বঙ্গদর্পণ। ৩

বঙ্গদর্পণ ।৩

পরিচয় পাবলিশার্স

প্রকাশক :
পরিচয় পাবলিশার্স
২১, হায়াৎ খাঁ লেন
কলিকাতা—৯

প্রথম প্রকাশ
২৫শে বৈশাখ, ১৩৬৭

মুদ্রাকর :
সত্যেন্দ্র নাথ সেনগুপ্ত
নিরুপমা প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
২১, হায়াৎ খাঁ লেন,
কলিকাতা —৯

সূচিপত্র

বঙ্গদর্পণ । ৩

ভূমিকা

পবিত্র সরকার

বঙ্গদর্পণ-এর তৃতীয় খণ্ড প্রকাশে বেশি দেরি হল। দেরির সমস্ত কার্যকারণ আমাদের নিয়ন্ত্রণে ছিল না। কম্পিউটারের কপি নষ্ট হওয়ার ফলে বেশ কিছু নিবন্ধ আবার নতুন করে কম্পোজ করতে হয়, তাতে বেশ কিছুটা সময় চলে যায়, কারণ একই কাজ দু-বার করে করতে হয়, কম্পোজ থেকে প্রুফ দেখা অবধি। যাই হোক, তৃতীয় খণ্ড শেষ পর্যন্ত দিনের আলো দেখছে, এতে আমরা সকলেই স্বস্তিবোধ করছি। আমাদের সমিতির সভাপতি বারবার উদ্‌বেগ প্রকাশ করেছেন, তাড়া দিয়েছেন 'কী হল' বলে, কিন্তু আমরা নিরুপায় হয়ে তাঁর ধৈর্যের পরীক্ষা নিয়েছি, নিতে বাধ্য হয়েছি।

পাঠকেরা লক্ষ করবেন, এই খণ্ডেও আমরা প্রয়াত বাঙালি লেখকদের প্রবন্ধ ছেপেছি। বর্তমান লেখক ও গবেষকদের মৌলিক লেখা সম্পাদকীয় দপ্তরে জমা পড়া আরম্ভ হয়েছে, কিন্তু এই কাজের মধ্যেই আমরা প্রয়াতদের এত গবেষণাধর্মী ও মূল্যবান লেখা হাতে পাচ্ছি যে, সেগুলিকে অনাদরে ও আড়ালে ফেলে রাখতে আমাদের কষ্ট হল। হোক না একটু এলোমেলোভাবে, তবু এ লেখাগুলিকে একটি খণ্ডের আশ্রয়ে সাজিয়ে দিয়ে আমরা একটু আরাম পাচ্ছি। জানি না আরও একটি খণ্ড আমাদের এ রকম পুরানো লেখা দিয়েই তৈরি করে দিতে হবে কি না। হলে সেটা খুব খারাপ ঘটনা হবে না। এরকম লেখা যে কত লেখা হয়েছে তার আংশিক আবিষ্কারও আমাদের বিস্মিত করছে।

আমাদের এবারের সম্পাদকীয়ের মূল বিষয় বাংলা ভাষার বর্তমান ও ভবিষ্যৎ নিয়ে। ইদানীংকালে জনপ্রিয় কাগজে 'বাংলাবাজ', 'বাংলাবাদী', ইত্যাদি কথার ইতস্তত লোষ্ট্র-নিক্ষেপ থেকে এই লেখাটির কথা মাথায় এসেছে। আমরা যারা বাংলাভাষার পক্ষে কিংবা ফটাফট ইংরেজিভাষার পক্ষে যারা— তাদের মধ্যে বাংলাবাদীরা সবাই ইংরেজিভাষার বিপক্ষে যেমন নন, তেমনই ইংরেজিবাদীরা সবাই বাংলা ভাষার বিপক্ষে নন। দুপক্ষেই

জনতা মিশ্রচরিত্রের। এই সত্যটি ভুলে গিয়ে মিডিয়া এ দুদলকে পরস্পরের প্রতিপক্ষরূপে দাঁড় করায় এবং সুবিধাবাদী হুল্লাসর্বস্ব রাজনীতি তার সুযোগ নেয়।

এ প্রবন্ধে আমরা একটি ব্যাপকতর পরিপ্রেক্ষিত তৈরির চেষ্টা করেছি। তাতে আর একবার ভাষাপ্রেম ভাষাবিরোধের কথা এসেছে। আশা করি তা পাঠকদের মূল প্রশ্ন, অবস্থান; সংকট ও কর্তব্যের বিষয়গুলি বুঝতে, অল্প হলেও, সাহায্য করবে।

২

একটি হিসেব থেকে পাই যে, পৃথিবীতে বাংলাভাষী মানুষের সংখ্যা বিশ কোটি আশি লক্ষ এবং এই হিসেবেই লোকসংখ্যা অনুযায়ী পৃথিবীতে বাংলা ভাষার স্থান সমস্ত ভাষাগুলির মধ্যে ষষ্ঠ।[১] প্রথমে মান্দারিন চিনা (সাতাশি কোটি চল্লিশ লক্ষ), তারপরে হিন্দি (ছত্রিশ কোটি ষাট লক্ষ), ইংরেজি (চৌত্রিশ কোটি দশ লক্ষ), স্প্যানিশ (বত্রিশ কোটি তিরিশ লক্ষ), আরবি (পঁচিশ কোটি ষাট লক্ষ), এবং আরবির পরে বাংলা। পোর্তুগিজ, রুশ, জার্মান, ফরাসি ইত্যাদি তার পরে। এটা সবই প্রথম ভাষা হিসেবে যারা ভাষাগুলি বলে তার পরিসংখ্যান। দ্বিতীয় ভাষা হিসেবে ধরলে ইংরেজির পাশে কেউ নেই।

ইন্টারনেট থেকে অন্যান্য সংখ্যা পাওয়া যেতেই পারে। আমাদের বাঙালিদের ধারণায় তা তেইশ চব্বিশ বা পঁচিশ কোটিতে কখনও কখনও পৌঁছে যায়, তাও খুব অস্বাভাবিক নয়।

কিন্তু একটা ভাষা কতজন লোক বলছে— এ সংখ্যাটা ভাষার মহিমার বিষয়ে খুব বড়ো কথা নয়। **এথ্‌নোলোগ্‌** পত্রিকার পরিসংখ্যান তুলেছেন ডেভিড ক্রিস্ট্যাল তাঁর **ল্যাঙ্গুয়েজ ডেথ্‌** বইয়ে,[২] তাতে পাই পৃথিবীতে এখন মোট ভাষার সংখ্যা ছ হাজার সাতশো তিনটি। কিন্তু যে-কথা আমাদের মন দিয়ে শোনবার তা এই যে, ভাষার সৃষ্টির পর ভাষার সংখ্যা নাকি ছিল এর প্রায় দুগুণ, অর্থাৎ প্রায় চোদ্দ হাজারের মতো। তার অর্ধেক ভাষা এই সময়ের মধ্যে লুপ্ত হয়ে গেছে। এবং ক্রাউস্‌ নামে একজন ভাষাবিলুপ্তি বিষয়ের গবেষক এ রকম অনুমান করেছেন যে, এই একুশ শতকে, অর্থাৎ মাত্র একশো বছরের মধ্যেই, এরও অর্ধেক ভাষা লুপ্ত হয়ে যাবে। অর্থাৎ পৃথিবীতে ভাষার সংখ্যা দ্বাবিংশ শতাব্দীর গোড়ায় দাঁড়াবে তিন-সাড়ে তিন হাজারের মতো। এতে অনেকেই ভাবতে পারেন, 'তাতে আপনার-আমার কী এল গেল? আমাদের ভাষাটা লুপ্ত না হলেই হল!' কিন্তু ভাষার দুর্গতি, বিপন্নতা ও মৃত্যু নিয়ে যাঁরা গবেষণা করেন তাঁরা ব্যাপারটাকে মোটেই মানবসংস্কৃতির পক্ষে স্বাস্থ্যকর মনে করেন না। তাঁরা বলেন, ভাষাবিলোপ পৃথিবীর জীববৈচিত্র্য বা বায়োডাইভার্সিটি কমে আসার মতোই ভয়ঙ্কর ঘটনা ঘটায়। জীববৈচিত্র্যের কমে-আসা যেমন মানুষের অস্তিত্বের পক্ষে বিপজ্জনক তেমনই ভাষাবৈচিত্র্যের ক্রমহ্রাসও তাই। বরং ভাষার লোপ আরও মারাত্মক। তার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে একটা মানবগোষ্ঠীর সম্পূর্ণ স্মৃতিসম্পদ লুপ্ত হয়ে যায়। স্মৃতিতে ধরে-রাখা তাদের গল্প-কথা, কিংবদন্তি,

পুরাণ-কথা, প্রবাদ-প্রবচন-নীতিকথার মধ্যে ধরে-রাখা মূল্যবোধ— অর্থাৎ নীতি ও সৌন্দর্যের এক বিপুল সৃষ্টিসম্ভার— মানুষের সম্মিলিত সংস্কৃতির এক অতি মূল্যবান খণ্ড— সব চিরকালের মতো হারিয়ে যাবে, আর তাদের পুনরুদ্ধার করা যাবে না। তার কিছু লিখিত বা রেকর্ডবদ্ধ হলে হয়তো থেকে যাবে, কিন্তু ঠাকুমা-দিদিমা বা মা-বাবা-দাদুর মুখ থেকে 'শোনা' কথার ব্যঞ্জনা ও সৌন্দর্য সম্পূর্ণ অন্য ধরনের। লিখিত নথিতে তার কিছুই থাকে না।

আমাদের বাংলা ভাষা কি এই ধরনের কোনো বিলোপ বা মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাচ্ছে? না, এ ধরনের কোনো অতিনাটকীয় আশঙ্কা আমরা এ নিবন্ধে তুলে ধরতে চাই না। তাহলে আর-একটা প্রশ্ন উঠবে— বাংলা ভাষা কি কোনোভাবে বিপন্ন? এর উত্তরে স্পষ্ট 'না' বলতে পারলে সুখী হওয়া যেত। হয়তো 'না'-ই বলব, কিন্তু তাকে আর একটা ব্যাখ্যা করে, ভাষার বিপদের নানা পর্যায় ও সম্ভাবনা দেখিয়ে আমাদের 'না' উত্তরটিকে চরিত্রদান করতে হবে।

৩

সমাজভাষাবিজ্ঞানীরা ভাষার শক্তি ও বিপন্নতা বোঝার বা বোঝানোর জন্য কতকগুলি প্রশ্ন তোলেন সেই ভাষাটির সামাজিক অবস্থান সম্বন্ধে। প্রথম ও দ্বিতীয়— এই দুটি স্তরে এ প্রশ্নগুলিকে ভাগ করতে পারি আমরা। প্রথম স্তরে প্রশ্নের গুচ্ছ শুধু সেই ভাষাটির দিকে লক্ষ্য রেখে, অন্য কোনো ভাষার সঙ্গে তার তুলনায় না গিয়ে, অন্য কোনো ভাষার সঙ্গে সম্পর্কহীন ভাবে। আর দ্বিতীয় স্তরের প্রশ্নের গুচ্ছ তার বাইরে গিয়ে, অর্থাৎ অন্য এক বা একাধিক ভাষার সঙ্গে তার তুলনা করে, অন্য ভাষার সঙ্গে সম্পর্কিতভাবে তার শক্তি বা অবস্থান বিবেচনা করে।

অবশ্যই এই দুটি স্তরের তফাত খানিকটা তাত্ত্বিক ও কাজের সুবিধের জন্য করা; আসলে অন্য ভাষার থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন ও দূরবর্তী ভাষা আজকের পৃথিবীতে নেই বললেই হয়। ফিলিপিন্‌সের দুর্গম অরণ্যে হয়তো কোনো আদিম গোষ্ঠী এখনও সভ্যতার বাকি অংশের থেকে দূরে নিঃসঙ্গ বাস করছে, কিন্তু তারাও যে অন্য গোষ্ঠীর ভাষা বা সংস্কৃতি থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন তা বলা মুশকিল। ফলে প্রথম স্তরের প্রশ্নগুচ্ছের মধ্যেই অন্তর্লীনভাবে রয়েছে দ্বিতীয় স্তরের প্রশ্নগুচ্ছ। তবু এই তাত্ত্বিক বিভাগটুকু বজায় রেখেই আমরা প্রশ্নগুলিকে সাজিয়েছি। সেই প্রশ্নগুলি হল—

১. সেই ভাষাটি কত জন লোক বলে?
২. সেই ভাষার লোকেরা একটি জায়গায় সংহত হয়ে বাস করে কি না।
৩. সেই ভাষাটি লিখিত হয়েছে কি না।
৪. লিখিত হয়ে থাকলে তার শব্দভাণ্ডার কত?
৫. তাতে সাহিত্যসৃষ্টির পরিমাণ কতটা।

৬. তার ব্যাকরণ, অভিধান ইত্যাদির পরিমাণ কী রকম।
৭. তা তার গোষ্ঠীতে স্বচ্ছন্দে পুনর্নবায়িত (self-renewed) হয় কি না, অর্থাৎ সে ভাষাগোষ্ঠীর শিশুরা বিনা চাপে ও বাধায় সে ভাষা 'মা-মাসি'দের কাছে বলতে এবং স্কুলে গিয়ে 'লিখতে' শেখে কি না।
৮. সে ভাষার প্রশাসনিক শক্তি ও সমর্থন আছে কি না।
৯. এ ভাষা স্কুলের শিক্ষায় আইনে, ব্যবসায়িক অর্থব্যবস্থায় কারবার পরিচালনায় ইত্যাদিতে ব্যবহৃত হয় কি না। শিক্ষার বাহন হিসেবে? বিষয় হিসেবে?

এ ধরনের আরও কিছু প্রশ্ন নিশ্চয়ই করা যায়। কিন্তু এই প্রশ্নগুলির শেষ দিকে এলে আপনারা বুঝতে পারছেন যে, এগুলির আড়ালে দ্বিতীয় স্তরের বহুবিধ প্রশ্ন উঁকি দিচ্ছে। আমাদের মনে রাখতে হবে যে, লেখা একটি তুলনায় আধুনিক প্রযুক্তি। মানবভাষার বয়স চল্লিশ হাজার বছরের মতো হলে লেখার বয়স সাড়ে পাঁচ হাজার বছরের বেশি নয়, এবং লেখার লিপি হয় অন্য কোনো ভাষার লিপি থেকে নেওয়া, না-হয় অন্য ভাষার দেখাদেখি নিজেদের কারও উদ্ভাবন করা। আর লিখিত হলেই সাহিত্যের অনুবাদ আরম্ভ হয়, অনুবাদের সূত্রে অন্যভাষার সঙ্গে পাকাপোক্ত সম্পর্ক গড়ে ওঠে। অবশ্যই মুখের ভাষাতেও (অর্থাৎ লিখিত হওয়ার আগেও) অনুবাদ সম্ভব, কিন্তু তার পরিসর ও স্থায়িত্ব খুব সংকীর্ণ।

এবার দ্বিতীয় স্তরের নির্বাচিত প্রশ্নাবলি :

১. ভাষাটি দ্বিভাষী বা বহুভাষী অঞ্চলে বলা হয় কি না, অথবা ভাষাটির সঙ্গে প্রতিবেশী অন্যান্য ভাষার সম্পর্কের চরিত্রটি কী রকমের?
২. (এই প্রশ্ন উপরের প্রশ্নেরই বিস্তার, হয়তো এর পরেরগুলিও) এ ভাষার লোকেরা কি অন্যভাষার দ্বারা প্রভাবিত? অন্য এক বা একাধিক ভাষা কি প্রশাসনিক ও অন্যান্য শক্তিতে এর উপরে বা নীচে? নিজের অঞ্চলে কি এর স্বপ্রাধান্য নেই?
৩. এ ভাষার মানুষেরা কি ভাষাগত সংখ্যালঘু, এর চারপাশে কি অন্য ভাষার লোকসংখ্যার বিপুল প্রাধান্য? তারই ফলে কি এ ভাষার শিশুরা নিজেদের ভাষা ভুলে যাচ্ছে? অর্থাৎ ভাষার মানুষের সংখ্যালঘুত্ব এবং ভাষাটির আপেক্ষিক প্রশাসনিক অবস্থান কি তার ভিত্তি দুর্বল করছে এবং তার পুনর্নবায়নে বাধা তৈরি করছে?[৬]
৪. এই ভাষার আঞ্চলিক, জাতীয় ও বৈশ্বিক অবস্থান কী রকম? অর্থাৎ এটি কি রাজ্যস্তরে প্রধান ও প্রশাসনিক ভাষা, জাতীয় স্তরেও তাই? এটি কি অন্যতম বিশ্বভাষা? প্রধানতম বিশ্বভাষা?
৫. এই ভাষা তার সন্তানদের জীবন ও জীবিকার ক্ষেত্রে কতদূর এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে? তাকে কি এসব ক্ষেত্রে অন্য ভাষা শিখতে এবং ব্যবহার করতে হয়? হলে কখন, কী পরিমাণে? তার পরিপ্রেক্ষিতে নিজের ভাষা সম্বন্ধে তাদের কী ধারণা তৈরি হয়? (পরের প্রসঙ্গ দ্রষ্টব্য)।
৬. আর একটি বা অন্যান্য ভাষায় আপেক্ষিক শক্তি বা সম্ভ্রমের ফলে এ ভাষার মানুষেরা নিজেদের ভাষা সম্বন্ধে কী ভাবে? তারা কি মনে করে, 'আমাদের এ ভাষা ভালো, একে আমরা হারিয়ে যেতে দেব না, প্রাণ দিয়েও রক্ষা করব?' না

কি ভাবে যে, 'দূর! এ একটা কোনো ভাষাই নয়, এ ভাষা আমাদের ছেলেমেয়েরা ভুলে গেলেই ভালো। অমুক ভাষাটার ক্ষমতা বেশি, মানসম্মানও বেশি, ফলে আমরা আমাদের সন্তানদের ওই ভাষাটাই শেখাব।' অর্থাৎ নিজেদের ভাষা সম্বন্ধে সেই ভাষাগোষ্ঠীর কখনও Positive বা Negative attitude তৈরি হয়ে যায়। সেটাও আশেপাশে অন্য ভাষার উপস্থিতির কারণেই।

এই সব প্রশ্নের উত্তরের মধ্যেই নিহিত থাকে কোনো ভাষার অবস্থান কী রকম। সমাজভাষাবিজ্ঞানীরা ভাষার এই শক্তি ও স্বাস্থ্য বা আয়ুর সম্ভাবনা অনুযায়ী ভাষাকে শক্ত-সমর্থ (stable), বিপন্ন (threatened), মৃতপ্রায় (moribund) এবং মৃত (dead) — এইরকম কয়েকটি শ্রেণিতে ভাগ করেন।[৪] সব ভাষাবিজ্ঞানীর শ্রেণিবিভাগ একরকম নয়, তবু ক্রাউস-এর অনুকরণে (হুবহু অনুসরণ নয়) আমরা ভাষার এই চারটি দশার তাত্ত্বিক ন্যায্যতা মেনে নিতে পারি।

'শক্তসমর্থ' দশা হল যখন ভাষাটির প্রশাসনিক ও অন্যান্য প্রাধান্য আছে, কোথাও এর উপর কোনো চাপ বা বিপদ নেই, কোনো সংকটই এসে একে আক্রমণ করেনি। ফলে এ ভাষার নিরাপত্তা নিয়ে কোনো প্রশ্নই নেই। এ ভাষার মানুষেরা সেই মজার জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকেন যাকে ইংরেজিতে বলে 'on the top–of–the–world feeling'। এ ভাষার লোকেরা রাত্রে নিশ্চিন্তে ঘুমোতে পারে ভাষা সম্বন্ধে যাবতীয় উৎকণ্ঠা বিসর্জন দিয়ে।

বলা বাহুল্য বাংলা এ ধরনের ভাষার মধ্যে পড়ে না। পৃথিবীর বেশির ভাগ ভাষাই পড়ে না, এবং তার মধ্যে ফরাসি, জার্মান, রুশ, স্প্যানিশ, জাপানি ইত্যাদি যদ্‌যাবতীয় ভাষাই আছে। যেটি পড়ে সেটি হল ইংরেজি। ইংরেজ ভাষাবিজ্ঞানীরা অবশ্য ক-বছর হল একটা হুলিয়া তুলেছেন যে, ইংরেজি আর একরকম থাকছে না, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন রকমের ইংরেজি, অর্থাৎ other Englishes তৈরি হচ্ছে।[৫] কিন্তু আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি এটা ইংরেজিভাষী ও তাদের অনুগত লোকজনদের একটা রাজনৈতিক অতিরঞ্জন এবং আসল ঘটনা থেকে লোকের মনটা অন্য দিকে ঘুরিয়ে দেবার চেষ্টা। Other Englishes মানে অন্যান্য অঞ্চলে লোকেদের মুখে ইংরেজির স্থানীয় রূপান্তর। প্রধানত সেইটা; কিন্তু সে তো ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জের মধ্যে নানা অঞ্চলে এবং সমাজের নানা স্তরে এখনই আছে। আদার ইংলিশেজ্ তারই একটি আন্তর্জাতিক বিস্তার মাত্র। কোথাও তা প্রথম ভাষা হয়েই[৬] বদলেছে, আবার কোথাও তা দ্বিতীয় বা বিদেশি ভাষা হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে বদলেছে। প্রথম ভাষা হয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে, অস্ট্রেলিয়ায়, কানাডার বৃহদংশে, পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে ও অন্যান্য ছোটোখাটো জায়গায়। আবার তার মধ্যেও রূপবৈচিত্র্য দেখা গেছে, যেমন যুক্তরাষ্ট্রের আঞ্চলিক উচ্চারণ বা শাদা ও কালোদের ইংরেজি। ইংরেজরা প্রথমে এ ব্যাপারটাও খুব ভালো চোখে দেখেনি, 'Look what the Americans have done to our language' গোছের আপত্তি ও অনুযোগ তাদের অনেকেরই মনে ছিল। অন্যদিকে দ্বিতীয় ভাষা হিসেবে তৈরি হয়েছে ভারতীয় ইংরেজি, চিনা জাপানি ইংরেজি, তুর্কি ইংরেজি ইত্যাদি। তারও মধ্যে নানা আঞ্চলিক রূপান্তর আছে, মুখ্যত উচ্চারণগত— যেমন বাঙালির, তামিলের বা পাঞ্জাবির ইংরেজি।

প্রথম বা দ্বিতীয় ভাষা হিসেবে ইংরেজির এই রূপান্তর আটকানোর ক্ষমতা মূল ইংরেজিভাষীদের নেই, বরং তারাই এটা ঘটিয়েছে— একদিকে সাম্রাজ্য চাপিয়ে, অন্যদিকে (মূলত মার্কিনদেশের) অর্থনৈতিক রাজ্যপাট ও তার উপায় হিসেবে বহুজাতিক সংস্থার বিস্তারে এবং তার পাশাপাশি পাশ্চাত্যের নানা ধরনের প্রযুক্তির (ট্রেন ও জাহাজ-চালনা, উড়োজাহাজ-চালনা, কম্পিউটার, বেতার, টেলিফোন, টেলিভিশন, মোবাইল ইত্যাদি) বিশ্বায়নে। এই সব কারণে 'সবই আমরা মেনে নিচ্ছি'— এই ধরনের একটা প্রশ্রয়ের পিঠ-চাপড়ানো ভঙ্গি যেন তৈরি হয়েছে ইংরেজিভাষী সমাজভাষাবিজ্ঞানীদের মধ্যে। ফলে তাঁরা 'other Englishes' কথাটিকে চতুর্দিকে ছড়িয়ে দিচ্ছেন।

এর আড়ালে যে তথ্যটি প্রচ্ছন্ন হয়ে আছে তা হল লিখিত আদর্শ বা স্ট্যান্ডার্ড ইংরেজির চেহারা মোটামুটি সর্বত্রই এক, অল্পবিস্তর হেরফের ছাড়া। ইংরেজ এই বিশ্বভাষার আঞ্চলিক রূপান্তর মেনে নেয়, কিন্তু সকলেই চায় একটা স্ট্যান্ডার্ড-এর কাছাকাছি পৌঁছোতে। অন্তত লেখায় তার স্ট্যান্ডার্ড 'রূপ' জানতেই হবে, নইলে লোকে আড়ালে হলেও হাসবে। সকলে তা পারে না, তার নানা কারণ আছে। না পারলে তা নিয়ে হাসাহাসি হয়, যেমন ভারতীয় 'বাবু ইংরেজি' নিয়ে হয়। এই হাসাহাসির একটাই অর্থ— অর্থাৎ 'বেচারিরা আর কী করবে? ওরা ইংরেজির হালের হকিকত জানে না তো!' এই হালের হকিকত হল স্ট্যান্ডার্ড ইংরেজির এখনকার অবস্থা। অর্থাৎ আসলে ইংরেজি ভাষার পুরোপুরি গণতন্ত্রীকরণ ঘটেনি, ঘটছে না। তার মধ্যে রূপের একটা আদল সারা পৃথিবী জুড়েই মানতে হবে।

বাংলা ভাষা সম্বন্ধে বলতে গিয়ে ইংরেজির সাতকাহন বলার কারণ আর কিছু নয়, বাংলা ভাষার আপেক্ষিক অনিরাপত্তার একটা কারণ ভারতের এবং পশ্চিমবঙ্গ, বাংলাদেশ, ত্রিপুরা, কাছাড় ইত্যাদি নানা অঞ্চলে থিতু বাঙালিদের সমস্যা, সেই সঙ্গে অন্যভাষীদেরও সমস্যা, — কীভাবে ইংরেজির শক্তির সঙ্গে তুলনায় বাংলা ভাষার শক্তিকে একটা সুস্থিত বিন্যাসে আনা যাবে। ইংরেজি ভাষার লোকেদের যেমন পৃথিবীর অন্য কোনো ভাষা না-শিখলেও দিব্যি চলে যায়, পৃথিবীর অন্য কোনো ভাষার মানুষের অন্তত একটা অংশের কাজের জন্য, উচ্চতর জীবিকার জন্য তথা সাফল্যের জন্য ইংরেজি শিখতেই হবে। এই ইংরেজি শেখানোর ব্যাপারটা কখন কীভাবে কতটা কোথায়— এই নিয়ে যত বিতর্ক। শেখানোর ব্যাপারে কোনো আপত্তি নেই, বরং আগ্রহই আছে।

ইংরেজির পরে বাংলা ও অন্যান্য ভারতীয় ভাষার আপেক্ষিক অনিরাপত্তার একটা উৎস হল হিন্দি ভাষা। বাংলাদেশের ক্ষেত্রে এই বিপদটা তত নেই। পশ্চিমবাংলা বা অন্যত্র আছে। হিন্দি শুধু আমাদের ভারতীয়দের প্রধান প্রশাসনিক ভাষাই নয়। তা ভারতীয় বৈদ্যুতিন মাধ্যমের (রেডিয়ো ও টেলিভিশনের) এক প্রধান ভাষা। বিশেষত বিনোদনের একটি অত্যন্ত শক্তিশালী মাধ্যম— হিন্দি চলচ্চিত্র— তা সিনেমা হল ও ভিডিয়ো, সিডি ইত্যাদির সূত্রে ভারতের বাংলা ভাষা-অঞ্চলের অভ্যন্তরে দূর-দূরান্তে চলে গেছে, এবং বিনোদন-আকর্ষণ হিসেবে স্থানীয় ভাষার চলচ্ছবি বা নাটক তার ধারেকাছে পৌঁছোতে পারেনি। রেডিয়োতেও 'বিবিধ ভারতী' এবং ইদানীংকালের 'রেডিয়ো মির্চি' জাতীয় এফ. এম. চ্যানেলে হিন্দির প্রচুরতর ব্যবহারও অনাচারিক বা informal উপায়ে হিন্দিকে আমাদের কাছে অধিকতরভাবে প্রকাশিত করছে। এ ছাড়া ভারতের বিভিন্ন নগরের

অর্থনীতিতে মূলত হিন্দিভাষী মানুষদের প্রবল উপস্থিতিও হিন্দির প্রাধান্যকে স্পষ্ট করে। এ বিষয়টি অনেকেই আমরা লক্ষ করেছি যে, বাংলার প্রতিবেশী দুএকটি রাজ্যে, যেমন আসাম, ওড়িশা ও মণিপুরে কয়েক বছর আগেও যেখানে সাধারণ লোকের সঙ্গেও বাংলা ভাষায় কথা বলা সম্ভব ছিল সেখানে এখন তাঁরা বাংলা বলতে চান না বললেই চলে। বাংলাকে সেখানে অলক্ষ্যে হিন্দি এসে স্থানচ্যুত করেছে। হয়তো জাতীয় ভাষা হিসেবে হিন্দি এভাবেই নিজেকে প্রতিষ্ঠা করছে, তাতে আমাদের আপত্তির কিছু নেই। কিন্তু আমাদের ঘরেও তার প্রবল অনুপ্রবেশ আমার ভাষাকে কোন্ জায়গায় কতটা সংকীর্ণ করে আনছে সেটাও ভাববার বিষয়।

এমনকি হিন্দিভাষী অঞ্চলে যে বাংলার উপর হিন্দির প্রভাব পড়বে তাতেও বিস্ময়ের কিছু নেই। বাংলা যেখানে সংখ্যালঘু সেখানে ভাষাবিজ্ঞানে যাকে shift বলে তা এ ভাষার ক্ষেত্রে ঘটবেই। ফলে বেনারসের বাংলায় 'ইনি আমার মাসিমা হচ্ছেন' (= ইনি আমার মাসিমা), বা পাটনার বাংলায় 'পাকিট থেকে মাচিস বার করে মুখের সিগারেটা সব সুঘলেছি (ধরিয়েছি), এমন সময় দেখি বগলে (পাশে) বাবা!' এ ধরনের বাংলা তৈরি হবেই। তৈরি হবে ঘরের বাইরে, অন্যভাষার প্রাধান্যের প্রতিবেশে। কিন্তু তার নিজের ঘরেও শোনা আর দেখায় যখন অন্য ভাষার বহুলতর উপস্থিতি তৈরি হয় তখন বাংলা ভাষার মানুষদের একটু উদ্‌বেগ তৈরি হতেই পারে। পরে আমরা মূল বাংলাভাষী অঞ্চলেই কোনো একটা স্তরে বাংলার কিছুটা হেনস্থা আমরা লক্ষ করব, আবার বহুজাতিকের বিজ্ঞাপন ইত্যাদিতে যে বাংলা-হিন্দি ইংরেজির খিচুড়ি code-mixing হচ্ছে তাও দেখব। এ সম্বন্ধে আমাদের মন্তব্যও পরের জন্যই তোলা রইল।

৪

উপরের প্রশ্নগুলির ভিত্তিতে সেগুলির উত্তর খুঁজতে খুঁজতে আমরা এবার বাংলা ভাষার আপেক্ষিক শক্তি ও দুর্বলতা সন্ধান করতে এগোই।

প্রথমেই লক্ষ করতে বলি, আমরা বাংলা ভাষার গঠন, তার সৌন্দর্য ইত্যাদি সম্বন্ধে কোনো প্রশ্ন রাখিনি। তার কারণটা এই যে, কোনো ভাষার গঠন, অর্থাৎ ব্যাকরণের যে-সব নিয়মে ভাষার ধ্বনি জুড়ে শব্দ তৈরি এবং শব্দ জুড়ে অর্থপূর্ণ বাক্য গঠন করা হয় তা ভাষার একধরনের শক্তি বটে, কিন্তু ভাষার আপেক্ষিক শক্তি সম্বন্ধে খুব বড়ো বিবেচনা নয়। দ্বিতীয়ত ভাষার সৌন্দর্য মানে তার প্রকাশের সৌন্দর্য, শ্রুতি ও অর্থগত সৌন্দর্য— সে সব সম্বন্ধে আমাদের ধারণা খানিকটা মন্ময় ও অনুভবাত্মক। তৃতীয়ত ভাষার প্রশাসনিক ও ব্যবহারিক (আঞ্চলিক, জাতীয়, বৈশ্বিক) শক্তির ক্ষেত্রে ভাষার সৌন্দর্যের বিষয়টিও খুব গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে না। এমনকি তার ব্যাকরণ সহজ না কঠিন, তা সহজে শেখা যায় কি বা যায় না— এ সব প্রশ্নের কোনো মূল্য নেই। শিশু যদি অন্য ভাষার মৌখিক

প্রতিবেশে থাকে, অর্থাৎ ভাষাটা বলা ও শোনার যথেচ্ছ সুযোগ পায়, তাহলে ভাষার আপেক্ষিক সহজত্ব ও কঠিনতা তার কাছে কোনো সমস্যাই নয়, সে তা অনর্গল বলতে শিখে যাবে। বরং যা এসব ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে তা হল ওইসব প্রশ্নের উত্তর, বিশেষত দ্বিতীয় স্তরের প্রশ্নাবলির উত্তর। তবু আমরা প্রথম স্তরের প্রশ্নগুলির থেকেই বাংলায় এখনকার অবস্থান-সংক্রান্ত আলোচনা শুরু করি।

প্রথম প্রশ্নের উত্তরে আমরা বলতে পারি যে, বাংলা ভাষায় এখন যা জনসংখ্যা, তাতে তার লুপ্ত হওয়ার কোনো দূরবর্তী সম্ভাবনা নেই, এমনকি এ ভাষা সে অর্থে দুর্গত বা বিপন্ন ভাষাও নয়। কী অর্থে বিপন্ন, বা তার মধ্যে একটা টেনশন তৈরি হয়েছে তা আমরা একটু আগে আংশিক আলোচনা করেছি। এ ভাষা দীর্ঘদিন লিখিত হয়েছে, তার প্রকাশের শিল্পগত ও মানবিক মূল্য আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি লাভ করেছে। অন্যান্য প্রশ্নের আলোচনায় গিয়ে দেখি যে পাক-ভারত উপমহাদেশে সংহত ও সন্নিহিত অঞ্চলে বদ্ধ এক বিশাল জনগোষ্ঠী এ ভাষা মৌখিক ও লিখিতভাবে বলে ও ব্যবহার করে, এবং এই অঞ্চলটিই এ ভাষার সৃষ্টিশীলতার সবচেয়ে বড়ো উৎস।

কিন্তু যে-বাঙালিরা অসংহতভাবে অন্যত্র থাকে, ভারতে অন্যভাষী অঞ্চলে এবং বিশ্বের অন্যান্য দেশে— তারা আগে তাদের ভাষা ও সংস্কৃতির মূল ধারা থেকে যতটা দূরবর্তী ও বিচ্ছিন্ন ছিল, তারা আর ততটা বিচ্ছিন্ন নেই। নতুন সময়ের তথ্যপ্রযুক্তি যে 'ভুবনগ্রাম'-এর কল্পবাস্তব তৈরি করেছে, তাই সম্ভব করেছে আবিশ্ব বাঙালিকে, বিশেষত কমবেশি সম্পন্ন বাঙালিকে আরও কাছাকাছি আনায়। বিমান চলাচলের সুবিধেতে বাংলাদেশের ইলিশ মাছ আর কাঁচালঙ্কা যেমন অত্যন্ত সহজেই মার্কিনদেশের বাঙালিদের কাছে পৌঁছে যায়, তেমনই ইন্টারনেটের সাহায্যে বাংলা খবরের কাগজও পৌঁছায় দেশবিদেশের কম্পিউটারধারী বাঙালিদের কাছে। দেশে বাংলা পত্রপত্রিকার, অন্তত দৈনিকপত্রের প্রসার বাড়ছে, জনপ্রিয় দৈনিক পৌঁছে যাচ্ছে একাদশ লক্ষের প্রচারে, পশ্চিমবঙ্গে-বাংলাদেশে সাময়িকপত্রের সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটছে, এবং তারও আন্তর্জাতিক ব্যাপ্তি ঘটছে। এছাড়া নিউ ইয়র্কে টোরোন্টোতে মূলত বাংলাদেশীদের উদ্যোগে একাধিক পত্রপত্রিকা প্রকাশিত হচ্ছে। এটা লক্ষ করছি যে, তার লেখক ও পাঠকদের কয়েকটি সক্রিয় গোষ্ঠী তৈরি হয়েছে। ফলে বাংলার মূল ভূখণ্ড যেমন ইন্টারনেটে অভিবাসী বাঙালিদের মাউস-টেপার নাগালে এসে গেছে, তেমনই অভিবাসী বাঙালিরাও নিজের নিজের ছোটোবড়ো ভাষাবৃত্ত সৃজনবৃত্ত তৈরি করেছেন, বৃহত্তর সংস্কৃতিবৃত্তের অংশ হিসেবে। অন্যদিকে একাধিক বাংলা ইন্টারনেট পত্রিকাও বেরিয়েছে— দুই বাংলা থেকেই। সেই সঙ্গে উপগ্রহের সাহায্যে একাধিক চ্যানেলে বাংলা টেলিভিশন অনুষ্ঠান বিশ্বের অনেক দেশেই লভ্য। তার সঙ্গে জুড়ে দিতে হবে সিডি ক্যাসেট ভিডিয়ো ইত্যাদির সুবিধা— যা বছর পনেরো-কুড়ি আগেও প্রায় অকল্পনীয় ছিল।

বাংলা স্বাধীন গণপ্রজাতন্ত্রী রাষ্ট্র বাংলাদেশের একমাত্র প্রশাসনিক ভাষা। তুলনায় কিছুটা গৌণ হলেও ভারতে পশ্চিমবাংলা ও ত্রিপুরার প্রশাসনিক ভাষা। ভারতের সংবিধানের ৩৪৩ থেকে ৩৫২ ধারার মধ্যে, এবং তার অঙ্গ হিসেবে সংবিধানের অষ্টম তপশিলি, 'ভারতের বহুবিধ ভাষার (১৯৮১-র ১৬৫২-টি ভাষাকে ২০০১-এ ১১৪-টি 'মাতৃভাষা'-তে কমিয়ে আনা গেছে) যে ক্রমবিন্যাস করা হয়েছে তাতে বাংলার স্থান এ রাষ্ট্রের

দ্বিতীয় স্তরে। অর্থাৎ রাষ্ট্রভাষা হিন্দি ও ইংরেজির পরেই তার এবং অন্যান্য আঞ্চলিক প্রশাসনিক ভাষার স্থান।

ফলে বাইরে থেকে দেখতে গেলে বাংলার বিপন্নতা বেশি হওয়ার কথা নয়। তার মর্যাদাও বিষয়টিও আপাতদৃষ্টিতে খুব বিপদ্‌গ্রস্ত নয়, যদি আমরা 'মর্যাদা'-র অর্থ নিয়ে খুব বেশি পীড়াপিড়ি না করি। তার আগে এ কথাগুলিও জুড়ে দেওয়া ভালো যে এ ভাষা পশ্চিমবাংলা ও বাংলাদেশের অধিকাংশ স্কুলে ও কলেজে এখনও শিক্ষার বাহন, কোথাও বা বিশ্ববিদ্যালয়ে। কিন্তু উপরের স্তরে তার বাহনত্বের গৌরব আংশিক মাত্র, কারণ আইন, ডাক্তারি, ইঞ্জিনিয়ারিং, ম্যানেজমেন্ট ইত্যাদি বৃত্তিমূলক ও প্রযুক্তিক্ষেত্রের শিক্ষায় বাংলার ব্যবহার সামান্যই। অর্থাৎ জার্মান, ফরাসি, জাপানি, রুশ ইত্যাদি সব ভাষা বাংলার তুলনায় হ্রস্বতর জনগোষ্ঠীর হওয়া সত্ত্বেও সেগুলির কাছে বাংলা এইখানে হেরে গেছে যে, সে সব ভাষায় কলা, বিজ্ঞান, চিকিৎসা, প্রযুক্তি ইত্যাদি সমস্ত ধরনের সর্বস্তরের শিক্ষা চলছে, বাংলা সেখানে শিক্ষাতেও সর্বত্র নিজের অস্তিত্ব ছড়াতে পারেনি। কোনো ভারতীয় ভাষাই পারেনি যে, সেটা বাংলার জন্য আলাদা কোনো সান্ত্বনার বিষয় কি না জানি না।

শিক্ষা একটা আচারিক বা formal এলাকা, সেখানে বাহন হিসেবে ভাষার ব্যবহার ভাষার একটা আচারিক প্রয়োগ। এই আচারিক ব্যবহারে ভাষাগোষ্ঠীর কাছে ভাষার মূল্য বাড়ে। এইরকমভাবে ভাষার আর-একটি আচারিক প্রয়োগের এলাকা হল প্রশাসনে ও আইনে। বলা বাহুল্য, এখানেও বাংলার সাফল্য সর্বাঙ্গীণ নয়। প্রশাসনে বাংলাদেশ ও ত্রিপুরাতে বাংলা হয়তো অনেকটাই এগিয়েছে, পশ্চিমবাংলায় বাংলার অগ্রগতি সে তুলনায় ধীরে। পশ্চিমবাংলায় নিম্ন আদালতে কয়েকটি রায় বাংলায় হয়েছে শুনেছি, কিন্তু ব্যতিক্রম বলেই সেগুলি বিশেষ প্রচার লাভ করেছে। এখনও এখানে ইংরেজিই মোটামুটিভাবে আইনের সর্বমান্য ভাষা, যদিও তার ফলে সাধারণ মানুষ অনেক সময় বিচারকদের রায়, বিচারক ও কৌসুলির বা কৌসুলিতে কৌসুলিতে উক্তি-প্রত্যুক্তির বিষয়টি বুঝতে পারে না। জানি না এতে তার গণতান্ত্রিক বা মানবিক অধিকার ক্ষুণ্ণ হয় কিনা।

সরকারি প্রশাসনের বাইরে ভাষার আচারিক প্রয়োগ ঘটে বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের চিঠিপত্রে, প্রতিবেদনে, এমনকি, সরকারের মতোই ফাইল-রক্ষায় ও চিঠিপত্রের বা প্রতিবেদনের উপর মন্তব্যে। এখানেও কতকগুলি জায়গায় বাংলা প্রবেশ করতে পারেনি। যেমন বহুজাতিক ও অন্যান্য শিল্পগোষ্ঠীর জগতে। কেবল স্থানীয় স্তরের ব্যবসাবাণিজ্য দোকানদারিতেই বাংলা কিছুটা ব্যবহৃত হয়।

অবশ্যই অনাচারিক বা informal ক্ষেত্রে বাংলার ব্যবহার মোটামুটি ব্যাপক। এর একটা বিস্তার হল সৃষ্টি ও সৌন্দর্য-নির্মাণের পরিসর যেখানে বাংলার কবি লেখক গীতিকার নাট্যকার চলচ্চিত্রকাররা নিরন্তরভাবে সৃষ্টি করে চলেছেন। এই সৃষ্টিশীলতা মহত্ত্বের শীর্ষবিন্দুও প্রায়ই স্পর্শ করেছে।

কিন্তু আচারিক নানা ক্ষেত্রে বাংলার অধিকার যে সর্বাঙ্গীণ হতে পারেনি তার জন্যই অন্যান্য ভাষার মতোই বাংলা ভাষার দেহে খানিকটা উদ্‌বেগ জেগে আছে। উদ্‌বেগ এই জন্য নয় যে, অন্য ভাষার উপস্থিতিতে বাংলা ভাষার ভূমিকা তার সংস্কৃতিতে, বিশেষত বাঙালি মধ্যবিত্ত ও উচ্চমধ্যবিত্তের সংস্কৃতিতে, খানিকটা খণ্ডিত। সেটা এই সব মানুষের

শৌখিন ক্লাবে বা পার্টিতে গেলেই বোঝা যায়, দেখা যায় যে, সুন্দরী বাঙালি নারীরা যেমন নিজেদের মধ্যে ইংরেজিতে কথাবার্তা বলছেন তেমনই টাই-সুট পরিহিত বাঙালি সাহেব বা নকশাদার সিল্কের পাঞ্জাবি, চুড়িদার ও প্রলম্বিত চাদরের বাঙালি ভদ্রলোকও ইংরেজিতে কথাবার্তা বলছেন, মাঝেমধ্যে বাংলার মিশেল দিয়ে। এরা বাংলাভাষী সমাজের মধ্যে থেকেও বিশেষ বিশেষ প্রতিবেশে একধরনের অভিবাসী বা immigrant হয়ে যান। তখন আমার তিরিশ বছর আগে বিদেশপ্রবাস-কালে মিনিয়াপোলিসে আমাদের বাড়িতে অতিথিবালক রেমন্ড বা রহমানের কথা মনে পড়ে। গুরুগম্ভীর প্রবন্ধে হালকা গল্পের স্থান দেওয়াতে খানিকটা ভ্রূকুটি জাগতে পারে কারও কারও, বিশেষত এটা অভিবাসীদেরই গল্প— যাতে ভাষার রক্ষণ বা maintenance-এর চেয়ে বিসরণ বা shift-এ বেশি প্রত্যাশিত। চারপাশে অন্যভাষার প্রবল চাপ, বাবা-মাও বাংলা বলেন না শিশুর সঙ্গে এই ধারণা থেকে যে, ঘরে বাংলা বললে শিশুর ওই বিদেশের ভাষা ইংরেজি শেখার বাধা ঘটবে। ফলে দক্ষিণ এশীয় বাবা-মার সন্তান সত্বর নিজের ভাষা ভুলে ইংরেজিতে রপ্ত হয়ে যায়। বাড়িতে যতটা না হয় স্কুলে গিয়ে হয় আরও দ্রুত ও বেশি করে। কারণ স্কুলে সে মেশে সমকক্ষ বন্ধু ও peer group-এর সঙ্গে— যাদের ভাষা ইংরেজি।

আমাদের এই রেমন্ড ছিল বাংলাদেশি বাবা-মার সন্তান। বছর সাতেকের হবে। তার বাবা-মা আমাদের অতিথি ছিলেন দু-দিন, আমরা রাত্রে বহুক্ষণ আড্ডা দিতাম, রেমন্ড আমার বছর দেড়েক বয়সের ডায়াপার পরা মেয়ের খেলনাগুলি নিয়ে খেলত আর তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে পড়ত, আর রাত্রিজাগরণক্লান্ত আমাদের শয্যাত্যাগের বহু আগেই তারা দুজনেই উঠে আবার খেলতে বসে যেত। একদিন ভোরে আমরা ওইরকম ঘুমে অচেতন, এমন সময় রেমন্ড এসে আস্তে আস্তে আমাকে ঠেলা দিয়ে এমন কিছু বলল যা আমি প্রথম ধাক্কায় বুঝতে পারিনি। 'সে দ্যাট্ আগেইন!' বলায় রেমন্ড আগের কথাটারই পুনরাবৃত্তি করে বলল, আংক্ল, আংক্ল, শি ডিড্ সাম 'হাগা'।

আমি তার বিপন্নতা বুঝে আমার মেয়ের ডায়াপার বদলে দিয়ে আবার এসে ঘুমিয়ে পড়লাম। পরে ভাবলাম, এ এক বিচিত্র ভাষা রক্ষণ ও বিসরণের খেলার সাক্ষী হলাম আমি। রেমন্ডের ভাষার রক্ষিত অংশ প্রায় অবলুপ্ত, তার জায়গা নিয়েছে ইংরেজি। কিন্তু কোথাও কোথাও তার ভাষা নাছোড়বান্দা হয়ে ঝুলে আছে, হয়তো একটি দুটি শব্দে, যেমন এখানে এই 'হাগা' শব্দটিতে। কালক্রমে এ শব্দটিও হারিয়ে যাবে, রেমন্ড তখন পুরোপুরি ইংরেজিভাষী হয়ে যাবে। তার মাতৃভাষার maintenance বলতে কিছুই থাকবে না, পুরোটাই shifted হয়ে যাবে।

আগেই বলেছি, ভাষার ভৌগোলিক-সামাজিক পরিবেশ থেকে বিচ্যুত হলে এরকম হতেই পারে। আর একটা জিনিসও হতে পারে। তা হল ভাষাভূমিতেই বিজ্ঞাপনের কাজে ভাষার একটু ব্যতিক্রমী ব্যবহার। কলকাতায় এখন বিজ্ঞাপনের ভাষায় বাংলা ও ইংরেজির বুলিমিশ্রণ বা code mixing ঘটিয়ে এক ধরনের কিম্ভূত স্লোগান ধরনের বুকনি তৈরি হতে পারে। পেপসির 'ইয়ে দিল মাঙ্গে more'-এ ইংরেজি ও হিন্দির বুলিমিশ্রণ ঘটে। এইরকম ইংরেজি অক্ষরে বাংলায় aamar PC aamar style, no chinta only money, বাংলা ফিল্মের একটি টিভি চ্যানেলে 'no জবরদস্তি only মস্তি'— ইত্যাদি

আমরা লক্ষ করেছি। এ ধরনের কোড্-মিক্সিং ঘটানো হয় এক বিশেষ উদ্দেশ্য থেকে— ধাক্কা দিয়ে লোকের নজর টানবার জন্য। চেক ভাষাবিজ্ঞানীদের কথায় এর নাম aktualisacc, ইংরেজিতে foregrounding। এখানে ভাষার অল্পবিস্তর বিপর্যয় ঘটিয়ে চমক দিয়ে লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা করা হয়।

এই লেখক ব্যক্তিগতভাবে মনে করে না যে, এসব দৃষ্টান্ত, কিংবা বিদেশে অভিবাসী বাঙালি সন্তানদের বাংলা ভুলে যাওয়া বাংলা ভাষার অস্তিত্বের ক্ষেত্রে খুব বড়ো একটা বিপদের সংকেত দিচ্ছে। সমাজের নানা স্তরে ভাষার নানারকমের ব্যবহার হয়। তার একটা স্তরে, মূলত এলিট স্তরে, দ্বিভাষিকতা বা bilingualism একটা ঘটনা। সেখানে দ্বিভাষিকতা বা বহুভাষিকতা নিছক দুটো বা একাধিক সমান ভাষার সমান ব্যবহার নয়। আগেই ইঙ্গিত করেছি যে, যেখানে একাধিক ভাষার মধ্যে কোনো একটি জনগোষ্ঠী অংশ নেয়, তখন ভাষাগুলির মধ্যে 'মূল্য' ও 'মর্যাদা'গত একটা ক্রম তৈরি হয়ে যায়। কোনো ভাষা বেশি শক্তিশালী ও মর্যাদাবান, এবং dominant, আবার কোনো ভাষা কম শক্তিশালী, ফলত dominated। দাপুটে ভাষার প্রভাবে অধীন ভাষাগুলিই বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়। তারা দাপুটে ভাষা থেকে বেশি শব্দ নেয়, দাপুটে ভাষার ধরন-ধারণ বাক্যপদ্ধতিও গ্রহণ করার চেষ্টা করে। বুলিমিশ্রণ বা কোডসুইচিং-এ দাপুটে ভাষার শব্দাবলি বা বাক্যাংশই বেশি প্রাধান্য পায়। দাপুটে ভাষাকে অধীন ভাষার লোকেরা যে খুব সমীহ করে তার প্রমাণ রাস্তাঘাটের ঝগড়ায়, কলকাতার বাসে-ট্রামে প্রচুর পাওয়া যায়। সামান্য পা-মাড়ানো, গায়ের উপর ঝুলে-পড়া থেকে যে ঝগড়া শুরু হয়, তাতে 'অত আরাম চাইলে ট্যাক্সি করে যেতে পারেন' বলায় একটা পর্যায় আসে, যার উত্তরে আর-একজন হয়তো বলেন, 'আমি ট্যাক্সি করে যাই বা না যাই তাতে আপনার ইয়ের কী?' যার উত্তরে আর-একজন তেলেবেগুনে জ্বলে বলে ওঠেন, 'কী! আপনি ইয়ের নাম তুললেন? Shut up!'— এই Shut up থেকে তুমুল ঝগড়ার চূড়ান্ত ক্লাইম্যাক্স শুরু হয়ে যায়, তা থেকে হাতাহাতি মারপিট খুব সামান্য দূরত্বেই অবস্থান করে।

বাংলা নাট্যসাহিত্য থেকে এর একটা অসাধারণ দৃষ্টান্ত আবার তুলছি,— মধুসূদনের 'একেই কি বলে সভ্যতা' প্রহসনটির কয়েকটি সংলাপ। দ্বিতীয়াঙ্কের প্রথম গর্ভাঙ্কে নববাবুদের ইয়ার-বকশিদের মধ্যে নব আর কালী দেরি করে পানভোজন-বারাঙ্গনানৃত্যের ফুর্তির মজলিশে পৌঁছেছে, বাকিরা 'হিপ্ হিপ্ হুরে' করার মাঝখানে নব বলছে, 'দেখ ভাই, আজ আমাদের এক্সকিউজ কত্তে হবে, আমাদের একটু কর্ম ছিল বলে তাই আসতে দেরি হয়ে গেচে।' তার উত্তরে শিবু প্রমত্তভাবে বলে 'দ্যাট্স এ লাই।' নব ক্রুদ্ধভাবে প্রশ্ন করে 'হোয়াট, তুমি আমাকে লাইয়র বল? তুমি জান না আমি তোমাকে এক্ষুনি শুট করবো?' এতে চৈতন উঠে নবকে ধরে বসায়, বলে, 'হাঃ, যেতে দেও, যেতে দেও, একটা ট্রাইফ্লিং কথা নিয়ে মিছে ঝকড়া কেন?' এর উত্তরে নব যা বলে সেটাই বিশেষভাবে লক্ষ করবার মতো— 'ট্রাইফ্লিং! — ও আমাকে লাইয়র বললে — আবার ট্রাইফ্লিং? ও আমাকে বাঙ্গালা করে বললে না কেন? ও আমাকে মিথ্যেবাদী বললে না কেন? তাতে কোন্ শালা রাগত? কিন্তু — লাইয়র — এ কি বরদাস্ত হয়?'

৫

উপরের আলোচনা, আখ্যান আর উদ্ধৃতি থেকে বোঝা গেল (আশা করি) যে, বাংলাভাষা তার বিপুল জনসংখ্যা সত্ত্বেও জার্মান, ফরাসি, জাপানি, রুশ ইত্যাদির মতো স্বপ্রধান বা পুরোপুরি 'অটোনমাস' হতে পারেনি। তার আচারিক ব্যবহারের এলাকা পূর্ণাঙ্গ নয়। শিক্ষায় তার ব্যবহার স্বাধীনতার পর বাড়লেও শিক্ষার সব এলাকা তা দখল করতে পারেনি। প্রশাসন, আইন এবং বেসরকারি প্রতিষ্ঠানেও তার ব্যবহার সীমাবদ্ধ।

বরং শিক্ষার বাহন হিসেবে সে এক প্রবলতর (প্রবলতম বলাই ভালো) প্রতিযোগীর মুখোমুখি হচ্ছে— ইংরেজি। সর্বত্র তথাকথিত ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল এত গজিয়ে উঠছে যে, ইংরেজি ভাষাকে প্রথম শ্রেণি পর্যন্ত নামিয়ে এনেও সরকারি শিক্ষাব্যবস্থাপকেরা খুব সুবিধে করতে পারছেন না। অভিভাবকেরা সমাজে যিনি যে-অবস্থানেই থাকুন না কেন, সকলেই ছেলেমেয়েদের ইংরেজি-মাধ্যম স্কুলে নিয়ে যাচ্ছেন, ফলে বাংলাভাষা-বাহনের প্রাথমিক স্কুলগুলি, অন্তত শহর ও তার আশেপাশের স্কুলগুলির অবস্থা খুব সুখকর নয়। খবরের কাগজে দেখলাম নদিয়ার নবদ্বীপ, রানাঘাট ও হরিণঘাটার প্রায় ১৫টি প্রাথমিক স্কুল বন্ধের মুখে।[৭] ইংরেজি-বাহনের প্রায় সব স্কুলই বেসরকারি, তার খরচাও বেশি, তবু বহুলাংশের তার প্রতি এই দৌড় বাংলার আচারিক ভূমিকাকে আরও সংকীর্ণ করে আনছে।

এটা স্পষ্টতই একটা সামাজিক মনস্তত্ত্বের ছবি তুলে ধরে। জীবনে সাফল্য অর্জনের ক্ষেত্রে ইংরেজি ভাষার তুলনায় বাংলা ভাষার তত গুরুত্ব নেই— এই ধারণাটা অভিভাবক থেকে ছাত্রছাত্রীদের মনে চারিয়ে যায়। ফলে অভিভাবক-অভিভাবিকাদের এ সব গর্বিত সংলাপ আর খুব অবিশ্বাস্য লাগে না— 'জানেন আমার মেয়েটা/ছেলেটা না, বাংলাটা একেবারেই পারে না।' বা 'ওসব বাংলা-ফাংলার পেছনে এত সময় দিয়ে কী হবে? ওটা আগের রাত্রে দেখে নিলেই হবে।'

ইদানীং পশ্চিমবাংলায় যে-সব সংগঠন কখনও 'বাংলাবাজ' এবং কখনও মৃদুতর 'বাংলাবাদী' আখ্যা পেয়েছে তারা আর কিছুই চায় না, তারা ইংরেজি, বা হিন্দির প্রতিপক্ষে বাংলার এই আচারিক বা ফর্ম্যাল ভূমিকা একটু বাড়াতে চায়। সরকারি প্রশাসনে, আইন-আদালতে যেমন, তেমনই বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে, দোকানের সাইনবোর্ডে ও অন্যান্য ক্ষেত্রে বাংলা ভাষার অবস্থান খুঁজছে, শেষ ক্ষেত্রে অন্তত একটুখানি পার্শ্বিক অবস্থান। এ চাওয়াতে অন্যায় কিছু নেই এবং এতে ইংরেজি ভাষার ভয় পাওয়ারও কিছু নেই। ইংরেজি যদি তার পাশে বাংলাকে একটু জায়গা দেয় এসব এলাকায় তাতে বাংলা ভাষার কেজো উপযোগিতা একটু বাড়বে, কিন্তু ইংরেজি ভাষার মর্যাদা ও মাহাত্ম্য এতটুকু ক্ষুণ্ণ হবার সম্ভাবনা নেই। অথচ এমন একটা শোরগোল তোলা হচ্ছে যেন পশ্চিমবাংলায় ইংরেজি ভাষাই বিপন্ন, তারই সর্বনাশ করে নিজেদের পায়ে কুড়ুল মারার আত্মবিধ্বংসী খেলায় মেতেছে একদল বাঙালি। সরকারি কর্তারাও কথায় কথায় যে বক্তৃতা দিচ্ছেন তার কাগুজে হাস্যকর হেডলাইন দাঁড়াচ্ছে— 'ইংরেজি আমাদের শিখতেই হবে।'

তাঁদের এ কথাটা সম্ভবত খেয়াল থাকে না যে, এই অনুশাসন নিয়ে কোনো বিতর্ক এখনও নেই, কোনো কালেই ছিল না। এর ইঙ্গিত দাঁড়ায় এই যে, কোনো আকাট নির্বোধ লোক কোনো সময়ে বলেছে, 'ইংরেজি আমাদের শিখতে হবে না!' কিন্তু কস্মিন্‌কালে কোনো মূঢ় ব্যক্তি একথা বলেনি। তর্কটা ছিল বাংলার বাহনে শিক্ষার বিন্যাসে দ্বিতীয় ভাষা হিসেবে কখন বা কোন্ স্তরে ইংরেজিকে আনা হবে তাই নিয়ে।

এখন আমাদের এই বাংলা ভাষার সৃষ্টিকর্মে. অনাচারিক এলাকায়, কোনো সমস্যা নেই, কিংবা যে-সমস্যা আছে সৃষ্টিক্ষেত্রে তা সব ভাষার ক্ষেত্রেই মাঝে-মাঝে কমবেশি দেখা দেয়। কিন্তু ইংরেজি-বাহন শিক্ষা মানে ভাষার স্বাধিকারে একটা বড়ো-থাবা বসাচ্ছে ইংরেজি। ভাষার অটোনমি-র একটি বড়ো ক্ষেত্র হল শিক্ষার বাহন হিসেবে তার প্রতিষ্ঠা। সেই আসন থেকে তাকে সরিয়ে দিলে তার স্বাধিকার খর্ব হয় তাতে সন্দেহ নেই, ভাষার আচারিক প্রয়োগের জায়গা অনেক ছোটো হয়ে আসে। এর বিরুদ্ধে বাংলাবাজ বা বাংলাবাদীরা কতটা উচ্চকণ্ঠ তা দেখার বিষয়, কারণ বাংলায় সাইনবোর্ড আন্দোলনের চেয়ে এটা অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু যে-কারণে স্বাধীনতার পর ভারত সরকারের সমস্ত কমিটি-কমিশন থেকে আরম্ভ করে সরকারি মন্ত্রী ও আমলারা পর্যন্ত প্রকাশ্যভাবে ইংরেজি-বাহন স্কুলের বিরুদ্ধে কিছু বলেননি, সেই কারণেই বাংলাভাষাপ্রেমিকদের আন্দোলনেও ইংরেজি-বাহন শিক্ষার বিষয়টি কেন্দ্রীয় জায়গা নেয়নি। তার কারণ অনুমান করা কঠিন নয়।

অনেক অভিভাবক ভাববেন, 'সে কী কথা! আমাদের ছেলেমেয়েদের ভালো শিক্ষা, কেরিয়ার তৈরির শিক্ষা দেব না? ইয়ার্কি না কি? ভাষার স্বাধিকার-ফাধিকার ওসব ফালতু কথা ছাড়ুন মশায়। ছেলেমেয়ে যদি ভালো কেরিয়ার না পায়, ভাষার স্বাধিকার কি ধুয়ে খাব?'

আসলে বাংলা-মাধ্যম শিক্ষার চেহারা অনেককে আশ্বস্ত করে না। আর-একটা জিনিসও এঁরা বিশ্বাস করেন না যে, বাংলা-মাধ্যমে ক্লাস ওয়ান থেকে ইংরেজি পড়িয়ে ছেলেমেয়েদের চটপটে ও তুখোড় ইংরেজিভাষী, সেই সঙ্গে টাই ও শু-পরা সটান স্মার্ট বালক-বালিকা, করে তোলা সম্ভব। রাজ্য সরকার যতই চেষ্টা করুন, অপ্রস্তুত প্রাথমিক শিক্ষকদের হাজার ট্রেনিং দিলেও সেই পরিবর্তনটা রাতারাতি আনা সম্ভব হবে না। তাই ছেলেমেয়েদের উজ্জ্বল ও সাহেবিয়ানা-মণ্ডিত ভবিষ্যতের প্রতি সংগত কারণেই আশাবাদী অভিভাবকেরা তাঁদের মাতৃভাষার স্বাধিকার নিয়ে মাথা ঘামাবেন না।

আমাদের অপেক্ষা করতে হবে সেই অলীক (?) সুদিনের জন্য যেদিন প্রাথমিক স্কুলের মাধ্যমিক স্কুলের শিক্ষকদের কাছে কিছুটা বাংলা ধরনের ইংরেজি শিখেও আমাদের ছেলেমেয়েরা বহুজাতিক সংস্থায় বা বিদেশে 'করে খেতে' পারবে। তাদের বাবা-মায়েরা অনেকে তাই করেছে। এখন বিদেশে যাঁরা সফলভাবে গবেষণা বা চাকরি-বাকরি করে সাফল্যের চূড়োয় আছেন তাঁদের সবাই ইংরেজি মাধ্যমের ছাত্রছাত্রী নন, এটা আমরা সবসময় খেয়ালে রাখি না বলেই ছেলেমেয়েদের ইংরেজি-কাঁচা ভবিষ্যৎ নিয়ে উতলা হই।

বাংলাভাষার স্বাধিকারের ক্ষেত্রগুলি বিস্তারিত হোক। ইংরেজি এবং অন্যান্য ভাষাও যেন আমরা মন দিয়ে শিখি।

কয়েকটি প্রাসঙ্গিক কথা

বঙ্গাদর্পণ-এর দপ্তরে যত পুরোনো লেখা সংগৃহীত হয়েছে ততই আমাদের প্রাথমিক পরিকল্পনার কাঠামোতে পরিবর্তন ঘটেছে। আমাদের মনে হয়েছে আরও বেশি সংখ্যায় এইসব লেখা পাঠকদের কাছে পৌঁছে দিতে পারলে তাঁরা উপকৃত হবেন। লেখা বাছাই করতে গিয়ে বারবার ভাবতে হয়েছে। জায়গার অভাবে অনেক মূল্যবান লেখাও ছাপানো গেল না। যেসব গৃহীত লেখা নিয়ে *'বঙ্গাদর্পণ'*-এর তৃতীয় সম্ভারটি মুদ্রিত হল তাতে পাঠকদের আগ্রহ বাড়বে বলে আমাদের বিশ্বাস। এবার আমাদের সংকলনে ৫৬ জন প্রয়াত লেখকের ৬২টি প্রবন্ধ যুক্ত হল। পূর্বের খণ্ড দুটির পূর্বানুবৃত্তি যাতে না ঘটে সে বিষয়ে আমরা মনোযোগ রেখেছি। প্রথম খণ্ডে ৪৯টি রচনা, ২য় খণ্ডে ৪৫টি। তিন খণ্ড মিলিয়ে ১৫৬টি লেখা। এইসব রচনায় বঙ্গাজীবনের নানা কথা যাঁরা তুলে ধরেছেন সেইসব প্রয়াত লেখকের সংখ্যা ১৪৫। এরমধ্যে বাংলাদেশের লেখকরাও রয়েছেন। আমাদের মনে হয়েছে প্রয়াত লেখকদের রচনা মুদ্রণের জন্য তিনটি খণ্ড পর্যাপ্ত নয়। পরবর্তী খণ্ডগুলোতে জীবিত গবেষকদের সঙ্গে প্রয়াত লেখকদের কিছু লেখার সংযোজন ঘটানো সম্ভব হলে সংকলন আরও সমৃদ্ধ হবে।

আমরা আগেই বলেছি, *'বঙ্গাদর্পণ'* পশ্চিমবঙ্গের খণ্ডিত দর্পণ নয়। সমগ্র বঙ্গাভাষী ও বাংলাভাষা অধ্যুষিত অঞ্চল আমাদের আলোচনার বিষয়। সংখ্যাগরিষ্ঠ বাঙালির বাস বাংলাদেশে। তাদের বাদ দিয়ে *'বঙ্গাদর্পণ'*-এর কথা কখনো ভাবিনি। বাংলাদেশের *বিদ্বৎ সমাজের* সঙ্গে যোগাযোগ করে আমরা যথেষ্ট সাহায্য পেয়েছি। প্রয়াত লেখকদের কিছু লেখা সম্ভবমত তাঁরা সংগ্রহ করে দিয়েছেন। চতুর্থ খণ্ডের জন্য বাংলাদেশের গবেষণারত চিন্তাবিদদের ৮০ জনের একটি তালিকা আমরা পেয়েছি। তাঁদের মধ্যে ১২ জনকে আমরা চতুর্থ খণ্ডে লেখার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছি। বিষয়ক্রমে অন্যদেরও লেখার জন্য অনুরোধ জানাব।

আমাদের বিশ্বাস *বঙ্গাদর্পণ* দুই বাংলার সাংস্কৃতিক জগতের সেতুবন্ধের কাজ করবে। বঙ্গা বিভাজনের পর ছয়টি দশক পূর্ণ হতে চলল। সাবেক বঙ্গাদেশের ভূখণ্ড চিরে দিয়ে চলে গেছে দুই রাষ্ট্রের সীমারেখা। একদেশে গঙ্গা আরেক দিকে পদ্মা। প্রবাহিত হয়ে গেছে কত জলস্রোত। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে শিথিল হয়ে গেছে বিচ্ছেদের যন্ত্রণা। থিতিয়ে গেছে মেলামেশার আগ্রহ। দুটি রাষ্ট্র, পাসপোর্ট, ভিসা, সরকারি বাধানিষেধের বেড়া ডিঙিয়ে মেলামেশাটা যথেষ্ট সহজ এবং গভীর নয়।

ইতিমধ্যে বাংলাদেশে বাঙালি মুসলমান সমাজে অনেক পরিবর্তন ঘটেছে। উনিশ শতকে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত বাঙালি হিন্দু সমাজের একাংশে একটা জাগরণ ঘটে গিয়েছিল। ঠিক তার অনুরূপ না হলেও তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে যা এখন বাংলাদেশ, সেখানে এরকম একটা জাগরণ ঘটেছিল। তার মূলে ছিল বাংলা ভাষা। বাঙালির ভাষা। নতুন রাষ্ট্রের প্রয়োজনে বাঙালি মুসলমান সমাজে বড় সংখ্যায় মধ্যবিত্ত শিক্ষিত সমাজ গড়ে উঠল। বাংলাভাষা ও সংস্কৃতির সমৃদ্ধি ঘটল। সমাজের যে অংশ চাইছিলেন বাংলা ভাষাকে ইসলামি সংস্কৃতির ঘেরাটোপে বন্দি করে রাখতে তারা সফল হলেন না।

পশ্চিমবঙ্গ আর বাংলাদেশের বাঙালির অবস্থান ঠিক একরকম নয়। বাংলাদেশে উর্দু ভাষার আগ্রাসী ভূমিকা এখন সীমিত। পাশাপাশি পশ্চিমবঙ্গের জনজীবনে হিন্দির প্রভাব ক্রমবর্ধমান। পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষিত মধ্যবিত্তের একটা অংশ তাদের সন্তানদের জন্য ইংরেজিকে ক্রমশ শিক্ষার মাধ্যম রূপে মেনে নিয়েছেন। সর্বভারতীয় ভাষা ও সংস্কৃতি পশ্চিমবঙ্গের ভাষা ও সংস্কৃতিকে প্রভাবিত করছে। বাংলাদেশের বাঙালির ভাষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে পার্শ্ববর্তী এলাকার প্রভাব তত প্রবল নয়। নিজেদের ভাষা ও সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য রক্ষা করেই বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সঙ্গে তারা স্বাধীন স্বতন্ত্র ভাবে যোগাযোগ রাখতে পারছেন। বাংলাদেশের বাঙালির সংস্কৃতি এখন আর কলকাতার নিঃশর্ত অনুগত নয়। বাংলাভাষা ও সংস্কৃতি দুটি রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে স্বতন্ত্র ও সমান্তরাল ভাবে বিকাশমান। সেই দুটি স্বতন্ত্র ধারার মধ্যে বাঙালির স্বার্থেই সেতু বাঁধার প্রয়োজন। সেই সেতু রচনায় *বঙ্গদর্পণের* একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকবে।

বিশ্বজীবন মজুমদার

বাংলার জাতি ও সমাজবিন্যাস

রাধাকমল মুখোপাধ্যায়

বিভিন্ন অঞ্চলে হিন্দু-মুসলমানের হ্রাস-বৃদ্ধি

অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে দক্ষিণ বাংলায় সীতারাম রায়ের নেতৃত্বে মুর্শিদকুলি খাঁর বিরুদ্ধে হিন্দু জমিদারদিগের সম্মিলিত জীবনপণ বিদ্রোহ যখন বিফল হইল, এবং ওই বীর যোদ্ধা যখন মুর্শিদাবাদে বন্দি হইয়া নীত হইলেন, হিন্দু বাঙালির স্বাধীনতা-প্রদীপের শেষ শিখা তখন ভাগীরথী-জলে নির্বাপিত হইল।

১৭১২ সালে সীতারামের মৃত্যু হইয়াছিল। ওই সালেই আজিম ওস্মানের মৃত্যুর পর মুর্শিদকুলি বাংলার নবাব হন। তাহার পর ৫০ বৎসরের মধ্যেই মুসলমানের পরিবর্তে ইংরেজ-শাসনের সূত্রপাত আরম্ভ। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে বাংলার মাটি ও নদীর প্রচণ্ড বিপ্লব দেখা দিল। হিন্দু-প্রধান মধ্য ও পশ্চিমবঙ্গে নদনদীর গতি হ্রাস ও রোধ, এবং উত্তর ও পূর্ব বঙ্গে নদীর বিপুলতর প্রবাহ ও ভাঙা-গড়া, বাংলার সমাজকে নূতন করিয়া ভাঙিতে ও গড়িতে আরম্ভ করিয়াছে। নদনদীর বিপর্যয়ের ফলে অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতেই বাংলায় হিন্দুর অবনতি ও মুসলমানের সংখ্যাধিক্যের সূচনা হইয়াছিল। ইংরেজ আমলে যখন প্রথম বাংলায় লোকগণনা হয়, তখন হিন্দুরা সংখ্যায় মুসলমান অপেক্ষা অধিক ছিল। ১৮৭১ সালে বাংলায় হিন্দুর সংখ্যা ছিল ১৮১ লক্ষ, মুসলমানের সংখ্যা ছিল ১৭৬ লক্ষ। ১৮৮১ সালে মুসলমানেরা বাড়িয়া ১৮৪ লক্ষ হইল, হিন্দুরা কমিয়া ১৮০·৭ লক্ষ হইল। সেই হইতেই মুসলমানের সংখ্যার প্রাধান্য দ্রুত বাড়িয়া চলিতেছে।

কী পরিমাণে বাংলার বিভিন্ন অংশে সমগ্র লোকসংখ্যার অনুপাতে হিন্দু ও মুসলমান বাড়িয়াছে বা কমিয়াছে, তাহা নিম্নের তালিকায় দেওয়া হইল।

সমগ্র লোকসংখ্যা হিসাবে শতকরা পরিমাণ

পশ্চিমবঙ্গ	১৮৮১	১৮৯১	১৯০১	১৯১১	১৯২১	১৯৩১
হিন্দু	৮৪	৮৩	৮৩	৮২	৮২	৮৩
মুসলমান	১৩	১৩	১৩	১৩	১৩	১৪

মধ্যবঙ্গ						
হিন্দু	৫০	৫০	৫০	৫০	৫১	৫১
মুসলমান	৪৯	৪৯	৪৯	৪৮	৪৭	৪৭
উত্তরবঙ্গ						
হিন্দু	৪০	৪০	৩৯	৩৭	৩৫	৩৬
মুসলমান	৬০	৬০	৬০	৬০	৬০	৬১
পূর্ববঙ্গ						
হিন্দু	৩৬	৩৪	৩৩	৩১	৩০	২৮
মুসলমান	৬৭	৬৮	৬৯	৭০	৭০	৭১

১৮৮১—১৯৩১ শতকরা বৃদ্ধি

	পশ্চিমবঙ্গ	মধ্যবঙ্গ	উত্তরবঙ্গ	পূর্ববঙ্গ	সমগ্র বাংলা
হিন্দু	১৫·৪	২৬·৭	১৩·১	৩৮·৯	২২·৯
মুসলমান	২৭·৭	১৭·৪	২৭·১	৮৭·৫	৫১·২

উহার কারণ : প্রাকৃতিক বিপর্যয় বনাম সমাজের কুসংস্কার

একমাত্র মধ্যবঙ্গেই হিন্দু অপেক্ষা মুসলমানের বৃদ্ধির হার কম। হিন্দুরা মুসলমান অপেক্ষা অধিক বাড়িয়াছে একমাত্র মধ্যবঙ্গেই। কৃষির দুর্দশা ও ম্যালেরিয়া মহামারী এখানে মুসলমানদিগকে সংখ্যায় বাড়িতে দেয় নাই। খুলনা ও ২৪ পরগনা অপেক্ষাকৃত স্বাস্থ্যকর ও বর্দ্ধিষ্ণু। এখানে পোদ, কৈবর্ত প্রভৃতি সতেজ হিন্দু জাতিরই প্রাধান্য। অপরদিকে প্রেসিডেন্সি বিভাগের উত্তর অঞ্চলে যেখানে মুসলমানের আধিক্য সে অঞ্চল ম্যালেরিয়া-পীড়িত ও ক্ষয়িষ্ণু। তাহা ছাড়া কলিকাতা ও ভাগীরথী-তীরে শিল্পপ্রধান শহরগুলিতে হিন্দু শ্রমিক ও ব্যবসায়ী বিদেশ হইতে অনেক আসিয়া বসবাস করিতেছে। মধ্যবঙ্গ ছাড়া অন্য সব অঞ্চলেই মুসলমানের বিপুলতর বৃদ্ধি লক্ষিত হয়। পূর্ব অঞ্চলে মুসলমানের বৃদ্ধির হার (৮৭·৫) জগতের উপনিবেশ ও কৃষির ইতিহাসে অসাধারণ। পশ্চিমবঙ্গ ক্ষয়িষ্ণুতম, এখানে বিরুদ্ধ প্রাকৃতিক ও অর্থনৈতিক শক্তি হিন্দু বৃদ্ধির বিষম অন্তরায়। যেখানে স্বাস্থ্য ও সম্পদ দুই-ই বর্তমান,— যেমন উত্তর ও পূর্ববঙ্গ,— সেখানে হয় হিন্দুরা অপেক্ষাকৃত পুরাতন, ঘনবসতি ও অস্বাস্থ্যকর অঞ্চলে অবস্থানের জন্য, অথবা বহুবিবাহ, বিধবা-বিবাহ প্রভৃতির অপ্রচলনের জন্য, মুসলমানের মতো সমান হারে বাড়ে নাই এবং মোট লোকসংখ্যার অনুপাতে বরং কমিয়াই গিয়াছে।

নদনদীর গতি ও জল সরবরাহের ওলট-পালটের জন্য ৫০ বৎসরে মানুষের স্বাস্থ্য ও প্রতিবেশের যে পরিবর্তন হইল তাহার ফলে ক্রমে প্রাকৃতিক বিধানে যেন হিন্দু ও মুসলমানের পৃথক অঞ্চলেই বসবাস সূচিত হইতেছে। কোনো সাম্প্রদায়িক বিধিনিষেধে নয়, প্রকৃতির শাসনে ও অনুশাসনেই ইহা হইতেছে। ক্ষয়িষ্ণু পশ্চিম ও মধ্য-বঙ্গ হইতে মুসলমানেরা পূর্ববঙ্গে যাইয়া বাস করিতেছে না, এবং হিন্দুরাও উত্তর ও পূর্ব অঞ্চল হইতে পশ্চিমবঙ্গে আসিয়া মিলিত হইতেছে না। প্রকৃতি ও কৃষির পরিবর্তনের জন্যই মুসলমানপ্রধান জেলাগুলিতেই মুসলমানের সংখ্যা অতি দ্রুত হিন্দুর সংখ্যা অতিক্রম করিয়া বাড়িতেছে। পক্ষান্তরে যেখানে হিন্দুর প্রাধান্য পূর্বে ছিল, সেখানেও হিন্দুর সংখ্যাগরিষ্ঠতার হ্রাস হইতেছে। হিন্দুর মোট লোকসংখ্যা হিসাবে অনুপাত কমিতেছে প্রায় সর্বত্র; এবং অস্বাস্থ্যকর জেলাগুলিতে উহা শোচনীয়ভাবে কমিয়াছে।

১৮৭১—১৯৩১ সালের মধ্যে নদিয়া, মুর্শিদাবাদ, ফরিদপুরে মোট লোকসংখ্যা হিসাবে হিন্দু কমিয়াছে শতকরা ৮·৩, ১১·২ ও ৫·৬। ৬০ বৎসরে মুসলমান বাড়িয়াছে খুব বেশি রংপুর, পাবনা, মৈমনসিংহ ও ত্রিপুরা জেলায়, মোট লোকসংখ্যা হিসাবে শতকরা ১১, ৭·১, ১১·৮, ১১·২ এবং যে-সকল জেলায় হিন্দু খুব কমিয়াছে অথচ মুসলমান বাড়িয়াছে তাহাদিগের মধ্যে নদিয়া, মুর্শিদাবাদ, ফরিদপুরে মুসলমান বাড়িয়াছে শতকরা ৭·৭, ১০·৪, ৭·৯। একমাত্র মধ্যবঙ্গে মুসলমান অপেক্ষা হিন্দুর আধিক্য শতকরা ৯·৩ বাড়িয়াছে। ক্ষয়িষ্ণুতম পশ্চিমবঙ্গে মুসলমান অপেক্ষা হিন্দু অধিক দুর্ম হটিয়াছে। ইহাতে বুঝা যায় যে, প্রাকৃতিক বিপর্যয় হিন্দু-মুসলমান-সংখ্যার অসমতার প্রধান কারণ হইলেও হিন্দু-সমাজের অভ্যন্তরীণ ক্ষয়ের কারণকেও উপেক্ষা করিবার উপায় নাই।

পশ্চিম ও পূর্ব-বঙ্গের কৃষক

বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে মুসলমানপ্রধান ও নমশূদ্রপ্রধান জেলাগুলির অভ্যুন্নতি এবং উচ্চ হিন্দুপ্রধান মধ্য ও পশ্চিমবঙ্গের অবনতির সঙ্গে সঙ্গে বাংলার সভ্যতা, আচার, নিয়ম ও আদর্শ যে রূপান্তরিত হইবে, ইহাতে সন্দেহ নাই। স্বাস্থ্যকর আবহাওয়া, ম্যালেরিয়া ও অন্যান্য ব্যাধি হইতে মুক্তি, প্রচুর আমিষাহার, বনজঙ্গল ও জলাভূমির জীবনধারা ও কৃষির বিস্তার, নূতন ঔপনিবেশিক-সুলভ আগ্রহ ও শ্রমশীলতা, বাংলা দেশের পূর্ব অঞ্চলে, যমুনার চরে, পদ্মাতীরে, মেঘনার মোহনায় তাহাকে নূতন করিয়া গড়িতে থাকিবে। সেখানকার মুসলমান বা নমশূদ্র কৃষক যেমন পরিশ্রমী, তেমনিই সাহসী। উন্মত্ত ঝটিকা বা বন্যার আক্রমণে ত্রস্ত না হইয়া সে তাহার ফসল রক্ষণাবেক্ষণের জন্য যমুনা বা মেঘনার চরে হিংস্র পশুর সঙ্গে রাত্রিবাস করে। দক্ষিণ অঞ্চলের সুন্দরবনে ও পূর্ব অঞ্চলে আসামের উপত্যকায় সে কুঠারহস্তে নির্ভয়ে অগ্রসর হয়, নিবিড় জঙ্গল ভূমিসাৎ করিয়া সে রাস্তা বাহির করে, চাষ-আবাদের প্রবর্তন ও বসতি স্থাপন করে। জলে কুমির ও স্থলে বাঘের সঙ্গে তাহার নিরন্তর সংগ্রাম। যেখানে নদীচরে সে শস্য উৎপাদন করে, সেই জনবিরল বিপদসংকুল স্থানে হয়তো স্ত্রীপুত্র পরিবার লইয়া বাস করা অসম্ভব, তাই সে দিনের কাজ শেষ করিয়া নির্ভয়ে সীমাহীন পাথারে তরি ভাসায়, নিঃশঙ্কচিত্তে ভগবানের নাম লইয়া সে তুফানকে অগ্রাহ্য করে। তাহার তুলনায় পশ্চিম ও মধ্যবঙ্গের কৃষক অলস, বিলাসী, ও ক্ষীণপ্রাণ।

কিন্তু উদ্যম, সাহস ও লোকবৃদ্ধি যেমন জাতিকে সতেজ রাখে, তেমনই তাহার চাই শিক্ষা, দীক্ষা ও সংস্কার। পূর্ব-অঞ্চলে কৃষি উন্নতিশীল, পরিবার লোকবহুল, জনপদও উত্তরোত্তর বর্ধিষ্ণু।

কিন্তু সংখ্যা বাড়িলেই কি সম্পদ ও কৃষ্টির পরিপুষ্টি হয়? বরং কৃষক ও বর্গাদারের অপরিমিত সংখ্যাবৃদ্ধি সম্পদের বিঘ্ন, এবং সমাজের অনৈক্য ও অশান্তির কারণ; সমগ্র প্রদেশে উচ্চ ও শিক্ষিত স্তর অপেক্ষা নিম্ন ও অশিক্ষিত স্তরের সংখ্যাবৃদ্ধি কৃষ্টিরও অন্তরায়— ধর্ম, জাতি ও বিদ্যাভিমান ভুলিয়া বাঙালি এই নিছক সত্যটি গ্রহণ করিতে পারিলে তবেই শেষরক্ষা হয়। হিন্দুর উচ্চজাতি সমুদায়ের এই বিষয়ে সর্বাপেক্ষা গুরুদায়িত্ব।

উচ্চজাতির মধ্যে স্ত্রীলোকের সংখ্যাল্পতা, নিম্নজাতি ও মুসলমান অর্বাচীন বলিয়া অধিকতর শক্তিমান ও প্রজননশীল

উচ্চজাতিদিগের মধ্যে যেসকল কুপ্রথা তাহাদের বংশবৃদ্ধির অন্তরায়, সেগুলিকে বিনা দ্বিধায় সত্বর বিসর্জন দিতে হইবে। ইহাদিগের মধ্যে অনেক ক্ষেত্রে বিবাহের গণ্ডি সংকীর্ণ এবং বিধবাদিগের সংখ্যা অধিক বলিয়া জীববিজ্ঞান যে নিকট যৌন সম্বন্ধের কুফল ভয় করে, তাহা দেখা দিয়াছে।

হিন্দুর সমাজবিন্যাসে যে শ্রেণি ব্রহ্মণ্য সভ্যতার মাপকাঠি অনুসারে উচ্চ সোপানে রহিয়াছে, তাহার স্ত্রীজাতির সংখ্যা পুরুষজাতির অনুপাতে কম, এবং যে শ্রেণি নিম্ন সোপান অধিকার করে, তাহাদিগের মধ্যে এই বৈলক্ষণ্য দেখা যায় না। পুরাতন জাতি মাত্রেই অধিকতর সংখ্যায় পুরুষের জন্ম দান করে। ইহা একদিকে যেমন তাহার যুদ্ধবিগ্রহের রক্ষাকবচ, অপরদিকে শান্তির সময় ইহাই আবার তাহার বংশহানি ও ধ্বংসের সূচনা করে। পক্ষান্তরে আদিম জাতিরা— প্রকৃতির সহিত গাছপালা ও মাটির সহিত যাহাদিগের শক্তির সহজ আদান-প্রদান হয়, যাহাদিগের মধ্যে সভ্যতার কৃত্রিমতা ও সমাজশাসনের নির্মম দৃঢ়তা অধিক প্রবেশ করিতে পারে নাই, তাহাদিগের যেমন প্রজনন-শক্তি অধিক, তেমনই তাহাদিগের মধ্যে বিবাহযোগ্যা স্ত্রীলোকের অভাব তো দৃষ্টই হয় না, অধিক ক্ষেত্রে সংখ্যাধিক্যই দেখা যায়। বাংলার মুসলমানেরা বেশির ভাগই সমাজের নিম্নস্তরে সেই আদিম বীর্যবান কর্মঠ জাতি সমুদায় হইতে উদ্ভূত। একই কারণে তাহাদিগের মধ্যেও বাংলার অতিসভ্য উচ্চজাতির ন্যায় বিবাহযোগ্যা স্ত্রীজাতির সংখ্যাল্পতা দেখা যায় না।

নিম্নে প্রদত্ত তালিকাটিতে উচ্চ ও অনুচ্চ হিন্দু জাতির ও মুসলমানের মধ্যে স্ত্রীজাতির সংখ্যার বৈলক্ষণ্য প্রকাশিত হইল।

	প্রতি হাজার পুরুষের অনুপাতে স্ত্রীলোকের সংখ্যা	প্রতি হাজার স্ত্রীলোকের অনুপাতে বিধবার সংখ্যা
সাঁওতাল	৯৮৪	১৩৬
কোচ	৯৪৯	১৪৯
বাউরি	১০১৭	১৯৪
ডোম	৯৬৫	২০৩
নমশূদ্র	৯৬৪	২১৭
মুসলমান	৯৫৮	১৪০
মাহিষ্য	৯৫২	২৪৩
সাহা	৯৫০	১৯৬
বৈদ্য	৯২২	১৫৮
কায়স্থ	৯০১	২০০
ব্রাহ্মণ	৮৪৭	২০০

হিন্দুর বিবাহবিধির সংস্কার জাতিক্ষয় নিবারণের প্রধান উপায়

সমগ্র জাতি ও সম্প্রদায় মিলিয়া বাংলা দেশের প্রতি হাজার পুরুষের অনুপাতে স্ত্রীলোকের সংখ্যা ৯২৪। বাংলার উচ্চজাতি তিনটিতেই স্ত্রীলোকের সংখ্যা এই গড় সংখ্যা অপেক্ষা কম। সমস্ত হিন্দুজাতি ধরিলে স্ত্রীলোকের মধ্যে বিধবার সংখ্যা ২২৬, কিন্তু মুসলমান বিধবার সংখ্যা মোট ১৪০। উচ্চ ও অর্ধোচ্চ হিন্দু জাতিগুলি বিধবাবিবাহ নিষেধ করিয়া স্ত্রীলোকের আপেক্ষিক সংখ্যাল্পতার কুফল আরও অধিক প্রকট করিয়াছে।

মুসলমানদিগের মধ্যে বহু বিধবা পুনরায় বিবাহ করে। হিন্দুজাতি সমুদায়ের মধ্যে বিধবাবিবাহ অনেক কম প্রচলিত। অনেক জাতির মধ্যে বিবাহের জন্য কন্যাকে উচ্চপণে ক্রয় করিতে হয় বলিয়া বহু পুরুষ যৌবন অতিক্রমের পূর্বে বিবাহ করিতে পারে না।

রাধাকমল মুখোপাধ্যায়

বিবাহের অর্থ সংগ্রহের জন্য বহু পুরুষ প্রৌঢ়কাল পর্যন্ত শহরে উপার্জন করিতে বাধ্য হয়। সেখানে চারি দিকেই নিঃসঙ্গ যুবার পাপপথের প্রলোভন রহিয়াছে, অথচ তাহার পক্ষে সমাজ-শাসনের কোনো বাধা বা নিষেধ নাই। বিবাহের জন্য অল্পবয়স্ক বালিকাকেও সে গ্রহণ করে। তাহাও বংশবৃদ্ধির অন্তরায়। বিধবা-বিবাহ নিষেধ ও পণপ্রথা বাস্তবিক পক্ষে অনুচ্চ হিন্দুজাতির মধ্যে পাপাচার, বন্ধ্যাত্ব ও ভ্রূণহত্যাকে যথেষ্ট প্রশ্রয় দিয়াছে। সব দিক হইতেই জাতিক্ষয়ের পথ উন্মুক্ত।

তাহা ছাড়া বিবাহের গণ্ডি সংকীর্ণ হওয়াতে ও বহুবিবাহের প্রচলনে, পুরুষের মধ্যে অবিবাহিতেরও সংখ্যার অনুপাত মুসলমান অপেক্ষা অধিক।

উচ্চজাতির আত্মঘাত

উচ্চজাতির মধ্যে বিবাহ সম্বন্ধীয় রাঢ়ি, বারেন্দ্র, বৈদিক, ও অন্যান্য নানাপ্রকার বিভাগ-বর্জন অত্যাবশ্যক। বিধবা-বিবাহ প্রচলনও অতি প্রয়োজনীয়। একশত ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ স্ত্রীলোকের মধ্যে বিশ জন বিধবা, কিন্তু মুসলমানের মধ্যে মাত্র ১৪ জন। উচ্চ হিন্দুজাতির মধ্যে বৈদ্যগণ সংখ্যায় সর্বাপেক্ষা কম। সুতরাং তাহাদিগের মধ্যে বিবাহের পাত্রাপাত্র বিচারের সংকীর্ণতা সর্বাপেক্ষা অধিক অনিষ্টকর।

প্রাচীন এথেনীয়গণ ও বাঙালিদের ধ্বংসের তুলনা

যেভাবে বাংলার উচ্চজাতিগুলি এই যুগে প্রতিকূল আবেষ্টনের সহিত সংগ্রামে হটিয়া গিয়াছে, যেভাবে তাহাদিগের আদিম বাসভূমি অরণ্যে পরিণত হইয়াছে, এবং তাহারা যেভাবে দারিদ্র্য ও ব্যাধির নিকট আত্মসমর্পণ করিয়াছে, তাহাতে নির্দেশ করা যায় যে, সমাজ-সংস্কারের একটা চরম চেষ্টা না করিলে তাহাদিগের ধ্বংস অবশ্যম্ভাবী। পুরাতন এথেনীয়দিগের সহিত তাহাদিগকে অনেক বিদেশি পণ্ডিত তুলনা করিয়াছেন। এথেনীয়গণ তাহাদের শেষ দশায় ম্যালেরিয়ার দ্বারা জর্জরিত হইয়াছিল এবং দাসশ্রেণি ও রোমক বর্বরগণ দেশ ছাইয়া ফেলিয়া তাহাদিগের সংস্কৃতি ও সভ্যতার বিপর্যয় ঘটাইয়াছিল। তাহাদিগেরই মতো, বাংলার যখন চারি দিকে অনুচ্চ হিন্দু অশিক্ষিত মুসলমান নূতন সম্পদ ও রাষ্ট্রবলে বলীয়ান হইয়া তাহাদিগের পুরাতন অধিকার করায়ত্ত করিতে থাকিবে তখনই পুরাতন ভদ্রলোকশ্রেণি ম্যালেরিয়ার দ্বারা প্রপীড়িত হইয়া, অসংখ্য বিধিনিষেধের দ্বারা শতধাখণ্ডিত ও বিক্ষিপ্ত হইয়া, দারিদ্রমোচন ও অন্নসংস্থানের উপায় উদ্ভাবনে অশক্ত হইয়া মৃত্যুর পথে অগ্রসর হইবে। এই ভীষণ অসাম্যমূলক সংগ্রাম ও প্রতিযোগিতায় যাহাদিগের বীর্যবত্তা ও জীবনীশক্তি কম, শিক্ষা ও শোভনতার কৃত্রিম বর্ম তাহাদিগকে আর রক্ষা করিতে পারিবে না। সংখ্যায় যাহারা অধিক, কায়িক পরিশ্রম ও শিল্পকৌশলে যাহারা গরীয়ান, রাষ্ট্রবলে যাহারা বলীয়ান ও আত্মম্ভরি, তাহারা ইহাদিগের ধ্বংসের জন্য অনুশোচনা করিবে না, হইলই বা তাহারা বংশপরম্পরা হিসাবে বাংলার সমস্ত প্রাচীন গৌরবের উত্তরাধিকারী, হইলই বা ইঁহারা তাঁহাদিগেরই বংশধর যাঁহারা বাংলা দেশ হইতে সমগ্র প্রাচ্য এশিয়ায় বৌদ্ধধর্ম প্রচার ও প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, যাঁহারা নব্য ন্যায় ও বিচিত্র মরমিয়া সাধনের অগ্রদূত, যাঁহাদিগের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ বিশ্বচিন্তার একটি সর্বশ্রেষ্ঠ গৌরব এবং যাঁহারা এই আধুনিক কালেও ভারতের নবচিন্তা, সাহিত্য, বিজ্ঞান ও রাষ্ট্রীয় আন্দোলনে গুরু ও নায়কের স্থান অধিকার করিয়াছেন। এসকল কথা সংখ্যাগরিষ্ঠ শক্তিমন্তের দল কি ভাবিয়া দেখিবে?

শিক্ষা সংস্কার এবং ভদ্রলোকের ভূমি-কর্ষণ ও কায়িক শ্রম স্বীকার

তাই বলিয়াছি উচ্চজাতির সমাজ-সংস্কার বাংলার-কৃষ্টির ধারা রক্ষার একটি প্রকৃষ্ট উপায়। নূতন রাষ্ট্রবিন্যাসে জমিসংক্রান্ত আইনকানুন অচিরেই পরিবর্তিত হইবার সম্ভাবনা। যে-কোনো কৃষিপ্রধান, লোকবহুল দেশে এক অলস কর্মবিমুখ শ্রেণি শুধু স্বত্বাধিকারের অজুহাতে টিকিয়া থাকিতে পারে না। ইতিপূর্বেই বাংলার যেসব জেলায় মুসলমান বা নমশূদ্রের প্রাধান্য, কৃষিকশ্রেণি নির্ভীক ও পীড়ন-অসহিষ্ণু, সেসব জেলায় জমিদার ও জমিদারের আমলাশ্রেণির সংখ্যা কম দেখা গিয়াছে।

শতকরা জমিদার ও আমলার সংখ্যা-অনুপাতে কৃষকের সংখ্যা

রংপুর	৩২৬৫
দিনাজপুর	২২৬৮
ত্রিপুরা	২১৭৪
ঢাকা	১৭৪৬
নোয়াখালি	১৫৪৪
যশোহর	৯৯৪
বর্ধমান	৯৩৩
বাঁকুড়া	৪১৯

বর্ধমান ও বাঁকুড়ায় নিরীহ প্রজার পোষ্য অনেক আমলা। জমিদার গ্রাম ত্যাগ করিয়া তাহাদিগেরই উপর খাজনা আদায়ের ভার দিয়া নিশ্চিন্ত। এইসব জেলায় কৃষিকার্যেও আদিম মুন্ডা ও সাঁওতাল জাতির প্রভাব বিশেষভাবে লক্ষ করা যায়। ভবিষ্যতে বাংলার দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চলে দেশবাসীর স্বাস্থ্যহানি হেতু আদিম জাতির বাহুবল চাষবাসে একটা বড়ো রূপান্তর আনিবে। কিন্তু সর্বাপেক্ষা বড়ো রূপান্তর আসিবে ভূমির স্বত্বাধিকার বিষয়ে। ভাগবিলি, জোতস্বত্বের রেহান ও ভোগদখল এবং ভূমির লেনদেন বিষয়ে সর্বপ্রথমেই সংস্কার অতি প্রয়োজনীয়। বাংলা দেশের মধ্যবিত্তশ্রেণি ভাগচাষের আশ্রয়ে বিনা পরিশ্রমে, বিনা মূলধনে, বিনা তত্ত্বাবধানে, জোতস্বত্ব ভোগ করিতেছে। তাহাদিগকে অনুকরণ করিয়া মধ্য ও পশ্চিম-বঙ্গের জোতদার কৃষকও শ্রমবিমুখ, ভদ্রলোক সাজিয়াছেন। তিনিও জমি বিলি করেন, মজুর লাগান, ভাগে ফসল ভোগ করেন। পূর্ব অঞ্চলে ভূমিস্বত্বের অংশীকরণও জমির ব্যবস্থায় কম অসুবিধা আনে নাই। ভূমিস্বত্বের সঙ্গে ভূমিকর্ষণের দায়িত্ব নিবিড়ভাবে জড়িত। এ দায়িত্ব বাংলার ভদ্রলোকশ্রেণি গ্রহণ করে নাই। বাংলার ভবিষ্যৎ আইনকানুন এ দায়িত্ব স্বীকার না করিলে যে শ্রেণি এখন ভূম্যধিকারী তাহাদিগকে ধীরে ধীরে অথবা জনসমাজ-শানিত আইনখড়্গের এক কোপে বিনষ্ট হইতে হইবে। সমাজ-সংস্কৃতি না হইলে মাঠের কাজে, কারখানায়, দোকানে, আড়তে ভদ্রলোকশ্রেণি হটিয়া যাইবে। কলিকাতা প্রভৃতি নগরে মাড়োয়ারি ও ভাটিয়ার আধিপত্যের মূল কারণ, বাঙ্গালার ভদ্রলোকের পরিশ্রমকাতরতা। তাই কলিকাতা নগরীর বিরাট সম্পদ বিদেশিরই করায়ত্ত। নব-নাগরিক সভ্যতা বিদেশির রোশনাই,—'পর দীপমালা নগরে নগরে, তুমি যে তিমিরে তুমি সে তিমিরে'। মূলকথা এই— যে কায়িক পরিশ্রম এতদিন বাঙালি ভদ্রলোক অভদ্রোচিত জ্ঞান করিয়া আসিয়াছে, বর্তমান বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার নিরর্থকতা ও বিফলতার যুগে তাহাকেই জীবনরক্ষার একমাত্র সহায় ও সম্বল বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে।

রাধাকমল মুখোপাধ্যায়

রাজনীতি নহে, মানবিকতাই হরিজন আন্দোলনের মূলশক্তি

শুধু নিজের ঘরে, পরিবারে ও গোষ্ঠীতেসংস্কৃতি হইলে চলিবে না। উচ্চজাতির সহিত প্রতিবেশী অনুচ্চজাতি ও মুসলমানের সামাজিক আদানপ্রদান, আচারনিয়মেরও আমূল পরিবর্তন প্রয়োজনীয়। মহাত্মা গান্ধি জীবন পর্যন্ত পণ করিয়া যে হরিজন-আন্দোলন প্রবর্তিত করিয়াছেন, রাষ্ট্রিক সুবিধা-অসুবিধার প্রতি নিরপেক্ষ হইয়া যদি উহা সত্যসত্যই উদারতার নীতি ও মানবিকতার ভিত্তিতে বাংলা দেশে রাজনীতির গণ্ডি অতিক্রম করিয়া প্রসার লাভ করে, তবেই রক্ষা। যেসব জাতি এখন অস্পৃশ্য রহিয়াছে, যেমন ডোম, হাড়ি, কেওড়া, লালবেগি, মেথর, ভুঁইমালি, চামার প্রভৃতি— তাহাদিগকে বাসগৃহের অন্দরে এবং মন্দিরাভ্যন্তরে প্রবেশের অধিকার দান করিতে হইবে। তাহাদিগের মধ্যে বাংলা দেশ জুড়িয়া একটা পরিচ্ছন্নতার আন্দোলন জাগাইতে হইবে। সকল অনুচ্চ ও পতিত জাতির পাড়ায়-পাড়ায়,— যেখানে, এখন ভদ্রলোক প্রবেশ করিলে জাতিচ্যুতির ভয় আছে, সেখানে,— নৈশ-বিদ্যালয় স্থাপন করিতে হইবে। দেশ জুড়িয়া মদ্যপান নিবারণ, সর্বজনীন পূজা, সর্বজনীন জলাচরণ, ব্রাহ্মণ পুরোহিতের মারফতে তাহাদিগের সংস্কার ও অখাদ্যনিবারণ, দীক্ষাদান— এইসকল উদ্দেশ্যে বাংলার উচ্চজাতীয়গণকে সকল কপটতা ত্যাগ করিয়া গভীর আন্তরিকতা ও বিশ্বাসের সহিত মূঢ়, মূক, অশুচি নারায়ণের নামে কাজে নামিতে হইবে।

বাংলা দেশ বহু শতাব্দী ধরিয়া পার্বত্য, যাযাবর ও নীচ অনার্য জাতির শিক্ষা ও সংস্কারের ভার লইয়াছে। কত অনার্যশ্রেণি ব্রাহ্মণ্য সভ্যতাকে আংশিকভাবে গ্রহণ করিয়াও হিন্দুসমাজের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। বাংলা দেশের সামাজিক ইতিহাসে এই সংস্কারের বহু দৃষ্টান্ত আছে। হিন্দুর সামাজিক স্তর-বিভাগের উচ্চ-নীচতা এই ধীর সংস্কার-পদ্ধতির বিভিন্ন ক্রম বা পর্যায় নির্দেশ করে। দেশ যখন স্বাধীনতা হারাইল, তখন হইতেই এই সহজ শিক্ষা ও সংস্কারকার্য বাধা পাইল। তখন হইতেই যতপ্রকার অস্বাভাবিক স্পৃশ্যাস্পৃশ্য বিচারের সূচনা। নূতন শিক্ষা ও প্রজাতন্ত্রের দিনে হিন্দু-সভ্যতার এই প্রচ্ছন্ন প্রচারশক্তিকে পুনঃপ্রবুদ্ধ করিয়া দেশময় যে এক কোটি পঞ্চাশ লক্ষ অনুচ্চ বা পতিত জাতি আছে, তাহাদিগকে সমাজের ক্রোড়ে টানিয়া লইতে হইবে। রাষ্ট্রিক নির্বাচন-প্রণালী যে নূতন ব্যবধান সৃষ্টি করিতেছে, তাহা উদারতর নীতি ও অভিনব সমাজবিন্যাস ফুৎকারে উড়াইয়া দিবে।

বিবাহ-সংস্কার

ধর্মগত জাতিগত ও সম্প্রদায়গত সর্ববিধ সামাজিক বিচ্ছেদকে প্রশ্রয় না দিয়া সমগ্র বাংলা দেশে এমন একটা শিক্ষা ও সমাজ-সংস্কারের আন্দোলন আনিতে হইবে যাহাতে মুসলমান, মাহিষ্য, রাজবংশি ও নমশূদ্র বাংলার কৃষ্টিকে নীচের দিকে না টানিয়া বরং তাহা যুগপরম্পরার্জিত জাতির প্রগতিরই পুষ্টি সাধন করিতে পারে। হিন্দুজাতির মধ্যে নিম্নশ্রেণির উন্নয়ন ও সামাজিক অধিকার প্রবর্তন ও উচ্চ-নীচ জাতির মধ্যে বিধবা-বিবাহের প্রবর্তন ও বৈবাহিক সম্বন্ধ বন্ধনের গণ্ডির বিস্তার, সর্বপ্রকার কায়িক শ্রম ও শিল্পানুশীলনের অস্পৃশ্যতাবর্জন ও পরিপূর্ণ আত্মনিয়োগ,— দূরদৃষ্টিতে দেখিলে, তাহা শুধু হিন্দু-সমাজের আত্মরক্ষার উপায় নয়, সমগ্র বাঙালি জাতির আত্মরক্ষার সুনিশ্চিত পথ।

ধর্মান্তর গ্রহণ ও বিবাহ রেজিস্ট্রি

বাঙালি সমাজে কী হিন্দু কী মুসলমানের আর-একটি আত্মরক্ষার পথ হইতেছে সরকারি দপ্তরে বিবাহ ও ধর্মান্তর গ্রহণ রেজিস্ট্রি করা। পূর্বে রাষ্ট্র আমাদের দেশের সমাজবিন্যাসে অধিক হাত দেয় নাই।

আধুনিক শাসনব্যবস্থায় ধর্মই ভোট দিবার অধিকার দিতেছে। বাঙালি বলিয়া নয়, হিন্দু ও মুসলমান বলিয়া, আমরা রাষ্ট্রিক অধিকার পাইয়াছি। এই পদ্ধতি জাতীয়তা বিকাশের সম্পূর্ণ পরিপন্থী। কিন্তু যখন ইহাকে অবলম্বন করিতেই হইয়াছে, তখন ধর্মান্তরগ্রহণকে একটা রাষ্ট্রিক অনুষ্ঠান বলিয়া মানিতেই হইবে। কোনো ধর্ম পরিবর্তন সরকারি দপ্তরে রেজিস্ট্রি না হইলে মঞ্জুর হওয়া উচিত হইবে না। ইহাও আইন হওয়া উচিত যে অন্তত ১৮ বৎসর পূর্ণ না হইলে ধর্মান্তর গ্রহণ করিবার ক্ষমতা কোনো পুরুষ বা নারীর থাকিবে না। এমনকি, ওই বয়সটি বাড়াইয়া ২১ বৎসর করিলেও অসংগত হইবে না।

দ্বিতীয়ত, নূতন শিল্প-প্রণালী ও নাগরিক জীবন যেভাবে আমাদিগের পঞ্চায়েত শাসন, গোষ্ঠী ও জাতির প্রভাব ও একান্নবর্তী পরিবারের রক্ষণাবেক্ষণ নষ্ট করিয়া দিতেছে সেক্ষেত্রে যৌন জীবন ও পারিবারিক জীবনের শুদ্ধি রক্ষা কল্পে রাষ্ট্রের তত্ত্বাবধান একান্ত প্রয়োজনীয় হইয়া উঠিয়াছে। বিবাহে রেজিস্ট্রির প্রচলন হইলে বহুবিবাহ ও অবৈধ যৌন সম্বন্ধ স্থাপন অসম্ভব হইবে। পাট ও তুলা সম্বন্ধীয় নূতন শিল্প-প্রধান গ্রাম ও শহর সমুদায়ের যৌন জীবন এখন এতই পঙ্কিল হইয়া পড়িয়াছে এবং এসকল গ্রামে ও শহরে স্ত্রী ও পুরুষের সংখ্যার অনুপাতে এত অধিক তারতম্য দেখা দিয়াছে যে, আইনানুমোদিত দাম্পত্য সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠিত না হইলে এখানে পারিবারিক ও সামাজিক শীলতা রক্ষা করা সুকঠিন।

নারীহরণের প্রতিরোধ

একই ধর্মানুলম্বী পতি ও পত্নী হইলে নারীর ১৪ বৎসরে বিবাহ-সম্বন্ধ-স্থাপন আইনবিরুদ্ধ হইবে না। কিন্তু পতি বা পত্নী বিবাহের পূর্বে অন্য ধর্মাবলম্বী থাকিলে ধর্মান্তর গ্রহণ এবং বিবাহ-সম্বন্ধের সম্মতির বয়স অন্তত ১৮ বৎসর হওয়া উচিত। আমেরিকার যুক্তপ্রদেশের অনেক বিভাগে বিবাহে সম্মতির বয়স ১৮। অন্তর্জাতি-বিবাহেও সম্মতির বয়স ১৮ হওয়া উচিত। এখনকার আইনে নারীহরণের অভিযোগে অভিযুক্ত কেবল পুরুষ খালাস পাইতে পারে, যদি হৃতা বা অত্যাচারিতা নারীর বয়স ১৬ বৎসর বা ততোধিক হয় এবং তাহার সম্মতির প্রমাণ হয়। আমেরিকার যুক্তপ্রদেশের মতো, সম্মতির বয়স বাড়াইয়া অন্তত ১৮ বৎসর করা উচিত এবং যদি প্রলুব্ধক বিবাহিত পুরুষ হয় তাহা হইলে তাহার ইতালির আইনের মতো শাস্তিবিধান নিতান্ত কর্তব্য। এই উপায় অবলম্বন করিলে একদিকে যেমন নারী-রাখা প্রভৃতি দুর্নীতিমূলক অনুষ্ঠান ও বহুবিবাহ সমাজে স্থান পাইবে না, অপরদিকে বাংলার সমাজের প্রধান কলঙ্ক নারী-নির্যাতনেরও অনেকটা প্রতিকার হইবে। বাংলায় ক্রমবর্ধমান নারীহরণের তালিকা সামাজিক রীতি-নীতির ব্যর্থতার নির্মম উপহাস। দাম্পত্য সম্বন্ধ স্থাপনে রেজিস্ট্রির প্রয়োজন হইলে নারীহরণ অনেক কমিবে। বিবাহের রেজিস্ট্রির সময়ে ধর্ম সম্বন্ধে কোনোরূপ নির্ধারণ প্রয়োজন নাই। প্রত্যেক পুরুষ ও নারীর স্বকীয় ধর্ম ও নিজধর্মগত আইন বজায় রাখিবার স্বাধীনতা থাকিবে। জাপানে ও কানাডায় এইপ্রকার বিধিব্যবস্থা অনেকটা সাম্প্রদায়িক কলহ নিবারণের উপায় হইয়াছে। নারীহরণ সম্বন্ধে তালিকা পড়িলে জানা যায় যে, নির্যাতিতা মুসলমান নারীর সংখ্যা সর্বাপেক্ষা অধিক। ১৯৩৭-৩৮ সালে হিন্দু নারীর নির্যাতনের মোট অভিযোগ সংখ্যা ছিল ১৪০, কিন্তু সকল সম্প্রদায়ের নারীর নির্যাতনের মোট সংখ্যা ছিল ৪১০। মুসলমান নারীহরণ সর্বাপেক্ষা বেশি এবং যেসকল জেলা মুসলমানপ্রধান তাহারা এই অপরাধে অধিকতর কলঙ্কিত। বিবাহে রেজিস্ট্রির প্রচলন হইলে নারীকে স্বেচ্ছায় বা অনিচ্ছায় হরণ করিয়া স্থানান্তরে লইয়া যাওয়া অথবা স্বগৃহে পৈশাচিক অত্যাচার অনেক কমিয়া যাওয়া সম্ভব। শ্রদ্ধেয় রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় এই প্রসঙ্গে জর্জ সৈয়দ আমীর আলীর প্রস্তাবের কথা তুলিয়াছেন যে, দলবদ্ধভাবে যাহারা নারী ধর্ষণ করে তাহাদের ফাঁসি দেওয়া উচিত।

নতুবা এই দুর্বৃত্ততার উচ্ছেদ-সাধন করা বড়োই কঠিন। অস্ট্রেলিয়াদেশে কিছু দিন পূর্বে গুন্ডারা দল বাঁধিয়া নারীদিগের উপর অত্যাচার করিত। ওই দেশ আইন পরিবর্তন করিয়া নারীধর্ষণের অপরাধীদিগকে প্রাণদণ্ড দিতে আরম্ভ করে, তাহাতেই এইরূপ কুকর্ম একেবারে বন্ধ হইয়া গিয়াছে। পুরাতন মুসলমান নীতিশাস্ত্রে এইরূপ নারীধর্ষক ব্যভিচারীর দণ্ড ছিল লোষ্ট্র নিক্ষেপে প্রাণবধ। সুতরাং যে ক্ষেত্রে মুসলমান নারীরাই অধিকতর নিপীড়িত সে ক্ষেত্রে হিন্দু-মুসলমান মিলিয়া উভয় সম্প্রদায়ের নারীর মর্যাদা ও পারিবারিক জীবনের শুচিতা, শান্তি ও স্বাধীনতা রক্ষা কল্পে নারী-বিষয়ক অপরাধ সম্বন্ধে অতি কঠোর আইনকানুন প্রবর্তন করিলে সবদিক রক্ষা হয়।

পারিবারিক শুচিতা ও নারীর মর্যাদা

বাংলার কোনো-এক জেলায় যদি একটা নারী লাঞ্ছিত হয় এবং অপরাধী যদি খালাস পায় বা কঠোর দণ্ডে দণ্ডিত না হয়, তাহা হইলে ইহাতে সকল সম্প্রদায়েরই পারিবারিক নীতির একটি গ্রন্থি অলক্ষিতে শিথিল বা ছিন্ন হয়, এবং সমগ্র সমাজেরই অকল্যাণ হয়। গত বৎসরে নারী-নির্যাতনের মোট ৪১০টি মোকর্দমার মধ্যে শাস্তি হইয়াছে কেবল ১২৭টাতে; খালাস তাহা অপেক্ষা বেশি,— ১৪৮টাতে। বাকিগুলা এখনও বিচারাধীন বা অন্য-কিছু। হিন্দু নারীদিগের অভিযোগ ছিল ১৪০টা; তাহাতে সাজা হয় ৫২টাতে, আসামিরা খালাস পায় ৫৩টাতে। এতগুলি অভিযুক্ত লোকের খালাস কোনো সম্প্রদায়ের পক্ষেই হিতকর নহে। মুসলমানের শিক্ষা ও নীতি যতই এক বিবাহের পবিত্রতা ও সংযমের দিকে অগ্রসর হইবে, যতই মুসলমান-নারীর শিক্ষা ও প্রগতির সঙ্গে তাহার নৈতিক অধিকার পরিস্ফুট হইতে থাকিবে, ততই পারিবারিকজীবনে হিন্দু-মুসলমানের আদর্শের বৈষম্য কমিতে থাকিবে এবং তখন হিন্দু-মুসলমান মিলিয়া সমাজ-রক্ষা ব্রতে এক প্রাণে উদ্যোগী হইতে পারিবে। বহুবিবাহ-বর্জন ও দাম্পত্য-সম্বন্ধ রেজিস্ট্রিকরণ ও নারী-ধর্ষককে প্রাণদণ্ড দান— উভয় সম্প্রদায়ের নারীর প্রগতি ও সামাজিক কল্যাণ সহজ করিয়া দিবে। অন্যদিকে ধর্মান্তরগ্রহণ আইনানুমোদিত হইলে হিন্দু-মুসলমান সম্প্রদায়ের সংখ্যার পরিমাণ লইয়া যে প্রতিযোগিতা চলিয়াছে তাহারও নিরাকরণ হইবে। উভয়ের অবাধ লোকবৃদ্ধি বাটোয়ারা হিসাবে কিছু আপেক্ষিক রাষ্ট্রিক সুবিধা আনিতে পারিবে সত্য, কিন্তু তাহা সাময়িক হইবে। লোকবাহুল্য কী হিন্দু কী মুসলমানকে আর্থিক হিসাবে আরও হীন ও আরও দুর্দশাগ্রস্ত করিয়া বরং অচিরেই রাষ্ট্রিক অধিকার সংকোচ করিয়া দিবে।

হিন্দু-মুসলমানের একই মাটি ও জল

বাংলার নূতন রাষ্ট্রতন্ত্রে মুসলমানের প্রাধান্যকে ভয় করিয়া হিন্দু ও মুসলমানের সামাজিক বৈষম্যকে বাড়াইতে দেওয়া বাঙালির আত্মঘাতের পথ। রাজনীতিজ্ঞের দূরদর্শিতায় দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন ইহা স্পষ্ট বুঝিয়াছিলেন। ছয় শতাব্দীর নদীপথের গতি ও তজ্জনিত জাতীয় অধোগতিকে রাষ্ট্রিক নিয়মকানুনের দ্বারা বাঙালি কী করিয়া লঙ্ঘন বা রোধ করিবে? বরং প্রাকৃতিক বিপর্যয়কে মানিয়া লইয়াই ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুত হওয়া বিবেচনার কাজ। সাহিত্যের ভিতর দিয়া, সামাজিক ভাব-বিনিময়ের দ্বারা, মহরম অথবা জন্মাষ্টমী পার্বণে, এবং মুসলমানের সত্যপির ও হিন্দুর বুড়ি মনসা ও শীতলার পূজা-অনুষ্ঠানে জাতিধর্ম নির্বিশেষে যোগদান করিয়া সমান উদাসীনতার সহিত ইতিহাস তাহাদের জয়-পরাজয়ের কাহিনি পাশাপাশি স্থান দিয়াছে। এমনকি নামকরণে হিন্দু-মুসলমান প্রথা একযোগে গ্রহণ করিয়া দুই সম্প্রদায়ের সহজ, আন্তরিক মিলন আনিতে হইবে। হিন্দু-মুসলমান দুই-ই এক মাটি ও জলে জন্মিয়াছে ও বাড়িয়াছে।

বিশ্ব-প্রকৃতি সমান স্নেহে তাহাদিগকে রক্ষণাবেক্ষণ করিয়াছে। ভবিষ্যৎও নিরপেক্ষভাবে তাহাদিগকে আশীর্বাদ ও অভিশাপ দিবে। মন ও শরীরের গঠন হিসাবে মুসলমান ও হিন্দুর কোনো পার্থক্যই নাই। কারণ অনুচ্চ হিন্দুজাতি সমুদয় হইতেই বেশির ভাগ মুসলমান ধর্মান্তর গ্রহণ করিয়া হিন্দুরা সমাজ-বিন্যাস হইতে পৃথক হইয়াছে। এই কারণে যাহাতে রাষ্ট্রিক প্রতিযোগিতামূলক সাম্প্রদায়িকতা পরস্পরের বিরোধ না বাড়ায়, তাহার জন্য স্বার্থানুসন্ধিৎসু মোল্লা বা পণ্ডিতের হস্তে সমাজের শিক্ষাদীক্ষার ভার না দিয়া বিদ্যালয়ে-বিদ্যালয়ে একটা উদার সর্বজনীন ধর্মবুদ্ধির অনুশীলন করিতে হইবে।

বিজয়ার সময় মুসলমান প্রবীণ হিন্দুর চরণধূলি লইবে, ইদের সময় হিন্দু-মুসলমানের পার্বণে যোগদান করিয়া সকলকে প্রীতি-আলিঙ্গন করিবে। পরস্পরের আদবকায়দা, বিধিনিষেধ পালন শুধু শিষ্টাচারসম্মত নয়, ধর্মের আদেশ বলিয়া গ্রহণ করিয়া হিন্দু-মুসলমানের বিরোধ না ঘুচাইতে পারিলে, পূর্ববঙ্গ এবং মধ্য ও পশ্চিম-বঙ্গের যে প্রাকৃতিক ও অর্থনৈতিক ব্যবধান বিংশ শতাব্দীতে ক্রমশ বাড়িতে থাকিবে, তাহাই বাঙালির বৈশিষ্ট্য রক্ষার ঘোর অন্তরায় হইবে।

অন্যদিকে যে অনুচ্চ মুসলমান ও অবনত হিন্দুশ্রেণি সমুদায় বাংলার চিন্তা ও সাধন, কৃষ্টি ও আচারকে অধোমুখী করিয়া রাখিয়াছে, তাহাদিগের সংস্কার ও উন্নতিসাধনে শুধু হিন্দু বা মুসলমান-সমাজের নহে, সমগ্র বাংলারই গুরুদায়িত্ব রহিয়াছে।

বাঙালি যুগনির্দেষ্টা, নূতন অবদানের অগ্রদূত

পলি-পড়া উর্বরা, তরল ভূমিতে বাঙালি জন্মিয়াছে ও বাড়িয়াছে। সমগ্র ভারতের মধ্যে বাঙালির সভ্যতা সর্বাপেক্ষা পরিবর্তনশীল। বাংলার পূর্ব-ইতিহাসের সাক্ষী ইষ্টক-নির্মিত মন্দির, প্রাসাদ কত উঠিয়াছে, কত ভাঙিয়াছে, পলি-পড়া ভূমিতে অথবা নদীগর্ভে তাহার চিহ্নমাত্রের নির্দেশ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। সেইরূপ বাংলার সভ্যতাও অচল অটল নহে, গঙ্গার ঢেউয়ের মতো তাহা নিত্যনূতন সৃষ্টি করিয়াছে, ধ্বংস করিয়াছে। যুগে যুগে চিন্তার নূতন ধারা, ধর্মের নূতন আদর্শ, শিল্পকলার নূতন রীতি, সমাজের নূতন নিয়ম ও বিন্যাস গ্রহণ করিয়া বাঙালি চিরকালই ভারতের সভ্যতার পথ নির্দেশ করিয়াছে।

মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের বর্ণিত ভারতের ইতিহাসে বাঙালির দান ও অবদানের কথা কোন বাঙালির অবিদিত আছে? বাঙালির কী উচ্চ, কী নীচ জাতির রক্ত যে বিভিন্ন আর্য-অনার্যের রক্ত-সংমিশ্রণ ঘটিয়াছে, তাহাও বাঙালির প্রগতি ও বিপ্লববাদের সহায়। এমন মিশ্রিত জাতি ভারতবর্ষে আর কোথায়? দুই হাজার বৎসর পূর্বে বাঙালি ব্রাহ্মণ বেদবিরোধী বৌদ্ধভাব সর্বপ্রথম গ্রহণ করিয়া সমগ্র ভারতবর্ষকে নূতন পথে আমন্ত্রণ করিয়াছিল। পাঁচ শত বৎসর পূর্বে বাঙালির সর্বজনীন সহজিয়া ও বৈষ্ণব ধর্ম উচ্চনীচ হিন্দুজাতির সহিত মুসলমানকে একসূত্রে বাঁধিয়া নূতন সাম্যমূলক সমাজ-বিন্যাসের সূচনা করিয়াছিল। মাত্র দেড় শত বৎসর পূর্বে রাজা রামমোহন রায় শাক্ত ও সুফি, ঔপনিষদিক ও ঈশাহি সাধন সম্মিলনে বিশ্বজগতে যে এক নূতন সর্বজনীন ধর্মসাধনের ইঙ্গিত করিয়াছিলেন, তাহা জগতের ইতিহাসে নিতান্ত বিরল। রামমোহনের ধর্ম ও জাতি মিলনের বিরাট কল্পনার তুলনায় বর্তমান ক্ষুদ্রতা ও সম্প্রদায়িকতা কত হীন, কত জঘন্য, কত অবাঙালি। বাংলার যাহা লৌকিক ধর্মসাধন, যাহার গুরু শত শত আউল-বাউল আজও কৃষকের ঘরে ঘরে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, তাহাও যে মানুষকে পরম পুরুষ বা দেবতা বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে,— 'সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই'। বিশ্বের কোনো ধর্মে মরমীর অমন রহস্যময় আত্মবিশ্বাসের সাহস দেখা যায় নাই। বাঙালির ভবিষ্যতের সমস্যা,

এই একইপ্রকার ভ্রাতৃত্ব বন্ধন ও সমাজ-গঠনের সমস্যা। বর্তমান কালের রাষ্ট্রিক সুবিধা-অসুবিধায় বিমূঢ় না হইয়া, স্বল্প সময়ের ধর্ম ও সমাজের দ্বন্দ্বে বিপর্যস্ত না হইয়া, বাঙালি যদি স্থিরচিত্তে ভবিষ্যৎদৃষ্টিতে আপনার যুগপরম্পরালব্ধ সাধনের গুরুদায়িত্ব বরণ করিতে পারে, তবেই হিন্দু-মুসলমানের মিলনে, উচ্চ ও নীচ জাতির মিলনে এবং ক্ষয়প্রাপ্ত মধ্য ও পশ্চিমবঙ্গ ও বর্ধিষ্ণু পূর্ববঙ্গের সম্মিলনে একটি অপূর্ণ সভ্যতা গড়িয়া উঠিতে পারে। তাহাতে হয়তো গৌড়-সপ্তগ্রাম-কলিকাতার নাগরিক সভ্যতার ঔজ্জ্বল্য ও সমারোহ না থাকিতে পারে, কিন্তু তাহা শ্রম, সাহস, ও হস্ত-কৌশলের সাহায্যে অধিকতর সতেজ, লোকবৃদ্ধির সাহায্যে অধিকতর বলীয়ান এবং নূতন মৈত্রী স্থাপনের সাহায্যে অধিকতর গরীয়ান হইবে, সন্দেহ নাই।

বাঙালির মানবিকতা

বাঙালির এই নূতন নির্নিমেষ ভবিষ্যৎ-দৃষ্টি চাই। নূতন বাংলা দেশ ও নূতন বাঙালির সভ্যতা গড়িবার যুগে বাঙালি যদি অল্পদর্শী হইয়া সামাজিক ও সাম্প্রদায়িক বিরোধকে বড়ো করিয়া দেখে, তাহা হইলে তাহার শতযুগের সাধনা ব্যর্থ হইবে এবং এই শতাব্দীর অবসানের পূর্বেই সুজলা, সুফলা, শস্য-শ্যামলা বাংলা ভূমিতে বাঙালিজাতি শিক্ষায় ও দীক্ষায় সবরকমে অবাঙালি হইবে। বাংলার আগামী যুগ সমাজ-সংস্কৃতির যুগ। জাতি, কৃষ্টি ও ধর্মসমন্বয়ের সূচনা না হইলে, একটা ব্যাপকতর জাতীয়তার অভাবে বাংলার রাষ্ট্রিক আন্দোলন পদে-পদে ব্যর্থ ও বিপর্যস্ত হইবে। এমনকি রাষ্ট্রই তখন সমাজের শান্তি ও সাধনার ঘোর পরিপন্থী হইবে। অনুন্নতের সংখ্যা ও কর্মপরায়ণতার সহিত উন্নতের বুদ্ধি ও নিয়ন্ত্রণ শক্তির সংযোগ চাই। তাহা যদি সহজ বুদ্ধি ও সাধারণ সামাজিক ও রাষ্ট্রিক অভিজ্ঞতার ফলে না আসে, তবে আমাদিগকে কবির, রামানন্দ ও চৈতন্যের আন্দোলনের মতো কোনো ভবিষ্যৎ যুগ-প্রবর্তনার জন্য প্রতীক্ষা করিতে হইবে। তবেই প্রকৃতির অভিশাপকে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া আমরা অন্তরের সম্পদে মহত্তর বাঙালি সমাজ ও সভ্যতা গড়িতে পারিব নূতন কোনো নদীধারাকে অবলম্বন করিয়া নূতন সমুদ্রের মোহানায়। বাংলা দেশ ও তাহার দেবতা, দুই-ই যে 'নিতুই নব'।

উৎস : *বাঙলা ও বাঙালি/ প্রকাশকাল : ১লা বৈশাখ ১৩৪৭।*

সমাজবিজ্ঞান ও বাঙালি সমাজ

আবু জাফর শামসুদ্দিন

নিঃসন্দেহে, প্রাণীকুলে মানবসমাজ একটি গ্রুপ বা প্রজাতি। অন্যান্য প্রজাতির জীবনে জটিলতা অত্যন্ত কম। কুকুর একটি প্রজাতি, গোরু একটি প্রজাতি, ইঁদুর একটি প্রজাতি। জৈব স্বভাবজাত কাজগুলো স্বয়ংক্রিয় ব্যাপার। তার বাইরে ওদের অন্য কোনোরূপ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য নেই বলেই মনে হয়। মানবজাতি পশুপক্ষীদের কোনো কোনো প্রজাতির কিছু অংশকে নানা কৌশলে বশীভূত করেছে। ওরা মানুষের কাজে লাগছে। ল্যাবরেটরিতে গিনিপিগ রূপেও ব্যবহৃত হচ্ছে কোনো কোনো প্রজাতির পশুপক্ষী। ইদানীং অবশ্য অনুন্নত দেশের মানুষকেও গিনিপিগ করা হচ্ছে। কিন্তু সেটা অন্য প্রসঙ্গ।

মানবেতর প্রাণীর স্বভাবের একটি দিক বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এক প্রজাতির প্রাণীর সঙ্গে অন্য প্রজাতির ঝগড়া-ফ্যাসাদ-লড়াই, খাওয়াখাওয়ি, খুনোখুনি আছে। কিন্তু অভিন্ন প্রজাতির মানবেতর প্রাণী পরস্পর বিবদমান নানাপ্রকার স্বার্থবাদী শ্রেণিতে বিভক্ত নয়। ওদের মধ্যে আশরাফ-আতরাফ, ব্রাহ্মণ-শূদ্র ভেদাভেদ নেই। মৌমাছি ব্যতীত অন্য কোনো প্রজাতির মধ্যে সম্ভবত মালিক-শ্রমিক সম্পর্কও নেই। একই প্রজাতির পশুপক্ষীর মধ্যে ঝগড়াঝাঁটি ও মারামারি হয়, কিন্তু সেটা হয় ব্যষ্টিতে ব্যষ্টিতে। একই প্রজাতির মানবেতর প্রাণী বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে যুদ্ধে লিপ্ত হয় না।

মানবজাতি তার ব্যতিক্রম। ঐতিহাসিককালের শুরু থেকেই মানবজাতি রাজাপ্রজা, শাসক-শাসিত, শোষক-শোষিত, আশরাফ-আতরাফ, শ্রমিক-মালিক, পুরোহিত-অ-পুরোহিত (Laity), প্রভু-ভৃত্য, শিক্ষিত-অশিক্ষিত প্রভৃতি নানা শ্রেণিতে বিভক্ত। তা ছাড়াও রয়েছে পরস্পর বিবদমান নানা ধর্ম-বিশ্বাসী সম্প্রদায়। আছে নানা ভাষা-ভাষী লোক। আছে নির্দিষ্ট ভৌগোলিক সীমারেখার মধ্যে বসবাসকারী নানা জাতি-উপজাতি প্রভৃতি। প্রতিটি গ্রুপের ইহজাগতিক স্বার্থ আলাদা। বর্ণবিদ্বেষও আছে। এক কথায় ঐতিহাসিককাল হতেই মানবজাতি নানা পরস্পরবিরোধী স্বার্থবাদী শিবিরে বিভক্ত। বিরোধ নিষ্পত্তির জন্যেই হোক অথবা বিরোধ অধিকতর তীব্র করার জন্যেই হোক বিরোধী শিবিরগুলো কখনও একে অপরের বিরুদ্ধে, কখনও-বা এক যুক্তফ্রন্ট অন্য যুক্তফ্রন্টের বিরুদ্ধে বহুকাল হতে সশস্ত্র যুদ্ধ করে আসছে। মানুষের হাতে নিহত হয়েছে অগণিত মানুষ— শস্য শ্যামল জনপদ হয়েছে ভস্মীভূত।

বিরোধ ও যুদ্ধবিগ্রহের মধ্যে স্থাপিত হয়েছে রাজ্য, সাম্রাজ্য, উদ্ভব হয়েছে সামন্তশ্রেণির, স্থাপিত হয়েছে জাতিক-রাষ্ট্র; যুদ্ধ হয়েছে জাতিতে জাতিতে; দেশপ্রেম, ধর্মপ্রেম প্রভৃতি বোধের (Concept) জন্ম হয়েছে। বিরোধ ও সংঘর্ষের ফলে রাজরাজড়া ও রাজত্বের উত্থান-পতন হয়েছে। বহু সভ্যতা ও সংস্কৃতি এবং ভাষা ও ভাষা-ভাষী গোষ্ঠী বিলুপ্ত হয়েছে। নতুন সভ্যতা ও সংস্কৃতি পুরাতনের স্থান অধিকার করেছে। এই প্রক্রিয়ার মধ্যে উদ্ভব হয়েছে বিভিন্ন প্রকারের আর্থ-সামাজিক রাজনৈতিক পদ্ধতির।

মানবজাতির এ ইতিহাসকে অনেকে দেখেছেন পরস্পর সম্পর্কহীন বিচ্ছিন্ন ঘটনারূপে। হারবার্ট এ. এল. ফিশার বলেন,

> I can see only one emergency following upon another as wave follows upon wave. Only one great fact with respect of which, since it is unique, there can be no generalisations, only one safe rule for historian : that he should recognise in the development of human destinies the play of contingent and unforeseen.

সমালোচকদের মতে বিখ্যাত ব্রিটিশ ঐতিহাসিক আর্নল্ড টয়েনবিও একই পথের পথিক।

> One of Toynbee's initial propositions is denial of the unity of the historical process. In his own inimitable form he develops the idea of Spengler, who in the spirit of medieval nominalism, denying the objective existence of general concepts, maintained that 'mankind is an empty word' and that only individual ethnico-cultural communities actually exist. According to Toynbee, history is the history of different isolated civilisations, which arose, developed and disappeared without making any appreciable impact on one another. But what force conditions the movement of civilisation, its rise and development? Such a force is the intellectual elite, the thinking and creative minority, leading the 'inert majority' which lacks the reason and will to engage in independent historical creativity.

পুঁজিবাদী পদ্ধতিতে বিশ্বাসী ঐতিহাসিকগণ ভুলে যান যে, সকল কালের তথাকথিত 'intellectual elite' শ্রেণি সমকালীন আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক পদ্ধতির মধ্যে বিদ্যমান বৈষম্যেরই সৃজন। একালের বাংলা দেশের শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যেও তার প্রমাণ পাওয়া যায়। যেমন, intellectual elite তৈরির জন্যে বিশেষ ধরনের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান আছে। সাধারণ মানুষের ছেলে-মেয়েদের পক্ষে এসব ব্যয়বহুল শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে প্রবেশ সম্ভব নয়। সুতরাং intellectual elite আকাশ থেকে পতিত কোনো বিশেষ ধরনের প্রাণী নয়, বৃহত্তর মানবসমাজেরই অংশ। ওরা শ্রেণিবিভক্ত সমাজে শোষক-শাসক শ্রেণিরই অন্তর্ভুক্ত।

মানবেতিহাসের যুগ পরিবর্তনকারী কোনো ঘটনাই অপ্রত্যাশিত কিংবা আকস্মিক কিছু নয়। বিদ্যমান আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক পদ্ধতির মধ্যেই আপাতদৃষ্টে অপ্রত্যাশিত ঘটনার বীজ উপ্ত থাকে। গ্যাস জমলে বিস্ফোরণ ঘটবেই। রোমান সাম্রাজ্যের দাস বিদ্রোহ, পরবর্তীতে ইউরোপের নানা বিদ্রোহ, যুদ্ধবিগ্রহ, ফরাসি বিপ্লব প্রভৃতি কোনো ঘটনাকেই আকস্মিক ও অপ্রত্যাশিত বলা যায় না। দীর্ঘসময় ধরে সমাজে এসবের কারণ পুঞ্জীভূত হয়। যখন বিস্ফোরণ ঘটে তখন 'status quo'-এর অবিনশ্বরতায় বিশ্বাসীদের কাছে মনে হয়, এমনটি হওয়ার তো কথা ছিল না।

অন্য মতের জ্ঞানী ব্যক্তিরা মানবেতিহাসকে কতকগুলো পরস্পর সম্পর্কহীন বিচ্ছিন্ন ঘটনাবলির সংকলন মনে করেন না। তাঁরা ইতিহাসকে দেখছেন সমগ্র মানবজাতির পরিক্রমারূপে। আঞ্চলিক

বৈশিষ্ট্য, স্থানে স্থানে অসম বিকাশ, এবং বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষের পরিক্রমার গতিপ্রকৃতি বিভিন্ন চরিত্রের হওয়া সত্ত্বেও শেষোক্ত মতের জ্ঞানী ব্যক্তিগণ মানবজাতির ইতিহাসকে সামগ্রিকভাবে বিচার-বিশ্লেষণ করেছেন। আঞ্চলিক বৈচিত্র এবং সমাজে স্তরভেদের কার্যকারণ খুঁজতে গিয়ে মানবেতিহাসের নতুন ব্যাখ্যা উপস্থিত করলেন কার্ল মার্কস। আমরা জানি তার ব্যাখ্যার নাম Economic Interpretation of History। তাঁর এ ব্যাখ্যা অনুযায়ী 'each system of production relations is a specific social organism, whose inception, functioning, and transition to a higher form, conversion into another social organism, are governed by specific laws'.

এক শতাব্দীর অধিককাল যাবৎ ইতিহাসের মার্কসীয় ব্যাখ্যা পৃথিবীর সর্বমহলের আলোচ্য বিষয়। পৃথিবীর এক-ষষ্ঠাংশ সোভিয়েত রাশিয়াসহ ভূমণ্ডলের আরও বহু দেশে মার্কসীয় ব্যাখ্যা গৃহীত হয়েছে, স্থাপিত হয়েছে সমাজতান্ত্রিক আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক পদ্ধতি। বিশ্ব এখন প্রকৃতপক্ষে দুটি শিবিরে বিভক্ত। তৃতীয় কোনো পদ্ধতি আজকের পৃথিবীর কোথাও বিদ্যমান নেই। থাকা সম্ভবও নয়। লক্ষ্যাদর্শের পার্থক্য সত্ত্বেও উভয় ধরনের সমাজপদ্ধতির মধ্যে লেনদেনের সম্পর্ক বিদ্যমান।

এখানে একটি চিরনতুন চিরপুরাতন বিষয়ের অবতারণা করতে হচ্ছে। বৈষয়িক অবস্থা (objective condition) আমরা সাদা চোখেই দেখতে পাই। আস্তাকুঁড় এবং গোলাপ বাগান পাশাপাশি আছে। একই শহরের একাংশে ঘিঞ্জি নোংরা বস্তি (slum) অন্য অংশে প্রাসাদোপম অট্টালিকা সজ্জিত অভিজাত এলাকা। যদি কেউ দেখতে না পায় তা হলে বুঝতে হবে যে, হয় সে অন্ধ অথবা নির্বোধ। কিন্তু ব্যৈক্তিক অথবা সামাজিক ধ্যান-ধারণা (concept) ভাবাত্মক ব্যাপার। সুনীতি-দুর্নীতিবোধ, লক্ষ্যাদর্শবোধ প্রভৃতিও ভাবাত্মক। এগুলোর কোনোটাই চরম ও পরম সত্য নয়। আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক প্রথা-পদ্ধতি পরিবর্তিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এসব ধ্যান-ধারণাও পরিবর্তিত হয়। এক সময়ে দাসপ্রথাকে স্বাভাবিক মনে করা হত। আমার বাল্যকালেই জমিদারের খাজনা না দেওয়াকে মনে করা হত অন্যায় কাজ। জমিদারকে মনে করা হত ভূমির ঈশ্বর-নির্দেশিত মালিক। খাজনা শোধ না করলে ফসল হয় না, এ ধারণা ছিল ব্যাপক। আজ দাসপ্রথাও নেই, জমিদারও নেই। সঙ্গে সঙ্গে ওসব প্রথা সম্পর্কিত উপরিউক্ত ধ্যান-ধারণাও নেই।

ভাব মানেই ভাবুকের সামাজিক অবস্থান, পরিবেশ এবং প্রতিবেশগত প্রতিক্রিয়া ব্যতীত অন্য কিছু নয়। জন্মকালে মানবশিশু ভাষাহীন নির্বোধ। পরিবার ও সমাজে লালিতপালিত হওয়ার কালে সে তার সমাজে প্রচলিত ভাষা শিখে। ভাষা পারস্পরিক ভাব বিনিময়ের সামাজিক মাধ্যম। ভাষা এবং সতত দর্শিত সামাজিক আচরণ শিশুকে করণীয় অকরণীয় কাজকর্ম বিষয়ে বোধ-শক্তি প্রদান করে। ভূমিষ্ঠ হওয়ার পরপরই যদি মানবশিশু সমাজ হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে এবং মানবশূন্য স্থানে এসে বড়ো হয় তা হলে সে জন্মকালে যেমন নির্বোধ ছিল তেমন নির্বোধই থেকে যায়। জৈবধর্ম পালন ব্যতীত তার জন্য অন্য কোনো কাজ থাকে না। অন্য কোনো চিন্তাও করতে পারে না। আগেই বলেছি জৈব ধর্ম পালন প্রাণীমাত্রেরই স্বয়ংচালিত (automatic) কর্ম। যে-কোনো প্রকারের ভাবাত্মক (subjective) চিন্তার কোনো না কোনো লক্ষ্য থাকে। ভালো করার লক্ষ্য না থাকলে 'ভালো' নামক বোধটির জন্ম হত না। 'ভালো' বোধটির সমকালীন সামাজিক সংজ্ঞা আছে। সেই সংজ্ঞা অনুযায়ী যা ভালো সে চিন্তাই করে মানুষ এবং করেও তেমন কাজ। ভাষার মাধ্যমে যা বলা হয়, তার অর্থ বক্তা নিজেও বোঝেন, শ্রোতারাও বোঝেন। সুতরাং সচেতন মানুষ মাত্রেরই ভালোমন্দ লক্ষ্যাদর্শ থাকে। কারও সোচ্চার, কারও অনুচ্চারিত। পৃথিবীতে নিরপেক্ষতা নামে কোনো বস্তু নেই। দু-ধরনের মানুষ 'নিরপেক্ষ' হতে পারে। এক নির্বোধ, আমরা যাদের 'মগা' বলি তারা। দুই, প্রচলিত আর্থ-সামাজিক-

রাজনৈতিক পদ্ধতির মধ্যে যারা সুখে স্বচ্ছন্দে আছেন তাঁরা। অন্য সকল শ্রেণির মানুষের পক্ষপাত আছে। স্বৈরাচারী শাসক-শোষক শ্রেণি এবং তাদের পৃষ্ঠপোষকদের পক্ষপাত স্বৈরাচারী পদ্ধতির প্রতি। জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে সকল মানুষের কল্যাণকামীর পক্ষপাত সাম্য, মৈত্রী ও ভ্রাতৃত্বের লক্ষ্যাদর্শের প্রতি।

এককালে ইউরোপে আর্ট ফর আর্টস সেক (Art for Arts Sake) অর্থাৎ শিল্পের জন্যেই শিল্প মতবাদ প্রবল ছিল। এখন খুব কম শিল্পীই এ মত পোষণ করেন। অধিকাংশের মতে শিল্পের লক্ষ্যাদর্শ থাকতে হবে। তেমনই বিদ্যার জন্যেই বিদ্যা অর্জনের মতবাদও অচল। জ্ঞানের এমন কোনো শাখা নেই যা বাস্তব জীবনে কাজে লাগে না। পণ্ডিত ব্যক্তিদের সমাবেশে এ উক্তির ব্যাখ্যা অনাবশ্যক। কাজে লাগার অর্থ জ্ঞানার্জন-প্রবৃত্তির পশ্চাতে লক্ষ্যাদর্শ আছে। সমাজবিজ্ঞান জ্ঞান-বিজ্ঞানের একটি শাখা। জ্ঞান-বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখাপ্রশাখার মতো সমাজবিজ্ঞানের চর্চাও ঐতিহাসিককাল হতেই কোনো না কোনো নামে চলে আসছে। কারও কারও মতে, সমাজবিজ্ঞানের জন্ম উনবিংশ শতাব্দীতে। কথাটি আংশিকভাবে সত্য। অর্থাৎ উনবিংশ শতাব্দীতে একটি আলাদা শৃঙ্খলারূপে সমাজবিজ্ঞানের চর্চা শুরু হয়। কিন্তু আমরা যখন অ্যারিস্টটলের রাজনৈতিক রচনাবলি পাঠ করি, পাঠ করি প্লেটোর *রিপাবলিক* তখন কি প্রকৃতপক্ষে সমাজবিজ্ঞানই পাঠ করি না? প্লেটোর *রিপাবলিক* এবং অ্যারিস্টটলের *পলিটিকস*-এর মধ্যে শুধু সমাজকে বিভিন্ন শ্রেণিতে বিভক্ত করা হয়নি, গ্রন্থকারদের লক্ষ্যাদর্শও ব্যক্ত হয়েছে। চতুর্দশ শতাব্দীর মনীষী ইবনে খালদুন তাঁর বিশ্ব ইতিহাসের ভূমিকা 'আল মুকাদ্দিমা'-য় এ কথা বলেছেন যে, চিন্তাশক্তির আকর্ষণে মানুষ যখন পরস্পর-এর সহায়তায় এগিয়ে গেছে এবং সম্মিলিত প্রয়াসে পৃথিবীর উপর অধিকার প্রতিষ্ঠায় ব্রতী হয়েছে তখনই 'উমরান' অর্থাৎ সভ্যতার জন্ম হয়েছে। 'উমরান' শব্দটি 'জবরদস্তি' অর্থেও তিনি ব্যবহার করেছেন। শব্দটির ধাতুগত অর্থ নির্মাণ করা, আবাদ করা। এই সঙ্গে ইবনে খালদুন ব্যবহৃত অন্য একটি term 'ইজতেমাউল বশরী' (মানবসমাজ) মিলিয়ে বিচার করলে তার মূল বক্তব্য স্পষ্ট হয়। অর্থাৎ সভ্যতা ও সংস্কৃতি বলতে যা বোঝায় তা মানবসমাজেরই বিনির্মিত কীর্তি। সত্য বটে, মানবসমাজের সর্বত্র যুগপৎ এবং সমানভাবে সভ্যতা ও সংস্কৃতি বিস্তৃতি লাভ করেনি। এই অসমতার কারণ হিসেবে প্রতিবেশ-পরিবেশগত বৈচিত্রের প্রভাব ছাড়াও সমাজজীবনের একটি অভ্যন্তরীণ কারণের উল্লেখ এবং তা অত্যন্ত বিশদভাবে ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করেছেন ইবনে খালদুন। এই কারণটির নাম দিয়েছেন তিনি 'আসাবিয়া' বা 'গোত্রপ্রীতি'। তাঁর মতে 'আসাবিয়া'-র শক্তি যে পরিমাণে ঐক্যবদ্ধ ও সক্রিয় হয়েছে সভ্যতা বিনির্মাণে তার প্রভাবও হয়েছে তত বেশি স্থায়ী এবং দর্শনীয়। বস্তুত, গোত্র-প্রীতি থেকেই মানবজাতির গোত্রবদ্ধ জীবনের বিকাশ। এটি সমাজ বিকাশের প্রাথমিক স্তর। ইবনে খালদুন এটাকে 'বদোয়া' বা যাযাবরী জীবন নাম দিয়েছেন। এই যাযাবর গোত্র-শক্তিই আরও সংঘবদ্ধ হয়ে নগর নির্মাণ করেছে এবং তার ফলশ্রুতি হিসেবে নগরসভ্যতার বিকাশ ঘটেছে। এমনকি রাজ্য স্থাপন, বিস্তার এবং তার স্থায়িত্ব অস্থায়িত্ব-এর মধ্যে যে বৈচিত্র লক্ষ করা যায় ইবনে খালদুন তার মধ্যেও 'আসাবিয়া'-র অমোঘক্রিয়া দেখেছেন। ফলত সমাজ বিকাশের সর্বত্র তিনি আসাবিয়ার শক্তির প্রবল প্রতাপ লক্ষ করেছেন। বলা বাহুল্য এগুলো যুগপৎ সমাজবিজ্ঞান এবং 'ইতিহাসের দর্শন'-এর কথা। আধুনিক জাতি ও জাতিক রূপের উদ্ভবমূলে ইবনে খালদুনের 'আসাবিয়া' তত্ত্ব কতটা ক্রিয়া করেছে তা পণ্ডিত ব্যক্তিদের বিচার্য বিষয়। ইতিহাস বলে, স্থায়ী বসতি স্থাপনের পূর্বে মানুষ যূথবদ্ধ হয়ে বিচরণ করত। কিন্তু গোত্র-প্রীতির উপর গুরুত্ব প্রদান সত্ত্বেও ইবনে খালদুন মানবজাতিকে একটি অবিচ্ছেদ্য সমাজরূপে চিন্তা করেছেন। স্মরণীয় যে, চাণক্য এবং মেকিয়াভেলির মধ্যে রাজার রাজ্যশাসন বিষয়ে চিন্তা আছে। গ্রিক মনীষীদের রাষ্ট্র-চিন্তা ওঁদের

রচনায় নেই। কিন্তু ওঁরাও মানবসমাজকে শ্রেণিবিভক্ত করে দেখেছেন। বলা বাহুল্য, শ্রেণিবিভাগ এবং বিচ্ছিন্নতা এক বস্তু নয়।

একালে সমাজবিজ্ঞানের সংজ্ঞা দেওয়ার চেষ্টা চলছে। এ বিষয়ে আমি যখন ভাবি তখন কোনো কূলকিনারা পাই না। সাগর মন্থন করার কথা বলা হয় বটে। কিন্তু সাগর কি সত্য সত্যই মন্থন করা যায়? পোপ বলেছেন, 'The proper study of mankind is man'। নামই প্রমাণ করে যে, মানব-সমাজটাই সমাজবিজ্ঞানের বিষয়বস্তু। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ইতিহাস, ভূগোল, দর্শন, অর্থশাস্ত্র, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান, ফিজিয়োলজি, বায়োলজি, পদার্থবিদ্যা, রসায়নশাস্ত্র, গণিত, জ্যোতির্বিজ্ঞান, ভাষা প্রভৃতি বহু বিষয় শিক্ষা দেওয়া হয়। কিন্তু সবকিছুরই জনক যেমন মানবসমাজ তেমনিই সবকিছুই শিক্ষা দেওয়া হয় মানবজাতিকে এবং মানবজাতির জন্যই। তুলনীয় 'Government of the people, by the people, for the people' বাক্যটি।

সুতরাং আমার মতে, সমাজবিজ্ঞানে বিদ্যার সকল শাখাপ্রশাখা এসে মিলিত হয়েছে, শত নদী শত দিক থেকে এসে যেমন সাগরে মিশে যায় তেমনই।

একালে প্রধানত রাজনৈতিক প্রয়োজনে (রাজনীতিও সমাজবিজ্ঞানেরই অংশ) সমাজবিজ্ঞানকে প্রথমত একটি আলাদা ডিসিপ্লিনরূপে এবং দ্বিতীয়ত সেটাকে আবার শাখাপ্রশাখায় বিভক্ত করে অধ্যয়ন করা হচ্ছে। আগেই বলেছি, পৃথিবীতে এখন মাত্র দুটি আর্থ-সামাজিক পদ্ধতি বিদ্যমান। দুই পদ্ধতির সমর্থকগণ দুটি শিবিরে বিভক্ত। ওদের রাজনৈতিক প্রয়োজন বা লক্ষ্যাদর্শও আলাদা।

পুঁজিবাদী পদ্ধতির প্রতি অনুগত সমাজবিজ্ঞানীদের কারও কারও কথা শুনলে মনে হয়, ওরা বুঝি-বা প্রগতির কথা বলছেন। বুঝি-বা চাচ্ছেন মানবজাতির কল্যাণ। আসলে বাক্য-জালের কৌশলে ওঁরা সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্ত করতে চান। প্রকৃতপক্ষে ওঁরা status quo-এর সমর্থক। সমাজবিজ্ঞানের সহায়তায় ওঁরা পুঁজিবাদী আর্থ-সামাজিক পদ্ধতি বহাল রাখতে চান। এঁরা রুশ বিজ্ঞানী পাভলভের conditioned reflex তত্ত্বটি প্রয়োগ করছেন মানবজাতির উপর। বিখ্যাত মার্কিন সমাজবিজ্ঞানী পি. সরোকিন তার একটি দৃষ্টান্ত। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ যখন চলছে সরোকিন লিখলেন,

> We are living and acting at one of the epoch-making turning points of human history, when one fundamental form of culture and society-sensate is declining and different form is emerging .... This means that the main issue of our times is not democracy versus totalitarianism, nor liberty versus despotism, neither is it capitalism versus communism nor pacifism versus militarism nor internationalism versus nationalism nor any of the current popular issues daily proclaimed by statesmen and politicians; professors and ministers; journalists and soapbox orators. All these popular issues are by-products of the main issue, namely the sensate form of culture and way of life versus another different form. Still more insignificant are such issues as Hitler versus Churchill or England versus Germany or Japan versus United States... It was not the Hitlers, Stalins and Mussolinis who created the present crises; the already existing crisis made them what they are—its instrumentation and puppets.

সরোকিন অবশ্য বলছেন, The complete disintegration of our culture and society (বলা বাহুল্য পশ্চিমি) claimed by the pessimists, is impossible, also for the reason that

total sum of social and cultural phenomena of western society and culture has never been integrated into one unified system. What has not been integrated, can not, it is evident, disintegrate.

কথাগুলো শুনতে চমৎকার কিন্তু আসলে তাঁর মতলবটা কী? তিনি ideational, idealist এবং sensate এই তিনপ্রকার সংস্কৃতির শনিচক্রের (vicious circle) মধ্যে মানবজাতি সতত পরিক্রমণশীল সাব্যস্ত করেছেন। সুতরাং sensate সংস্কৃতির মধ্যে যেগুলো integrate করেনি সেগুলি হচ্ছে ideational এবং idealist সংস্কৃতি ও সভ্যতা। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে ১৯৫৭ সালে সরোকিন কী চান তা স্পষ্ট করে বলেছেন, 'This struggle between the forces of the previously creative but now largely outworn sensate order and the emerging, creative forces of a new-ideational or idealistic order is proceeding relentlessly in all fields of social and cultural life. The final outcome of this epochal struggle will largely depend upon whether mankind can avoid a new World War.'

সরোকিন-এর ideational এবং idealistic যুগ প্রকৃতপক্ষে প্রাচীন এবং মধ্যযুগ। স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে বর্তমান sensate যুগের অবসানে তিনি উক্ত দু-যুগের যে-কোনো একটির পুনঃপ্রতিষ্ঠার মধ্যে মানবসমাজের মুক্তি দেখতে পাচ্ছেন। তিনি পুঁজিবাদী প্রথা এবং সমাজতান্ত্রিক প্রথাকে এক পাল্লায় তুলেছেন। শিল্পবিপ্লবোত্তর টেকনোলজির সঙ্গে পুঁজিবাদী প্রথায় উৎপাদন রীতির অসংগতিপূর্ণ সহ-অবস্থানজনিত বিরোধ হতেই সমাজতন্ত্রের উদ্ভব হয়েছে সন্দেহ নেই। কিন্তু দুটি পদ্ধতির মৌলিক পার্থক্য বিদ্যমান। পুঁজিবাদী পদ্ধতিতে জ্ঞানের চেয়ে মালের মূল্য অধিক। পুঁজিবাদ সকল-প্রকার বিষয়-সম্পত্তি এবং উৎপাদন উপকরণের উপর ব্যক্তিগত মালিকানায় দৃঢ় বিশ্বাসী। পুঁজিবাদ সজ্ঞানে মানব- সমাজকে শ্রেণিবিভক্ত করে : বর্ণবৈষম্যও পুঁজিবাদেরই সৃষ্টি। পুঁজিবাদ জাতিগত শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করার জন্যে কলম ধরে। হেগেলের মতো অসাধারণ প্রতিভাও, 'The German spirit is the spirit of the new world' বলতে কুণ্ঠাবোধ করেননি।

পক্ষান্তরে, সমাজতন্ত্রের লক্ষ্যাদর্শ শ্রেণিহীন মানবসমাজ প্রতিষ্ঠা। সমাজতন্ত্র মালের চেয়ে জ্ঞানকে অধিক মূল্যবান মনে করে। 'সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই' সমাজতন্ত্র এ মতে দৃঢ় বিশ্বাসী। সমাজতন্ত্র পৃথিবীর সকল সম্পদ এবং উৎপাদন উপকরণের উপর জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে মানবসমাজের যৌথ মালিকানা প্রতিষ্ঠায় আস্থাবান। আমাদের *কোরান শরিফ* বলে, পৃথিবীতে মানবজাতি আল্লাহ্‌তালার খলিফা (প্রতিনিধি) (ইন্নীজায়েলুন ফীল আরদে খলিফাতুন), বিশেষ কোনো শ্রেণি, বর্ণ, জাতি বা ধর্মাবলম্বী নয়। আমরা যদি এই মূল সূত্রটি মনে রাখি তা হলে প্রুধোর 'property is theft' মতের সারবত্তা উপলব্ধি করার অসুবিধা হয় না। সমাজতন্ত্র idealist, ideational, sensate চক্রবৃত্তের বাইরের ব্যাপার। সমাজতন্ত্র পৃথিবীতে নতুন ধরনের সভ্যতা, সংস্কৃতি, মূল্যবোধ, আইনকানুন, নীতিমালা প্রভৃতি নির্মাণ করে চলছে।

সুতরাং crisis of our age আমাদের কালের সংকট দু-দিক থেকে বিচার্য। পুঁজিবাদী পদ্ধতির অভ্যন্তরীণ সংকট তার এক দিক। এই পদ্ধতিতে শাসিত বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে পারস্পরিক অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতা ছাড়াও রয়েছে প্রতিটি রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে বিভিন্ন শ্রেণির পারস্পরিক বিরোধ। শ্রেণিতে শ্রেণিতে পর্বতপ্রমাণ বৈষম্য বজায় রেখে এ বিরোধ নিষ্পত্তি করা সম্ভব নয়।

আমাদের কালের সংকটের অপর দিক হচ্ছে সমাজতন্ত্র এবং পুঁজিবাদ এই দুই বিপরীতধর্মী পদ্ধতির অনতিক্রম্য ব্যবধান বা বিরোধ। হিটলার-মুসোলিনি-চার্চিল প্রমুখ ছিলেন পুঁজিবাদী পদ্ধতির প্রতিনিধি। ওঁদের মধ্যে মতপার্থক্য ছিল। কিন্তু পুঁজিবাদী পদ্ধতির বিরোধী ছিলেন না কেউ। চার্চিল তো সদর্পে ঘোষণা করেছিলেন, 'I am not going to preside over the liquidation of Her Majesty's British empire'।

অপর দিকে, স্টালিন ছিলেন সমাজতান্ত্রিক পদ্ধতির প্রতিনিধি। এখন চার্চিল গ্রুপের প্রতিনিধিত্ব করেছেন প্রেসিডেন্ট রিগান, ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী থ্যাচার প্রমুখ। সমাজতন্ত্রের প্রতিনিধিত্ব করেছেন গরবাচভ, ফিডেল কাস্ত্রো প্রমুখ। আমরা যদি Evolution অর্থাৎ বিবর্তনবাদে বিশ্বাস করি তা হলে স্বীকার করতেই হবে যে, সামন্ততান্ত্রিক পদ্ধতির স্থলে পুঁজিবাদী পদ্ধতির প্রতিষ্ঠা যেমন ছিল মানবসমাজের একটি যুগ পরিবর্তনকারী পদক্ষেপ, তেমনিই আজকের দিনে সমাজতান্ত্রিক পদ্ধতিও একটি যুগ পরিবর্তনকারী অগ্রযাত্রা। পুঁজিবাদী পদ্ধতি পৃথিবীর উপর দু-আড়াইশো বছর বহাল রয়েছে। আর কত? আপন ঐতিহাসিক ভূমিকা নিঃশেষিত না হওয়া পর্যন্ত সমাজতান্ত্রিক পদ্ধতি সম্প্রসারিত হতে থাকবেই।

পুঁজিবাদী পদ্ধতির মুখপাত্রগণ, তার মধ্যে সমাজবিজ্ঞানীও আছেন, জোড়াতালি দিয়ে পদ্ধতিটিকে বাঁচিয়ে রাখতে চাচ্ছেন। এ জন্যে তাঁরা নানা কৌশল অবলম্বন করছেন। তাঁরা সমাজবিজ্ঞানকে বৃহত্তর মানবসমাজ হতে বিচ্ছিন্ন করে নানা ভাগে বিভক্ত করেছেন। এখন কলকারখানা, ফ্যাক্টরি, সামাজিক প্রতিষ্ঠান, রাজনীতি ও রাজনৈতিক দল, বিভিন্ন সরকারি বিভাগ, বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান, সমাজের অভিজাত ও এলিট শ্রেণির সঙ্গে অন্যদের সম্পর্ক, জনমত, ব্যৈক্তিক ও সামাজিক সাইকোলজি, জনতার সাইকোলজি, যুদ্ধ ও শান্তি প্রভৃতি বিষয়ের জন্য আলাদা আলাদা সমাজবিজ্ঞানের সৃষ্টি হয়েছে। প্রতিটি বিভাগের জন্যে আলাদা বিশেষজ্ঞ আছেন। নতুন নতুন বিভাগ উপ-বিভাগ সৃষ্টি হচ্ছে এবং বিভাগীয় বিশেষজ্ঞের সংখ্যাও বৃদ্ধি পাচ্ছে। তাঁদের গবেষণা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা নিঃসন্দেহে মানবজাতির জ্ঞান বৃদ্ধি করছে। সমাজের নানা দিক নানা গ্রুপের পারস্পরিক সম্পর্ক বিষয়ে তথ্য জমা হচ্ছে। এগুলোর মূল্য আছে। কিন্তু পুঁজিবাদী পদ্ধতির সুযোগসুবিধা-ভোগী সমাজবিজ্ঞানীদের এসব মূল্যবান অনুসন্ধিৎসার মূল উৎপ্রেরণা আসছে status quo-স্থিতাবস্থা অর্থাৎ পুঁজিবাদী আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক পদ্ধতি বহাল রাখার সংগোপন ইচ্ছা থেকে। তাই আমি এটাকে জোড়াতালি দেওয়ার কাজ বলেছি। কিন্তু রিফু করে অথবা তালি দিয়ে পরিধেয় বস্ত্র খুব বেশি দিন ব্যবহার করা যায় না। সমাজতান্ত্রিক পদ্ধতিতে বিশ্বাসী সমাজবিজ্ঞানীদের মতে, স্থান ও অঞ্চল বিশেষের অগ্রসরতা অনগ্রসরতা, বৈশিষ্ট্য, ভাষার বিভিন্নতা প্রভৃতি সত্ত্বেও সামগ্রিক বিচারে মানবজাতির অগ্রযাত্রা অব্যাহত আছে এবং তারা উত্তরোত্তর উন্নত হতে উন্নততর জীবনযাপন প্রণালী আবিষ্কার ও কায়েম করে চলছে। সুতরাং সমাজবিজ্ঞানী কী কাজ করছেন সেটা আমাদের কাছে বড়ো কথা নয়। তাঁর কাজের লক্ষ্যাদর্শ কী সেটাই আমাদের কাছে বড়ো কথা।

এখন তত্ত্বীয় আলোচনা ছেড়ে আমাদের দেশের বাস্তব জীবনের প্রতি দৃষ্টিপাত করা যাক। প্রাচীন ভারতের আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক ইতিহাস সম্পর্কে ইদানীংকালে উন্নতমানের গবেষণাগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। এগুলোর মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য অধ্যাপক রামশরণ শর্মার *ভারতীয় সামন্ততন্ত্র* (প্রাক্-মুসলিম আমল) এবং অধ্যাপক ইরফান হাবিবের *মুঘল ভারতের কৃষি ব্যবস্থা (১৫৫৬-১৭০৭)* নামক গ্রন্থদ্বয়। এ ছাড়াও আরও বহু গ্রন্থ আছে। সেসব গ্রন্থ দেখার বা পাঠ করার সুযোগ হয়নি।

যে যুগে পশ্চিম ইউরোপের মানুষ জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা শুরু করল, বের হল দিগ্‌বিজয়ে তখন ভারত পিছিয়ে থাকল কেন, এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করেছেন ইদানীংকালের পণ্ডিত ব্যক্তিগণ। অনেকে স্বয়ম্ভর গ্রামীণ আর্থ-ব্যবস্থাকে দায়ী করেছেন। অনেকে চতুর্বর্ণাশ্রয়ী ভারতীয় সমাজব্যবস্থায় পুরুষানুক্রমিকভাবে পেশা নির্দিষ্ট এবং পণ্য বিনিময় প্রথা বহাল থাকার ফলে শ্রমিকের অনুসন্ধিৎসার অভাবের বিষয় উল্লেখ করেছেন। কেউ কেউ বলেছেন, পশ্চিম ভারতে প্রাচীনকাল হতেই ব্যাপক সেচব্যবস্থা বিদ্যমান থাকার ফলে চাষির সর্বনিম্ন প্রয়োজন পূরণ হত। অনেকে এটাকেও অনগ্রসরতার কারণ বলেছেন। ভারতে সামন্ততন্ত্র থাকলেও উচ্চবর্ণীয় সামন্তরা তাদের অধিকৃত ভূমি নিজস্ব 'খামার' হিসেবে ইউরোপীয় সামন্তদের মতো চাষবাস করত না। চাষি মোটামুটি পুরুষানুক্রমিকভাবে জমি চাষ করত, বেশি উৎপীড়িত হলে বা দুর্ভিক্ষ দেখা দিলে গ্রাম ছেড়ে অন্য গ্রামে পালিয়ে যেত, অবস্থা অনুকূল হলে আবার ফিরে আসত, এসব কারণও উল্লেখ করেছেন অনেকে। ইরফান হাবিব কতকগুলো কৃষকবিদ্রোহের উল্লেখ করে বলেছেন এগুলো সুনির্দিষ্ট দাবিদাওয়াভিত্তিক বিদ্রোহ ছিল না : ছিল বিশেষ কোনো একজন সামন্ত অথবা রাজ-কর্মচারীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ অথবা সামন্তদের পারস্পরিক বিরোধে কোনো একজনের পক্ষ সমর্থন; একালেও যেমন বাংলা দেশে চর দখলের জন্যে নিম্ন শ্রেণি হতেই উভয় পক্ষের লাঠিয়াল সংগৃহীত হয় তেমন ব্যাপার। অর্থাৎ কাজটা ছিল নেতিবাচক। বিদ্রোহীদের সর্দারই হয়তো নতুন জালেমরূপে দেখা দিত অথবা বিদ্রোহীরা লুটেরা গ্যাং রূপে দেশে লুঠতরাজ করে বেড়াত। স্মরণীয় যে, শিবাজির মৃত্যু এবং আহমদ শাহ আবদালির সেনাবাহিনীর কাছে পরাজিত হওয়ার পর মারাঠারা বর্গি দস্যুবাহিনীতে রূপান্তরিত হয়।

শক, হুন, গ্রিক আক্রমণকারীরা ভারতীয় সমাজজীবনে গৃহীত হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু একেশ্বরবাদী ধর্ম, সংস্কৃতি ও সভ্যতা নিয়ে আগত মুসলিম আক্রমণকারীরা ভারতে রাজ্য স্থাপনের পর উচ্চবর্ণীয় হিন্দুসমাজ স্বাতন্ত্র্য রক্ষার উদ্দেশ্যে কচ্ছপের মতো আপন মস্তিষ্ক গুটিয়ে নিল। ওরা মুসলিম রাজা-বাদশাহদের অধীনে চাকরি গ্রহণ করল, ফারসি ও শিখল, কিন্তু সামাজিক দূরত্ব রক্ষা করেই চলল। এটাকেও অনেকে ভারতের পশ্চাদপদতার একটি কারণরূপে চিহ্নিত করেন। প্রাচীন এবং মধ্যযুগের অন্য একটি বৈশিষ্ট্যও প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য। মুসলিম আগমন-পূর্ব ভারতে ব্রাহ্মণ্যধর্ম ছাড়াও জৈন এবং বৌদ্ধধর্মের আবির্ভাব ঘটে, এবং বৌদ্ধধর্ম বিশেষ প্রসার লাভ করে। কিন্তু কালক্রমে ভারতের মাটি হতে উদ্ভূত উক্ত দুটো ধর্মের সঙ্গে ব্রাহ্মণ্যধর্মের একটা সমঝোতা হয়ে যায়। শংকরাচার্যের অদ্বৈতবাদে ঈশ্বর নিরাকার নির্গুণ নির্বিকার। বৌদ্ধধর্মে ঈশ্বর অনুপস্থিত। নিরাকার নির্গুণ নির্বিকার ঈশ্বর থাকা না থাকার মধ্যে পার্থক্য খুঁজে পাওয়া মুশকিল। শংকরাচার্যের পরে একমাত্র পূর্ববাংলা ব্যতীত ভারতের অন্য কোথাও বৌদ্ধধর্মাবলম্বী থাকল না। অপর দিকে, শুধু এক ধর্ম নয় রাষ্ট্রীয় কার্যেও ভারতের সর্বত্র সংস্কৃত ভাষা বহাল হয়। তা সত্ত্বেও, ভারতে জাতিক ঐক্যচেতনা এমনকি ধর্মীয় ঐক্যবোধও জন্মাল না। যে-কোনো একটি ঐক্যচেতনা বিদ্যমান থাকলেও ভারতে মুসলিম রাজত্ব স্থাপন অসম্ভব হত। অপর দিকে, ইংরেজরা যখন এদেশ অধিকার করে তখনও ভারতে হিন্দুর সংখ্যা বেশি। কিন্তু মুসলমানের সংখ্যাও নিতান্ত কম নয়। রণজিৎ সিংহের নেতৃত্বে শিখরাও তখন শক্তিশালী। ওই সময়ে পুনরায় হিন্দু রাজত্ব স্থাপনের লক্ষে ঐক্যবদ্ধ হয়ে প্রতিরোধ করলে ইংরেজ রাজত্ব স্থাপিত হতে পারত না। এমনকি, মুসলিম সম্প্রদায় ঐক্যবদ্ধভাবে মোকাবিলা করলেও ইংরেজ আসতে পারত কি না সন্দেহ। কিন্তু কী আশ্চর্য, ওরকম কিছুই ঘটল না। শিখ শক্তিও হঠাৎ আলোর ঝলকানির মতো জ্বলে উঠে রণজিৎ সিংহের মৃত্যুর পরেই নাস্তানাবুদ হয়ে গেল। প্রতিরোধ না করে বরং হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে উভয় সম্প্রদায় নানা স্বার্থান্বেষী গ্রুপে বিভক্ত হয়ে গেল। ইংরেজদের ডেকে এনে মসনদে বসাবার লোকের

অভাব হল না ভারতে। ফউজিবিদ্রোহের সময়ও বিভেদ থেকেই গেল। পৃথিবীর ইতিহাসে এরকম দৃষ্টান্ত বিরল। বাংলার বুদ্ধিজীবী শ্রেণি ফউজি বিপ্লবকে বিদ্রূপ করে কাব্য রচনা করল।

নদীমাতৃক বাংলা দেশে সার্বিক জলসেচ ব্যবস্থা ছিল না, তার প্রয়োজনও ছিল না। সুতরাং এখানে কৃষক শ্রেণির নিষ্ক্রিয়তার কারণ রূপে সেচ-ব্যবস্থাকে উপস্থিত করা অযৌক্তিক। অপর দিকে, এ অঞ্চলের দুটি ঘটনাকে ব্যতিক্রমধর্মী বলা যায়। মাৎস্যন্যায় অর্থাৎ অরাজক ব্যবস্থা অবসানের লক্ষ্যে এতদঞ্চলের প্রকৃতি অর্থাৎ তৎকালীন মাতব্বরগণ একত্র হয়ে গোপাল নামক একজন মাতব্বরকে রাজ-চক্রবর্তীর সিংহাসন দান করে। নিঃসন্দেহে, এটি ছিল একটি ইতিবাচক গঠনমূলক কাজ। দ্বিতীয় ঘটনা, পাল আমলের কৈবর্ত সম্প্রদায় ঐক্যবদ্ধ হয়ে সম্রাটের সেনাবাহিনীকে পরাভূত এবং অস্থায়ী হলেও, স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করে। এটিও একটি ইতিবাচক কাজ ছিল। তা ছাড়াও, বাংলা ভাষাভাষী অঞ্চল আরও কিছু বৈশিষ্ট্যের দাবি করতে পারে। প্রথমত গোটা অঞ্চলে একটি ভাষার প্রচলন ছিল। দ্বিতীয়ত শতকরা ৯০/৯৫ জন মুসলমান ছিল নিম্নবর্গের হিন্দু এবং আদিবাসী সম্প্রদায় হতে ধর্মান্তরিত। তৃতীয়ত এবং সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য দিক হল বাংলা ভাষাভাষী অঞ্চলে ইসলাম ধর্মের প্রসার ঘটেছে সুফি দরবেশ শ্রেণির প্রচারকদের দ্বারা। সুফি দরবেশদের সঙ্গে হিন্দু সর্বেশ্বরবাদ (pantheism)-এর যথেষ্ট মিল আছে। মনসুরের আনাল হক (আমিই সত্য) ঘোষণার সঙ্গে হিন্দুর 'তুমিই সেই' (শ্বেতকেতুকে এ শিক্ষা দেওয়া হয়েছিল) তত্ত্বের মধ্যে সাদৃশ্য স্পষ্ট বলে মনে হয়। সুফিবাদের কয়েকটি তরিকা (আধ্যাত্মিক পথ) আছে। বাংলা ভাষাভাষী অঞ্চলে সর্বেশ্বরবাদী স্কুলের প্রাধান্য বিদ্যমান। এ শাখার সুফিবাদী ইসলামে আনুষ্ঠানিকতার ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয় না। শ্রীচৈতন্যের প্রেমভক্তিমূলক একেশ্বরবাদী সংস্কার আন্দোলন কতটা ইসলাম দ্বারা প্রভাবিত সে বিষয়ের আলোচনায় না গিয়েও এ কথা বলা চলে যে, সুফিবাদ এবং শ্রীচৈতন্যের ধর্মের সমন্বয়ে বাংলা দেশে একটি সমন্বিত লোকসংস্কৃতি গড়ে ওঠে। এই সমন্বিত লোকসংস্কৃতি যুগপৎ উভয় ধর্মের মৌলবাদ এবং এসটাব্লিশমেন্টের বিরুদ্ধে এক ধরনের বিদ্রোহ। এটাও বাংলা ভাষাভাষী অঞ্চলের একটি বৈশিষ্ট্য।

অষ্টাদশ শতাব্দীর ফকির-সন্ন্যাসী বিদ্রোহ এবং উনবিংশ শতাব্দীর নীলবিদ্রোহও হয় বাংলা দেশেই। প্রথমটি ছিল কোম্পানি সরকারের বিরুদ্ধে সশস্ত্র বিদ্রোহ। ওই বিদ্রোহের সঙ্গে বাংলার চাষি শ্রেণি সহযোগিতা করেছিল। লর্ড রিপন ১৮১০ খ্রিস্টাব্দে ফকির-সন্ন্যাসী বিদ্রোহ সম্বন্ধে লিখেছিলেন,

> They had established a terrorism a perfect as that which was the foundation of the French Republican power and in truth the Sardars or captains of the band were esteemed or even called the Hakeem or the ruling power, while the Government did not possess either authority or influence enough to obtain from the people the smallest aid towards their own protection. If a whole village was destroyed not a man was found to complain.

নীলবিদ্রোহ সম্বন্ধে বাংলা দেশের তৎকালীন লেফটেনান্ট গভর্নর স্যার জে. পি. গ্রান্ট স্টিমারযোগে সিরাজগঞ্জ সফর করে এসে লেখেন,

> On my return a few days afterwards along the same two rivers from dawn to dusk as I steamed along the two rivers for some 60 or so miles, both banks were literally lined with crowds or villagers claiming justice in this matter. Even the women of the villages on the banks were collected in groups by

themselves... It would be folly to suppose that such a display on the part of tens of thousands of people, men, women and children has no deep meaning. The organisation and capacity for combined and simultaneous action in the cause, which this remarkable demonstration over so large an extent of country proved, are subjects, worthy of much consideration.

এ বিদ্রোহ সম্বন্ধে লর্ড ক্যানিং সরকারি রিপোর্টে লেখেন, 'I assure you that for about a week it caused me more anxiety since the days of Delhi from that day I felt that a shot fired in anger or fear by one foolish planter might put every factory in lower Bengal in flames.'

ব্রিটিশ সরকারের রেকর্ডই প্রমাণ করছে যে, উক্ত দুটি বিদ্রোহ লুটেরাদের বিদ্রোহ ছিল না। ছিল সুসংগঠিত ইতিবাচক লক্ষ্যাদর্শগত বিদ্রোহ। উভয় বিদ্রোহ ছিল হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে উভয় ধর্মের উৎপীড়িত শোষিত জনসাধারণের ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম। উভয় সম্প্রদায়ের এলিট (elite) শ্রেণি নীল বিদ্রোহের বিপক্ষে ছিলেন। তাঁরা বিদ্রোহ দমনে ইংরেজের সঙ্গে সহযোগিতাও করেছিলেন। ইতিহাসে এসব সহযোগিতাকারীদের নাম আছে।

তাই উপরোউক্ত ঐতিহাসিক ঘটনাবলি প্রমাণ করছে যে, বাংলা দেশের সমাজজীবন উত্তর ভারতীয় সমাজজীবনের প্রতিচ্ছবি মাত্র ছিল না : বেশ-কিছু ব্যাপারে তার আলাদা বৈশিষ্ট্য ছিল। সর্বশেষ বৈশিষ্ট্য আমরা সালে দেখেছি।

ধর্ম বিশ্বাসে এক হোক বা বহু ধর্মাবলম্বী হোক, ভারতবর্ষ বহুকাল পূর্ব হতেই বহু জাতির বাসভূমি। ভারতবর্ষে সাম্রাজ্য স্থাপিত হয়েছে, কিন্তু জাতিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার আন্দোলন কখনও হয়নি। ১৯৪৭ সালে ব্রিটিশ সরকার দুটি বিবদমান এলিট রাজনৈতিক দলের কাছে আপসে ক্ষমতা হস্তান্তরিত করে। তার ফলে পাকিস্তান হল একটি খুদে সাম্রাজ্য। ভারত হল একটি বহুজাতিক রাষ্ট্র যাকে এ যুগের সাম্রাজ্য বলা যায়। ভারতের ইতিহাসে বাংলা দেশের বাঙালি জাতিই সর্বপ্রথম জাতিক-রাষ্ট্র স্থাপনের জন্যে সশস্ত্র বিদ্রোহ করে। বাংলাদেশই প্রকৃত অর্থে উপমহাদেশের প্রথম জাতিক-রাষ্ট্র।

সংক্ষেপে প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলোর উল্লেখ করলাম। আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, উক্ত প্রতিটি ঐতিহাসিক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনায় হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে সাধারণ খেটে-খাওয়া মানুষ ঐক্যবদ্ধ ভূমিকা পালন করেছে। তা সত্ত্বেও, বাঙালি জাতিকে বারবার শুরু থেকে শুরু করতে হচ্ছে কেন? কেন বেশ কিছু দূর এগিয়ে সমাজজীবন আবার পূর্বের স্থানে পশ্চাদ্ধাবন করে— যেখান থেকে যে বিন্দু থেকে তারা অভিযাত্রা শুরু করেছিল সেই বিন্দুতে ফিরে যায়? এ বিষয়ে যখন ভাবি তখন আমার সামান্য জ্ঞানবুদ্ধি নিয়ে তার সন্তোষজনক ব্যাখ্যা খুঁজে পাই না।

হিন্দুসমাজের উচ্চবর্ণীয় শ্রেণিটির মধ্যে ইংরেজ আমলের আগেও বিদ্যাচর্চা ছিল। বাংলা দেশে অভিজাত (আশরাফ) শ্রেণির মুসলমানের সংখ্যা ছিল খুবই কম, যাঁরা ছিলেন তাঁদের মধ্যেও অধিকাংশ ছিলেন বহিরাগত অবাঙালি। বাংলা তাঁদের মাতৃভাষা ছিল না, বাংলার চর্চাও তাঁরা করতেন না। সুতরাং জাতিক চেতনা তাঁদের মধ্যে না থাকাই স্বাভাবিক। তা ছাড়া, ইংরেজি ভাষার প্রতি তারা ছিল পরাঙ্মুখ। সংখ্যার বিচারেও উচ্চবর্ণীয় হিন্দু শ্রেণিটি ছিল বেশ বড়ো। এই শ্রেণিটি সকলের আগে ইংরেজি ভাষা শিখতে শুরু করে। ইংরেজি ভাষার মাধ্যমে ওরা শিল্পবিপ্লবোত্তর ইউরোপীয় জ্ঞান-বিজ্ঞান, সমাজ-নীতি, রাজনীতি, রাষ্ট্রবিজ্ঞান প্রভৃতির সঙ্গে পরিচিত হয়। ইউরোপে তখন জাতিক রাষ্ট্র

গঠন সমাপ্ত প্রায়। সুতরাং ইংরেজিশিক্ষিত উচ্চবর্ণীয় হিন্দুসমাজ এ কালে জাতি বলতে কী বোঝায় তা জানত, বুঝত। বাঙালি যে একটি আলাদা জাতি সে বোধও অনেকের মধ্যে ছিল। বাংলা সাহিত্যে তার প্রমাণ আছে। কিন্তু তাঁরা যখন সাহিত্যে রাজনীতি এবং সামাজিক জীবন আনলেন তখন দেখা গেল, হিন্দু ধর্মাবলম্বীদেরই শুধু বাঙালি জাতিরূপে চিহ্নিত করা হচ্ছে। অপর দিকে, নিম্নবর্ণীয় হিন্দু ও আদিবাসী শ্রেণি হতে ধর্মান্তরিত বিপুল সংখ্যক মুসলমান এদের সৃষ্ট সাহিত্যের বাইরে রয়ে গেল। সমাজে তাদের অবস্থান রইল, কিন্তু তাদের সামাজিক গুরুত্ব উপলব্ধ হল না।

উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হতে বাংলা দেশে বসবাসকারী আশরাফ শ্রেণির অবাঙালি মুসলমানগণ ইউরোপীয় শিক্ষা গ্রহণ শুরু করে। স্যার সৈয়দ আহমদ আলিগড়ে মুসলমানদের জন্য আলাদা কলেজ স্থাপন করলে অবস্থাপন্ন ঘরের ছেলেরা উচ্চ শিক্ষার জন্যে সেখানে যেতে থাকে। অপর দিকে, বাংলার নিরক্ষর চাষি মুসলমানদের হেদায়েত অর্থাৎ ধর্মীয় শিক্ষাদানের জন্যে আসতে শুরু করে বিহার, যুক্ত প্রদেশ প্রভৃতি স্থানের উর্দুভাষী মুসলিম প্রচারক। অর্থাৎ ১৭৫৭ সাল হতে ১৯০০ সাল এই দেড়শো বছর সময়ের মধ্যে কয়েক কোটি খাঁটি বাঙালি মুসলমানের আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক, এমনকি ধর্মীয় নেতৃত্বও চলে যায় অবাঙালি অথবা বাঙালিত্ব বর্জনকারী মুসলমানদের হাতে। সাধারণ মুসলমান সমাজের মস্তিষ্ক শোধন হতে লাগল : অবিরত একতরফা প্রচার মানুষকে প্রতিবর্তী ক্রিয়ার শিকার করে। স্মরণীয় যে, জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চায় পৃথিবীর অন্যতম শীর্ষস্থানীয় জার্মান জাতিকেও হিটলার-গোয়েবলস অবিরত মিথ্যা প্রচার দ্বারা বিভ্রান্ত করতে সক্ষম হয়। জার্মান জাতি হয়ে পড়ে হিটলারের গিনিপিগ। এখনও তারা তা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হতে পারেনি। বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশক হতে বাঙালি মুসলমান সমাজে ইউরোপীয় শিক্ষার প্রসার ঘটতে থাকলেও তারা অবাঙালি নেতৃত্বের প্রভাবমুক্ত হতে পারেনি।

এ হল বিষয়টির এক দিক। অপর দিকে ইতিপূর্বে আমি যে 'বাঙালির সমন্বিত লোকসংস্কৃতি'র কথা বলেছি তার মধ্যেও দুর্বলতা ছিল। লোকসংস্কৃতিতে কোনো বিশেষ ধর্মের মৌলবাদ স্থান পায়নি ঠিক। কিন্তু ইহজগতে শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থানের প্রয়োজনে উদ্ভূত এই লোকসংস্কৃতিতে প্রেম-ভক্তিবাদী উপাদানের প্রাধান্য ছিল। গুরু এবং পিরেরা ইহলোকে অর্থবিত্ত, সুস্বাস্থ্য এবং পরলোকে বেহেশতের দ্বার খুলে দেওয়ার ক্ষমতা রাখেন— এই ছিল ব্যাপক বিশ্বাস। গুরু ও পিরেরা এ আস্থা জনমনে দৃঢ় করার জন্যে যা-কিছু করা প্রয়োজন তা করতেন, এখনও করছেন। তার ফলে সাধারণ মানুষের মনে গণশক্তির চেয়ে ব্যক্তিক শক্তির উপর অধিক আস্থা জন্মে। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এটা বিস্তার লাভ করে। বিগত সত্তর আশি বছরের রাজনীতিতে আমরা ব্যক্তিক নেতৃত্বের প্রাধান্য দেখে আসছি।

অন্য একটি দিক আছে : নগর-সংস্কৃতি বনাম লোকসংস্কৃতি। এ কথা সত্য যে, নগর-সংস্কৃতি ও সভ্যতাই শ্রেষ্ঠ। এবং নগরবাসীরাই দেশ পরিচালনা করে। বাংলা দেশে কোনো আমলেই স্থায়ী বড়ো নগর গড়ে ওঠেনি— পূর্ব বাংলায় এক ঢাকা ব্যতীত অন্য কোনো উল্লেখযোগ্য নগর ছিল না। সুতরাং নগর-সংস্কৃতি ও সভ্যতার সঙ্গে এদেশবাসী অপরিচিত ছিল। ছোটো ছোটো তথাকথিত শহরে যাঁরা বাস করতেন তাঁদের আয়ের প্রধান উৎস ছিল পল্লিগ্রাম, মানমর্যাদার সঙ্গে স্থাবর সম্পত্তির সম্পর্ক ছিল। বাংলা দেশে কলকাতাই প্রকৃত অর্থে প্রথম বড়ো শহর এবং তিন চার শতাব্দীকালের মধ্যে সেখানে নগর-সংস্কৃতি ও সভ্যতা গড়ে ওঠে। কিন্তু তার মধ্যেও দুর্বলতা ছিল। কলকাতাকেন্দ্রিক সংস্কৃতি ও সভ্যতার মধ্যে লোকায়ত উপাদানের চেয়ে ধর্ম-সাম্প্রদায়িক উপাদান ছিল বেশি। যানবাহনের উন্নতি, সংবাদপত্রের উদ্ভব ও প্রচারসংখ্যা বৃদ্ধি এবং অন্যান্য প্রচারমাধ্যমের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে কলকাতাকেন্দ্রিক নগর-সংস্কৃতি ও সভ্যতার সবগুলো উপাদান পল্লিগ্রামে প্রবেশ করতে থাকে। তার

ফলে বাঙালির সমন্বিত লোকসংস্কৃতির অবক্ষয় দু-দিক থেকে শুরু হয়। প্রথমত পল্লিগ্রামের শ্রেণিবৈষম্য সাম্প্রদায়িকতায় রূপান্তরিত হতে থাকে। দ্বিতীয়ত নগর-সংস্কৃতি ও সভ্যতার যেগুলো খারাপ দিক সেগুলোও গ্রামে প্রবেশ করে।

এ শতাব্দীর শুরুতে বাংলা দেশে ব্রিটিশ-বিরোধী আন্দোলন শুরু হয়। তার মধ্যে মুসলমান শরিক হয়নি বললেই চলে। ১৯১৯-২১ সালের আন্দোলনে ইহজাগতিক লক্ষ্যাদর্শের সঙ্গে ধর্ম যুক্ত হয়। মহাত্মা গান্ধির লক্ষ্যাদর্শ ছিল রামরাজত্ব স্থাপন। মুসলমান চাইল তুর্কি খেলাফতের পুনরুদ্ধার। ফলে সে সময়ের গণঐক্য অল্পকালের মধ্যেই ভেঙে পড়ে। ১৯৩০-৩৩ সালের পূর্ণ স্বাধীনতা আন্দোলনেও উনিশ-একুশের ব্যাপক ঐক্য দেখা দেয়নি। ১৯৩৬ সালের মধ্যে ঐক্য সম্পূর্ণরূপে ভেঙে যায়। তার পর দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ ১৯৪৩-এর ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ, ১৯৪৬-৪৭-এর ভারতব্যাপী মারাত্মক সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, লাখ লাখ লোকের প্রাণহানি এবং কোটি কোটি মানুষের ভিটেমাটিহীন উদ্‌বাস্তু হওয়ার অভিজ্ঞতার মধ্যে ভারত-বিভাগ এবং বঙ্গভূমির অঙ্গচ্ছেদ ঘটে। এই অভিজ্ঞতার মধ্যে সমাজ হতে মানবিক গুণাবলি (ethics and morality) বিদায় গ্রহণ করতে থাকে। উচ্চবিত্ত ও মধ্যবিত্ত শ্রেণি সম্প্রসারিত হয়। এই দুটি শ্রেণির সমন্বয়ে যে এলিট (elite) শ্রেণি তৈরি হয় তার মধ্যে অভ্যন্তরীণ দলাদলি ছিল। কিন্তু একটি বিষয়ে ঐক্য ছিল, সেটি হচ্ছে এদের বেশির ভাগ ছিলেন মূলত unscrupulous opportunist অর্থাৎ নীতিজ্ঞানহীন সুবিধাবাদী। অপর দিকে অনেক ক্ষেত্রে ধর্মতন্ত্র মোনাফিকদের মুখোশে পরিণত হওয়ার ফলে ধর্মীয় নীতিজ্ঞানও সমাজ হতে লোপ পেতে থাকে।

১৯৭১ সালে মি. জিন্নাহর ধর্ম-সাম্প্রদায়িক দ্বিজাতিতত্ত্ব পাকিস্তান প্রতিষ্ঠায় প্রধান ভূমিকা পালনকারী পূর্ব পাকিস্তানবাসীর ঘাড়েগর্দানে চোখেমুখে বুকে বুমেরাং হয়ে পতিত হতে থাকে। তিরিশ লাখ বাঙালি হত্যা, ব্যাপকভাবে নারী নির্যাতন, লুঠপাট, বাড়িঘর ও শস্যক্ষেত্র ভস্মীভূত হওয়ার মধ্য দিয়ে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী প্রমাণ করে যে, ধর্মের স্লোগান ছিল প্রকৃতপক্ষে পূর্ববঙ্গকে স্থায়ী কলোনিতে পরিণত করার হাতিয়ার ও কৌশল মাত্র। ১৯৪৮-৫২ সালে বাংলা ভাষা ও বাঙালি সংস্কৃতির উপর হামলা ছিল তারই প্রস্তুতি।

১৯৭১ সালের যুদ্ধের ফল উপমহাদেশের প্রথম ভাষাভিত্তিক ধর্ম-নিরপেক্ষ স্বাধীন জাতিক রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা। নিঃসন্দেহে, এটি গর্বের বিষয় এবং উপমহাদেশের ইতিহাসে একটি যুগ পরিবর্তনকারী ঘটনা। কিন্তু তার একটি অপর পিঠ আছে। বাংলার সাধারণ মানুষ আর কখনও যুদ্ধক্ষেত্রের মধ্যে বসবাস করেনি। গোটা পূর্ববঙ্গ যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত হল। নিরক্ষর সাধারণ মানুষ সাদা চোখেই দেখতে পায় যে, ন্যায়-অন্যায়, ভালোমন্দ, পাপপুণ্য প্রভৃতি নামে পরিচিত নীতিবোধ স্থায়ী কোনো বস্তু নয়। শাসক শ্রেণির মর্জিমতো তা পরিবর্তিত হয়। অর্থাৎ ন-মাস সময়ের মধ্যে তিরিশ লাখ মানুষের প্রচলিত ধর্মীয় ও মানবিক মূল্যবোধও সমাধি লাভ করে।

একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে উপমহাদেশের ইতিহাসে একটি ব্যতিক্রমধর্মী অধ্যায় রচিত হল। অথচ সাড়ে তিন বছর অতিবাহিত হতে না হতেই দেখা গেল অ্যাবাউট টার্ন। স্বাধীনতা সংগ্রামের অবিসংবাদিত নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানকে সপরিবারে হত্যা করে যাঁরা সিংহাসন দখল করলেন তাঁরা ধর্ম-নিরপেক্ষ বাঙালি জাতীয়তাবাদের চেতনাটি সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত সংবিধান হতে মুছে ফেললেন। মুছে ফেললেন রাষ্ট্রীয় চার লক্ষ্যাদর্শ। আশ্চর্যের বিষয়, গৃহযুদ্ধ হল না। ধর্মনিরপেক্ষ জাতিক চেতনার উৎপ্রেরণাবশে যে বৃহৎ রাজনৈতিক দলটি স্বাধীনতা যুদ্ধের নেতৃত্ব দিয়েছিল সেটিও এই অ্যাবাউট টার্ন

নীরবে মেনে নিল। পৃথিবীর ইতিহাসে এরকম ঘটনা বিরল। গলদটা তো সমাজের মধ্যেই ছিল। কিন্তু কোন্ স্তরে? কোন্ শ্রেণির মধ্যে? ১৯৭৫ সালের পর ১৩ বছর চলছে। এখন তো মনে হচ্ছে, আমরা বিশের দশকে ফিরে গেছি। কাজি নজরুল ইসলাম 'বিদ্রোহী' কবিতা লিখেছিলেন। তাকে 'কাফের' খেতাব দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু তিনি প্রাণে বেঁচে গিয়েছিলেন। দ্বিতীয় কাজি নজরুল ইসলামের আবির্ভাব হলে প্রাণে বাঁচবেন কি না সন্দেহ। ১৯৪০-৪৭ সালে ধর্ম-সাম্প্রদায়িক রাজনীতির জজবার চেয়ে আজকের জজবা কম ভয়াবহ নয়। এক দিকে ধর্মব্যবসায়ী রাজনৈতিক দলগুলো ধর্মীয় মৌলবাদের পক্ষে জনমত আকৃষ্ট করার চেষ্টা করছে। এক্ষেত্রে তাদের সাফল্যও উপেক্ষণীয় নয়। শিক্ষিত ছাত্র-যুবক, বুদ্ধিজীবী, সাংবাদিক, সরকারি কর্মচারী, বিভিন্ন বাহিনীর লোক, এমনকি অধ্যাপক শ্রেণি হতেও ওরা লোক সংগ্রহ করতে সক্ষম হচ্ছে। ইতিমধ্যেই ওরা হিটলারের অনুকরণে একটু বেশ বড়ো ধরনের ফ্যাসিস্ট-ঝটিকা বাহিনী (Storm Troops) গঠন করেছে। এই ঝটিকা বাহিনীও শিক্ষিত ছাত্র যুবকদের নিয়ে গঠিত। ওরা ধর্ম রক্ষার নামে স্থানে স্থানে ভিন্ন রাজনৈতিক মতাবলম্বী এমনকি সাধারণ মানুষের উপরও আক্রমণ শুরু করেছে। আলামত ভালো নয়। কিন্তু বাঙালি সমাজেই এর বীজ উপ্ত না থাকলে শুধু বিদেশি অর্থে এ ধরনের প্রাইভেট বাহিনী তৈরি করা যায় না। এবং কারা করছে? করছে যারা ১৯৭১ সালের গণহত্যায় পাকিস্তানি বাহিনীর সঙ্গে সক্রিয় সহযোগিতা করেছিল যারা এখন পর্যন্ত বাংলাদেশের স্বাধীনতা স্বীকার করে নেয়নি তারা। ব্যারামটা কোথায়? সমাজের বিভিন্ন শ্রেণির প্রবণতা এবং পারস্পরিক সম্পর্ক সঠিকভাবে নির্ণয় করতে পারলে এ ব্যাধির উৎসস্থলও আবিষ্কার করা সম্ভব। এ কাজ সমাজবিজ্ঞানীর।

আমি কখনও কখনও একটি বিষয় ভাবি। খ্রিস্টীয়, বৌদ্ধ প্রভৃতি ধর্মের মতো ইসলামও একটি বিশ্বধর্ম। উদ্ভবস্থল যাই হোক, বিশ্ব ধর্মাবলম্বীরা পৃথিবীর সর্বত্র কমবেশি সংখ্যায় বসবাস করছে। কালক্রমে উদ্ভবস্থল গৌণ হয়ে গেছে। ধর্ম হয়ে গেছে যার যার দেশীয় ধর্ম : জাতি ও ধর্মের মধ্যে বিভেদ নেই। জাতি ধর্ম এবং ভাষা মিলে এক অভিন্ন ঐক্য স্থাপিত হয়েছে। ভেদাভেদ আছে শ্রেণিতে শ্রেণিতে। মনে হয়, বাংলাদেশের মুসলিম সমাজে এখনও জাতি ধর্ম ও ভাষার সমন্বয় সাধিত হয়নি। পশ্চিম হতে ধর্ম এসেছে। সুতরাং খাঁটি ইসলাম এবং খাঁটি মুসলমান বাংলাদেশের পশ্চিমে আছে, আরবি ভাষাও পশ্চিমি ভাষা, অতএব পবিত্র। এরকম একটা ধারণা বোধ করি এখনও মুসলিম সমাজে আছে। আগেই উল্লেখ করেছি, উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হতে বর্তমান শতাব্দীর দ্বিতীয় দশক পর্যন্ত বাঙালি মুসলিম সমাজের নেতৃত্ব দিয়েছে উর্দুভাষী অবাঙালি মুসলমান। মাঝখানে দশ-পনেরো বছর বাঙালি মুসলমান কিছুটা নড়াচড়া করেছে। ১৯৩৬ সাল হতে ১৯৫২ সাল পর্যন্ত সময়টার মূল নেতৃত্ব পুনরায় পশ্চিম ভারতীয় মুসলমানদের হাতে চলে যায়। ১৯৫৪ সালে কিছুদিনের জন্যে বাঙালি মুসলমান নেতৃত্ব দেয়। ১৯৫৮ সাল হতে ১৯৬৮ সাল পর্যন্ত সময়টায় বাঙালি মুসলমান সমাজ পুনরায় পশ্চিমি নেতৃত্বাধীন হয়ে পড়ে। ১৯৬৯ সাল হতে ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট পর্যন্ত বাংলাদেশ পুনরায় বাঙালির নেতৃত্বাধীন হয়। ১৫ আগস্টের পর হতে পুনরায় পশ্চাদ্ধাবন শুরু হয়েছে। এখন বাংলাদেশ নামেই স্বাধীন। তার অর্থনীতি, সমাজনীতি, রাজনীতি প্রভৃতি সবকিছুই মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ এবং তার সহযোগী বন্ধু মধ্যপ্রাচ্যের কোনো কোনো আরবি ভাষাভাষী রাষ্ট্রের নির্দেশাধীন।

১৯৭১ সালের যুদ্ধটা কি তা হলে নিছক আত্মরক্ষার ব্যাপার ছিল? এরকম সিদ্ধান্তে আসা ঠিক হবে না। তার মধ্যে ইতিবাচক জাতীয় চেতনাও ছিল। কিন্তু ধর্ম, ভাষা এবং জাতীয়তাবোধের যে সমন্বিত চেতনা অ্যাবাউট টার্ন রোধ করতে পারে সেরূপ ইস্পাতদৃঢ় শক্তি তার মধ্যে ছিল না।

তা ছাড়াও অন্য একটি বিষয় সম্বন্ধে ভাবতে হয়। ১৯৩৬ সাল পর্যন্ত সময়ের মধ্যে শিক্ষিত

মধ্যবিত্ত বাঙালি মুসলিম শ্রেণির যতটুকু বিকাশ হয়েছিল সেটাকে আমরা স্বাভাবিক বিকাশ বলতে পারি। ১৯৩৭ সাল হতে ১৯৭১ পর্যন্ত সময়কালের মধ্যে যে সম্প্রসারণ ঘটে তার ভিত্তিমূলে রয়েছে ব্যাপক দুর্নীতি, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামা, খুনোখুনি, লুঠপাট প্রভৃতি যাবতীয় অনাচার। স্বাধীনতা লাভের পরেও উক্ত অনাচার অব্যাহত গতিতে চলেছে। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টের পরে তা আরও ব্যাপকতা লাভ করেছে। সুতরাং ড. নাজমুল করিমের *Changing Society in India and Pakistan* এবং ড. রঙ্গলাল সেন-এর *Political Elites in Bangladesh* গ্রন্থদ্বয়ে আমরা বাঙালি মুসলিম মধ্যবিত্ত-উচ্চবিত্ত শ্রেণির সমন্বয়ে গঠিত যে রাজনৈতিক এলিট শ্রেণিটি দেখছি তার বিকাশ কালটায় কোনো লক্ষ্যাদর্শগত ভিতভূমি ছিল না বললে সম্ভবত খুব একটা বড়ো রকমের ভুল করা হবে না। তাই আমরা শুধু বারবার শুরু হতে শুরু করার বিস্ময়কর ঘটনাবলি দেখছি না, আরও একটি কৌতুকপ্রদ দিক দেখছি। শহর বন্দর ও পল্লিগ্রাম সর্বত্রই পাশাপাশি অবস্থান করছে নৈতিক অরাজকতা, নির্লজ্জ 'vulgar materialism' প্রভৃতি এবং ধর্মীয় মৌলবাদ প্রতিষ্ঠার জজবা। বাংলাদেশের সমাজজীবনে এই যে 'কন্ট্রাডিকশন' চলছে তার মূলে কি আরও কোনো কারণ আছে? ইবনে খালদুনের *আল মুকাদ্দিমা*-র একটি পরিচ্ছেদের শিরোনাম 'বিজিত সর্বদাই বিজয়ীর বৈশিষ্ট্য, পরিচ্ছদ, পেশা এবং অন্যান্য যাবতীয় অবস্থা এবং অভ্যাস-এর অনুকরণ করে'। ইবনে খালদুন উক্ত পরিচ্ছেদের শিরোনাম ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছেন,

> ইহার কারণ এই যে জীবাত্মা সর্বদাই তাহার উপর প্রাধান্য বিস্তারকারীর পরিপূর্ণতা সম্পর্কে আস্থাবান এবং তাহার অনুসরণ করিয়া থাকে। এ ব্যাপারে পূর্ণতার গুণাবলির প্রতি তাহার মধ্যে যে শ্রদ্ধা সমীহতার ভাব আছে উহার অথবা সে ভুল করিয়া বিজয়ীর প্রতি তাহার আনুগত্যকে স্বাভাবিক প্রাধান্য বিস্তারের ফল নহে, বরং পূর্ণতর গুণের আকর্ষণ— এইরূপ ধারণার বশবর্তী হয়। এই শেষোক্ত ভুলটি যখন সে করিয়া বসে ও বিজয়ীর সংস্পর্শে আসে তখন এটা তার বিশ্বাসে পরিণত হইয়া বিজয়ীর সমস্ত মত ও পথ গ্রহণে তাকে উদ্বুদ্ধ করে। ইহাই অনুসরণ নামে খ্যাত। অথবা এমনও হইতে পারে, আল্লাহ্ই ভালো জানেন, সে দেখিতে পায়, বিজয়ীর প্রাধান্য বিস্তার কোনো গোত্রপ্রীতি বা সামরিক শক্তির ফল নহে, বরং উহা একান্তই তাহার চারিত্রিক গুণ ও ধর্মীয় বিশ্বাসাদির কারণে সংঘটিত হইয়াছে, তখন সে আবারও ভুল করে এবং এই ভুল তাহার পূর্বোক্ত প্রথম ধারণাকে অধিকতর মজবুত করে। পাঠক সম্ভবত এই কারণেই দেখিতে পান যে, বিজিত সর্বদাই বিজয়ীর অনুকরণ করিয়া থাকে... ইহা সন্তান-সন্ততির মধ্যেও সংক্রমিত হয়, কেননা তাহারা পিতামাতাকেই অনুসরণ করে।

যে রাজনৈতিক এলিট (elite) শ্রেণিটি এখন বাংলাদেশ শাসন করছে অথবা রাজনৈতিক নেতৃত্ব দিচ্ছে তার উদ্ভব ব্যাপক দুর্নীতির মধ্য হতে। তার মস্তিষ্কে উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত বহুকালের দাসত্ববোধ বিদ্যমান। দেশে বহু সংখ্যক অর্থনৈতিক শ্রেণি আছে : শ্রমিকের সংখ্যা সম্ভবত পঁচিশ-ত্রিশ লাখ। আছে দেড় কোটি নিঃস্ব খেতমজুর এবং অগণিত প্রান্তিক চাষি পরিবার। কেরানি, ছোটো ব্যবসায়ী এবং অন্যান্য পেশায় নিযুক্তদের নিয়ে গঠিত শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণিও আছে। আছে অধ্যাপক, শিক্ষক, উকিল, ডাক্তার, ব্যারিস্টার, সাংবাদিক, সাহিত্যিকদের সমন্বয়ে গঠিত বুদ্ধিজীবী শ্রেণিও।

তবু আমরা বারবার একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি দেখতে পাচ্ছি। ঐক্যবদ্ধ জনসাধারণ যখন দুর্বার গতিতে এগিয়ে গেছে ব্যর্থ প্রমাণিত প্রচলিত আর্থ-সামাজিক কাঠামো ভেঙে নতুন কাঠামো প্রতিষ্ঠা করতে তখন নেতৃত্বদানকারী রাজনৈতিক এলিট শ্রেণি তাদেরকে নানা কৌশলে থামিয়ে দিয়েছে। এটা

বিশ্বাসঘাতকতার নামান্তর। কিন্তু বিশ্বাসঘাতকতা করে পার পাওয়ার শক্তি তারা পাচ্ছে কোথায়? তা হলে কি এ সিদ্ধান্তেই আসতে হয় না যে, শোষিত নিপীড়িত জনগণের শ্রেণি-চেতনা এখনও দুর্বল। শ্রেণিত্যাগী বুদ্ধিজীবী শ্রেণির উদ্ভব এখনও হয়নি। অথবা হলেও জনগণকে নেতৃত্ব দেওয়ার মতো শক্তি এখনও তারা অর্জন করতে পারেনি। তা ছাড়া, সকল শ্রেণির প্রতিবিপ্লবী যখন ঐক্যবদ্ধ তখন তারা বিভক্ত। সময় সময় যে গণবিদ্রোহ দেখা যায় সেটা কি উত্তেজনার মুহূর্তে Crowd-এর আচরণ? এ প্রশ্নটিও মনে জাগে। বাংলাদেশে এখন অসংখ্য রাজনৈতিক দল। কিন্তু যত দলেই বিভক্ত দেখছি না কেন, বাংলাদেশের রাজনৈতিক এলিট শ্রেণির অভ্যন্তরীণ বিরোধ প্রকৃতপক্ষে লক্ষ্যাদর্শগত বিরোধ নয়। বিরোধটা ক্ষমতা ও সুবিধা ভাগাভাগি সংক্রান্ত। ব্যতিক্রম আছে অবশ্যই। কিন্তু সেসব দল এখনও দেশকে নেতৃত্ব দেওয়ার মতো শক্তি অর্জন করতে পারেনি।

জনকল্যাণের বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে বিশ্বাসী বাংলাদেশের সমাজবিজ্ঞানীগণ বাঙালি জাতিকে বারবার শুরু হতে শুরু করার পঙ্কাবর্ত হতে উদ্ধার করার দিক নির্দেশ করতে সক্ষম হবেন—এই আশাবাদ নিয়ে শেষ করছি

জয় বাংলা।
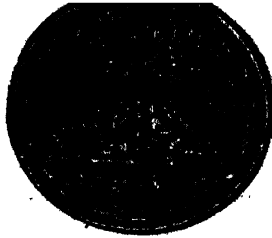
যুক্তি-জিজ্ঞাসা ও বাঙালি

জীবনানন্দ দাশ

এদেশে ইংরেজ শাসন যখন সত্যিই টিকে গেল, শিক্ষিত মানুষদের আস্তে আস্তে সুযোগও ঘটল চিন্তা-পদ্ধতিতে যুক্তির ব্যবহার ফিরে পাওয়ার (রাষ্ট্রিক ব্যাপারে শুধু নয়, ইংরেজ আমলে নানা বিষয়ে মন সজাগ হওয়ার অবসর পেয়েছে), তখন রামমোহন সমাজ সংসার ধর্ম শিক্ষা ইত্যাদিতে যে নতুন ভারতবর্ষের ধারণা (ও স্থাপনা) করছিলেন, তাঁর পরে সে কাজ খুব বেশি এগিয়েছে বলে মনে হয় না। আজকের ভারতবর্ষকে দেখার সুযোগ যদি তিনি পেতেন, তাহলে এর প্রায় কোনো চেহারাতেই হয়তো তৃপ্ত হতে পারতেন না; আবার নতুন করে যুক্তি দিয়ে সংস্কার (রামমোহন ক্ষালন করে যাওয়ার পর আবার ঢের নতুন-পুরোনো সংস্কার এসে জমেছে দেশে) ও সত্য ও কল্যাণের প্রয়োগে দুর্বলতা দূর করবার প্রয়োজন বোধ করতেন। রামমোহন চলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই যে আমাদের দেশে যাথার্থ্যের সন্ধান ঘুচে গিয়েছিল তা নয়। দ্বিতীয় বা তৃতীয় রামমোহন কেউ জন্মায়নি; জন্মাবে কি না সময়ই শুধু বলতে পারে। নতুন ভারতবর্ষে তিনি যে ধরনের মনের প্রথম ও (সবচেয়ে) ব্যাপক ব্যবহার করে গিয়েছিলেন তাঁর মৃত্যুর পরে দেশের কোথাও কোথাও মানুষ ও সমাজ সে দিক দিয়ে চলতে চেষ্টা করেছিল, আজও করছে, কিন্তু দোষ ও অন্ধতার যে ঢের সংস্কার আশা করা গিয়েছিল সেটা কাজে বিশেষ-কিছু হল না।

এ কথা বলা অবশ্য ঠিক নয় যে আমাদের দেশ অন্ধতায় ডুবে আছে। ভারতবর্ষের কথা ছেড়ে দিয়ে এ প্রবন্ধে আমি বাংলা দেশ সম্বন্ধে দু চারটে কথা বলব। বাংলাকে ভারতবর্ষের মুখপাত্র হিসেবে ধরবার চেষ্টা করলে ভারতবর্ষকে ঠিক বোঝা যাবে না হয়তো, বাংলাকেও না, তবে দুয়েরই মোটামুটি স্বরূপ, আমার মনে হয়, অনেকটা পরিষ্কারভাবে চোখে পড়বে। তবুও বাংলাকে আমি এ প্রবন্ধে ভারতের মুখপাত্র (বাংলা তা নয় আজ আর) হিসেবে নয়, তার নিজের তাৎপর্যে একটু-আধটু বিশ্লেষণ করে দেখবার চেষ্টা করেছি।

বিবেকানন্দ বলেছিলেন, 'আমাদের উন্নতির পথে কতকগুলি বিঘ্ন আছে তন্মধ্যে "আমরাই জগতের একমাত্র শ্রেষ্ঠ জাতি"—এই গোঁড়ামি একটি। ভারতকে আমি প্রাণের সহিত ভালোবাসিয়া থাকি, স্বদেশের কল্যাণের জন্য আমি সদাই বদ্ধপরিকর, আমাদের প্রাচীন পূর্বপুরুষগণকে আমি বিশেষ ভক্তিশ্রদ্ধা করিয়া থাকি; তথাপি জগৎ হইতে যে আমাদিগকে অনেক জিনিস শিখিতে হইবে, এ ধারণা ত্যাগ করিতে আমি অক্ষম। আমাদিগকে শিক্ষা গ্রহণের জন্য সকলের পদতলে বসিতে সর্বদা প্রস্তুত থাকিতে হইবে, কারণ, এটি বিশেষভাবে লক্ষ করিও যে সকলেই আমাদিগকে মহৎ শিক্ষাদান করিতে পারে।' সত্য কথা। মনকে সতর্ক ও উন্নত না রাখলে সংস্কৃতি শিক্ষা জীবনের সব ক্ষেত্রেই জাতীয়তাবাদের ফল খারাপ হতে পারে—বিবেকানন্দ যে অর্থে বলেছিলেন তাছাড়া আরও নানা অর্থে।

পৃথিবী সম্বন্ধে রামমোহন ভাবতেন—এবং ভারতবর্ষ সম্বন্ধেও। কিন্তু ভারতবর্ষ ও বাংলা দেশে তাঁর অবস্থিতি ছিল; তাঁর যুক্তি ও কর্মের পুরস্কার আমরাই সবচেয়ে বেশি পেয়েছি, যদিও সে পুরস্কারের তেমন কোনো সদ্‌ব্যবহার আজ পর্যন্ত করতে পারা যায়নি। এ অনুচ্ছেদের গোড়ার দিকে যা বলা হল তা থেকে মনে হতে পারে যে, রামমোহন অতিরিক্ত জাতীয়তাবাদ পছন্দ করতেন না, তাঁর দেশবাসী বেশি জাতীয়তাবাদী হয়ে পড়েছে। সাক্ষ্যপ্রমাণ থেকে তাই-ই মনে হয়। দেশপ্রেমেরও যথেষ্ট অপব্যবহার আছে। রামমোহন মানুষকেই প্রধানত ভালোবাসতেন ও শ্রদ্ধা করতেন বলে দেশের কল্যাণ চাইতেন। তিনি অধীন ভারতবর্ষে ছিলেন, স্বাধীন করার একান্ত দরকার বোধ করেছিলেন, কিন্তু আজকের স্বাধীন ভারতবর্ষে বা বাংলায় যদি জাতীয়তাবাদ বেশি ঢুকে থাকে তাহলে যে স্থূল চিন্তা-চেতনার ভিতর দিয়ে ঢুকে পড়েছে রামমোহনের কাছে তা কোনো সমর্থন পেত না। কিন্তু আমেরিকা ব্রিটেন সোভিয়েত রাশিয়া—পৃথিবীর সব রাষ্ট্রই আজ জাতীয়তাবাদী, কেউ কেউ ভারতবর্ষের চেয়ে ঢের বেশি; শুদ্ধ লোককল্যাণের পথে—রামমোহন বা মহাত্মা গান্ধির যুক্তি ও সেবার পথে প্রায় কেউই চলেনি; এরকম অবস্থায় যুক্তি ও কল্যাণের হত্যা সর্বাত্মক হয়ে দাঁড়ায়; রোধ করা কঠিন। গোটা পৃথিবীর হৃদয় মনকে না বদলাতে পারলে কোনো বিচ্ছিন্ন দেশের মন ও কাজের পদ্ধতি বদলানো প্রায় অসাধ্য ব্যাপার।

ভারতবর্ষে জাতীয়তাবাদ নানা রাষ্ট্রের কম বেশি উগ্র জাতীয়তাবাদের সঙ্গে এমনই গেঁথে পড়েছে যে এ বিষয়ে এ দেশের পক্ষে এককভাবে খাঁটি হয়ে থাকতে পারা কঠিন, হয়তো অসম্ভব। ব্যাবহারিক ক্ষেত্রে এই সমস্যার সৎ মীমাংসা আজকের পৃথিবীর অদ্ভুত সংস্থার দরুন যে প্রায় অসম্ভব সেটা স্বীকার করলেও মনে মনেও যদি অধিকাংশ ভারতবাসী বেশি জাতীয়তাবাদে চাপা পড়ে থাকে সেইটেই খারাপ। কিন্তু খারাপ পৃথিবীতে এর চেয়ে ভালো কিছু আশা করা যেতে পারে মাত্র, পাওয়া শক্ত।

যাঁরা (কমবেশি আন্তরিকভাবে) ঈশ্বর ও ধর্ম মানেন তাঁদের ধর্মে পর্যন্ত জাতীয়তাবাদ ঢুকেছে, ধারণা জন্মেছে যে ঈশ্বর কোনো বিশেষ ধর্ম ও জাতির জন্যে। একই ধর্মের মানুষের ভিতরে চিড় দেখা দিচ্ছে জাতির ব্যাপার নিয়ে—যদিও ইংরেজও খ্রিস্টান, জার্মানও খ্রিস্টান।

পৃথিবীর নানা ধর্মের বেশির ভাগ সাধক-নায়কদের কাছে পর্যন্ত ধর্ম মানে নিজের জাতির একান্ত উন্নতি—অনেক সময় নীতিহীন পথে উন্নতি; ধর্মের লক্ষ্য তাঁদেরও মতে মোটেই মানুষ মাত্রেরই মঙ্গল নয়। ধর্ম ও ঈশ্বরকে যাঁরা সত্য বলে মনে করেন তাঁদের

ভিতরেই এইরকম। কিন্তু পৃথিবীর অনেকের কাছেই আজ আর অধ্যাত্ম প্রশ্ন তোলবার মতো কিছু নয়; সৎ পার্থিব প্রশ্নগুলোও নয়; কিন্তু জাতীয়তাবাদ প্রাদেশিকতা সাম্প্রদায়িকতায় সত্য ও বাস্তবের স্বাদ রয়েছে।

কিছুদিন আগে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ভবিষ্যৎ নিয়ে প্রবন্ধ লিখেছিলাম। বাংলা প্রথম শ্রেণির ভাষা, ছেলেবেলা থেকে তা বলে আসছি, কিংবা এই ভাষা বেশি ভালো লাগে, বেশি শ্রদ্ধা জাগায় এ ধরনের ব্যক্তি বা জাতিগত কারণে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের পরিণাম সম্বন্ধে আলোচনা করবার দাবি যে না জানানো যায় তা নয়। কিন্তু তাতে নিজ ভাষা ও সাহিত্যের বিশদ ব্যাখান ও সম্পদ বর্ণনার ভিতর দিয়ে নিজের জাতীয় স্বার্থের আবেশ মনকে বিহ্বল করতে পারে। বাংলা ভাষা আজ পৃথিবীর বিশেষ ও খুব সম্ভব ভারতবর্ষে সবচেয়ে বড়ো ভাষা ও এ সাহিত্য এ দেশের সবচেয়ে বড়ো সাহিত্য। এরকম একটি সাহিত্য ও ভাষাকে যদি আজকের বাংলার মতো একটি ছোটো গরিব বিশৃঙ্খল ও বিপন্ন দেশে লালিত হতে হয় তাহলে এখনকার বাঙালি সাহিত্যিকেরা যতই সৎ ও করিতকর্মা হোন না কেন—ইংরেজির লোপ ও হিন্দির প্রতিপত্তির দিনে তারা বা উত্তর-সাহিত্যিকেরা এ ভাষা ও সাহিত্যের ভবিষ্যৎ দুর্দিন কী করে ঠেকিয়ে রাখতে পারবেন—প্রবন্ধে এ নিয়ে আলোচনা করেছিলাম। বোধ হয়েছিল, বাংলার পক্ষে আরও জায়গা, মানুষ, রাষ্ট্র ও টাকাকড়ির আরও ভালো ব্যবস্থার দরকার—ভাষা ও সাহিত্যকে তার বড়ো ধারাবাহিকতায় বাঁচিয়ে রাখতে হলে। লেখবার সময় এ ভাষার আশা-আশঙ্কার কথাই ভেবেছিলাম। মনে হচ্ছিল, নিজের ভাষা ও সাহিত্যের মতো একটা শুদ্ধ জিনিসও এমনিই নিজের জাতির জিনিস হয়ে দাঁড়াতে পারে যে মনকে বিশেষভাবে অবিকার না রাখলে এর আশ্রয়েও খারাপ জাতীয়তাবাদ দেখা দিতে পারে। আমাদের বাঙালিদের পক্ষে আজকের বাংলার এই বিশেষ বিশেষ বিপদের দিনে অন্য নানা বিষয়ের মতো বাংলা ভাষা ও সাহিত্য নিয়ে অনেক ভাববার ও করবার আছে, কিন্তু সদ্ভাব ও যুক্তি নাশ করে নয়। এতে ফল না পাওয়া গেলে উত্তেজনার পথে তবুও না যাওয়াই ঠিক। যে সদ্ভাব ও নীতি যুক্তির ভিতরে রয়েছে সেই পথেই খুব দেরি করে এলেও সাফল্য প্রায়ই এসে পড়বে হয়তো; না এলেও ইতিহাসের অন্ধতার (ইতিহাস মাত্রকেই আমি অন্ধ বলছি না) ভিতর সব সময়ই যে মূল্য নাশের চেষ্টা, সেটা ক্রমাগত ব্যাহত হতে পারে বলে আমার মনে হয়। রামমোহন, বিদ্যাসাগর, আমাদের দেশীয় যুক্তি ও চিন্তার ফল ও পশ্চিমি সভ্যতা যখন এদেশিদের ভিতরে কমবেশি সত্যের আগ্রহ জাগিয়ে কাজ প্রায় শেষ করল, তখন সমাজে সংসারে আচারে-অনুষ্ঠানে যে প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছিল তা শিল্পে সাহিত্যে পর্যন্ত জড়িয়ে মিশিয়ে গিয়েছিল। সাহিত্য অবিশ্যি সাদাকালো বা মিশ্রিত রঙের জীবন-দর্শনে বিশ্বাস করেও ভালো শিল্পফল পেতে পারে—কিন্তু জীবনের অন্য-অন্য ক্ষেত্রে খণ্ড সত্য ও নিষ্ফল জীবনবোধ মানুষের সমাজকেই ক্ষয় করে ফেলে। মনে হয়েছিল, বাংলা দেশের জীবনে ও সমাজে এই অক্ষমতা সহজে ঘুচবে না। কিন্তু ক্রমে ক্রমে রুশ বিপ্লবের সাড়া (ফরাসি বিপ্লবকে ওয়ার্ডসওয়ার্থ-কোলরিজ থেকে শুরু করে ইউরোপের সাদামাঠা গদ্যপ্রাণ লোকও যে আশা-বিশ্বাসের চোখে দেখেছিল ঠিক সেরকম নয় অবশ্য; ঘটনাটা হয়ে যাওয়ার খানিকটা পরে কিছুটা অস্পষ্টভাবে ভারতীয় সমাজের কোনো কোনো স্তরে

রুশ বিপ্লবের মর্ম এসে পৌঁছোতে পেরেছিল), সমাজতন্ত্রবাদ (লেনিন ও ট্রটস্কির রাশিয়ার) ও মার্কসবাদে তখনকার বাঙালি মনের অনেকখানি অসংগতি কেটে গেল; মনে হয়েছিল, রামমোহন ও তাঁর জিজ্ঞাসা যুক্তি কাজ, বিদ্যাসাগর মশায়ের কাজ ও যুক্তি যা দিয়ে গেছে তার পরের বিশেষ ধাপ হিসেবে এই—সব বিপ্লবের পূর্ব ও উত্তর সিদ্ধান্ত, নতুন চৈতন্য ও বিশ্লেষণের খুব দরকার ছিল। কিন্তু রুশ বিপ্লবের ফলে বাংলায় (ও ভারতবর্ষে) বলশেভিক, সোভিয়েত প্রভাব সাময়িক ও অনেক স্থলে প্রশস্তভাবে দেখা দিলেও সে পথে চলার মতো তেমন কোনো যোগ্য চিন্তা বা কাজকর্ম দেখা গেল না, মহাত্মা গান্ধি শান্তভাবে যে বিপ্লব করে যাচ্ছিলেন ভারত ও বাংলা সেদিকেই ঝুঁকল; ঝুঁকে ভালোই করল (রুশ বা ফরাসি বিপ্লবের মতো জিনিস ভারত বা বাংলার মাটিতে হতে পারে বা হবে কি না বলা শক্ত); কিন্তু গান্ধির দর্শনেরও সহজ অথচ (তাঁর দেশবাসীর কাছে যা দেখছি) দুঃসাধ্য যুক্তি বাঙালি বড়ো বেশি নিল না।

মার্কসবাদের সত্যমিথ্যা ভেদ করে জিজ্ঞাসার একান্ত মূল্যের ওপর সে দর্শনে যে জোর দেওয়া হয়েছে তার প্রভাবও শিথিল হয়ে পড়েছে বাঙালির চিন্তা-জীবনে; খুব সম্ভব কয়েকজন পণ্ডিত-অপণ্ডিতের তর্কবিতর্কের ভিতরেই মার্কসবাদ বাংলায় (ও ভারতবর্ষে) আজ খানিকটা সূক্ষ্মভাবে স্থিত; আমাদের দেশে এর সামাজিক ব্যবহারের চেষ্টাচিহ্নও রয়েছে, কিন্তু বেশি নয়। জীবন ও সমাজের (বা কোনো কিছুরই) কোনো শাশ্বত সুধী বা শাশ্বত মীমাংসা আছে বলে মনে হয় না। মানুষের সমস্যা কোনো দিন সম্পূর্ণভাবে মিটবে কি না ভাবার বিষয়। যুক্তিকে ক্ষুণ্ণ করলে সমস্যা বেড়ে যায়, ভালোভাবে ব্যবহার করতে পারলে প্রায়ই কোনোরকম অন্ধশক্তির কাছেই ভীত বা নির্জিত হতে হয় না, স্পষ্টতা ও কল্যাণের মাত্রা বাড়তে থাকে।

ধর্ম সম্বন্ধে বিশেষ কোনো মন্তব্য করবার ক্ষমতা আমার নেই। অবিশ্যি নীতিকে ধর্ম মনে করতে পারলে এবং পৃথিবীকে সেই হিসেবে মোটামুটি ধার্মিক দেখতে পারলে তৃপ্তি বোধ করা যায়। কিন্তু বিশ্বাসী ধর্মাশ্রয়ীরা কেবলমাত্র নীতি ও যুক্তিকে ধর্ম বলে মনে করেন না, এগুলো বাদ দিয়েও ধর্ম চলে, তাঁদের মতে ধর্মসাধনায় এমন কোনো চৈতন্যের দরকার নেই যার ফলে বিশ্বাস জন্মাবার আগে যুক্তি ও জিজ্ঞাসার জন্ম হয়। কথাটা ভেবে দেখবার মতো; হয়তো অসত্য নয়; কিন্তু প্রায় লোকের হাতেই এর অপব্যবহারের সম্ভাবনা। যারা অশিক্ষিত আধা-শিক্ষিত তারাই শুধু নয়, অনেক সুশিক্ষিত বুদ্ধিমান লোকও ভক্তিকেই ধর্ম মনে করেন—অন্ধ ভক্তিকেও। ঈশ্বর আছেন কি না স্বতন্ত্র কথা। কিন্তু খুব সম্ভব কারও নেহাৎই ভাবাবেগের ফলের ভেতর তিনি বা তাঁর শুদ্ধ স্বরূপের বিশেষ কিছু আছে বলে মনে হয় না।

তবুও এই জিনিসকেই চেতনা জিজ্ঞাসার স্থানে বসিয়ে এদের নিজেদের জীবনে যে নিবেদনের বিশেষত্ব, তা অনেক সময়েই সরল ও আন্তরিক, কিন্তু প্রায়ই তার চেয়ে বেশি যে কিছু নয়, আমার মনে হয়, ডিরোজিয়ো ও ডিরোজিয়োর শিষ্যদের বিচলিত মন নিয়ে নয়, কিন্তু যত দূর সম্ভব রামমোহনের মতো স্থির পরিজ্ঞানে সে কথা ভেবে দেখবার সময় বাঙালির জীবনে আবার এসেছে। জ্ঞান ও বিজ্ঞানের নিয়ম ও ফল ঠিকভাবে বোঝবার ও কাজে লাগাবার মতো মন যে বাঙালি খুব বেশি লাভ করেছে তা নয়, কিন্তু

সব বিষয় সম্পর্কেই তার জীবনে ক্রমেই বুঝে-শুনে দেখবার স্পষ্টতা এসে পড়ছে মনে করেছিলাম। আজ মনে হচ্ছে, তা ততটা আসেনি, উনিশ শতক ও বিশ শতকের গোড়ার দিকে যা এসেছিল তার কোনো বিকাশ হয়নি (বরং সেটুকুর থেকেও পতন হয়েছে) মনে হয়। কোথাও কোথাও দীক্ষা, চর্চা, জীবনের কোনো কোনো ভগ্নাংশের ধারণা ও গঠনের ব্যাপারে বরং যেটুকু চিন্তাশুদ্ধি বাঙালির জীবনে আছে মনে হচ্ছে—জীবনের অন্য নানা গুরুতর বিষয়ে সেটুকুও নেই; সেখানে প্রায়ই অন্ধ আস্থাই সব। আমার এ পাঠ ভুল হতে পারে। কিন্তু আজকের বাংলার জিজ্ঞাসাবিমুখতা অসত্য প্রমাণিত হলে ভালো হয়।

নব্য ন্যায়ের জন্ম বাংলা দেশে হলেও ঠিক বলতে গেলে এক দিকে রামমোহন ও পরে বিদ্যাসাগর ও অন্য দু চার জন মনীষী ও অন্য দিকে ইংরেজি শিক্ষা বাঙালিকে প্রথম ভালো করে জিজ্ঞাসা করতে শিখিয়েছিল। উনিশ ও বিশ শতকের রাষ্ট্র ও সমাজমনের ইতিহাসে ও বড়ো সাহিত্যে সেসবের অনেক প্রমাণ রয়ে গেছে। কিন্তু বাঙালির জীবনে সে জিজ্ঞাসার প্রাধান্য কিছুই তেমন নেই এখন আর। রামমোহন প্রভৃতি মনীষীর ও দেশি-বিদেশি যুক্তিদর্শনের ফল জাতীয় জীবনে স্থায়ী হবে বলে মনে হয়েছিল। কিন্তু তা হয়নি। ধরা যাক ধর্মের কথা। যুক্তির সিদ্ধান্ত চলবে, নীতিই প্রায় সবটুকু ধর্ম, বাকি যেটুকু থাকতে পারে তা যার-যার নিজের চেতনা ও সংবেদের কাছে। ধর্মীদের কাছে এ সিদ্ধান্তের কোনো মূল্য নেই, প্রয়োজনীয় জিনিস হচ্ছে মনের ব্যাকুল অবস্থা, ভক্তির পাত্র (তা যাই হোক না কেন) এবং সেই পাত্রের ওপর সবচেয়ে বেশি ভক্ত। আমাদের দেশে না হোক, অন্য নানা দেশে যারা সজাগ মনে চলতে চায় তারা নীতি গ্রহণ করে ধর্ম ছেড়ে দিচ্ছে; বিশ্বের নানারকম অজ্ঞাত সূত্র স্পষ্টভাবে বুঝে দেখবার জন্যে সৃষ্টিই তাদের প্রশ্ন ও মীমাংসার পাত্র. মনের এই ভাবকেই তারা ধর্ম মনে করে। আমাদের দেশেও এবকম হলে হত—কিন্তু ধর্ম ও ভক্তির নামে প্রায়ই বিচারের থেকে মনকে ফিরিয়ে নেওয়া হচ্ছে।

গান্ধি মার্কস কিয়ের্কগাড বা অন্য কারও সিদ্ধান্ত বা দর্শনের সঙ্গে সাহিত্যের বিশেষ কোনো সাক্ষাৎ যোগ নেই। প্রত্যেক সৎসাহিত্যে কোনো-না-কোনোরকম জীবনদর্শন আছে, কিন্তু সে দর্শনের ভালোমন্দের সঙ্গে শিল্পফলের তেমন কোনো সম্পর্ক নেই; বাংলার সমাজে অনেক সময়ই বুদ্ধির বিশৃঙ্খলা দেখা দিলেও বড়ো সাহিত্যের সচলতায় অনেক দিন পর্যন্ত ছেদ পড়েনি; বিশেষ শক্তি ও অভিজ্ঞতা নিয়ে লেখকেরা এ দেশে যে অনেক কাল ধরে কাজ করে যাচ্ছেন তা খুব সম্ভব বাংলার খাঁটি স্বভাবের সঙ্গে অযুক্ত ঘটনা মাত্র নয়। কিন্তু বাংলার স্বভাবে পরিষ্কার যুক্তিও অনেক দেখা গেছে, এবারে তা ঢের বেশি করে লাভ করবার নিতান্ত দরকার বোধ করা যাচ্ছে।

ফলিত জ্যোতিষ সম্পূর্ণ নিরর্থক

মেঘনাদ সাহা

এখন সমালোচকের হিন্দু জ্যোতিষের উৎকর্ষের দাবি কতটা বিচার-সহ তাহা আলোচনা করিয়া দেখাইতেছি। প্রথমেই দেখিয়াছি যে 'পৈতামহ সিদ্ধান্ত-এর কাল অর্থাৎ খ্রিস্টাব্দের ৮০ সন পর্যন্ত ভারতীয় নিজস্ব জ্যোতিষ বা কালগণনা প্রণালী অতিশয় অশুদ্ধ ছিল এবং তৎপূর্ববর্তী *মহাভারত* ইত্যাদি গ্রন্থে কুত্রাপি পৃথিবীর গোলত্ব, আবর্তনবাদ ও সূর্যের চতুর্দিকে প্রদক্ষিণবাদ স্বীকৃত হয় নাই। আনুমানিক ১০০ খ্রিস্টাব্দের পর বোধ হয় উজ্জয়িনীর শক রাজাদের সময় হইতে (যাহারা পারসিক প্রভাবান্বিত ছিলেন) পাশ্চাত্য Chaldean ও Greek জ্যোতিষ ভারতে আসিতে আরম্ভ করে। তখন ভারতীয় জ্যোতিষীগণ পৃথিবীর গোলত্ব, আবর্তনবাদ ইত্যাদি স্থূলভাবে স্বীকার করতে আরম্ভ করেন।

কিন্তু এই মতবাদ যখন ব্যাবিলনে ও গ্রিসদেশে প্রায় ভারতের প্রথম প্রচলিত মতে অন্যূন তিন শত বৎসর পূর্বেই প্রচলিত ছিল এবং যখন প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে যে গ্রিক জ্যোতিষ সেই সময় ভারতে সম্যক প্রচারিত হইয়াছিল, তখন স্বীকার করিতে হইবে যে পৃথিবীর গোলত্ব, নিরাধারত্ব আবর্তন ও প্রদক্ষিণবাদ সম্বন্ধে যদি কিছু পরবর্তীকালের হিন্দুপুরাণে বা জ্যোতিষে থাকে তাহা বিদেশ হইতে ধার করা। পৃথিবীর গোলত্ব হিন্দু পণ্ডিতগণ চিরকালই স্বীকার করিয়াছেন, যদিও তাঁহাদের দেওয়া পৃথিবীর ব্যাস গ্রিকদের দেওয়া পরিমাণ হইতে বিশুদ্ধতর নয়। ভূভ্রমণবাদ সম্বন্ধে প্রথম প্রামাণ্য উক্তি পাওয়া যায় কুসুমপুর অর্থাৎ পাটলীপুত্র নিবাসী আর্যভট্টের (জন্ম ৪৬৭ খ্রি: অব্দ) রচিত গীতিকাপাদে।

অনুলোমগতির্নৌস্থঃ পশ্চাৎচলং বিলোমগং যদবৎ
অচলানি ভানি তদবৎ সমপশ্চিম্যানি লঙ্কায়াম—

ইহা পৃথিবীর আবর্তন-সম্বন্ধীয় মতবাদ, কোনো প্রাচীন হিন্দু জ্যোতিষী সূর্যের চারিদিকে পৃথিবীর প্রদক্ষিণ সম্বন্ধে কোনো মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন কি না তাহা আমার জানা নাই। আর্যভট্ট নিজে Epicyclic Theory দিয়া গ্রহগণের গতি বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন—তাহাতে পৃথিবীকে সৌরজগতের কেন্দ্র বলিয়া ধরা হইয়াছে।

কিন্তু আর্যভট্টের ভূর্ভ্রমণবাদ পরবর্তী কোনো হিন্দু জ্যোতিষী গ্রহণ করেন নাই। ব্রহ্মগুপ্ত, লল্ল, মুঞ্জাল, ভাস্করাচার্য প্রভৃতি পরবর্তীকালের সমস্ত জ্যোতিষীই ভূর্ভ্রমণবাদ খণ্ডন করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন (বিশদভাবে শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় কৃত *আমাদের জ্যোতিষ ও জ্যোতিষী গ্রন্থ* দ্রষ্টব্য)। সুতরাং ইউরোপে প্রাচীন গ্রিকদের ভূর্ভ্রমণবাদের যে দশা হইয়াছিল, ভারতেও আর্যভট্টের ভূর্ভ্রমণবাদেরও (যাহা সম্ভবত গ্রিকদের নিকট হইতে ধার করা) সেই অকথা হয়। ভূর্ভ্রমণবাদেও আর্যভট্ট পৃথিবীর দৈনিক আবর্তন মাত্র বুঝিয়াছেন, তিনি অথবা কোনো ভারতীয় পণ্ডিত যে পৃথিবী সূর্যের চতুর্দিকে ভ্রমণ করিতেছে, এই মতবাদ প্রচার করিয়াছিলেন তাহার কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না। আর্যভট্টকে তর্কের খাতিরে Copernicus-এর সমতুল্য ধরিলেও এদেশে পরবর্তীকালে Kepler, Galileo, Newton-এর জন্ম হয় নাই, এ কথা নিশ্চিত বলা যাইতে পারে।

সিদ্ধান্ত জ্যোতিষকালে (৪০০-১১০০ খ্রি: অব্দ) ভারতে কালগণনার অনেক উন্নতি সাধন হয়। বৎসর ও মাসের পরিমাণ, গ্রহদিগের ভ্রমণকাল হিন্দু পণ্ডিতেরা অধিকতর শুদ্ধভাবে নিরূপণ করেন। জ্যোতিষিক গবেষণা করিতে যাইয়া, তাঁহারা জ্যামিতি, ত্রিকোণমিতি, বীজগণিতে অনেক মৌলিক আবিষ্কার করেন। কিন্তু এসমস্ত আবিষ্কার Prerenaissance যুগের আরব জ্যোতিষেরও সমতুল্য নয়। হিন্দু ও গ্রিকদের নিকট জ্যোতিষশাস্ত্র শিখিয়া মধ্যযুগের আরবগণ (৭০০-১৫০০ খ্রি: অব্দ) জ্যোতিষে বহু উন্নতি সাধন করেন। প্রায় ১৭৩০ খ্রি: অব্দে সম্রাট মহম্মদ শাহের আদেশে জয়পুররাজ সবাই জয়সিংহ ভারতে উন্নততর আরব জ্যোতিষের প্রচলন করিতে চেষ্টা করেন। তাঁহার আদেশে তৈলদ পণ্ডিত জগন্নাথ সংস্কৃত ভাষায় *'সিদ্ধান্তসম্রাট'* নামক গ্রন্থ রচনা করেন, উহা Ptolemy-র Ayntonis-এর আরব্য সংস্করণের (যাহা Almagest নামে বিখ্যাত) অনুবাদ মাত্র। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত মানমন্দিরসমূহ মধ্য-এশিয়ার উলুখবেগের মানমন্দিরের আদর্শে গঠিত।

জয়পুররাজ প্রাচীন ভারতীয় সিদ্ধান্ত-জ্যোতিষ পরিত্যাগ করিয়া আরব্য-জ্যোতিষের প্রবর্তন করিতে সচেষ্ট হন কেন? কারণ সিদ্ধান্ত-জ্যোতিষের গণনাপ্রণালী ৪০০ খ্রি: অব্দের পক্ষে প্রশংসনীয় হইলেও সম্পূর্ণ 'দূরবিভ্রাট' হইয়া পড়িয়াছিল। সিদ্ধান্ত-জ্যোতিষকালের হিন্দু পণ্ডিতগণ মনে করিতেন যে অয়নচলন ক্রমান্বয়ে এক দিকে নয়, খানিক দূর যাইয়া পেন্ডুলামের গতির মতো প্রত্যাবর্তন করিবে। সেইজন্য তাহারা সায়ন বৎসর (Tropical) গণনা না করিয়া নিরয়ণ বর্ষ (Sidereal) গণনা করিতেন এবং এখনও করেন। এইজন্য এবং নিরয়ন বৎসরের পরিমাণে যে ভুল ছিল দুই-এ মিলিয়া তাহাদের বৎসরমান প্রকৃত সায়নবর্ষ মান অপেক্ষা প্রায় ০০১৬ দিন বেশি হয় এবং প্রায় ১৪০০ বৎসরে হিন্দু বর্ষ মানে ভুল প্রায় ২৩ দিন পৌঁছিয়াছে। হিন্দু পঞ্জিকায় ৩১শে চৈত্রকে মহাবিষুব সংক্রান্তি বলা হয়, কিন্তু বাস্তবিক মহাবিষুব সংক্রান্তি ৭ কি ৮ই চৈত্র। যদিও পৃথুদক স্বামী প্রায় ৮৫০ খ্রি: অব্দে স্পষ্ট করিয়া বলেন যে অয়নচলন এক দিকেই হয়, তথাপি একাল পর্যন্ত দুই-এক জন ব্যতীত কোনো হিন্দু জ্যোতিষীই বর্ষমানের সংস্কারের আবশ্যকতা উপলব্ধি করেন নাই। বাস্তবিক পক্ষে ১২০০ খ্রি: অব্দের পর হইতে হিন্দু জ্যোতিষিক পণ্ডিতগণ বেহুলার মতো মৃত সভ্যতার শব আলিঙ্গন করিয়া নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া আছেন এবং বর্তমান সময় পর্যন্ত অতি ভুল পদ্ধতিতে বর্ষ গণনা করিতেছেন। মৎ সম্পাদিত *Science Culture* পত্রিকায় প্রকাশিত কয়েকটা প্রবন্ধে দেখাইতে চেষ্ট করিতেছি যে হিন্দুর তিথি ইত্যাদি গণনা, শুভ অশুভ দিনের মতবাদ কতকগুলি মধ্যযুগীয় ভ্রান্তির উপর প্রতিষ্ঠিত এবং প্রচলিত হিন্দু পঞ্জিকা একটা কুসংস্কারের বিশ্বকোশ মাত্র।

সিদ্ধান্ত-জ্যোতিষ সম্বন্ধে প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় ভারতীয় জ্ঞানের কথঞ্চিৎ পরিচয় দেওয়া হইল। আশা করি সমালোচক আমার বিবরণে ভুল বাহির করিবেন, না হয় তাঁহার হিন্দু জ্যোতিষের উৎকর্ষ সম্বন্ধে অতিশয়োক্তি প্রত্যাহার করিবেন। সম্যক অধ্যয়ন ও বিচার না করিয়া অতীতের উপর একটা কাল্পনিক শ্রেষ্ঠত্ব আরোপ করা শুধু আত্মপ্রবঞ্চনা মাত্র এবং এরূপ 'আত্মপ্রবঞ্চক'-এর পক্ষে পরকে উপদেশ দিতে যাওয়া অমার্জনীয় ধৃষ্টতা।

সমালোচক পুনরায় বলিয়াছেন, 'এই বিশ্বজগতের পশ্চাতে এক বিরাট চৈতন্যশক্তি আছে, তাহা হইলে সূর্য চন্দ্র গ্রহাদির পশ্চাতেও সে শক্তি রহিয়াছে অতএব এই সকলকে দেবতা বলিলে ভুল হয় না।'

এই মন্তব্য বিশ্বাসের কথা, যুক্তির কথা নয়। যাঁহারা Shamanism-এ বিশ্বাস করেন, তাঁহারা সমালোচকের মত মানিয়া লইতে পারেন। আমি যুক্তিবাদী, যুক্তি মানিতে রাজি আছি Shamanism মানিতে আমার কোনো আগ্রহ নাই। এইরূপ বিশ্বাস যদি সভ্যতার উৎকর্ষ প্রতিপন্ন করে, তাহা হইলে Maxico নিবাসী Aztee গণের মতো সভ্যজাতি পৃথিবীতে জন্মে নাই, কারণ তাহারা সূর্যকে দেবতা বলিয়া মানিত এবং মনে করিত যে, পর্বে পর্বে নরবলি না দিলে সূর্যের ক্ষুধা মিটিবে না, সূর্যের শক্তি হ্রাস হইবে এবং তাপ বিকিরণের ক্ষমতা লোপ পাইবে, পৃথিবীতে দুর্ভিক্ষ ও মহামারী আরম্ভ হইবে। সুতরাং পর্বে পর্বে তাহারা সূর্যের ক্ষুধানিবৃত্তির জন্য সহস্র সহস্র নরবলি দিত।

সূর্যকে দেবতা মনে করা একটা প্রাচীন ও মধ্যযুগের ধারণামাত্র, এই যুগে সেই ধারণার কোনো সার্থকতা নাই। এখন অতি সাধারণ শিক্ষাপ্রাপ্ত লোকেও জানে যে সূর্যপূজা করিলে গ্রীষ্মের আধিক্য বা অনাবৃষ্টি ইত্যাদি দূরীভূত হয় না। কিন্তু বিজ্ঞানের প্রসাদে সূর্যের উত্তাপকে যন্ত্র-যোগে সর্ববিধ কাজে লাগানো সম্ভবপর এবং উহাকে মানুষের সর্ববিধ সুবিধা, যেমন শক্তি উৎপাদন, refrigeration (শৈত্যোৎপাদন), air-conditioning, cooking (রন্ধন), জলোত্তোলন ইত্যাদি যাবতীয় প্রয়োজনীয় কাজ সম্পন্ন হয়। সুতরাং যাঁহারা সমালোচকের মতো গ্রহাদিকে দেবতা জ্ঞান করেন, তাঁহারা শুধু একটি মধ্যযুগীয় কুসংস্কারের মোহে নিমজ্জিত আছেন, তাঁহাদের অপেক্ষা যাঁহারা যন্ত্রযোগে সূর্যের উত্তাপকে সর্ববিধ কাজে লাগাইতে সচেষ্ট আছেন তাঁহারা অনেক উন্নত স্তরের। বিশ্বজগতের পশ্চাতে চৈতন্যই থাকুক বা অচৈতন্যই থাকুক, তাহাতে মানবসমাজের কী আসে যায়, যদি সে 'চৈতন্য' কোনো ঘটনা নিয়ন্ত্রণ না করেন অথবা কোনো প্রকারে সেই 'চৈতন্য'কে আমরা আমাদের উদ্দেশ্যের অনুকূলে চালিত না করিতে পারি? প্রাচীন Chaldean জ্যোতিষ বা হোরাশাস্ত্র উদ্ভাবন করেন এবং কোষ্ঠী, গ্রহ নক্ষত্রের অবস্থানজনিত ফলাফল গণনা করিতেন। কিন্তু Chaldean সভ্যতার ধ্বংস ও ভারতীয় সভ্যতার অধঃপতন হইতে মনে হয় যে ফলিত জ্যোতিষ সম্পূর্ণ নিরর্থক। বর্তমান বিজ্ঞানে ফলিত জ্যোতিষের কোনো সার্থকতা উপলব্ধি হয় না। দুই বন্ধু—প্রাচীনপন্থী ও নবীনপন্থী। প্রাচীনপন্থী, বেদ, উপনিষদ, পুরাণের কথা জানিত, পঞ্জিকায় যত রকম উপবাসের বিধিব্যবস্থা আছে তৎসমুদয় পালন করিত, প্রত্যহ গঙ্গাস্নান করিত এবং হাঁচি টিকটিকি পাঁজি মানিয়া চলিত, কোনোরূপ অভক্ষ্য ভক্ষণ করিত না, স্বপাক ভিন্ন আহার করিত না। নবীনপন্থী ছিল বস্তুতান্ত্রিক, কোনো কিছু শাস্ত্রবিধি মানিত না, অভক্ষ্য ভক্ষণ করিত। যথাসময়ে মৃত্যুর পরে প্রাচীনপন্থী গেল 'হিন্দু'র স্বর্গে, নবীনপন্থী গেল 'বৈজ্ঞানিক'-এর নরকে। কিছুদিন যায়। নবীনপন্থীর অনুরোধে প্রাচীনপন্থী একদিন রিটার্নটিকিট কাটিয়া নরকদর্শনে বাহির হইল। কিন্তু সেই যে গেল আর স্বর্গে ফিরিয়া আসিল না। ব্যাপার কী? না-ফেরা সম্বন্ধে উদ্বিগ্ন

হইয়া প্রাচীনপন্থীর স্বর্গবাসী জনৈক বন্ধু তাহাকে চিঠি লিখিয়াছিল, প্রত্যুত্তরে বন্ধুকে প্রাচীনপন্থী *যে চিঠি দিয়াছিল তাহা হইতে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিতেছি। প্রাচীনপন্থী লিখিয়াছে :*

বৈজ্ঞানিকের নরকের সীমানায় উপস্থিত হইলে প্রথমত ভীষণ উত্তাপ ও তৃষ্ণা অনুভব করিলাম, ভাবিলাম যাত্রা করিয়া কী ঝকমারিই করিয়াছি, এখন উপায়? কিন্তু সীমানার ভিতর প্রবেশ করিবামাত্র স্বর্গের গাড়ি বদলাইয়া নূতন গাড়িতে উঠিতে হইল, ওইখানে একটা বড়ো জংশন দেখিতে পাইলাম। জংশনের বর্ণনা করিবার শক্তি আমার নাই, নূতন গাড়িতে প্রবেশ করিবামাত্র দেখিলাম আশ্চর্য! আর উত্তাপ নাই, খাসা ঠান্ডা এবং মৃদুমন্দ হাওয়া বহিতেছে। ব্যাপার কী? শুনিলাম, এখানকার সমস্ত গাড়িই Air-Conditioned, গন্তব্য স্টেশনে গাড়ি থামিলে নামিয়া বন্ধুর আবাসে উপস্থিত হইলাম। তথাকার বিধি-ব্যবস্থা দেখিয়া চমৎকৃত হইলাম। স্বর্গে যেমন আমাদের পরিশ্রম করিতে হইত না, কেবল ইন্দ্রের সভায় হাজির থাকিয়া অপ্সরার মামুলি নাচ দেখিতে হইত এবং নারদ-ঋষির ভাঙা গলায় পৃথিবীর 'গেজেট' শুনিতে হইত, পানীয়ের মধ্যে একঘেয়ে ভাঙ ও ধেনো মদ— অর্থাৎ পৃথিবীতে আমি যেসব যত্নের সহিত বর্জন করিয়াছিলাম স্বর্গে তাহার ক্ষতিপূরণ স্বরূপ আমাকে সমস্ত জিনিস ভোগ করিতে দেওয়া হইত— তেমনি বৈজ্ঞানিকের নরকে উহার সবই উলটা, অথচ কী চমৎকার ব্যবস্থা! যদিও নরক দেশটি অত্যন্ত গরম, কিন্তু বৈজ্ঞানিকেরা সেখানে যন্ত্রবলে উত্তাপকে কার্যে পরিণত করিয়া সমস্ত ঘরবাড়ি air-conditioned করিয়া রাখিয়াছে, সুতরাং উত্তাপ মোটেই অনুভূত হয় না। তৃষ্ণা পাইলে শরবত খাবার টেবিলে সর্বদেশজাত টাটকা ফলমূলের প্রাচুর্য এবং নূতন প্রণালীতে উদ্ভাবিত অপরাপর আহার্যের বাহার, পরিপাট্য ও সুগন্ধ স্বতঃই ক্ষুধার উদ্রেক করে। স্বর্গে বেড়ান ঝকমারি, ঘোড়াগুলো বুড়া হইয়া গিয়াছে প্রায়ই গাড়ি উলটায়, কিন্তু নরকে air-conditioned হাওয়াগাড়ি দিব্যি 'খেয়ে-দেয়ে-ঘুরে-ফিরে' আরামে আছি। রেডিয়োর সুইচ টিপিলে বহির্জগতের সব খবর শুনিতে পাই, বিখ্যাত গায়ক-গায়িকার কলাকুশলী সংগীত, অভিনেতা-অভিনেত্রীর বক্তৃতা, আর্ট, নৃত্যকলা প্রভৃতি দেখিয়া-শুনিয়া মন আপনা হইতেই মুগ্ধ ও বিভোর হইতে থাকে। বহির্জগতের কোনো ব্যাপার অনুসন্ধান করিতে যখন ইচ্ছা হয় museum-এ যাই এবং Planetarium-এ প্রদত্ত বক্তৃতা শুনি। স্বর্গের একঘেয়ে জীবনযাত্রায় কী সুখ আছে জানি না, কিন্তু আমার কাছে বৈজ্ঞানিকের নরকের জীবনযাত্রা বড়োই আরামপ্রদ ও লাভজনক মনে হইয়াছে। সুতরাং আমি আমার 'স্বর্গবাস' করিয়া ভবিষ্যতে 'নরকবাসে'র বন্দোবস্ত কায়েমি করিয়া লইয়াছি।"

বর্তমান লেখককে যাঁহারা প্রাচীনপন্থীর মতো নরকে পাঠাইবার ব্যবস্থা করিয়াছেন তাঁহাদের প্রস্তাব আমি সানন্দে গ্রহণ করিলাম।

বাঙালি সভ্যতা-সংস্কৃতির রূপরেখা

মমতাজুর রহমান তরফদার

ভাষা আন্দোলন সাংস্কৃতিক আত্মনিয়ন্ত্রণের আন্দোলন। এই আন্দোলন একটি জাতিসত্তাকে সংহত করে পরোক্ষভাবে হলেও একটি জাতিরাষ্ট্রের ভিত্তি গড়ে তুলেছে। মধ্যশ্রেণি গঠনের প্রক্রিয়ার সঙ্গে উক্ত আন্দোলন অবিচ্ছিন্নভাবে সম্পর্কিত। মধ্যশ্রেণি আত্মনিয়ন্ত্রণের সংগ্রামে নেমেছিল—নেমেছিল অবশ্য সর্বসাধারণের জন্য। আন্দোলনটির সঙ্গে তুলনীয় অন্য কোনো আন্দোলন বাংলার ইতিহাসে খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। তবে শ্রেণি-গঠন ও ভাষার মাধ্যমেই তার আত্মিক অভিব্যক্তি—এ দুয়ের মধ্যকার যোগসূত্রে বাঁধা অতীতের কতকগুলি ঘটনায় সামাজিক উজ্জীবন ও চিৎপ্রকর্ষের লক্ষণ স্পষ্টভাবে দেখা গেছে। ষোল শতক থেকে শুরু করে আঠার শতকের মধ্যে দক্ষিণ-পূর্ব বাংলার বেশ কয়েকজন মুসলমান কবি অশিক্ষিত মুসলমানদের জন্য বাংলা ভাষায় ধর্মীয় ও ঔপাখ্যানিক গ্রন্থাদি লেখার ঔচিত্য ও অনৌচিত্যের দ্বিধাদ্বন্দ্ব কাটিয়ে উঠে—আভিজাত্যের ভাষা ফারসি ও ধর্মের ভাষা আরবি বাদ দিয়ে—মাতৃভাষার মাধ্যমে ধর্মীয় ও লোকায়ত সংস্কৃতি গঠনের জন্য উদ্যোগ নিয়েছিলেন। এই সামাজিক এলিট শ্রেণির বাংলাভাষাকেন্দ্রিক আত্মজিজ্ঞাসা মোগল আমলের ফারসিনির্ভর আভিজাত্য-বোধ এবং উনিশ শতকের সাম্প্রদায়িক ও প্যান-ইসলামি আন্দোলনের মাঝখানে তলিয়ে গেছে—হারিয়ে গেছে একটি অনন্ত সম্ভাবনাময় ভূমিনির্ভর গ্রামীণ এলিট। উলামা শ্রেণির একটি অংশের অযৌক্তিক আরবি-ফারসি-প্রীতির ক্ষতিকর সামাজিক প্রভাবের বিরুদ্ধে ওই কবিগোষ্ঠী গঠনমূলক সাংস্কৃতিক প্রতিরোধ সৃষ্টির কাজে এগিয়ে এসেছিলেন। উনিশ ও বিশ শতকের কতকগুলি ঘটনা থেকেও বুঝতে পারা যাচ্ছে যে, ভাষা-সাহিত্য-সংস্কৃতির বিবর্তন কোনো না কোনো মধ্যশ্রেণির মানস-গঠনের ও সামাজিক বিকাশের সঙ্গে সম্পর্কিত। উনিশ শতকের শেষ ভাগ বাংলার মুসলিম মধ্যবিত্ত গঠনের প্রভাত-লগ্ন। কিছুটা সমাজতাত্ত্বিক সরলীকরণের আশ্রয় নিয়ে বলা যায়, মীর মশাররফ হোসেন ওই মধ্যশ্রেণির শক্তিশালী প্রতিভূ। তিনি বটতলার দোভাষী পুথির ভাষা বাদ দিয়ে লিখলেন সংস্কৃতঘেঁষা বাংলায়। এই প্রয়াসের মধ্যে আছে প্রতিবাদের পরিচয়। তাঁর লেখা *জমিদার দর্পণ*, *উদাসীন পথিকের মনের কথায়* এবং তাঁর আরও কোনো কোনো রচনায় আছে জুলুমজবরদস্তিমূলক আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে তীব্র ক্ষোভ

ও প্রতিবাদ। উনিশ শতকের শেষ দশকে কলকাতাভিত্তিক মিহির ও সুধাকর গোষ্ঠীর সাহিত্য-সাধনায় ও সাংবাদিকতায় প্রতিবাদের স্ফুলিঙ্গ মৃদু। নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণির ওই লেখকগণ লেখার মাধ্যম হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন বঙ্কিমি বাংলা— তাঁরা পুথি সাহিত্যের মিশ্র বাগ্‌ভঙ্গির প্রতি আদৌ মোহগ্রস্ত ছিলেন না। বাঙালি মুসলমানের সমাজ-সংস্কৃতি, মুসলমানদের জন্য বাংলা ভাষার উপযোগিতা, বাঙালির জীবনে উর্দুর স্থান, হিন্দু-মুসলিম সম্পর্ক, ইতিহাসে হিন্দু লেখকদের সৃষ্ট বাংলা সাহিত্যের স্থান প্রভৃতি সমস্যার প্রতি তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল স্বচ্ছ বাস্তববাদী। চলমান শতাব্দীর প্রথম দিকে ঢাকার মুসলিম সাহিত্য সমাজের প্রতিষ্ঠাতা লেখকগণ ছিলেন ইংরেজি শিক্ষায় আলোকপ্রাপ্ত। তাঁরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে তাঁদের আলোচনার মাধ্যম হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন বাংলা ভাষাকে। শাস্ত্রানুগত্য থেকে বুদ্ধিকে মুক্তি দেওয়া, এবং সমাজ, অর্থনীতি ও সংস্কৃতির সংস্কার সাধন ছিল তাঁদের অভীষ্ট। সে-কালের মুসলিম সমাজের একটি অংশের মৌলবাদী প্রতিক্রিয়ার আঘাতে ঐ প্রতিষ্ঠানটি ভেঙে পড়ে— সৃষ্টিধর্মী সম্ভাবনা ও প্রতিশ্রুতিসম্পন্ন একটি বুদ্ধিদৃপ্ত মধ্যশ্রেণির বৈপ্লবিক সংস্কৃতি-সাধনা ও কৃতিরও শোকাবহ পরিণতি ঘটে। ভাষা আন্দোলনে যেমন, মুক্তিযুদ্ধে ও নতুন রাষ্ট্রের ভিত্তি গঠনেও তেমনি মধ্যবিত্তের অবদান গুরুত্বপূর্ণ। মুসলিম মধ্যবিত্তের তুলনায় হিন্দু মধ্যবিত্তের ইতিহাস অনেক পুরনো। তবুও বাংলাদেশের মুসলিম মধ্যবিত্ত ও হিন্দু মধ্যবিত্ত শিক্ষাদীক্ষায় এবং জীবন ও জীবিকার অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রে এখন প্রায় পরস্পরের কাছাকাছি। এই দুই মধ্যশ্রেণির সামাজিক গঠন, তাদের সাহিত্য-সংস্কৃতি, তাদের আর্থ-সামাজিক অবকাঠামো এবং তাদেরই সৃষ্ট রাষ্ট্র-ব্যবস্থা দৈশিক ও আন্তর্জাতিক উপাদান আত্মস্থ করে উদ্দিষ্ট পরিণতির দিকে কি এখন এগিয়ে চলেছে? Historical lag বা ইতিহাসের অসমগতির কি পরিসমাপ্তি ঘটছে?

জাতি-গঠনের প্রশ্নটি এই প্রসঙ্গে গুরুত্ব পাচ্ছে। হিন্দু ও মুসলিম মধ্যশ্রেণি সম্বন্ধে কথা বলতে গেলে প্রথমেই মনোযোগ আকর্ষণ করে তাদের ভাষাগত ঐক্য। সর্বভারতীয় জাতীয়তাবাদের অন্যতম প্রবক্তা বঙ্কিমচন্দ্রও মশাররফ হোসেনের লেখা নাটক *জমিদার দর্পণ*-এর সমালোচনায় প্রায় সোয়াশো বছর আগে বলেছিলেন :

বাঙ্গালা হিন্দু-মুসলমানের দেশ— একা হিন্দুর দেশ নহে। কিন্তু হিন্দু-মুসলমান এক্ষণে পৃথক— পরস্পরের সহিত সহৃদয়তাশূন্য। বাঙ্গালার প্রকৃত উন্নতির জন্য প্রয়োজনীয় যে হিন্দু-মুসলমানে ঐক্য জন্মে। যতদিন উচ্চশ্রেণির মুসলমানদের মধ্যে এমত গর্ব থাকিবে যে, তাঁহারা ভিন্ন দেশীয়, বাঙ্গালা তাঁহাদের ভাষা নহে, তাঁহারা বাঙ্গালা লিখিবেন না, বা বাঙ্গালা শিখিবেন না, কেবল উর্দু-ফারসির চালনা করিবেন, ততদিন সে ঐক্য জন্মিবে না। কেন-না জাতীয় ঐক্যের মূলে ভাষার একতা।

শুধু ভাষার ঐক্যই কি জাতীয় ঐক্য আনতে পারে? আরও যে উপাদানগুলো এই ঐক্যের সহায়ক তা হচ্ছে অর্থনীতি, সংস্কৃতি ও সংস্কৃতিকে কেন্দ্র করে গড়ে-ওঠা মূল্যবোধের সমন্বয়। জাতিগত সমন্বয়ের ক্ষেত্রে যে বাধাগুলি ইতিহাস থেকে চলে এসেছে তার মধ্য সবেচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হিন্দু মুসলমানের জাতিগত বিভেদ। বিভেদ প্রাক-বৃটিশ আমলেও ছিল; কিন্তু সম্প্রদায় দুটির মধ্যে বিরোধ তেমন একটা ছিল না। ব্রিটিশ শাসকগণ প্রশাসনিক কারণে ওই বিভেদকে বিরোধের রূপ দিয়েছেন। অনেকটা সেই ঔপনিবেশিক নীতির দরুন এবং তথাকথিত রেনাইসাসকে ভর করে জেগে-ওঠা সর্বভারতীয় জাতীয়তাবাদের প্রভাবে উনিশ ও বিশ শতকের উপমহাদেশে হিন্দু জাতীয়তাবাদ ও তার বিপরীত মেরুতে মুসলিম জাতীয়তাবাদ ব্যাপক সামাজিক মাত্রা অর্জন করেছিল। বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক শক্তির সঙ্গে মিলিত হয়ে এই সাম্প্রদায়িক মেরুকরণ পাকিস্তান আন্দোলনের একটি সক্রিয় উপাদান হিসেবে

গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছিল। মুসলমানদের মধ্যে ইসলামি আন্তর্জাতিকতা ও স্বাদেশিকতার সমন্বয় না ঘটলে এবং হিন্দুদের সামাজিক বিচ্ছিন্নতা দূর করতে না পারলে নেশন বা বৃহত্তর জাতি-গঠনের প্রক্রিয়া কার্যকারিতা হারাবে।

জাতি-গঠনের প্রক্রিয়ায় মধ্য যুগের ইতিহাসের ভূমিকা কিন্তু অত্যন্ত উজ্জ্বল। চৌদ্দ শতকের প্রথম দিকে দিল্লির শাসনকর্তৃত্ব থেকে মুক্ত হয়ে অল্প সময়ের মধ্যে বঙ্গ-সমতট-হরিকেল-বরেন্দ্র-গৌড়-রাঢ় প্রথম বারের মতো একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাজশক্তির অধীনে একত্রিত হল। এই রাষ্ট্র-কাঠামোর ভেতর গড়ে উঠল তুর্কি-হাবশি-আরব-বাঙালি লোকজন নিয়ে তৈরি সামরিক শক্তি এবং সৃজ্যমান, ভূমিনির্ভর হিন্দু মধ্যবিত্ত প্রশাসক-গোষ্ঠীর সমন্বয়ে গঠিত একটি প্রশাসনিক ব্যবস্থা। আর তা স্থায়ী হয়েছিল দুশো বছর ধরে। একই ধরনের এথ্নিক বৈশিষ্ট্যে চিহ্নিত, সমসত্তাসম্পন্ন একটি লোকগোষ্ঠী, তাদের বসবাসের জন্য একটি উর্বর ভুখণ্ড, নিরাপদ, সভ্য জীবন যাপনের জন্য একটি শক্তিশালী রাষ্ট্র-ব্যবস্থা, ওই লোকজনের মানস-চর্চার জন্য একটি বিকাশমান ভাষা, কৃষিভিত্তিক সভ্যতা, বাণিজ্যে ও নগরায়ণে অগ্রগতি এবং এ-সবের পরিণতি হিসেবে সাহিত্য-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে হিন্দু ও মুসলমানের মানসিক সমন্বয় ও জাতিগত ঐক্যের প্রস্তুতি-পর্ব দেখে মনে হয়, জাতি-গঠনের জন্য প্রয়োজনীয় সবগুলি উপাদান তখন বিদ্যমান ছিল। প্রথমে মোগল শাসনের বহির্মুখী চারিত্র্য, পরে ব্রিটিশ শাসকদের ঔপনিবেশিক ভেদনীতি এবং সর্বশেষে বিভাগকালীন রাজনীতির প্রতীক র‍্যাড্‌ক্লিফের কলমের আঁচড়ে বাংলাভাষাভাষী অঞ্চলটির খণ্ডিত রূপ ও পাকিস্তান জাতি-গঠনের প্রক্রিয়াকে প্রায় অচল করে দিয়েছে। বাণিজ্যনির্ভর বুর্জোয়া শ্রেণির বিকাশ এবং শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান ও সুষ্ঠু মূল্যবোধের মাধ্যমে গণতন্ত্রের পূর্ণতা প্রাপ্তি এখন জাতি-গঠনের প্রতিবন্ধকতাগুলি অন্তত আংশিকভাবে দূর করতে পারে। এই রাজনৈতিক ও আর্থ-সামাজিক বিবর্তনের বাধা হিসেবে বোধগম্য কারণে হয়ত সক্রিয় হবে পার্শ্ববর্তী বিশাল ও শক্তিশালী রাষ্ট্রের ধনতন্ত্র এবং বহু ভাষার লোকগোষ্ঠী নিয়ে গঠিত সর্বভারতীয় জাতীয়তাবাদ। বাংলাদেশে পুঁজির বিকাশ না ঘটলে, আপেক্ষিকভাবে স্বনির্ভর ধনতন্ত্র দানা না বাঁধলে, গণতান্ত্রিক ভিত্তিতে রাষ্ট্রগঠন, রাষ্ট্রের সামাজিকীকরণ ও জাতি-গঠন সম্ভব নয়।

কৃষিই এ দেশে আধা সামন্ততান্ত্রিক সামাজিক কাঠামো ও মূল্যবোধ টিকিয়ে রেখেছে, বুদ্ধিদৃপ্ত বুর্জোয়া সমাজ-গঠনের প্রক্রিয়ায় অন্তত আংশিকভাবে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। খ্রিস্টীয় পাঁচ ছয় শতক থেকে অর্থনীতির ভর বাণিজ্য ও শিল্প-কারিগরি থেকে ক্রমাগত সরে গিয়ে সেই যে কৃষিকে আশ্রয় করল, আজও সেই কৃষিনির্ভরতা কাটল না। মুসলিম আমলে বাণিজ্যিক ক্রিয়াকর্মে অগ্রগতির ফলে মুদ্রাভিত্তিক অর্থনীতি গড়ে উঠলেও কতকগুলি কারণে শক্তিশালী স্থায়ী বাণিজ্যনির্ভর শ্রেণির বিকাশ ঘটেনি। তার ফলে অটুট রইল ভূমির উপর সমগ্র সামাজিক শ্রেণিগুলির নির্ভরশীলতা এবং ধন উৎপাদনের উৎস হিসেবে কৃষির ব্যাপক গুরুত্ব। রাজা-বাদশা-নবাবগণ বণিক-শিল্পী-কারিগরদের কাজকর্ম সুষ্ঠুভাবে নিয়ন্ত্রণের কথা এবং এই উৎপাদক শ্রেণিগুলিকে সাহায্য-সহায়তা দানের কথা ভাবতে পারেননি। ভূমি রাজস্বভিত্তিক প্রশাসনিক ব্যবস্থা শিল্প-বাণিজ্যের বিকাশের ও বাণিজ্যিক পুঁজি গঠনের পথে ছিল বড়ো বাধা। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তনের ফলে এক বিশেষ ধরনের সামন্ততন্ত্র বিদেশি ধনতন্ত্রের পরিপূরক হিসেবে গড়ে উঠল। উনিশ শতক থেকে শুরু করে সাম্প্রতিক কালের মধ্যে কিছু সংখ্যক হিন্দু জমিদারের সন্তান-সন্ততি লেখাপড়া শিখে সম্মানজনক পেশায় নিয়োজিত হয়েছে। এঁদের অনেকেই আবার বিপ্লবী রাজনৈতিক চেতনায় উদ্দীপিত হয়েছে, কিংবা জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে স্বাক্ষর রেখেছেন। শেষোক্ত শ্রেণিরই সৃষ্টি বাংলার রেনাইসাঁসের চিৎপ্রকর্ষ ও মানববাদকে স্বীকৃতি দিয়েও বলা যায় যে, কৃষিভিত্তিক

সামন্ততান্ত্রিক চিন্তা-চেতনা থেকে এই আন্দোলনের উদ্যোক্তাগণও মুক্ত ছিলেন না। খুদে মুসলমান জমিদার-জোতদারদের বংশধরগণ কৃষিজীবনের গণ্ডির বাইরে যেতে পারেননি। চিৎপ্রকর্ষের কোনো মৃদু শিখা তাঁদের ও অনুন্নত হিন্দু সমাজের মানসলোক স্পর্শ করেনি। ১৯৪৭ থেকে ১৯৭১-এর মধ্যে মুসলমান মধ্যবিত্ত সমাজে যে পরিবর্তন এসেছে তা কতটা পরিমাণগত ও কতটা গুণগত পর্যায়ের সে প্রশ্ন যুক্তিসঙ্গত। কিন্তু গত অর্ধ শতাব্দীর মধ্যে কৃষক-কারিগর দারিদ্র্য-সীমার নীচে নেমে গেছেন— উদ্‌বাস্তুতে পরিণত হয়েছেন। ভূসম্পদের পুনর্বণ্টন ও উন্নতমানের প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে কৃষির রূপান্তর অসম্ভব নয়। জাপানে কৃষিকেন্দ্রিক পুঁজি-গঠনের প্রক্রিয়া এবং ইংল্যান্ডের শিল্প-বিপ্লবের ইতিহাসে কৃষির গঠনমূলক ভূমিকা এ-প্রসঙ্গে স্মর্তব্য। বাংলাদেশে এ-সব সম্ভব হবে রাষ্ট্র ও রাজনীতির সামাজিকীকরণের মধ্য দিয়ে।

সমাজ-সভ্যতার কৃষিভিত্তির মূলে আছে এই অঞ্চলের নদীগুলির জল-প্রবাহের মাধ্যমে স্মরণাতীত কাল থেকে বেয়ে-আসা প্রচুর পলি মাটি নিয়ে গঠিত ভূখণ্ডের উর্বরতা। অনার্য লোকগোষ্ঠী থেকে উদ্ভূত বিভিন্ন জাতির ও শ্রেণির লোকজনই এই নব-গঠিত উর্বর বদ্বীপ এলাকার স্থায়ী বাসিন্দা। সারি, জারি, মুর্শিদা, ভাওয়াইয়া, ভাটিয়ালি প্রভৃতি লোক সংগীতের মার্মিক নিসর্গ-প্রীতি ও আবেগবিহ্বলতা, মঙ্গল কাব্যের আবহ, বাউল-সহজিয়া সম্প্রদায়ের মরমি ধ্যান-ধারণা, সুফিদের অতীন্দ্রিয়বাদী তান্ত্রিক আমেজ, হিন্দু-মুসলমানের যাদু-টোনা-টোটেম-প্রীতি, তাঁদের উৎসব-পার্বণের বহু উপকরণ—এক কথায় তাঁদের সংস্কৃতির ভাব ও রূপ বাংলার নদী-মাতৃকতা ও কৃষিজ গ্রামীণতার সঙ্গে নিবিড়ভাবে সম্পর্কিত। এই সংস্কৃতির বৈচিত্র্য ও আবহমান কালের ঐতিহ্যিক ভিত্তিকে স্বীকৃতি দিয়েও বলতে হয় বাঙালি সমাজের ভূমিলগ্ন অন্তর্মুখিতা (landbound inwardness) তার সার্বিক আর্থনীতিক বিকাশের প্রক্রিয়াকে দীর্ঘকাল ধরেই স্থবির করে রেখেছে। তবে এই গ্রামীণ সংস্কৃতির গণ্ডির মধ্যে ধর্মের ভেদ, সাম্প্রদায়িকতার ভেদ চুকে গেছে, ঘুচে গেছে শহুরে ও গ্রামীণ মানসিকতার বিভেদ। এটাই বোধ হয় এই সংস্কৃতির শক্তির দিক।

মুক্তিযুদ্ধের আন্দোলনে এবং এক কালের পূর্বপাকিস্তানের ভূখণ্ডের উপরই একটি স্বাধীন রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠার ঘটনায় আকস্মিকতা আছে। সেইজন্য মনে হতে পারে, এই রাষ্ট্রের ঐতিহাসিক পটভূমি বিস্তীর্ণ নয়, এর কোনো সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার থাকলেও তা তেমন প্রাচীন নয়। উত্তরাধিকার বা সংস্কৃতির একটানা ইতিহাসকে গ্রহণ করার জন্য উপযুক্ত মানসিকতা তৈরি হয়, ঐতিহ্য-সচেতনতা বৃদ্ধি পায়, সমগ্র লোকগোষ্ঠীর মানস-লোক যখন কোনো চিৎপ্রকর্ষের আলোকে উজ্জীবিত হয়ে উঠে। ইউরোপের লোকজন গ্রিক সভ্যতাকে বর্তমান ইউরোপীয় সভ্যতার উৎস বলে মনে করেন। তাঁদের এই ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে উঠেছে। রেনাইসাঁস আন্দোলনের ব্যাপক ও সুদূর-প্রসারী প্রভাবে। শিল্প-বিপ্লবের সময় থেকে ধনতন্ত্রনির্ভর আধুনিক সভ্যতা গ্রিক সভ্যতার মানবিক, লোকায়ত, জীবনবাদী উপাদানগুলিকে রেনাইসাঁসের ফসল হিসেবে ইউরোপীয়দের কাছে পৌঁছিয়ে দিয়েছে। ইউরোপীয় লোকজন উজ্জীবিত হয়েছেন—তাঁরা ভাবতে শিখেছেন, পৃথিবীতেই মানুষের পরিপূর্ণ বিকাশ সম্ভব—এ বিকাশ সম্ভব প্রকৃতির শক্তিগুলোর উপরে নিয়ন্ত্রণ অর্জনের মাধ্যমে। ঐতিহ্য-চেতনা এমনিভাবে প্রয়োগবাদী রূপ নিয়েছে। বাংলায়, এমনকি আফ্রো-এশীয় দেশগুলোর কোনোটিতেও ইউরোপীয় ধাঁচের জাগৃতি ঘটেনি। উনিশ শতকের বাংলার জাগরণেও দেখা যায় খণ্ডিত ঐতিহ্য-চেতনার এবং প্রচুর সাম্প্রদায়িক উপাদানের সমাবেশ।

অধিকাংশ দেশের দীর্ঘকালের ইতিহাসে পরিলক্ষিত হয় বিভিন্ন বাধার মধ্য দিয়েও ঘটনার প্রবহমানতা এবং অনেক ক্ষেত্রেই সভ্যতা-সংস্কৃতির ধারাবাহিকতা। বখতিয়ার খিলজির অশ্বারোহী

বাহিনী বিহারে ও উত্তরবঙ্গে ঢুকবার সঙ্গে সঙ্গেই ইতিহাস শুরু হয়নি। এ-দেশের সভ্যতা-সংস্কৃতির ইতিহাস অনেক পুরনো। *সেই ইতিহাসের ধারা আজকের দিনেও প্রবহমান।* বর্তমান কালের বাংলা ভাষাভাষী অঞ্চলে ছিল কতকগুলো খণ্ড খণ্ড জনপদ। আর ছিল অস্ট্রিক, দ্রাবিড় ও তিব্বতি-চিনা ভাষাভাষী অনেকগুলো কৌম বা বিভিন্ন নৃগোষ্ঠীর লোকজন। এই কৌম লোকগোষ্ঠীর ভাষা ও সংস্কৃতির সঙ্গে বাইরে থেকে আসা ইন্দো-আর্য নরগোষ্ঠীর এবং তাঁদের ভাষার সংস্পর্শ, সংঘাত ও সংমিশ্রণ ঘটেছিল। পূর্বোক্ত জনপদগুলি নিয়ে গঠিত কোনো অখণ্ড আঞ্চলিক সত্তার বিকাশ কৌমগুলির বিচ্ছিন্নতা ও তাদের প্রবল আঞ্চলির কৌম চেতনার দরুন তখন সম্ভব ছিল না। সেইজন্য লক্ষ্য করা যায় উপ-মহাদেশের পূর্বাঞ্চলে তখন একভাষিক জাতিসত্তার বা রাষ্ট্রসত্তার অনুপস্থিতি। পাল-সেন-চন্দ্র-বর্মণ আমলেই এই অঞ্চলে ও কৌমগুলির মধ্যে সংহতি এসেছিল কি না, সে বিষয়ে তর্ক চলতে পারে। তবে এ যুগ ছিল প্রত্ন-বাংলা, সাহিত্যের ভাষা অবহট্‌ঠ ও বাংলা লিপি এবং চিত্রকলা ও স্থাপত্য নিয়ে গঠিত Eastern India School of Art বা পূর্ব-ভারতীয় পদ্ধতির শিল্পকলার বিকাশের যুগ। কৌমগুলো তখন কিছুটা সংহত না হয়ে থাকলে শুধু মাত্র রাজ-পোষকতায় কি এ ধরনের বিকাশোন্মুখ সভ্যতা-সংস্কৃতি জন্ম নিতে পারত?

আমরা আগেই দেখেছি, সে কালের বিচ্ছিন্ন জনপদগুলির সমন্বয়ে প্রশাসনিক প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে চৌদ্দ শতকের প্রথম দিকেই একটি যুক্ত বাংলা গড়ে উঠেছিল। 'বাংলা' শব্দটিও তখন থেকেই আজকের দিনের সমগ্র বাংলা-ভাষাভাষী অঞ্চলের নাম হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছিল। এই আঞ্চলিক একত্রীকরণের প্রক্রিয়ার সঙ্গে সম্পর্কিত, ভাষা ও সংস্কৃতি-ভিত্তিক জাতি গঠনের বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ। প্রায় তিনশো বছর ধরে অবহট্‌ঠ ও Proto Bengali বা প্রত্ন-বাংলার স্তর পার হয়ে বাংলা ভাষা চোদ্দো পনেরো শতকের দিকে এসে পুরাপুরি Middle Bengali বা মধ্যকালীন বাংলার প্রাথমিক স্তরে পৌঁছে গিয়েছিল। প্রত্ন-বাংলার উদাহরণ পাওয়া যাচ্ছে চর্যাপদ সংজ্ঞক গীতিগুচ্ছে। আর মধ্যকালীন বাংলার রূপ দেখা দিয়েছে পনের শতকে লেখা চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে। পনেরো ষোলো শতকের দিকে হিন্দু ও মুসলমান কবিগণ দেশি সংস্কৃতি গঠনের জন্য বাংলা ভাষার উপযোগ ও ব্যবহার সম্বন্ধে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন। সংগত কারণেই বলা যায়, একই প্রশাসনিক কাঠামোর আওতায় প্রাচীন জনপদগুলির একত্রীকরণ, এই সংযুক্ত ভূখণ্ডের প্রতি আজকের দিনের অতি পরিচিত শব্দ বা দেশনাম 'বাঙলা'র প্রয়োগ, গঠনগতভাবে বাংলা ভাষার পূর্ণতা প্রাপ্তি, মধ্যযুগীয় বাংলার বিবর্তন ও বিকাশ লাভ এবং একই সাহিত্যিক ঐতিহ্যের মাধ্যমে তার পরিণতি লাভ বাংলার সাংস্কৃতিক ইতিহাসের কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। আর এসব ঘটেছিল পনেরো ষোলো শতকের মধ্যেই। এই সময়টিকে আমরা ভাষাভিত্তিক বাঙালি লোকগোষ্ঠী গঠনের কালরূপে চিহ্নিত করার পক্ষপাতী। বাঙালির এথ্‌নিক উপাদানগুলির উৎস যে-সকল নৃগোষ্ঠীর মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায়, ভাষাগত উপাদানগুলিও সেই একই উৎস থেকে উদ্‌গত। কারণ ভাষার সৃষ্টি বহু লোকগোষ্ঠীর মিলন-মিশ্রণের ফলে। সেইজন্য মনে হয়, বাংলা ভাষায় কম পরিমাণে আছে অস্ট্রিক, মঙ্গোলীয় ও দ্রাবিড় উপাদান এবং বেশি পরিমাণে আছে ইন্দো-আর্য উপাদান। সমরূপবিশিষ্ট একটি সাহিত্যিক ভাষা বাংলার সমগ্র অঞ্চল ব্যাপী পনেরো শতকের মধ্যেই ছড়িয়ে পড়েছিল। বর্তমান কালে সর্ব বঙ্গীয় সাহিত্য মাধ্যম রূপে ব্যবহৃত বাংলা ভাষার প্রাক-আধুনিক রূপটি মালাধর বসুর শ্রীকৃষ্ণবিজয়, কীর্তিবাসের রামায়ণ, বিপ্রদাসের মনসা-বিজয় প্রভৃতি পনেরো শতকের কাব্যগুলির ভাষায় দৃষ্টিগোচর। হাজার বছরেরও অধিক সময় ধরে বহুভাষিক উপাদান মিশ্রিত ও সমন্বিত হয়ে এ ভাষার রূপ ও আত্মা গড়ে তুলেছে। বাংলা ভাষা আজ বাঙালির আত্ম-পরিচয়ের প্রতীক-চিহ্ন।

শুধু বাংলা ভাষাই নয়, কতকগুলি ধর্মভিত্তিক সংস্কৃতিও বিবর্তনের বিচিত্র পথ পার হয়ে আজকের বাঙালি সমাজের কাছে পৌঁছে গেছে। বাংলায় আর্য সভ্যতার বড় অবদান সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য, জাতিবর্ণ প্রথা (caste system) এবং বৈদিক ও পৌরাণিক দেবতাকুলের বিশদ পরিকল্পনা। বিবর্তনের বিভিন্ন স্তর অতিক্রম করে সংস্কৃত আজকের দিনেও টিকে আছে। সংস্কৃতের প্রভাবে বাংলা ভাষা সমৃদ্ধ হয়েছে তৎসম ও তদ্ভব শব্দের প্রাচুর্যে। বাংলা ব্যাকরণও তৈরি হয়েছে সংস্কৃত ভাষার ব্যাকরণের আদলে। বাংলা ভাষায় সাঙ্গীকৃত এই উপাদানগুলি জাতিধর্ম নির্বিশেষে বাঙালির ঐতিহ্য ও সম্পদ। স্মৃতি-শাসনকে ভিত্তি করে গড়ে-ওঠা জাতিবর্ণ প্রথা মুসলিম আমলে রাজশক্তির পোষকতা-বর্জিত ব্রাহ্মণদের হাতেই সুসংহত হয়েছিল। কৃষিনির্ভর সামন্ততন্ত্রের সঙ্গে সম্পর্কিত জাতিপ্রথা পরোক্ষভাবে ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্প-কারিগরির উন্নয়নের বাধা সৃষ্টি করেছিল। বর্তমানে আর্থ-সামাজিক কারণে জাতি-প্রথা বিধ্বস্ত—হিন্দু সমাজের জাতিশ্রেণিগুলির মধ্যে সামাজিক সংহতি সৃষ্টি করতে গেলে এই প্রথা এখন বোধ হয় বড়ো রকমের বাধা হয়ে দাঁড়াবে না।

মুসলমান আমলে আর্য সংস্কৃতি রূপান্তরিত হচ্ছিল। রাজ-পোষকতা-বর্জিত ব্রাহ্মণ্য-সংস্কৃতি হিন্দু সমাজের উঁচু স্তরের মধ্যে নিজের জন্য স্থান করে নিচ্ছিল। লোক-সংস্কৃতির উপাদানগুলি অর্থাৎ লৌকিক দেবদেবী, কৌম সমাজের জড়োপাসনার প্রতীক ও কৌলচিহ্ন জাতীয় উপাদানগুলি এই শূন্যতার সুযোগে অনার্য স্তর থেকে উঠে এসে সমাজের পুরোভাগে দেখা দিল। ব্রাহ্মণ্য সমাজের তাত্ত্বিকদের স্বীকৃতি পেয়ে প্রথমে স্মৃতি-পুরাণে দেওয়া পূজা-বিধানে, পরে মঙ্গলকাব্যগুলিতে লৌকিক দেবতাগণ স্থান পেয়ে গেলেন। লৌকিক দেবদেবীর রূপকল্পনার বিবর্তন ও প্রতিষ্ঠা ঘটে মুসলিম আমলে এবং কতকটা মুসলিম শাসনের পরোক্ষ প্রভাবে। পূর্বোক্ত রূপান্তরের প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে এসে ব্রাহ্মণ্য-সংস্কৃতির চেহারা ও আত্মা বদলে গেল। ব্রাহ্মণ্য-সংস্কৃতি লোকসংস্কৃতির কাছাকাছি এল। চৈতন্যের আবেগাশ্রিত বৈষ্ণবধর্ম বোধ হয় এই সামাজিক প্রক্রিয়াকে সহজতর করে তুলেছিল। বর্তমানের হিন্দু সংস্কৃতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল ধর্মীয় আনুষ্ঠানিকতায় সামাজিক ও শৈল্পিক উপাদানগুলির প্রাধান্য। যখন বর্ণপ্রথার কঠিন শাসন নেই, পূজা-অর্চনার কঠোর বিধি-বিধান নেই, তখন হিন্দুসমাজের ভিতরে বিভিন্ন শ্রেণির মধ্যে সংহতি আনয়ন এবং এই সংহত সমাজ-ব্যবস্থাকে বৃহত্তর জাতি ও স্থিতিশীল রাষ্ট্রগঠনের কাজে নিয়োগ করা কঠিন নয়।

ব্রাহ্মণ্যবিরোধী বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম এককালে বাংলায় প্রবল ছিল। আট শতক থেকে বারো শতকের মধ্যে মহাস্থান-পাহাড়পুর-দিনাজপুর এলাকায় (সে কালের পৌণ্ড্রবর্ধনে) ময়নামতি-লালমাই অঞ্চলে (সে কালের সমতটে) এবং মুর্শিদাবাদের অন্তর্গত রাজবাড়ি ডাঙ্গায় (শশাঙ্কের রাজধানী শহর কর্ণসুবর্ণে) বৌদ্ধ ধর্মের প্রসার যে কত ব্যাপক ছিল তার প্রমাণ মেলে সাম্প্রতিক কালের উৎখননের ফলে উন্মোচিত বিহার-সংঘারাম-স্তূপ-মন্দির-ভাস্কর্যের বহুবিচিত্র রূপে ও চারিত্র্যে এবং সাত শতকের চিনা পর্যটক হিউয়েন-সাঙের বিবরণে। রূপান্তরের বিভিন্ন পর্যায় পার হবার পর মুসলিম শাসনের প্রাক্কালে এই ধর্মের যে আদলটি টিকে রইল তা হঠযোগকেন্দ্রিক অন্তর্মুখী কায়া-সাধনা। প্রায় একই ধরনের প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে ব্রাহ্মণ্য-তন্ত্রেরও বিবর্তন ঘটছিল। তার ফলে বৌদ্ধতন্ত্র স্বাভাবিক সামাজিক ও ধর্মীয় যোগাযোগের মাধ্যমে ব্রাহ্মণ্য-তন্ত্রে বিলীন হল। তবে বৈষ্ণব সহজিয়া ধর্মে, কতকগুলি প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ মতে এবং পরবর্তী কালের বাউল সাধনায় বৌদ্ধ সহজিয়া তন্ত্রের জের বোধ হয় টিকে রইল। মধ্য যুগের দক্ষিণ-পূর্ব বাংলায় লেখা সুফি কাব্যগুলিতে পরিলক্ষিত যোগতান্ত্রিক মরমি দর্শন বোধ হয় তান্ত্রিক বৌদ্ধ ধর্মের সঙ্গে কোনো না কোনো যোগসূত্রে গাঁথা। বর্তমানে বাংলাদেশে বসবাসকারী বৌদ্ধগণ বর্মি থেরবাদী সম্প্রদায় থেকে উদ্ভূত। জাতি-গঠনের কাজে তাঁদের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ পরিপ্রেক্ষিত অর্জন করতে পারবে।

মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠার পর সাধারণ নিম্নশ্রেণির হিন্দু, বৌদ্ধ ও কৌম সমাজের লোকজন ইসলামে দীক্ষা নেন। নবদীক্ষিত লোকজনের সংস্কৃতিতেপ্রায় অটুট রইল পূর্বোক্ত শ্রেণিগুলির মধ্যে প্রচলিত অনার্য ধ্যান-ধারণা—জড়বাদী ও প্রতীকবাদী মানসিকতা। মুসলমানদের এই অনার্য সংস্কৃতিই উনিশ শতকের মৌলবাদী ওহাবি ফরায়জি বিরোধিতার সম্মুখীন হয়েছিল। তবে মুসলমান সমাজে এই গ্রামীণ সংস্কৃতির জের আজও টিকে আছে। সংস্কৃতির এই এলাকাটিতে গ্রাম্য হিন্দু ও গ্রাম্য মুসলমানদের মধ্যে বিরোধ বা বিভেদ প্রায় সাম্প্রতিক কাল পর্যন্ত তেমন একটা ছিল না। মুসলিম সংস্কৃতির অন্য একটি রূপ শহরবন্দরকেন্দ্রিক। তা গড়ে উঠেছিল মুসলিম শাসক-শ্রেণি, উলামা ও অন্যান্য বিদেশাগতদের নিয়ে এবং প্রথমে আরবি-ফারসি এবং পরে ফারসি-উর্দুকে অবলম্বন করে। উর্দু-ফারসিভিত্তিক সংস্কৃতি প্রায় সাম্প্রতিক কাল পর্যন্ত টিকে থাকলেও ভাষাগুলিকে কেন্দ্র করে গড়ে-ওঠা অভিজাত শ্রেণি বিধ্বস্ত হয়েছে ব্রিটিশ আমলে। বাংলাভাষী মুসলিম মধ্যবিত্তের উদ্ভব ও বিকাশ উনিশ শতকের শেষার্ধের আগে সম্ভব হয়নি আর্থ-সামাজিক কারণে। বৌদ্ধ ও হিন্দু সমাজের নিম্ন স্তর থেকে দীক্ষিত মুসলমানগণ স্বাভাবিকভাবে তাদের আদি পেশায় পুরুষানুক্রমে নিয়োজিতথাকলেন। সামাজিক গতিশীলতা সৃষ্টির জন্য কতকগুলি চালিকাশক্তির দরকার। এ গুলি হচ্ছে উচ্চ শিক্ষা গ্রহণের মাধ্যমে পেশার পরিবর্তন, ধন সঞ্চয় বা পুঁজির গঠন এবং ভূমি ও রাজশক্তির উপর নিয়ন্ত্রণাধিকার অর্জন। এ-সব চালিকা-শক্তির কোনোটিই সাড়ে ছশো বছরে বাঙালি মুসলমানদের অধিগত হয়নি। হিন্দু সমাজে এই শক্তিগুলি বরাবর সক্রিয় ছিল বলে প্রাক-মুসলিম আমল থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত সেই সমাজে প্রায় একটানাভাবে একটি মধ্যশ্রেণির অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যাচ্ছে। ইতিহাসের এই অসমগতির দরুন হিন্দু ও মুসলিম মধ্যবিত্তের ইতিহাসও আর্থ-সামাজিক কারণেই অনেকটা স্বতন্ত্র হয়ে গিয়েছিল। চৈতন্যের বৈষ্ণববাদ, উনিশ শতকের রেনাইসাঁস ও চলমান শতকের খিলাফত আন্দোলন এই স্বাতন্ত্র্যকে ঘোচাতে পারেনি। সুযোগ্য রাজনৈতিক নেতৃত্বের প্রভাবে রাষ্ট্রীয়, আর্থনীতিক ও সাংস্কৃতিক ঐক্যের মাধ্যমে এই সামাজিক দীর্ণতার এখন অবসান হতে পারে।

হিন্দু ও মুসলমান ছাড়া বাংলাদেশে বৌদ্ধ-খ্রিস্টান আছেন। আর সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রান্তিকতা নিয়ে দেশের প্রান্ত-সীমায় আছেন বেশ কয়েকটি উপজাতীয় গোষ্ঠীর লোকজন। আমরা অন্যত্র বলেছি, হিন্দু-মুসলিম-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান এবং উপজাতিদের মধ্যকার সামাজিক বিচ্ছিন্নতা আর্থনীতিক বৈষম্যেরই একটি রূপ। এই সমস্যার সমাধান হতে পারে সমগ্র আর্থ-সামাজিক কাঠামো ও অর্থনীতির রূপান্তরের মধ্য দিয়ে। কৃষির উন্নতি এবং নির্দিষ্টভাবে ব্যাখাত নীতির ভিত্তিতে প্রয়োজন মতো ভূমির পুনর্বণ্টন এবং ধনতান্ত্রিক অর্থনীতিকে egalitarian social structure বা সমতাবাদী সমাজ-ব্যবস্থার উপযোগী করে তোলার কাজ এই আর্থ-সামাজিক রূপায়ণে সহায়ক হতে পারে। এই সুদূরপ্রসারী কর্মসূচির জন্য একটি পূর্ব শর্ত হচ্ছে রাজনীতিতে সকল স্তরের লোকজনের ব্যাপক অংশ গ্রহণ, আর তার সার্থক বাস্তবায়নের লক্ষ্যে রাষ্ট্র-দর্শনের ও প্রশাসনিক কাঠামোর যথার্থ সামাজিকীকরণ। উপজাতীয় কৌমগুলির মধ্যে প্রচলিত অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠান, আচার-সংস্কার এবং জীবন-ব্যবস্থার সামাগ্রিকতাকে মানবিক সহানুভূতির সঙ্গে দেখতে পারলে, আধুনিক শিক্ষা, বিজ্ঞান, প্রকৌশল এবং সভ্যতার যাবতীয় উপাদান তাঁদের দ্বারপ্রান্তে পৌছিয়ে দিয়ে তাঁদের সামাজিক জীবনের পরিপূর্ণ বিকাশের পথ খুলে দিলে একটি দীর্ঘস্থায়ী আর্থ-সামাজিক প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়ে তাঁরা বাঙালিদের অন্যান্য শ্রেণির কাছাকাছি আসবেন।

আমাদের দেশের হিন্দু, মুসলিম, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান মধ্যশ্রেণির আর্থ-সামাজিক ইউনিটগুলি পরস্পরের কাছাকাছি অবস্থিত। সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধির সীমা এবং ধর্মীয় সংস্কারের বাধা কিছুটা

ডিঙাতে পারলে এবং বৃহত্তর আর্থনীতিক ক্ষেত্রে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের জন্য উপযুক্ত সুযোগ-সুবিধার পরিবেশ তৈরি হলে সে ক্ষেত্রে সাংস্কৃতিক সমন্বয় অনুভূমিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ত্বরান্বিত হতে পারে। সমাজবিজ্ঞানীদের মতে একই সামাজিক ইউনিটের ভেতরকার ধর্ম, জাতি, উপজাতি ও বর্ণের স্তরগুলি ভেদ করে vertical বা অনুদীর্ঘ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সংস্কৃতির প্রসার বা বিচ্ছুরণ সম্ভব। সেই প্রক্রিয়াটি অনুভূমিক প্রক্রিয়ার চেয়ে ঢের বেশি মন্থর ও জটিল।

বাংলার বিভিন্ন ধর্মীয় লোকগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক সমন্বয় একটি জটিল প্রক্রিয়া। সাংস্কৃতিক উপাদানগুলির সামগ্র্যকে আমরা আমাদের ঐতিহ্য-চেতনার মধ্যে সহজে স্থান দিতে পারি না। এ ধরনের মানসিকতা ব্রাহ্মণিক, বৈষ্ণব, বৌদ্ধ ও মুসলিম সংস্কৃতিকে সমগ্র রূপে দেখে না, দেখে খণ্ড খণ্ড রূপে। এই ধরনের খণ্ডিত মানসিকতাই সুযোগ বুঝে সাম্প্রদায়িক রূপ নেয় এবং বৃহত্তর জাতি-গঠনের প্রক্রিয়াকে নস্যাৎ করে দেয়। অথচ ময়নামতি, মহাস্থান ও পাহাড়পুরের প্রত্ন-নিদর্শনগুলো আমাদের মনে নিবিড় ও ঘনিষ্ঠ অনুভূতি জাগায়, আমরা ওগুলির হৃদ্য আবেদনে আবিষ্ট হই—আমরা ওই স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের হৃৎস্পন্দনের প্রতি আত্মিকভাবে সাড়া দিই। বিদেশি পুরাকীর্তির বেলায় আমাদের মানসিক প্রতিক্রিয়া কি ঠিক সেই রকম? ব্রাহ্মণ্য ধর্ম ও বৌদ্ধ ধর্ম মুসলমানদের ধর্ম নয়। সেই জন্য এই যুক্তি অত্যন্ত স্বাভাবিক যে, ধর্ম দুটির শৈল্পিক অবদানগুলির সঙ্গে মুসলমানদের আত্মিক সম্পর্ক স্থাপন সম্ভব নয়। সাংস্কৃতিক অবদানের ক্ষেত্রে ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের পক্ষে বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য শিল্পের সঙ্গে একাত্মবোধ সৃষ্টি করতে গেলে বোধ হয় কোনো অলঙ্ঘনীয় বাধা দেখা দেয় না। ধর্ম দুটির যে ধারণা ও রূপ স্থাপত্য, ভাস্কর্য, চিত্রকলা ও সাহিত্যের মধ্য দিয়ে প্রকাশ পায়, তা অনেক ক্ষেত্রেই ধর্ম নয়, তা দর্শন ও শিল্পের এক বিচিত্র সমন্বয়। এই ভূখণ্ডের স্থায়ী বাসিন্দারা জাতিতত্ত্বের দিক দিয়ে (ethnically) সমশ্রেণিভুক্ত (homogeneous), খাদ্যাভাসের দিক দিয়ে অনেকটা অস্ট্রিক, দৈহিক ও মানসিক গঠনের দিক দিয়ে আর্য-অনার্য-সেমেটিক এবং আরো বহু নৃগৌষ্ঠিক উপাদানের মিশ্র রূপ। এই মতবাদের প্রতি কিছুমাত্র সহানুভূতি বা সমর্থন থাকলে দেখা যাবে যে, হিন্দু ও বৌদ্ধ সংস্কৃতি মুসলমানদের সম্পূর্ণ অনাত্মীয় নয়। সুদুর অতীত থেকে আজ পর্যন্ত যা কিছু এ দেশে ঐতিহ্যের রূপ নিয়েছে, তা বৌদ্ধ-হিন্দু ধর্ম, ইসলাম, উপজাতীয় প্রত্যয় ও অনুষ্ঠান, যে কোনো উৎস থেকেই এসে থাকুক না কেন—তা দৈশিক সংস্কৃতির অপরিহার্য অঙ্গ। তার কোনো অংশ বাদ দিয়ে এই অঞ্চলের সভ্যতা-সংস্কৃতি পূর্ণাঙ্গ হতে পারে না। রাসায়নিক ক্রিয়ার মাধ্যমে বহু উপাদনের মিশ্রণে প্রস্তুত যৌগিক পদার্থের মতোই এই সংস্কৃতির রূপ ও আত্মা অনেকগুলি কৃষ্টির উপকরণ নিয়ে গঠিত একটি মিশ্র ইউনিট। আঞ্চলিক সত্তা ও বহির্মুখী মানসিকতার টানাপোড়েনে ভূগোলে জাতি-গঠন সম্ভব হবে না। রাষ্ট্র গঠনের প্রক্রিয়া দুর্বল হয়ে যাবে, অতি-গুরুত্বপূর্ণ ভাষা আন্দোলনও তাৎপর্য হারাবে। ইতিহাসে দেখা গেছে, বাংলার মুসলমান সব সময়ে একটি দ্বিধাগ্রস্ত সত্তা (split personality)। বর্তমানের বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদ ও বাঙালি জাতীয়তাবাদের ফুকর দিয়ে কি সেই সত্তাই উঁকি দিচ্ছে? রাষ্ট্রের নাম বাংলাদেশ। সেইজন্য এই দেশের প্রত্যেকের রাষ্ট্রীয় বা নাগরিক সত্তা বাংলাদেশি। কিন্তু আবহমানের ভাষাভূগোল-সংস্কৃতির ভিত্তিতে গঠিত জাতিসত্তার দিক দিয়ে সবাই এখানে বাঙালি। *

বাঙালি জাতির রূপান্তর

আবদুল হক

বাঙালি সামরিক জাতি নয়, এ কথা এখন কেউ আর চট করে বলতে পারবে না। একাত্তরের পর বলা সম্ভব নয়। অথচ বহুকাল যাবৎ তার এই বদনাম ছিল। এর কারণ বোঝা কঠিন নয়। পাকিস্তান সরকার, এবং তাঁদের আগে বহু শতাব্দী যাবৎ আরও বহু রকমের সরকারে সবাই ছিলেন বহিরাগত, মুসলিম আমল সম্বন্ধেও এ কথা খাটে। এদেশে শাসন ও শোষণ ছিল সকলেরই লক্ষ্য, অতএব বাঙালির হাতে অস্ত্র দিতে তাঁদের ভরসা হয়নি। সৈনিকবৃত্তি একটা অর্থকরী পেশা, ক্ষমতার অন্যতম উৎস অস্ত্র। এই পেশায় এবং ক্ষমতার উৎসে ভাগ বসাবার সুযোগ প্রজাকে কে-ই-বা দিয়ে থাকে। অতএব বাঙালিকে প্রদমিত রাখার জন্যই ওই বদনাম রটানো হয়েছিল।

কিন্তু বাঙালি সামরিক জাতি এ কথা বলার আগেও ক্ষণকাল চিন্তা করতে হয়। সামরিক জাতি বলতে কী বোঝায়? পৃথিবীতে এমন বহু মানবগোষ্ঠী আছে যারা সমাজ হিসাবে সর্বদাই সশস্ত্র; ব্যক্তিগত পারিবারিক অথবা গোত্রীয় কারণে কথায় কথায় অস্ত্র ব্যবহারে এবং পরস্পর হানাহানিতে অভ্যস্ত, যুদ্ধে তারা নির্ভয় ও নিপুণ, যুদ্ধ তাদের পেশা, জাতীয় সৈনিক হিসাবে অথবা ভাড়াটে সৈন্য হিসাবে। স্বদেশরক্ষায় এরা বীর সৈনিক অথবা পররাজ্য গ্রাসে এবং নিরস্ত্র জনসমাজ দমনে নিষ্ঠুরতম যন্ত্র। সাধারণত এদেরই বলা হয় সামরিক জাতি।

এই অর্থে বাঙালি সামরিক জাতি নয়, কেননা এইসব লক্ষণের প্রায় সবই তার জীবনে অনুপস্থিত। যুদ্ধ তাদের পেশা নয়। কিন্তু বাঙালি যুদ্ধ করতে পারে না, যুদ্ধকে ভয় পায়, সুশিক্ষিত আধুনিক অস্ত্রসজ্জিত সেনাবাহিনীর সম্মুখে নিরীহ অক্ষম, এইসব অপবাদ এখন প্রায় কিংবদন্তি। বাঙালি জাতির এই রূপান্তর কী করে সম্ভব হল, বাঙালির অতীত ইতিহাসে কালিমালেপন হয়েছিল কী করে, তার বিশ্লেষণ ও মূল্যায়ন রণ-অভিজ্ঞ ও পণ্ডিত ব্যক্তিদের করণীয়, যেন বাঙালি জাতি আবার সেই অপমানময় অতীতের

ইতিহাসে নিমজ্জিত না হয়। তথাপি ইতিহাসের ইঙ্গিত এবং আমাদের সাম্প্রতিক অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে দু একটি কথা বলা চলে।

প্রকৃতিগতভাবে বীর-জাতি এবং ভীরু-জাতি বলে কোনো নিঃসংশয় সত্য নেই, যেমন মৃত্যুবিপন্ন সন্তানের জন্য প্রাণ দেওয়ার বেলায় কোনো সমাজের পিতামাতারা প্রকৃতিগতভাবে অপর কোনো সমাজের পিতামাতাদের তুলনায় ভীরু এমন কোনো প্রমাণ নেই, যদিও ব্যক্তিগত ক্ষেত্রে সাহসের তারতম্য হতে পারে। তথাপি কোনো জাতিকে যে বীর-জাতি বলে মনে হয় এবং কোনো জাতিকে ভীরু বলে, তার কারণ ইতিহাস তাদেরকে কোনো-এক বিশেষ পরিস্থিতিতে স্থাপন করেছে এবং সে ইতিহাস বহুলাংশে তাদেরই সৃষ্টি; তাদের দেশপ্রেম, চেতনা, সংস্কৃতি এবং আরও অনেককিছুর সংমিশ্রণে সৃষ্ট সেই ইতিহাস। তথাকথিত ভীরু-জাতি ইতিহাসকে নূতন করে সৃষ্টি করার যথেষ্ট উদ্যোগ নিতে পারছে কি না, নিজের নিয়তিকে এবং ঠিক মুহূর্তটিকে চিনে নিতে পারছে কি না এবং তার চেয়েও বড়ো কথা—তার যথেষ্ট দেশপ্রেম আছে কি না তারই ওপর নির্ভর করে তারা বীর-জাতি হয়ে উঠতে পারবে কি না।

কোনো স্বীকৃত বীর-জাতির নৈতিক চরিত্রে এবং দেশপ্রেমে স্খলন ঘটলে এবং তারা অপ্রজ্ঞায় আচ্ছন্ন হলে অনতিবিলম্বে সে জাতি ভীরু অথবা অক্ষম জাতিতে পরিণত হতে পারে। এর অনেক উদাহরণ আছে। বীর-জাতি হিসাবে গ্রিক, পারসীয়, আরব, পাঠান অথবা মোগলের স্থান এখন শুধু ইতিহাসে, বাস্তবে নয়। জাতি হিসাবে পাঠান ও মোগল বিলুপ্ত, আরব ক্ষুদ্র ইসরাইলের পদানত। ইউরোপের কয়েকটি জাতিকে এখনও বলা চলে বীর-জাতি অথবা তথাকথিত বীর-জাতি : ইংরেজ, ফরাসি, স্পেনীয়, পোর্তুগিজ : ন্যায়, অন্যায় যে-কোনো কারণে যুদ্ধ করতে পারে এই অর্থে। চল্লিশেরও কিছু পরে এদের পৃথিবীময় সাম্রাজ্য ছিল, এখন পোর্তুগাল ছাড়া আর প্রায় কারোই দৃশ্যসাম্রাজ্য নেই, 'ভীরু' জাতিরা সশস্ত্র সংগ্রামের পর এইসব বীর-জাতিকে বিতাড়িত করেছে। এখন ছদ্মবেশে অথবা অন্যভাবে কোনো কোনো সাম্রাজ্যবাদী জাতি অর্থনৈতিক সাম্রাজ্য অথবা উপনিবেশ বিস্তার করতে চাইছে : কিন্তু সে অন্য কথা। অস্ত্রচালনা ছাড়া আর কোনো নৈপুণ্যকে আমরা আপাতত বীরত্বের লক্ষণ বলে ধরছি না। ওই চল্লিশেরই কিছু আগে অথবা পরে চিনা, ইন্দোনেশীয়, মালয়েশীয়, ভিয়েতনামি, আলজেরীয় অথবা এশিয়া ও আফ্রিকার অন্যান্য জাতিকে ভীরু বলা চলত, এই সেদিন অবধি ভীরু-জাতি বলা হয়েছে বাঙালিকে। কিন্তু এশিয়া ও আফ্রিকার এইসব জাতিই সশস্ত্র সংগ্রাম ও বিপ্লবের ইতিহাস রচনা করেছে পরাক্রান্ত রণ-অভিজ্ঞ সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলিকে পরাভূত করে।

এটা সম্ভব হয়েছে অনেকগুলি কারণের মধ্যে বিশেষ একটি কারণে, সেটি হচ্ছে জ্বলন্ত দেশপ্রেম। এর আধুনিকতম উদাহরণ বাংলাদেশ। মুক্তিবাহিনীর তরুণদের যুদ্ধের অভিজ্ঞতা ছিল না (ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের জোয়ানদের ছাড়া), ট্রেনিং ছিল অল্প দিনের, আধুনিক অস্ত্রশস্ত্র ছিল সামান্য। ব্যক্তিগত কোনো লাভই তারা আশা করেনি, তথাপি একটা সুসজ্জিত পরাক্রান্ত বাহিনীর মোকাবিলা করতে তারা দ্বিধা করেনি। কারও প্রলোভনে নয়, বলপ্রয়োগে নয়, অধিকাংশ ক্ষেত্রে বাপ-মাকে না জানিয়ে স্বদেশের হাতছানিতে একদিন তারা উধাও হয়েছে। দেশপ্রেম অথবা যে-কোনো আদর্শে উদ্দীপ্ত হলে খর্বকায়

শীর্ণদেহ তরুণও ছুরির ফলার মতো তীক্ষ্ণ হয়ে উঠতে পারে; দেশপ্রেম এবং আদর্শের অভাবে দীর্ঘদেহী সুপুষ্ট তরুণ মাংসপিণ্ড মাত্র। সংগ্রামী জাতি মাত্রেরই বিপ্লবী তরুণদের জন্য এ কথা সত্য। এসব জাতির এবং বিশেষ করে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার তরুণেরা তাদের প্রতিপক্ষ শ্বেতাঙ্গদের তুলনায় ক্ষীণকায় এবং খর্বকায়। কিন্তু পরাক্রমে তারা খাটো ছিল না। স্বাধীনতা-সংগ্রামে এবং আগ্রাসনের মুখে স্বদেশরক্ষায় দেশপ্রেম এবং জ্বলন্ত দেশপ্রেমই প্রধানতম অস্ত্র।

প্রধানতম, কিন্তু একমাত্র অস্ত্র নয়। রণনৈতিক এবং রাজনৈতিক প্রজ্ঞাও যে-কোনো যুদ্ধে প্রধান অস্ত্র, সেই সঙ্গে কূটনৈতিক প্রজ্ঞা। এর যে-কোনোটির অভাবে সংগ্রামী বাহিনী পরাভূত হতে পারে। কিন্তু দেশপ্রেম অথবা কোনো একটা আদর্শের তীব্র আকর্ষণ ছাড়া এসব অস্ত্র বেশি কাজে আসে না। বাঙালিকে বহু শতাব্দী যাবৎ পরাধীন থাকতে হয়েছে মূলত দেশপ্রেমহীনতার জন্য। এবং এই দেশপ্রেমের অভাব পুনরায় বাঙালিকে পুরাতন অতীতে নিক্ষেপ করতে পারে। অনেক জাতির বেলায় দেখা গেছে শুধু রণকুশলতা এবং রণপ্রিয়তাই একটা জাতিকে স্বাধীন সমুন্নত রাখতে পারে না, দেশপ্রেমের এবং রাজনৈতিক প্রজ্ঞার অভাব ঘটলে এই রণপ্রিয়তাই আত্মকলহের মধ্য দিয়ে সে জাতিকে ধ্বংসের পথে টেনে নিয়ে যেতে পারে। নিজের অধিকারের সীমা অতিক্রম করলে, অপর জাতির সম্পদের প্রতি অথবা একই জাতির এবং সমাজের এক অংশ অপর অংশের প্রতি লোলুপ দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে, নৈতিক অধঃপতন ঘটলে, বিলাসিতায় আক্রান্ত হলে এবং আরও কোনো কোনো কারণে এক সময়ের রণকুশল জাতি আর-এক সময়ের ধ্বংসস্তূপে পরিণত হতে পারে।

রণকুশল শব্দটা, অতএব, একটা আপেক্ষিক শব্দ। যুদ্ধের সঙ্গে কোনোরকম প্রত্যক্ষ সম্পর্ক নেই এমন সামাজিক গুণাবলির পরিপ্রেক্ষিতে এর তাৎপর্য, ওইসব গুণাবলির যথাযথ সংমিশ্রণে এর সার্থকতা। কোনো দেশের নাগরিকবৃন্দ সমাজ, সংস্কৃতি, দেশ, জাতি এবং বৃহত্তর জগৎ সম্পর্কে এবং মানবতা ও বিভিন্ন আদর্শ সম্পর্কে কীরূপ মনোভঙ্গি, আবেগ ও নৈতিক দায়িত্ব অঙ্গীকার করে, সমগ্র জাতির পরিপ্রেক্ষিতে এরূপ নাগরিকবৃন্দ এবং তাদের অঙ্গীকারের আনুপাতিক হার কত তার উপর নির্ভর করে তাদের, অর্থাৎ বিশেষ একটা জাতির, কী পরিমাণ রণকুশলতার অধিকারী হওয়া সম্ভব এবং এই রণকুশলতার সার্থকতা কতখানি। সশস্ত্র ডাকাতি-ছিনতাই ইত্যাদি সব সমাজেই কিছু-না-কিছু থাকে। কিন্তু মনে করা যাক কোনো একটি জাতি অথবা অন্য ধরনের মানবগোষ্ঠীর সকল ব্যক্তিই শারীরিকভাবে সমর্থ এবং নিপুণ অস্ত্রধারী; কিন্তু তারা সামাজিক এবং জাতীয় দায়িত্বের কোনো ধার ধারে না; তারা মৃত্যুভয়হীন, মানবজীবন তাদের কাছে তুচ্ছ, তারা বোঝে শুধু ব্যক্তিস্বার্থ অথবা কোনো একটি ক্ষুদ্র দলীয় স্বার্থ। তা হলে অনতিবিলম্বে ওই জাতির মানুষেরা পরস্পর লুণ্ঠন ও হানাহানিতে প্রবৃত্ত হবে, তাদের সমাজ ও জাতি এবং সমাজমানস ও জাতীয়মানস আহত রক্তাক্ত হবে, তার পর একসময়ে কোনো বৃহৎ অথবা ক্ষুদ্র জাতির থাবায় তারা মুহূর্তে ভূতলশায়ী হবে। নিপুণ অস্ত্রধারী মৃত্যুভয়হীন মানুষের সমষ্টিমাত্রকেই অতএব সামরিক জাতি বলা চলে না। যে মানবসমষ্টি বহিরাক্রমণের সম্মুখে আত্মরক্ষার জন্য সংহত হতে অসমর্থ এবং আত্মহত্যাপ্রবণ (কেননা স্ব-সমাজের ব্যক্তিবর্গকে হত্যা

আত্মহত্যারই একটা দিক মাত্র), সে মানবসমষ্টি আদৌ জাতিই নয়, সামরিক জাতি অনেক পরের কথা। দেশপ্রেম এবং নৈতিকতা সেই নিম্নতম শর্ত, যা একটা জাতিকে বেঁচে থাকতে সহায়তা করে। এই দেশপ্রেম শুধু মৃত্তিকাকে কেন্দ্র করে নয়, ওই মৃত্তিকার উপর দণ্ডায়মান মানবমণ্ডলীকে কেন্দ্র করে। এর পরেও দরকার রণকুশলতা, রাজনৈতিক প্রজ্ঞা এবং অন্যান্য গুণাবলি।

একাত্তরে বাঙালি প্রমাণ করেছে অসামরিক জাতি বলতে যা বোঝায় তা এই মানবগোষ্ঠী নয়। রণলোলুপ সামরিক জাতি হওয়ার তার প্রয়োজন নেই, কিন্তু অস্ত্রনৈপুণ্য তাকে আত্মরক্ষায় সমর্থ করে তুলেছে অথবা শিশুর হাতে অস্ত্র তুলে দেওয়ার মতো ব্যাপার ঘটেছে মাত্র তা এখনই বোঝা যাচ্ছে না, যুদ্ধোত্তর বাংলাদেশে অস্ত্রের ব্যাপক অসদ্‌ব্যবহার দেখে।

উৎস : *'সাহিত্য ও স্বাধীনতা'*।
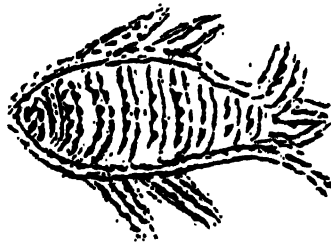
বাংলাদেশের প্রত্নতাত্ত্বিক কর্মতৎপরতা

মুহম্মদ এনামুল হক

প্রত্নতত্ত্বের প্রতি বিদগ্ধ সমাজের আগ্রহ বর্তমানে বেশ কিছুটা বৃদ্ধি পেলেও এ সম্বন্ধে আমাদের অনেকের ধারণা সুস্পষ্ট নয়। ফলে, বাংলাদেশের প্রত্নতাত্ত্বিক কর্মতৎপরতা সম্বন্ধে যেসমস্ত বিশেষজ্ঞ আজ আলোচনা করেন, তাঁদের পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলোচনার তাৎপর্য সম্যক উপলব্ধ হওয়ার কথা নয়। শাস্ত্রটি সম্বন্ধে বেশির ভাগ লোকের অস্পষ্ট ধারণাই এর মূল কারণ। এ সম্বন্ধে কোনো সুস্পষ্ট ধারণা দেওয়া আমার পক্ষেও কঠিন। তথাপি, বাংলাদেশের প্রত্নতাত্ত্বিক তৎপরতাকে কতকটা বুঝতে পারা যায়, এমন একটা ধারণা বোধ হয় দেওয়া চলে।

'প্রত্নতত্ত্ব' বলতে মাটির তলায় চাপা পড়া অথবা মাটির উপরে অরক্ষিত অবস্থায় পড়ে থাকা ঘরবাড়ি, তৈজসপত্র, অস্ত্রশস্ত্রাদির একটা আন্দাজি বিবরণ বলে আমরা সচরাচর মনে করে থাকি। আবিষ্কারের ঔৎসুক্য ও প্রচেষ্টা, বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং ঐতিহাসিক পুনর্গঠনের সৃষ্টি-তৎপরতা যে প্রত্নতত্ত্বে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িয়ে আছে, আমরা সে কথা একরকম ভাবিই না। প্রত্নতত্ত্ব সম্বন্ধে আমাদের এ ধারণা বড্ড সংকীর্ণ। এই সংকীর্ণ ধারণাকে বিস্তৃততর ও সঠিক করে তোলার জন্য শব্দটির ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ আবশ্যক।

'প্রত্নতত্ত্ব' archaeology নামক একটি গ্রিক পারিভাষিক শব্দের বাংলা অনুবাদ। শব্দ দুইটির একটিও 'মৌলিক' নয়— দুইটিই 'গঠিত'। ফলে, অন্যান্য গঠিত শব্দের মতো 'প্রত্নতত্ত্ব'-তেও মূলের পারিভাষিক দ্যোতনা পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান। মূল শব্দটি যেমন arche বা উৎপত্তি এবং logos বা আলোচনা নামক দুটি শব্দের সমাহারে গঠিত, অনূদিত শব্দটিও 'প্রত্ন' বা প্রাচীন এবং 'তত্ত্ব' বা তদ্‌বিষয়ক (সেই বিষয়ে) জ্ঞান অর্থে গঠিত হয়েছে। তাই, গ্রিক archaeology শব্দটিতে 'মানুষের উৎপত্তি-বিষয়ক আলোচনা' এবং বাংলা 'প্রত্নতত্ত্ব' শব্দটিতে 'মানুষের প্রাচীনতা সম্বন্ধে জ্ঞান' বুঝিয়ে থাকে। শব্দ দুটো পারিভাষিক বা বিশিষ্ট অর্থজ্ঞাপক বলে, এর কোনোটিই শাস্ত্রটির পূর্ণ ধারণার দ্যোতক নয়। প্রকৃতপক্ষে শব্দ দুটি মানব-সভ্যতার প্রারম্ভিক যুগের সাথে মূলত সংশ্লিষ্ট হলেও এ সভ্যতায় অবলুপ্তির সাথেও এদের যোগ কম নয়। প্রায়ই দেখতে পাওয়া যায়, কোথাও কোনো বিলুপ্ত মানব-সভ্যতার, যেমন

পম্পিআই, আসিরিয়া, হারাপ্পা প্রভৃতির সন্ধান পাওয়া গেলে তথায় প্রত্নতাত্ত্বিকদের সমাবেশ ঘটতে থাকে, যথাসময় খনন-কার্য চালু হয় এবং ভূগর্ভের প্রত্নবস্তুনিচয় আবিষ্কৃত, পরীক্ষিত ও নিরীক্ষিত হয়। ফলে, সেখানকার বিলুপ্ত সভ্যতার রুদ্ধদ্বার অবারিত হয়,— স্থাপত্য, ভাস্কর্য, শিল্পকলা, জ্ঞানবিজ্ঞান ও জীবনধারা প্রভৃতি কত বিষয়ে যে আলোকপাত করা হয়, তার কোনো ইয়ত্তা থাকে না। তার কোনোটি দেখে আমরা বিস্মিত, কোনোটি পেয়ে আমরা বিমুগ্ধ এবং কোনোটি লাভ করে আমরা নতুন চেতনায় উদ্‌বুদ্ধ হই।

এ ছাড়াও, ভূপৃষ্ঠের উপরিভাগের মানব-সভ্যতা ও সংস্কৃতির অতীত নিদর্শনগুলোও প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধিৎসার অর্থাৎ পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও আবিষ্কারের আওতার বহির্ভূত বস্তু নয়। এখানকার যেসমস্ত অতীত মানবকীর্তি এখনও লোকচক্ষুর অন্তরালে আত্মগোপন করে বেঁচে আছে, অথবা বিলুপ্তির পথে উপেক্ষিত অবস্থায় শনৈঃ শনৈঃ এগিয়ে চলেছে, অথবা এখন একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে, তাদের আবিষ্করণ, সংরক্ষণ ও পুনর্গঠন প্রভৃতিও প্রত্নতত্ত্বের অন্তর্গত এবং প্রত্নতাত্ত্বিকের প্রধান কর্মতৎপরতার মধ্যে অন্যতম। তবে কি মানব-সভ্যতার বর্তমান ও ভবিষ্যৎ কীর্তিনিচয় প্রত্নতত্ত্বের বহির্ভূত বিষয়? প্রত্নতত্ত্ব এ কথা স্বীকার করে না। বর্তমানে মানব সভ্যতা ও সংস্কৃতির যে দ্রুত পরিবর্তন , পরিবর্জন ও পরিবর্ধন সংশোধিত হচ্ছে এবং ভবিষ্যতেও যা হবে, তার স্থিতি, গতি ও পরিণতির প্রতি লক্ষ রাখাও প্রত্নতত্ত্বের ন্যায্য দাবির অন্তর্গত। সত্যিকার প্রত্নতত্ত্ব তা করেও থাকে।

অতএব ভূপৃষ্ঠে মানব-প্রজাতির (species) অবিদিত আবির্ভাবকাল থেকে নিয়ে সুবিদিত স্থিতি, গতি ও বিলয়কাল পর্যন্ত প্রত্নতাত্ত্বিকের অনুসন্ধিৎসার ধারা প্রবাহিত থাকবে। এই কারণেই 'প্রত্নতত্ত্ব' মানব-সভ্যতা ও সংস্কৃতির উন্মেষ, বিকাশ ও বিলয়ের; অন্যকথায় অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ কালের একটি বিরতিবহুল অথচ ধারাবাহিক কাহিনির জ্ঞানদায়িনী আলোচনা।

বলা বাহুল্য, অজানাকে জানার ঔৎসুক্য যেমন পৃথিবীর যাবতীয় বিজ্ঞানের জন্মদাতা এবং বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের মূল প্রেরণা, একটি বিশেষ শাস্ত্র-রূপে প্রত্নতত্ত্বের উৎপত্তির এবং প্রত্নতাত্ত্বিক-এষণার মূলভিত্তিও তেমন অজ্ঞাতকে পরিজ্ঞাত করে তোলার এবং অজানাকে জানানোর মূল আবেগ। বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার যেমন নানাবিধ পরীক্ষা-নিরীক্ষালব্ধ 'সত্য', প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কারও তেমন বহু ধরনের পরীক্ষা-নিরীক্ষা-নির্ভর 'তত্ত্ব'। পাথরে, মাটিতে, গাছের পাতায়, বৃক্ষবল্কলে, লৌহস্তম্ভে বা পর্বতগাত্রে প্রাচীন মানুষের যেসমস্ত লিখিত বিবরণ আবিষ্কৃত হয়েছে, তার গুরুত্ব প্রত্নতত্ত্বে যথেষ্ট হলেও, এসমস্ত সামগ্রীর আবিষ্কৃত 'তত্ত্ব' প্রত্নলিপি বা প্রত্নবস্তুর মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। এসমস্ত 'সত্য' বা 'তত্ত্ব' আবিষ্কারের প্রত্নতাত্ত্বিক প্রচেষ্টা আরও বহুবিস্তৃত। প্রত্নতাত্ত্বিক কর্তৃক 'প্রত্নবস্তুবিশেষ' আবিষ্কৃত হয়। তিনি তাকে শনাক্ত করেন। এমনকি, তার উদ্দেশ্য এবং কার্যকারিতাও উপলব্ধি করেন। কিন্তু, যতক্ষণ তিনি তাঁর প্রাপ্ত বস্তুটির আবিষ্কারকালীন অবস্থার এবং অন্যত্র প্রাপ্ত এজাতীয় বস্তুর সাথে এর সম্বন্ধ, সাদৃশ্য বা বৈসাদৃশ্য ইত্যাদির পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়ে এর সম্বন্ধে একটা নিশ্চিত ধারণা পোষণ করতে না পারেন, ততক্ষণ পর্যন্ত তিনি তার সম্বন্ধে কোনো 'তত্ত্ব', 'সত্য' বা 'তথ্য' প্রকাশ করতে সম্পূর্ণ অক্ষম। অজানাকে জানার ঔৎসুক্য, অজ্ঞাতকে আবিষ্কার করার কৌতূহল যাঁদের মনে চিরন্তন, তাঁদের কাছে প্রত্নতত্ত্ব কোনো প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের চেয়ে কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। তাঁদের কাছে প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কার ভাস্কোডাগামার আমেরিকা আবিষ্কারের চেয়ে অধিক চমকপ্রদ কি না বলতে পারি না। তবে গ্রিক বৈজ্ঞানিক আর্কিমিডিসের 'আপেক্ষিক গুরুত্ব' (Specific Gravity) নামক বৈজ্ঞানিক সত্য আবিষ্কারান্তে আনন্দে আত্মহারা অবস্থায় 'প্রাপ্তোলুপ্তহস্মি'—'প্রাপ্তোলুপ্তহস্মি' (Eureka Eureka) বলতে বলতে তিনি যে উলঙ্গনৃত্য শুরু করেছিলেন, তার চাইতে প্রত্নতাত্ত্বিকের আবিষ্কার তাঁদের কাছে কম উত্তেজনাপূর্ণ নয়। সুতরাং, বলতে হয় প্রত্নতত্ত্ব একটা বিশেষ বিজ্ঞান।

মানব সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রাচীন ইতিহাস খ্রিস্টপূর্ব পাঁচ-ছ হাজার বছর আগেকার নয়; তাও আবার সম্পূর্ণ প্রত্নতত্ত্বনির্ভর কাহিনি। প্রত্নলিপি, প্রত্নচিত্র, ভাস্কর্য, স্থাপত্য প্রভৃতির সাহায্যেই এ কাহিনি লিখিত হয়েছে। সুতরাং একে মানুষের ঐতিহাসিক যুগ বলে উল্লেখ করা যায়। বাবিলোনীয়, আসিরীয়, মিশরীয়, গ্রিক, রোমক, চীন, পাক-ভারতীয় প্রভৃতি মানব-সভ্যতা এই ঐতিহাসিক যুগেরই সভ্যতা।

কিন্তু, খ্রিস্টপূর্ব ছয় থেকে দশ পনেরো হাজার বছর আগেকার মানব-সভ্যতা ও সংস্কৃতি আবিষ্কারের সংখ্যা খুব নগণ্য নয়। এসময়কার প্রত্ননিদর্শনাদির যুগকে আমরা প্রাগৈতিহাসিক যুগ বলে উল্লেখ করতে পারি। এর বহু আগে মানুষের উদ্ভব হয়েছিল। তার প্রমাণ মিলছে 'ফসিল' বা জীবাশ্মের মধ্যে। লক্ষাধিক বৎসরের আগেকার অশ্মীভূত (fossilized) মানুষের নিদর্শনও কিছু সংখ্যায় পাওয়া গেছে। এই প্রত্নতাত্ত্বিকনির্ভর প্রাগৈতিহাসিক যুগকে এখনও আমরা স্বীকার করে নিতে পারিনি। এর প্রধান কারণ হচ্ছে এসময়কার প্রত্নতাত্ত্বিক তারিখকে আমরা বিজ্ঞানভিত্তিক বলে মনে করি না।

এখানে এসে আমরা থমকে দাঁড়াই এবং ভুলে যাই যে, এসময়কার প্রত্নতাত্ত্বিক বস্তুর বয়স নির্ণয়ে প্রত্নতাত্ত্বিকেরা শুধু যে ভূস্তরবিদ্যা (Stratigraphy) কিংবা প্রতিরূপবিদ্যা (Typography) প্রয়োগ করে থাকেন তা নয়, তাঁরা অন্যান্য বিজ্ঞানেরও সাহায্য নিয়ে থাকেন। শারীরবিদ্যাবিৎ (Anatomist) ও প্রত্নজীববিদ্যাবিৎ (Palaeontologist) ভূগর্ভোত্থিত হাড়গোড় পরীক্ষা করে প্রত্নমানব ও জীবের অবয়ব কীরূপ ছিল তার ছবি তৈরি করে ফেলতে এবং প্রত্নউদ্ভিদবিদ্যাবিদ (Palaeontologist) বীজ, পরাগ ও উদ্ভিজ্জাদির প্রত্নবিশেষ অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে পরীক্ষা করে প্রত্নযুগের উদ্ভিদকুলের (Flora) আকৃতি-প্রকৃতির সুস্পষ্ট ধারণা দিতে প্রত্নতত্ত্ববিদকে সাহায্য করে যান। অধুনা পারমাণবিক পদার্থবিদ (Nuclear Physicist) প্রত্নবস্তুতে জৈব পদার্থের তেজস্ক্রিয়তার (Radioactivity) পরিমাণ নির্ণয় করে প্রত্নবস্তুর সঠিক তারিখ বের করে দিয়েও প্রত্নতত্ত্ববিদকে সহায়তা দান করে থাকেন। এর থেকে দেখা যাবে অন্য বৈজ্ঞানিক সত্যকে যেমন অস্বীকার করার উপায় নেই, প্রকৃতপক্ষে প্রত্নতাত্ত্বিক সত্যকেও তেমন অস্বীকার করা যায় না।

প্রত্নতত্ত্বের এ ধারণা নিয়ে বাংলাদেশের দিকে তাকালেই দেখা যায় শ্রীহট্ট জেলার জন্তিয়াপুরে আবিষ্কৃত 'মেগালিথিক কীর্তিস্তম্ভমালা' (Megalithic monuments) নামে অভিহিত প্রত্ননিদর্শন ব্যতীত প্রাগৈতিহাসিক যুগের অন্য কোনো উল্লেখযোগ্য বস্তু আমাদের নেই। প্রকৃতপক্ষে বাংলাদেশ প্রাচীনতার দিক থেকে পাকিস্তানের সাথে প্রতিযোগিতা করা দূরের কথা, এক সারিতে দাঁড়াবার যোগ্যতাও অর্জন করতে পারেনি। আমাদের মহেন-জো-দারো নেই, হারাপ্পা নেই, এমনকি তক্ষশিলাও নেই। স্বীকার করি, বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চল পাললিক ভূমি (alluvial land) বলে গঠনের দিক থেকে পাকিস্তানের চেয়ে যথেষ্ট আধুনিক। কিন্তু, এর উত্তরাঞ্চল তো পাকিস্তানের চেয়ে কোনো অংশে আধুনিক নয়। সেখানেও তো হারাপ্পা বা মহেন-জো-দারোর মতো চার-পাঁচ হাজার বছর আগেকার মানব-সভ্যতা ও সংস্কৃতির নির্দশন আবিষ্কৃত হতে পারত? এটা একটা সম্ভাব্যতার কথা। তা না হয় ছেড়েই দেওয়া যাক।

কিন্তু, আমরা যে আর্যানার্য রক্তের সংমিশ্রণে উৎপন্ন আর্যভাষাভাষী একটা মানবগোষ্ঠী, এটা একটা সর্বস্বীকৃত নৃতাত্ত্বিক (Anthropological) ও ভাষাতাত্ত্বিক (Philogical) সত্য। এতৎসত্ত্বেও, খ্রিস্টপূর্ব হাজার বা পাঁচ-সাতশো বছর আগেকার আর্যবসতি তক্ষশিলার মতো প্রত্নাবশেষ পর্যন্ত এ প্রদেশের কোথাও আজ পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয়নি। প্রত্নতাত্ত্বিক ক্ষেত্রে আমাদের এহেন দীনতার কারণ কী? মনে হয়, এ ব্যাপারে জনসাধারণের কাছ থেকে যে সাহায্য ও সহানুভূতি এবং দেশের সরকারের কাছ থেকে যে পরিমাণ অর্থানুকূল্য ও উৎসাহ পাওয়া উচিত ছিল, তা কখনও পাওয়া যায়নি বলেই আমাদের প্রত্নতাত্ত্বিক দীনতা আজও ঘোচেনি।

খ্রিস্টপরবর্তী যুগে এসেই প্রত্নতত্ত্বের ক্ষেত্রে আমরা নিজের পায়ে দাঁড়াতে সমর্থ হয়েছি। আমাদের ইতিহাসে এ যুগ প্রাগৈসলামিক যুগ (Pre-Islamic Period) নামে পরিচিত হতে পারে। অবশ্য, আমরা সচরাচর এ যুগকে 'প্রাক্-মুসলিম যুগ' (Pre-Islamic Period) বলে উল্লেখ করে থাকি। বগুড়া জেলায় আবিষ্কৃত খ্রিস্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে আর্যভাষার ব্রাহ্মীলিপিতে উৎকীর্ণ গুপ্তযুগের একখানা শিলালিপিই আমাদের ভাষাতাত্ত্বিক নিদর্শনের একমাত্র ও প্রাচীনতম সম্বল। রাজশাহি জেলার 'পাহাড়পুর', বগুড়া জেলার 'মহাস্থানগড়' এবং কুমিল্লা জেলার 'ময়নামতী' প্রভৃতি স্থানে প্রত্নতাত্ত্বিক কর্মতৎপরতার ফলে আমাদের যে সভ্যতার প্রাচীন নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়েছে, তার সবই খ্রিস্টীয় চতুর্থ থেকে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যবর্তী কালে উদ্ভূত, বিকশিত ও বিলীন হয়েছে। এ সময়ে আমাদের দেশে বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী খড়্গবংশ (সপ্তম-অষ্টম শতাব্দী), দেববংশ, চন্দ্রবংশ ও পালবংশ (অষ্টম-একাদশ শতাব্দী) এবং হিন্দুধর্মাবলম্বী সেনবংশ (দ্বাদশ শতাব্দী) রাজত্ব করেছেন। প্রত্নতাত্ত্বিক খননের ফলে এসমস্ত রাজবংশের সময়কার কিছু কিছু প্রত্ননিদর্শন আবিষ্কৃত হয়েছে। এতদ্ব্যতীত চট্টগ্রামের 'পণ্ডিত-বিহার', পাহাড়পুরের 'সোমপুরী-বিহার', রামপালের 'বিক্রমপুরী-বিহার', ময়নামতীর 'কনকস্তূপ-বিহার' অথবা বগুড়ার 'বসু-বিহার' প্রভৃতি বৌদ্ধদের প্রাচীন ধর্মীয় ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির কোনোটিই খ্রিস্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর পূর্ববর্তী নয়।

এই হিন্দু-বৌদ্ধ যুগের শেষের দিকে এসে আমাদের সাথে ইসলামের প্রথম পরিচয় ঘটে। প্রাচীন আরব-পরিব্রাজক ও ভৌগোলিকদের লিখিত বিবরণ থেকে জানতে পারছি, আরাকান থেকে নিয়ে মেঘনা নদীর পূর্বতীরবর্তী বিস্তীর্ণ ভূভাগটি খ্রিস্টীয় অষ্টম শতাব্দী থেকে নিয়ে ত্রয়োদশ শতাব্দীর আগ পর্যন্ত আরব বণিকদের কর্মতৎপরতায় মুখর হয়ে উঠেছিল। এর প্রত্নতাত্ত্বিক প্রমাণও পাওয়া যাচ্ছে পাহাড়পুরের বৌদ্ধস্তূপে একটি এবং ময়নামতীর বৌদ্ধবিহারে দুটি, মোট তিনটি স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রার আবিষ্কারে। এর প্রথম মুদ্রা আব্বাসি খলিফা হারুনুর রুশিদের (৭৮৬—৮০৯ খ্রি.) এবং শেষ মুদ্রা খলিফা মুসতসিম বিল্লার (১২৪২—১২৫৮)। এ সময়ে বাংলা দেশে আরব, পারস্য ও অন্যান্য মুসলিম দেশ থেকে বহু দরবেশের আগমনের সাথে সাথে ইসলামের পদধ্বনিও শোনা যাচ্ছিল। তাঁদের মধ্যে চট্টগ্রামের বায়িজিদ বিস্তামী (মৃ. ৮৭৪ খ্রি.), বগুড়ার সুলতান মাহমুদ মাহীসওয়ার (আগমন—১০৪৭ খ্রি.), ময়মনসিংহের নেত্রকোনার শাহ্ মুহম্মদ সুলতান রুমী (আগমন—১০৫৩ খ্রি.), ঢাকা জেলার বিক্রমপুরের বাবা আদম শহিদ (হত্যা—১১১৯ খ্রি), মালদহের পাণ্ডুয়ার মখদুম শেখ জালালুদ্দীন তাব্‌রিজী (মৃ. ১২২৫ খ্রি.)। প্রভৃতিই বিশিষ্ট।

খ্রিস্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর একেবারে গোড়াতেই আমাদের দেশ মুসলিম তুর্কি জাতি কর্তৃক বিজিত হয়। এ যুগে এসে প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনের প্রাচুর্য পরিলক্ষিত হচ্ছে। এগুলোর মধ্যে গৌড় ও পাণ্ডুয়ার ভগ্ন ইমারতই প্রধান। মুসলিম নির্মিত অজস্র বাসভবন, স্নানাগার, তোরণ, দুর্গ, মসজিদ, দরগাহ্, পুল প্রভৃতি গৌড় পাণ্ডুয়ায় ছড়িয়ে আছে। মুসলিম আমলে হিন্দুদের দ্বারা নির্মিত মন্দির, পোড়ামাটির কাজ, এমনকি গৃহাদির ধ্বংসাবশেষ প্রভৃতি প্রত্ননিদর্শনও বেশ কিছু সংখ্যায় দেখতে পাওয়া যায়। ষোড়শ শতাব্দীতে নির্মিত ফরিদপুরের 'মথুরাপুর দেউল', সপ্তদশ শতাব্দীতে নির্মিত পাবনার 'জোড়বাংলা মন্দির', অষ্টাদশ শতাব্দীতে নির্মিত কুমিল্লার 'সতেরো রত্নমন্দির' প্রভৃতির নাম এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।

এ ছাড়া বাংলার চিরপরিবর্তনশীল আবহাওয়া, অথবা মানুষের নিত্যনৈমিত্তিক প্রয়োজন মেটানোর তাগিদে আমাদের আরও যে কত মূল্যবান প্রত্নকীর্তি হয় ধ্বংসপ্রাপ্ত নতুবা ধ্বংসোন্মুখ, তারও কোনো হিসেব নেই। তার খুব কম সংখ্যক প্রত্ননিদর্শন সরকারি প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের দ্বারা সংরক্ষিত হলেও, আজ

আমাদের অসংখ্য প্রত্নসম্পদ প্রদেশের অখ্যাত ও অবজ্ঞাত অঞ্চলে লোকচক্ষুর অন্তরালে আত্মগোপন করে আছে। এইসমস্ত প্রত্নবস্তু আমাদের সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার। এগুলোর উদ্ধার, সংরক্ষণ ও পুনর্গঠন আমাদের জাতীয় দায়িত্ব। কেননা, আমরা যদি এসব উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত হই, আমাদেরকে বিশ্বের কাছে ভুঁইফোঁড় বলে পরিচয় দিতে হবে।

আমি গোড়াতেই বলেছি মানুষের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ কীর্তিও প্রত্নতত্ত্বের বহির্ভূত বিষয় নয়। ১৯৪৭ ইংরেজিতে স্বাধীনতা লাভের পর আমরা জাতি হিসেবে যে গতিতে দ্রুত এগিয়ে চলেছি, সে গতিতে স্থাপত্য, ভাস্কর্য, শিল্পকলা প্রভৃতি প্রত্নতাত্ত্বিক বিষয়েও পিছিয়ে নেই। অবশ্য, আগেও যেমন ছিল, এর সবকিছুই এখনও তেমন বহুলাংশে নগরকেন্দ্রিক। কিন্তু, আগেকার প্রত্নতাত্ত্বিক কীর্তির লক্ষ্য ছিল স্থায়িত্ব, নিজস্বতা, চমৎকারিত্ব ও সৌন্দর্য; আর এখনকার প্রত্নতাত্ত্বিক কীর্তির লক্ষ্য হচ্ছে ভঙ্গুরতা, মিতস্থানিকতা, আরামপ্রিয়তা ও পাশ্চাত্য স্থাপত্যের অন্ধ অনুকারিতা।

উৎস : *মনীষা-মঞ্জুষা,* তৃতীয় খণ্ড।

বর্তমান হিন্দুধর্মের দেববাদ ও দেবোপাসনা

বিপিনচন্দ্র পাল

আজকাল এ দেশের প্রায় সকল স্কুলেই হিন্দু-বালকেরা স্বল্পবিস্তর সমারোহ করিয়া সরস্বতীপূজা করে। আমার ছোটো বালকটি যে স্কুলে পড়ে, সেখানেও এবারে খুব জাঁকালো রকমে পূজার আয়োজন হয়। সে অঞ্জলি দিতে যাইতে চাহিল। আমরা বহুদিন প্রতিমাপূজা ছাড়িয়া দিয়াছি। কিন্তু এই বালক এসকল তত্ত্বকথা তো জানে না ও বুঝে না। বৃদ্ধেরাই বা কয়জনে বুঝিয়া থাকেন? সে অঞ্জলি দিতে গেল না বটে। যায় নাই ভালোই করিয়াছে, গেলে তার কুলধর্ম রক্ষা হইত না। কিন্তু মনে মনে এজন্য একেবারেই যে ক্ষুণ্ণ হয় নাই, ইহাও বলিতে পারি না। পরদিন পাড়ার এক প্রতিবেশীর প্রতিমা যখন বিসর্জন করিবার জন্য লইয়া যায়, তখন আমার বালকটি এদিক-ওদিক চাহিয়া, কেউ দেখিতেছে না ভাবিয়া, তাহাকে দুই হাত তুলিয়া নমস্কার করিল!

এ কি তার রক্তের দোষ? শিক্ষার দোষ যে নয়, এ কথা বলাই বাহুল্য। সে জন্মিয়া অবধি আমার বাড়িতে কোনো দেবদেবীর পূজা দেখে নাই। সে যাহা-কিছু ধর্মকথা শুনিয়াছে, সকলই এই প্রতিমাপূজার বিরোধী। কিন্তু সেই নিরাকার তত্ত্ব সে বুঝে নাই। সে দোষ যদি কারও হয়, তবে তার কচি বয়সের। এই বয়সে এত 'লজিক'ও যুক্তিবাদ কারোই হজম হয় না। মুসলমান বা খ্রিস্টিয়ান হইলে, কৌলিক ও পৈতৃক সংস্কারবশত সে এগুলিকে বুতপরস্ত ও পাপ বলিয়া ভাবিতে পারিত। কিন্তু তার আপনার পরিবারে এসকল প্রতিমাপূজা না হইলেও, অতি নিকট আত্মীয়েরা ঠাকুরদেবতার পূজা করেন, সে ইহাও জানে। কতবার তাঁহাদের মুখে ঠাকুরদেবতার নাম শুনিয়াছে। কতবার তাঁহাদিগকে এসকল প্রতিমাকে ভক্তিভরে প্রণাম করিতে দেখিয়াছে। আমরা ছাড়া তার অপর গুরুজনেরা একেবারেই অজ্ঞ ও সর্বদা অধর্মাচরণে রত, আমাদের জন্য স্বর্গের অনন্ত উন্নতি আর তাঁদের জন্য নরকের অনন্ত দুর্গতির ব্যবস্থা হইবে,— এসকল ধর্মোপদেশ সে পায় নাই। এ অবস্থায় চারিপাশে তার আত্মীয়স্বজনেরা, পাড়াপ্রতিবেশীরা, খেলার সাথি ও বিদ্যালয়ের

সতীর্থেরা যে দেবদেবীর প্রত্যক্ষ অর্চনা করিয়া থাকেন, তাহাদের প্রতি মহম্মদীয় বা খ্রিস্টীয় প্রকৃতিসুলভ অশ্রদ্ধা তার হইতেই পারে না। সরস্বতী কে, সে বুঝে না। যাঁহারা এত ধুমধাম করিয়া বৎসর বৎসর এই দেবতার পূজার্চনা করেন, তাঁহারাই সকলে বুঝেন কি? নিরাকার ব্রম্ববস্তু যে কী, ইহাও সে জানে না। যাঁহারা নিয়ত এই ব্রম্মের বাঙ্ময়ী উপাসনা বা মানস-কল্পনা রচনা করিয়া থাকেন, তাঁহারাই বা কয়জনে এই ব্রম্মতত্ত্ব বুঝেন? এই প্রত্যক্ষ সরস্বতী তার বাল্যকল্পনাকে বরং কিয়ৎ পরিমাণে জাগাইতে পারে, ওই নিরাকার ব্রম্মজ্ঞানে তাহাও পারে না। এ অবস্থায় সে যে আমার ঘরে জন্মিয়াও চোরের মতন ওই সরস্বতীকে প্রণাম করিল, ইহা কিছুই বিচিত্র নহে।

ভাবিতেছি, এ প্রণামের অর্থটা কী? আমি দেবদেবীকে প্রণাম করিতে শিখিয়াছিলাম। মা-বাবা শিখাইয়াছিলেন। পরিবারের সকলে ইহাদিগকে প্রণাম করেন, দেখিয়াও শিখিয়াছিলাম। শেযে একদিন প্রণাম করিতে চাহিলাম না, বলিলাম— এ যে পুত্তলিকা, ইহাকে ঈশ্বরজ্ঞানে পূজা করি কেমন করিয়া? সেদিন যে গোল বাধিয়াছিল, তার জের এই চল্লিশ বৎসরেও মিটে নাই। কিন্তু এ বালককে তো এই প্রণাম কেউ শিখায় নাই। সে এমন করিয়া, ভাই ভগ্নিদের উপহাসের ভয়ে, লুকাইয়া প্রণাম করিতে গেল কেন? কেন, আমি তার কী বুঝি? সেও বলিতে পারিবে কি না সন্দেহ। এই লইয়া তার সঙ্গে একটা বিচারেও তো বসিতে পারি না।

তবে সরস্বতীর সঙ্গে লেখাপড়ার একটা-কিছু সম্পর্ক যে আছে, এ কথাটা সে অবশ্যই জানে। নহিলে স্কুলে আর কোনো ঠাকুর-দেবতার পূজা হয় না, কেবল সরস্বতীরই হয় কেন? সরস্বতী বিদ্যাদাত্রী, তাঁর পূজা করিলে বিদ্যালাভ হয়, ইহা সে শুনিয়াছে। আর এই বিদ্যালাভের জন্যই, মনে হয়, সে অমন করিয়া সরস্বতীকে প্রণাম করিল। অপর একটি বালক, তার পিতামাতাও আমাদেরই মতন, তাঁদের বাড়িতেও কোনো দিন কোনো প্রকারের প্রতিমার বা দেবদেবীর পূজা হয় না, সেও সরস্বতীপূজার পূর্বদিন তার মাকে বলিয়াছিল—'মা আমি সরস্বতীকে অঞ্জলি দিতে যাইব, আর আমার অ্যালজেবরা তাঁর পায়ের কাছে রাখিয়া দিব। তাহলে আর ওখানা পড়তে হবে না, সব বিদ্যা আপনি জন্মিবে'। এ বালক আমার বালক অপেক্ষা বয়সে বড়ো। লেখাপড়াও বেশি করে। কথাটা সে কতকটা তামাশা করিয়াই বলিয়াছিল। অন্তত আমরা সেটাকে তামাশা বলিয়াই ভাবিয়াছিলাম। কিন্তু সে তামাশা করিয়াই বলুক আর না বলুক, তার কথার ভিতরে এই সকল দেবদেবীপূজার একটা দিক প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে। সে অ্যালজেবরা পড়িতে চাহে না। অ্যালজেবরা পড়া তার রোচে না। এত ক্লেশ করিয়া যথারীতি সে এই বিদ্যা লাভ করিতে রাজি নহে। অথচ অ্যালজেবরা না পড়িয়া, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষাও পাশ করা যায় না। সরস্বতীর পায়ে অঞ্জলি দিয়া যদি কোনো প্রকারে অ্যালজেবরা পড়ার ক্লেশ স্বীকার না করিয়াও অ্যালজেবরা পরীক্ষাটা পাশ হওয়া যায়, সে তো বেশ কথা। প্রাচীনকালে যারা বৈদিক যজ্ঞাদি করিত, তারাও কতকটা এইভাবেই সেসকল কর্মের অনুষ্ঠান করিত। জাদুকর যেমন আপনার জাদুগুণে মাটিকে সোনা করে, একটা বীজ মুহূর্তের মধ্যে পুঁতিয়া তাহাতে ফল ধরায় ও সেই ফল পাকাইয়া অকালে লোককে খাইতে দেয়— এইসকল যজ্ঞকর্ম দ্বারা সেইরূপ কোনো অলৌকিক ইন্দ্রজালপ্রভাবে পরলোকে স্বর্গাদি প্রাপ্তি হয়, কিংবা এই

লোকেই রূপ, ধন, পুত্র, রাজ্য, ঐশ্বর্য প্রভৃতি লাভ এবং শত্রু জয় হয়। এই বিশ্বাসেই লোকে নানাবিধ যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিত। ক্রমে এসকল বৈদিক যাগযজ্ঞের এই ঐন্দ্রজালিক ভাবটা এতই প্রবল হইয়া উঠিল, যে যাজ্ঞিক মীমাংসকেরা বেদের ইন্দ্রাদি দেবতাকে পর্যন্ত উড়াইয়া দিলেন। জৈমিনি মুনি স্বয়ং ইহা করিয়াছেন। আর জৈমিনির যুক্তির নিকটে আধুনিক ইহসর্বস্ব, প্রত্যক্ষপ্রধান ইউরোপীয় যুক্তিবাদ পর্যন্ত হার মানিয়া যায়। জৈমিনি বলেন যে ইন্দ্র নামে যদি সত্যই কোনো দেবতা থাকেন, যিনি ঐরাবতে চড়িয়া যজমানের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হন, তাহা হইলে যজমান যে মৃৎঘট স্থাপনা করিয়া 'ইহাগচ্ছ' 'ইহতিষ্ঠ' বলিয়া এই ইন্দ্রদেবতাকে আহ্বান করে, তিনি অবশ্যই সেই ঘটের উপরে আসিয়া বসেন। যদি তাই হয়, তবে ঘট তো একেবারে চূর্ণ হইয়াই যাইবে। ঘট যখন ভাঙে না, তখন বলিতে হয় যে ডাকিলেও ইন্দ্র আসেন না, আর না হয়, ইন্দ্র নামে কোনো দেবতাই নাই। ডাকিলে আসেন না, এ কথা মানিলে, বেদমন্ত্র নিরর্থক হইয়া যায়। বেদ কখনও নিরর্থক হইতে পারে না, কারণ বেদ অপৌরুষেয়, আপ্তবাক্য, অভ্রান্ত। সুতরাং ইন্দ্র নামে কোনো দেবতা নাই, ইহাই স্বীকার করিতে হয়। বৈদিক মন্ত্রে যে ইন্দ্রদেবতার কথা আছে, তাহা কোনো বিশিষ্ট বস্তু বা ব্যক্তিকে জ্ঞাপন করে না, যথাবিধি উচ্চারিত হইলে, নির্দিষ্ট যজ্ঞফল উৎপাদন করে মাত্র। এইভাবে জৈমিনি যজ্ঞের মহিমা অক্ষুণ্ণ রাখিতে যাইয়া, ইন্দ্রাদি বৈদিক দেবতার অস্তিত্ব পর্যন্ত উড়াইয়া দিয়াছেন। প্রত্যক্ষ কার্যকারণ-সম্বন্ধ ব্যতীত, কেবল, কোনো মন্ত্রাদির প্রভাবে যেখানে কোনো বিশিষ্ট ফল উৎপন্ন হয়, সেখানেই আমরা এই ক্রিয়াকে ইন্দ্রজাল বলি। বৈদিক যাগযজ্ঞের এই ঐন্দ্রজালিক ভাবটা খুবই প্রবল ছিল। আর আমাদের প্রচলিত ক্রিয়াকাণ্ডেতেও স্বল্পবিস্তর এই ঐন্দ্রজালিক ভাবটা আছে। সরস্বতীর পায়ে অঞ্জলি দিলে, পড়াশুনা না করিয়াও, কেবল তাঁহারই বরে, আকাশ-ফোঁড়া বিদ্যা লাভ হয়। তাঁর পায়ে অ্যালজেবরা নিবেদন করিলে, রাত্রে বিছানায় শুইয়াই হয়তো প্রাক্তনজন্য বিদ্যার মতন, বীজগণিতের সকল প্রকারের কঠিন আঁক কষিবার শক্তিটা আপনা-আপনি পাওয়া যায়। এইভাবে যে অনেক লোকেই, বিশেষত বহুতর স্কুলের বালকেরা, এমন উৎসাহ করিয়া, এতটা ভক্তিভরে এই বাগ্‌দেবতার পূজা করে না, এই কথা বলা যায় না। এইসকল পূজা-অর্চনার এই ঐন্দ্রজালিক প্রভাবটাই সত্য সত্য অনিষ্টকর। ইহাতেই মানুষকে অমানুষ করিয়া ফেলে।

ইন্দ্রজাল প্রভাবে যে ফল উৎপন্ন হয়, তাহার সম্বন্ধে মানুষের বিচারবুদ্ধির প্রয়োগের কোনো অবসরই থাকে না। এখানে অন্ধ আনুগত্যই সফলতালাভের একমাত্র উপায়। আর এইজন্যই ঐন্দ্রজালিক ধর্মাচরণে মানুষের বুদ্ধিবৃত্তিকে নিস্তেজ, তার জ্ঞানান্বেষণের স্পৃহাকে পঙ্গু এবং পুরুষকারকে ম্রিয়মাণ করিয়া তোলে। আত্ম-চেষ্টায় যেখানে কোনো কিছু পাওয়া যায় না, যন্ত্রারূঢ়ের মতন কতকগুলি বাহ্য ক্রিয়াকলাপ করিয়াই যেখানে ঈপ্সিত ফল লাভ হইতে পারে, সেখানে সেইরূপ ধর্মানুষ্ঠানে মনুষ্যত্ব ফুটিয়া উঠিতে পারে না। ইন্দ্রজাল কেবল তামসিক লোকের তমকেই বাড়াইয়া দিতে পারে। ঐন্দ্রজালিক যাগযজ্ঞাদিতে প্রাচীনকালে ইহাই করিয়াছিল। প্রচলিত হিন্দুধর্মের এই অতিপ্রাকৃত ঐন্দ্রজালিক প্রভাবই সত্য সত্য অনিষ্টকর। ভগবান বুদ্ধদেব হইতে আরম্ভ করিয়া রাজা রামমোহন পর্যন্ত সকলে হিন্দুর ক্রিয়াকাণ্ডের এই ঐন্দ্রজালিক দিকটার বিরুদ্ধেই সংগ্রাম ঘোষণা করিয়াছেন।

কিন্তু আমাদের দেশের প্রচলিত দেবোপাসনার একটা ঐন্দ্রজালিক দিক যেমন আছে, সেইরূপ একটা রসের এবং কাব্যের দিকও আছে। ওই ঐন্দ্রজালিক দিক দিয়া দেখিলে, এগুলিকে প্রাচীন বৈদিক যজ্ঞেরই জের বলিতে পারা যায়। এই রসের ও কাব্যের দিক দিয়া দেখিলে, এগুলি পৌরাণিকী রূপকথার বাহিরের অভিব্যক্তি। বা প্রত্যক্ষ অভিনয়-চিত্র বলা যাইতে পারে। আর ওই ঐন্দ্রজালিক দিকটা যতই নিন্দনীয় হউক না কেন, এ-সকল ক্রিয়াকাণ্ডের এই রসের ও কাব্যের দিকটা নিতান্ত উপেক্ষার বিষয় নহে। এই পৌরাণিক দিকটা সকল উন্নত ধর্মেতেই দেখিতে পাওয়া যায়, কোথাও-বা বেশি কোথাও-বা কম। আর এই পৌরাণিকী কল্পনার সঙ্গে সর্বত্রই ভক্তি সাধনেরও অতিশয় ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ দেখিতে পাই। আমাদের প্রচলিত ক্রিয়াকাণ্ডের ওই ঐন্দ্রজালিক দিকটা নষ্ট করিতেই হইবে। না করিলে ধর্মের সত্য মর্ম এবং সাধনের সঞ্জীবনী শক্তি কোনো দিনই ভালো করিয়া ফুটিয়া উঠিতে পারিবে না। কিন্তু এইসকল পূজা-অর্চনার বাহ্য ও অলীক ঐন্দ্রজালিক প্রভাব নষ্ট করিতে যাইয়া, উচ্চতর আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতার ব্যঞ্জনা ও রূপক-রূপে, এইসকল দেবদেবীর কল্পনা আমাদের দেশের ভক্তিসাধনের ধারাকে আশ্রয় করিয়াই যে ক্রমে ক্রমে সাধক-সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল, এই কথাটাও ভুলিয়া গেলে চলিবে না। আমরা এই যুগে, বালক-বৃদ্ধ কিংবা শিক্ষিত-অশিক্ষিত নির্বিশেষে সকলেই যে এইসকল পুরাতন পৌরাণিকী রূপকের আশ্রয়ে শ্রেষ্ঠ ভক্তিসাধন করিতে পারিব, এমনটাও বলা যায় না। কিন্তু কাহারও পক্ষে এগুলি ভক্তিসাধনের সহায় হইতে পারে না, এমন কথাই বা বলিতে পারি কি? কেহ কেহ যে এইগুলিকে ধরিয়া ভক্তি লাভ করিয়াছেন, এখনও করিতেছেন, ইহাও তো অস্বীকার করা অসম্ভব। এইজন্যই কালাপাহাড়ের মতন এগুলিকে ভাঙিয়াচুরিয়া দিতে চাহি না; চাহিলেও ভাঙিতেচুরিতে পারিব না। অন্য পক্ষে এগুলি যেভাবে চলিয়া আসিয়াছে, সেইভাবেই চলিয়া গেলে, তাহাদের দ্বারা বর্তমানের ভক্তিসাধন কখনো কোনো প্রকারে পরিপুষ্টি লাভ করিবে না। আমাদের সমক্ষে নূতন নূতন সমস্যা ও নূতন নূতন আদর্শসকল জাগিয়া উঠিতেছে। এই নূতন ভাবের সঙ্গে ওইসকল পুরাতন পৌরাণিকী কল্পনার সংগতি ও সমন্বয় সাধন করিতে হইবে। এইজন্য সরাসরিভাবে এগুলিকে অসত্য বলিয়া বর্জন করিলে চলিবে না, কিন্তু তত্ত্বের সঙ্গে ও সত্যের সঙ্গে সংযুক্ত করিয়া, এসকলকে যথাসম্ভব সার্থক ও সজীব করাই প্রয়োজন।

এদেশের সাধনাকে যাঁহারা বড়ো করিয়া তুলিতে চাহেন, আপনাদের শ্রেষ্ঠতম অধ্যাত্মসম্পদভাণ্ডার এবং নিজেদের জাতির বৈশিষ্ট্যকে রক্ষা করিয়া, যাঁহারা এসকলকে আধুনিক কালের উচ্চতম শিক্ষা ও সাধনার সঙ্গে যথাযথভাবে মিলাইয়া, বিশ্ব-সাধনার সনাতন পূত ধারাকে পরিপুষ্ট করিতে চাহেন, তাঁহাদিগকে এই যুগ-সমস্যার সমন্বয় সাধনে ব্রতী হইতে হইবে। বিরোধের ও প্রতিবাদের পূর্ব-প্রয়োজন এখন আর নাই। ভাঙার কাজ প্রায় শেষ হইয়াছে; এখন গড়িতে আরম্ভ করা আবশ্যক। আর এই গড়া নিতান্ত পরানুচিকীর্ষাপর অথবা একান্ত মনগড়া হইলেও চলিবে না। ইহাকে নিজেদের বৈশিষ্ট্যের উপরে, বস্তুতন্ত্র করিয়া গড়িয়া তুলিতে হইবে। পূর্বাপরের সঙ্গে প্রাণগত যোগ রাখিয়া, আমাদের জাতির জীবনের মূলসূত্র ও চিরন্তন লক্ষ্যকে ধরিয়াই এই নূতন গড়ার কাজটা করিতে হইবে। আমাদেরই ছাঁচে আমরা যেমন যুগে যুগে নব নব আকারে ফুটিয়া

উঠিয়াছি, এই যুগেও তাহারই চেষ্টা করিতে হইবে। বিলাত বা আমেরিকা হইতে নূতন ছাঁচ আমদানি করিয়া, তাহার উপরে এই নূতন জীবনকে ঢালাই করিলে চলিবে না। আর দেশের এই পূর্বাপর ধারাকে রক্ষা করিয়া এই নূতন সমন্বয় সাধন করিতে হইলে, নিজেদের জাতির ভিতরকার ইতিহাসটা ভালো করিয়া ধরিতে হইবে। এইরূপ সমন্বয়-চেষ্টাই বর্তমানের প্রধান কর্তব্য।

উৎস : *মাসিক নারায়ণ।*

ভারতপন্থ ও বাংলা দেশ

ক্ষিতিমোহন সেন

বহু জাতির বহু সংস্কৃতি দিয়ে ভারতীয় সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে। তাই বিশেষ কারও নামে এদেশের সংস্কৃতির বা ধর্মের নামকরণ হতে পারেনি। ভারতে অর্থাৎ 'হিংদে' যাঁরা এসেছেন তাঁদের সবারই সৃষ্টি বলে এর নাম ব্যক্তিবিশেষের নামে না হয়ে এই দেশের নামে নাম হয়েছে 'হিন্দু' অর্থাৎ ভারতীয়।

সব জ্ঞানধারার মূল যে বেদেই মিলবে তার কোনো মানে নেই। বেদবাহ্য ব্রাত্য ও বেদবিরোধী তৈর্থিকের ধারাও অতি প্রাচীন। আর্যদের যেসব শাখা ভারতের বাইরে তাদের জ্ঞানধারার সঙ্গে ভারতীয় জ্ঞানধারার যেসব বিষয়ে পার্থক্য, তার জন্য ভারত ও ভারতীয় আর্যেতর সব ধারার প্রভাব থাকার কথা।

কবির তো বললেন শততন্ত্রী বীণার যেমন প্রতি তারে ভিন্ন সুর, অথচ তার একটি তারও বাদ দিলে চলে না, তাদের সবাকার সমন্বিত সুরসাধনা চাই। তেমনই ভারতের সর্ব সাধনার সমন্বয়ে পরিপূর্ণ সাধনা। কাউকে বাদ দেওয়া যায় না। তাই তাঁর বিখ্যাত গান— 'পংথ বীণা সত ধুন উচারৈ'। সর্বপথের সমন্বয়-বীণার সত্য সুর উঠেছে বেজে। তাই কবির ভারতীয় সাধনাকে সমন্বয়-সাধনাই বলেছেন এবং তাই এর নাম দিয়েছেন 'ভারতপন্থ'। এখনও তাঁর দলের যুগলানন্দ প্রভৃতি নিজেদের ভারতপথিক বলেই পরিচয় দিয়েছেন।

বহু যুগের নানা বিচিত্র সংস্কৃতির সম্মেলনে ও সমন্বয়ে ভারতীয় দর্শন যেমন ঐশ্বর্য লাভ করেছে এমন আর কোনো দেশে হয়ে ওঠেনি। আর-একটা কারণেও হয়তো চিন্তায় আর্যেরা খুব অগ্রসর হলেন। তাঁরা পূর্বে ছিলেন শীতপ্রধান দেশে। কাজেই তাঁদের আলস্য ছিল না। গ্রীষ্মপ্রধান দেশে এসে দেহ পড়ল এলিয়ে, অথচ চিরদিন তাঁরা ছিলেন অনলস। তাই তাঁদের মন চলল কাজ করে। তাই নানা সংস্কৃতির বৈচিত্র্যের মধ্যে তাঁদের মন নানাভাবে কাজ করে বিচিত্র রকমের দার্শনিক সম্পদ রচনা করে তুলতে লাগল।

হাজার হাজার বছরের সেই অপরিমেয় সম্পদের পরিচয় কী করে অল্পের মধ্যে দেওয়া যায়? শুধু নামের তালিকা দিলেও তো চলবে না। গ্রন্থ-টীকা-ভাষ্য বিস্তর আছে, তার অনুবাদ আছে। যত্ন করে দেখলেই হল। যাঁদের সময় কম তাঁদের জন্যও প্রাচীনকাল থেকে বহু মহাপুরুষ সকল দর্শনের সরল সংক্ষিপ্ত সব পরিচয় রেখে গেছেন। হরিভদ্র লিখে গেলেন *ষড়্‌দর্শনসমুচ্চয়*, শংকরাচার্য লিখলেন *সর্বসিদ্ধান্তসংগ্রহ*, মাধবাচার্য লিখলেন *সর্বদর্শনসংগ্রহ*, ফরিদপুর কোটালিপাড়ার মধুসূদন লিখলেন *প্রস্থানভেদ*। তাছাড়া *বিবরণপ্রমেয়সংগ্রহ*, *সর্বমতসংগ্রহ* প্রভৃতি গ্রন্থ আছে। বৈষ্ণবমতের জন্য *সকলাচার্যমতসংগ্রহ* আছে। এখনকার দিনেও দেশি-বিদেশি নানা ভাষায় অনেক বই এইজন্য রচিত হয়েছে।

বাংলা দেশ ভারতের এক সীমায়, তাই বাংলা দেশ জ্ঞানে ও সাধনায় অনেক নতুন কথা বলতে পেরেছে। যাস্ক পাণিনি প্রভৃতি ভাষাশাস্ত্রের আচার্যদের জন্ম কাবুলের কাছাকাছি, যেখানে আর্য ও অন্য ভাষা পরস্পর মিলতে পারায় ভাষার সম্বন্ধে সবার চেতনা হয়েছে। এক পতঞ্জলি হলেন গোনর্দীয় অর্থাৎ মধ্য-ভারতের। আর-সব ভাষাতত্ত্ববিদ হলেন ভারতীয় সীমান্তপ্রদেশের লোক। দর্শনেও যেখানে নানা ধারায় মিল হয়, সেখানে দার্শনিক সব আচার্যদের অভ্যুদয় হয়। তাই কপিল গঙ্গাসাগরসংগমবাসী। শংকরাচার্য, রামানুজ, মাধ্ব প্রভৃতি সব দক্ষিণদেশীয়। সবাই সীমান্তপ্রদেশবাসী।

সারা ভারতের কথা না বলে শুধু বাংলা দেশের কথা বলতে গেলে তারই পার পাওয়া প্রায় অসম্ভব। সারা ভারতের সাধনায়ও বাংলা দেশ কম কাজ করেনি। বাংলা দেশের নিজস্ব যে সাধনা ও বিশেষত্ব সে কথা বলবার আগে সারা ভারতের সঙ্গে বাংলা দেশ যে সাধনা করেছে তার সামান্য একটু নামমাত্র করে যাব।

দর্শনের প্রাচীনতম পরিচয় বেদে। তখনও বাংলা দেশে আর্য-উপনিবেশ হয়নি। আর্যপূর্ব সভ্যতা ও দর্শন যা ছিল তার পরিচয় বেদে মেলে না। তবে তখন বাংলা দেশে যোগমত, তন্ত্রাচার, দেহসাধনা প্রভৃতি থাকবারই কথা। পরে বাংলার কাছেই বেদবিরোধী জৈন ও বৌদ্ধ মতের উদ্ভব হল যেখানে, সেখানকার সঙ্গে বাংলার যোগ তখনও বিচ্ছিন্ন হয়নি। একান্নবর্তী পরিবারের মতো বাংলা-মিথিলাদি প্রদেশ তখন এক হয়েই ছিল। উপনিষদের চিন্তায় মিথিলার বড়ো স্থান আছে। পরে বাংলাতে বেদ ও বৈদিক শিক্ষার যথেষ্ট প্রচারও ঘটেছিল। সে কথা এ প্রসঙ্গে বলবার নয়। ভারতের দার্শনিক পথে বাংলাদেশ কারও চেয়ে কম যোগ্যতা দেখায়নি। বাংলা দেশ ভারতেরই এক বিশেষ অঙ্গ। কাজেই সারা ভারতের সংস্কৃতির মধ্যে বাংলারও সাধনা থাকবেই। সেইসব ক্ষেত্রেই বাংলার যথেষ্ট দান বহু গ্রন্থে আজও জীবিত রয়েছে। কিন্তু তবু তার নিজেরও একটি বিশিষ্টতা ও বিশেষ দান আছে। সে কথাতেই ক্রমে আসছি।

ষড়্‌দর্শনের মধ্যে পূর্বমীমাংসার আগাগোড়াই বেদ নিয়েই কারবার। পূর্বমীমাংসার দুইটি ধারা। কুমারিলের ধারা রক্ষণশীল, প্রভাকরের ধারা উদার। বাংলা দেশে গৌড়মীমাংসক শালিকনাথ (৭ম শতক) ছিলেন প্রভাকরী-মতের। কুমারিল-মতেও ভবদেব ভট্ট (১২শ শতক) যে অপূর্ব গ্রন্থ *তৌতাতিতমততিলক* রচনা করে গেছেন, তার সম্মান আজও অক্ষুণ্ণ আছে। এঁরা ছাড়া হলায়ুধ (১২শ শতক), রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য (১৫শ), রঘুনাথ, চন্দ্রশেখর প্রভৃতি বিস্তর পণ্ডিত এই ক্ষেত্রে কাজ করে গেছেন।

উত্তরমীমাংসায় বা বেদান্তে একা মধুসূদন সরস্বতীই একশত। সর্বশাস্ত্রের তিনি ছিলেন মূর্তিমান বিগ্রহ। তাঁর কথা আগেই বলেছি। এই মধুসূদন শেষজীবন কাটিয়েছেন কাশীতে। এঁর পাণ্ডিত্যের কথাই সবার আছে জানা, এঁর আর-একটি দিকের খবর অনেকে রাখেন না।

তুলসীদাস যখন কাশীতে এসে তাঁর *রামচরিতমানস* বা *রামায়ণ* রচনায় রত তখন কাশীর পাণ্ডা ও মোড়লেরা তুলসীদাসকে উদ্‌বাস্তু করে তুললেন। কাশী না ছাড়লে তুলসীদাসের উপায় নেই। এই যখন তাঁর মনের ভাব তখন কী করে মধুসূদন তা জানতে পারলেন। তুলসীদাসকে তিনি একটি শ্লোক লিখে পাঠালেন, 'কাশীর নাম আনন্দকানন। সেই কাননে একমাত্র জঙ্গমতরু তুমি তুলসী। তোমার কবিতামঞ্জরীই তো রামভ্রমরে ভূষিতা। তুমি কাশী ছাড়বে কেমন করে?'[১] :

আনন্দকাননে কাশ্যাং তুলসী জঙ্গমস্তরুঃ।
কবিতামঞ্জরী যস্য রামভ্রমরভূষিতা।

ফলে তুলসীদাস কাশীতেই রয়ে গেলেন। *রামায়ণ* সমাপ্ত হল। হিন্দি ভাষায় অপূর্ব *তুলসী-রামায়ণ-এর* মূলে পূর্ববঙ্গ কোটালিপাড়ানিবাসী এই ব্রাহ্মণের উৎসাহ যে কতখানি কাজ করেছে তার খবর ক-জনে রাখেন? মধুসূদন যেখানে বৈদান্তিক সেখানে তিনি ভারতীয়, যেখানে তিনি ভক্ত সেখানেই তাঁর গৌড়ীয় বিশিষ্টতাটিই ধরা পড়ে।

মধুসূদন ছাড়াও অদ্বৈতবেদান্তে বাংলা দেশে মহেশ্বর, বাসুদেব সার্বভৌম, গৌড় পূর্ণানন্দ, গৌড় ব্রহ্মানন্দ, নন্দরাম, রামানন্দ, কৃষ্ণকান্ত প্রভৃতি বড়ো বড়ো সব আচার্য হয়ে গেছেন। কত নাম আর করব?

সাংখ্যের প্রবর্তক কপিলের আশ্রম নাকি ছিল গঙ্গাসাগরসংগমে। গঙ্গাসাগর তো বাংলা দেশেই। কাজেই সাংখ্যদর্শনের সাধনায় বাংলা দেশের কি বিশেষ কোনো দাবি নেই? বাংলা দেশ যখন মগধাদি প্রদেশের সঙ্গে একাত্মপরিবারের অন্তর্গত তখনই তার কাছাকাছি জৈন বৌদ্ধাদি যাগযজ্ঞবিরোধী মত প্রবর্তিত হয়। মগধ-বাংলা বোধ হয় যাগযজ্ঞের পক্ষপাতী ছিল না বলেই ঐতরেয় আরণ্যকে পাখি বলে বাঙালি ও মগধবাসীদের গালাগালি করা হয়েছে।

তানীমানি বয়াংসি বঙ্গাবগধাশ্চেরপাদাঃ।[২]

তীর্থযাত্রাপ্রসঙ্গ ছাড়া বঙ্গমগধে এলে প্রায়শ্চিত্ত করতে হত, এই ছিল বেদপন্থীদের বিধান। বুদ্ধ, মহাবীর উভয়েই বেদবিরোধী। কপিলও যাগযজ্ঞকে বড়ো স্থান দেননি। তাঁর ধারাতে ক্রমে আসুরি, পঞ্চশিখ, ঈশ্বরকৃষ্ণ প্রভৃতি আচার্যদের নাম পাই।[৩] তর্পণকালে আমরা এঁদেরও তৃপ্তি কামনা করি :

কপিলশ্চাসুরিশ্চৈব বোঢ়ুঃ পঞ্চশিখস্তথা।[৪]

ঈশ্বরকৃষ্ণ তো তাঁর কারিকার আরম্ভেই বললেন,— দুঃখনিবৃত্তির কাজে বৈদিক যাগযজ্ঞ প্রত্যক্ষ উপায় বটে কিন্তু তাতে অবিশুদ্ধি, ক্ষয় ও তারতম্য দোষ আছে, কাজেই তার চেয়ে বিপরীত (প্রকৃতি-পুরুষের) জ্ঞানের পথই ভালো।

দৃষ্টবদানুশ্রবিকঃ সহ্যবিশুদ্ধিক্ষয়াতিশয়যুক্তঃ।
তদ্বিপরীতঃ শ্রেয়ান্‌ ব্যক্তাব্যক্তজ্ঞবিজ্ঞানাৎ॥[৫]

বাচস্পতি মিশ্র এই উপলক্ষে পঞ্চশিখাচার্যের যে একটু বচন উদ্ধৃত করেছেন তা তো আরও ভয়ংকরভাবেই যাগযজ্ঞকে আঘাত করছে। পঞ্চশিখ বললেন,

স্বল্পসংকরঃ সপরিহারঃ সপ্রত্যবমর্ষঃ।

অর্থাৎ যজ্ঞের সঙ্গে মেশানো আছে হিংসা প্রভৃতি পাপ, তাই সেসব অনর্থের জন্যও চাই প্রায়শ্চিত্ত।

---

১. রামনরেশ ত্রিপাঠী, *রামচরিতমানস*, তুলসীজীবনী, ৯৮ পৃ.।
২. ২, ১, ১, ৫।
৩. সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদী বাচস্পতি মিশ্রের প্রণতি।
৪. হিন্দুসংস্কর্মমালা ১ম, পৃ. ১৬।
৫. দ্বিতীয় কারিকা।

নইলে সেসব পাপের জন্য দুঃখবহ্নিতে দগ্ধ হতেই হবে। সাংখ্য তাই যাগযজ্ঞের দ্বারা স্বর্গলাভের চেয়ে প্রকৃতিপুরুষ জ্ঞানের দ্বারা মোক্ষলাভকেই শ্রেষ্ঠ উপায় বলেছেন। বাংলার বিশিষ্টতার সঙ্গে এর মিল আছে।

বল্লালসেনের গুরু অনিরুদ্ধ ছিলেন সাংখ্যসূত্রের প্রখ্যাত টীকাকার। রঘুনাথ তর্কবাগীশের *সাংখ্যবৃত্তিপ্রকাশ* হল ঈশ্বরকৃষ্ণের কারিকার টীকা। রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্যের *সাংখ্যকৌমুদী*ও তাই। রামানন্দ লেখেন *সাংখ্যপদার্থমঞ্জরী*। এঁরা সবাই বাঙালি। বাংলা দেশের নানাবিধ সাধনার সঙ্গেই সাংখ্যমত জড়িয়ে আছে।

যোগদর্শনে যেমন পতঞ্জলির মত দেখা যায় তেমনই নাথনিরঞ্জন প্রভৃতি অতি পুরাতন সব মতে কায়াসাধনের কথা আছে। আদিনাথ, মীননাথ, গোরখ, ময়নামতী, গোপীচাঁদ প্রভৃতি এই পথের গুরু। সেই সবই বাংলার নিজস্ব যোগমত। নাথগুরুদের গ্রন্থ এখন দুর্লভ। তবে মহাযান বৌদ্ধমতের মধ্যে দোহাকোশে গোরখ, গোপীচন্দ্র প্রভৃতি কথায় বাউলদের গানে সেই যোগমতের অনেক পরিচয় এখনও মেলে। এই পথেই বাংলা দেশের যোগমতের বৈশিষ্ট্য দেখতে পাই।

পূর্বেই বলা হয়েছে, নানা সংস্কৃতির মিলনে মানুষের বুদ্ধিবিচার বাড়ে। বাংলা দেশে অনেক সংস্কৃতির মিলন হয়েছিল বলে এখানে বিচারবুদ্ধিরও অনেক উৎকর্ষ হল। তাই বাংলা দেশে হেতুশাস্ত্র ও ন্যায়বৈশেষিক প্রভৃতি নানা যুক্তিবাদের উন্নতি দেখা গেছে। বাংলা দেশ এইজন্য চিরদিনই শাস্ত্রের চেয়ে যুক্তি ও বিচারবুদ্ধিকে বেশি মেনেছে। তাই বাংলার বাইরে বাংলা দেশের বদনাম 'হুজ্জতে বঙ্গালা'— তার্কিক বাংলা দেশ।

ন্যায়-বৈশেষিক লব-কুশের মতো যমজ ভাই। বৈশেষিক দর্শনে শ্রীধরের *ন্যায়কন্দলী* একখানা মহাগ্রন্থ। দক্ষিণ রাঢ়ের ভূরিশ্রেষ্ঠ গ্রামে ছিল শ্রীধরের নিবাস। বৈশেষিক মতের সাধনায় আরও বাঙালি পণ্ডিত আছেন। আর নব্যন্যায়ে তো বাংলার স্থান বহুকাল হতে আজ পর্যন্ত সারা ভারতে সবার অগ্রগণ্য হয়েই রয়েছে। বাসুদেব, রঘুনাথ, হরিদাস, জানকীশর্মা, রামকৃষ্ণ, কৃষ্ণদাস, গুণানন্দ, মথুরানাথ, রুদ্রবাচস্পতি, জগদীশ, ভবানন্দ, হরিরাম, বিশ্বনাথ, রামভদ্র, রঘুদেব, গঙ্গাধর, নৃসিংহ, পঞ্চানন, রামরুদ্র, শ্রীকৃষ্ণ ন্যায়ালঙ্কার, জয়রাম, রুদ্ররাম, কৃষ্ণকান্ত, কালীশংকর প্রভৃতি প্রত্যেকে এক-একটি দিকপাল। কার নাম রেখে কার নাম বলি? কাশীতেও চন্দ্রনারায়ণ, কৈলাস শিরোমণি, রাখালদাস, বামাচরণ প্রভৃতি বাঙালিরা স্বদেশের সম্মান অক্ষুণ্ণ রেখে গেছেন। সেদিনও সেখানে বিরাজমান ছিলেন প্রমথনাথ প্রভৃতি সব মহাপণ্ডিত। মহামহোপাধ্যায় বামাচরণ ছিলেন আমার সতীর্থ। অকালে তাঁরা চলে গেলেন। বাংলার যে কী বিষম ক্ষতি হল তা জানেন সংস্কৃতের পণ্ডিতেরা। যাঁরা তা জানেন না তাঁদের সে কথা বুঝিয়ে বলা কঠিন।

পাশ্চাত্য দর্শনে এবং প্রাচ্য-পাশ্চাত্য উভয় দর্শনে বিখ্যাত যেসব বঙ্গীয় পণ্ডিত তাঁদের নাম এখন অনেকেরই সুপরিচিত। ব্রজেন্দ্র শীল প্রভৃতি বঙ্গীয় পণ্ডিতদের লেখা সর্বত্র সম্মানিত। সারা ভারতের সাধনায় ও সারা জগতের সাধনায় এঁরা আপন আপন সাধনার অঞ্জলি ভালো করেই দিয়ে গেছেন।

বাংলাদেশের জৈনবৌদ্ধমত

পূর্বেই বলেছি, সেই অতি প্রাচীন যুগে জৈন ও বৌদ্ধ-মত বাংলার পাশেই জন্মেছে। জৈনমতের সব জ্ঞান চলে আসছিল মুখে মুখে। মহাবীর পর্যন্ত আচার্যেরা তীর্থংকর, তার পর চার জন শ্রুতকেবলী। শেষ শ্রুতকেবলী হলেন ভদ্রবাহু। তিনি ছিলেন সম্রাট চন্দ্রগুপ্তের গুরু। তাঁর জন্ম উত্তরবঙ্গে পৌণ্ড্রবর্ধনের কোটপুর বা বর্তমান দেবীকোটে। তিনিই সর্বপ্রথম জৈনশাস্ত্রগুলি একত্র

করে প্রকাশ করেন। তাঁর জীবনী পাই রত্ননন্দীর *ভদ্রবাহুচরিত* ও হরিষেণের *বৃহৎকথাকোষ* প্রভৃতি গ্রন্থে। তাতে প্রসঙ্গক্রমে তখনকার দিনের বাংলা দেশের অনেক খবরও পাওয়া যায়। দক্ষিণ-ভারতে জৈনধর্ম তিনিই নিয়ে যান।

বৌদ্ধদের হীনযান মতের চেয়ে মহাযান মতই বাংলা দেশের বেশি নিজস্ব। বহু মহাযান আচার্য বাংলা দেশেই জন্মেছেন। *তত্ত্বসংগ্রহ* রচয়িতা শান্তরক্ষিতও ৭০৫ খ্রিস্টাব্দে পূর্ববঙ্গের ঢাকা জেলার সাভারে জন্মগ্রহণ করেন। নালন্দার সর্বাধ্যক্ষ এবং য়ুয়ানচুয়াং-এর গুরু শীলভদ্রও ছিলেন পূর্ববঙ্গের লোক। বিক্রমশীলা-বিহারপতি তিব্বতের ধর্মগুরু দীপংকর শ্রীজ্ঞান অতীশ ৯৮০ খ্রিস্টাব্দে বিক্রমপুরের এক রাজকুলে জন্মগ্রহণ করেন। চর্যাপদে ও দোহাকোশে বহু বাঙালি আচার্যের নাম পাই। তাঁদের লেখার মধ্যে বাংলা দেশের বিশিষ্টতা নানাভাবে প্রকাশ পেয়েছে।

হীনযান মতের আচার্যদের মধ্যে সিংহলীয় পণ্ডিত রাহুলের শিষ্য রামচন্দ্র কবিভারতীর নাম ভুলবার নয়। বরেন্দ্রদেশের চিরবাটিকা গ্রামে ভরদ্বাজ গোত্রে তাঁর জন্ম। এখনও এই বুদ্ধাগমচক্রবর্তী রামচন্দ্রকে সিংহলের লোকে পূজা করে। প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনে দিল্লিতে যখন বেরন জয়তিলকের সঙ্গে কথাবার্তা হল তখন দেখলাম রামচন্দ্রের গ্রামের কথা জানবার জন্য তিনি উদ্‌গ্রীব। তিনি বললেন, 'রামচন্দ্র কবিভারতী আমাদের গুরুস্থানীয়, তাঁর বিষয়ে কোনো কথাই আমাদের উপেক্ষণীয় নয়। সম্ভব হলে বরেন্দ্রভূমের চিরবাটিকাগ্রামে তীর্থযাত্রায় যেতাম। তবে আমি বৃদ্ধ, অশক্ত'। তার পরেই জয়তিলক মারা গেলেন।

বাংলা দেশের শৈবমত

শৈবদর্শন ও শৈবধর্ম প্রচারেও বাঙালিরা কম কাজ করেননি। এখন তো দক্ষিণ-ভারতই শৈবধর্মের প্রধান আড্ডা। একসময় বাঙালিরা সেখানে ছিলেন রাজগুরু। প্রথম রাজেন্দ্র চোলের সময়েই গৌড়দেশ হতে বহু শিবাচার্য সেই দেশে নীত হন। ১১২২ খ্রিস্টাব্দে নরপতি বিক্রম চোলের গুরু ছিলেন বঙ্গীয় শ্রীকণ্ঠশিব। ১১৬৮ খ্রিস্টাব্দে নৃপতি উমাপতি দেবের গুরু জ্ঞানশিবও ছিলেন দক্ষিণ-রাঢ়ের লোক। ১১৮২ খ্রিস্টাব্দে রাজগুরু শ্রীকণ্ঠশম্ভু সে দেশে শিব প্রতিষ্ঠা করেন। তিনিও দক্ষিণ-রাঢ়বাসী। ১১৯৩ খ্রিস্টাব্দের লেখে জানা যায় সম্রাট তৃতীয় কুলোত্তুঙ্গদেবের গুরু ছিলেন শ্রীকণ্ঠপুত্র সোমেশ্বর। একবার শৈবমতের মঠগুলির বিষয়ে সম্রাট একটা পরোয়ানা তৈয়ার করেন। সেই পরোয়ানাটা সংগত নয় বলে সোমেশ্বর তা নাকচ করে দেন। সম্রাট পরে নিজে আপন মতটা অন্যায় বুঝতে পেরে তা প্রত্যাহার করেন। ১২৬২ খ্রিস্টাব্দের মালকাপুর শিলাশাসনে পাওয়া যায়, রাজা গণপতি ও রুদ্রাম্মার গুরু ছিলেন দক্ষিণ-রাঢ়বাসী শিবাচার্য বিশ্বেশ্বর। রাজাদের কাছে যা পেয়েছিলেন তিনি নানা সৎকার্যে তা দান করেন। তার মধ্যে নারীদের জন্য আরোগ্যশালা ও প্রসূতিশালাও ছিল। তখন আর কোনো দেশে মাতৃমন্দির বা প্রসূতিশালার কথা চিন্তারও অগোচর ছিল।

এইসব নাম ছাড়া দক্ষিণ-ভারতে সোমনাথ, শ্রীকণ্ঠদেব, বামদেব, মহাগণপতিভট্ট প্রভৃতি বড়ো বড়ো বাঙালি শিবাচার্যদের নাম পাই।

সমস্ত বাংলা দেশে কী ভারতের অন্যত্র যেখানেই দেখি কোথাও দর্শন ছাড়া ধর্ম নেই, ধর্ম ছাড়া দর্শন নেই। বাইরে যা সত্যের বীজ তাই জীবনের ক্ষেত্রে বসিয়ে দিলে হয়ে দাঁড়ায় জীবন্ত ধর্ম। বীজ যে জীবন্ত তার প্রমাণ তো ক্ষেত্র ছাড়া হবার জো নেই। জীবনের সঙ্গে সত্যের নিত্যযোগ। তাই সত্যকে জীবনের ক্ষেত্রে ধর্মরূপে গ্রহণ করে অতি সাবধানে পরখ করে নিতে হয়। এই পরখ করার পদ্ধতি এবং পরখ করে পাওয়া সত্যই হল দর্শন। জীবনের সত্য স্বচক্ষে দেখে পরখ না করে নিলে চলবে কেন? কাজেই ধর্ম ও দর্শনের মধ্যে কোনো বিরোধ নেই।

'দর্শন' কথাটি খাসা, কিন্তু চোখে দেখাকেই সেরা পরখ মনে করলে চলবে না। যিনি পরখ করবেন তিনি তো বাইরের ইন্দ্রিয় নন। চোখ কান প্রভৃতি বাইরের ইন্দ্রিয় তার দাসদাসী। দাসদাসীর কাছে খবর নিয়ে কি নিশ্চিন্ত হওয়া যায়? 'প্রত্যক্ষ' হল অক্ষিতে দেখা অর্থাৎ ইন্দ্রিয় বা দাসের কাছে খবর পাওয়া। তাই দর্শনের প্রধান কথা 'প্রত্যক্ষ' নয়। তাঁদের সেরা পরখ হল 'অপরোক্ষানুভূতি' অর্থাৎ পরোক্ষ-নয় সোজাসুজি দেখনেওয়ালার এমন এক অপরোক্ষ অনুভূতি। একে ইংরেজিতে immediate বললেও যেন যথেষ্ট বলা হয় না। ভারতের 'দর্শন' কথাটাকে তাই ইংরেজি করতে গিয়ে soul-sight বলা হয়েছে।[১]

মানবধর্ম

এই অপরোক্ষ দর্শনে দেখব কী? বিশ্বচরাচর? কোথায় এই বিশ্বচরাচরের অন্ত? আর তাও তো বাহ্য, দেখতে গেলেও কোনো-না-কোনো ইন্দ্রিয় অর্থাৎ বাহিরের দাসদাসীর কথাই শুনতে হবে। উপনিষদের ঋষিরা বললেন, বাইরে যাওয়ার দরকার কী? যা বাইরে আছে তা সবই তোমার মধ্যেও আছে।[২] এসব কথা বেদের প্রথম দিকটায় তো তেমন পাই না। ঋগ্‌বেদ-এর দশম মণ্ডল অনেকটা পরের। তাতে দেখছি লোকে সত্য খুঁজছে। কিন্তু কোথায় সেই সত্যের দেখা মিলবে, তার খবর তখনও মেলেনি। তাই ঋষি বললেন, পেট ভরাবার জন্য মন্ত্র আওড়ালে হবে কী? তোমরা এই সৃষ্টির রহস্য কিছুই তো জান না। সেই রহস্য কি কথার কথা? তা তো অন্ধকারে নীহারে আবৃত।

> ন তং বিদীথা য ইমা জজান
> অন্যদ্ যুষ্মাকমন্তরং বভূব।
> নীহারেণ প্রাবৃতা জল্প্যা
> চাসুতৃপ উক্‌থশাসশ্চরন্তি॥[৩]

এই বিশ্বের যিনি অধ্যক্ষ হয়তো তিনিই তা জানেন, অথবা তিনিও জানেন না।

> যো অস্যাধ্যক্ষঃ পরমে ব্যোমন্‌
> সো অংগ বেদ যদিবা ন বেদ॥[৪]

অথর্ব-তে দেখতে পাওয়া গেল, পৃথিবী দ্যৌঃ অন্তরিক্ষ সবই এই মানুষের মধ্যে।[৫] মানুষের মধ্যেই মৃত্যু ও অমৃত, তার শিরায় শিরায় স্পন্দিত হচ্ছে সব সমুদ্রের উচ্ছ্বাস।[৬] তপস্যা, শ্রদ্ধা, সাধনা সবই

১. Radhakrishnan, *Indian Philosophy*, Intro, p.44। ২. *বৃহদারণ্যক* ২, ৫, ১০, ২, ৫, ১৪।
৩. *ঋগবেদ* ১০, ৮২, ৭। ৪. *ঋগবেদ* ১০, ১২৯, ৭।
৫. *অথর্ব* ১০, ৭, ৩। ৬. *অথর্ব* ১০, ৭, ১৫।

এই মানুষেরই মধ্যে।[১] ঋক্, যজু, সাম সবই এই মানুষের মধ্যে।[২] ভূত ভবিষ্যৎ সর্বকাল সর্বলোক সবই এই মানুষে।[৩] ব্রহ্মও মানুষেরই মধ্যে। মানুষের মধ্যে যে ব্রহ্মকে দেখল সেই তাঁকে ঠিক জায়গাটিতে সংস্থিত দেখল।[৪]

যে পুরুষে ব্রহ্ম বিদু
স্তেবিদুঃ পরমেষ্ঠিনম্॥

ছান্দোগ্য বললেন, 'এই সবই ব্রহ্ম'—'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম'।[৫] বৃহদারণ্যক বললেন, 'এই আত্মাই ব্রহ্ম'—'অয়মাত্মা ব্রহ্ম'।[৬] মোট দাঁড়াল এই আত্মাই বিশ্বচরাচর ও ব্রহ্ম।

এইসব কথা তো বেদের প্রথম দিকে দেখি না। বেদপন্থীরা যতই এদেশে বসবাস করতে লাগলেন ততই এইসব কথা তাঁদের মুখে বেশি করে শোনা যেতে লাগল। বেদের প্রথম দিকে দেবতাদের নিয়েই কারবার। *অথর্ব*-তেই মানুষ ও পৃথিবীর দিকে সকলে শ্রদ্ধার সহিত তাকালেন। *অথর্ব*-এর দশম কাণ্ডের দ্বিতীয় সূক্তের ৩৩টি ঋক্ এই মানুষেরই স্তবগান। দশম কাণ্ডের সপ্তমে ৪৪টি ঋকে বিশ্বরহস্যের সঙ্গে মানবের যোগের মহিমারই কথা। *অথর্ব*-এর পঞ্চদশ কাণ্ডটা আগাগোড়া ব্রাত্য অর্থাৎ ধর্মকর্মহীন সহজ মানুষের স্তবগান। অর্থাৎ ধার্মিক বলেই মানুষ শ্রদ্ধেয় নয়, মানুষ বলেই মানুষ শ্রদ্ধার পাত্র। *অথর্ব*-এর দ্বাদশ কাণ্ডের প্রথম সূক্তের ৬৩টি ঋকে শুধু পৃথিবীরই মহিমা ঘোষিত হল। এখনকার দিনে বেদের দেবদেবীদের কথার চেয়ে এইসব দিকেরই মূল্য অনেক বেশি। অথচ *অথর্ব-বেদ*টাকে সেকালের অনেক দেবপন্থীর দল আমলই দিতে চাননি। কাজেই মনে হয় মানুষের ও জগতের মাহাত্ম্য-বিষয়ক কথা বৈদিকদের নিজস্ব নয়। এদেশে এসে তাঁরা এইসব পেয়েছেন ও ক্রমে তা আত্মসাৎ করেছেন। ক্রমে এইসব কথা উপনিষদে স্থান পেল। এদেশের নাথ যোগপন্থে নিরঞ্জনপন্থে, এইগুলিই হল আসল কথা। মহাযান বৌদ্ধধর্ম থেকে আরম্ভ করে মধ্যযুগের সন্ত ও এখনকার বাউলদের মধ্যে এইসব তত্ত্বই বরাবর চলে আসছে।

জৈন ও বৌদ্ধদের মতেও দেবতার স্থানে মানুষই বসলেন পূজ্য হয়ে। মানববৃত্তিগুলি বিশুদ্ধ করাই হল ধর্মসাধনা। সেইসব জৈন বৌদ্ধ মতবাদও বাংলারই আশপাশের বস্তু। বেদের সঙ্গে তাদের চিরবিরোধ। আর নাথযোগ, মহাযান প্রভৃতি মত বেদের ধার ধারে না অথচ সেইসব মতবাদই হল বাংলার চিরন্তন বস্তু। বাংলা দেশ থেকেই এইসব বিচার ও যুক্তি হয়তো চারিদিকে বিস্তৃত হয়েছে। আর সবাইকে এইসব জিনিস দিয়ে বাংলা দেশও ধন্য হয়েছে। বাংলার নাথধর্মে মহাযানধর্মে তান্ত্রিকধর্মে বাউলধর্মে সব সত্যই মানুষের মধ্যে, তাই কায়াসাধনাই হল প্রধান কথা। বিশ্ব ও বিশ্বের সব সত্যই এই মানবকায়ারই মধ্যে। কায়ার মধ্যেই বিশ্বপতি, কায়ার মধ্যেই তাঁকে পেতে হবে। জৈনদের পাহুড় দোহা ও কবির প্রভৃতির বাণীও প্রায় অক্ষরে অক্ষরে মহাযানদেরই বাণী। দোহাকোশ বললেন—'এই দেহেই গঙ্গা-যমুনা-সাগরসংগম, এখানেই প্রয়াগ-বারাণসী, এখানেই চন্দ্র-দিবাকর'।

এথু সে সুরসরিজমুনা
এথু সে গঙ্গাসাঅরু।
এথু পআগবনারসি
এথু সে চন্দদিবাঅরু॥[৭]

---

১. *অথর্ব* ১০, ৭, ১।
২. *অথর্ব* ১০, ৭, ২০।
৩. *অথর্ব* ১০, ৭, ২২।
৪. *অথর্ব* ১০, ৭, ১৭।
৫. *ছান্দোগ্য উপনিষদ* ৩, ১৪, ১।
৬. *বৃহদারণ্যক* ২, ৫, ১৯।
৭. *দোহাকোষ* ১৫, ৪৭।

পাহুড় দোহা জৈনদের। মহাযান বৌদ্ধদের মতের মতো পরবর্তী জৈনধর্মে কায়াযোগ, প্রেমসাধনা প্রভৃতিই প্রধান হয়ে উঠল। কাজেই আর্যপূর্ব এইসব মতবাদের জোর কতখানি তা বুঝতে পারি। পাহুড় দোহার রচয়িতা মুনি রামসিংহ প্রায় ১০০০ খ্রিস্টাব্দের লোক। পরে কবিরও বললেন,

যা ঘট ভীতর সপ্ত সমুন্দর
যাহীমেঁ নদ্দী নারা।
যা ঘট ভীতর কাশী দ্বারকা...
যা ঘট ভীতর চংদ সূর হৈ।[১]

তাঁরও পরে দাদূ বললেন,

কায়া মাহিঁ সাগর সাত।[২]
কায়া মাহিঁ নদীয়া নীর।[৩]
কায়া মাহিঁ গংগতরংগ।
কায়া মাহিঁ জমনাসংগ।[৪]
কায়া মাহিঁ কাসীথান।[৫]

মহাযান বৌদ্ধদের দোঁহাতেও দেখি, এই শরীরের মধ্যেই চলেছে অশরীরের গুপ্তলীলা :

অসরির কোই সরিরহি লুক্কো।[৬]

ভাই সরহপাদ বললেন, 'ঘরেও থেকো না, বনেও যেয়ো না'।

ঘর হি ন থক্কু ন জাহি বনে।[৭]

কবিরেরও আছে,

না ঘর রহ্যা না বন গয়া না কুছ কিয়া কলেস।

কবির যে জাতিতে জোলা, অর্থাৎ যোগী নাথের ঘরেই যে তাঁর জন্ম।

বাংলা দেশও দেবতাকে মানবভাবেই তার অন্তরঙ্গ করে নিয়েছে। আর এই সাধনার গুরু হলেন বাংলার প্রাকৃত অর্থাৎ শিক্ষাদীক্ষাহীন সহজ মানুষ।

বাংলা দেশের প্রাকৃত মানবতাধর্ম

২৮ বছর আগে কলিকাতায় দর্শনমহাসভাতে সভাপতিরূপে রবীন্দ্রনাথ এই দেশের প্রাকৃত দর্শন (Philosophy of Our People) বিষয়ে বক্তৃতা করেন। তিনিও বলেন, 'আমাদের মধ্যে যে সত্য তাতেই এই বিশ্বের সত্যতা'। তাই তিনি বাউলগান উদ্ধৃত করেন :

আমার আঁখি হইতে পয়দা
আশমান আর জমীন।

সেই পরাৎপর পরমপুরুষও আমারই মধ্যে আছেন :

রূপ দেখিলাম রে
নয়নে আপনার রূপ দেখিলাম রে।
আমার মাঝত বাহির হইয়া
দেখা দিল আমারে॥

১. *কবির ১, ৮৬।*
২. *দাদূ, কায়াবেলী ২৪।*
৩. *দাদূ, কায়াবেলী ২৫।*
৪. *দাদূ, কায়াবেলী ২৮।*
৫. *দাদূ, কায়াবেলী ৩০।*
৬. *দোহাকোষ ২১, ৮, ৯।*
৭. *দোহাকোষ ২২, ১০৩।*

অক্সফোর্ডে তাঁর হিবার্ট লেকচারও বাউলদের কথাতেই পূর্ণ।

বাংলা দেশে এই মানবের মধ্যেই সাধনা। প্রেমই হল ধর্মের প্রাণ। এইসব কথাই বৌদ্ধযুগ থেকে আজ পর্যন্ত সমানভাবে দেখা যাচ্ছে। এইসব কথাই বাংলার যোগমতে, বাংলার তান্ত্রিক সাধনায়, বাংলার প্রাকৃত গানে চলে আসছে। বাংলা দেশের সাধনার এইটেই প্রাণবস্তু। পরবর্তী সব উপনিষদে যে যুক্তিবিচারের এত স্বাধীনতা তা খুব সম্ভব এইসব মতেরই প্রভাবে। এই স্বাধীনতার জন্য বাংলা দেশকে অন্য প্রদেশের সনাতনপন্থীরা কোনোদিনই দু-চক্ষে দেখতে পারেননি। অথচ বাংলার বাউলদের এইসবই হল সাধনার মূলতত্ত্ব।

বাংলাতে বৌদ্ধধর্ম এইসবের সঙ্গে মিশে গিয়ে মহাযান হয়ে দাঁড়াল। প্রেমের সাধনায় অনেক দুঃখ অনেক বিপদ আছে, তবু বাংলা তাকেই স্বীকার করেছে, তবু শুষ্ক আচার ও জ্ঞানের পথে যায়নি। সাধকশ্রেষ্ঠ রবিদাসকে জিজ্ঞাসা করা হল, 'প্রেমের ধর্মে যদি বিকারেরই ভয় তবে সে পথে কেন যাব?'

তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, কী খাও?'

উত্তর পেলেন 'দুধ দই শাক অন্ন খাই'।

আবার প্রশ্ন হল, 'তা কি পচে?'

উত্তর এল, 'হ্যাঁ'।

রবিদাস বললেন, 'ইট পাথর তো পচে না, তা কেন খাও না?'

উত্তর শুনলেন, 'তাতে যে প্রাণ বাঁচে না'।

তখন রবিদাস বললেন, 'ঠিক সেইজন্যই প্রেমের পথে বিপদ থাকলেও সেই পথেই যেতে হবে। তা যে জীবন্ত। শুধু শুষ্ক আচারে ও জ্ঞানে বিকারের ভয় না থাকলেও যাতে প্রাণ নেই তাতে প্রাণ তো বাঁচে না। জীবন্ত মানুষ জীবন্ত প্রেম ছাড়া বাঁচবে কেমন করে?'

কবির দাদূ সবাই বলেছেন :

জীব বিনা জীব বাঁচে নহিঁ
জীব কা জীব আধার।

সংস্কৃতির যোগাযোগ

বেদের প্রথম দিকে যা দেখি তা হল ইন্দ্র অগ্নি বায়ু বরুণ প্রভৃতি দেবতার উদ্দেশ্যে যাগ-যজ্ঞ, তাতে করে আমরা ইহলোকে পাই ধনজন গো-অশ্ব ও শস্য-সম্পদ এবং পরলোকে পাই স্বর্গ। সুখ সম্পদ প্রভৃতির জন্য লড়বার মতো শক্তিও তাঁদের কাম্য। তাঁদের যাগযজ্ঞের চারিদিকে দেখা যেত গানবাজনা-উৎসবের সমারোহ। সে যুগে সন্ন্যাস বৈরাগ্য প্রভৃতির ধার তাঁরা ধারেননি। ধর্মের জন্য পশুঘাতও তাঁদের বেশ চলত। ক্রমে উপনিষদের যুগে দেখি দেবতার স্থানে আত্মা পরমাত্মা ব্রহ্ম প্রভৃতির তত্ত্ব বড়ো হয়ে উঠল। সন্ন্যাস ব্রহ্মচর্য প্রভৃতি প্রতিষ্ঠিত হল। ধনজনের কামনার স্থানে এল বৈরাগ্য, স্বর্গের বদলে ক্রমে তাঁরা চাইলেন মুক্তি। ধর্মার্থ পশুঘাতের স্থলে এল অহিংসা মৈত্রী। মানুষ ও মানবদেহের মহত্ত্ব, মানবের মধ্যে বিশ্বপ্রেমে ভক্তিতে সাধনা প্রভৃতি দেখা দিল। এসব জিনিস হয় এদেশে আগে থেকেই ছিল, নয়তো এদেশে এমন সব মতবাদ ছিল যার সঙ্গে যোগে বা সংস্কৃতির যোগাযোগের ফলে তাঁদের মনে ওইসব ভাব এল।

কিন্তু নানা কারণে মনে হয় আর্যপূর্ব কোনো কোনো উন্নত দলে এইসব বড়ো তত্ত্ব ছিল। আবার কোনো কোনো অনুন্নত দলে ভূতপ্রেত প্রভৃতি স্থূল বস্তুর পূজা তুকতাক অভিচার প্রভৃতি অনেক নিকৃষ্ট জিনিসও ছিল। আর্য-অনার্য মিলনের ফলে উভয়ের ভালো ও মন্দ দুই-ই মিলেমিশে গিয়েছে। মোটের উপর এই সংস্কৃতির ক্ষেত্রে অনেক বিচারবৈচিত্র ও পরস্পরের মিলন ঘটেছে।

আর্যেরা এলেন উত্তর-পশ্চিম ভারতে। তাই আর্যপূর্ব সংস্কৃতিকে সরতে হল হয় পূর্বদিকে নয় দক্ষিণে। পূর্বদেশে আর্যপূর্ব বহু সংস্কৃতি এসে স্থান পেল। সেইগুলিই পরে জৈনধর্মের সঙ্গে মিলে গেল এবং পাহুড় দোহা প্রভৃতি মরমি মতবাদের সৃষ্টি হল। মহাযান বৌদ্ধধর্মেও দেখা গেল মানুষই সব, দেহেই বিশ্বচরাচর। প্রেমেই সাধনা, দেহাকর্ষণ ব্যর্থ, কায়াযোগই সাধনীয়, বাহ্য-দেবতা মন্দির পূজা সবই ব্যর্থ, বাহ্য-আচার সম্প্রদায় সবই নিষ্ফল। এসব মতবাদ বেশি করে ছিল এই বাংলা দেশেই। বাংলার নাথ-যোগীদের মধ্যে এইসব মতই চলে আসছিল। কবির প্রভৃতির ধারাও এই দলের। নাথ-যোগীরা নামেমাত্র মুসলমান হয়ে জোলা বনে গিয়েছিলেন। জোলা শুধু একটা জাত নয়; তখন জোলা বলে সাধক-সম্প্রদায়ও ছিল। তাই তুলসীদাস বলে গেছেন :

ধূত কহৌ অবধূত কহৌ রজপুত কহৌ
জোলহা কহৌ কোউ।।[১]

এখনও কাশী-প্রদেশে ভর্থরী নামে এক সম্প্রদায় আছে। তারা নাকি ভর্তৃহরির অনুবর্তী যোগী-সম্প্রদায়। অথচ এখন নামে তারা মুসলমান। আবার হিন্দুদের কোনো উৎসবই তাদের গান ছাড়া সম্পন্ন হয় না।

কায়াযোগ ও প্রাকৃত পথ-সহ এইসব মরমিবাদই বিশেষ করে বাংলার নিজস্ব। শুধু মহাযানে নয়, খুব শেষের দিকের উপনিষদগুলিতেও এরই পূর্ণ প্রভাব। এগুলিই এদেশের নিজস্ব বলে এর শক্তি এত বেশি যে পরে বাইরে থেকে যত ধর্ম এসেছে সবাইকে ক্রমে ক্রমে এইসব মরমি মত মেনে নিতেই হয়েছে।

ভূমির সঙ্গে যোগ থাকায় এর জোর এতই বেশি ছিল যে এরই প্রভাবে ক্রমে বৈদিক ধর্ম হল উপনিষদের কায়াযোগবাদী প্রাকৃত ধর্ম। জৈনমতের ক্রমে পরিণতি হল সেই জাতীয় পাহুড় দোঁহা প্রভৃতি মতে। পরে স্থানকবাসী ঢুংঢিয়া লুঙ্কাশাহমত—তারণপন্থ প্রভৃতি জৈন মতেও এর প্রভাব দেখা যায়। বৌদ্ধমতের সঙ্গে এই মত মিলে হল মহাযান, বজ্রযান প্রভৃতি সম্প্রদায়।

বাংলা দেশের শৈব ও শাক্ত-ধর্ম

শৈবমত বাংলাতে বজ্রযানের সঙ্গে মিলেমিশে ছিল। এখনও বাংলায় পার্থিব শিবের মধ্যে বজ্রযানীদের স্তূপের রূপ দেখা যায়। বাংলা দেশে মাটির তৈরি শিবের মাথায় একটি মাটির গুলি দেওয়া হয়। তার নাম বজ্র। বেলপাতা দিয়ে তা সরিয়ে দিলে তবে তিনি শিব হয়ে পূজার যোগ্য হন। বাংলা দেশে পার্থিব শিবের পূজকেরা সবাই এই তত্ত্ব জানেন। ভারতের অন্যান্য স্থানের শৈবমতের সঙ্গে বাংলা দেশের শৈবমতেরও বেশ-একটু পার্থক্য আছে। কাশ্মীরের শৈবমত ও বাংলার শৈবমত এক নয়। রাবণ নাকি কৈলাসের মহাদেবকে লঙ্কায় নিয়ে যেতে চাইলেন। শিব তো রাজি হন না। শেষে

১. *রামচরিতমানস*, রামনরেশ ত্রিপাঠী, তুলসীজীবনী পৃ. ২১।

রাবণ একরকম জোর করে তাঁকে মাথায় করে নিয়ে চললেন। শিব একটা অজুহাত বের করে বৈদ্যনাথ পর্যন্ত এসে সেখানেই থেমে গেলেন। কোনো কোনো মতে তিনি কর্মনাশা নদীও পার হননি। এই কথার মধ্যে গভীর একটি ঐতিহাসিক সত্য আছে। এক দেশের শিব অন্য দেশে যেতে চাইতেন না। উত্তরের শৈবধর্ম ও শিবদেবতা বিহারের পাশে বা বড়োজোর ঝাড়খণ্ড পর্যন্ত এসে থেমে গেলেন। এইসব সূত্র ধরে কাজ করলে অনেক গভীর সত্যের সন্ধান মিলবে। পূর্বেই বলা হয়েছে বাংলার শিবাচার্যেরা দক্ষিণ-ভারতেও ধর্ম প্রচার করেছিলেন। কাজেই সেখানে বাংলার শৈবধর্মের প্রভাব মিলবে। এইসব কথায় বোঝা যায় দেশভেদে শিবের স্বরূপ শৈবমত ভিন্ন ভিন্ন ছিল। এক দেশেরটা অন্য দেশে চলত না।

তন্ত্রশাস্ত্র ও শাক্তদর্শনের উৎপত্তি খুব সম্ভবত এই বাংলা দেশেই অন্তত উইন্‌টার্‌নিট্‌জ্‌সাহেব তো তাই বলেন। কালীবিলাসতন্ত্রে পূর্ব-বাংলা ও অসমিয়া ভাষায় খিচুড়ি দেখা যায়। বাংলার তন্ত্রশাস্ত্রের অতি প্রাচীন গ্রন্থকার মহোপাধ্যায় পরিব্রাজকাচার্য, তাঁর গ্রন্থ *কাম্যমন্ত্রোদ্ধার*। ১৩৭৫ খ্রিস্টাব্দে লেখা এই গ্রন্থের পুথি পাওয়া গেছে। তার পর হলেন মহাপ্রভুর সমসাময়িক কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ। তাঁর গ্রন্থ *তন্ত্রসার*। তার পরই ব্রহ্মানন্দ ও তাঁর শেষে পূর্ণানন্দ। তিনি আসাম ও মণিপুরে তন্ত্রশাস্ত্র প্রচার করেন। কামাখ্যাতেও শাক্তধর্ম প্রচার করেন বাঙালি কৃষ্ণরাম ন্যায়বাগীশ। আহোমরাজ রুদ্রসিংহ তাঁরই শিষ্য। এদিকে *কুব্জিকামততন্ত্র* সপ্তম শতকেরও পূর্ববর্তী। *পরমেশ্বরমততন্ত্রের* পুথিই পাওয়া গেছে ৮৫৮ খ্রিস্টাব্দে লেখা। কাজেই এই মত আরও পুরাতন। *মহাকৌলজ্ঞানবিনির্ণয়*ও এর চেয়ে কম পুরোনো নয়। বাণভট্ট সপ্তম শতাব্দীর লোক। ভবভূতি অষ্টম শতাব্দীর কবি। তাঁদের লেখার মধ্যে কাপালিক ও তান্ত্রিক মতের পরিচয় মেলে।[১]

বাংলায় তান্ত্রিকদের ধারার সঙ্গে তৎপূর্ববর্তী নাথদের ধারার যোগ আছে। *কৌলাবলীনির্ণয়* গ্রন্থের দ্বিতীয় উল্লাসে তান্ত্রিক গুরুপরম্পরায় বহু নামের শেষেই 'নাথ' পদবি দেখা যায় (৯২-৯৩ শ্লোক)। এঁদের কায়াসাধনের সঙ্গে নাথদের কায়াসাধনার মিল আছে। তারাতন্ত্রের পূর্বপীঠিকায় দেখতে পাই বশিষ্ঠ বৈদিক সাধনায় সিদ্ধি না পেয়ে যোগপথে যান, তার পর চীনাচার মতে তান্ত্রিক সাধনায় ত্বরিত সিদ্ধি লাভ করেন।

ত্রিপুরায় মেহারের শক্তিপীঠের আদি সাধক সর্বানন্দ ১৪২৫ খ্রিস্টাব্দে সিদ্ধি লাভ করেন। এঁর পিতামহ বাসুদেবের পূর্বস্থান রাঢ়দেশে। কাশ্মীরের রঘুনাথমঠের নবাহ্নপূজাপদ্ধতি ও মধ্য ভারতের *ত্রিপুরার্চনদীপিকা* নাকি এঁরই রচনা। কাশীতে গণেশমহল্লায় এঁর মঠ আছে; হিমালয়েও এঁর মত কোথাও কোথাও চলে।

যশোরেশ্বরীর সঙ্গে কিছু তান্ত্রিক আবার রাজপুতানায় গেলেও ভালো পণ্ডিতের অভাবে সেই সঙ্গে রাজস্থানে বঙ্গীয় কোনো শাক্তদর্শনের তেমন প্রচার ঘটেনি। বেলুচিস্তানে হিংলাজে বাঙালি ব্রহ্মানন্দ ও তাঁর শিষ্য জ্ঞানানন্দ তান্ত্রিক দর্শন ও সাধনা প্রচার করেন।

শাক্ত ধর্মে ও দর্শনে প্রদেশভেদে নানা বৈচিত্র আছে। তবে শাক্তদর্শনে বাংলার নিজস্ব বৈশিষ্ট্যও আছে। তন্ত্রশাস্ত্র যদিও এখন ভারতের সর্বদেশেরই গূঢ় বিদ্যা, তবু সর্বদেশে তার রূপটি এক নয়। আগমবাগীশের লেখায় বাংলার শাক্তসাধনা যা প্রকাশ পেয়েছে ঠিক তার মতো জিনিস দক্ষিণ-ভারতের শ্রীবিদ্যার সাধনায় দেখা যায় না। কাশ্মীরের তন্ত্রবিদ্যা ও কৌলসাধনাও ভিন্ন জিনিস। নেপালের সাধনার মধ্যে কতকটা বাংলা প্রভাব অছে। কিন্তু তার যতটুকু নেপালের নিজস্ব তাতে

১. হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, *নেপাল-পুথির তালিকা,* I, ১৯০৫ LXXVII, LXXVIII, II, ১৯১৫, XXI, XVIII,

আর তন্ত্রসারের সাধনাতে অনেক প্রভেদ আছে। কাশীতে তৈলঙ্গস্বামী ছিলেন অন্ধ্রদেশীয় তন্ত্রসাধনার অনুবর্তী। তাঁর সাধনার স্থানে এখনও পাথরের তৈরি সব তাঁর সাধনার যন্ত্র ও চক্রগুলি আছে। সেগুলি দেখলে যাঁরা জানেন তাঁরা বেশ বুঝতে পারবেন। লক্ষ্মণদেশিক প্রভৃতি গুরুর মত আমাদের দিকে ঠিক মিলবে না। প্রভাস, মালাবার, কোচিন প্রভৃতি নানা দেশে তন্ত্রের নানা রূপ দেখা যায়। এইসব অন্তরঙ্গ কথা পাঠক সাধারণের আলোচ্য হতে পারে না। তবে তান্ত্রিকদের মধ্যে সর্বত্রই কায়ার মধ্যে চক্রভেদ প্রভৃতি আছে। বাংলার যতি পূর্ণানন্দের *শ্রীতত্ত্বচিন্তামণি* ও *ষট্‌প্রকরণ*-এর যে ষট্‌চক্রনিরূপণ ও তার কালীচরণ, শংকর, বলদেব ও বিশ্বনাকৃত টীকাতে বাংলারই বিশেষত্ব রয়েছে। তন্ত্রের বহু বহু গ্রন্থ আছে, তাতে বাংলারও গ্রন্থসংখ্যা কম নয়। সেসব কথাও অন্তরঙ্গদের মধ্যে ছাড়া হতে পারে না।

বাংলার শাক্তগান

বৈষ্ণবদের যেমন নিজস্ব গান আছে শাক্তদেরও তেমনই নিজস্ব সব গান আছে। এখন রামপ্রসাদ, দেওয়ান রামলোচন ও কমলাকান্তের আগেকার শাক্তগান বড়ো একটা মেলে না। পূর্বে সেরকম গান অনেক ছিল। তাকে মালসি বলত। তাতে শুধু তন্ত্রশাস্ত্রোক্ত সাধনা ও জ্ঞানের শাস্ত্রীয় কথাই নয়, বাংলার অন্তরের সুখ-দুঃখ-বেদনার পরিচয়ও মেলে এইসব মালসি আগমনি ও বিজয়া প্রভৃতি গানে।

তন্ত্র ও শাক্ত মতবাদ এক কথা আর বাঙালির জীবনে কীভাবে তা দিনের পর দিন কাজ করছে তা আর-এক কথা। বাঙালি-শাক্ত তার উপাস্য দেবীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ প্রেমের সম্বন্ধে যুক্ত। সে প্রেম একেবারে মানবীয়। আগমনি ও বিজয়াগানে ঘরে ঘরে গৌরীর জন্য কন্যাবিরহবিধুর পিতামাতার দল কেঁদে আকুল। দেবীকে মা বলে ডেকে দেওয়ান রামদুলাল, রামপ্রসাদ, কমলাকান্ত কত বেদনাই না জানিয়ে গেছেন। এইসব মানবীয় ভাব নিয়ে শাক্তদের বহু মালসি গান এদেশে প্রচলিত ছিল। এখনও পূর্ববঙ্গে কোথাও কোথাও তার কিছু পাওয়া যেতে পারে, কিন্তু উৎসাহের অভাবে সেগুলি প্রায় সবই এখন বিস্মৃতির গর্ভে ডুবে গেছে। সেই মালসিতে দেবীকে মানবীয় সম্বন্ধ দিয়েই ঘনিষ্ঠ করে দেখা হয়েছে। বাউলদের মধ্যে ভগবানকে যেমন নানা মানবীয় ভাবে দেখা হয়েছে মালসিতেও তাই। এই ভাব নইলে বাঙালির প্রাণ তাতে সাড়া দিত না। প্রেমমাত্র-সম্বল বাংলা দেশকে ধন্য করতে গিয়ে দেবী এখানে শুধু মা হয়ে তৃপ্ত হননি, তিনি প্রণয়িনী হয়েও বাংলা দেশকে ধন্য করে গেছেন। সাধক দ্বিজদেব তাঁকে পেলেন কন্যারূপে, রাঘবানন্দ পেলেন পত্নীরূপে।

পূর্ব-বাংলার দুইটি তান্ত্রিক গুরুপরম্পরাই এখন প্রধান। একটির নাম সর্altবিদ্যাবংশ। তার প্রবর্তক মেহারের সাধক সর্বানন্দ। অন্য ধারা হল মিতড়ার ঠাকুরদের পূর্বপুরুষ রাঘবানন্দের প্রবর্তিত। এই ধারাকে বলে অর্ধকালীর ধারা।

ময়মনসিংহ জেলায় আলাপসিংহ পরগনায় পণ্ডিতবাড়ি গ্রামে দ্বিজদেবের ঘরে দেবী কন্যারূপে অবতীর্ণ হয়ে রাঘবানন্দের পত্নীরূপে নারীলীলা দেখিয়ে যান। নিমন্ত্রণে অন্ন-পরিবেশনকালে তাঁর মাথার ঘোমটা বাতাসে উড়ে গেল। দুই হাতে খাদ্যের থালা। তাঁর লজ্জা রক্ষা হয় কীসে? হঠাৎ আর-দুখানি হাত দিয়ে তিনি ঘোমটা সামলে নিলেন। কারও কারও চোখে তা এড়াল না। সকলে টের পেলেন রাঘবানন্দ-গৃহিণী মানবীরূপে দেবী। তাই এই বংশের সন্তান, মিতড়ার গুরুঠাকুরদের বংশকে অর্ধকালীবংশ বলে। এঁদের বহু শিষ্য বাংলা দেশে।

ছেলেবেলায় আমরা অনেক মালসিগান শুনতে পেতাম। এখন সেগুলি ক্রমে লুপ্ত হয়ে এসেছে। কারণ তার জানিনে। হয়তো একদিকে অনাদর ও উপেক্ষা আর-একদিকে এইসব অনাদর হতে বাঁচাবার জন্যে গানগুলি গোপন করে রাখবার চেষ্টা প্রভৃতি অনেককিছু হেতুই আছে।

এইসব মালসিগানে দেখা যায় ভক্ত ও দেবীর মধ্যে শুধু উপাস্য-উপাসক যোগ নয়— মাতাপুত্রের মতো একটি ঘনিষ্ঠ প্রেমের যোগও আছে। শিব-শক্তি যোগের মতোই তা এমন প্রগাঢ়, এমন মধুর যে, এককে বাদ দিয়ে অন্যকে কোথাও খুঁজে পাওয়া যায় না।

কী সংসারের কাজে কী সংসার হতে মুক্তির সাধনায় উভয় ক্ষেত্রেই সাধক ও সাধ্যা দেবী উভয়ের যোগে সাধনা পূর্ণ হয়ে চলেছে। গঙ্গা-যমুনা সংগমের মতো এই যোগটি যেমন মধুর তেমনই সুন্দর ও পবিত্র। যে মুক্তিস্বরূপিণী জননী মুক্তি দেওয়ার জন্য বন্ধন মোচন করবেন সেই আদ্যাশক্তি জননীই আবার আপন সন্তানকে নিয়ে এই সংসারে বসে তার জন্য রমণীয় আশ্রয়নীড়টুকু রচনায় রত। রামপ্রসাদ প্রভৃতি ভক্তদের জীবনের সঙ্গে এইসব মালসির কোনো কোনো কথা জড়িয়ে গেছে। এইসব গানে উপাস্য-উপাসকের ব্যবধান যেন কোথায় মিলিয়ে যাচ্ছে।

প্রেমের সাধনায় উপাস্য-উপাসকের এরূপ ভেদ ক্রমে ঘুচে আসাই স্বাভাবিক। কিন্তু শাক্তদের সাধনা হল শক্তি নিয়ে। সেখানে তো এই ভেদ ঘুচবার কথা নয়। কিন্তু প্রেমপথের পথিক বাংলার প্রাণের মধ্যে এমন একটা মানবীয় রস আছে যে, এই দেবী আদ্যাশক্তিকেও মাতারূপে কন্যারূপে এমনকি অর্ধকালী-লীলায় দেবীকে প্রণয়িনীরূপেও দেখে সে ধন্য হয়েছে। এখানে বাংলার শাক্ত ও বাউলে কোনো ভেদ নেই।

শাক্ত ভক্তরাও তাই দেবীকে নিয়ে দুইয়ে মিলে মুক্তির সাধনা এমনকি সংসারের কাজও চালিয়ে গেছেন। ভক্ত রামপ্রসাদ একদিন ঘরের বেড়া বাঁধতে গেলেন। বেড়ার ওদিক হতে কেউ তো বাঁধবার বেতটি ফিরিয়ে না দিলে চলে না। তাই তিনি কন্যাকে ডাকলেন সাহায্য করতে। হয়তো কন্যা সে ডাক শুনতে পাননি আর নয়তো তিনি ছিলেন অন্য কাজে ব্যস্ত। রামপ্রসাদ ব্যাকুল হয়ে ডাকলেন, 'কই মা, কত আর তোর জন্য বসে থাকব? তুই কি আর আসবিনে?'

মহানির্বাণের বিশুদ্ধ ব্রহ্মবাদ যামলগ্রন্থ-লিখিত আদ্যার মহাশক্তিবাদ বা কোথায় আর বাংলা দেশের প্রাকৃত জনের ঘরে ঘরে দেবী যে আপনজন হয়ে আছেন সেই মতবাদই বা কোথায়? এই ঘরোয়া দেবীকে নিয়েই বাংলা দেশের চিত্ত ভরে উঠেছে। বাংলা দেশের প্রাকৃত শাক্ত মতবাদে নির্বিকল্প ব্রহ্মবাদ বা শক্তিবাদ মানবীয় প্রেমেই পর্যবসিত হয়েছে। তাই পরাৎপরা ব্রহ্মময়ী বিশ্বভুবনেশ্বরী ভক্তের ব্যাকুল ডাকে মানবীর রূপে এসে রামপ্রসাদের ঘরের বেড়ায় বেতের বাঁধন বাইরে বসে ফিরিয়ে দিতে লাগলেন। একদিকে কন্যারূপিণী জগন্মাতা, অন্যদিকে রামপ্রসাদ— দুয়ে মিলে বেড়ার বাঁধন চলল। রামপ্রসাদ বাইরের দেবীকে দেখতে না পেলেও তাঁর অন্তরের মধ্যে কী এক দিব্য অনুভূতি ভরে উঠল। ঘরবাড়ি সব দিব্য ভাবে ও পরিপূর্ণতায় ভরে উঠল।

বাঁধন শেষ হতেই মর্ম বুঝবার জন্য রামপ্রসাদ কন্যাকে দেখতে দৌড়ে গেলেন বাইরে। দেখলেন মুক্তকেশী এক মেয়ে দৌড়ে যাচ্ছেন পালিয়ে। মুখখানি দেখা গেল না, শুধু তাঁর কৃষ্ণ কেশপাশ আর রাঙা অলক্তাক্ত চরণদুখানি মাত্র দেখতে পেলেন রামপ্রসাদ। রামপ্রসাদের প্রাণ মন অন্তরাত্মা আরও যেন ব্যাকুল হয়ে উঠল।

বাড়ির ভিতরে গিয়ে রামপ্রসাদ কন্যাকে খুঁজতে লাগলেন। দেখলেন, কন্যা বসে ঘরের কাজে রত। কই কন্যা তো বেড়া বাঁধতে যাননি! কন্যার চরণে আলতাও নেই, মাথার কেশও এলো নয়। তখন রামপ্রসাদ বুঝতে পারলেন এই সবই আদ্যাশক্তি জগৎ-জননীর চাতুরী। তখন কেঁদে তিনি বললেন, 'সারা জনম ডেকে ডেকে মরলাম, তখন তো দেখা দিলিনে, আর কোন্ এক অসাবধান মুহূর্তে অলক্ষ্যে এসে আমার সঙ্গে কাজে যোগ দিয়ে দেখা না দিয়েই চলে গেলি! আমি কি কাজ চাই না সিদ্ধি চাই? আমি যে মা তোকেই খুঁজি। হায় মুক্তকেশী, যদি তোকে আসতেই হল তবে আমার বেড়া খোলবার কাজে না এসে বেড়া বাঁধবার কাজেই তুই এলি! তুই দিবি মা মুক্তি, তুই কেন মা সংসার-ঘরের বেড়া বাঁধবি!'

হয়তো তাঁর এই অনুভূতিরই আভাস পাই তাঁর 'মন রে কৃষিকাজ জান না' নামে বিখ্যাত গানে। তাতে তিনি বলেছেন :

মুক্তকেশীর শক্ত বেড়া
তার কাছেতে যম ঘেঁসে না।[১]

দেবতা-মানুষ উভয়ে মিলে যে একসঙ্গে সমানভাবে সাধনা করতে হবে, তা বুঝতে পারি রামপ্রসাদের এই গানে :

একা যদি না পারিস তো
রামপ্রসাদকে ডেকে নে না।

মনের দুঃখে রামপ্রসাদ এই কথা বললেও তিনি জানতেন যে, এই জগন্মাতাই মুক্তিস্বরূপিণী হয়ে সব মুক্ত করে নিয়ে যান আর তিনিই স্নেহময়ী হয়ে সংসারের বেড়া বেঁধে তাঁরই প্রেমের জগতে আমাদের আশ্রয় দেন।

শাক্তসাধনার মধ্যে এইরূপ স্নেহের সম্বন্ধ বাংলার বাইরে কি আর কোথাও আছে? দক্ষিণ ভারতেও শক্তিসাধনা যথেষ্ট আছে। কিন্তু সেখানে দেখতে পাই, শ্রীবিদ্যা আর ক্রাঙ্গানোর (Cranganore) প্রভৃতি তীর্থে মীনভরণীর উৎসব। বাংলার আগমনি, বাংলার বিজয়া, বাংলার এই মধুর প্রেমযোগ আর তো কোথাও দেখি না।

মুর্শিদাবাদ কিরীটেশ্বরী ও পূর্ববঙ্গের ও উত্তরবঙ্গের কয়েকটি স্থানে দেবীর নামে চমৎকার সব গানের পালা আছে। দেবী থাকেন মন্দিরে। পূজকঠাকুর প্রতিদিন পূজা করেন। দেবী যেন সুন্দরী মেয়েটি। নিভৃতে সবার দৃষ্টির আড়ালে দিঘির ঘাটে অলক্তাক্ত চরণদুখানি ডুবিয়ে বসে থাকেন। দেবী এক দিন দেখেন শাঁখারি শাঁখা নিয়ে হেঁকে যাচ্ছে, 'শাঁখা পরবি মা?' দেবীর ইচ্ছা হল শাঁখা পরতে। ডাকলেন. শাঁখারিকে, শাঁখা পরতে চাইলেন।

কী রূপ, কী দুখানি রাঙা চরণ! শাঁখারির দু-চোখ জলে ভরে এল। ওই হাতে শাঁখা পরিয়ে দিয়ে সে কৃতার্থ হল। তবু মনের দুঃখে বললে, 'মা, তোর হাতে পরালাম শাঁখা, ধন্য হলাম। কিন্তু বড়ো গরিব আমি, শাঁখা বেচে খাই, এর মূল্য না পেলে ছেলেপিলে যে না খেয়ে মরবে'। দেবী বললেন, 'ওই মন্দিরের পূজারি আমার বাপ, তাঁকে বোলো তাঁর মেয়ের শাঁখার দাম তিনি যেন দেন। যদি তিনি বলেন 'টাকা কই?' তবে বোলো তাঁর দেবীর ঝাঁপিতে যে দুটি টাকা আছে তাই যেন তিনি তোমায় দেন"। শাঁখারি গিয়ে মেয়ের শাঁখার দাম চাইলে পূজারি বিস্মিত হয়ে বললেন, 'মেয়ে তো আমার নেই, বাবা'। তবু একবার ঝাঁপি খুলে দেখেন, ঠিক দুটি টাকাই আছে। এ টাকা

---

১. যোগেন্দ্রনাথ ঘোষ, *সাধনসংগীত*, ১৩৩৫, পৃ. ১১৬।

তো পূর্বে ছিল না। শাঁখারি বললে, 'বিশ্বেস না হয়, ঠাকুর, ওই খাটে গিয়ে দেখ, তোমার মেয়ে বসেই আছেন'। গিয়ে দেখেন কন্যা নেই। শাঁখারি ডেকে বললে, 'মাগো, তোমার হাতের শাঁখা তোমার বাবাকে দেখাও না মা একবার, তিনি যে পেত্যয় করেন না'। শুনে সরোবর থেকে শাঁখাসুদ্ধ হাতদুখানি দেবী একবার তুলে দেখালেন।

তখন পূজারি মাটিতে লুটিয়ে পড়ে বললেন, 'মাগো, এতকাল পূজা করে তোর দেখা পেলাম না, আর কী পুণ্যফলে এই দীনহীন শাঁখারি তোকে দেখতে পেল, তোর চরণদুখানি দেখতে পেল, তোর হাতে শাঁখা পরাল! তারই কৃপায় কিনা আজ আমি তোর শাঁখাপরা হাতদুখানি মাত্র একটিবার দেখতে পেলাম।'

বাংলা দেশের বৈষ্ণবধর্ম

বাংলার শৈব ও শাক্ত ধর্মের মতো বাংলার বৈষ্ণব ধর্মেরও নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে। বাংলার বৈষ্ণবধর্মের সঙ্গে ভারতের অন্যান্য জায়গার বৈষ্ণবধর্ম মিলবে না। ভারতীয় বৈষ্ণবদের সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রধান হল শ্রীমাধ্ব, বিষ্ণুস্বামী, নিম্বার্ক। এর কোনোটাই বাংলার বৈষ্ণবধর্ম নয়। অথচ বাংলার বৈষ্ণবধর্ম অতি পুরাতন। পাহাড়পুরে যে বৈষ্ণবধর্মের পরিচয় পাই তা অন্তত দেড় হাজার বছরের পুরোনো অর্থাৎ এইসব মতের থেকে প্রাচীনতর; বঙ্গদেশ-প্রচলিত কৃষ্ণলীলাই তাতে চিত্রিত।

Anthology অর্থাৎ নানা কবির কাব্যসংগ্রহ অতি প্রাচীনকাল থেকে চলে আসছে। সংস্কৃত প্রাচীনতম কাব্যসংগ্রহ *কবীন্দ্রবচনসমুচ্চয়* বাংলা দেশে লেখা। তার পর শ্রীধর দাসের *সদুক্তি-কর্ণামৃত*ও বাংলা দেশেরই রচনা। তাতে অনেক বাঙালি বৈষ্ণব কবির রচনা রয়েছে। মাধ্বমত-প্রবর্তক আনন্দতীর্থের তখন সাত-আট বৎসর মাত্র বয়স।[১] মহাপ্রভুর মত শ্রীব্রহ্ম-রুদ্র-সনকাদি কোনো সম্প্রদায়েরই অন্তর্গত করা যায় না।

তবে মহাপ্রভুকে কেউ কেউ যে মাধ্বমতের অনুবর্তী বলে ধরেন, তা কি ঠিক? জয়দেব-চণ্ডীদাসের গীত, তো মাধ্বমতের বিরোধী। মহাপ্রভুর আবার এঁরাই উপজীব্য। রাসপঞ্চাধ্যায় মাধ্বমতে অচল হলেও মহাপ্রভুর তা প্রাণস্বরূপ। মাধ্বমতে সাধনায় ব্রাহ্মণেরই অধিকার। মহাপ্রভুর মতে সাধনায় সবারই অধিকার। শ্রীমন্ নিত্যানন্দকেই তিনি আজ্ঞা দিলেন :

আচণ্ডালাদি করিহ কৃষ্ণভক্তি দান।[২]

মাধ্বমতে ভক্তির সঙ্গে আচরণ যুক্ত থাকা চাই। মহাপ্রভুর মতে শুদ্ধাভক্তিই যথেষ্ট। মহাপ্রভুর অচিন্ত্যভেদাভেদ ও নিত্য-বৃন্দাবনলীলা তাঁর আপন জিনিস। তবে লীলাশুকের *কৃষ্ণকর্ণামৃত* তিনি খুবই আদর করেছেন। বিষ্ণুস্বামী মতের ভালো ভালো জিনিসও তিনি নিয়েছেন, মাধ্ব নিম্বার্ক হতেও নিয়েছেন। রামানুজের বহু সিদ্ধান্ত জীবগোস্বামীও গ্রহণ করেছেন। তবু মহাপ্রভুর মত তাঁরই নিজস্ব। বাংলা দেশের প্রাচীন বৈষ্ণবভাবের উপরই তার প্রতিষ্ঠা। ভক্তিরত্নাকরে মহাপ্রভুকে মাধ্ব বলা হয়েছে। কিন্তু তার রচয়িতা নরহরি অনেক পরের মানুষ। চারি সম্প্রদায়ের পঙ্‌ক্তিতে উঠবার জন্য বলদেব বিদ্যাভূষণও মহাপ্রভুর মতকে মাধ্ব বলেছেন। কিন্তু তা হল অষ্টাদশ শতাব্দীর কথা। আর তাঁর লেখা পীঢ়িতে (গুরুশিষ্যপরম্পরা) ও মাধ্বদেব পীঢ়িতে মিলও নেই, কাজেই তাঁর প্রমাণ অচল। কৃষ্ণদাস

১. জন্ম ১২৯৭, ভাণ্ডারকর।

২. *চৈতন্যচরিতামৃত*, মধ্য, ১৫শ।

৩. *মধ্যলীলা*, ৯ম।

কবিরাজ তাঁর *চৈতন্য-চরিতামৃত*-তে দেখিয়েছেন মহাপ্রভু যখন মাধ্বতীর্থ উড়ুপীতে গেলেন তখন সেখানকার মাধ্বেরা মহাপ্রভুকে নিজেদের বলে গ্রহণ করেননি, তিনিও মাধ্বদের মতকে পরমত বলেই মনে করেছেন এবং মাধ্বদের গর্ব চূর্ণ করে ('তার ঘরে গর্ব চূর্ণ করি'[৩]) তিনি ফল্গুতীর্থে চলে এলেন। মহাপ্রভুর গুরুদের 'পুরী' 'ভারতী' প্রভৃতি উপাধিতে মনে হয় তাঁরা দশনামী সম্প্রদায়েরই ছিলেন। মোটকথা বাংলা দেশে অতি প্রাচীনকাল হতেই কৃষ্ণভক্তি চলে আসছিল। যদিও সেই কৃষ্ণভক্তিকে রামানন্দ-মাধ্ব-বিষ্ণুস্বামী-নিম্বার্ক উত্তর-ভারত-প্রচলিত এই চারি সম্প্রদায়ের কোনোটার মধ্যেই ফেলা যায় না। বাংলা দেশের বৈষ্ণব মত বাংলা দেশেরই প্রাকৃত বস্তু। বহুকাল ধরেই সেই ধারা এইখানে চলে আসছিল। নিত্যানন্দ মহাপ্রভুর মধ্যে বাংলার সেই নিজস্ব ধারার খানিকটা পরিচয় মেলে। মহাপ্রভুর মধ্যে বাংলার সেই ধারাটির স্বরূপ রীতিমতো দেখতে পাই। কাজেই বাংলা দেশের বাউলেরা যে মহাপ্রভুকে নিজেদের পূর্বগুরুর মধ্যে মানেন তা যুক্তিহীন নয়।

বাংলা দেশের রাম বাল্মীকির রাম নন। কৃত্তিবাস প্রভৃতি কবিরা বাংলায় মানবীয় রামচরিত এঁকেছেন। বাংলার নরহরি কৃষ্ণ মহাভারত হরিবংশ বা ভাগবতের দেবতা কৃষ্ণ নন। *পদ্মপুরাণ* ও *ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ*-এ কতকটা প্রাকৃত ভাব আছে। জয়দেব কোথাও কোথাও তাঁদের কাছে ঋণী। তবু জয়দেবে বাংলাদেশের কৃষ্ণচরিতই পাই। জয়দেব সংস্কৃত গানের সম্রাট। গানের খাতিরে তাঁর *গীতগোবিন্দ* সারা ভারতে ছড়িয়েছে। মানবরূপে-ভরপুর কৃষ্ণচরিতই হল আমাদের দেশের আসল কৃষ্ণচরিত। তা মিলবে চণ্ডীদাস প্রভৃতির রচনায়। তাঁদের লেখা বাংলাতে। তবে মহাপ্রভুর সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবাচার্যদের সংস্কৃত লেখার জোরে বাংলার বাইরেও বাংলার বৈষ্ণব মত কিছু কিছু ছড়িয়েছে।

উৎস : *বাংলার সাধনা*, আষাঢ় ১৩৫২।
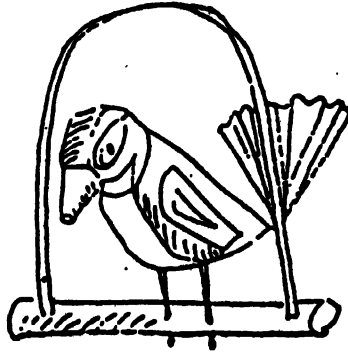
বঙ্গসংস্কৃতি

নীলিমা ইব্রাহিম

বর্তমান বিশ্বে প্রতিটি উন্নত এবং উন্নয়নকামী জাতিই সাংস্কৃতিক সংকট বা বিপর্যয়ের সম্মুখীন। কারণ বহুবিধ; সবচেয়ে বড়ো কারণ যোগাযোগব্যবস্থার দ্রুত উন্নয়ন। সহজ ও সুলভ ভ্রমণ পৃথিবীর প্রায় সকল জাতিকেই খুব কাছে আনতে সক্ষম হয়েছে। ফলে ভাব, ভাষা, সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক জীবনেও আমরা একান্ত ঘনিষ্ঠ বৃত্তে এসে উপস্থিত হয়েছি। ঘরের সম্পদ বাইরে এবং বাইরের ঐশ্বর্য ঘরে আনতে আজ আর বাধা নেই। আজ বিশেষ জাতীয় কৃষ্টি ও সংস্কৃতির আবেষ্টনী অতিক্রম করে আমরা সর্বজনীন কৃষ্টিমুখী হয়েছি। এর ফলাফল দ্বিমুখী। সেদিন একজন বিদেশি বন্ধু বলছিলেন, আজকের সংস্কৃতি তো সর্বত্রই এক। জিজ্ঞেস করলাম 'অর্থাৎ?' উত্তর এল 'অর্থাৎ সর্ববিশ্বেই কোকাকোলা আর পপসংগীত সাংস্কৃতিক জীবনের প্রতিচ্ছবিকে তুলে ধরছে', এ উক্তিতে নিঃসন্দেহে ক্ষোভ ও বেদনা আছে; এ বেদনাবোধ মুখ্যত প্রাচ্যদেশের বা এশীয় ভূখণ্ডের। সকল জাতির বাহ্যিক আচার-আচরণের মূলে আছে ওই জাতির চিত্তসত্তার মূল্যবোধ ও তার প্রকাশভঙ্গি। সম্ভবত এর বহিঃপ্রকাশের স্বরূপই প্রকৃত সংস্কৃতির রূপ। ইউরোপ ও আমেরিকা আমাদের উপনিবেশ হিসেবে মুক্তি হয়তো দিয়েছে কিন্তু তাদের খ্রিস্টধর্মানুসারী জীবনবোধ ও সাম্রাজ্যবাদী চেতনার মিশ্র-সংস্কৃতি আমাদের গ্রাস করতে বসেছে। যান্ত্রিক ও ধনতান্ত্রিক সভ্যতা ও শিল্পায়ত জীবনবোধ আমাদের অস্তিত্বের ওপর এক নতুন সভ্যতা ও সংস্কৃতির রোলার চালিয়ে যাচ্ছে। আমরা ক্রমশ আত্মবিস্মৃত হয়ে পড়ছি।

বর্তমান বিশ্বের তথাকথিত পেছনে-পড়া রাষ্ট্রগুলি আজ তাদের অবস্থা অনুধাবন করে সামনে দুটি চিন্তাকে আশ্রয় করেছে : ১. আত্মরক্ষা, ২. প্রগতি।

নিজের মৃত অতীতকে আঁকড়ে ধরে আজ আর বাঁচবার পথ নেই। বহির্বিশ্বের প্রবহমান জীবনতরঙ্গের সঙ্গে যোগসূত্র রক্ষা না করলে আমরা জড় ও পতিত বলে চিহ্নিত হব। অন্যপক্ষে নিজের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে যদি বাঁচাতে না পারি তাহলে

আত্মবিলুপ্তি ঘটবে। সুতরাং এ উভয়ধারার সমন্বয়সাধনই বর্তমান সাংস্কৃতিক চিন্তা ও ভাবনার বিষয়বস্তু।

এশিয়া ভূখণ্ডে জাপান আমাদের এ সম্পর্কে কিছুটা পথ দেখাতে পারে। কারণ আধুনিক শিল্প ও যন্ত্রসভ্যতার অগ্রগতিতে জাপান ইউরোপীয় উন্নত দেশের সঙ্গে সমতালে চলবার দাবিদার। সেই সঙ্গে জাপান তার নিজস্ব ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি সম্পর্কে অতি সচেতন। জাপানিদের কাব্য, সাহিত্য, চিত্রকলা, সংগীত থেকে শুরু করে পোশাক-পরিচ্ছদ, দেহসজ্জা, গৃহসজ্জা, উৎসব সবকিছুতেই তারা সচেতনভাবে নিজস্ব সাংস্কৃতিক জীবনকে ধরে রাখতে কিছু পরিমাণে সার্থকতা অর্জন করেছে। অথচ জাপানের সাংস্কৃতিক জীবনে আধুনিক পাশ্চাত্য প্রভাব ছাড়াও কোরিয়া, চিন প্রভৃতি দেশের প্রভাবও কম নেই। এর মূল কারণ জাপানিদের সমন্বয়ধর্মী চারিত্রিক দৃঢ়তা।

বঙ্গসংস্কৃতি সম্পর্কে অবহিত হতে হলে আমাদেরও জীবনের এই সংকট ও সংঘাত সম্পর্কে সচেতন হতে হবে। এ কারণে সর্বাধিক প্রয়োজন আত্মপরিচয় জানা। পিতৃপুরুষের ঠিকানা না জানলে নিজের পরিচয় প্রদান সম্ভব নয়। বিশেষত বাংলা দেশ এক অর্থে জন্মলগ্ন থেকেই পরাধীন। তাই যেসব জাতি এখানে এসেছে তারাই কিছু কিছু সাংস্কৃতিক ছাপ আমাদের ওপর রেখে গেছে।

আজ আত্মপরিচয়ে প্রতিষ্ঠিত হতে হলে সাংস্কৃতিক ভারসাম্যকে ফিরিয়ে আনতে হবে এবং বাংলার জীবনে যেসব বহিরাগত জাতির ছাপ পড়েছে তাকে দূরে সরাবার চেষ্টা না করে একটি সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে আপনাকে স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। নতুনকে গ্রহণের জন্যও যেমন এর প্রয়োজন রয়েছে তেমনই গড্ডলিকাস্রোত থেকে আত্মরক্ষার জন্যও আমাদের এ গুরুদায়িত্বকে স্বীকার করতে হবে।

মূল্য বিচারে সংস্কৃতির কোনো একটি নির্দিষ্ট সংজ্ঞা আছে বলে আমার জানা নেই। কোনো একটি জাতি বা মানবগোষ্ঠীর দৈনন্দিন নিত্যপ্রয়োজনীয় কাজকর্ম থেকে শুরু করে তার চিন্তাধারার বহিঃপ্রকাশের সম্মিলিত রূপায়ণই ওই জাতি বা গোষ্ঠীর সংস্কৃতি নামে অভিহিত হয়ে থাকে। সুতরাং কোনো জাতির সভ্যতা, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি নির্ণয়ের ক্ষেত্রে ভৌগোলিক সীমারেখা ও কালের অবস্থানের উল্লেখযোগ্য অবদান রয়েছে। সংস্কৃতির বিচার-বিশ্লেষণে আমরা দুটি রূপ বা ভিন্ন চেতনা লক্ষ করি। একটি বহিরঙ্গ রূপ, অপরটি অন্তরজাত। প্রথমটি আত্মপ্রকাশ করে জাতির দৈনন্দিন জীবনধারাকে অবলম্বন করে। এ ক্ষেত্রে তার নিত্যব্যবহার্য তৈজসপত্র, আসবাব, অশন, বসন, শয়ন, ভোজন ইত্যাদি থেকে শুরু করে তার সামাজিক উৎসব-অনুষ্ঠান, জন্মলগ্নে অনুষ্ঠিত লোকাচার, অন্নপ্রাশন, আকিকা, বিয়ে, অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া এমনকি তার পারলৌকিক অনুষ্ঠান পর্যন্ত সংস্কৃতির বহিরঙ্গের পর্যায়ে পড়ে। এখানে অবশ্য অনিবার্যভাবে ধর্মের প্রশ্ন আসে, কিন্তু আশ্চর্যভাবে লক্ষ করা যায় ধর্ম ভিন্ন হলেও আচরণীয় অনুষ্ঠানে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এক আশ্চর্য মিল বর্তমান। ধর্মে বিভিন্নতা সত্ত্বেও এই সাদৃশ্যই ওই জাতির লৌকিক সংস্কৃতির রূপ। যেমন বাংলাদেশে হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ অথবা যে ধর্মাবলম্বীই তাঁরা হোন না কেন তাঁদের বিয়ের আচার-অনুষ্ঠানে যে মিল আছে, আরবের মুসলমান, উত্তর ভারতের হিন্দু অথবা তিব্বতের বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের বিবাহ-অনুষ্ঠানে সে আচরণে মিলের অভাব রয়েছে। সুতরাং ধর্মবিশ্বাসে ব্যবধান

থাকলেও সামাজিক অনুষ্ঠানে লোকসংস্কৃতি প্রাধান্য অর্জন করে। এইজন্য জাতীয় সংস্কৃতি বা ঐতিহ্য খুঁজতে গিয়ে আমরা যখন পূর্বসূরিদের ফেলে যাওয়া হাঁড়ি, পাতিল, মাটির কলশি, হাড় বা পুঁতির মালা, পাথরের হাতিয়ার সযত্নে রক্ষা করি তখন ওইসব ক্ষুদ্র নিত্যব্যবহার্য দ্রব্য ধর্মমত নির্বিশেষে আমাদের সামনে পিতৃপিতামহের পরিচয় তুলে ধরে। এজন্যে প্রাচীন মন্দির, মসজিদ, বৌদ্ধবিহারের অঙ্গসজ্জায় আমরা আকর্ষণ বোধ করি, গুহাগাত্রে চিত্রিত নরনারীর দেহসজ্জা ও অলংকারের প্রতি আকৃষ্ট হই। কারণ এদের মাধ্যমে আমরা অতীত-জীবনবোধরূপ সংস্কৃতিকে অন্বেষণ করি। বাহ্যিক জীবনচেতনায় সংস্কৃতি জাতীয় জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত।

সংস্কৃতির দ্বিতীয় ধারায় আমরা লক্ষ করি ওই সমাজের ব্যক্তিচেতনার সমষ্টিগত রূপ বা তার চিত্তসত্তার বহিঃপ্রকাশকে। একই কালের পরিধিতে ওই বিশেষ মানবগোষ্ঠীর চিন্তাজগতে জীবনের কী রহস্য কীভাবে উদ্‌ঘাটিত ও উদ্ভাসিত হয়েছে, এই চিন্তাধারা তার আত্মিক সংস্কৃতিবোধের স্বরূপ প্রকাশ করে। এ জগৎই তার কাব্য, সাহিত্য, সংগীত, চিত্রকলা ও আনুষঙ্গিক জীবনবোধে সমৃদ্ধ। সুতরাং এ কথা বলা যায় যে, সাংস্কৃতিক চেতনা ও জীবনবোধ মানবসমাজের বাস্তব ও অন্তর্জীবনের সমষ্টিগত রূপ।

প্রাচীন বাংলায় সাংস্কৃতিক জীবনের পরিচয় দিতে হলে বাংলা দেশ ও বাঙালি সমাজ সম্পর্কে আমাদের একটা স্পষ্ট ধারণা থাকা প্রয়োজন। দুঃখের বিষয় আমাদের ইতিহাস আমরা সংগ্রহ করেছি বিদেশিদের বিবরণ ও পরিবেশিত তথ্য থেকে। এ দেশের জলবায়ুতে প্রাচীন ইতিহাসকে ধরে রাখা হয়তো সম্ভবপর হয়নি। পুথিপত্র টেকেনি, টিকলেও সামনে-পিছনের পরিচয়পত্র, সনতারিখ রসিক উইপোকার জঠরে। এমনকি স্থাপত্য নিদর্শন পর্যন্ত আমরা সর্বত্র রক্ষা করতে পারিনি। খরস্রোতা নদনদী প্রবাহিত বাংলায় কীর্তিনাশার অভাব নেই। তবুও ধারণা হয় বাংলা দেশে কবি অনেক জন্মেছেন কিন্তু ঐতিহাসিক সংকোচ বোধ করেছেন ইতিহাস রচনায়। অবশ্য এ তথ্য সমগ্র প্রাচীন ভারত সম্পর্কেও প্রযোজ্য। যে যুগে ভাস, ভবভূতি, কালিদাস জন্মেছেন সে যুগে একজন নৈর্ব্যক্তিক ঐতিহাসিক জন্মাতে কম ছিল কোথায়? সম্ভবত সত্যনিষ্ঠ ইতিহাস রচনায় আজও বাঙালির মনে যে দ্বিধা ও সংকোচ দেখতে পাই তা উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া। পরবর্তীকালে এমনকি ষড় ঐশ্বর্যশালী মোগল-যুগেও ইতিহাসের পরিচয়ে প্রভুবন্দনা যতখানি পেয়েছি নিরপেক্ষ ইতিহাস ততটা পাইনি। তাই নিজেদের পরিচয় খুঁজে ফিরেছি কৌটিল্যের *অর্থশাস্ত্র*-এ, বাৎস্যায়নের *কামসূত্র*, বরাহমিহিরের *বৃহৎ সংহিতা*, মুরারির *অনর্ঘ্য রাঘব* গ্রন্থ, কালিদাস, হিউয়েন চুয়াং, মেগাস্থিনিস, ফা হিয়েন, বার্নিয়ের বর্ণনায়। গৌড়, হরিকেল, সমতট, চন্দ্রদ্বীপ, বাঙ্গালা, বঙ্গ, পুণ্ড্র, রাঢ়, দক্ষিণ-রাঢ়, উত্তর-রাঢ় মণ্ডল, তাম্রলিপ্তি ইত্যাদি নামের ভৌগোলিক বিবরণ খুঁজে ফিরেছি নিজেদের পরিচয় প্রতিষ্ঠার জন্য।

ইতস্তত বিক্ষিপ্ত ভৌগোলিক ও ঐতিহাসিক উপাদানকে জোড়া লাগিয়ে মোটামুটিভাবে এ সত্য উদ্ধার করা গেছে যে, বাঙালি একটি সংকর জাতি। বহুদিন আর্যসভ্যতার বাইরে থেকে তারা নিজেদের এক বিশেষ পরিচয়ে গড়ে তুলতে সচেষ্ট ছিল।

আনুমানিক নবম শতাব্দীতে লেখা *কর্পূরমঞ্জরী*-তে পাই হরিকেলের মতো স্বর্ণের অলংকার তাদের পরিধানে, তারা রাধার মতো আকর্ষণীয় এবং রূপ ঐশ্বর্যে কামরূপকে

জয় করেছে। এঁরা হরিকেলবাসীদের কেলিতে অর্থাৎ আনন্দ উপভোগে সহায়তা করতেন। হরিকেল যদি বাংলা দেশের অংশ হয় তাহলে আর্যসভ্যতার বাইরে থেকেও এ দেশবাসী উন্নত রুচির অধিকারী ছিল এ অনুমান করা অসংগত নয়।

এছাড়া বঙ্গের একটি বৈশিষ্ট্যের কথা ইতিহাস বারবার স্বীকার করেছে, তা হচ্ছে বাঙালির জ্ঞানস্পৃহা। সুদূর অতীতে নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের বঙ্গ-গৌরব শীলভদ্রের খ্যাতি ভারতের বাইরেও ছড়িয়ে পড়েছিল। তিব্বতীয় রাজ্যের আমন্ত্রণে অতীশ দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান জ্ঞান বিতরণের আহ্বানে সুদূর তিব্বত ও চিন গমন করেছিলেন। গদাধর, মদন, রামচন্দ্র কবি ভারতী, বাসব বিশ্বেশ্বর, শম্ভু ইত্যাদি বঙ্গসন্তানেরা দেশবিদেশে জ্ঞান আহরণ ও বিতরণের সাক্ষ্য রেখে গেছেন। কল্হন বলেছেন বিদ্যাচর্চার জন্য বাঙালি কাশ্মীর পর্যন্ত যেত। ক্ষেমেন্দ্র তাঁর দেশোপদেশ নামক ব্যঙ্গ কবিতায় লিখেছেন, বাঙালিরা যখন কাশ্মীর পৌঁছোত তখন স্বভাবতই তারা থাকত শীর্ণজীবী এবং দুর্বল স্বাস্থ্যসম্পন্ন কিন্তু কিছুদিন পরেই তারা স্বাস্থ্য সঞ্চয় করত। ফলে তারা এমন তেজস্বী হত যে প্রয়োজনবোধে বিপণি চালককে অর্থ না দিয়ে ছুরিকা প্রদর্শন করতেও ইতস্তত করত না। উপরন্তু তারা ছিল অতিমাত্রায় কলহপরায়ণ। তৎসত্ত্বেও তাদের সত্যবোধ ও চারিত্রিক নিষ্ঠা ছিল।

'কলহপরায়ণতা'র উল্লেখ তাৎপর্যপূর্ণ। আর্যসভ্যতার কেন্দ্র থেকে বহু দূরে উত্তাল নদনদী, ব্যাঘ্র সর্পসংকুল জনপদে সংগ্রম করে বাঙালিকে স্ব অস্তিত্ব রক্ষা করতে হয়েছে। এ কারণে তাদের পৃথক ব্যক্তিসত্তা গড়ে উঠেছিল। উপরন্তু বৈদিক ব্রাহ্মণেরা তাদের 'পক্ষীজাতি' রূপে চিহ্নিত করেছিলেন। সুতরাং নগ্ন মস্তক বাঙালি নতি স্বীকারে অপারগ বলেই প্রতিবাদমুখর কলহপরায়ণ বলে চিহ্নিত হয়েছিল।

ইতিহাস বলে রাজা শশাঙ্ক অথবা বাংলার পাল ও সেন রাজারা 'গৌড়' নাম নিয়ে বাংলার সমগ্র জনপদকে একত্রিত করবার যে চেষ্টা করেছিলেন তা সাফল্যমণ্ডিত হয়নি। যে অংশ বঙ্গ নামে গৌরব অর্জন করল আর্যসভ্যতা ও সংস্কৃতির দিক থেকে সে অংশ ছিল ঘৃণিত ও অবজ্ঞাত। বাংলা দেশের পরিচয় ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতায় প্রথম আমরা পাই অষ্টম শতকের মাঝামাঝি পাল-বংশ প্রতিষ্ঠায়। পাল-বংশ প্রায় চারশো বছর ধরে রাজত্ব করে; রাজ্যসীমাও বহুদূর বিস্তৃত হয়।

এ সময়ের ইতিহাস মুখ্যত রাজা ও তার রাজ্যজয়ের ইতিহাস। দেশ ছিল মোটামুটি কৃষিনির্ভর। সমাজে বিত্তশালী শ্রেণি সমাদৃত ছিলেন কিন্তু ভূমিহীন কৃষক ও শ্রমিকের যে অর্থকষ্ট ছিল তার সাক্ষ্য নানা জায়গায় পাওয়া যায়। '*সদুক্তিকর্ণামৃত*-এর' শ্লোকে পাই :

ক. শিশুরা ক্ষুধায় পীড়িত, দেহ শবের মতো শীর্ণ, বান্ধবেরা প্রীতিহীন, পুরাতন জীর্ণ জলপাত্রে স্বল্পমাত্র জল ধরে— এ সকলও আমায় তেমন কষ্ট দেয় নাই, যেমন দিয়েছিল যখন দেখেছিলাম আমার গৃহিণী করুণ হাসি হেসে ছিন্নবস্ত্র সেলাই করবার জন্য কুপিত প্রতিবেশিনীর কাছ থেকে সূচ ভিক্ষা করছেন।

খ. কাঠের খুঁটি নড়ছে, মাটির দেওয়াল গলে পড়ছে, চালের খড় উড়ে যাচ্ছে। কেঁচোর সন্ধানে নিয়ত ব্যাঙের দ্বারা আমার জীর্ণ গৃহ আকীর্ণ।

এবং বৌদ্ধগান ও দোঁহায় পাই : 'হাঁড়ীতে ভাত নাই নিতি আবেশী'।

প্রকৃতপক্ষে পাল-রাজাদের সাম্রাজ্য বিস্তারের ফলে এবং তাঁদের পোষকতা ও আনুকূল্যে নালন্দা, বিক্রমশালী, ওদন্তপুরী এবং সারনাথের বৌদ্ধসংঘ ও মহাবিহারগুলিকে আশ্রয়

করে বঙ্গ আন্তর্জাতিক বৌদ্ধজগতে একটি গৌরবময় আসন লাভ করে। সুতরাং এ যুগেই বাংলায় সামগ্রিক ঐক্যবোধ গড়ে ওঠে এবং স্বদেশ ও স্বাজাত্যবোধের মূলে বাঙালির এক জাতীয়ত্বের ভিত্তি লক্ষ করা যায়।

বাংলার ময়নামতী, পাহাড়পুর, মহাস্থানগড় ইত্যাদি স্থানে যে প্রাচীন শিল্প, সভ্যতা ও সংস্কৃতির ইতিহাস খুঁজে পাওয়া গেছে তার ভিতর ময়নামতীকেই আমরা আধুনিক বাংলা দেশের প্রাচীনতম ঐতিহ্যের আদি উৎস বলতে পারি। কারণ সমতটের কৃষ্টি-চিহ্ন কিছু পরিমাণে এখানে বিদ্যমান। পদ্মা-মেঘনা বিধৌত বাংলার রূপ এখানে স্পষ্টতর। বৌদ্ধধর্ম জনগণের কাছে সাম্যবাদী প্রকৃতিরূপে গৃহীত হলেও বাংলার তান্ত্রিকতা তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। লক্ষ্মণ সেনের আমলে সাহিত্যচর্চা পাই কিন্তু তা বাংলায় নয়। আনুষঙ্গিক সহিষ্ণুতার পরিচয়ও পাওয়া যায়। 'সেক শুভোদয়া'—এ জীবনের বহু পরিচয় বহন করে। সেন রাজারা বৌদ্ধ প্রভাবকে দমন করে ব্রাহ্মণ্যধর্ম ও সংস্কৃতির পুনঃপ্রচারে যত্নবান হন। এসময়ে মঙ্গলঅনুষ্ঠানে আলপনা দেওয়া হত। কাঁচা ও পোড়া মাটি দিয়ে পুতুল তৈরি হত, পটচিত্রণ ও বেড়ার গায়ে মাটি লেপে অঙ্কনরীতিও প্রচলিত ছিল। কাঁথা সেলাই-এর নৈপুণ্যের কথা জানা যায়। সরা, হাঁড়ি প্রভৃতি চিত্রিত করা হত। শাল দোশালা প্রস্তুতির রীতিও প্রচলিত ছিল। সুতরাং বাঙালির শিল্পরুচি ও সৌন্দর্যপ্রীতির স্পষ্ট একটি রূপরেখা এখানে বিদ্যমান।

ময়নামতীর শিল্পকলার মৌলিক বৈশিষ্ট্য সম্পূর্ণ লৌকিক চিন্তাধারায়। প্রাত্যহিক জীবনের ঘটনা, মানুষ ও প্রকৃতির বিস্তৃত লীলাক্ষেত্রের ক্ষুদ্রতম বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে এই দরিদ্র গ্রাম্য মৃৎশিল্পীদের গভীর চেতনা এবং জীবন সম্পর্কে তাদের অভিনিবেশ এই ফলকগুলিতে স্পষ্ট; অভিজাত, সুসংস্কৃত স্তরের সঙ্গে একাসনে এদের স্থান নেই।

দশম থেকে দ্বাদশ শতকে বঙ্গের স্বাতন্ত্র্য নানাভাবে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এ সময়ে চর্যাপদে সাহিত্যিক ভাষারূপে বাংলার প্রথম প্রকাশ। দেবভাষা পরিত্যাগ করে সাধারণ কথ্যভাষা অবলম্বনে সাহিত্যরচনায় বিদ্রোহী বাঙালি মানসিকতা স্পষ্ট; এখানে নায়ক উলঙ্গ যোগী, নায়িকা অস্পৃশ্য ডোম্বিনী। সুতরাং সমকালীন ভারতের অন্যান্য অংশের সাহিত্যের তুলনায় বাংলা সাহিত্য তার উষালগ্ন থেকেই বিশেষ মানস-ভাবনায় সমৃদ্ধ। একে গণসাহিত্য নামে অভিহিত করা যায়। দরিদ্র জনসাধারণ এর কেন্দ্রবিন্দু। ডোম্বিনী চাঙড়ি বোনে, নৌকা বায় আবার নৃত্যগীতও করে।

এক সো পদুমা চউসট্‌ঠি পাখুড়ি।
তঁহি চড়ি নাচই ডোম্বী বাপুড়ী।।

এ ছাড়া 'নাটগীত'ও প্রচলিত ছিল। কারণ 'পড়পেড়া' বা নটপেটিকার উল্লেখ পাওয়া যায়। বিয়েতে বাজনা বাজত, শোভাযাত্রা হত, বর যৌতুক পেতেন, বাসর জাগার রীতি প্রচলিত ছিল। সমাজে ব্রাহ্মণ্য প্রভুত্ব ছিল। অস্পৃশ্যেরা নগরের বাইরে বাস করত কিন্তু অভিজাত সমাজেও চরিত্রহীনতার পরিচয় পাওয়া যায়।

কামসূত্র এবং পবনদূতেও অনুরূপ সমাজচিত্র বিদ্যমান। ধোয়ী বলেছেন, এ ধরনের নীতিবহির্ভূত আচরণ সমাজ মেনে নিত, ব্রাহ্মণ শূদ্র-রমণী সঙ্গ করলে প্রায়শ্চিত্ত রূপে মনস্তাপই যথেষ্ট ছিল। সেন রাজাদের সম্পর্কেও অনুরূপ কাহিনি বিদ্যমান। বৃহস্পতি

ভারতের অন্যান্য অংশের অধিবাসীদের সঙ্গে তুলনা করে বলেছেন যে, পূর্বদেশের দ্বিজরা মাছ খেত আর তাদের মেয়েরা ছিল চরিত্রহীনতার জন্য বিখ্যাত। জীমূতবাহন বলেছেন, দাসী-প্রথাই এ নীতিহীনতার কারণ। দেবদাসী-প্রথা প্রচলিত ছিল; পুণ্ড্রবর্ধনের একটি মন্দিরে দেবদাসী কমলার কাহিনি অভিজাত বাঙালি-চরিত্রের আভাস আমাদের দেয়।

সম্ভবত তান্ত্রিকতার প্রভাববশতই সমাজে এ ব্যভিচার চলেছিল। সেন আমলে ও পরবর্তীকালের ব্রাহ্মণ্য ও বৌদ্ধ সাহিত্যে এর প্রতিফলন ঘটেছে।

এ সময় থেকে দুর্গাপূজা প্রচলিত হয়। আজও এ পূজা একমাত্র বাঙালি হিন্দুরাই করে থাকেন। মদ মাংস খাওয়ার রীতি প্রচলিত ছিল। একালে জীমূতবাহনকৃত উত্তরাধিকার আইনও গৃহীত হয়। অষ্টম শতাব্দীর ধর্মপ্রাণ বাঙালির পরিচয় পাই জাভায় বৌদ্ধধর্ম প্রচারে এবং মন্দির প্রতিষ্ঠায়। এ কারণে প্রাচীন বাংলার ভাস্কর্য ও বর্ণমালার সঙ্গে জাভানিজ ভাস্কর্য ও বর্ণমালার মিল বর্তমান।

বাৎস্যায়ন গৌড়ীয় রমণীদের কোমল, ভীরু, মঞ্জুভাষী এবং সুন্দরী বলে অভিহিত করেছেন। তিনি বলেছেন, রাজগৃহের রমণীরা সচরাচর বাইরে বেরোতেন না। তাঁরা পরপুরুষের সঙ্গে পর্দার আড়াল থেকেই কথা বলতেন। সুতরাং মুসলিম আমলে পর্দা-প্রথা এসেছে এ ধারণা সত্য নয়। সমাজে মেয়েদের বিশেষ সম্মান ছিল বলে মনে হয় না। তবে জীমূতবাহন স্বামীর সম্পত্তিতে নিঃসন্তান বিধবার পূর্ণ অধিকার দিয়েছেন। এমনকি স্বামীর নিকটস্থ পুরুষ আত্মীয় না থাকলে শেষকৃত্য বা সপিণ্ডকরণের অধিকার স্ত্রীর ছিল। সতীদাহকে সম্মানের সঙ্গে গ্রহণ করা হত, সুতরাং এ প্রথার প্রাচীনত্ব স্বীকৃত হয়।

মাছ, মাংস, দুধ, সবজি খাদ্যরূপে গৃহীত হত। ব্রাহ্মণেরা সাদা আঁশযুক্ত মাছ খেতেন। ইলিশ মাছের তেল সবজি পাকে ব্যবহার করা হত। শুঁটকি খাওয়ার প্রথাও প্রচলিত ছিল তবে তা অব্রাহ্মণ সমাজে। আহারে-বিহারে তখনও বর্ণাশ্রম ধর্ম পালিত হত। শামুক, কাঁকড়া, বন্য অথবা গৃহপালিত মুরগি ভোজ্যরূপে নিষিদ্ধ ছিল। সবজির ভিতর ব্যাঙের ছাতা, রসুন ও পেঁয়াজ গ্রহণ করা হত না। কর্পূর দিয়ে পান খাওয়ার রীতি প্রচলিত ছিল। মদ্যপান রীতি প্রচলিত ছিল তবে প্রকাশ্যে নয়। পুরুষ ও রমণী উভয়েই দু-খণ্ড বস্ত্র পরতেন। পুরুষেরা ধুতি ও চাদর। মেয়েরা শাড়ি কোমর পর্যন্ত ও উপরে ওড়নার মতো বস্ত্রখণ্ড থাকত। মাথায় কাপড় দেওয়ার রীতি প্রচলিত ছিল না।

পাহাড়পুরের নারীর কেশ সুবিন্যস্ত, মস্তক আবরণহীন। নারী-পুরুষ প্রায় একই ধরনের অলংকার পরিধান করত। কর্ণে কুণ্ডল, কণ্ঠে মুক্তোমালা, হাতে কঙ্কণ, মহিলাদের জন্য বিশেষ করে শঙ্খবলয় এবং পায়ে নূপুর পরবার রীতি প্রচলিত ছিল। মেয়েরা ললাটে সিঁদুর ও পায়ে আলতা পরত, ওষ্ঠরঞ্জনীর প্রচলনও ছিল।

বৈদিকযুগ থেকেই দাবা খেলার রীতি প্রচলিত ছিল। বাদ্যযন্ত্রের ভিতর বাঁশি, ঢোল, ঢাক ও একতারার উল্লেখ পাওয়া যায়। মেয়েরা উদ্যান ও জলক্রীড়া করতেন। গোরুর গাড়ি, ঘোড়া, ঘোড়ার গাড়ি, হাতি এবং নৌকাই ছিল যানবাহন। তবে পাহাড়পুরে উষ্ট্র আরোহিণী দেবীমূর্তি দেখা যায়।

বাংলা দেশের অধিকাংশ জনপদই ছিল গ্রামবাংলা। বিশেষ বিশেষ শহর যেমন রামবতী বা বিজয়পুরে প্রচুর ঐশ্বর্য ছিল। নৈতিক দুর্বলতার কথা যত্রতত্র বিদ্যমান।

মুখ্যত উপযুক্ত সাংস্কৃতিক জীবনাচরণ ব্রাহ্মণ্য ও বৌদ্ধ-ধর্ম প্রভাবিত ছিল। ধর্মীয় জীবন ও সমাজজীবনে ব্যবধান ছিল কম। কারণ সকলরকম লৌকিক ক্রিয়াকলাপই ধর্মীয় অনুশাসনে আবদ্ধ ছিল।

দ্বিতীয় পর্যায়ে মুসলিম বিজয়ের পর ইসলাম ধর্ম, তার গণমুখী জীবনাচরণ ও পারসিক চারু ও কারুকলা এবং সংগীত বাংলা দেশের গণজীবনকে একান্তভাবে প্রভাবিত করে। ইংরেজ আসবার পূর্ব পর্যন্ত আমাদের খাদ্যাভ্যাস থেকে শুরু করে পোশাক-পরিচ্ছদ, আচার-ব্যবহার সবই অল্পবিস্তর ইসলামি ঐতিহ্যে পরিবর্তিত হয়। বণিকের মানদণ্ড রাজদণ্ডে পরিণতি লাভ করবার পর যে জীবনে প্রবেশ করলাম তাই বর্তমান 'কোকাকোলা' ও 'পপ' সংস্কৃতির আদি অবস্থা। প্রসঙ্গান্তরে উভয় স্তরবিন্যাসের সাংস্কৃতিক জীবনাচরণ সম্পর্কে আলোচনার বাসনা রইল।

(সংক্ষেপিত)

উৎস : *'প্রবন্ধ সংগ্রহ'*।

বাংলায় সুফি প্রভাব

আহমদ শরীফ

মুসলিম বিজয়ের পূর্বে বাংলা দেশে সুফি দরবেশ এসেছিলেন কি না ইতিহাস তা বলতে পারে না। তবু পাহাড়পুরে ও ময়নামতীতে আব্বাসীয় খলিফাদের মুদ্রাপ্রাপ্তি ও সোলেমান, খুরদাদবেহ্, আলইদ্রিসী, আলমাসুদী প্রমুখ লেখকদের এবং *হুদুদুল আলম* গ্রন্থের বিবরণের প্রমাণে স্বীকার করতে হয় যে, অন্তত আট শতক থেকে আরবদের সঙ্গে বাংলার বাণিজ্যিক সম্পর্ক শুরু হয়। অবশ্য 'Periplus in the Erythrean Sea'-এর আলোকে যাচাই করলে এ সম্পর্ক খ্রিস্টীয় প্রথম শতক অবধি পিছিয়ে দেওয়া সম্ভব। চট্টগ্রাম বন্দরে আরব বেনেরা বছরে কয়েক মাস থেকে যেত। সে সূত্রে বন্দর এলাকায় তারা বৈবাহিকসম্বন্ধ পাতিয়েছিল কি না জানা নেই। তবে পরবর্তী কালের পোর্তুগিজ প্রভৃতি ইউরোপীয় বেনেদের জীবনযাপন-রীতির কথা স্মরণে রাখলে এ সম্পর্কিত অনুমান করা চলে। ইংরেজ আমলে দেখেছি, বাঙালি মুসলমানেরা বর্মায় বর্মি স্ত্রী গ্রহণ করত আর তাদের সন্তানেরা 'জেরবাদী' নামে পরিচিত হত। এমনই সংকর মুসলমান হয়তো কিছু ছিল চট্টগ্রামের বন্দর এলাকায়। মুসলমান ব্যবসায়ীদের পাহাড়পুরে ময়নামতীতে কিংবা কামরূপে যাতায়াত ছিল কি না বলা যাবে না। কেননা তাদের মুদ্রা ওসব অঞ্চলে অন্যভাবেও নীত হওয়া সম্ভব। কিন্তু ইসলামের প্রচার ও প্রসার যুগে মুসলিম বেনে বা তাদের সঙ্গীদের কেউ ইসলাম প্রচারে আগ্রহী হয়নি, এমন কথা ভাবব কেন! আমাদের মনে হয় তখনও মুসলিম সমাজে সুফি মতবাদ প্রসার লাভ করেনি বলে এবং দণ্ডশক্তিও বিধর্মীর হাতে ছিল বলে এদেশে যারা ইসলাম প্রচার করতে এসেছিলেন বা অন্যসূত্রে এসে ইসলাম প্রচারের চেষ্টায় ছিলেন, তাঁরা বিশেষ শ্রদ্ধা কিংবা সাফল্য অর্জন করতে পারেননি। দরবেশ হলে তথা কেরামতির আভাস না পেলে, অজ্ঞ লোকেরা ভক্তি করবার কারণ খুঁজে পায় না। কাজেই তেমন লোকের স্মৃতি রক্ষার গরজও বোধ করে না। আর যদি মুসলিম বিজয়ের পূর্বে জালালউদ্দীন তাবরেজীর মতো সুফিরা এসেও থাকেন, তা হলেও মুসলিম বিরল কিংবা বিহীন বিধর্মীর রাজ্যে তাঁদের স্মৃতি রক্ষার আয়োজন করবার লোকই ছিল না। সুফিমত প্রসারের সঙ্গে দলে দলে সুফিরা বিজিত ভারতেও আসতে শুরু করেন। তখন থেকেই খানকা ও দরগাহ্-কেন্দ্রী ইতিহাসেরও আরম্ভ।

কিন্তু চোদ্দো শতকের এক সুফির সাক্ষ্যে প্রমাণ, বাংলা দেশে তার আগেই বহু সুফির আগমন ঘটেছে। তাঁরা বিভিন্ন মত সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। শেখ আলাউল হক্ পাণ্ডবির শাগরেদ সৈয়দ আসরফ জাহাঙ্গির সিমনানি কর্তৃক জৌনপুর সুলতান ইব্রাহিম শরকির নিকট লিখিত পত্রে আছে :

> God be praised! What a good land is that Bengal where numerous saints and ascetics came from many directions and made it their habitation and home. For example at Devgaon followers of Hazrat Shaikh Shahabuddin Suhrwardi are taking their eternal rest. Several saints of the Suhrwardi order are lying buried in Mahisun and this is the case with saints of Jalalia order in Deotala. In Narkoti some of the best companions of the Shaikh Ahmad Damishqi are found. Hazrat Shaikh Sharfuddin Tawwama, one of the twelve of the Qadar Khani order whose chief pupil was Hazrat Shaikh Sharifuddin Maneri, is lying buried at Sonargoan. And then there were Hazrat Bad Alam and Badr Alam Zahidi. In short, in the country of Bengal, what to speak of the cities, there is no town and no village where holy saints did not come and settle down. Many of the saints of the Suhrwardi order are dead and gone under earth but those still alive are also in fairly large number.

এতে বোঝা যায় চোদ্দো শতকের মধ্যেই বাংলা দেশে সুফিপ্রভাব গভীরতা ও বিস্তৃতি লাভ করে।

কিন্তু যে কয়জন প্রাচীন সুফির কাহিনি এবং খানকা ও দরগাহ্র খবর আমরা জানি, তাদের আগমন ও অবস্থিতি কাল সম্বন্ধে বিদ্বানেরা একমত নন। যেমন বাবা আদমশহিদ। বিক্রমপুরস্থ রামপালের এই আদমশহিদ বিক্রমপুরের এক সেনরাজা বল্লালের সমসাময়িক। আনন্দ তার রচিত *বল্লালচরিতম* সম্ভবত এঁরই জীবনচরিত— লক্ষ্মণ সেনের পিতা প্রখ্যাত বল্লাল সেনের নয়। বল্লাল চরিতোক্ত 'বায়াদুমবা' (Bayadumba) সম্ভবত বাবা আদমেরই নামবিকৃতি। নগেন্দ্রনাথ বসুর মতে বল্লাল সেন চোদ্দো শতকের শেষার্ধের লোক। কাজেই বাবা আদমও ওই সময়ের।

চট্টগ্রামের পির বদরুদ্দিন বদর-ই-আলম বর্ধমানের কালনার বদর সাহিব, দিনাজপুরের হেমতাবাদের বদরুদ্দিন এবং 'বদর মোকাম' খ্যাত বদর শাহ্ বা বদর আউলিয়া আর মাঝিমাল্লার পাঁচ পিরের অন্যতম পির বদর সম্ভবত অভিন্ন ব্যক্তি। চট্টগ্রামে এঁর অবস্থিতিকাল কারও মতে ১৩৪০ আর কারও ধারণায় ১৪৪০ খ্রিস্টাব্দ।

শেখ জালালউদ্দিন তাবরেজির নাম *শেকশুভোদয়া*-র সঙ্গে জড়িত। কেউ কেউ একে জাল গ্রন্থ বলে মনে করেন। এই গ্রন্থের লেখক হলায়ুধ মিশ্র রাজা লক্ষ্মণ সেনের সচিব ছিলেন। তিনি যদি ১২১০-১২ খ্রিস্টাব্দের পরে বেঁচে থাকেন, তা হলে *শেকশুভোদয়া* তাঁর রচনা হওয়া সম্ভব। তবে স্বীকার করতে হবে যে ভাষার বিকৃতিতে ও প্রক্ষিপ্ত তথ্যে গ্রন্থটি বিদ্বানদের বিভ্রান্তির কারণ হয়েছে। ইতিহাস বিরল সে যুগে গ্রন্থকার হিসেবে হলায়ুধ মিশ্রের ও লক্ষ্মণ সেনের নাম ও সত্যকাহিনি জড়িয়ে, আর্য প্রভৃতির প্রাচীন রূপ রক্ষা করে ষোলো-সতেরো শতকে জাল গ্রন্থ রচিত হয়েছে— অনুমান করতে অনেকখানি কল্পনার প্রয়োজন। *শেকশুভোদয়া* সূত্রে কারও কারও বিশ্বাস শেখ জালালউদ্দিন তাবরেজি লক্ষ্মণ সেনের আমলে লখনোতিতে বাস করতেন। অমৃতকুণ্ড তাঁরই আগ্রহে অনূদিত হয়। তাঁরই মাহাত্ম্যমুগ্ধ হলায়ুধ মিশ্র তাঁর কীর্তিকথা বর্ণনা করেছেন *শেকশুভোদয়া*-য় (শেখের শুভ উদয়)।

আবদুল রহমান চিশতির মতে জালালুদ্দিন তাবরেজির পুরো নাম ছিল কাসেম মখদুম শেখ জালাল তাবরেজি। তিনি শেখ শাহাবুদ্দিন সোহ্রাওয়ার্দির শাগরেদ ছিলেন। তিনি কুতুবুদ্দিন বখতিয়ার

কাকি, বাহাউদ্দিন জাকারিয়া নিজামুদ্দিন মুগরা ও দিল্লির সুলতান শামসুদ্দিন ইলতুতমিসের (১২১০-৩৬) সমসাময়িক। জন্মস্থান তাব্রিজ থেকে দিল্লি এলে তাঁকে সুলতান ইলতুতমিস অভ্যর্থনা করেন। এ তথ্যে আস্থা রাখলে স্বীকার করতে হবে জালালুদ্দিন তাবরেজি লক্ষ্মণ সেনের আমলে বাংলায় আসেননি। আসলে শেখ বাংলা থেকেই দিল্লি গিয়েছিলেন। কেউ কেউ আবার শেখ জালালুদ্দিন তাবরেজি ও সিলেটের জালালুদ্দিন কুনিয়াঈকে অভিন্ন মনে করেন। শেখ জালালুদ্দিন তাবরেজি বহুল আলোচিত সুফি।

ময়মনসিংহ জেলার মদনপুরে শাহ্ সুলতান রুমি নামে এক সুফির দরগা আছে। ইনি ৪৪৫ হি. বা ১০৫৩-৫৪ সনে ওখানে বিদ্যমান ছিলেন বলে পরবর্তীকালের দলিল সূত্রে দাবি করা হয়। এক কোচ রাজা তাঁর হাতে ইসলামে দীক্ষিত হয়ে তাঁকে মদনপুর গ্রাম দান করেন বলে ময়মনসিংহ *Gazetteer*-এ উল্লেখ আছে। কিন্তু আরও প্রায় সাড়ে তিনশো বছর পরে উক্ত জেলায় কোচ রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। অতএব, উক্ত কোচ রাজা কোনো কোচ জমিদার হবেন, কিংবা সুলতান রুমি চোদ্দো শতকের লোক।

পাবনা জেলার শাহ্জাদপুরে রয়েছে মখদুম শাহদৌলা শহিদের দরগা। ইনি জালালউদ্দিন বোখারির সমসাময়িক ছিলেন। অতএব ইনি বারো-তেরো শতকের লোক।

বর্ধমানের মঙ্গলকোট গাঁয়ে মখদুম শাহ্ মাহমুদ গজনবি ওরফে শাহরাহি পিরের দরগা আছে। ইনি স্থানীয় রাজা বিক্রমকেশরীর সাথে লড়েছিলেন বলে কিংবদন্তি আছে।

বগুড়ার মহাস্থান গড়ের শাহ্ সুলতান মাহি আসোয়ারের স্বীকৃতি আওরঙ্গজিবের সনদসূত্রেও (১০৯৬ হি. ১৬৮৫-৮৬) মিলে। তাঁর সম্বন্ধে লোকশ্রুতি এই যে, তিনি মুসলিমবিদ্বেষী রাজা বলরাম ও পরশুরামকে হত্যা করেন। পরশুরামের ভগ্নী শিলাদেবী করতোয়া নদীর যেখানে ডুবে মরেছিল তা এখনও শিলাদেবীর ঘাট নামে পরিচিত। ইনি সম্ভবত চোদ্দো শতকের লোক। মনে হয় মাহি আসোয়ার (মৎস্যাকৃতি নৌকার আরোহী) খ্যাতির লোকেরা চোদ্দো শতকের পরের লোক নন। কেননা পনেরো শতকে আরব-ভারতের স্থলপথ জনপ্রিয় হয়। আর ষোলো শতকে পোর্তুগিজেরা জলপথ নিয়ন্ত্রণ করত।

সিলেটের শাহ্ জালালউদ্দিন কুনিয়াঈ চোদ্দো শতকের দ্বিতীয় পাদে বাংলা দেশে আসেন। ইবন বতুতা (১৩৩৮ সনে) সিলেটে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। ইনি রাজা গৌরগোবিন্দকে পরাজিত করে সিলেট অঞ্চলে ইসলাম প্রচার করেন।

মখদুম-উল-মুলক্ শেখ শরফুদ্দীন ইয়াহিয়া ও তাঁর ওস্তাদ শরফুদ্দিন আবু তওয়ামাহ্ সোনারগাঁয়ে ১২১০-৩৬ বা ১২৭০-৭১ কিংবা ১২৮২-৮৭ খ্রিস্টাব্দে এসেছিলেন। ইনি এবং 'মক্তুল হোসেনে' মুহম্মদ খান বর্ণিত শেখ শরফুদ্দিন অভিন্ন ব্যক্তি কি না বলবার উপায় নেই।

শেখ বদিউদ্দিন শাহ্ মাদার সিরিয়া থেকে এসেছিলেন। এঁর পিতার নাম আবু ইসহাক শামি। ইনি মুসা নবির ভাই হারুনের বংশধর। ইনিই সম্ভবত শূন্যপুরাণোক্ত নিরঞ্জনের রুষ্মার দম-মাদার এবং মাদারিপুরও সম্ভবত তাঁর নাম বহন করছে। চট্টগ্রামের মাদার বাড়ি, মাদারশাহ্ এবং দরগা সংলগ্ন পুকুরের মাছের মাদারি নাম, শাহ্ মাদারের স্মরণার্থ বাঁশ তোলার বার্ষিক উৎসব প্রভৃতি মাদারিয়া সম্প্রদায়ের সুফির বহুল প্রভাবের পরিচায়ক বলে ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক মনে করেন।

মখদুম জাহানিয়া জাহানগস্ত ওরফে জালালউদ্দিন সুরক্পুশ (Surkpush) নামে এক দরবেশও বাংলায় এসেছিলেন। জাহান গস্ত-র মৃত্যু হয় ১৩৮৩ খ্রিস্টাব্দে এবং 'উছ' (Uchh)-এ তাঁর সমাধি আছে।

শেখ আখি সিরাজুদ্দিন উসমান নিযামুদ্দিন আউলিয়ার খলিফা ছিলেন। ইনি পাণ্ডুয়ার শেখ আলাউল হকের পির। ইনি চোদ্দো-পনেরো শতকের দরবেশ। তাঁর প্রভাবেই মুখ্যত বাংলা দেশে

চিশতিয়া তরিকার প্রসার হয়। পিরের নামানুসারে বিভিন্ন চিশতিয়া পিরের শিষ্যরা বিভিন্ন নামে পরিচিত হতেন। আলাউল হকের শিষ্যরা 'আলাই'। তাঁর পুত্র নুর-কুতুব-ই-আলমের শাগরেদরা নুরি এবং আলাউলের খলিফা শেখ হোসেন ধুক্কারপোশ (Dhukkarposh)-এর সম্প্রদায়ের সুফিরা হোসেনি নামে পরিচিত ছিল। শেখ আলাউল হক ইসলামের উন্মেষ-যুগের মুসলিম সেনাপতি খালিদ বিন ওয়ালিদের বংশধর। সেজন্যে তাঁর শিষ্যরা 'খালিদিয়া' নামেও অভিহিত হত। আলাউল হকেরই পুত্র ছিলেন নুর-কুতুব-ই-আলম। গণেশ-যদুর আমলে গৌড়ের রাজনীতিতে আলাউল হকের পরিবার স্মরণীয় ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। নুর-কুতুব-ই-আলমের পুত্র শেখ আনোয়ার গণেশ কর্তৃক সোনারগাঁয়ে নির্বাসিত ও পরে নিহত হন। নুর-কুতুব-ই-আলমের ভ্রাতুষ্পুত্র শেখ জাহিদও সোনারগাঁয়ে নির্বাসিত হয়েছিলেন। জালালউদ্দিন মুহম্মদ শাহ্ ওরফে যদু শেখ জাহিদের প্রতি শ্রদ্ধাবান ছিলেন।

মির সৈয়দ আশরাফ জাহাঙ্গির সিমনানি শেখ আলাউল হকের শিষ্য ছিলেন। এঁর চিঠিগুলো সেকালের ধর্মীয়, সামাজিক ও রাজনৈতিক ইতিহাসের মূল্যবান উপকরণ ও নির্ভরযোগ্য দলিল। সৈয়দ আশরাফ সিমনানি জৌনপুর সুলতান ইব্রাহিম শরকির সমসাময়িক ছিলেন। সিমনানি ইব্রাহিম শরকিকে লিখিত এক পত্রে বদ্আলম ও বদর আলম শাহিদ নামে দুজন সুফির উল্লেখ করেছেন। শেখ হোসেন ধুক্কারপোশ (Dhukkarposh)-এর ছেলে রাজা গণেশ কর্তৃক নিহত হলে সিমনানি তাঁকে প্রবোধ দিয়ে যে পত্র লেখেন, তা থেকে আভাস মিলে যে গণেশ সোহ্‌রাওয়ার্দিয়া ও রুহানিয়া সুফিকে হত্যা করেন।

> Those who Traverse the path of God, have many calamities to suffer from. It is hoped through the spiritual grace of the souls of Suhrwardia and Ruhania saints of the past that in near future that kingdom of Islam will be freed from the hands of the luckless non-believers.

শেখ বদরুল ইসলাম নুর-কুতুব-ই-আলমের সমসাময়িক। রিয়াজুস সালাতিন-এ বর্ণিত ঘটনায় প্রকাশ: রাজা গণেশের দরবারে ইনি রাজাকে অভিবাদন না করেই আসন গ্রহণ করেন। রুষ্ট রাজা তাঁকে হত্যা করে তাঁর ঔদ্ধত্যের শাস্তি দেন।

এঁরা ছাড়া শাহ্ সফিউদ্দিন, জাফর খান গাজি, খান জাহান আলি, শাহ্ আনোয়ার কুলি হালবি, ইসমাইল গাজি, মোল্লা আতা, শাহ জালাল দাখিনি (মৃত্যু ১৪৭৬ খ্রি.), শাহ্ মোয়াজ্জম দানিশ মন্দ্ ওরফে মৌলানা শাহ্ দৌলা (রাজশাহি, বাঘা), শাহ্ আলি বাগদাদ্দি (মীরপুর, ঢাকা), শেখ ফরিদউদ্দিন, শাহ্ লঙ্গর, শাহ্ নিয়ামতুল্লাহ্, শাহ্ লঙ্কাপতি প্রমুখ দরবেশের নাম উল্লেখ্য।

জালালউদ্দিন তাবরেজি (মৃত্যু ১২২৫ খ্রি.), মখদুম জাহানিয়া (১৩৭০-৮৩) ও শাহ্ জালাল কুনিয়াঈ (মৃ. ১৩৪৬) সোহ্‌রাওয়ার্দিয়া মতবাদী ছিলেন।

শেখ ফরিদুদ্দিন শকরগঞ্জ (১১৭৬-১২৬৯); আখি সিরাজুদ্দিন (মৃ. ১৩৫৭), আলাউল হক (মৃ. ১৩৯৮), শেখ নাসিরুদ্দিন মানিকপুরী, মীর সৈয়দ আশরাফ জাহাঙ্গির সিমনানি, শেখ নুর-কুতুব-ই-আলম (মৃ. ১৪১৬), শেখ জাহিদ প্রমুখ চিশতিয়া সম্প্রদায়ের সুফি ছিলেন।

শাহ্ সফিউদ্দিন (মৃ: ১২৯০-৯৫?) কলন্দরিয়া সুফি ছিলেন। শাহ্ আল্লাহ্ মদারিয়া এবং শেখ হামিদ দানিশ মন্দ্ নকশ্‌বন্দিয়া সুফি ছিলেন। ষোলো শতক অবধি চট্টগ্রামের সুফি শাহ্ সুলতান বলখি (বায়জিদ?), শেখ ফরিদ, পির বদর আমল, কাতালপির শাহ্ মসন্দর বা মোহ্‌সেন আউলিয়া, শাহ্‌পির, শাহ্ চাঁদ প্রমুখ এবং কবি মুহম্মদ খানের মাতৃকুলের শরফউদ্দিন থেকে সদরজাহাঁ, আবদুল ওহাব ওরফে শাহ্ ভিখারী অবধি অনেক পিরের নাম মেলে।

গৌড়ের সুলতানদের মধ্যে ফখরুদ্দিন মুবারক শাহ্‌, সিকান্দর শাহ্‌, গিয়াসউদ্দিন আযম শাহ্‌, জালালুদ্দিন মুহম্মদ শাহ্‌ (যদু), রুকনুদ্দিন বারবক শাহ্‌, হোসেন শাহ্‌ প্রমুখের দরবেশ-ভক্তি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

আবার শাহ্‌ জালালুদ্দিন কুনিয়াঈ, আলাউল হক, নুর-কুতুব-ই-আলম, আশরাফ জাহাঙ্গির সিমনানি, ইসমাইল গাজি, জাফর আলি খান, খান জাহান খান প্রমুখ সুফি রাজনীতি ও সরকারি কর্মে নিযুক্ত ছিলেন।

আর্তের সেবা, কাঙালভোজন, রোগীর চিকিৎসা ও কেরামতি প্রভৃতির দ্বারাই সুফিগণ মন জয় করেন।

২

মুসলমানদের বিশ্বাস হজরত মুহম্মদ, হজরত আলিকে তত্ত্ব বা গুপ্ত জ্ঞান দিয়ে যান। সে জ্ঞান হাসান, হোসেন, খাজা কামীন বিন জয়দ ও হাসান বসরি আলি থেকে প্রাপ্ত হন। এই কিংবদন্তির কথা বাদ দিলে হাসান বসরি (মৃ. ৭২৮ খ্রি.), রাবিয়া (মৃ. ৭৫৩), ইব্রাহিম আদহম (মৃ. ৭৭৭), আবু হাশিম (মৃ. ৭৭৭), দারুদ তায়ি (মৃ. ৭৮১), মারুফ করখি (মৃ. ৮১৫) প্রমুখই সুফিমতের আদি প্রবক্তা।

পরবর্তী সুফি জুননুন মিসরি (মৃ. ৮৬০), শিবলি খোরাসানি (মৃ. ৯৪৬), জুনাইদ বাগদাদি (মৃ. ৯১০) প্রমুখ সাধকরা সুফিমতকে লিপিবদ্ধ, সুশৃঙ্খলিত ও জনপ্রিয় করে তোলেন। 'আল্লাহ্‌ আকাশ ও মর্ত্যের আলোস্বরূপ'। 'আমরা তাঁর (মানুষের) ঘাড়ের শিরা থেকেও কাছে রয়েছি'। এইপ্রকার ইঙ্গিত থেকেই সুফিমত বিশ্বব্রহ্মতত্ত্বের বা সর্বেশ্বরবাদের তথা অদ্বৈতবাদের দিকে এগিয়ে যায়। জিক্‌র বা জপ করার নির্দেশ মিলেছে *কোরানে*-এর অপর এক আয়াতে 'অতএব (আল্লাহ্‌কে) স্মরণ করো কেন-না, তুমি একজন স্মারক মাত্র'।

সৃষ্টি ও স্রষ্টার অদৃশ্য লীলা ও অস্তিত্ব বুঝবার জন্য বোধি তথা 'ইরফান' কিংবা গুহ্যজ্ঞান লাভ করা প্রয়োজন। এ প্রয়োজনবোধ ও রহস্যচিন্তাই সুফিদের বিশ্বব্রহ্মবাদী বা সর্বেশ্বরবাদী করেছে। এই চিন্তা বা কল্পনার পরিণতিই হচ্ছে 'হমহ উস্ত' (সবই আল্লাহ্‌), বিশ্বব্রহ্ম তত্ত্ব তথা 'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম'। এই হল তৌহিদ-ই ওজুদি তথা আল্লাহ্‌ সর্বভূতে বিরাজমান এই অঙ্গীকারে আস্থা স্থাপন। বায়াজিদ, জুনাইদ বাগদাদি, আবুল হোসেন ইবনে মুনসুর হল্লাজ এবং আবু সৈয়দ বিন আবুল খায়ের খোরাসানি (মৃ. ১০৪৯) প্রমুখ প্রথম যুগের অদ্বৈতবাদী সুফি। শরিয়ৎ-পন্থবিরোধী এসব সুফির অনেককেই নূতন মত পোষণ ও প্রচারের জন্য প্রাণ হারাতে হয়। মনসুর হল্লাজ শাহাবুদ্দিন সোহ্‌রাওয়ার্দি, ফজলুল্লাহ প্রমুখ এভাবেই শহিদ হন।

ডক্টর মহম্মদ এনামুল হক বলেন : 'ভারতে সুফি প্রভাব পড়িবার পূর্ব হইতে সুফিমতবাদ ভারতীয় চিন্তাধারায় পরিপুষ্ট হইতে থাকে। খ্রিস্টীয় একাদশ শতাব্দীতেই ভারতে সূফীমত প্রবেশ করে। তৎপূর্ব সুফিমতেও ভারতীয় দর্শন ও চিন্তাধারার স্পষ্ট ছাপ দেখিতে পাই'। তাঁর মতে এই ভারতীয় প্রভাব ভারতীয় পুস্তকের আরবি-ফারসি অনুবাদের মাধ্যমে, ভ্রাম্যমাণ বৌদ্ধ ভিক্ষুর সান্নিধ্যে এবং আল বিরুনি অনূদিত পাতঞ্জল যোগ এবং কপিল সাংখ্যতত্ত্বের সঙ্গে পরিচয়ই এ প্রভাবের মুখ্য কারণ। বায়জিদ বিস্তামির ভারতীয় (সিন্ধুদেশীয়) গুরু-বু-আলির প্রভাবও এ ক্ষেত্রে স্মরণীয়। তিনি আরও বলেন, 'বাঙলা দেশে সুফিমত প্রচার ও বহুল বিস্তৃতির সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় সহজিয়া ও যোগ সাধন প্রভৃতি পন্থা বঙ্গের সুফি মতকে অভিভূত করিয়া ফেলিতে থাকে। কালক্রমে বঙ্গের সুফিমতবাদের সহিত এ দেশীয় সংস্কার, বিশ্বাস প্রভৃতিও সম্মিলিত হইতে থাকে। এবং সুফিমতবাদ ও সাধন পদ্ধতি ক্রমে ক্রমে যোগসাধন প্রভৃতি হিন্দু পদ্ধতির সঙ্গে একটা আপস করিয়া লইতে থাকে। ... চিশতীয়হ ও

সুহরবরদীয়হ সম্প্রদায়দ্বয়ের সাধনা ভারতে আগমন করার পূর্ব হইতেই অনেকখানি ভারতীয় ভাবাপন্ন হইয়া পড়িয়াছিল, ভারতে আগমনের পর এ দেশীয় সাধনার সহিত তাহাদের সাক্ষাৎ যোগসূত্রের সৃষ্টি হইল; ভারতের প্রাণের সহিত আরব ও পারস্যের প্রাণের ত্রিবেণি সঙ্গম ঘটিয়া গেল। ভারতবিখ্যাত সাধক কবির (১৩৯৮—১৪৪০ খ্রি.) উক্ত প্রাণত্রয়ের পুণ্যতীর্থ প্রয়াগ ক্ষেত্রে পরিণত হইলেন। তাঁহার মধ্যে ভারতীয় যোগ সাধনা ও সুফিদের "তস্বরফ্" বা ব্রহ্মবাদ সম্মিলিত হইল। সুফিরা সাক্ষাৎভাবে তাঁহার ভিতর দিয়া ভারতীয়দের, আর ভারতীয়েরাও সুফিদের প্রাণের সন্ধান লাভ করিলেন'। *আইন-ই-আকবরি*-তে চোদ্দোটি সুফি খানদান বা মণ্ডলীর উল্লেখ আছে।

আবুল ফজল হয়তো প্রধান সম্প্রদায়গুলোরই নাম করেছেন। আমাদের অনুমানে তখন এক এক পিরকেন্দ্রী এক এক সম্প্রদায় ছিল। পরে তাত্ত্বিক ও আচারিক বিধিবন্ধ শাস্ত্র গড়ে উঠার ফলে সম্প্রদায় সংখ্যা কমেছে এবং চারটি প্রধান মতবাদী খানদান প্রসার লাভ করে। আর অ-প্রধানগুলো কালে লোপ পায়, স্থানিক সীমা অতিক্রম করার যোগ্যতা হারায়। এ কারণেই আবুল ফজল কথিত চোদ্দোটি খানদানের অনেকগুলিই লোপ পেয়েছে।

চিশ্‌তিয়া ও সুহ্‌রাওয়াদিয়া মতই প্রথমে ভারতে তথা বাংলায় প্রসার লাভ করে। এর পরে নকশবন্দিয়া এবং আরও পরে কাদিরিয়া সম্প্রদায় জনপ্রিয় হয়। মনে হয় ষোলো শতক অবধি চিশ্‌তিয়া মাদারিয়া ও নকশবন্দিয়া সম্প্রদায়ের প্রভাবই বেশি ছিল। মাদারিয়া ও কলন্দরিয়া মত একসময় জনপ্রিয়তা হারিয়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়।

চোদ্দো-পনেরো শতকের মধ্যেই সুফির সর্বেশ্বরবাদ আর বৈদান্তিক অদ্বৈতবাদ অভিন্ন রূপ নিল। আচার ও চর্যার ক্ষেত্রেও যোগপদ্ধতির মাধ্যমে ঐক্য স্থাপিত হল। ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে এ অভিন্নতা প্রথম আমরা কবিরের (১৩৯৮-১৪৪৮) মধ্যেই প্রত্যক্ষ করি। এই মিলনবিরোধী আন্দোলনও শতোর্ধ্ব বছর পরে মুজদ্দদ-ই-আলপ সানি শেখ আহমদ সরহিন্দির (১৫৬৩-১৬২৪) নেতৃত্বে গড়ে উঠে। কিন্তু সে সংস্কার আন্দোলন সর্বব্যাপী হতে পারেনি। নকশবন্দিয়া এবং কিছুটা কাদিরিয়া সম্প্রদায়েই এ সংস্কার আন্দোলন প্রধানত সীমাবদ্ধ ছিল। আলফা-সানী স্বয়ং একজন নকশবন্দিয়া। বাংলায় দেশি তত্ত্বচিন্তা ও চর্যার সঙ্গে ইসলামের বহিরবয়বের মিলন ঘটানোর চেষ্টায় পরিণতি লাভ করে। সৈয়দ সুলতান ও তাঁর সমসাময়িকদের মধ্যে এই প্রচেষ্টাই লক্ষ করি। ভারতীয় যোগচর্যাভিত্তিক তান্ত্রিক সাধনার যা-কিছু মুসলিম সুফিরা গ্রহণ করলেন, তাকে একটা মুসলিম আবরণ দেবার চেষ্টা হল, তা অবশ্য কার্যত নয়—নামত। কেননা, আরবি-ফারসি পরিভাষা গ্রহণের মধ্যেই এর ইসলামি রূপায়ণ সীমিত রইল। যেমন নির্বাণ হল ফানা, কুণ্ডলিনী শক্তি হল নকশবন্দিয়াদের লতিফা। হিন্দুতন্ত্রের ষড়পদ্ম হল *এঁদের ষড় লতিফা* বা আলোককেন্দ্র। *এদেরও অবলম্বন হল দেহচর্যা* ও *দেহস্থ* আলোর ঊর্ধ্বায়ন। পরম আলো বা মৌল আলোর দ্বারা সাধকের সর্বশরীর আলোময় হয়ে উঠে, এ হচ্ছে এক আনন্দময় অদ্বয় সত্তা— এর সঙ্গে সামরস্য জাত সহজাবস্থার, সচ্চিদানন্দ বা বোধি চিত্তাবস্থার মিল খুঁজে পাওয়া যায়।

সুফির জিক্‌র ভারতিক প্রভাবে যোগীর ন্যাস, প্রাণায়াম ও জপের রূপ নিল। বহির্ভারতিক বৌদ্ধ প্রভাবে (ইরানে সমরখন্দে বোখারায় বলখে) এবং ভারতিক বৌদ্ধ হিন্দু প্রভাবে বৌদ্ধ গুরুবাদ ও (যোগতান্ত্রিক সাধকের অনুসৃতি বশে) সুফি সাধনায় অপরিহার্য হয়ে উঠল। সুফিমাত্রই তাই পির মুর্শিদ-নির্ভর তথা গুরুবাদী। গুরুর আনুগত্যেই সাধনায় সিদ্ধির একমাত্র পথ। এটিই পরিণামে কবর পূজারও (*দরগাহ বৌদ্ধভিক্ষুর স্তূপ পূজারই মতো হয়ে উঠল*) রূপ পেল। সুফিরা আল্লাহ্‌র ধ্যানের প্রাথমিক অনুশীলন হিসাবে পিরের চেহারা ধ্যান করা শুরু করেন। গুরুতে বিলীন হওয়ার অবস্থায়

উন্নীত হলেই শিষ্য আল্লাহ্‌তে বিলীন হওয়ার সাধনার যোগ্য হয়। প্রথম অবস্থার নাম 'ফানা ফিশ শেখ', দ্বিতীয় স্তরের নাম 'ফানাফিল্লাহ্‌'। প্রথমটি 'রাবিতা' গুরুসংযোগ, দ্বিতীয়টি 'মুরাকিবাহ' (আল্লাহ্‌র ধ্যান)। এই 'মুরাকিবাহ'য় যৌগিক পদ্ধতি গৃহীত হয়েছে। আসন, ধারণা ধ্যান ও সমাধি— এই চতুরঙ্গ যোগপদ্ধতি থেকেই পাওয়া।

পিরের খানকা বা আখড়ার সামা (গান), হালকা (ভাবাবেগে নর্তন), দা'রা (আল্লাহ্‌র নামকীর্তনের আসর), হাল (অভিভূতি), সাকি, ইশক প্রভৃতি খাজা মঈনুদ্দিন চিশতির আমল থেকেই চিশতিয়া খানদানের সুফিদের সাধনায় অপরিহার্য হয়ে উঠেছে। পরবর্তীকালে নিজামিয়া প্রভৃতি সম্প্রদায়েও এ রীতি গৃহীত হয়। গৌড়ীয় বৈষ্ণব সাধনায় এরই অনুসৃতি রয়েছে।

সুফিদের দ্বারা দীক্ষিত অজ্ঞজন সাধারণ শরিয়তি ইসলামের সঙ্গে ভাষার ব্যবধানবশত অনেককাল পরিচিত হতে পারেনি। ফলে, 'তাহারা ক্রিয়াকলাপে, আচারে-ব্যবহারে, ভাষায় ও লেখায়, সর্বোপরি সংস্কার ও চিন্তায়, প্রায় পুরাপুরি বাঙালিই রহিয়া গেল। এমনকি হিন্দুত্বকে সম্পূর্ণরূপে বর্জন করিতে পারিল না; '... দরবেশদের প্রশ্রয়ও ছিল— তাঁহারা (দরবেশরা) কখনও বাহ্যিক আচার-বিচারের প্রতি বিশেষ মনোযোগ তো দেনই নাই, এমনকি অভ্যন্তরীণ ব্যাপারেও অসাধারণ মহৎ ও উদার ছিলেন। ...এখনও পশ্চিম ও উত্তরবঙ্গীয় "শয়খ" শ্রেণির মুসলমানদের মধ্যে অনেক হিন্দুভাব, চিন্তা, আচার ও ব্যবহারের বহুল প্রচলন (রয়েছে)। সাধারণ বঙ্গীয় মুসলমানদের মধ্যে এখনও তাহাদের ভারতীয় পিতৃপুরুষ হইতে লব্ধ বা পরবর্তীকালে গৃহীত (যত) হিন্দু ও বৌদ্ধ আচার-ব্যবহার প্রচলিত আছে এবং চিন্তা ও বিশ্বাস ক্রিয়া করিতেছে'।

বাংলার লোকনৃত্য ও লোকসংগীত

গুরুসদয়

জাতীয় জীবনের পুনরুজ্জীবনের ও পুনর্গঠনের এই যুগে মানুষের প্রাণশক্তির সাধনার অপরিহার্য উপকরণগুলিকে ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনে নিয়োজিত করে নিতে হবে, নতুবা সম্পূর্ণ সফলতা লাভ করা অসম্ভব।

কী শারীরিক ব্যায়ামঘটিত শক্তি ও স্বাস্থ্যের দিক দিয়া, কী আত্মার আনন্দঘটিত মুক্তি ও তৃপ্তির দিক দিয়া, কী কল্পনাবৃত্তি ও ভাববৃত্তি উন্মেষ ও বিকাশের দিক দিয়া, কী সামাজিক ঐক্য-বিধানের দিক দিয়া, নৃত্যকলার ব্যাপকভাবে চর্চা যে মানুষের প্রাণশক্তির সাধনার একটি অপরিহার্য উপকরণ, তা পৃথিবীর প্রত্যেক জীবন্ত উন্নতিশীল জাতির দৃষ্টান্ত হতে দেখা যায়। দুর্ভাগ্যবশত আমাদের দেশের আধুনিক শিক্ষিত সম্প্রদায় এ দেশেরই প্রাচীন পরম্পরাগত নৃত্যের বহুব্যাপক প্রথাকে বিলাসিতার ও দুর্নীতির গণ্ডীভুক্ত করে নির্বাসিত করে সমাজের জীবন থেকে বিতাড়িত করেছে। অথচ এই দেশেই একদিন নৃত্যকে শৈব কী বৈষ্ণব ধর্মের সাধনার একটি প্রধান সোপান বলে গণ্য করা হয়েছিল। আবার এই দেশেই সুদূর পল্লিগ্রামে বাংলায় স্বকীয় সংস্কৃতির ধ্বংসাবশেষ যাদের মধ্যে এখনও অল্পবিস্তরভাবে বর্তমান আছে তাদের জীবনের এবং তাদের সামাজিক প্রথার ও ধর্মপ্রণালির সঙ্গে বিশুদ্ধ নৃত্যগীতের চর্চা আজও অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত হয়েছে।

আমাদের আধুনিক শিকড়বিহীন শহুরে শিক্ষিত ও ভদ্রসমাজের সঙ্গে যে কেবল প্রাচীন বাংলার সংস্কৃতির সহিত সম্পূর্ণ ছাড়াছাড়ি হয়ে পড়েছে তা নয়, তার সঙ্গে সঙ্গে একদিকে পশ্চিম অঞ্চলের বাঈ খেমটা ইত্যাদি দুর্নীতিমূলক মজলিশি নৃত্যের ও থিয়েটারের কুৎসিত ইঙ্গিতমূলক নৃত্যের আমদানির ছড়াছড়ি হয়েছে এবং অপরদিকে আজকালকার পাশ্চাত্য জগৎ থেকে নৃত্যের সঙ্গে ধর্মানুষ্ঠানের ও আধ্যাত্মিক ভাবের সম্পূর্ণ বিচ্ছেদময় মনোভাবের আমদানি হয়েছে। এর ফলে বাংলা দেশের আধুনিক শিক্ষিত ও ভদ্র সমাজে নৃত্যের স্থান অতি নিম্নস্তরে এসে পড়েছে ও নৃত্যকলা ঘৃণ্য বিবেচিত হয়ে কেবল যে

জাতির ও ব্যক্তির সামাজিক ও আধ্যাত্মিক জীবন ও শিক্ষাক্ষেত্র থেকে নির্বাসিত হয়েছে তা নয়;—বালকবালিকার দল—যারা অন্যান্য দেশে প্রতিনিয়ত নৃত্যের সহায়তায় দেহের বল, মনের স্ফূর্তি ও প্রাণের আনন্দের সঞ্চার করে আপন আপন জীবনে শক্তির ও আনন্দের ভিত্তিকে সুদৃঢ় করে জাতিকে শক্তিশালী করে গড়ে তুলতে সহায়তা করবে—(যেমন অন্যান্য দেশে করে থাকে)—তাদের জীবন থেকেও নৃত্যকে নির্বাসিত করা হয়েছে।

পাশ্চাত্য জগতের সকল দেশেই আজ মানুষ শিক্ষাক্ষেত্রে ও সামাজিক জীবনে দেশের জনসাধারণের মধ্যে প্রচলিত লোকনৃত্যের মূল্য বুঝতে পেরেছে এবং প্রত্যেক জাতি আপন আপন সংস্কৃতিপ্রসূত লোকনৃত্যের প্রথাকে আবার জাতির সকল শ্রেণির লোকের মধ্যে বহুব্যাপকভাবে প্রচলিত করে দেশের ও সমাজের জীবনকে সরল, নির্মল আনন্দময়ভাবে অনুপ্রাণিত করে তুলবার চেষ্টা করছে। বর্তমান শিক্ষিত ও সভ্য জগতের অনুমোদিত এই প্রণালী হতে বাংলার আজ বিচ্যুত হয়ে থাকার কোনো অজুহাত নাই; কারণ বাংলা দেশের পল্লিগ্রামের নরনারীর মধ্যে এখনও যে সকল নৃত্যকলার পরম্পরাগত প্রথা আড়ালে আবডালে জীবন্ত ভাবে প্রচলিত রয়েছে সেগুলি রসকলা সৌন্দর্যের দিক দিয়া ভারতের অন্যান্য প্রদেশের অথবা পৃথিবীর অন্যান্য দেশের নৃত্যকলা থেকে কোনো প্রকারে নিকৃষ্ট নয়—বরং সহজ, সরল এবং বিশুদ্ধ প্রণালির আদর্শের দিক দিয়ে ও গভীর আধ্যাত্মিক ভাবের ব্যঞ্জনার দিক দিয়ে অন্যান্য প্রদেশের ও অন্যান্য দেশের নৃত্যপদ্ধতি থেকে শ্রেষ্ঠ বলে আমার মনে হয়। এটা আজকাল নৃ-তত্ত্ববিদ্‌গণ স্বীকার করেন যে, প্রত্যেক জাতিই আপন আপন প্রতিভাজাত রসকলাপদ্ধতি থেকে যে জীবন্ত অনুপ্রেরণা লাভ করতে পারে, অন্য জাতির নিকট থেকে ধার-করা রসকলা পদ্ধতি হতে সেরূপ জীবন্ত অনুপ্রেরণা লাভ করা সম্ভব নয়।

বৎসরেক কাল পূর্বে বাংলা দেশে যে নিজস্ব লোকনৃত্য বলে কিছু আছে তার উপলব্ধি আমাদের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের ছিল না বললেই চলে। কিন্তু এই বৎসরেক কালের মধ্যে সৌভাগ্যক্রমে বাংলার প্রাচীন রায়বেঁশে নৃত্য, জারি নৃত্য, কাঠি নৃত্য, অবতার নৃত্য ও ধূপ নৃত্য ইত্যাদি পুনরাবিষ্কার করবার সুযোগ এবং সৌভাগ্য আমার হয়েছে, আর শিক্ষাক্ষেত্রে যে এ-গুলির প্রচলন সবিশেষ কল্যাণপ্রদ ইহা শিক্ষা বিভাগের ডিরেক্টর এবং সরকারি শারীর শিক্ষা বিভাগের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত জে বুকানন থেকে আরম্ভ করে বাংলার অনেক উচ্চ ইংরেজি স্কুল, মধ্য ইংরেজি স্কুল এবং প্রাথমিক বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষগণ স্বীকার করে নিয়েছেন এবং তার ফলে কেবল বীরভূমে নয় বাংলার নানা জেলার স্কুলে বাংলার নিজস্ব লোকনৃত্যের চর্চা শিক্ষার একটি অতি প্রয়োজনীয় এবং কল্যাণপ্রদ অংশস্বরূপ বলিয়া গৃহীত ও প্রবর্তিত হতে আরম্ভ হয়েছে। গত ফেব্রুয়ারি মাসে উচ্চ ইংরেজি স্কুল এবং মধ্য ইংরেজি স্কুলের শিক্ষকদিগকে বাংলার লোকনৃত্য ও লোকসংগীত শিক্ষা দিবার জন্য সিউড়িতে যে একটি শিক্ষাকেন্দ্র খোলা হয়েছিল, তাতে বাংলার অনেক জেলার শিক্ষকেরাই যোগ দিয়েছিলেন। সুতরাং আশা করা যায় যে, অনতিবিলম্বে দেশের সকল শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে এই আদর্শের বিস্তার হবে এবং বাংলার জাতীয় লোকনৃত্যের আনন্দময় অনুপ্রেরণার প্লাবনের সঙ্গে সঙ্গে শারীরিক স্বাভাবিক ব্যায়াম প্রণালির প্রবর্তনের ফলে বাংলার বালক এবং যুবক সম্প্রদায়ের প্রভূত মঙ্গল সাধিত হবে ও জাতির জীবনে শক্তি ও আনন্দের সঞ্চার হবে।

কিন্তু কেবল পুরুষদের জন্য নৃত্যের বন্দোবস্ত করে নিরস্ত হয়ে থাক্‌লে আমাদের চলবে না। দেশের ছেলেদের জীবনে এখনও আনন্দের এবং ব্যায়ামের কতকটা সুযোগ এবং বন্দোবস্ত আছে; কিন্তু দেশের মেয়েদের ও বালিকাদের বেলা তা বিন্দুমাত্র নাই বললেই চলে, এবং এর ফলে বাংলার মেয়েদের কেবল যে স্বভাবজাত শরীরিক সৌন্দর্যের লোপ হচ্ছে তা নয়, দিন দিন তাদের স্বাস্থ্যহীনতার ও দুর্বলতার মাত্রা বেড়ে চলে জাতিকে দ্রুত ধ্বংসের পথে নিয়ে যাচ্ছে। ছেলেদের জন্য যে ড্রিল-পদ্ধতি শারীরিক ব্যায়ামের দিক দিয়া অস্বাভাবিক ও অনুপযোগী সাব্যস্ত হয়েছে মেয়েদের পক্ষে যে ইহা আরও বেশি অস্বাভাবিক ও অনুপযোগী তা বলা বাহুল্য। সুতরাং এটা জোরের সহিত বলা যেতে পারে যে, ছেলেদের ব্যায়ামের জন্যে নৃত্যের প্রচলনের যতটা প্রয়োজন, মেয়েদের ব্যায়াম, শরীরগঠন ও স্বাস্থ্যোন্নতির জন্যে তার প্রয়োজন আরও বেশি।

আজকাল অনেক স্কুলে ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে এর উপলব্ধি এসেছে এবং তার ফলে অনেক স্কুলে নানাপ্রকার নূতন নূতন নৃত্য উদ্ভাবিত করে শেখানো হচ্ছে। কিন্তু আমাদের মনে রাখতে হবে যে, রঙ্গমঞ্চ ইত্যাদিতে যে প্রণালীর নৃত্যের প্রচলন, শিক্ষাক্ষেত্রে সে-প্রণালীর নৃত্য সম্পূর্ণ অনুপযোগী। রঙ্গমঞ্চের নৃত্যপ্রণালীর শিক্ষাক্ষেত্রে প্রচলিত করলে উহাতে অনেক কুফল ফলবার সম্ভাবনা আছে, কারণ সেসকল নৃত্যে নানাপ্রকার কৃত্রিমতা ও বিলাসিতার ভাব এসে পড়ে।

লোকনৃত্যে এসকল দোষের সম্পূর্ণ অভাব, কারণ লোকনৃত্য জাতির সহজ সরল ভাব হতে প্রসূত; তাতে কৃত্রিমতা অথবা কোনোরকম বিলাস-বিভ্রম থাকে না। সেজন্য প্রত্যেক জাতির পক্ষে সেই জাতির আপন আপন জাতীয় লোকনৃত্যই যে শিক্ষাক্ষেত্রে বিশেষভাবে উপযোগী, তা আজকাল পাশ্চাত্য জগতে স্বীকৃত হয়ে পড়েছে।

মেয়েলি ব্রত নৃত্য ও উৎসব নৃত্য

সনাতন হিন্দুয়ানির অথবা খাঁটি ভারতীয় সভ্যতার বিরুদ্ধ বলে বাংলার যেসকল আধুনিক ভদ্র ও শিক্ষিত ব্যক্তি নৃত্যের প্রথাকে দূষণীয় মনে করে শিক্ষাক্ষেত্রে ও সমাজ থেকে নৃত্যকে নির্বাসিত করতে বদ্ধপরিকর, তাঁদের মধ্যে অনেকেই হয়তো জানেন না যে, বাংলা দেশে এক সময়ে বিশুদ্ধ নৃত্যের প্রথা কী পুরুষ কী মেয়েদের মধ্যে সামাজিক ও ধর্ম জীবনে অতি ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল এবং তার ফলে বাংলার পুরুষ ও মেয়েদের শরীর আজকালকার চেয়ে অনেক বেশি বলিষ্ঠ, স্বাস্থ্যবান ও কর্মঠ ছিল।

প্রতি গ্রামে ছোটো ছোটো মেয়েরা প্রতি মাসে ব্রত উপলক্ষে পাড়া ঘুরে ঘুরে বাড়িতে বাড়িতে ছড়া আবৃত্তি করতে করতে নৃত্য করত। বিবাহ ও ব্রতাদি উপলক্ষে বয়স্কা মহিলারাও প্রকাশ্যভাবে গান গেয়ে গেয়ে নানাপ্রকার সুন্দর অথচ সুরুচিপূর্ণ অঙ্গ ভঙ্গির সহিত নৃত্য করতেন। এটা যে কেবল একটা মান্ধাতার আমলের অতীত যুগের কাহিনি তা নয়, এখনও বাংলার সুদূর নিভৃত পল্লিতে— যেখানে আমাদের আধুনিক শিক্ষা ও শহরের বিকৃত আদর্শ তার প্রভাব সম্পূর্ণ বিস্তার করতে পারেনি— বাংলার নিজস্ব এই সুন্দর স্বাস্থ্যপ্রদ ও আনন্দপ্রদ মেয়েলি নৃত্যের প্রথা বেঁচে আছে।

কিন্তু এখনও যে এই প্রথা বেঁচে আছে, তা আমাদের শহুরে শিক্ষিত লোকদের মধ্যে অনেকেই কেন—বেশির ভাগ লোকেই যে জানেন না, তা বললে অত্যুক্তি হয় না। মাস-চারেক আগে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নেতৃস্থানীয় বিখ্যাত একজন বাঙালি বন্ধুর সঙ্গে এই নিয়ে আমার আলোচনা হয়। তিনি গুজরাট ইত্যাদি অঞ্চলের মেয়েদের 'গরবা' নৃত্যে মুগ্ধ হয়ে সেই নৃত্য বাংলার মেয়েদের মধ্যে প্রবর্তন করতে ভয়ানক ঔৎসুক্য প্রকাশ করছিলেন। আমি যখন বললাম যে, 'গরবার আমাদের এত আবশ্যক কি? আমাদের বাংলার পল্লীগ্রামে আমাদের নিজস্ব অনেক সুন্দর মেয়েলি নৃত্য আছে সেগুলির পুনঃপ্রচলন করা উচিত', তখন তিনি আমার কথা একেবারে অবিশ্বাসের ও অবজ্ঞার হাসিতে উড়িয়ে দিলেন আর বললেন—'বলেন কি মশায়, বাংলার ভদ্রমেয়েদের মধ্যে নৃত্যের প্রচলন আছে, সে আবার কে কোন্ দিন শুনেছে? আর যদি থাকেই, তবে সেটা নিশ্চয়ই একটা যা-তা রকম হবে। গুজরাট ইত্যাদি অঞ্চলের আর্ট বাংলার আর্টের চেয়ে অনেক উঁচুদরের।'

বাংলার সংকৃষ্টির সম্বন্ধে এই-যে অজ্ঞতা ও আত্মনিকৃষ্টতা—অবিশ্বাসের ভাব, এটা যে কেবল আমার এই বন্ধুটির একটি ব্যক্তিগত ভাব মাত্র তা নয়—আমাদের আধুনিক শহুরে ও শিক্ষিত সমাজের মনোভাবের এটা একটা সাধারণ দৃষ্টান্তমাত্র। ভারতের অন্যান্য প্রদেশের অনেক জিনিসেরই আমি প্রশংসা করি; কিন্তু এটা জোরের সহিত বলব যে, বাংলার নিজস্ব রসকলার সঙ্গে আমাদের একবার সাক্ষাৎভাবে পরিচয় করবার সৌভাগ্য হলেও তার গুণ চিনবার মতো চোখ আমাদের খুললে আমরা একদিন বুঝতে পারব যে, কী নৃত্য কী অন্যান্য রসকলা প্রত্যেকটিতেই বাংলার স্থান অতি উচ্চে। আর সেই রসকলার ধারার সঙ্গে আমাদের পরিচয় করতে হবে—বাংলার শহুরে জীবনে ও বর্তমান শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলিতে নয় বাংলার পল্লিগ্রামের নরনারীর জীবনে।

গত এপ্রিল মাসে কলিকাতায় গলস্টোন্ পার্কে যে লোকনৃত্য-উৎসবের ব্যবস্থা হয়েছিল তার অনতিপূর্বে আমি যশোহরের পল্লিগ্রামের মেয়েদের মধ্যে প্রচলিত 'ঘট-ওলানো'-ব্রত নৃত্যের আবিষ্কার করি; এবং সেই উৎসবে এই ব্রত প্রদর্শন করবার সুযোগ আমার হয়েছিল। বাংলার নিজস্ব মেয়েলি নৃত্যের এই সুন্দর প্রথা দেখে আমাদের শিক্ষিত সমাজের অনেকেরই যে চোখ ফুটে গিয়েছে তা তাঁরা স্বীকার করেছেন। সহজ সরল ভাবের, শুচিতার, ললিতগতিভঙ্গির, অঙ্গ সঞ্চালনের লাবণ্যের এবং আধ্যাত্মিক ভাবগর্ভতার একাধারে এমন সুন্দর মনোমুগ্ধকর ও আনন্দদায়ক সমাবেশ আধুনিক নৃত্য-প্রণালীগুলিতে খুব কমই দেখা যায়। আর তার সঙ্গে সঙ্গে শারীরবিজ্ঞানমূলক অঙ্গসঞ্চালনাবলির কী চূড়ান্ত সংযোজনা। এই নৃত্যের বিবিধ ভঙ্গি দেখলে মনে হয় এগুলিতে বিখ্যাত 'সুইডিশ' ড্রিলের যাবতীয় ব্যায়াম-প্রণালী সন্নিবিষ্ট রয়েছে। তাছাড়া ইহার সঙ্গে আর একটা জিনিস আছে যা সুইডিশ ড্রিলে নেই; সেটা হচ্ছে ঢাকঢোলের বাদ্য ও তালের শক্তি-উদ্দীপনাময় সংগত। এসকল উপাদানের সমাবেশে এই নৃত্য-প্রণালী একটি অতি আনন্দময় ও উচ্চাঙ্গের রসকলা বলে পরিগণিত হবার যোগ্য। বালিকারা আপন-আপন মা, মাসি, ঠাকুরমা ও দিদিমাদের কাছ থেকেই এইসকল নৃত্য শিক্ষা করে থাকে। মৈমনসিংহ, ত্রিপুরা, শ্রীহট্ট ইত্যাদি জেলার পল্লিগ্রামে এখনও সূর্যব্রত ইত্যাদি উপলক্ষে ছোটোবড়ো মেয়েরা প্রকাশ্যভাবে অতি সুরুচিপূর্ণ প্রণালির নৃত্য করে থাকেন। ফরিদপুরের নলিয়া গ্রামের ব্রাহ্মণ কায়স্থ ইত্যাদি পরিবারের মেয়েদের মধ্যে এখনও ব্রত ও বিবাহ উপলক্ষ্যে যে সকল নির্মল ও সুন্দর নৃত্যপ্রণালীর

প্রচলন আছে, তা দেখবার সুযোগ সম্প্রতি আমার হয়েছে। অবিবাহিতা মেয়েরা সুমধুর ছড়া আবৃত্তি করে ব্রত নৃত্য করে থাকে। উচ্চশ্রেণির বয়স্কা মেয়েরা এখনও বিবাহ উপলক্ষে নানাপ্রকার নৃত্য করে থাকেন। এই সব নৃত্যের মধ্যে আধুনিক খ্যামটা বাইনাচ ইত্যাদির মতো বিলাস-বিভ্রমের লেশমাত্র আভাসও নাই। এই সকল নৃত্যের প্রণালী বাংলার প্রতি বালিকা বিদ্যালয়ে প্রবর্তিত করা একান্ত প্রয়োজন এবং তা করতে পারলে জাতির অশেষ উপকার সাধিত হবে।

বিবাহ-উৎসবের আনুষঙ্গিক নানা অনুষ্ঠান উপলক্ষে নৃত্যের সঙ্গে সঙ্গে পূর্ববঙ্গের মেয়েরা যেসকল গান গেয়ে থাকেন সেগুলির সহজসরল কথা, ছন্দ ও সুরের লালিত্যে অতি মূল্যবান লোকসংগীত।

ব্রত অথবা পূজা উপলক্ষে যে সকল লোকনৃত্য হয়, তার সঙ্গে ঢাক বাজে, আর বিবাহ ইত্যাদি উৎসবে যেসকল মেয়েলি নৃত্য হয় তার সঙ্গে ঢোল বাজে।

পশ্চিম বাংলায় কোনো কোনো ব্রাহ্মণ কায়স্থ পরিবারের অবিবাহিতা মেয়েদের মধ্যে ভাদ্র মাসে ইন্দ্রপূজার সময় ভাঁজোনৃত্য এখনও প্রচলিত আছে। শুনিতে পাওয়া যায় কাটোয়া অঞ্চলে কোনো কোনো জায়গায় ভদ্র পরিবারের বয়স্থা মেয়েরা এখনও এই উপলক্ষে ভাঁজো নৃত্য করে থাকেন।

পূর্ব ও পশ্চিম বাংলার মুসলমান মেয়েদের মধ্যে এখনও বিবাহ উপলক্ষ্যে নৃত্যগীতের প্রথা প্রচলিত আছে।

বাংলা দেশে পুরুষদের মধ্যে যে সকল লোকনৃত্য এখনও প্রচলিত আছে, তার কয়েকটির সংক্ষিপ্ত বর্ণনা নিম্নে দেওয়া গেল।

রায়বেঁশে নৃত্য

পুরুষদের মধ্যে নানা দেশে যত নৃত্য প্রচলিত আছে, তন্মধ্যে রায়বেঁশে নৃত্য যে সবচেয়ে গৌরবময়, এটা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে। এই নৃত্যের ইতিহাস ও প্রণালী আমি অন্যত্র বিস্তারিতভাবে বিবৃত করেছি। আজকাল এই 'রাইবেঁশে' নামধারী নর্তকগণ যে প্রাচীন বাংলার 'রায়বেঁশে' যোদ্ধাদের বংশধর, তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ হতে পারে না। কবিকঙ্কণচণ্ডী, ধর্মমঙ্গল, অন্নদামঙ্গল ও কবি রামপ্রসাদের কাব্যগ্রন্থের মধ্যে প্রাচীন বাংলার 'রায়বেঁশে' যোদ্ধাদের সমর-কৌশলের ও 'বেড়াপাকের' পদ্ধতিতে তাণ্ডব নৃত্যের যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। রবীন্দ্রনাথ এই নৃত্য দেখে মুগ্ধ হয়ে বলেছেন,—'এরকম পুরুষোচিত নাচ দুর্লভ; আমাদের দেশের চিত্তদৌর্বল্য দূর করতে পারবে এই নৃত্য।' বাস্তবিক এই নৃত্য দেখলে এটাকে নটরাজ শিবের রণতাণ্ডব নৃত্যের অবিকল প্রতিরূপ বলে মনে হয়। বাংলার প্রতি গ্রামে এবং প্রতি স্কুলে এই নৃত্য প্রবর্তিত হলে যে শক্তি ও সাহসের দিক দিয়া জাতির প্রভূত মঙ্গল সাধিত হবে তা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে।

কাঠি নৃত্য

বীরভূম অঞ্চলে কাঠি নৃত্য নামক যে নৃত্য প্রচলিত আছে, ইহাতে দুই হাতে দুটি ছোটো কাঠি নিয়ে কয়েকজন লোক গোলাকার বৃত্তের আকারে ঘুরে ঘুরে নেচে থাকে। একজনের কাঠির সঙ্গে আর-একজনের কাঠির ঠকঠকানি আওয়াজের সঙ্গে সঙ্গে মাদল বাজে ও তার সঙ্গে

সহজসরল ভাষায় ও সুরে গানের সঙ্গত হয়। এতে বেশ একটা সুন্দর রসকলার উৎপত্তি হয়। আজকাল অনেক স্কুলেই এই নৃত্যের ও রায়বেঁশে নৃত্যের প্রবর্তন হয়েছে।

ঢালি নৃত্য

যশোহর ও খুলনা অঞ্চলের ঢালি নৃত্য যে রাজা প্রতাপাদিত্যের বিখ্যাত ঢালি যোদ্ধাদের যুদ্ধনৃত্যের লুপ্তাবশেষ তাতে সন্দেহ নাই। ইহাও রায়বেঁশের মতো একটা তাণ্ডব নৃত্য। নর্তকগণ সাধারণত গোল বৃত্তাকারে ঘুরে ঘুরে নৃত্য করে থাকে। মাঝে মাঝে কাঠের তলোয়ার ও বেতের ঢাল নিয়ে দ্বন্দ্বযুদ্ধ হয়। সঙ্গে ঢোল ও কাঁশি বাজে ও মাঝে মাঝে নর্তকেরা হুঙ্কার দিয়ে থাকে। এককালে এই নৃত্য কেবল নমশূদ্রদের মধ্যে প্রচলিত ছিল। আজকাল অনেক মুসলমানও ঢালি নৃত্য করে থাকে।

জারি নৃত্য

মহরম উপলক্ষে মুসলমান পল্লিবাসীগণ যেসকল নৃত্য করে থাকে, সেগুলি পূর্ববঙ্গে জারি নামে প্রচলিত। মৈমনসিংহ জেলার জারি নাচই সবচেয়ে সুন্দর। নর্তকগণ বাম হাতে ধুতির কোঁচা ধরে থাকে এবং প্রত্যেকের ডান হাতে লাল রঙের এক-একটা রুমাল থাকে ও গোলাকারে নৃত্য হয়। বাহির থেকে একজন 'বয়াতি' মূল গানের কাহিনি সুর সহযোগে আবৃত্তি করে ও নর্তকগণ দিশা গেয়ে থাকে। প্রত্যেক নর্তকেরই ডান পায়েতে নূপুর থাকে, নাচ ও গানের সঙ্গে তালে তালে নূপুরের আওয়াজ বড়োই সুন্দর শোনায়। এই জারি নাচও আজকাল অনেক স্কুলে প্রবর্তিত হয়েছে।

বাউল ও কীর্তন

বাংলার বাউল ও কীর্তন নৃত্যের কথা এখানে বেশি বিস্তৃতভাবে বলবার দরকার নাই; কারণ এগুলি প্রায় সকলেই দেখেছেন ও সকলেই জানেন। কিন্তু আমাদের মধ্যে অনেকেরই ধারণা আছে যে, নৃত্যকলা হিসাবে এগুলির বিশেষ কোনো মূল্য নাই। এটা নিতান্ত ভুল। আধ্যাত্মিক ভাবব্যঞ্জনার দিক দিয়া ও সহজসরল গতিভঙ্গির ছন্দের দিক দিয়া এগুলি পৃথিবীর সকল দেশের নৃত্যকলার মধ্যে একটি গৌরবময় স্থান পাবার যোগ্য। কীর্তন নৃত্যের আর-একটি নিজস্ব বৈশিষ্ট্য এই যে, এতে ছোটোবড়ো উচ্চনীচ সব সম্প্রদায়ের লোক একটা অনির্বচনীয় সাম্যের ভাবে যোগ দিয়ে থাকে।

বাউল ও কীর্তন নৃত্যের সঙ্গে যেসকল গান গাওয়া হয় সেগুলি ভাব, সুর ও ছন্দ-গৌরবে পৃথিবীর মধ্যে অনুপম। বাউল ও কীর্তন নৃত্যের সঙ্গে সঙ্গে এই সকল লোকসংগীতের প্রবর্তন বাংলা দেশের প্রত্যেক স্কুলে হওয়া একান্ত প্রয়োজনীয় ও ইহাতে বাংলা দেশে সংগীত-প্রতিভার ও কাব্য-প্রতিভার পুনর্জাগরণের বিশেষ সহায়তা করবে।

অবতার নৃত্য ও ধূপ নৃত্য

ফরিদপুরের চড়ক-গম্ভীরা। পূজার অনুষ্ঠানের অঙ্গস্বরূপ, কায়স্থ, চূর্ণকার, নমশূদ্র ইত্যাদি জাতির মধ্যে যেসকল নাচের প্রচলন আছে তার মধ্যে অবতার নৃত্য ও ধূপ নৃত্য বিশেষ উল্লেখযোগ্য। অবতার-নৃত্যে বাংলা ভাষায় মন্ত্রের আবৃত্তির সঙ্গে সঙ্গে দিকবন্দনা ইত্যাদি করা হয় এবং তারপর দশ অবতারের প্রত্যেকটির অভিনয়মূলক ভঙ্গি শ্লোকের আবৃত্তির সঙ্গে সঙ্গে নৃত্যের আকারে দেখানো হয়। ধূপ নৃত্যটি বৃত্তাকারে হয়। প্রত্যেক নর্তকের বাঁ হাতে থাকে এক-একটি ধুনুচি, তাতে জ্বলন্ত কাঠের উপর ধুনার ছিটা দিতে দিতে নর্তকগণ নৃত্য করতে থাকে। প্রত্যেক ছিটার সঙ্গে ধক করে আগুন জ্বলে উঠে বলে অন্ধকার রাত্রে এই নাচটি বড়োই সুন্দর দেখায়। এই নাচের ভঙ্গিগুলি তাণ্ডবশ্রেণীয়।

উৎস : *প্রবাসী* আশ্বিন ১৩৩৯।

আমাদের চড়ক

অমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ

পুরাতন বৎসর শেষ হইলে নববর্ষের আবির্ভাব হইবে। চৈত্রের শেষ দিনে উভয় বর্ষের সংক্রমণ হয়। এই সংক্রান্তিতে বাংলা দেশে এক উৎসবের অনুষ্ঠান হয়। সেই উৎসব যেন হিন্দুকে বুঝাইয়া দেয় যে, বর্ষচক্র ঘুরিয়া একটি বর্ষের শেষ হইল— সঙ্গে সঙ্গে হইল নববর্ষের শুভ সূচনা। এই রূপককে অবলম্বন করিয়া একটা পর্বের সৃষ্টি হইল কি না বলা যায় না। তবে চৈত্র-সংক্রান্তিতে 'চড়ক উৎসব' বা শিবের গাজন অনুষ্ঠিত হইয়া আসিতেছে। 'চরক' শব্দ 'চক্র' শব্দ হইতেই ব্যুৎপন্ন। চক্র শব্দের স্বরভক্তিতে 'চকর', 'চক্কর'— তাহা হইতে বর্ণবিপর্যয়ে 'চরক'—পশ্চিমাঞ্চলে ইহার রূপান্তর 'চরখ', 'চরখী', 'চরখা'। বাংলায়ও 'চরকী', 'চরকা'র প্রয়োগ আছে। 'চরখ' বাংলায় 'চড়কে' পরিণত হইয়াছে। সুতরাং চড়ক বলিলে চক্র বা ঘূর্ণন-উৎসব বুঝাইবে। আমাদের দেশে চৈত্র-সংক্রান্তিতে অনুষ্ঠিত হইয়া আসিতেছে—দীর্ঘ বাঁশে বা দারুস্তম্ভের মাথায় তরাজুর দাঁড়ির আকারে বাঁধা দণ্ডে এই ঘূর্ণন-উৎসব। এই দণ্ডটির নাম 'চড়ক গাছ'। এটি যেন অত্যল্প সময়ে বহুবার প্রদক্ষিণ বা ঘুরপাক খাইবার কল। কেহ কেহ বলেন তিব্বতিরা যেমন মালাজপের সুবিধা করিবার জন্য কলে ধর্ম-চক্র ঘুরাইয়া অনায়াসে ধর্ম-চক্র প্রবর্তনের কর্তব্য সাধন করে, ধর্মানুষ্ঠানে প্রদক্ষিণ করিবার ব্যাপারটিও এই উৎসব-কালে সম্পাদিত হইয়া থাকে। যাহারা এই উৎসব করে, লোকে তাহাদের 'সন্ন্যাসী' বলে। ব্রাহ্মণ ছাড়া যে-কোনো জাতি গাজনের সন্ন্যাসী হইতে পারে। এই সন্ন্যাসীদের কেহ এক মাস, কেহ ১৫ দিন, কেহ অন্তত ১০ দিন নানাপ্রকার কৃচ্ছ্রসাধন করিয়া নিজেদের পবিত্র করে। সন্ধ্যার পর শিবের মন্ত্র বলিতে বলিতে ধুনা পোড়াইয়া থাকে। এই সন্ন্যাসীদের গৈরিক বস্ত্র পরিতে হয়— একাহারী হইয়া থাকিতে হয়। যেখানে শিবলিঙ্গ আছে ইহারা প্রত্যহ সেখানে গমন করিয়া থাকে এবং বারবার শিবনাম উচ্চারণ করে। যেখানে শিবমন্দির, ইহারা তাহার চারিদিকে নৃত্য করিয়া থাকে। এই সময় ইহারা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকে। গলায় বেশ মোটা উপবীতের গোছা ধারণ করিয়া থাকে। স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে এই সন্ন্যাস করিতে পারে। সন্ন্যাস লইয়া ইহারা শিবের পাটের পূজা করিয়া থাকে। একখানি মাঝারি গোছের তক্তা পরিষ্কার করিয়া তাহাতে সিঁদুর মাখাইয়া শিবের পাট তৈয়ারি করে। ইহারা যেমন শিবের পূজা করে,

শিবের পাটেরও তেমনই পূজা করে। পুরোহিত নিযুক্ত করিয়াই প্রত্যহ পূজা হইয়া থাকে। কখনও কখনও সন্ন্যাসীরা হরগৌরী সাজিয়া শিবের গান গাহিয়া নগরে নগরে ঘুরিয়া বেড়ায়।

পূজাদি অবশ্যকৃত্য শেষ হইলে ইহারা শিবভক্তি দেখাইবার জন্য উঁচু বাঁশের উপর হইতে লাফাইয়া পড়ে। ইহার নাম 'ঝাঁপ'। ঝাঁপ আবার তিনরকম—'ঝুল ঝাঁপ', 'কাঁটা ঝাঁপ', 'বঁটি ঝাঁপ'। বাঁশের তলায় খড়ের গাদা থাকে, তাহার উপর লোহার পেরেক, কাঁটা প্রভৃতি পোঁতা থাকে। কিন্তু সন্ন্যাসীদের গায়ে ওই পেরেক কাঁটা প্রভৃতি ফুটিয়া যায় না— সেগুলি এমনভাবে বাঁকাইয়া পোঁতা থাকে যে; তাহাদের অঙ্গে সেগুলি প্রবেশ করিতে পারে না। কখনও কখনও তাহারা লৌহশলাকা বা বঁটির উপর লাফাইয়া পড়ে। তাহাতে ওই শলাকা বা বঁটির আঘাত লাগিয়া বুক দিয়া রক্ত বাহির হয়।

গিরি-সন্ন্যাস

সংক্রান্তির কয়েক দিন পূর্বে (সাধারণত ৩/৪ দিন পূর্বে) সন্ন্যাসীরা একটা অভিনয়ের আয়োজন করিয়া থাকে। কোথাও কোথাও ইহাও সন্ন্যাসের অঙ্গ। প্রথমে সকলে মিলিয়া 'গন্ধ-মাদন-গিরি' আনয়ন অভিনয় করে। অভিনয়ান্তে সকলে আম্রবৃক্ষতলে আসিয়া উপস্থিত হয়। সেখানে সন্ন্যাসীরা শিবের গান গায় আর মন্ত্র আওড়ায়। শেষে আম্রফল সমেত আমের ডাল ভাঙিয়া আনে।

বাণ-সন্ন্যাস

কোনো কোনো জায়গায় সংক্রান্তির দিন একজন সন্ন্যাসীর বাহু একটি বর্শা দিয়া বিঁধিয়া ফেলা হয় আর একজনের জিহ্বার সহিত একটি লৌহদণ্ড থাকে। লৌহদণ্ডটিকে সেই ব্যক্তি দুই হাতে ধরিয়া থাকে। ইহারা সারাদিন নাচিয়াগাহিয়া কাটায়। সন্ধ্যার পর জলে বাণটি খুলিয়া ফেলে। অসমর্থ হইলে দিনেও খুলিয়া থাকে। এই ব্যাপার 'বাণ-সন্ন্যাস' বলিয়া প্রসিদ্ধ। এই সঙ্গে নীলকণ্ঠের পূজার অনুষ্ঠানও হইয়া থাকে। চড়কের পূর্ব রাত্রে সমস্ত নিস্তব্ধ হইলে সন্ন্যাসীরা ধুনা পোড়াইয়া মাথা চালিয়া শিবের আরাধনা করে। এই সময় কাহারও কাহারও আবার ভাব লাগিয়া যায়। যার দশা হয়, সে একেবারে জ্ঞানশূন্য হইয়া পড়ে এবং অনর্গল বকিতে থাকে। মহাদেবের আবেশ হইয়াছে, এই বিশ্বাসে সকলে তাহার সম্মুখে উৎকর্ণ হইয়া থাকে। স্বয়ং মহাদেব তাহার মুখ দিয়া ভূত-ভবিষ্যতের নানা কথা বলাইয়া থাকেন।

সূত্র-সন্ন্যাসী

ইহারা চামড়ার ভিতর গর্ত করিয়া সুতা বা আস্ত সরু বেত ঢুকাইয়া রাখে। চড়ক পূজার শেষদিনে চড়ক গাছে ঘোরা হয়। ওই দিন বিশ-ত্রিশ ফুট লম্বা একটি বাঁশ বা দারুস্তম্ভ সোজাসুজি মাটির উপর পোঁতা হয়। তাহার মাথায় তরাজুর দাঁড়ির আকারে বাঁধা দণ্ড লাগানো থাকে। ওই দণ্ডের দুইদিকে দুইটি দড়ি বাঁধা থাকে। এই দড়ি দুইটির একটি সন্ন্যাসীর কোমরে হুক দিয়া আটকানো থাকে এবং অপরটি যন্ত্রটিকে ঘুরাইবার জন্য বাঁধা থাকে। তার পর সন্ন্যাসী শূন্যে প্রায় আধ ঘণ্টা ধরিয়া ঘুরিতে থাকে। ঘুরিতে ঘুরিতে সন্ন্যাসী মালা, মিষ্টান্ন প্রভৃতি ছুড়িতে থাকে, একই চড়কগাছে একজনের বেশি যে ঘুরিবে না এমন কোনো নিয়ম নাই। এই কলিকাতা শহরে একশত বৎসর পূর্বে একসময়ে এক চড়কগাছে ষোলো জন ঘুরিয়াছিল। শান্তিপুরে বত্রিশজন পর্যন্ত একসঙ্গে একটি চড়কগাছে ঘুরিয়াছিল। পল্লিগ্রামে এই চড়কগাছের চারিদিকে বেশ বড়ো রকমের হাট বসিয়া থাকে। চড়কতলায় ৭০ বৎসরের বুড়াবুড়ি হইতে আরম্ভ করিয়া পাঁচ বৎসরের বালক-বালিকা পর্যন্ত আসিয়া কৌতুকে যোগদান করে।

সওয়াশো বছর আগে *কলিকাতা গেজেট-এ* চড়কের একটি বিবরণ মুদ্রিত হইয়াছিল। *কলিকাতা রিভিউ-তেও* (১৮শ খণ্ড, ৬৮-৭০পৃ.) আছে। *Good Old Days of Hon'ble John Company, Asiatic Journal* প্রভৃতিও কিছু কিছু বিবরণ দিয়াছে। *সমাচার-দর্পণ* প্রভৃতিতে চড়কের বিভীষিকার

চিত্র আছে। পরমস্নেহভাজন শ্রীমান ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাহাদের কিছু কিছু ছাপিয়াছেন। স্মিথ-লিখিত কেরির জীবনীতেও (পৃ. ২৫৫-৫৬) চড়কের ভয়াবহ দৃশ্যের চিত্র আছে। আমি *কলিকাতা গেজেট*-এর বিবরণের সারমর্ম নিম্নে প্রদান করিলাম। ইহাতে তখনকার চড়কের একটা চিত্র পাওয়া যাইবে।

প্রায় ত্রিশ ফুট লম্বা একটি স্তম্ভ মাটিতে বেশ শক্ত করিয়া পোঁতা থাকে। তাহার উপর একটি কাঠ ঘুরিতে থাকে। ইহাকে 'চড়কগাছ' বলে। কাঠের দুইদিকে দুইটি দড়ি। একদিকের দড়িটি সন্ন্যাসীর পিঠের বঁড়শিতে আটকানো থাকে। এই বঁড়শিটি পিঠের শিরদাঁড়ার দুই পাশের মাংসের ভিতর ঢুকিয়া থাকে। একখানি কাপড় পাকাইয়া খুব শক্ত করিয়া বুকের সহিত বাঁধিয়া বঁড়শিটিকে আটকাইয়া রাখা হয়। এমনিভাবে রাখা হয় যাহাতে শরীরের ভার ও ঘুরানোর গতিতে মাংস কাটিয়া বাহির হইয়া না আসে। মিনিট-পাঁচেক ধরিয়া সন্ন্যাসীটি খুব জোরে ঘোরে। এই অল্প সময়ের মধ্যেই তাহার পিঠের মাংস চার-পাঁচ ইঞ্চি বাহির হইয়া আসে এবং রক্তে কাপড়টি লাল হইয়া যায়। চড়কগাছে উঠিবার সময় সন্ন্যাসীটি একটি থলের ভিতর কলা, ডালিম প্রভৃতি ফল ও নানাবিধ খাদ্যদ্রব্য লইয়া যায়। ঘুরিতে ঘুরিতে ওই খাদ্য ও ফল দর্শকদিগের উপর ফেলিতে থাকে। এইসমস্ত দ্রব্যকে লোকে অতি পবিত্র জ্ঞান করে ও দেবতাদিগের পূজায় উৎসর্গ করে। কাঠের দুইদিকের ভার সমান রাখিবার জন্য অপরদিকের দড়িটি দশ-বারোজন লোক ধরিয়া থাকে।

এই উৎসবটি অনেক দিন ধরিয়া থাকে। কেবল যে প্রৌঢ় ও যুবকেরাই চড়কগাছে উঠিয়া থাকে এমন নহে। চৌদ্দো-পনেরো বৎসরের বালকদের উঠিতে দেখা যায়। কখনও কখনও বালকেরা তাহাদের দুই পাঁজরের মাংসের মধ্যে দিয়া তির ঢুকাইয়া দেয় এবং উন্মত্তভাবে নৃত্য করিতে থাকে। তাহাদের মুখ দেখিয়া বোঝা যায় না যে তাহাদের কষ্ট হইতেছে। বোধ হয় যন্ত্রণা অপনোদনের জন্যই তাহারা নৃত্য করিয়া ভুলিয়া থাকে।

এই সন্ন্যাসীগণ কখনও কখনও জ্বলন্ত কাঠকয়লার উপর নৃত্য করিতে করিতে তাহাদের পায়ে ফোসকা পড়িয়া যায়, কিন্তু তাহারা এমনই উন্মত্ত হয় যে, তাহাদের তাহাতে ভ্রূক্ষেপ থাকে না। আবার সেই জ্বলন্ত কয়লা, তাহারা অধিক ভক্তি দেখাইবার জন্য, হাতে তুলিয়া ধরিয়া যতক্ষণ না কয়লা পুড়িয়া ছাই হইয়া যায় ততক্ষণ নাচে ও গান গায়।

শিবের নিকট মানস করিয়া লোকে এইরূপ কষ্ট স্বীকার করে, সাধারণত সন্তানকামী হইয়াই তাহারা এইরূপ মানস করে।

বাঁকুড়া জিলার সাঁওতালদের মধ্যে এই উৎসবে আরও বীভৎস কাণ্ড হইয়া থাকে। নিম্নে তাহার সামান্য বিবরণ প্রদান করিলাম।

চড়কগাছটি উচ্চে ত্রিশ হাত হইবে। যে লোকটি এই গাছে চড়িবে, তাহার পিঠে যে বঁড়শি বিদ্ধ করিয়া আটকানো হয়, তাহা তিন ইঞ্চি লম্বা। এই বঁড়শিটি এমন আশ্চর্যরকম কৌশলে তাহার পিঠে বিদ্ধ করা হয় যে, পিঠ হইতে অতি সামান্য রক্ত বাহির হয় এবং কখনও কখনও একটুও রক্ত বাহির হয় না। ইহারা ওই বঁড়শি কাপড় দিয়া বা আর কোনোরকমে শক্ত করিয়া বাঁধিয়া রাখে না। ওইভাবেই বঁড়শির সহিত দড়ি বাঁধিয়া চড়কগাছের চারিদিকে প্রবল বেগে ঘুরে। সামান্য পিঠের মাংসের ভিতর বঁড়শিটি আটকাইয়া তাহার উপর সমস্ত দেহের ভার দিয়া ঘুরে। ইহাতে যদি পিঠের মাংস কাটিয়া বঁড়শি খুলিয়া যায়, তাহা হইলে সেই ত্রিশ ফিট উচ্চ হইতে মাটির উপর পড়িয়া যাইবে। তথাপি ইহাদের ভয়ের লেশমাত্র থাকে না, এমনই ইহাদের সাহস। শুধু তাহাই নহে—ইহাদের কষ্টসহিষ্ণুতাও অতি আশ্চর্যজনক, এইভাবে ঘুরিতে থাকিলেও ইহাদের মুখে যন্ত্রণার একটুও ছায়া পড়ে না।

যাহারা চড়কগাছে ঘোরে, তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ শিবের প্রতি ভক্তি দেখাইবার জন্য ওইরূপ করে। কেহ কেহ শিবের নিকট মানস করিয়াও চড়কগাছে চড়িয়া থাকে, আবার অনেকে নিতান্ত কৌতূহলবশত ওই গাছে উঠে—কোনোরূপ মানস করিয়া অথবা শিবের অনুগ্রহ পাইবার জন্য নয়।

ইহাদের মধ্যে আর-এক রকমের চড়কগাছ দেখা যায়, মাটির উপর খুব শক্ত করিয়া দুইটি স্তম্ভ পোঁতা হয়। স্তম্ভ দুইটি পরস্পর হইতে ছয় ফুট ব্যবধানে থাকে। ইহাদের মাথার উপর একটি কাঠের আল রাখা হয়। এই আলের উপর দুইটি আট ফুট উচ্চ দণ্ড থাকে। নীচে মাটির উপর কয়লার আগুন জ্বলিতে থাকে। ইহার পার্শ্বে জানু পাতিয়া বসিয়া পুরোহিত নানাবিধ গন্ধদ্রব্য আগুনে ফেলে। তবে এই চড়কগাছে ঘুরিতে হয় না, ইহাতে দুলিতে হয়। একজন সন্ন্যাসী এক লাফে এই কাঠের আলটি ধরে এবং দণ্ড দুইটির উপর পা রাখিয়া আগুনের ঠিক উপরে মাথা নিচু করিয়া ঝুলিয়া পড়ে। পুরোহিত মন্ত্র পড়িতে থাকে এবং সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য লোক সন্ন্যাসীটিকে একবার আগুনের সম্মুখে ও একবার পশ্চাতে দুলাইতে থাকে। চড়কের উৎসব খুব জাঁকজমকের সহিত ওড়িশায় হইয়া থাকে। এই উৎসবকে উৎকলবাসীরা উরা-পট বলে। ইহাদের এই উরা-পটের একটি মস্ত ইতিহাস আছে।

দক্ষিণ ভারতেও চড়কপূজার রীতি আছে। সেখানে চড়কের নাম চুড্ডেল।

তারকেশ্বরে খুব জাঁকজমক সহকারে চড়কপূজা হইয়া থাকে। চুঁচুড়ায় ষণ্ডেশ্বর মন্দিরের ঠিক সম্মুখে এই উৎসব হইয়া থাকে এবং একটি মেলা বসিয়া থাকে। এই মেলাটি সমস্ত বৈশাখ মাস ধরিয়া থাকে।

সাঁওতাল পরগনায় বৈশাখ মাসে চতাপরব (Chata Parab) নামক একটি উৎসব হয়। এই উৎসবটি আমাদের চড়কপূজার অনুরূপ। তবে আজকাল আর পিঠে বঁড়শি বিঁধাইয়া এই উৎসবে চড়কগাছে ঘোরা হয় না। এখন কোমরে দড়ি বাঁধিয়া উহারা ঝুলিয়া থাকে। পূর্বে কলিকাতায় চারিটি চড়কডাঙা ছিল। একটি ভবানীপুরে, একটি বেলেঘাটায়, একটি বরাহনগরে আর একটি নিমতলার কাছে। এসব জায়গায় আজকাল আর চড়ক হয় না।

চড়কপূজার প্রথম প্রবৃত্তি কেমন করিয়া হইল, তাহা ঠিক বলা যায় না। তবে হরিবংশের বিষ্ণুপর্বে চড়কের কিছু ইঙ্গিত পাওয়া যায়। শোণিতপুরে রাজা বাণ যখন অনিরুদ্ধকে আটকান, সেই সময় শ্রীকৃষ্ণের সহিত বাণের যুদ্ধ বাধে। বাণের ছিল হাজার হাত— কৃষ্ণ সেগুলি বাণে বিদ্ধ করিয়া বাণের মাথা কাটিতে গেলেন, এমন সময় শিবভক্ত বাণের এই দুর্দশা দেখিয়া মহাদেব স্বয়ং উভয়ের মধ্যে দণ্ডায়মান হইয়া বাণকে রক্ষা করেন। বাণ তখন অনবরত নৃত্য করিতে লাগিলেন। আশুতোষ খুশি হইয়া বাণকে বর দিলেন, আমার যে ভক্ত উপবাসী থাকিয়া বাণবিদ্ধ হইয়া নৃত্য করিবে, সে আমার পুত্রত্ব প্রাপ্ত হইবে। বৃহদ্ধর্মপুরাণ উত্তরখণ্ড নবম অধ্যায়ে ব্যবস্থা আছে যে, দেহ সম্পীড়ন করিয়া শিবপূজা করিলে অশ্বমেধ-যজ্ঞের ফল লাভ হয়।

চৈত্রেশিবোৎসবংকুর্যান্নৃত্যগীতমহোৎসবৈঃ।
স্নাত্বাত্রিসন্ধ্যাংরাত্রৌ চ হবিষ্যাশী জিতেন্দ্রিয়ঃ।।
শিবস্বরূপতাং যাতি শিবপ্রীতিকরঃ পরঃ।
ক্ষত্রিয়াদিষু যো মর্ত্যো দেহং সম্পীড্য ভক্তিতঃ।।
অশ্বমেধফলং তস্য জায়তে চ পদে পদে।
সর্বকর্মপরিত্যাগী শিবোৎসবপরায়ণঃ॥
ভক্তৈর্জাগরণং কুর্য্যদ্রাত্রৌ নৃত্যকুতূহলৈঃ।
নানাবিধৈর্মহাবাদ্যৈর্নৃত্যৈশ্চ বিবিধৈরপি॥

নানাবেশবরৈর্নৃত্যৈঃ প্রীয়তে শঙ্করঃ প্রভুঃ।
কিমলভ্যং ভগবতি প্রসন্নে নীললোহিতে॥
তস্মাৎ সর্বপ্রযত্নেন তোষণীয়ো মহেশ্বরঃ।
শঙ্খবাদ্যং শঙ্খতোয়ং বর্জয়েচ্ছিবসন্নিধৌ॥
গ্রামাদ্বহিঃ শিবং শম্ভোরুৎসবং কারয়েন্মুদা।
উপোষ্য হুত্বা সংক্রান্ত্যাং ব্রতমেতৎ সমাপয়েৎ॥

১৮১৪ খ্রিস্টাব্দের কিঞ্চিৎ পূর্বে চড়কের বীভৎস কাণ্ড দেখিয়া পুলিশ ইহা বন্ধ করিবার চেষ্টা করে। কিন্তু ভারতে বড়ো বড়ো শহর ব্যতীত অন্য কোনো স্থানে এই উৎসবের বীভৎস ব্যাপার বন্ধ হয় নাই। অবশেষে ১৮৬৩ খ্রিস্টাব্দের নতুন আইনে এই উৎসব একরকম উঠিয়া গিয়াছে। যেখানে পূজা আছে, সেখানে বাণ বঁড়শি প্রভৃতি বিদ্ধ করিবার প্রথা উঠিয়া গিয়াছে।

উৎস : *'দেশ'*, ১৪ এপ্রিল ১৯৩৪। ১বৈশাখ ১৩৪১। বর্ষ ১ সংখ্যা ২১।
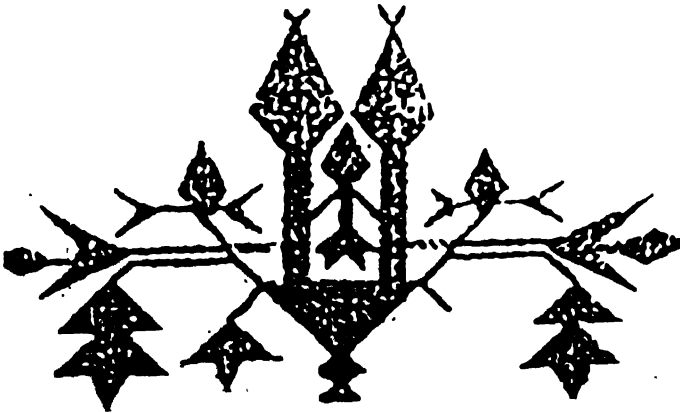
বাংলার লোকসংগীতে হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের সাধনা

হেমাঙ্গ বিশ্বাস

গ্রাম্য গীতিকার পালাগানের শুরুতেই থাকে বন্দনা। বন্দনায় যেমন থাকে দিক বন্দনা :

পুবেতে বন্দনা করলাম পুবের ভানুশ্বর
একদিকে উদয়রে ভানু চৌদিকে পশর।...

ঠিক তেমনই থাকে সভার বন্দনা— পল্লিবাংলার সভা হিন্দু-মুসলিমের মিলিত সভা।

সভা কইর‍্যা বইছ ভাইরে হিন্দু মুসলমান
সভার চরণে আমি জানাইলাম সেলাম।

সেই সুরেরই রেশ টেনে প্রধান গায়ক বা বয়াতি গাইতে থাকেন—

হেদু আর মোছলমান একুই পিণ্ডর দড়ি
কেহ বলে আল্লা রসুল কেহ বলে হরি।
বিছমিল্লা আর গিরিবিষ্টু একুই গেয়ান
দোফাক করি দিয়ে পরভু রাম রহমান

পাণ্ডা পুরোহিত, মোল্লা মৌলানা শাসিত সামন্ত সমাজের আনুষ্ঠানিক ধর্মের আচারবিচার যখন আমাদের কৃষিজীবী খেটে-খাওয়া মানুষের মধ্যে বিভেদের ও বিচ্ছেদের বীজ বপন করেছে, জনসাধারণের কবি তখন বিপরীত জীবনদর্শন প্রচার করে ঐক্য ও সমন্বয়ের বাণী প্রচার করেছেন।

অজানা মুসলমান গ্রাম্যকবি গাজির গীতে গেয়েছেন—

নানা বরণ গাভীরে তার একই বরণ দুধ
জগত ভরমিয়া দেখলাম একই মায়ের পুত।

গ্রামবাংলায় কৃষিজীবী নিরক্ষর মানুষের কাছে গ্রামের কবি এমনই এক মহান বিশ্বমানবতার বাণীকে এমন সহজ অথচ সুগভীর আবেগে প্রচার করেছেন।

মোল্লা মওলানার শরিয়ত শাসন কিংবা সনাতন ব্রাহ্মণ্যধর্মের মনুর বিধানকে অবজ্ঞা করে,

সমাজপতিদের লাঞ্ছনাকে অগ্রাহ্য করে, বৈষ্ণব, সুফি ও সহজিয়া বাউলের ভাবধারার সংমিশ্রণে এক অপূর্ব মানবতত্ত্ব গড়ে উঠেছিল। জাতপাত আচারবিচারের শুকনো বালুচরে তাদের এই নবভাবের বন্যায় যে মানবধর্মের পলিমাটি পড়েছিল তাতে আমাদের পল্লিপ্রান্তর সবুজ প্রাণের ফসলে ভরে উঠেছিল। সাধারণ খেটে-খাওয়া মানুষের এই নিরক্ষর দার্শনিকদের কথা ভাবলেই প্রথমে মনে পড়ে মুসলমান কবিদের কথা— শানাল ফকির, শেখ মদন, শরিয়তি শাহ্ প্রভৃতি নাম শিক্ষিত শহুরে সমাজেও আজ পরিচিত। কিন্তু কত ছোটো বড়ো জ্ঞাত অজ্ঞাত লোককবি দেহের খাঁচার মধ্যে হীরামন পাখির সন্ধান দিয়ে মানবদেহকে পবিত্রতম ঘোষণা করে স্বর্গ ও বেহেশ্‌তের উপরে স্থান দিয়ে গেছেন তার ইয়ত্তা নেই। সৃষ্টিতত্ত্বের শরিয়তি ধারণাকে ওলটপালট করে যখন মুসলমান পল্লিকবি হাসান রাজা বলেন,

আমার আংখি হইতে পয়দা হইল আসমান জমিন

কিংবা হিন্দু কবি মনোমোহন বলেন :

মনোমোহন কয় পেরেশন
পুজে হিন্দু মুসলমান
তরিকৎ মঞ্জিল কইরে আপনে হজরত।

অর্থাৎ প্রেমের পথে নিজের দেহের মঞ্জিলেই হজরতের সন্ধান মেলে, সাম্প্রদায়িক শাসনক্লিষ্ট সমাজে এর ঐক্যসাধনকারী তাৎপর্য ছিল অপরিসীম। শুধু দেহতত্ত্ব নয়, হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে কৃষিজীবী গ্রাম্যবাংলার ভিজে মাটি ও সজল হাওয়ার আবেগের একটি সর্বজনীন পরিমণ্ডল সৃষ্টি হয়েছিল। আরবের কারবালার ফাতেমার চোখের পানি আর বাংলার নিমাই সন্ন্যাসের শচীমাতার বেদনাশ্রু এক মোহানায় মিশে গেছে। হোসেনের ঘোড়াকে সম্বোধন করে ফাতেমার বুকফাটা বিলাপ :

ও ঘোড়া দুলদুলরে দুলদুল
ফিরিয়া আয় ঘরে
আইজের রণ জিতত্যা আইলে
সোনা দিমু তোরে।

কিংবা শচীমাতার আকুতি :

ওরে ও নগরবাসী তোমরানি কেহ্ দেইখাছ নিমাইরে
তোমরানি দেইখাছ নিমাইরে
আমার প্রাণের বাছারে।
সন্ন্যাসী না হইওরে নিমাই
বৈরাগী না হইও।
ঘরে এসে অভাগীরে মা বলে ডাকিও নিমাইরে...

মুর্শিদ মোজাহেদ চান্দে যখন গান—

তোর গৈরবে আমরা গৈরবিনী গো ফাতিমা মা

আবার শেখ মুনশি সেই সুরে যখন গলা মিলান আমার শচীর দুলাল গৌরবে— তখন বিরহ বিধুরা বাংলার ব্যথিত প্রাণের তন্ত্রীতে একই আবেগের কম্পন তোলে আজ।

হাসানের বেটা কাসেমের বিবির যে বিলাপ—

যাইও না যাইও না নাথ আমারে ছাড়িয়া
যুদ্ধে যাইতে ছিল সাধ কেনে করলা বিয়া

তার সাথে ঘরের বধূ বিষ্ণুপ্রিয়ার যে আর্তনাদ— শচীমাতা গো আমি চার জন্মে হুই জন্ম দুঃখিনী— এই দুয়ে মিলে গ্রাম্যবাংলার হাওরে বিলে বারে বারে যে ভাবের ঢেউ উঠেছে, কাটা গাঙের ঘোলাজল তাকে কি ডুবিয়ে দিতে পারে?

এই ভাবের প্রবাহে বাউল কবিদের দান অসামান্য।

বাউল বলতে এক কথায় আমরা যা বুঝি তা বাংলায় সুফি ও বাউলা সাধনার ধারার সমন্বয়ে সৃষ্ট জীবনদর্শন। এই বাউল ও সুফিরা যে মানুষের সন্ধানী হয়েছিলেন তা আপাতদৃষ্টিতে গূঢ় তত্ত্বের ব্যাপার হলেও সামাজিক দৃষ্টিতে তা ছিল জাত পাত ধর্মের উপরে মানবতার প্রতিষ্ঠা। সেই নবমানবতা বাংলার পল্লিসংস্কৃতিতে সেদিন এক নতুন প্রাণে সঞ্জীবিত করেছিল। আজ বাউল-সংগীতের সাধক এবং গবেষকরা তার তত্ত্ব নিয়ে মত্ত। কিন্তু তত্ত্বের ব্যাপার হলে তা লোক-সংগীতের অন্তর্ভুক্ত হতে পারত না। তার সমাজসত্য, সহজ করে দেখা ও গভীর অনুভূতিই লোকমানসে ভাবের ঢেউ তুলেছিল। রবীন্দ্রনাথ তাই মহম্মদ মনসুরউদ্দীনের 'হারামণি'র ভূমিকায় লিখেছেন :

আমাদের দেশে যাঁরা নিজেদের শিক্ষিত বলেন তাঁরা প্রয়োজনের তাড়নায় হিন্দু মুসলমানের মিলনের নানা কৌশল খুঁজে বেড়াচ্ছেন। অন্য দেশের ঐতিহাসিক স্কুলে তাঁদের শিক্ষা। কিন্তু আমাদের দেশের ইতিহাস আজ পর্যন্ত প্রয়োজনের মধ্যে নয়, পরন্তু মানুষ ও অন্তরতর গভীর সত্যের মধ্যে মিলনের সাধনাকে বহন করে এসেছে। বাউল সাহিত্যে বাউল সম্প্রদায়ের সেই সাধনা দেখি, এ জিনিস হিন্দু মুসলমান উভয়েরই। তারা একত্র হয়েছে অথচ কেউ কাউকে আঘাত করেনি। এই মিলনে সভা-সমিতির প্রতিষ্ঠা হয়নি, এই মিলনে গান জেগেছে। এই গানের ভাষা ও সুর অশিক্ষিত মাধুর্যে সরস। বাংলা দেশের গ্রামের গভীর চিত্তে উচ্চ সভ্যতার প্রেরণা, স্কুল কলেজের অগোচরে আপনা আপনি কীরকম কাজ করে এসেছে, হিন্দুমুসলমানের জন্য এক আসন রচনার চেষ্টা করেছে, এই বাউল গানে তারই পরিচয় পাওয়া যায়।

যশোহরের পাঞ্জ শাহ্ ছিলেন তেমনই এক সুফি বাউল। গোঁড়া সমাজপতিদের দ্বারা নিগৃহীত হয়ে গেয়েছিলেন :

জেতের বড়াই কি,
ইহকালে পরকালে জেতে করে কি।
আমার মন বলে অগ্নি জ্বেলে দিই জেতের মুখি,
এক জেতের বোঝা লয়ে
চিরকাল কাটালাম মানী মানুষ হয়ে,
মানের গৌরব, কুলের গৌরব
ধন্ধবাজি সব দেখি।
লোকে পেটের জ্বালায় দেশান্তরী হয়,
হিন্দু মুসলমানের বোঝা মাথায় করে রয়,
কার বা জাতে কেবা দেখে ঘরে এলে চিহ্ন কি।

'আমার মন বলে অগ্নি জ্বেলে দিই জেতের মুখি'— বাউল তত্ত্বের অন্তরাল থেকে ক্রোধে অভিমানে বেরিয়ে আসা এই গান মনে করিয়ে দেয় বিদ্রোহী কবি নজরুলের— জাতের নামে বজ্জাতি সব জাত জালিয়াত খেলছে জুয়া। কিন্তু এ বিষয়ে লালন শাহের তুলনা নেই। আমাদের

অতি পরিচিত মরমিয়া লালন ফকির সমাজের অতি নীচুতলা থেকে উপরতলার বিভেদকারী ধর্মবুদ্ধিকে তীব্র চ্যবুক হেনেছেন। হিন্দু-মুসলমানের উর্ধ্বে এক মানবধর্ম প্রতিষ্ঠা ছিল তাঁর সাধনা।

ফঁকিরি করিবি ক্ষেপা কোন্ রাগে,
আছে হিন্দু-মুসলমান দুই ভাগে।
থাকে ভেস্তের আশায় মমিনগণ,
হিন্দুরা দেয় স্বর্গেতে মন,
ভেস্ত স্বর্গ ফাটক সমান,
— কার বা তা ভালো লাগে।

তার পরেই তাঁর জীবনদর্শন যে মানবতত্ত্ব তা অতি পরিষ্কারভাবে প্রচার করেছেন :

মানবতত্ত্ব যার সত্য হয় মনে
সে কি অন্য তত্ত্ব মানে!
মাটির ডিপি কাঠের ছবি
ভূতভাবে সব দেবাদেবী,
ভোলে না সে এসব রূপি
ও যে মানুষ রতন চেনে।
জিন ফেরেস্তার খেলা
পেঁচাপেঁচি আলা ভোলা
তার নয়ন হয় না ভোলা
(ও সে) মানুষ ভজে দিব্যজ্ঞানে। ইত্যাদি

পারস্যের যে কবি শরিয়তের শাসনকে অবজ্ঞা করে একদিন বলেছিলেন 'আনাল হক' 'আমিই সত্য' এবং তদানীন্তন ধর্মজীবীদের দ্বারা আগুনে নিক্ষিপ্ত হয়েছিলেন, গল্পে আছে, তাঁর ছাইয়ের সঙ্গে আনাল হক ধ্বনি বাতাসে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। বাংলার মাটিতে সে ছাই এসে লালনের মতো বহু কবির জন্ম দিয়েছে। সামন্ত সমাজের অচলায়তনের মধ্যে এই ফকিরেরা গণচেতনার নির্ভুল ফরমান। তাই সাধারণ মানুষের মধ্যে এই জীবনদর্শন এমনই ছড়িয়ে পড়েছিল।

আমাদের দেশের সর্বধর্মসমন্বয়বাদীদের চেয়ে এই বাউলরা ছিলেন অনেক অগ্রসর। সমন্বয়বাদীদের মন্দিরে গির্জায় মসজিদে সর্বত্রই সত্য আছে, এরা দেবাদেবী, জিন ফেরেশতা সবই সত্য বলে জোড়াতালি তত্ত্ব দিয়ে সমন্বয় সাধনের ব্যর্থ চেষ্টা করেছেন।

কিন্তু সহজিয়া সুফি বাউলরা সে তুলনায় ছিলেন বিপ্লবী। তাঁরা মন্দির মসজিদ-মার্কা ধর্মে অনাস্থা প্রকাশ করেছেন।

মদন বাউল অত্যন্ত জোরালো ভাষায় গেয়েছেন :

তোমার পথ ঢেক্যাছে মন্দিরে মসজিদে
ও তার ডাক শুনে সাই চলতে না পাই
আমায় রুখে দাড়ায় গুরুতে, মুরশেদে।।

কিংবা

মোর যাইতে তো চায় না মন মক্কা-মদিনা
বন্ধু আমার কাছে আমি রইব তারি কাছে,

পাগল হইতাম ঘরে রইতাম
তারে চিনতামরে যদি না।
(আমার) নাই মন্দির কি মসজিদ
নাই পূজা কি বকরিদ
তিলে তিলে মোর মক্কা কাশী
পলে পলে সুফিনা।

যাঁরা বাউলতত্ত্ব আলোচনা করেন, ইড়া, পিঙ্গলা, সুষুম্নার ত্রিবেণি সংগমের কিংবা সুফিদের আবহায়াতের নির্ঝরিণীর গুহ্য ধারার সন্ধান বিশ্লেষণ করেন, তাঁরা এই তত্ত্বের সামাজিক ও মানবিক তাৎপর্যের এ দিকটাকে অবহেলা করে যান। বরঞ্চ 'হিন্দু ধারা' ও 'মুসলিম ধারা'র অনুসন্ধান করে লোকসংগীতের এই সবল ঐতিহ্যকে অবজ্ঞা করে পরোক্ষভাবে সাম্প্রদায়িকতাকে প্রশ্রয় দেন।

কিন্তু মাটির ঢিপি আর কাঠের ছবি বা জিন ফেরেশতার শাসন সমাজে আজও অব্যাহত হয়ে রইল। কারণ সামন্ত সমাজেরই ক্ষুধিত পাষাণের উপর গজিয়ে উঠল বিদেশি মূলধনের মুতসুদ্দিদের মোতিমহল। এখানে এ আলোচনায় ঢুকতে চাই না।

বাউলদের মানবতাবাদ হয়তো আজকের সমস্যা সমাধানের পথে সাম্প্রদায়িকতার দুষ্ট ব্রণের উপর অস্ত্রোপচারে অসমর্থ। সেজন্য চাই জনতার শ্রেণিসংগ্রামের নতুন জীবনদর্শন। কিন্তু আমাদের পল্লিকবিদের বলিষ্ঠ ঐতিহ্যের উপরেই গড়ে উঠবে এই নতুন জীবনবেদ।

বাঙ্গালার কথা

আজ বাঙ্গালির মহাসভায় আমি বাঙ্গালার কথা বলিতে আসিয়াছি, আপনারা আমাকে আহ্বান করিয়াছেন, আপনাদের আদেশ শিরোধার্য। আজ এই মিলনমন্দিরে আমার যোগ্যতা অযোগ্যতা লইয়া জটিল কুটিল অনেক প্রকারে বিচারের মধ্যে বিনাইয়া বিনাইয়া বিনয় প্রকাশ করিয়া আমার ও আপনাদের সময় অযথা নষ্ট করিব না। দেশের নায়ক হইবার অধিকারের যে অহংকার, তাহা আমার নাই, কিন্তু আমার বাঙ্গালাকে আমি আশৈশব সমস্ত প্রাণ দিয়া ভালোবাসিয়াছি, যৌবনে সকল চেষ্টার মধ্যে আমার সকল দৈন্য, সকল অযোগ্যতা, অক্ষমতা সত্ত্বেও আমার বাঙ্গালার যে মূর্তি, তাহা প্রাণে প্রাণে জাগাইয়া রাখিয়াছি, এবং আজ এই পরিণত বয়সে আমার মানসমন্দিরে সেই মোহিনী মূর্তি আরও জাগ্রত জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে! এই যে আশৈশব ও আজীবন শ্রদ্ধা, ভক্তি, প্রেম ও ভালোবাসা, তাহার অভিমান আমার আছে। সেই প্রেম জ্বলন্ত প্রদীপের মতো আমাকে পথ দেখাইয়া দিবে! আপনাদের সকলের সমবেত যে যোগ্যতা, তাহাই আমাকে আশ্রয় করিয়া আমাকে যোগ্য করিয়া তুলিবে।

সেই ভরসায় আজ আমি আপনাদের সম্মুখে বাঙ্গালার কথা বলিতে আসিয়াছি। যে কথাগুলি অনেকদিন ধরিয়া আমার প্রাণে জাগিয়াছে, যেসব কথা আমার জীবনের সকল রকমের চেষ্টা ও অভিজ্ঞতার মধ্যে আরও ভালো করিয়া উপলব্ধি করিয়াছি, যে কথাগুলিকে সত্য বলিয়া জীবনের ধ্যানধারণার বিষয় করিয়াছি, সেসব কথাগুলি আপনাদের কাছে নিবেদন করিব। যাহা সত্য বলিয়া হৃদয়ংগম করিয়াছি, তাহা প্রকাশ করিতে আমার কোনো ভয় হয় না। লজ্জা হয় না। হয়তো আমাদের শাসনকর্তাদের কাছে আমার অনেক কথা অপ্রিয় লাগিবে, হয়তো আমার অনেক কথার সঙ্গে আপনাদের অনেকের মনের মিল হইবে না। কিন্তু 'সত্যম্ ব্রুয়াৎ প্রিয়ম্ ব্রুয়াৎ ন ব্রুয়াৎ সত্যম্ অপ্রিয়ম্' এই বচনের এমন অর্থ নহে যে, যাহা সত্য বলিয়া উপলব্ধি করিয়াছি এবং যাহা প্রকাশ করিবার আবশ্যকতা আছে, তাহা করিব না। সে তো কাপুরুষের কথা, দেশভক্তের রীতি নহে। যে সত্য আমার হৃদয়ের মধ্যে জ্বলিতেছে, যাহাকে চক্ষের সম্মুখে দেখিতে পাইতেছি, তাহাকে ঢাকিয়া

রাখিতে হইলে যে পাটোয়ারি বুদ্ধির আবশ্যক, তাহা আমার নাই। আর নাই বলিয়া তার জন্য কোনো অনুতাপও হয় না। তাই আজ যে কথাগুলি সত্য বলিয়া বিশ্বাস করি, সেই কথাগুলি প্রিয়ই হউক, কী অপ্রিয়ই হউক, অম্লানবদনে অকুণ্ঠিত চিত্তে আপনাদের কাছে নিবেদন করিব।

প্রথমেই হয়তো অনেকেরই মনে হইবে যে এই মহাসভা শুধু রাজনৈতিক আলোচনার জন্য, এই সভায় বাঙ্গালার কথার আবশ্যক কী? এই প্রশ্নই আমাদের ব্যাধির একটি লক্ষণ। সমগ্র জীবনটাকে টুকরা টুকরা করিয়া ভাগ করিয়া লওয়া আমাদের শিক্ষা-দীক্ষা ও সাধনের স্বভাববিরুদ্ধ। আমরা ইউরোপ হইতে ধার করিয়া এই প্রথা অবলম্বন করিয়াছি এবং এই ধার-করা জিনিস ভালো করিয়া বুঝি নাই বলিয়া আমাদের অনেক পরিশ্রম, অনেক চেষ্টাকে সার্থক করিতে পারি নাই। যে জিনিসটাকে আমরা রাজনীতি বা politics বলিতে অভ্যস্ত হইয়াছি, তাহার সঙ্গে কি সমস্ত বাঙ্গালাদেশের, সমগ্র বাঙ্গালি জাতির একটা সর্বাঙ্গীণ সম্বন্ধ নাই? কেহ কি আমাকে বলিয়া দিতে পারে, আমাদের জাতীয় জীবনের কোন্ অংশটা রাজনীতির বিষয়, কোন্ অংশটা অর্থনীতির ভিত্তি, কোন্ অংশটা সমাজনীতির প্রাণ, আর কোন্ অংশটা ধর্মসাধনের বস্তু? জীবনটাকে মনে মনে খণ্ডবিখণ্ড করিয়া, এইসব মনগড়া জীবন-খণ্ডের মধ্যে কি আমরা অলঙ্ঘ্য প্রাচীর তুলিয়া দিব? এই কাল্পনিক প্রাচীরবেষ্টিত যে কাল্পনিক জীবন-খণ্ড, ইহারই মধ্যে কি আমাদের রাজনৈতিক আলোচনা বা সাধনা আরব্ধ থাকিবে? আমাদের রাজনৈতিক আলোচনা বা আন্দোলনের যে বিষয়, তাহাকে কি বাঙ্গালি জাতির যে জীবন, সেই জীবনের সব দিক দিয়া দেখিতে চেষ্টা করিব না? যদি না দেখি তবে কি সত্যের সন্ধান পাইব?

কথাটা একটু তলাইয়া দেখিলে বেশ স্পষ্ট করিয়া বোঝা যায়। রাজনীতি কাহাকে বলে? এই বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য কী? আমাদের সাধনায় ইহার কোনো বিশিষ্ট নাম নাই, আমাদের পূর্বপুরুষগণ ইহার নামকরণ করার আবশ্যকতা মনে করেন নাই। ইউরোপীয় সাধনায় যাহাকে রাষ্ট্রবিজ্ঞান বলে, তাহার উদ্দেশ্য সংক্ষেপে বলিতে গেলে রাজায়প্রজায় যে সম্বন্ধ, তাহা নির্ণয় করা এবং এই সম্বন্ধের মধ্যে যে একটা নিত্য সার্বভৌমিক সত্য নিহিত আছে, তাহাকে প্রকাশ করা। ওই মতে রাজনৈতিক আন্দোলন বা আলোচনার বিষয় কোনো জাতির বা দেশের পক্ষে রাজাপ্রজায় কীরকম সম্বন্ধ হওয়া উচিত, তাহাই বিচার করা। বাঙ্গালার রাজনৈতিক আন্দোলনের অর্থ এই যে, আমাদের দেশে রাজাপ্রজায় যে সম্বন্ধ, তাহা পরীক্ষা করা ও কীরূপ হওয়া উচিত, তাহাই বিচার করা। অর্থাৎ সমস্ত রাজ্যটা সদ্ভাবে ও সৎপথে চালনা করিতে হইলে যে শক্তির প্রয়োজন, তাহা কতটা রাজার হাতে থাকিবে, কতটা প্রজার হাতে থাকিবে, তাহাই বিচার ও নির্ণয় করা।

কিন্তু ওই যে রাষ্ট্রীয় চিন্তা বা চেষ্টা, ইহার সার্থকতা কোথায়? এককথায় বলিতে হইলে, যে কথা অনেকবার শুনিয়াছি, তাহাই বলিতে হয়, বাঙ্গালিকে মানুষ করিয়া তোলা। বাঙ্গালি যে অমানুষ, তাহা আমি কিছুতেই স্বীকার করি না। আমি যে আপনাকে বাঙ্গালি বলিতে একটা অনির্বচনীয় গর্ব অনুভব করি, বাঙ্গালির যে একটা নিজের সাধনা আছে, শাস্ত্র আছে, দর্শন আছে, কর্ম আছে, ধর্ম আছে, বীরত্ব আছে, ইতিহাস আছে, ভবিষ্যৎ আছে! বাঙ্গালিকে যে অমানুষ বলে, সে আমার বাঙ্গালাকে জানে না। কিন্তু এই ক্ষেত্রে ধরিয়া লওয়া যাক যে, বাঙ্গালির কতকগুলো দোষ আছে, যাহার সংশোধন আবশ্যক এবং সেইভাবে ধরিয়া লওয়া যাক যে, বাঙ্গালি মানুষ। তাহাকে মানুষ করিয়া তোলাই রাষ্ট্রীয় চেষ্টা বা চিন্তার উদ্দেশ্য, এবং সেইজন্যই আমাদের দেশে রাজাপ্রজায় যে সম্বন্ধ হওয়া উচিত, তাহা বিচার করা আবশ্যক। কিন্তু আমাদের দেশে রাজাপ্রজায়

কী সম্বন্ধ হওয়া উচিত, তাহা বিচার করিতে গেলে, আমাদের যে এখন ঠিক কী অবস্থা, তাহার বিচার করিতেই হইবে। সেই বিচার করিতে হইলে, আমাদের আর্থিক অবস্থা কীরূপ, তাহা বিচার করিতেই হইবে। সেই বিচার করিতে হইলে, আমাদের চাষাদের চাষের সন্ধান লইতে হইবে। আমাদের চাষের সন্ধান ভালো করিয়া লইতে হইলে, আমাদের চাষ বাড়িতেছে কি কমিতেছে, তাহার খোঁজ রাখিতে হইবে। সেই কারণ অনুসন্ধান করিতে করিতে দেখিতে হইবে, কেন আমাদের পল্লিগ্রাম ছাড়িয়া অনেক লোক শহরে আসিয়া বাস করে, সেই কারণ অনুসন্ধান করিতে হইলে বিচার করিতে হইবে যে, সে কি পল্লিগ্রামের অস্বাস্থ্যের জন্য, কি অন্য কোনো কারণে? সেই সঙ্গে সঙ্গে অস্বাস্থ্যের কারণ অনুসন্ধান করা আবশ্যক হইবে। ইহাতেই দেখা যাইতেছে যে, রাজনীতির সাধন করিতে হইলে আমাদের চাষাদের অবস্থা চিন্তা করা আবশ্যক এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের গ্রামের অস্বাস্থ্যের কারণ অনুসন্ধান করাও আবশ্যক।

সেই সঙ্গে সঙ্গে ইহাও বিচার করিতে হইবে, আমাদের দেশে যত চাষযোগ্য জমি আছে, সব ভালো করিয়া চাষ করিলেও আমাদের অবস্থা সহজ সচ্ছল হয় কি না। যদি না হয়, তবে ব্যাবসাবাণিজ্যের কথা আলোচনা ও বিচার করিতে হইবে।

এইসব কথা ভালো করিয়া বুঝিতে হইলে আমাদের চাষের প্রণালী কীরূপ ছিল, আমাদের ব্যাবসাবাণিজ্যের অবস্থা পূর্বে কীরূপ ছিল, কেমন করিয়া গ্রামের স্বাস্থ্য রক্ষা করিতাম, এসব কথা তলাইয়া বুঝিতে হইবে।

শুধু তাহাই নহে, আমাদের শিক্ষাদীক্ষার কথা আলোচনা করিতে হইবে। কেমন করিয়া শিক্ষা বিস্তার করিতাম, কেমন করিয়া আমরা আপনাকে শিক্ষিত করিয়া লইতাম এবং এখন বর্তমান অবস্থায় আমাদের শিক্ষাপ্রণালী কীরকম হওয়া উচিত, রাজনীতির সঙ্গে সঙ্গে এইসব কথারই বিচার আবশ্যক।

শুধু তাহাই নহে। আমাদের কৃষিকার্য, ব্যাবসাবাণিজ্য ও শিক্ষাদীক্ষার সঙ্গে আমাদের সমাজের কী সম্বন্ধ ছিল এবং তাহাতে আমাদের কতটা উপকার, কতটা অপকার সাধিত হইতেছে, এ কথাকেও তাচ্ছিল্য করা যায় না। কী সম্বন্ধ ছিল, তাহা ভালো করিয়া না বুঝিতে পারিলে আমাদের বর্তমান অবস্থায় কী সম্বন্ধ থাকা উচিত, কীরূপে তাহার মীমাংসা হইবে? এই প্রশ্নের মীমাংসা যদি না করা যায়, তবে রাষ্ট্রীয় শক্তির কতটা রাজার হাতে, কতটা আমাদের হাতে থাকা উচিত, এই প্রশ্নের বিচারই বা কেমন করিয়া হইবে?

শুধু ইহাই নহে। আমাদের কৃষিকার্য হইতে আরম্ভ করিয়া বড়ো বড়ো সামাজিক ব্যবহার পর্যন্ত আমাদের সকল ভাব, সকল ভাবনা, সকল চেষ্টা ও সকল সাধনার সঙ্গে আমাদের ধর্মের কী সম্বন্ধ ছিল ও আছে, তাহার বিচার অবশ্যকর্তব্য। সেদিকে চোখ না রাখিলে সব দিকই যে অন্ধকার দেখিব! সব প্রশ্নই যে অকারণে অস্বাভাবিকভাবে জটিল ও কঠিন হইয়া উঠিবে। সেই দিকে দৃষ্টি না রাখিলে কোনো মীমাংসাই সম্ভবপর হইবে না।

আমাদের অনেক বাধা, অনেক বিঘ্ন। কিন্তু আমাদের সবচেয়ে বেশি বিপদ যে, আমরা ক্রমশই আমাদের শিক্ষাদীক্ষা, আচারব্যবহারে অনেকটা ইংরেজি ভাবাপন্ন হইয়া পড়িয়াছি। রাজনীতি বা politics শব্দটি শুনিবামাত্র, আমাদের দৃষ্টি আমাদের দেশ একেবারে অতিক্রম করিয়া ইংল্যান্ডে গিয়া পঁহুছায়। ইংরেজের ইতিহাসে এই রাজনীতি যে আকার ধারণ করিয়াছে, আমরা সেই মূর্তিরই অর্চনা করিয়া থাকি। বিলাতের জিনিসটা আমরা যেন একেবারে তুলিয়া আনিয়া এই দেশে লাগাইয়া দিতে

পারিলেই বাঁচি। এ দেশের মাটিতে তাহা বাড়িবে কি না, তাহা তো একবারও ভাবি না। Burke-এর বুলি যাহা স্কুলেকলেজে মুখস্থ করিয়াছিলাম, তাহাই আওড়াই, Gladstone-এর কথামৃত পান করি আর মনে করি, ইহাই রাজনৈতিক আন্দোলনের চরম। Seely-র *Expansion of England* নামে যে পুস্তক আছে, তাহা হইতে বাছা বাছা বচন উদ্ধার করি। Sidgwick-এর কেতাব হইতে কথার ঝুড়ি টানিয়া বাহির করি, ফরাসি স্কুল, জার্মান স্কুল এবং ইউরোপ রাজনীতির যত স্কুল আছে, সব স্কুলের কেতাবে, *কোরান*-এ যত ধারালো বাক্য আছে, একেবারে এক নিশ্বাসে মুখস্থ করিয়া ফেলি, আর মনে করি, এইবার আমরা বক্তৃতা ও তর্কে অজেয় হইলাম, দেখি আমাদের শাসনকর্তারা কেমন করিয়া আমাদের তর্ক খণ্ডন করেন। মনে করি, রাজনৈতিক আন্দোলন শুধু তর্কবিতর্কের বিষয়— বক্তৃতার ব্যাপার মাত্র। আমরা তর্ক করিয়া, বক্তৃতা করিয়া জিতিয়া যাইব। আমাদের সকল উদ্যম ও সকল চেষ্টার উপরে আমাদের ধার করা কথার ভার চাপাইয়া দিই। যাহা স্বভাবত সহজ সরল, তাহাকে মিছামিছি বিনা কারণে জটিল করিয়া তুলি। শুধু যাহা আবশ্যক, তাহা করি না; দেশের প্রতি মুখ তুলিয়া চাই না, বাঙ্গালার কথা ভাবি না, আমাদের জাতীয় জীবনের ইতিহাসকে সর্বতোভাবে তুচ্ছ করি আমাদের বর্তমান অবস্থার দিকে একেবারেই দৃক্‌পাত করি না। কাজেই আমাদের রাজনৈতিক আন্দোলন অসার, বস্তুহীন। তাই এই অবাস্তব আন্দোলনের সঙ্গে আমাদের দেশের প্রাণের যোগ নাই, এই কথা হয়তো অনেকে স্বীকার করিবেন না।

কিন্তু স্বীকার না করিলেই কি কথাটা মিথ্যা হইয়া যাইবে? আমরা চোখ বুজিয়া থাকিলেই কি কেহ আমাদের দেখিতে পাইবে না? আমরা যে শিক্ষিত বলিয়া অহংকার করি, আমরা দেশের কতটুকু স্থান অধিকার করিয়া থাকি? আমরা কয় জন? দেশের আপামর সাধারণের সঙ্গে আমাদের কোথায় যোগ? আমরা যাহা ভাবি, তাহারা কি তাই ভাবে? সত্য কথা বলিতে হইলে কি স্বীকার করিব না যে, আমাদের উপর আমাদের দেশবাসীদের সেরূপ আস্থা নাই? কেন নাই? আমরা যে ভিতরে ভিতরে ইংরেজি ভাবাপন্ন হইয়াছি। আমরা যে ইংরেজি পড়ি ও ইংরেজিতে ভাবি এবং ইংরেজি তরজমা করিয়া বাঙ্গালা বলি ও লিখি, তাহারা যে আমাদের কথা বুঝিতে পারে না। তারা মনে করে, নকলের চেয়ে আসলই ভালো। আমরা যে তাহাদের ঘৃণা করি। কোন্ কার্যে তাহাদের ডাকি? Government-এর কাছে কোনো আবেদন করিতে হইলে তাহাদের গায়ে হাত বুলাইয়া একটা বিরাট সভার আয়োজন করি, কিন্তু সমস্ত প্রাণ দিয়া কোন্ কাজে তাহাদের ডাকি? আমাদের কোন্ কমিটিতে কোন্ সমিতিতে চাষা সভ্য-শ্রেণিভুক্ত? কোন্ কাজ তাহাদের জিজ্ঞাসা করিয়া, তাহাদের মত লইয়া করি? যদি না করি, তবে কেন অবনতমস্তকে আমাদের ত্রুটি স্বীকার করিব না? কেন সত্য কথা বলিব না? মিথ্যার উপর কোনো সত্য বা সত্ত্ব প্রতিষ্ঠা করা যায় না। তাই বলিতেছিলাম, আমাদের যে রাজনৈতিক আন্দোলন, ইহা একটা প্রাণহীন, বস্তুহীন, অলীক ব্যাপার। ইহাকে সত্য করিয়া গড়িতে হইলে বাঙ্গালার সব দিক দিয়াই দেখিতে হইবে। বাঙ্গালার যে প্রাণ, তাহারই উপর ইহার প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। তাই বলিতেছিলাম, আজ এই মহাসভায় আমি বাঙ্গালার কথা বলিতে আসিয়াছি।

কিন্তু আমি যে বিপদের কথা বলিয়াছি, তাহার জন্য নিরাশ হইবার কোনোই কারণ নাই। আমাদের এ অবস্থা প্রকৃতপক্ষে অস্বাভাবিক হইলেও ইহার যথাযথ কারণ আছে। ইংরাজ যখন প্রথমে আমাদের এদেশে আসে তখন নানা কারণে আমাদের জাতীয় জীবন দুর্বলতার আধার হইয়াছিল। তখন আমাদের ধর্ম একেবারেই নিস্তেজ হইয়া পড়িয়াছিল। একদিকে চিরপুরাতন

চিরশক্তির আকর সনাতন হিন্দুধর্ম কেবলমাত্র মৌখিক আবৃত্তি ও আড়ম্বরের মধ্যে আপনার শিব-শক্তিকে হারাইয়া ফেলিয়াছিল; অপরদিকে যে অপূর্ব প্রেমধর্মবলে মহাপ্রভু সমস্ত বাঙ্গালা দেশকে জয় করিয়াছিলেন, সেই প্রেমধর্মের অনন্ত মহিমা ও প্রাণসঞ্চারিণী শক্তি কেবলমাত্র তিলক-কাটা ও মালা-ঠকঠকানিতেই নিঃশেষিত হইয়া যাইতেছিল। বাঙ্গালার হিন্দুর সমগ্র ধর্মক্ষেত্র শক্তিহীন শাক্ত ও প্রেমশূন্য বৈষ্ণবের ধর্মশূন্য কলহে পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। তখন নবদ্বীপের চিরকীর্তিময় জ্ঞানগৌরব কেবলমাত্র ইতিহাসের কথা— অতীত কাহিনি। বাঙ্গালি জীবনের সঙ্গে তাহার কোনো সম্বন্ধ ছিল না। এইরূপে কী ধর্মে, কী জ্ঞানে বাঙ্গালার হিন্দু তখন সর্ববিষয়ে প্রাণহীন হইয়া পড়িয়াছিল। আলিবর্দি খাঁর পর হইতেই বাঙ্গালার মুসলমানও ক্রমশ নিস্তেজ হইয়া পড়িয়াছিল এবং এই সময় তাহাদের সকল জ্ঞান ও সকল শক্তি বলহীনের বিলাসে ভাসিয়া গিয়াছিল। এমন সময় সেই ঘোর অন্ধকারের মধ্যে ইংরেজ বণিক-বেশে আগমন করিল এবং অল্পদিনের মধ্যেই রাজত্ব স্থাপন করিয়া অসাধারণ শক্তির পরিচয় দিল। আমাদের জাতীয় দুর্বলতানিবন্ধন আমরা ইংরেজ রাজত্বের সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত ইংরেজ জাতিকে ও তাহাদের সভ্যতা ও তাহাদের বিলাসকে বরণ করিয়া লইলাম। দুর্বলের যাহা হয়, তাহাই হইল। ইংরেজি সভ্যতার সেই প্রখর আলোক সংযতভাবে ধারণ করিতে পারিলাম না। অন্ধ হইয়া পড়িলাম। অন্ধকারাক্রান্ত দিগ্‌ভ্রান্ত পথিক যেমন বিস্ময়ে ও মোহবশত আপনার পদপ্রান্তস্থিত সুপথকে অনায়াসে পরিত্যাগ করিয়া বহুদূর দুর্গম পথকে সহজ ও সন্নিকট মনে করিয়া, সেই পথেই অগ্রসর হয়, আমরাও ঠিক সেইরূপ নিজের ধর্মকর্ম সকলই অবলীলাক্রমে পরিত্যাগ করিয়া, নিজের শাস্ত্রকে অবজ্ঞা করিয়া, নিজের সাহিত্যকে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করিয়া, আমাদের জাতীয় ইতিহাসের ইঙ্গিতকে সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা করিয়া ইংরেজের সাহিত্য, ইংরেজের ইতিহাস, ইংরেজের জ্ঞান ও বিজ্ঞানের দিকে নিতান্ত অসংযতভাবে ঝুঁকিয়া পড়িলাম। সেই ঝোঁক অনেকটা কমিয়া আসিয়াছে সত্য, কিন্তু এখনও একেবারে যায় নাই। রামমোহন যে দেশে 'বিজ্ঞানের তূর্যধ্বনি' করিয়াছিলেন, আমরা তাহাই শুনিয়াছিলাম বা মনে করিয়াছিলাম শুনিয়াছি, অন্ততপক্ষে বিজ্ঞানের বুলি আওড়াইতে আরম্ভ করিলাম। কিন্তু রামমোহন যে গভীর শাস্ত্রালোচনায় জীবনটাকে ঢালিয়া দিয়াছিলেন, তাহার দিকে তো আমাদের চোখ পড়ে নাই। তিনি যে আমাদের সভ্যতা ও সাধনার মধ্যে আমাদের উদ্ধারের পথ খুঁজিয়াছিলেন, সে কথা তো আমরা একবারও মনে করি নাই। তার পর দিন গেল। আমাদের স্কুল, কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইল, আমাদের ঝোঁকটা আরও বাড়িয়া গেল। তার পর বঙ্কিম, সর্বপ্রথমে বাঙ্গালার মূর্তি গড়িলেন— প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিলেন। বঙ্গজননীকে দর্শন করিলেন। সেই 'সুজলাং সুফলাং মলয়জশীতলাং শস্যশ্যামলাং মাতরম্' তাহারই গান গাহিলেন। সবাইকে ডাকিয়া বলিলেন, 'দেখো দেখো, এই আমাদের মা, বরণ করিয়া ঘরে তোলো'। কিন্তু আমরা তো তখন সে মূর্তি দেখিলাম না; সে গান শুনিলাম না। তাই বঙ্কিম আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছিলেন, 'আমি একা মা মা বলিয়া রোদন করিতেছি'। তার পর শশধর তর্কচূড়ামণির হিন্দুধর্মের পুনরুত্থানের আন্দোলন। এই আন্দোলন সম্বন্ধে আমাদের দেশে অনেক মতভেদ আছে। কেহ বলেন, উহা আমাদের দেশের অনেক অনিষ্ট করিয়াছিল, আবার কেহ কেহ বলেন আমাদের অশেষ উপকার সাধন করিয়াছিল। সেসব কথা লইয়া আলোচনা করা আমি আবশ্যক মনে করি না। এই আন্দোলন যে অনেক দিকে একেবারেই অল্প ছিল, তাহা আমি বিশ্বাস করি। কিন্তু আমি যেন সেই আন্দোলনের মধ্যেই বাঙ্গালি জাতির, অন্ততপক্ষে শিক্ষিত বাঙ্গালির

আত্মস্থ হইবার একটা প্রয়াস— একটা উদ্যম দেখিতে পাই। সেইটুকুই আমাদের লাভ। তার পর আরও দিন গেল। ১৯০৩ খ্রিস্টাব্দ হইতে স্বদেশি আন্দোলনের বাজনা বাজিতে লাগিল। বাঙ্গালি আপনাকে চিনিতে ও বুঝিতে আরম্ভ করিল। রবীন্দ্রনাথ গাহিলেন :

বাংলার মাটি বাংলার জল

সত্য কর সত্য কর হে ভগবান্

বাঙ্গালার জল বাঙ্গালার মাটি আপনাকে সার্থক করিতে লাগিল।

কিন্তু আমাদের মধ্যে অনেকে জ্ঞানীগুণী মহাপণ্ডিত আছেন, যাঁহারা নাকি বলেন যে, এই স্বদেশি আন্দোলন ইহা একটা বৃহৎ ভ্রান্তির ব্যাপার। আমরা নাকি সব দিকে ঠিক হিসাব করিয়া চলিতে পারি নাই। পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে আমাদের দেশে একটা প্রাণহীন জ্ঞানের আবির্ভাব হইয়াছে। এই মুখস্থ-করা জ্ঞানের ক্ষমতা অল্পই; কিন্তু অহংকার অনেকখানি। এই জ্ঞানে যারা জ্ঞানী, তাঁহারা সব জিনিস সের দাঁড়ি লইয়া মাপিতে বসেন। তাঁহারা অঙ্কশাস্ত্রের শাস্ত্রী, সব জিনিস লইয়া আঁক কষিতে বসেন। কিন্তু, প্রাণের যে বন্যা, সে তো অঙ্কশাস্ত্র মানে না, সে যে সকল মাপকাঠি ভাসাইয়া লইয়া যায়! স্বদেশি আন্দোলন একটা ঝড়ের মতো বহিয়া গিয়াছিল, একটা প্রবল বন্যায় আমাদের ভাসাইয়া লইয়া গিয়াছিল। প্রাণ যখন জাগে তখন তো হিসাব করিয়া জাগে না। মানুষ যখন জন্মায়, সে তো হিসাব করিয়া জন্মায় না। বা জন্মাইতে পারে না বলিয়াই সে জন্মায়। আর না জাগিয়া থাকিতে পারে না বলিয়াই প্রাণ একদিন অকস্মাৎ জাগিয়া উঠে। এই যে মহা বন্যার কথা বলিলাম, তাহাতে আমরা ভাসিয়া— ডুবিয়া বাঁচিয়াছি। বাঙ্গালার যে জীবন্ত প্রাণ, তাহার সাক্ষাৎ পাইয়াছি। বাঙ্গালার প্রাণে প্রাণে আবহমান যে সভ্যতা ও সাধনার স্রোত, তাহাতে অবগাহন করিয়াছি। বাঙ্গালার যে ইতিহাসের ধারা, তাহাকে কতকটা বুঝিতে পারিয়াছি। বৌদ্ধের বুদ্ধ, শৈবের শিব, শাক্তের শক্তি, বৈষ্ণবের ভক্তি, সবই যেন চক্ষের সম্মুখে প্রতিভাত হইল। চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতির গান মনে পড়িল। মহাপ্রভুর জীবন-গৌরব আমাদের প্রাণের গৌরব বাড়াইয়া দিল। জ্ঞানদাসের গান, গোবিন্দদাসের গান, লোচনদাসের গান, সবই যেন একসঙ্গে সাড়া দিয়া উঠিল। কবিওয়ালাদের গানের ধ্বনি প্রাণের মধ্যে বাজিতে লাগিল। রামপ্রসাদের সাধনসংগীতে আমরা মজিলাম। বুঝিলাম, কেন ইংরেজ এ দেশে আসিল, বুঝিলাম, রামমোহনের তপস্যার নিগূঢ় মর্ম কী? বঙ্কিমের যে ধ্যানের মূর্তি—

তুমি বিদ্যা তুমি ধর্ম
তুমি হৃদি তুমি মর্ম,
ত্বং হি প্রাণাঃ শরীরে।
বাহুতে তুমি মা শক্তি
হৃদয়ে তুমি মা ভক্তি
তোমারি প্রতিমা গড়ি মন্দিরে মন্দিরে—

সেই মাকে দেখিলাম। বঙ্কিমের গান আমাদের 'কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল'। বুঝিলাম, রামকৃষ্ণের সাধনা কী— সিদ্ধি কোথায়! বুঝিলাম, কেশবচন্দ্র কেন কাহার ডাক শুনিয়া ধর্মের তর্করাজ্য ছাড়িয়া মর্মরাজ্যে প্রবেশ করিয়াছিলেন। বিবেকানন্দের বাণীতে প্রাণ ভরিয়া উঠিল। বুঝিলাম, বাঙ্গালি হিন্দু হউক, মুসলমান হউক, খ্রিস্টান হউক, বাঙ্গালি বাঙ্গালি। বাঙ্গালির একটা বিশিষ্ট রূপ আছে, বাঙ্গালির একটা বিশিষ্ট প্রকৃতি আছে, একটা স্বতন্ত্র ধর্ম আছে। এই

জগতের মাঝে বাঙ্গালির একটা স্থান আছে, অধিকার আছে, সাধনা আছে, কর্তব্য আছে। বুঝিলাম, বাঙ্গালিকে প্রকৃত বাঙ্গালি হইতে হইবে। বিশ্ববিধাতার যে অনন্ত বিচিত্র সৃষ্টি, বাঙ্গালি সেই সৃষ্টিস্রোতের মধ্যে এক বিশিষ্ট সৃষ্টি। অনন্তরূপ লীলাধারের রূপবৈচিত্রে বাঙ্গালি একটি বিশিষ্ট রূপ হইয়া ফুটিয়াছে। আমার বাঙ্গালা সেই রূপের মূর্তি, আমার বাঙ্গালা সেই বিশিষ্ট রূপের প্রাণ। যখন জাগিলাম, মা আমার আপন গৌরবে তাঁহার বিশ্বরূপ দেখাইয়া দিলেন। সে রূপে প্রাণ ডুবিয়া গেল। দেখিলাম, সে রূপ বিশিষ্ট, সে অনন্ত! তোমরা হিসাব করিতে হয় কর, তর্ক করিতে চাও কর— আমি সে রূপের বালাই লইয়া মরি।

স্বদেশি আন্দোলন হিসাব না করিয়াই আসিয়াছিল, হিসাব না করিয়াই চলিয়া গেল। কিন্তু এখন আমাদের হিসাব করিবার সময় আসিয়াছে, মা দেখা দিয়াছেন— এখন যে পূজার আয়োজন করিতে হইবে। হিসাব করিয়া ফর্দ তৈয়ারি করিতে হইবে, হিসাব করিয়া পূজার উপকরণ সংগ্রহ করিতে হইবে। এই যে মহাবন্যায় দেশ ভাসিয়া গিয়াছিল এখন যে, সব পতিত জমি আবাদ করিয়া সোনা ফলাইতে হইবে। বিশ্বাস রাখিয়ো, সোনা ফলিবেই।

এখন আমাদের বিচার্য যে কেমন করিয়া এই নব-জাগ্রত বাঙ্গালি জাতিকে সম্পূর্ণরূপে বিকশিত করিয়া তুলিতে পারি। সেই কারণে সেই দিক দিয়াই দেখিতে হইবে, আমাদের বিকাশের জন্য কী কী আবশ্যক এবং তাহা কী করিয়া পাইতে পারি।

এই বিচার লইয়াই সম্প্রতি একটা গোল বাধিয়াছে। ইউরোপে নাকি কোনো কোনো পণ্ডিত স্থির করিয়াছেন যে, এই যে জাতিগত ভাব— ইংরেজিতে যাহাকে 'Nation Idea' বলে, ইহা নাকি একেবারেই কাল্পনিক, কোনো বস্তুর উপরে প্রতিষ্ঠিত নহে। কোনো বিশিষ্ট জাতির নাকি কোনো একটা স্বতন্ত্র মূল নাই। প্রত্যেক জাতির রক্তের মধ্যে অন্যান্য জাতির রক্ত মিশ্রিত আছে। আচারব্যবহারে, শিক্ষায়দীক্ষায়, ব্যবসাবাণিজ্যে সকল বিষয়েই ভিন্ন ভিন্ন জাতির মধ্যে আদান-প্রদান চলিয়াছে এবং এই আদানপ্রদানের মধ্যে যাহা গড়িয়া উঠিয়াছে, তাহা কোনো বিশিষ্ট জাতির জাতিত্বের ফল নহে। এই জাতিত্বের ভাব পোষণ করিলে নাকি জাতিতে জাতিতে সংগ্রাম ও সংঘর্ষ বাড়িয়া যাইবে ও সমগ্র মানবজাতির অমঙ্গলের কারণ হইয়া উঠিবে। কথাটি অনেকদিনকার কিন্তু বর্তমান যুদ্ধের সঙ্গে সঙ্গেই আবার নূতন করিয়া প্রচারিত হইতেছে, কাজেই আমাদের দেশেও দুই এক জন পণ্ডিত তাহা ধরিয়া বসিয়াছেন, এবং এই মতের জোরেই আমাদের এই নবজাগ্রত জাতীয় জীবনাকাঙ্ক্ষাকে হাসিয়া উড়াইয়া দিবার চেষ্টা করিতেছেন। ইউরোপের এই মত ইউরোপে অনেক বড়ো বড়ো পণ্ডিত অনেকবার খণ্ডন করিয়াছেন; আমি ভরসা করি, এবারও করিবেন। তাঁহাদের সমস্যা তাঁহারাই পূরণ করিবেন। কিন্তু সূর্যের চেয়ে বালির তাপ বেশি; আমাদের দেশে এইসব নকল পণ্ডিতদের পাণ্ডিত্য এত বেশি যে তাহাদের কোনো মতকে কিছুতেই খণ্ডন করা যায় না! এমনকি, যে রবীন্দ্রনাথ সেই স্বদেশি আন্দোলনের সময় বাঙ্গালার মাটি বাঙ্গালার জলকে সত্য করিবার কামনায়, ভগবানের কাছে প্রার্থনা করিয়াছিলেন, সেই রবীন্দ্রনাথ— এখন স্যার রবীন্দ্রনাথ— এবার আমেরিকায় ওই মতটি নাকি খুব জোরের সঙ্গে জাহির করিয়াছেন। তাঁহার সমস্ত বক্তৃতাটি কোনো কাগজে প্রকাশিত হয় নাই। সুতরাং পড়িতে পারি নাই, *Modern Review*-তে কোনো কোনো অংশ উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহা পড়িয়াছি, হয়তো সমস্ত না পড়িতে পাইয়া তাঁহার মতের সম্বন্ধে ভুল ধারণা করিয়াছি, কিন্তু যাহা প্রকাশিত হইয়াছে, সেই মতের, এই ক্ষেত্রে বাঙ্গালি জাতির, এই মহাসভায় সভাপতির আসন হইতে প্রতিবাদ হওয়া উচিত মনে করি।

এই সমস্ত মতটাই বস্তুহীন, বিশ্বমানবের ছায়ার উপর প্রতিষ্ঠিত। সমস্ত মানবজাতির মধ্যে সত্য ভ্রাতৃভাব জাগাইতে হইলে ভিন্ন ভিন্ন জাতিসমূহকে বিকশিত করিতে হইবে। তাহার পূর্বে এই ভ্রাতৃভাব অসার কল্পনা মাত্র। জাতি তুলিয়া দিলে বিশ্বমানব দাঁড়াইবে কোথায়? যেমন প্রত্যেক ব্যক্তির বিকাশ না হইলে একটি পরিবারের উন্নতি হয় না, যেমন পরিবারসমূহের উন্নতি না হইলে সমাজের উন্নতি হয় না, যেমন সমাজের উন্নতি না হইলে জাতির উন্নতি হয় না, ঠিক তেমনই সেই একই কারণে সকল ভিন্ন ভিন্ন বিশিষ্ট জাতির উন্নতি না হইলে সমগ্র মানবজাতির উন্নতি হয় না। বাঙালির শিরায় শিরায় যে রক্তই প্রবাহিত হউক না কেন, সে রক্ত আর্যই হউক কী অনার্যই হউক, কী আর্য-অনার্যের মিশ্রিত রক্তই হউক, যাহা সত্য, তাহা সত্যকামের মতো স্বীকার করিতে বাঙালি কখনও কুণ্ঠিত হইবে না— বাঙালির শিরায় শিরায় যে রক্তই প্রবাহিত হউক না কেন, বাঙালি যে বাঙালি, সে কথা আর তো সে ভুলিতে পারে না, সে যে বাঙালার মাটি বাঙালার জলে বাড়িয়া উঠিয়াছে, বাঙালার মাটি বাঙালার জলের সঙ্গে নিত্যই যে তাহার আদান-প্রদান চলিতেছে। আর সেই আদান-প্রদানের মধ্যে যে একটা নিত্য সত্য জাগ্রত সম্বন্ধের সৃষ্টি হইয়াছে, সেই সম্বন্ধের উপর বাঙালার জাতিত্বের প্রতিষ্ঠা। অন্যান্য জাতির সহিত ব্যাবসাবাণিজ্য শিক্ষাদীক্ষার যে আদান-প্রদান, তাহাও এই জাতিত্বের লক্ষণ। জাতিত্বের গুণেই এক জাতি দান করিতেও সক্ষম হয়, গ্রহণ করিতেও সক্ষম হয়। ইহা সেই জাতির অবস্থার বিষয়, স্বভাবের বিষয়। তাহার পর বিরোধের কথা, জাতিত্বের প্রভাবে যে কতকটা বিরোধ জাগিয়া উঠে, তাহা অস্বীকার করা চলে না। সেও যে জাতির স্বাভাবিক ধর্ম, তা বলিয়াই জাতিগুলোকে উড়াইয়া দেওয়া যায় না। প্রত্যেক পরিবারমধ্যে প্রত্যেক সমাজে বিরোধ-বিসংবাদ তো লাগিয়াই আছে, তা বলিয়াই কি সেই ব্যক্তিগুলার অস্তিত্ব অস্বীকার করিতে হইবে না উড়াইয়া দিতে হইবে? শত প্রকারের বিরোধ বাদ-বিসংবাদের মধ্যেই মানুষ মানুষ হইয়া উঠে ও মিলনের পথ খুঁজিয়া পায়। এই যে সব বিশিষ্ট জাতিসমূহ, ইহাদের পক্ষেও ওই কথাই খাটে। এই বিরোধ-বিসংবাদ সংঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যেই এইসব বিশিষ্ট জাতি সমস্ত মানবজাতির যে মিলনমন্দির, সেই দিকে অগ্রসর হইতেছে ও হইবে।

সংসারে প্রত্যেক জিনিসের প্রত্যেক ভাবের দুইটা মুখ আছে, এই যে বাদ-বিসংবাদ, ইহারও দুইটা মুখ। আমরা এক মুখ দেখি আর-এক মুখ দেখি না। বিরোধ আছে চক্ষে দেখিতেছি, মনে জানিতেছি, ইহাকে অস্বীকার করিতে পারি না, কিন্তু এই বিরোধেরই অপর মুখে যে মিলন, তাহা দেখিতে পাই না বলিয়া অস্বীকার করিয়া থাকি। ইউরোপে আজ যে ভীষণ সমরানল প্রজ্জ্বলিত, এই অনলে ইউরোপের সকল ঈর্ষা, বিদ্বেষ, দৈন্য, অপার শক্তির অভিমানজনিত যে হীনতা, অসীম স্বার্থপরতার যে মলিনতা, সব পুড়িয়া ছাই হইয়া যাইতেছে। আমি দেখিতেছি চক্ষে স্পষ্ট দেখিতেছি, এই পবিত্র ভস্ম সমাধির উপরে ইউরোপ তাহার মিলনমন্দির রচনা করিতেছে। সকলপ্রকার হীনতা ও স্বার্থপরতার ধর্মই এই যে, সে নিজের আবেগে নিজের বিনাশসাধন করে এবং সেই বিনাশের মুখে পরানুরক্তি জাগাইয়া দেয়। সেই পরানুরক্তি না জাগিলে যথার্থ মিলন অসম্ভব। অনেকে হয়তো মনে করেন, এই যে কলিযুগের কুরুক্ষেত্র, ইহাতে ইউরোপের ধ্বংস অবশ্যম্ভাবী। আমি বলি, কখনও না। সকল যুদ্ধক্ষেত্র যে ধর্মক্ষেত্র, সকল ইতিহাস যে ভগবৎলীলার পূত পুণ্যকাহিনি, ভারতের কুরুক্ষেত্রের ফলে কি তখনকার ভারত মিলনপথে অগ্রসর হয় নাই? নবজীবন লাভ করে নাই? আর্য-অনার্যের মধ্যে কি একটা স্বাভাবিক মিলন সংঘটিত হয় নাই? আমরা অমঙ্গলের দিকটাই দেখি, কিন্তু তাহার সঙ্গে জড়িত যে মঙ্গল, সেই দিক দেখিতে ভুলিয়া যাই।

ইউরোপ আজ অসীম দুঃখকষ্ট, যাতনা-বেদনা, অর্ধ অনশনের মধ্যেই মিলনপথে পা বাড়াইয়াছে। অহংকারের অবসান না হইলে প্রেমের জন্ম হয় না। এই যে দুঃখকষ্ট আজ ইউরোপকে ব্যথিত করিয়া তুলিয়াছে, ইহা সেই প্রেম-মিলনের আগমন-প্রতীক্ষার প্রসববেদনা। এই সমরানল নির্বাপিত হইলে দেখিতে পাইবে, ইউরোপ আপনার স্বার্থপরতাকে ছাড়াইয়া উঠিয়াছে। একদিন দেখিবে, যে প্রবল অপ্রতিহত বেগে ইউরোপ আজ তাহার স্বার্থ খুঁজিয়া বেড়াইতেছে এবং সমস্ত প্রাণমন দিয়া সেই স্বার্থপরতাকেই পোষণ করিতেছে, সেই ইউরোপ তেমনই অপ্রতিহত বেগে ঠিক সেইরকম সমস্ত প্রাণমন দিয়া সে নিজের ও জগতের যথার্থ মঙ্গলসাধন করিতেছে। এই সমর, এই বিরোধ যে জাতিত্বের ফল, তাহা আমি স্বীকার করি, কিন্তু এই সমরক্ষেত্রের অপরপারে যে মিলনমন্দির রচিত হইতেছে, তাহাও এই জাতিত্বেরই ফল, সে কথা অস্বীকার করিলে চলিবে কেন? যদি কোনো দিন সুদূর ভবিষ্যতে সমস্ত মানবজাতি লইয়া একটা যুক্তরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়, তবে নিশ্চয় বুঝিতে হইবে যে, তখন সমস্ত বিশিষ্ট জাতিগুলি নিজ নিজ স্বভাব-ধর্মের পথ অবলম্বন করিয়া অপূর্বরূপে বিকশিত হইয়াছে এবং সেই যুক্তরাজ্যে সকল জাতিরই সমান অধিকার। কিন্তু আমার মনে হয়, এই বিশিষ্ট জাতিসমূহ সেই অবস্থায় উপস্থিত হইলে সমস্ত মানবজাতির কল্যাণের জন্য কোনো রাজত্বেরই আবশ্যক হইবে না।

এই যে বাঙ্গালি জাতির জাতিত্বের দাবি, ইহার সম্বন্ধে আরও দুই একটি কথার আলোচনা আবশ্যক। আমি এমন কথা শুনিয়াছি— আমার কাছেই অনেকে বলিয়াছেন যে— আমাদের পক্ষে জাতিত্বের গৌরব করা নিতান্ত অসংগত, কারণ, এই যে জাতিত্বের ভাব, ইহার সমস্তই আগাগোড়া বিলাতের আমদানি— একটা ধার-করা সামগ্রী মাত্র। এটা যে তাঁহাদের ভুল, তাহা আমি বুঝাইতে চেষ্টা করিব। আমি আগেই বলিয়াছি, কোনো একটা বিশিষ্ট দেশের সঙ্গে সেই দেশবাসীদের যে নিত্যসম্বন্ধ, তাহারই উপরে জাতিত্বের প্রতিষ্ঠা হইতে পারে, এ সম্বন্ধ যাহা নিত্য আবহমান কাল হইতে আছে ও চিরদিনই থাকিবে, তাহার প্রতি এতকাল এমতভাবে আমাদের চোখ পড়ে নাই ; হইতে পারে, আমাদের সভ্যতায় ও সাধনায় এই সম্বন্ধে কোনো বিশিষ্ট নাম রাখা হয় নাই; ইহাও হইতে পারে, ইউরোপীয় সভ্যতা ও সাধনা, তাহাদের শিক্ষাদীক্ষা, বিজ্ঞান, ইতিহাস লইয়া এমন করিয়া হুড়মুড় করিয়া আমাদের ঘাড়ের উপর না পড়িলে, হয়তো এত সহজে এত শীঘ্র আমাদের জাতিত্বের চৈতন্য হইত না— তাহা বলিয়া কি যাহা আমাদের, আমাদেরই দেশের, যাহা বাঙ্গালার মাটি বাঙ্গালার জলের সঙ্গে অণুতে অণুতে প্রাণে প্রাণে জড়াইয়া আছে, তাহাকে বিলাতের আমদানি বলিয়া সমস্ত বাঙ্গালিজাতিকে অপমান করিব? যাহা চিরকাল আছে, তাহাকে দেখিতে পাই নাই, বুঝিতে পারি নাই বলিয়া কি ধরিয়া লইতে হইবে যে, তাহার কোনো অস্তিত্ব ছিল না? বিজ্ঞান জগতে যে বড়ো বড়ো সত্য আবিষ্কার হইয়াছে, সেসব সত্যই যে সনাতন— তাহাদের সত্তা বা অস্তিত্ব তো কোনো বিজ্ঞান বা বিজ্ঞানবিদের উপরে নির্ভর করে না? মাধ্যাকর্ষণ যেমন নিউটনের জন্মাইবার আগেও ছিল, আমাদের জাতির জাতিত্ব তেমনই ইংরেজ আসিবার আগেও ছিল। আমরা দেখিতে পাই নাই বলিয়া যে ছিল না, তাহা নহে। ইউরোপ হইতে একটা বিপরীত সভ্যতা আসিয়া আমাদের জীবনে আঘাত করিল, সেই আঘাতে আমাদের চৈতন্য হইল, সেই মুহূর্তেই আমাদের জাতির যে জাতিত্ব, তাহার সাক্ষাৎ পাইলাম। এমন করিয়াই মনুষ্যজীবনে আত্মজ্ঞানের প্রতিষ্ঠা হয়, বাহিরের রূপ ইন্দ্রিয়ের ভিতর দিয়া আত্মাকে আঘাত করে, সেই আঘাতেরই ফলে আমরা আপনাকে দেখিতে পাই, কিন্তু যাহা দেখি তাহা তো বাহিরের নয়, তাহা আমাদের প্রাণের বস্তু। আমাদের

নবজাগ্রত বাঙ্গালি জাতির যে জাতিত্ব, তাহা আমাদেরই প্রাণবস্তু, বিদেশের নহে। স্বদেশি আন্দোলনের সময় ভগবৎ-কৃপায় আমাদেরই প্রাণের মধ্যে তাহার সাক্ষাৎ পাইয়াছি— তাহাকে ধার করিয়া সাত *সমুদ্র তেরো নদী পার করিয়া লইয়া আসি নাই।*

এই কথার সঙ্গে সঙ্গে আর-একটা কথার বিচার ও আলোচনার আবশ্যক। আমরা কথায় কথায় বলিয়া থাকি, আমাদের দেশে ইংরেজের আগমনবিধির বিধান। আমার শ্রদ্ধেয় বন্ধু স্যার সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহ ১৯১৫ খ্রিস্টাব্দের কংগ্রেসের সভাপতির অভিভাষণে এই কথাই বলিয়াছেন— এই কথার গূঢ় মর্ম কী, তাহা ভালো করিয়া বুঝিতে হইবে। এই কথার সঙ্গে সঙ্গে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের মিলন সম্বন্ধে আমরা অনেক কথা বলিয়া থাকি। এই দুইটি কথাই মূলে এক কথা। প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের মিলন সম্ভবপর কি না, এই বিষয়ে যে অনেক মতভেদ আছে। সেইসব ভিন্ন ভিন্ন মতের মর্মকথাটি কী, তাহা তলাইয়া বুঝিলে জাতির জাতিত্বের কথা আরও পরিষ্কার হইয়া উঠিবে। Kipling লিখিয়াছিলেন—'East is East, and West is West, never shall the twain meet' অর্থাৎ প্রাচ্য ও প্রতীচ্য চিরকালই ভিন্ন ভিন্ন থাকিবে, তাহাদের মিলন অসম্ভব।

আবার বিলাতে ও আমাদের দেশে এমন অনেকে আছেন, যাঁহারা বলেন যে, এই মিলন একেবারে অবশ্যম্ভাবী। স্যার রবীন্দ্রনাথ এবার আমেরিকায় বলিয়াছেন যে জাতির বদলে একটা Universal brotherhood of mankind হইবে অর্থাৎ সমস্ত মানবজাতি ভ্রাতৃভাবে একত্র হইবে। বোম্বাই-এর কংগ্রেসে স্যার সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন বলিয়াছেন :

> The East and the West have met— not in vain. The invisible scribe, who has been writing the most marvellous history that has ever been written, has not been idle. Those who have the discernment and the inner vision to see will note that there is only one goal, there is only one path.

অর্থাৎ— প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের মিলন ব্যর্থ হয় নাই, যে অদৃশ্য বিধাতাপুরুষ এতাবৎকাল পর্যন্ত রচিত ইতিহাসের পৃষ্ঠায় যে আশ্চর্য লেখা লিখিতেছেন, তিনি তো নিশ্চিন্ত হইয়া নাই। যাঁহাদের বিচারবুদ্ধি ও দিব্যচক্ষু আছে, তাঁহারা বলিবেন যে, প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের একই ইষ্ট, একই পন্থা। এই বিষয়ে আমি যতই চিন্তা করি, মনে হয়, এই দুইটা কথা সত্য আবার দুইটা কথাই মিথ্যা, ইহার কোনোটাই একেবারে সত্য নয়। দুইটা একেবারে বিপরীত রকমের সভ্যতা ও সাধনা লইয়া এই যে প্রাচ্য ও প্রতীচ্য, ইহাদের মধ্যে মিলনের সম্ভাবনা কোথায়। প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের বদলে আমি ইংলন্ড ও বাঙ্গালা দেশ ধরিয়া লই, তাহা হইলে কথাটা অনেক পরিমাণে সরল হইয়া আসিবে। এই মিলন কত প্রকারে হইতে পারে, তাহা বিচার করা যাক। আমাদের ও ইংরেজের মিলনের মর্ম যদি এই হয় যে, আমরা ইংরেজের ইতিহাসের সাহায্যে সেই ছাঁচে গড়িয়া উঠিব অর্থাৎ বাঙ্গালা দেশটা একটা নকল ইংলন্ড হইবে, আমাদের নরনারী নকল সাহেবমেম হইয়া উঠিবে, আমাদের শিক্ষাপ্রণালী ঠিক হুবহু বিলাতের মতো হইবে, আমাদের চাষবাস, ব্যাবসাবাণিজ্যের চেষ্টায় সমস্ত দেশটাই যথার্থ গৃহস্থের আশ্রম না হইয়া, একটা বৃহৎ ভীষণ কলের কারখানা হইয়া উঠিবে, তাহা হইলে আমি বলি, মিলন একেবারে অসম্ভব। অনেকে হয়তো বলিবেন, কেন অসম্ভব?

এই শহরে তো অনেকেই ইংরেজি রকমে জীবন যাপন করেন। আহারবিহারে আচারে-ব্যবহারে, চালচলনে ইংরেজের সহিত তাঁহাদের কোনো পার্থক্যই দেখা যায় না। কলিকাতায় আমাদের ব্যাবসাবাণিজ্য তো একরকম বিলাতের ছাঁচেই ঢালা, আর কলিকাতায় যাহা দেখা যায়,

তাহা যে ক্রমশ দেশে ছড়াইয়া পড়িতেছে, তবে কেমন করিয়া বলা যায় যে, আমরা বিলেতের ছাঁচে গড়িয়া উঠিব না? আমার কথা এই যে, নকল সাজা সহজ, কিন্তু যথার্থ নকল হওয়া বড়োই কঠিন। সাজা জিনিসটা খেয়ালের ব্যাপার, একদিন থাকে, তার পর থাকে না; কিন্তু হওয়া জিনিসটার সঙ্গে রক্তমাংসের সম্বন্ধ আছে, কোনো একটা জাতিকে কিছু হইতে হইলে তাহার স্বভাবধর্মের মধ্যে সেই হওয়া জিনিসটার বীজ থাকা চাই। আমার কিছুতেই মনে হয় না, বাঙ্গালির স্বভাবধর্মের মধ্যে ইংল্যান্ডের সভ্যতা ও সাধনার বীজ আছে, সুতরাং এই অর্থে ইংরেজ ও বাঙ্গালির মিলন অসম্ভব, এবং এইভাবে দেখিতে গেলে Kipling-এর কথাই ঠিক বলিয়া মনে হয়, প্রাচ্য প্রাচ্যই থাকিবে, প্রতীচ্য প্রতীচ্যই থাকিবে, ইহারা কখনও মিলিবে না।

তবে কি এই দুইটা জাতি ভাঙিয়াচুরিয়া নিজ নিজ সত্তা হারাইয়া একটা নূতন রকমের দোআঁশলা জাতি গড়িয়া উঠিবে, না একটা নূতন বর্ণসংকর জাতির উৎপত্তি হইবে? এ কথা অর্বাচীনের কথা, ইহার বিচারের কোনো আবশ্যকতা নাই।

আবার কেহ কেহ বলেন যে, এই মিলনের অর্থ এই যে, ইংরেজের যাহা কিছু ভালো, আমরা লইব, আমাদের যাহা কিছু ভালো, তাহা ইংরেজ লইবে এবং উভয়ের যাহা কিছু মন্দ, তাহা বিসর্জন করিতে হইবে। এ কথার অর্থ আমি বুঝিতে পারি না। আমাদের কি ইংরেজের যাহা ভালো যাহা মন্দ, তাহা কি এমন পৃথকভাবে জাতির জীবনের মধ্যে অবস্থিতি করে যে, একটা একেবারে ছাড়িয়া দিয়া আর-একটা লওয়া যায়? একটা বিশিষ্ট জাতির ভালোমন্দ যে একসঙ্গে সেই জাতির রক্তমাংসের সঙ্গে জড়ানো। খাঁটি ভালোটুকু ছিঁড়িয়া লইবে কী করিয়া? এমন করিয়া তো ছেঁড়া যায় না। একটা জাতির জীবন তো ঠিক ইটের ইমারত নয় যে, ঠেকা দিয়া খানিকটা ভাঙিয়া ফেলিয়া সে দিকটা আবার নূতন ধরনে নূতন উপকরণে গড়িয়া তুলিবে। কোনো জাতির সংস্কার অন্য জাতির আদর্শে সম্ভব হয় না। আমাদের যেসব সংস্কারের আবশ্যক, তাহা আমাদের স্বভাবধর্মের মধ্যে যেসব শক্তি নিহিত আছে, তাহার বলেই হইবে। বিলাতের সমাজশক্তির বলে আমাদের আবশ্যকীয় সংস্কার সাধিত হইবে না হইতেই পারে না। দুইটা জিনিস যেমন আঠা দিয়া জোড়া লাগানো যায়, ঠিক তেমনই করিয়া তো বিলাতের ভালোটুকু আমাদের জাতীয় জীবনের সঙ্গে জোড়া লাগানো যায় না। এ যে জীবনের লীলা— জীবন বিকশিত হয়, তাহার বিকাশের মধ্যে যাহা নাই, সে তো তাহার সঙ্গে জোড়া লাগে না।

এই কথাটি আর-এক দিক দিয়া দেখা যায়। ধরিয়া লও যে, বিলাতের ভালোটুকু তুলিয়া আনিয়া আমাদের জীবনের মধ্যে চালাইয়া দেওয়া যায়। কিন্তু তাহার ফলে কী হইবে, বিলাতি সামাজিক প্রথা বা অবস্থা যদি আমাদের মধ্যে চালাইয়া দেওয়া যায়, তবে সেই প্রথা বা অবস্থার যাহা স্বাভাবিক ফল, তাহা ফলিবেই এবং তাহার ফলে আমাদের দেশের যে বিশিষ্ট রূপ, তাহা নষ্ট হইয়া বাঙ্গালি সমাজ একটি দ্বিতীয় বিলাতি সমাজ হইয়া উঠিবে। এমন করিয়া আর-একটা জাতির প্রতিধ্বনি হইয়া উঠিলে আমাদের বাঁচিয়া থাকার সার্থকতা কোথায়?

এভাবে যাঁহারা আমাদের দেশে বিলাতি সমাজের প্রতিষ্ঠা করিতে চেষ্টা করেন, তাঁহাদের চেষ্টা করিতে দাও, আমাদের ভীত হইবার কোনো কারণ নাই। আমি জানি, বাঙ্গালি জাতির একটা বিশিষ্ট জাতিত্ব আছে, তাহার একটা বিশিষ্ট স্বভাবধর্ম আছে, সেই স্বভাবধর্ম নিজেকে প্রতিষ্ঠিত ও প্রকাশ করিবে এবং যাহা সেই স্বভাবধর্ম-বিরুদ্ধ, তাহাকে বাহির করিয়া দিয়া এইসব প্রচেষ্টাকে ব্যর্থ করিয়া দিবে।

তবে এই যে মিলন—যাহাতে অনেকেই বিশ্বাস করেন ও আমিও বিশ্বাস করি, সেই মিলনের যথার্থ মর্ম কী? এই বিষয়টা দুই দিক দিয়া দেখা যায়, ইহাকে জাতিত্বের দিক দিয়া অর্থাৎ বাঙ্গালি জাতির যে জাতিত্ব ও ইংরেজ জাতির যে জাতিত্ব, এই দুইটি সত্যের দিক দিয়া দেখা যায়। আর-একটা দিক দিয়াও দেখা যায়, সেটা আমাদের নিজ নিজ শাসনবিভাগ অর্থাৎ গভর্নমেন্টের দিক দিয়া।

এই শেষোক্ত দিক দিয়া বিচার করিতে হইলে ইহা নিশ্চয়ই বলা যায় যে, দুইটি স্বতন্ত্র জাতি নিজ নিজ বিশিষ্ট রূপেই বিকশিত হইয়াও এই দুইটি জাতির শাসনবিভাগের উপরদিকে একটা একচ্ছত্র যোগাযোগ থাকিবে। বাঙ্গালি জাতির ও ভারতবর্ষের অন্যান্য জাতির ক্রমবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের পরস্পরের শাসনবিভাগের একটা সম্বন্ধ স্থাপিত হইবে এবং সমস্ত ভারতবর্ষের যে শাসনবিভাগ, তাহার সহিত ইংলন্ডের সম্বন্ধ, একটা বাস্তবিক সম্বন্ধ গড়িয়া উঠিবেই উঠিবে। কিন্তু সেই সম্বন্ধের ভিতরের প্রকৃতি কী হইবে, বাহিরের আকার কী হইবে, তাহা এখনও ঠিক করিয়া বুঝা এবং বলা অসম্ভব। স্যার সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহ বোম্বাই-এর কংগ্রেসে বলিয়াছিলেন :

> It seems to me that having fixed our goal it is hardly necessary to attempt to define in concrete terms the precise relationship that will exist between England and India when the goal is reached.

অর্থাৎ : আমাদের যে উদ্দেশ্য, তাহা সম্পূর্ণভাবে সফল হইলে ইংলন্ডের সঙ্গে আমাদের যে ঠিক কী সম্বন্ধ থাকিবে, তাহা নির্ধারণ করিবার চেষ্টা আমার মতে এখন অনাবশ্যক।

আমারও ঠিক তাহাই মনে হয়, তবে এই পর্যন্ত বলা যায় যে, এমন সম্বন্ধ হইতে বা থাকিতে পারে না, যাহাতে আমাদের ও ইংরেজের জাতীয় স্বভাবধর্মের বিনাশসাধন হইবে। শুধু জাতিত্বের দিক দিয়া দেখিতে গেলে ইংরেজ ও বাঙ্গালির যথার্থ মিলনভূমি স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়। আমি আগেই বলিয়াছি, দুইটি জাতি যখন নিজ নিজ প্রকৃতির মধ্যে নিজ নিজ স্বভাবধর্মের গুণে উন্নত অবস্থা প্রাপ্ত হয়, তখনই তাহাদের মধ্যে যথার্থ আদানপ্রদান ও মিলন সম্ভব হয়। যখন ইংরেজ ও বাঙ্গালি এই উভয় জাতিই সেইপ্রকার উন্নতির পথে অগ্রসর হইবে, তখনই তাহাদের মধ্যে প্রকৃত মিলন হইবে। প্রকৃত মিলনের ফল এই যে, শত শত ভিন্ন ভিন্ন বিশিষ্ট রূপে বিকশিত স্বতন্ত্র জাতিসমূহ বিধাতার সৃষ্টিস্রোতে ভাসিতেছে, ফুটিতেছে, ইহাদের সকলের মধ্যেই যে একটা একত্ব আছে, এইসব ভিন্নরূপের যে স্বরূপ, তাহার সন্ধান পাওয়া যায়। বৈশিষ্ট্য লুপ্ত হয় না। জাতিত্ব মরে না— শুধু সকল জাতির মধ্যে সকল বিশিষ্ট রূপের মধ্যে যে একত্ব আছে, তাহাই জাগিয়া উঠে। এই জন্যই ইংরেজ এ দেশে আসিয়াছিল। এইখানেই প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের যথার্থ মিলন। এই ক্ষেত্রেই Universal Brotherhood of man সম্ভব। তাই শুধু এই দিক দিয়া দেখিলেই দেখা যায়, the East and the West have met— not in vain। অর্থাৎ প্রাচ্য ও প্রতীচ্য যে একত্র হইয়াছে, তাহা ব্যর্থ হইবে না।

এখন দেখা যাইতেছে যে, আমাদের দেশের উন্নতি সাধন করিতে হইলে আমাদের এই নব-জাগ্রত জাতিত্বের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া আমাদের ইতিহাসের ধারাকে উপলব্ধি করিয়া ও সাক্ষী রাখিয়া আমাদের দেশের সকল দিকের বর্তমান অবস্থা আলোচনা করিতে হইবে এবং সেই আলোচনার ফলে কী কী উপায় অবলম্বন করিলে আমাদের স্বভাবধর্ম-সংগত অথচ সার্বভৌমিক উন্নতি সাধিত হইতে পারে, তাহা নির্ধারিত করিতে হইবে।

উৎস : *দেশের কথা।*

যুদ্ধোত্তর বাংলার কৃষি-শিল্প

মহম্মদ কুদরত-এ-খুদা

বাংলার কৃষিজাত পণ্যের কথা

কৃষিজাত পণ্যকে কয়েকটি বিভিন্ন শ্রেণিতে ভাগ করা যায়। পশুর ব্যবহার কৃষির জন্য নিতান্ত প্রয়োজন। ইহাকেই প্রথম স্থান দিয়া তাহার বিবরণ দিব। পরে ক্ষেত্র হইতে যে-সকল ফসল জন্মায় তাহাদের কথাও আলোচনা করিব। খাদ্যশস্য গোধূম, ধান্য ইত্যাদি যেমন এই শ্রেণির অন্তর্গত, তৈল-প্রদায়ী বীজ, ইক্ষু, সবজি, ফলবৃক্ষ এবং ঔষধের জন্য ব্যবহারযোগ্য উদ্ভিদও এই শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত হইবে। বাংলার কৃষিক্ষেত্রে সর্ববিধ ফসল উৎপন্ন হইতে পারে, কিন্তু সকল প্রকার ফসলের পরিবর্তে যেসকল ফসল দ্বারা আমাদের যথেষ্ট উপকার হইতে পারে, তাহার কথাই বর্তমানে আলোচনা করিব।

পশুপালন, ক্ষেত্রের সার সরবরাহের জন্য বিশেষভাবে প্রয়োজন। গৃহপালিত পশু ও পক্ষীর বিষ্ঠা জমিতে দিলে তাহা উত্তম সারের কার্য করে। এই পদার্থটি কিছুদিন থাকিলে জল ও বাতাসের সহিত মিলিয়া ধীরে ধীরে পরিবর্তিত হইতে থাকে। এই বিষ্ঠাজাতীয় পদার্থ যে নাইট্রোজেন, অঙ্গার, হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনের সহিত মিলিত রহিয়াছে তাহা ক্রমে অ্যামোনিয়ায় পরিণত হয়। অ্যামোনিয়া পরে অন্য পদার্থে পরিণত হইতে থাকে। অথবা বিষ্ঠা হইতে প্রথমে যে পদার্থ উৎপন্ন হয় তাহা ক্রমে অ্যামোনিয়ায় পরিবর্তিত হইতে থাকে। অ্যামোনিয়া গ্যাসীয় পদার্থ, এইজন্য সহজেই উহা বাতাসের সহিত মিলিত হইয়া যাইবে। পশ্বাদির বিষ্ঠা এইজন্য খোলা জায়গায় শুষ্ক অবস্থায় ফেলিয়া রাখা উচিত নহে। খুলিয়া রাখিলে অ্যামোনিয়ার ন্যায় পদার্থ সহজে উড়িয়া যাইতে পারে, অন্যথায় এরূপ পদার্থ অন্যান্য পদার্থের সহিত সারের মধ্যে থাকিয়া যাইবে। অবশ্য এই সঙ্গে ইহাও মনে রাখা কর্তব্য যে, সারগাদায় যদি বাতাসের যাতায়াত একেবারে বন্ধ হইয়া যায়, তাহা হইলে বিষ্ঠাদির বিশ্লেষণক্রিয়া সহজে সংঘটিত হইবে না। কাজেই দেখিতে

হইবে যে, বাতাসের যাতায়াত যেন বন্ধ না হইয়া যায়। এ দেশে দেখিতে পাই অধিকাংশ স্থানে সারকুঁড়ার কোনোরূপ যত্ন লওয়া হয় না, কাজেই আমাদের গোবরসারেও উপযুক্ত পরিমাণ ফলপ্রদ পদার্থ থাকে না। পশ্বাদির মূত্রও উত্তম সার, উহা হইতেও প্রচুর পরিমাণে অ্যামোনিয়া পাওয়া যায়। মানবমূত্রেও ওইরূপ পদার্থ পাওয়া যাইবে। এইসকল তরল সার যথানিয়মে আহৃত হইয়া উপযুক্ত পাত্রে রক্ষিত হইলে তাহার দ্বারাও মাটিকে সারবান করা সম্ভব। এ বিষয়ে একটি কথা মনে রাখিতে হইবে যে, মূত্র তরল পদার্থ বলিয়া উহাকে সহজে রক্ষা করা যায় না। যদি আবৃত স্থানে গর্ত কাটিয়া উহার মধ্যে এই মূত্র আহৃত হয় ও প্রতি তিন দিন পর পর ওই তরল পদার্থকে উপযুক্ত পরিমাণ শুষ্ক ছাই বা মাটি দিয়া ঢাকিয়া দেওয়া যায় তাহা হইলে উহার সারভাগ রক্ষিত হইয়া থাকিবে। উহা প্রতি এক মাস বা দেড় মাস অন্তর জমিতে দিয়া মাটির সহিত উত্তমরূপে মিশাইয়া দিতে হইবে। এই সার সবজিক্ষেত্রের জন্য বেশ উপকারী।

পশু পালন করিতে গেলে পশুর পরিত্যক্ত এই মলমূত্র যেমন জমির জন্য কাজে লাগিবে, তেমনই উহার দেহও নানাবিধ উপকারে আসে। গবাদি পশুর দুগ্ধ মানবের অতি প্রয়োজনীয় খাদ্য। পূর্বে এ দেশে দুগ্ধ, ঘৃত, ননি, মাখনের অভাব ছিল না। এমনকি দরিদ্র-গৃহেও এই পদার্থ যথেষ্ট পরিমাণে উৎপন্ন হইত। আজ অবস্থা অন্যরূপ হইয়াছে। আমরাও পশুর যত্ন লইতে পারি না, কাজেই তাহারাও আমাদিগকে উপযুক্তমতো খাদ্যসামগ্রী প্রদান করিতে পারে না। গৃহপালিত পশুর উপযুক্ত যত্ন করা প্রত্যেক বাঙালির অবশ্যকর্তব্য। দুঃখের বিষয় এই যে, গাভি যে দেশে দেবতা বলিয়া পূজিত হয়, সেই দেশেই গাভির অযত্ন সর্বাপেক্ষা অধিক। দেশের গোরুবাছুর দেখিয়া কে বলিবে যে সত্যই এ দেশে লোক গাভির জন্য কিছুমাত্র চিন্তা করে। অথচ পাশ্চাত্য দেশে যেখানে লোক গো-খাদক বলিয়া এ দেশের লোকের নিকট ঘৃণা অর্জন করিয়াছে ও ম্লেচ্ছ নামে অভিহিত হইয়াছে, তাহাদের দেশে কিন্তু গবাদি পশুর যথেষ্ট পরিমাণে যত্ন লওয়া হইয়া থাকে। বলদ না হইলে এ দেশে চাষের উপায় নাই, অথচ ওই বলদগুলিকে অনাহারে ও অল্পাহারে এরূপ অবস্থায় রাখা হয় যে উহাদের খাটিবার জন্য দৈহিক শক্তি মোটেই থাকে না। প্রতি গৃহে পালিত পশুদিগকে যথেষ্ট আহার প্রদান করা কর্তব্য। পশুর আহার খড় বা বিচালির পরিমাণ যথেষ্ট না হইলে তাহাদের জন্য ঘাস অথবা অন্যজাতীয় উদ্ভিদ জন্মাইতে হইবে। সাধারণত দেখা যায় পশুর খাদ্য ভাদ্র, আশ্বিন ও কার্তিক মাসেই কম পড়ে। ওই সময়ের জন্য অপেক্ষাকৃত অনুর্বর ডাঙাজমিতে ভুট্টা, কুড়মি প্রভৃতি শস্যের চাষ করিলে বর্ষার মধ্যেই গাছগুলি যথেষ্ট বড়ো হইয়া গোরুর খাবার উপযুক্ত হইয়া উঠিবে। নেপিয়ার ঘাসও ওই সময়ে বেশ ভালো জন্মায়, উহাও গবাদি পশুর উত্তম খাদ্য। বিচালির অভাব এইসব পদার্থের সাহায্যে পূরণ করা তেমন কঠিন হইবে না।

গাভির পরিচর্যা ব্যবসায়ের জন্যও করা দরকার। প্রত্যেক গ্রামে অন্তত একটি করিয়া গোপালনক্ষেত্র বা ডেয়ারি স্থাপন করিলে দেশের শিশুদিগের জন্য যেমন সুখাদ্য সরবরাহ করা যায়, তেমনই অবিকৃত উদ্‌বৃত্ত দুগ্ধাংশ হইতে মাখন তুলিয়া, ছানা কাটিয়া, ঘোল মারিয়া নানাবিধ পদার্থ প্রস্তুত হইতে পারে। কোথাও-বা দুগ্ধ হইতে জমানো দুগ্ধ, মাখন, পনির ইত্যাদি প্রস্তুত হইতে পারে। এইসকল পদার্থ যেমন মানুষের আহার্য হিসাবে

ব্যবহৃত হয়, তেমনই উহার অন্য ব্যবহারও রহিয়াছে। ইংলন্ডের ন্যায় দেশে যেখানে লোকের প্রয়োজনানুযায়ী খাদ্যশস্য অথবা মাংস-খাদ্য যথেষ্ট পাওয়া যায় না, সেখানেও দুগ্ধ হইতে প্রস্তুত ছানা বা কেজিন বহুল পরিমাণে প্লাসটিকশিল্পে ব্যবহৃত হইতেছে। অতএব আমাদের দেশেও প্রয়োজনাতিরিক্ত কেজিন প্রস্তুত হইতে পারে। গাভির উপযুক্ত পরিচর্যা করিলে ভালো ষাঁড় অন্য প্রদেশ হইতে আনাইয়া এ দেশের গাভি হইতেও উন্নততর শ্রেণির বাছুর জন্মানো যায় এবং গাভির দুগ্ধও বাড়ানো সম্ভব হয়। এ দেশ হইতে একটু পশ্চিমে গেলেই উন্নতশ্রেণির ষাঁড় ও গাভি পাওয়া যাইবে। ওই গাভি ও ষাঁড় এ দেশে আমদানি করিয়াও গোপালনক্ষেত্র স্থাপন করা সম্ভব। এ বিষয় লইয়া খুব অল্পসংখ্যক লোকই চিন্তা করিয়াছেন, কিন্তু এ বিষয়ে তেমন উল্লেখযোগ্য কাজ কেহই এযাবৎ করেন নাই। নিশ্চেষ্ট বাঙালির এ বিষয়ে সত্বর দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন।

ডেয়ারি হইতে কয়েকটি অতি প্রয়োজনীয় পদার্থের বহুল প্রচার ঘটিতে পারে। এ দেশ হইতে ভালো মাখন প্রায় অন্তর্হিত হইয়া গিয়াছে। এখন মাখনের পরিবর্তে বিদেশি ব্যবসায়ীরা কৃত্রিম মাখন বিক্রয় করিয়া চলিয়াছে। কৃত্রিম মাখনের খাদ্যগুণ অতিশয় নিকৃষ্ট। অথচ আমরা ওই নিকৃষ্ট পদার্থই খাদ্য হিসাবে ব্যবহার করিতেছি। হয়তো কেহ কেহ বলিবেন, মাখন এদেশীয় জীবনযাত্রার জন্য তেমন প্রয়োজনীয় নহে। মানিয়া লইলাম। কথাটি সম্পূর্ণ না হইলেও আংশিকভাবে সত্য, সমস্ত বাঙালি জাতি মাখন ব্যবহার না করিলেও তাহাদের অনেকেই নূতনতর জীবনযাত্রায় অভ্যস্ত হওয়ায় এই পদার্থটির প্রয়োজন অন্তত কিয়ৎ পরিমাণে হইয়াছে। এ প্রয়োজনও আমাদিগকে বাংলা হইতেই মিটাইতে হইবে। বাঙালির দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় ঘৃতের প্রয়োজন যথেষ্ট; এই ঘৃতও এখন আর খাঁটি অবস্থায় পাওয়া যায় না। শতকরা ৮০/৯০টি দোকানে ঘৃতের পরিবর্তে ভেজিটেবল প্রোডাক্ট বা কৃত্রিম ঘৃতমিশ্রিত একটি পদার্থ পাওয়া যায়। উহা স্বাস্থ্যের পক্ষে মোটেই উপযুক্ত খাদ্য নহে। এই পদার্থটি বর্তমানে সমস্ত দেশকে ছাইয়া ফেলিয়াছে। ঘৃতের অনটনই এই নিকৃষ্ট পদার্থের ব্যবহার বাড়াইয়া তুলিয়াছে। যখন এ দেশে উত্তম ঘৃত পাওয়া যাইত তখনকার দিনে মানুষ দীর্ঘায়ু হইত। বর্তমানে এইসকল কুখাদ্য আহার করার ফলে আমরা ক্রমশ অল্পায়ু হইয়া চলিয়াছি। কাজেই প্রচুর পরিমাণে ঘৃত প্রস্তুত করিলে তাহা সহজেই বিক্রয় করা যাইবে ও আমরাও স্বাস্থ্যের উন্নতি বিধান করিতে সমর্থ হইব।

ছানাও আমাদিগের দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় যথেষ্ট পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। উন্নত প্রথায় বহুল পরিমাণে ছানা প্রস্তুত করিয়া তাহাকে যেমন খাদ্য হিসাবে ব্যবহার করা যাইতে পারে, তেমনই উহার দ্বারা একটি রাসায়নিক শিল্প-প্রতিষ্ঠান গঠিত হইতে পারিবে। এই পদার্থটিকেও বহুল পরিমাণে প্রস্তুত করা উচিত। ইহার সহিত দুগ্ধের চিনি বা ল্যাকটোজও পাওয়া যাইবে। উহাও একটি প্রয়োজনীয় পদার্থ।

দুগ্ধকে ঘন করিয়া যেমন ঘনদুগ্ধ বিক্রয় করা যায়, তেমনই উহাকে দুগ্ধচূর্ণে পরিণত করিয়াও রোগীর ও শিশুর জন্য খাদ্য হিসাবে চালানো যাইতে পারে। এইসকল পদার্থ কেবল দেশেই চলিবে না, উহাকে উত্তমরূপে প্রস্তুত করিতে পারিলে তাহা বিদেশেও রপ্তানি হইতে পারে।

পশুপালনকার্য যথানিয়মে প্রবর্তিত হইলে এইসকল শিল্পশালার প্রতিষ্ঠা সহজেই হইতে পারিবে। এইসকল শিল্প ব্যতীত পশুর মাংস খাদ্য হিসাবেও ব্যবহৃত হইয়া থাকে; মেষ ও ছাগল এইরূপ মাংসের জন্যই বহুল সংখ্যায় নিত্য প্রয়োজন হয়। এইসকল পশুপালনের ব্যবস্থা করাও নিতান্ত প্রয়োজন। পশুর লোম, চামড়া, অস্থি, রক্ত, কোনো পদার্থই ফেলিয়া দিবার জিনিস নহে। সবকিছুই মানুষের ব্যবহারে লাগানো যাইতে পারে। আমরা সচরাচর ধান ব্যতীত অন্য খাদ্যশস্য উৎপাদন করিতে চেষ্টা করি না। অথচ বাংলাদেশের অল্প পশ্চিমে বিহার হইতে পাঞ্জাব পর্যন্ত প্রত্যেক দেশেই আরও নানাবিধ ফসল উৎপন্ন হইয়া থাকে। অবশ্য ওইসমস্ত দেশ ধান্যের জন্য তেমন উপযুক্ত নহে, কাজেই তথায় গোধূম বা গমই প্রধান শস্য। কিন্তু গম ভিন্ন আরও অনেক ফসল তাহারা উৎপাদন করিয়া থাকে। ইহা সত্যই লজ্জার কথা যে, বাঙালির ন্যায় অন্য কোনো প্রদেশবাসী সর্ষপতৈল ব্যবহার না করিলেও বাংলায় সরিষার চাষ যথেষ্ট পরিমাণে হয় না। বাঙালির জন্য সরিষা সরবরাহ করে যুক্তপ্রদেশ। বাংলায় কি ইহার চাষ সম্ভব নহে? আমার তো মনে হয় এই ধারণা অত্যন্ত ভুল যে, ইহার চাষ এখানে হইতে পারে না। অপেক্ষাকৃত উচ্চ ভূমিতে যেখানে আমনধানের চাষ সম্ভবপর নহে, সেখানে সরিষার চাষ বেশ ভালোভাবেই হইতে পারে, কিন্তু আমরা তাহা করি না। একদিন বাংলায় তুলার চাষ হইত ও চরখার সাহায্যে বাঙালির বস্ত্র তাহার দেশেই প্রস্তুত হইতে পারিত। আজও সেই দেশ রহিয়াছে, সেই লোকও এ দেশে বাস করিতেছে, কিন্তু যন্ত্রযুগের মোহ আমাদিগকে এমনভাবে গ্রাস করিয়া রাখিয়াছে যে, আমরা এইসমস্ত কথা এখন ভাবিয়াই দেখি না। পরন্তু মহাত্মা গান্ধি যেদিন দেশকে মুক্তির মন্ত্র চরখার গানের সহিত গ্রহণ করিতে বলিলেন, সেদিন বাঙালিই বোধ হয় তাঁহাকে আদর্শবাদী ও কল্পনাবাদী বলিয়া উপহাস করিল সর্বাপেক্ষা অধিক। আজ আমরা হয়তো তাঁহার কথার সারাংশ কিয়ৎ পরিমাণে উপলব্ধি করিতে পারিয়াছি। আমার মনে হয়, কার্পাসের চাষ ব্যাপকভাবে এ দেশে হওয়া বাঞ্ছনীয়। কেহ কেহ বলেন, এ দেশের কার্পাসের তুলা নিকৃষ্ট শ্রেণির। কিন্তু কৃষির উন্নতি বীজের পরিবর্তন দ্বারাও সাধিত হয়। কেহ কেহ বিদেশি তুলার চাষ এ দেশে করিয়াছেন। চেষ্টা করিলে ওইরূপ চাষের ফলে উন্নততর তুলা এ দেশেও জন্মানো যাইবে। তুলা জন্মাইলে তাহার শ্রেষ্ঠতর অংশ যেমন বস্ত্রবুননকার্যে নিযুক্ত করা যাইবে, তেমনই নিকৃষ্টতর অংশকে কৃত্রিম রেশমে পরিণত করিয়া উন্নততর বস্ত্রের নির্মাণ সম্ভব হইবে। কেন যে আমরা এ বিষয়ে চেষ্টা করি না, তাহা আমার বুদ্ধির অতীত। আমি তো মনে করি, এখনই এ বিষয়ে চেষ্টা আরম্ভ হওয়া প্রয়োজন। এই কাজটির জন্য যুদ্ধোত্তর কালের অপেক্ষা করিবার কোনোই প্রয়োজন নাই।

পূর্বে পশুপালন বিষয়ে বলিয়াছি, পশুর অস্থিচর্ম সকলই অত্যন্ত প্রয়োজনীয় পদার্থ। পশুদেহ হইতে যে স্নেহপদার্থ পাওয়া যায়, তাহাও কম প্রয়োজনীয় নহে। এ দেশেই বর্তমানে অস্ট্রেলিয়া হইতে বিফট্যালো মাটন সোয়েট ও লার্ড প্রভৃতি নানাবিধ চর্বি আমদানি হইয়া থাকে। এ দেশেই ওইসমস্ত উৎপাদন করিলে তাহাই তখন বহু পরিমাণে সাবানশিল্পে নিযুক্ত হইতে পারিবে। উহা ব্যতীত কৃষিক্ষেত্র হইতেও নানাবিধ তৈলবীজের চাষ করিয়া তৈল উৎপাদন করিতে পারিলে তাহাকে সাবানশিল্পের কাজে নিযুক্ত করা সহজসাধ্য হইবে।

নানাবিধ ফল কাঁচা ও পাকা অবস্থায় আহার্য হিসাবে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। সুস্বাস্থ্যের জন্য ফল আহার করা অতীব প্রয়োজন। লন্ডনে দেখিতাম, প্রত্যেক রেলস্টেশনে ও রাস্তাঘাটে অধিক ফল ব্যবহার করিবার জন্য অনুরোধ বিজ্ঞাপনের আকারে দেশময় ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছে। অথচ আশ্চর্যের কথা এই যে, ইংলন্ডে ভালো ফল মোটেই উৎপন্ন হয় না। তথায় আপেল আসে আমেরিকা ও অস্ট্রেলিয়া হইতে, কমলা যায় স্পেন ও প্যালেস্টাইন হইতে। সিঙ্গাপুরের কলা এবং আনারস ইংলন্ডের বাজারেই বিক্রয় হয়, তেমনই আঙুর প্রভৃতি ফ্রান্স ও ইটালি হইতে যায়। মোটকথা নানা দেশ হইতে বিভিন্ন ফল তথায় আমদানি হয়, কারণ উহা জাতীয় স্বাস্থ্যের জন্য বিশেষ প্রয়োজন। বাংলাদেশেও আমরা কতকগুলি ফলের চাষ সহজেই করিতে পারি। এ দেশে পশ্চিমের আম; শ্রীহট্ট, দার্জিলিং ও নাগপুরের কমলালেবু প্রচুর পরিমাণে বিক্রয় হয়। বাংলাদেশে আমের চাষ, কলা ও আনারসের চাষ অতি সহজেই হইতে পারে। গোলাপজাম, জামরুল প্রভৃতিও এ দেশে বেশ জন্মায়। কিন্তু কোথাও ইহাদের উৎপাদনকার্য ব্যাপকভাবে হয় না অথবা উন্নততর শ্রেণির ফলও কেহ জন্মাইতে চেষ্টা করে না। বাংলাদেশে কলা, পেঁপে, আনারস, আম, পাতিলেবু প্রভৃতি নানাবিধ ফল প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হইয়া অন্যান্য প্রদেশেও বিক্রীত হইতে পারে। ইহার চেষ্টাও করিতে হইবে।

পরিশেষে ইহাই বলিতে চাই যে, বাঙালির শ্রীহীন সংসারকে সুন্দর করিতেই হইবে। নানাভাবে দেশের ধন দেশে রাখিয়া ও এদেশীয় পণ্য বিদেশে পাঠাইয়া বিত্তশালী হইতে না পারিলে ভবিষ্যৎ অত্যন্ত দুঃখময় হইবে।

উৎস : *'যুদ্ধোত্তর বাংলার কৃষি-শিল্প', ১৩৫০'*।

নীল-বিদ্রোহ ও নীলদর্পণ

সুকুমার মিত্র

নীল বানরে সোনার বাংলা করে
এবার ছারেখার।
অসময়ে হরিশ মলো লংয়ের হল
কারাগার।
প্রজার আর প্রাণ বাঁচানো ভার॥

উগ্র ধর্মমতের দ্বারা আচ্ছন্ন থাকলেও তিতুমিরের বিদ্রোহের দুটি ধারা বেশ স্পষ্টভাবেই চোখে পড়ে। একটি হল বিদেশি প্রভুদের অবসান ঘটানোর কামনা এবং অপরটি হল জমিদারি-প্রথা ও নীলকর-প্রথার অবসান ঘটানোর দাবি। এই দুটি ধারার সম্মিলিত অভিব্যক্তি দেখা যায় আরও উন্নত স্তরে ভারতীয় মহাবিদ্রোহে। ভারতীয় মহাবিদ্রোহের প্রথম ধারাটি প্রবল হলেও দ্বিতীয় ধারাটি উপেক্ষণীয় নয়। কোনো কোনো পণ্ডিত ব্যক্তির মতে দ্বিতীয় ধারাটিই ভারতীয় মহাবিদ্রোহের মূল শক্তি— অর্থাৎ মহাবিদ্রোহ বা সিপাহি-বিদ্রোহ হল মূলত কৃষক-বিদ্রোহ। এ বিষয়ে কোনো বিতর্কের মধ্যে এক্ষেত্রে প্রবেশ করার প্রয়োজন নেই। এ ছাড়া বাংলা দেশে ভারতীয় মহাবিদ্রোহের প্রভাব সম্পর্কে স্বতন্ত্রভাবে আলোচনা করতে চাই বলে এখন এ আলোচনা স্থগিত রাখাই উচিত।

কিন্তু একটা কথা মনে রাখা দরকার। সেটি হল বাংলা দেশে তিতুমিরের বিদ্রোহের পর দুটি বড়ো রকমের কৃষক-বিদ্রোহ উপস্থিত হয়েছিল। ফরিদপুরে শরিয়তুল্লার ফরাজি আন্দোলন শুরু হয় তিতুমিরের বিদ্রোহের আগে, কিন্তু দুদু মিয়াঁর নেতৃত্বে এই আন্দোলন চলে ভারতীয় মহাবিদ্রোহ আরম্ভ হওয়ার কাল পর্যন্ত। পাছে ফরাজি আন্দোলন মহাবিদ্রোহের সঙ্গে যুক্ত হয় এই আশঙ্কায় ইংরেজ সরকার দুদু মিয়াঁকে বন্দি করে রাখে।

১৮৫৫ খ্রিস্টাব্দে বাংলা ও বিহারের আদিবাসী অধ্যুষিত অঞ্চলে ব্যাপক সাঁওতাল-বিদ্রোহ দেখা দেয়। সাঁওতাল-বিদ্রোহও মূলত কৃষক-বিদ্রোহ। এ দুটি বিদ্রোহের কোনোটিই বাংলা সাহিত্যে স্থান পায়নি। ইংরেজিশিক্ষিত বাঙালি মধ্যবিত্তের সঙ্গে তখনও সাধারণ মানুষের যোগ স্থাপিত না হওয়াই এর প্রধান কারণ। আর সাঁওতালরা আদিবাসী, কাজেই তাদের মতো বুনো জাতের প্রতি

সহানুভূতি দেখানোর কথা তখন শিক্ষিত বাঙালিসমাজ ভাবতেই পারেননি। সাঁওতাল-বিদ্রোহ বাংলা সাহিত্যে স্থান পায় একশো বছর পরে কমিউনিস্ট নেতা পাঁচুগোপাল ভাদুড়ীর হাতে। তাঁর *ভাগনাদিঘীর মাঠ*-ই হল সাঁওতাল-বিদ্রোহের পটভূমিকায় প্রথম সাহিত্য-সৃষ্টি। আদিবাসীদের সঙ্গে যে আজও শিক্ষিত বাঙালি মধ্যবিত্তের (দু এক জন ঐতিহাসিক ছাড়া) খুব ঘনিষ্ঠ যোগ স্থাপিত হয়নি এটা তারই প্রমাণ। সাঁওতাল-বিদ্রোহ, ফরাজি আন্দোলন এবং ভারতীয় মহাবিদ্রোহের পর নীল চাষিদের অভ্যুত্থান বাংলা দেশের ইতিহাসে এক স্মরণীয় ঘটনা। ইংরেজিশিক্ষিত বাঙালি মধ্যবিত্তের মোহভঙ্গ পর্বের প্রথম কাণ্ড তখন সমাপ্ত। দ্বিতীয় কাণ্ডে তাঁরা পা দিয়েছেন নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের পথে, বিদেশি শাসকদের অত্যাচার, অবিচারের বিরুদ্ধে তাঁদের মুখ ফুটতে শুরু করেছে। আর এই কারণেই তাঁরা মুখ ফিরিয়েছেন জনসাধারণের দিকে।

নীল-বিদ্রোহ ভারতীয় মহাবিদ্রোহের পর হঠাৎ হল এবং শিক্ষিত বাঙালি মধ্যবিত্ত অমনি সেই বিদ্রোহে সমর্থন জানিয়ে নিজেদের সাহস ও শক্তির পরিচয় দিলেন এমনই একটা ধারণা দীর্ঘকাল প্রচারের ফলে সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এ ধারণাটা সম্পূর্ণ ভুল।

কোনো বিদ্রোহই অকস্মাৎ দেখা দেয় না, দীর্ঘকাল ধরে তার ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়।

বাংলা দেশে নীলের চাষ শুরু হয় অনেক দিন আগে। কবি দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের পিতা দেওয়ান কার্তিকেয়চন্দ্র রায় (*ক্ষিতীশ বংশাবলী চরিত্র অর্থাৎ নবদ্বীপের রাজবংশের বিবরণ*-এ) লিখেছেন যে, 'বাংলায় দেওয়ানী সনদ প্রাপ্তির অব্যবহিত পরেই নবদ্বীপে নীলকুঠি স্থাপিত হয়'। তাঁর মতে, 'এ প্রদেশে নীলের চাষ প্রবর্ত্তিত হইলে অধিবাসীদের অবস্থার যেরূপ পরিবর্ত্তন হয় সেরূপ আর কিছুতেই হয় নাই।' (১ম অধ্যায়, পৃ. ১৩)। দেশীয় জমিদাররাও নীল চাষ করতেন এবং তাঁদের বহু নীলকুঠি ছিল। ১৮৩৩ খ্রিস্টাব্দের এক সনদের বলে সাহেবরাও এদেশে ভূমিস্বত্বের অধিকারী হন; ফলে শ্বেতাঙ্গ নীলকরদের প্রভাব-প্রতিপত্তি দ্রুত বাড়তে থাকে।

নীল চাষিদের উপর অত্যাচার নীল চাষের শুরু থেকেই আরম্ভ হয় এবং ১৮১০ খ্রিস্টাব্দে সরকারি বিজ্ঞপ্তিতে এই অত্যাচারের বিবরণ প্রকাশ করা হয়। কিন্তু এসময় ইংরেজিশিক্ষিত বাঙালি মধ্যবিত্ত নীল চাষিদের প্রতি সহানুভূতি দেখাননি। তাঁরা এই ধরনের অত্যাচার স্বাভাবিক বলেই ধরে নিয়েছিলেন। এমনকি ১৮২৯ খ্রিস্টাব্দের ১৫ ডিসেম্বর সাহেবদের এদেশে আনিয়ে বসবাস করানোর ব্যবস্থা সমর্থন করে এক সভায় বক্তৃতা দেওয়ার সময় দ্বারকানাথ ঠাকুর বলেন যে এদেশে সাহেবদের বসবাস ও নীল চাষের ফলে দেশের ও সমাজের প্রভূত উপকার হয়েছে। মনে রাখতে হবে যে, স্বয়ং দ্বারকানাথও অনেকগুলি নীলকুঠির মালিক ছিলেন। এককথায় নতুন অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় দেশের উপকার হবে এমন একটা ধারণা ইংরেজিশিক্ষিত বাঙালি মধ্যবিত্তের মনে বেশ-কিছু-কাল বদ্ধমূল হয়েছিল। মোহভঙ্গ-পর্বে অর্থাৎ প্রধানত ১৮৫০ থেকে ১৮৬০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে এই ধারণা কেটে যায় এবং তীব্র বিক্ষোভ ও অসন্তোষের সৃষ্টি হতে থাকে। ইতিমধ্যে নীলকর ও জমিদারদের বিরুদ্ধে তিতুমিরের বিদ্রোহ, ফরিদপুরে ফরাজি আন্দোলন প্রভৃতি ঘটে গেছে। ভারতীয় মহাবিদ্রোহের আগুন জ্বলে ওঠার আগেই বাংলা দেশে কৃষকদের মধ্যে ব্যাপক বিক্ষোভ এবং শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণির মধ্যে তীব্র অসন্তোষ ধূমায়িত হয়ে উঠেছিল। বাঙালি শিক্ষিত সমাজের সাহিত্য ও পত্রিকাদিতে এই বিক্ষোভ ও অসন্তোষ প্রতিফলিত হল।

১৮৫৬ খ্রিস্টাব্দে *বাপরে বাপ! নীলকরের কি অত্যাচার* নামে ১৬ পৃষ্ঠার এক পুস্তিকা প্রকাশিত হয়। পুস্তিকাটি ছাপা হয়েছিল হিন্দু পেট্রিয়ট প্রেসে। গদ্যে-পদ্যে লেখা এই পুস্তিকা সংলাপের আকারে লেখা। ঘটনাস্থল পাবনা জেলার গোলকপুর গ্রাম। জমিদার ও গভর্নর

উভয়কেই শিবতুল্য মানুষ বানিয়ে রাগ ঝাড়া হয়েছে নীলকর সাহেবদের উপর। দুই যুবকের আলাপের মাধ্যমে নীলকরদের অত্যাচারের কাহিনি বর্ণনা করা হয়েছে।

কলকাতা নিবাসী শ্যামচাঁদ ঘোষ অবিনাশচন্দ্র ঘোষকে আশ্বাস দিয়ে বলছেন :

> নীলকরগুলো তাদের সঙ্গে (লেঠেলদের সঙ্গে) ভাব করে এখানে যা ইচ্ছে তাই করছে, এবং কোন গাঁয়ে যে শ্যাল রাজা হয়ে একে মারচে ওকে ধরচে তাকে কাটছে তাকি গভর্ণর প্রভৃতি সাহেবরা এতদিন জান্‌তেন। তাঁরা জান্‌লে কোন কালে এখানে উঠে যেত।

দীর্ঘ বক্তৃতায় পুস্তিকা সমাপ্ত হয়েছে। বক্তৃতার শুরু এইভাবে :

> হে দেশস্থ ভ্রাতৃবর্গ! বঙ্গীয় দীন হীন প্রজাপুঞ্জের এতাদৃশ যন্ত্রণা সন্দর্শন করিয়া তোমাদের পাষাণ সম সুকঠিন হৃদয়ে কি করুণা রসের আবির্ভাব হয় না?

পুস্তিকাটিতে পাঁচটি গান আছে। প্রথম গানটি নিম্নরূপ :

নিলকরের কি অত্যাচার।
এই নীলে নিলে সকল নিলে এদের নিলে বোঝা ভার।।
ও নিলের দাদন, বিষম বাঁদন, নাহিক নিস্তার,
বেচলে ভিটে না যায় মিটে, কিবে মিঠে সদ্ব্যবহার।।
ও জোর করে বিচ ছড়ায় সাপে, ছাড়ায় কর্ম্ম আর,
হোল না ধান, গেল যে মান, প্রাণ বাঁচান হোল ভার।।
ও সুদে সুদে কেবা সোদে তিন পুরুষের ধার,
বেচলে পাঠা, না যায় লেঠা, কতো বেটা গঙ্গা পার।।
হুড়ুর হো, হুড়ুর হো, হুড়ুর হো হো হো।

(পুস্তিকাটি এখানে পাওয়া যায়নি। লন্ডন স্কুল অব ওরিয়েন্টাল অ্যান্ড আফ্রিকান স্টাডিজ-এর অধ্যাপক তারাপদ মুখোপাধ্যায় যে লিখিত বিবরণ পাঠান ডাক্তার সুকুমার সেন তাঁর *বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস*—দ্বিতীয় খণ্ডে তা থেকে কিছুটা প্রকাশ করেছেন। সমস্ত উদ্ধৃতি ডাক্তার সুকুমার সেনের গ্রন্থ থেকে দেওয়া হল।)

বাংলা দেশে নীল চাষিরা যখন বিক্ষুব্ধ তখনই ভারতীয় মহাবিদ্রোহের আগুন জ্বলে উঠল। পলাশির যুদ্ধের পর শতবর্ষব্যাপী সংগ্রামে ও বিদ্রোহে বাংলা দেশের মানুষ বিপর্যস্ত, হাতিয়ার যারা ধরতে পারত তাদের হাতে আর তখন হাতিয়ার নেই, ভূমিহারা, অস্ত্রহারা হাজার হাজার মানুষ অনাহারে মরেছে অথবা অন্য পেশা অবলম্বন করে কায়ক্লেশে বেঁচে আছে। এই অবস্থায় বাংলা দেশে সশস্ত্র বিদ্রোহের আগুন জ্বলবার কোনো সম্ভাবনা ছিল না, নইলে কী হত তা এখন কল্পনা করে কোনো লাভ নেই।

তবু, শুধু লাঠি-সড়কি হাতেই বাংলার চাষি তখন স্থানীয়ভাবেই প্রতিরোধ সংগ্রামে নেমেছিল।

'এম এল এল' ছদ্মনামে শিশিরকুমার ১৮৬০ খ্রিস্টাব্দের ২২ আগস্ট *হিন্দু পেট্রিয়ট* পত্রিকায় লিখেছেন :

> এখনও নীল জেলাগুলিতে বাড়ি পোড়ানো, লুটপাট, ইত্যাদি, অন্তঃপুরবাসিনীদের উপর চরম অত্যাচারের ফলে বহু ব্যক্তির সমাজচ্যুত হওয়া, নীলকরদের অপূরণীয় লাভের তৃষ্ণা মেটানোর জন্য অসংখ্য ধনী ব্যক্তি নিঃস্ব হয়ে যাওয়ার নিদর্শন দেখতে পাওয়া যাবে।
>
> .... কুলি না পাওয়া গেলে ব্রাহ্মণ ও কায়স্থদের রেহাই দেওয়া হয় না এবং স্ত্রী ও

কন্যাদের ধরে নিয়ে গুদামে আটক রাখা হয়। আর পুরুষদের নীল চাষে বাধ্য করার জন্য তাদের সঙ্গে সেখানে যতদূর কল্পনা করা যায় ততদূর দুর্বিনীত ব্যবহার করা হয়।

রামতনু অধিকারী নামক জনৈক ব্যক্তির উপর হাজরাপুরের নীলকর মিস্টার 'ওটস'-এর অত্যাচার বর্ণনা করে শিশিরকুমার লিখেছেন :

রামতনু পালিয়ে গেল, কিন্তু মেয়েরা পালাতে পারল না। প্রথমে লাঠিয়ালদের রাগ পড়ল বাড়ি ও আসবাব-পত্রের উপর প্রথমটি ভেঙ্গে ফেলা হল এবং পরের গুলি লুঠ করা হল। মেয়েদের গ্রেপ্তার করার পর বস্ত্রাদি কেড়ে নিয়ে তাদের উলঙ্গ অবস্থায় উঠানে দাঁড় করিয়ে রাখা হল। কাহিনির বাকীটা লিখতে আমি কেঁপে উঠছি। লোকটি সমাজচ্যুত হয়েছে।' অধিকারী ওটস-এর বিরুদ্ধে মিস্টার স্কীনারের (এখানে শুনছি ইনি ওটস-এর আত্মীয়) কাছে নালিশ করেছিল এবং তিনি মুহূর্তমাত্র বিলম্ব না করে নালিশ খারিজ করে দেন। কয়েক মাস আগে অনুরূপ ভাবেই আর একটি অসম্মানিত পরিবার—লাউতাড়ার শাহদের পরিবার—মিঃ ওটস-এর হাতে লাঞ্ছিত হন।

নীলকরদের লাঠিয়ালগণের হস্ত হইতে আত্মরক্ষার জন্য কৃষকগণ এক অপূর্ব কৌশল আবিষ্কার করিয়াছিল। প্রত্যেক পল্লীর প্রান্তে তাহারা এক একটি করিয়া দুন্দুভি রাখিয়াছিল। যখন লাঠিয়ালগণ গ্রাম আক্রমণ করিবার উপক্রম করিত, কৃষকগণ তখন দুন্দুভিধ্বনি দ্বারা পরবর্ত্তী গ্রামের রায়ইত গণকে বিপদ সংবাদ জ্ঞাপন করিলে তাহারা আসিয়া দলবদ্ধ হইত।

এই রূপে অতি অল্প সময়ের মধ্যেই চারি পাঁচখানি গ্রামের লোক একত্র হইয়া নীলকর সাহেবদিগের লাঠিয়ালগণের সহিত তুমুল সংগ্রামে ব্যাপৃত হইত।

(মহাত্মা শিশিরকুমার ঘোষ—শ্রীঅনাথ বসু পৃ. ৩৬)

চাষিরা নীলকরদের অত্যাচার প্রতিরোধে কতটা দৃঢ়সংকল্প হয়েছিল তার প্রমাণ শিশিরকুমার ঘোষের একটি পত্রেও পাওয়া যায়। যশোরের ঝিনাইদহ মহকুমার যোলোকূপা গ্রামের চাষিদের দমন করার জন্য ওমান সাহেব সাতশত লাঠিয়াল সংগ্রহ করেন এবং এই সাহেবটি লাঠিয়ালদের হাতে বন্দুক ও রিভলভারও দিচ্ছেন বলে গুজব রটে। ছয় হাজার মুসলমান চাষি নীলকরের আসন্ন আক্রমণ প্রতিরোধের জন্য রুখে দাঁড়ায়।

হিন্দু পেট্রিয়ট পত্রিকায় (৩ সেপ্টেম্বর ১৮৬০) শিশিরকুমার লেখেন :

ছয় হাজার মরিয়া মুসলমানের সঙ্গে হাজার হাজার লঠিয়ালের—যাদের কিছু লোক আগ্নেয়াস্ত্র সজ্জিত—লড়াই এর অর্থ ত রীতিমত যুদ্ধ।

আতঙ্কগ্রস্ত কোম্পানি কর্তৃপক্ষ কৃষকদের দমন করার জন্য নীলকর সাহেবদের হাতে প্রভূত ক্ষমতা দিলেন। দেওয়ান কার্তিকেয়চন্দ্র রায় লিখেছেন :

১৮৫৭ অব্দে সেপাহী সৈন্য রাজবিদ্রোহী হইলে, অনেক নীলকর সাহেব গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক এসিষ্টাণ্ট মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলে, রাইয়তদিগের ক্লেশ আরও বৃদ্ধি হইল।'

(*ক্ষিতীশ বংশাবলী চরিত*, পৃ. ১৮)

এই দমননীতি ও অত্যাচারের প্রতিবাদে বাংলা দেশের নিরস্ত্র চাষি নতুন ধরনের প্রতিরোধ সংগ্রাম আরম্ভ করে। ভারতীয় মহাবিদ্রোহের আর-একটি ধারা অর্থাৎ কৃষক-বিদ্রোহের ধারা সারা বাংলায় ছড়িয়ে পড়ে। এ থেকেই বোঝা যায় যে, বাংলার নীলবিদ্রোহ বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয় এবং এই বিদ্রোহের সঙ্গে ভারতীয় মহাবিদ্রোহের ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল। এর অন্য প্রমাণও আছে। ঐতিহাসিক সতীশচন্দ্র মিত্র লিখেছেন :

সেপাহী বিদ্রোহের অব্যবহিত পরে নানা সাহেব ও তাঁতিয়া তোপীর নাম দেশময় ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। নীল বিদ্রোহী কৃষকেরাও তাঁহাদিগের নেতাদিগকে এই সব নামে অভিহিত করিত।'

(*যশোহর খুলনার ইতিহাস*—২য় খণ্ড, পৃ. ৭৮১)

নীল-বিদ্রোহের এই চেহারা দেখেই সাহেবরা আতঙ্কে বিমূঢ় হয়ে পড়েছিল। কালীপ্রসন্ন সিংহ বিদ্রূপ করে লিখেছেন :

> নীলকর সাহেবেরা দ্বিতীয় রিভোলিউসন হবে বিবেচনা করে (ঠাকুর ঘরে কে? না আমি কলা খাই নি।) গবর্ণমেন্ট তোপ ও গোরা সাহায্য চেয়ে পাঠালেন। রেজিমেন্টকে রেজিমেন্ট গোরা, গান বোট ও এস্পেশিয়াল কমিশনর চল্লো;—মফস্বলের জেলে আর নিরপরাধীর জায়গা হয় না, কাগজে হুলস্থুল পড়ে গেল ও আন্টর ব্রেড অবতার হয়ে পড়লেন। *(হুতোম প্যাঁচার নক্সা)*

দীনবন্ধু মিত্রের জন্ম হয়েছিল ১৮২৯ খ্রিস্টাব্দে। নদিয়া জেলার চৌবেড়িয়া গ্রামে! শৈশবকাল থেকেই তিনি নীলকর সাহেবদের অত্যাচার নিজের চোখে দেখেছিলেন। ময়মনসিংহে টিপুপন্থী বা পাগলাপন্থীদের বিদ্রোহ, চব্বিশ পরগনায় তিতুমিরের বিদ্রোহ, ফরিদপুরে ফরাজি আন্দোলন—বিদেশি শাসন, জমিদার ও নীলকরদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে বাংলা দেশে তখন কৃষক-বিদ্রোহের আগুন জ্বলে উঠছে থেকে থেকে। দীনবন্ধু যখন বড়ো হলেন তখন ভারতে মহাবিদ্রোহের আগুন জ্বলে উঠেছে, বাংলা দেশের শোষিত ও নির্যাতিত কৃষক তখন বিক্ষুব্ধ। বিদ্রোহের আগুনের আঁচ শিক্ষিত বাঙালি মধ্যবিত্তের গায়ে লেগেছে নানাভাবে, কিন্তু এতদিন শাসক-শক্তির পিছনে দাঁড়িয়েই তাঁরা আত্মরক্ষার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু নীল-বিদ্রোহের আগুন এবার তাঁদের গায়ে লাগিয়ে দিল শাসক-শক্তিই । নীলকর সাহেবরা গ্রামাঞ্চলের শিক্ষিত মধ্যবিত্ত পরিবারগুলিকেও রেহাই দিল না। শিক্ষিত মধ্যবিত্ত তখনও বিদ্রোহের কথা ভাবতে পারছে না। হাতিয়ার ধরে শাসক-শক্তির সম্মুখীন হওয়ার মতো শিরদাঁড়া তার তখনও শক্ত হয়নি। তাই দীনবন্ধু আঁকলেন এক ভয়াবহ অত্যাচারের চিত্র, নিয়তির মতোই যা অপ্রতিরোধ্য। তবু সেই চিত্রে কৃষক ও মধ্যবিত্তের ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধ-চেষ্টা যতটুকু ফুটে উঠল তার মূল্য কম নয়। সারা দেশে *নীলদর্পণ* বিক্ষোভের দাবানল সৃষ্টি করল। *নীলদর্পণ* অভিনয় কালে অর্ধেন্দুশেখর মুস্তৌফির রোগ-সাহেবের অভিনয় দেখে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রচণ্ড ক্রোধে দিশাহারা হয়ে চটিজুতো ছুঁড়ে মেরেছিলেন। এই ঘটনার মধ্যেই বাংলা দেশে শিক্ষিত মধ্যবিত্তের মনোভাব স্পষ্টভাবে প্রকাশ পেয়েছে।

শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণি যখন বিদেশি শাসক-শক্তির উচ্ছেদের কথা ভাবতে শুরু করেছে তখন শাসক-শক্তি আর *নীলদর্পণ*কে উপেক্ষা করতে পারেনি, ১৯০৮ খ্রিস্টাব্দের পর *নীলদর্পণ* অভিনয় নিষিদ্ধ হয়েছিল। ১৮৬০ খ্রিস্টাব্দে *নীলদর্পণ* ঢাকায় মুদ্রিত হয়। দীনবন্ধু ডাকবিভাগে চাকরি করতেন। কাজেই প্রথমে তিনি নিজের নাম প্রকাশ করা যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করেননি। তাই সংস্কৃত ভাষায় লেখক-পরিচয় দেওয়া হয়েছিল এইভাবে :

> নীলদর্পণং। নাটকং। নীলকর-বিষধর-দংশন-কাতর-প্রজানিকর। ক্ষেমঙ্করেণ কেনচিৎ পথিকেনাভি প্রণীতং। ঢাকা।

অবশ্য এতে বিপদ কাটেনি, কিন্তু দেশবাসীর প্রবল সমর্থন লাভ করবেন জেনেই দীনবন্ধু অবিচলিত ছিলেন।

বঙ্কিমচন্দ্র, *রায় দীনবন্ধু মিত্র বাহাদুরের জীবনী ও গ্রন্থাবলী*-র সমালোচনা (১২৮০) গ্রন্থে লিখেছেন :

> দীনবন্ধু বিলক্ষণ জানিতেন যে, তিনি নীলদর্পণের প্রণেতা একথা ব্যক্ত হইলে, তাঁহার অনিষ্ট ঘটিবার সম্ভাবনা। যে সকল ইংরেজের অধীন হইয়া তিনি কর্ম্ম করিতেন, তাহারা নীলকরের সুহৃদ। বিশেষ, পোষ্ট অপিসের কার্য্যে নীলকর প্রভৃতি অনেক ইংরেজের সংস্পর্শে সর্বদা আসিতে হয়। তাহারা শত্রুতা করিলে বিশেষ অনিষ্ট করিতে পারুক না পারুক, সর্বদা উদ্বিগ্ন করিতে পারে, এ সকল জানিয়াও দীনবন্ধু নীলদর্পণ

প্রচারে পরাঙ্মুখ হয়েন নাই। নীলদর্পণে গ্রন্থকারের নাম ছিল না বটে, কিন্তু গ্রন্থকারের নাম গোপন করিবার জন্য দীনবন্ধু কোন প্রকার যত্ন করেন নাই। নীলদর্পণ প্রচারের পরেই বঙ্গ দেশের সকল লোকই কোন না কোন প্রকারে জানিয়াছিল যে, দীনবন্ধু ইহার প্রণেতা।

লং সাহেবের নামে যখন মামলা রুজু হয় তখন দীনবন্ধুও অভিযুক্ত হবেন শুনে কালীপ্রসন্ন সিংহ সর্বস্ব দিয়েও তাঁকে বিপদমুক্ত করার প্রতিশ্রুতি দেন। *নীলদর্পণ*-এর প্রথম সংস্করণ শেষ হলে কালীপ্রসন্ন নিজ ব্যয়ে দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করে বিনামূল্যে বিতরণ করেন।

নীলদর্পণ নাটকে শুধু কল্পিত চরিত্র বা ঘটনার সমাবেশ করা হয়নি। এর অধিকাংশ চরিত্রই বাস্তব এবং ঘটনাগুলির বাস্তব ভিত্তি আছে, যদিও একই জায়গায় একই সময় সব ঘটনা ঘটেনি।

প্রথমত, নদিয়ার অন্তর্গত গুয়াতেলির মিত্র পরিবারের দুর্দশা উপন্যাসটির ভিত্তিভূমি। (*ভারত সংস্কারক* পত্রিকার সম্পাদকীয় মন্তব্য—৭ নভেম্বর ১৮৭৩)

দ্বিতীয়ত, মেহেরপুরের সুপ্রসিদ্ধ মহেশ মুখোপাধ্যায় (যিনি) *নীলদর্পণ*-এর 'গুপে' (দেওয়ান গোপীনাথ নামে খ্যাত) জেম্‌স্ হিলের মন্ত্রী ছিলেন। (*নদিয়া কাহি*[illegible] : কুমুদনাথ মল্লিক, পৃ. ৩৬৩)

তৃতীয়ত, *নীলদর্পণ*-এর ক্ষেত্রমণি কৃষ্ণনগরের অপরূপ সুন্দ[illegible]ক কন্যা হারামণি ছাড়া আর কেউ নয়। হারামণিকে কুলছিকাটা নীলকুঠিতে ছোটোসাহেব আ[illegible] ইল্‌স্ ধরে নিয়ে যায়। অমর নগরের দয়ালু ম্যাজিস্ট্রেট খ্যাতনামা জ্যোতির্বিদ হার্শেলের নাতি [illegible] ডব্লউ. জে. হার্শেল ছাড়া আর কেউ নয়। (*ইন্ডিয়ান স্টেজ*—দাশগুপ্ত)

চতুর্থত, যে নীলকুঠির সাহেবদের অত্যাচারের চিত্র দীনবন্ধু এঁকেছেন সেটি হল মোল্লাহাটির নীলকুঠি।

সমসাময়িক গণজীবনের বাস্তব চিত্র দীনবন্ধু যেভাবে ফুটিয়ে তুলতে পেরেছিলেন পরবর্তীকালে আর কেউ তেমনভাবে পারেননি এবং ফোটানোর চেষ্টাও করেননি। এখানে দীনবন্ধু একক ও অদ্বিতীয়। *নীলদর্পণ*, তাই, উনিশ শতকের ষষ্ঠ দশকেই বহন করে এনেছিল বিংশ শতকের গণ-বিক্ষোভের বার্তা, মধ্যবিত্তের নতুন পদক্ষেপের সংকেত।

দীনবন্ধু মিত্র *নীলদর্পণ* রচনা করেন প্রধানত বেঙ্গল ইন্ডিগো কোম্পানির কুঠি মোল্লাহাটি 'কানসারণ'-এর শ্বেতাঙ্গ নীলকরদের অত্যাচরের কাহিনিকে ভিত্তি করে। সতীশচন্দ্র মিত্র তাঁর যশোহর-খুলনার ইতিহাসে লিখেছেন :

> এই কুঠির অত্যাচার কাহিনীর উপর লক্ষ্য রাখিয়া দীনবন্ধুর 'নীলদর্পণ' প্রণীত হয়...। (পৃ. ৭৬৩)

মোল্লাহাটি বনগ্রাম থেকে পাঁচ ছয় মাইল দূরে। মোল্লাহাটির শ্বেতাঙ্গ নীলকরদের অত্যাচার প্রতিরোধের জন্য কৃষকরা সংঘবদ্ধ হয়ে লড়াই চালায়। পল্লি কবির গানে এই লড়াই-এর কাহিনি অমর হয়ে রয়েছে।

মোল্লাহাটির লম্বা লাঠি, রইল সব হুদোর আটি।
কলকাতার বাবু ভেয়ে, এল সব বজরা চেপে লড়াই দেখবে বলে।

দীনবন্ধুর *নীলদর্পণ*-এর মতো নীলকরদের নির্মম অত্যাচারের নিখুঁত ছবি ফুটিয়ে তুলেছিলেন খ্যাতনামা লেখক মীর মশাররফ হোসেন (১৮৪৮-১৯১২) তাঁর *উদাসীন পথিকের মনের কথা*-য়। সাহিত্যকৃতি হিসাবে *নীলদর্পণ*-এর সমতুল্য না হলেও নীলকর শোষিত ও অত্যাচারিত তৎকালীন পল্লিবাংলার একটি সঠিক চিত্র হিসাবে এই উপন্যাসটির বিশেষ গুরুত্ব আছে। দুঃখের বিষয় *উদাসীন পথিকের মনের কথা* (১৮৯১) ইতিমধ্যেই মীর মশাররফ হোসেনের অন্যান্য গ্রন্থের মতোই দুষ্প্রাপ্য হয়ে উঠেছে, এমনকি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ গ্রন্থাগারেও এর কোনো কপি নেই।

মীর মশাররফ হোসেন কুষ্ঠিয়ার অধিবাসী ছিলেন। কুষ্ঠিয়ার নীলকরদের অত্যাচারের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকেই *উদাসীন পথিকের মনের কথা* রচনা করেন।

মীর মশাররফ হোসেন কাঙ্গাল হরিনাথের সাহিত্য-শিষ্য ছিলেন। নীল-বিদ্রোহ সম্পর্কে অনেক তথ্য তাঁর জানা ছিল। নীল-বিদ্রোহের ইতিহাস লেখার ইচ্ছাও তাঁর ছিল, কিন্তু সে ইচ্ছা আর পূর্ণ হয়নি। বৃদ্ধ বয়সে তিনি বাংলা দেশের সুপরিচিত লেখক জলধর সেনকে বলেছিলেন :

> তোমাকে নীল বিদ্রোহ সম্পর্কে অনেক নোট দিয়া যাইব। তুমি একখানি ইতিহাস লিখিও, আমি এ বয়সে আর পারিলাম না।

(*কাঙ্গাল হরিনাথ*—জলধর সেন। ১ম খণ্ড । পৃ. ৩৮-৩৯, ১৩২০)

উৎস : *'উনবিংশ শতকের বাংলা সাহিত্যের বিদ্রোহের চিত্র'*, প্রকাশ : অগ্রহায়ণ, ১৩৬৬।

বাংলার রায়ত ও জমিদার

শচীন সেন

বাংলার শ্রেষ্ঠ সম্পত্তি তার ক্ষেত্রভূমি, এবং বাংলার শ্রেষ্ঠ সম্পদ তার কৃষি। প্রবাদ আছে যে, বাংলার মাটিতে সোনা ফলে। অতি সহজেই বাংলার মাটি কর্ষণযোগ্য ও ফলপ্রদ হয়। বাংলার আর্থিক সংস্থান কৃষিজাত মালের উপর নির্ভর করে। এই কৃষিজাত মাল তার অন্তর্বাণিজ্য ও বহির্বাণিজ্যের প্রধান অংশ দাবি করে। কৃষিপ্রধান বাংলা দেশে কৃষির অনুন্নতি শিল্পের উন্নতির প্রধান অন্তরায়। তাই কৃষির সঙ্গে বাঙালির ভাগ্য ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। বাঙালি প্রধানত গ্রামে বাস করে, তার সমাজ গ্রামের শিকড়ে আবদ্ধ, তার দৃষ্টিভঙ্গি গ্রামের সংস্কার দ্বারা প্রভাবান্বিত এবং তার মঙ্গল গ্রামের কল্যাণের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। শহরে বাস করলেও গ্রামের সঙ্গে থাকে তার নাড়ির যোগ; শহরে অর্জন করলেও গ্রামের কৃষিজাত মাল তার খোরাক জোগাড় করে। তাই বাংলার ঐশ্বর্য কৃষিকে অবলম্বন করে গড়ে উঠেছে। যে-মাটিতে সোনা ফলে, যে-মাটিতে বাংলার অর্থ লুকানো আছে, যে-মাটির সঙ্গে বাংলার সমাজব্যবস্থা জড়িত এবং যে-মাটিতে বাঙালির অর্থ ও উদ্যম ব্যয়িত হচ্ছে, সে-মাটি আজ সমস্যার আকর হয়েছে। এতে আমাদের জাতিগত চিন্তার ও কর্মের দীনতাই প্রকাশ পায়। কৃষি আমাদের প্রধান অবলম্বন, তাই কৃষিসমস্যা আমাদের প্রধান সমস্যা। এই কৃষিসমস্যার সঙ্গে ভূমির স্বত্ব, ক্রয়বিক্রয়, প্রকারভেদ, উপস্বত্ব ভোগ ইত্যাদি ভূমি-সম্পর্কিত নানাবিধ জটিল সমস্যা সংশ্লিষ্ট। আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্যের দিনে যে-ভূমিব্যবস্থা গড়ে উঠেছে বা ফলপ্রসূ হয়েছে, আর্থিক দুর্গতির দিনে সেই ব্যবস্থার আন্তর বিরোধ সুস্পষ্ট হয়ে উঠে। তাই যে-ব্যবস্থা এতকাল কল্যাণ বহন করে এনেছে, আজ সেই ব্যবস্থাই দুর্গতির নিশানা বলে মনে হচ্ছে। এতে বিস্ময়ের হেতু নেই। এই পরিবর্তনশীল জগতে ক্রমবর্ধমান সমস্যা মেটাবার ভার কোনো স্থিতিশীল ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে না। তাই সমস্যাকে এড়িয়ে গেলে সমস্যা সমাধানের পথ সহজ হয় না। সমস্যা সমাধানের শ্রেষ্ঠ উপায় হল সমস্যার রূপ সম্বন্ধে সজাগ ও সতর্ক থাকা। এবং সমস্যাকে জানা হল সমস্যা নিবারণের প্রথম সোপান।

ভূমিসমস্যা আলোচনায় কয়েকটি গোড়ার কথা জানা প্রয়োজন। প্রথম, জাতির দিক দিয়ে চাষের জমির সঙ্গে অন্যবিধ জমির প্রভেদ অনেক। চাষের সঙ্গে জাতির কল্যাণ জড়িত, এবং চাষের জমির

অবনতি জাতির স্বার্থকে মুখ্যভাবে আঘাত করে। যে-জমি চাষের জন্য ব্যবহৃত নয়, তার সঙ্গে সমগ্র জাতি তেমন সরাসরিভাবে সংশ্লিষ্ট নয়। তাই চাষের জমির উপর জাতির দৃষ্টি ও অধিকার অত্যন্ত প্রত্যক্ষভাবে থাকা প্রয়োজন। চাষির এবং চাষের উন্নতি জাতির শ্রম ও যত্ন দাবি করে সবচেয়ে বেশি। দ্বিতীয়, চাষের উন্নতিকল্পে প্রয়োজন হয় চাষি এবং চাষির চালক। যে চাষ করবে, তার বুদ্ধি, যত্ন ও শ্রম, এবং যে চাষ করাবে তার সাহায্য ও নেতৃত্ব— এই উভয় পক্ষের দায়িত্ব ও কর্তব্য আছে। চাষি কোনো ব্যক্তি, গভর্নমেন্ট বা সংঘের অধিনায়কত্ব গ্রহণ ও বরণ করতে পারে, এবং কোন্ দেশে কার নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হবে, তা নানা ঐতিহাসিক বা প্রাকৃতিক ঘটনার উপর নির্ভর করে। শ্রম, যত্ন ও অর্থের সাহায্যে জমির উৎপাদন-শক্তি বাড়ে, এবং কোথাও ত্রুটি ঘটলে জমির এবং শ্রমিকের অপচয় আরম্ভ হয়। এই অপচয়ের পথকে বন্ধ করবার দায়িত্ব যিনি নেবেন, তিনি হলেন চালক, অর্থাৎ চলতি কথায় জমিদার, এবং যাঁর শ্রমে ও যত্নে জমির পরিপোষণ চলবে, তিনি হলেন কৃষক। একই পক্ষ যদি চালক ও কৃষকের পদে ব্রতী হন, তা হলে ত্রুটি ঘটবার সম্ভাবনা বেশি। এই উভয় পক্ষের যে-কোনো পক্ষ যদি নিজের দায়িত্ব পালন না করেন, ভূমির সমস্যা তখনই প্রকট হয়। তাই সমস্যা সমাধানে এই দু পক্ষের সম্মিলিত সহযোগিতা এবং নিপুণতা একান্ত আবশ্যক।

কার্যকরী ও কল্যাণপ্রসূ ভূমিব্যবস্থা গড়তে হলে নিম্নলিখিত বিষয়ে অত্যন্ত সাবধানী দৃষ্টি থাকা প্রয়োজন :

(ক) যিনি চাষ করবেন তিনি হলেন প্রকৃত রায়ত, এবং তাঁর স্বার্থই সর্বাগ্রে সংরক্ষিত হবে।

(খ) চাষের উন্নতিবিধান জাতির প্রথম ও প্রধান লক্ষ্যবস্তু, এবং কোনো পক্ষের স্বার্থ বা অধিকার তার অন্তরায়স্বরূপ স্বীকৃত হবে না।

(গ) জোতকে অসংগতভাবে খণ্ডিত করবার সুযোগ দেওয়া সমীচীন নয়, এবং অত্যধিক জমি কোনো ব্যক্তি বা সংঘের হাতে থাকা উচিত নয়, কারণ চাষের জমি নিয়ে হেলাফেলা করা জাতির পক্ষে ক্ষতিকর।

(ঘ) ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় কৃষিব্যাবসা যাতে পুঁজি আকর্ষণ করতে পারে, সেদিকে নজর রাখতে হবে। অর্থের অভাবে উন্নতির যেন বাধা না ঘটে।

(ঙ) যাঁরা শ্রম ও যত্ন দ্বারা কৃষির উন্নতি সাধন করতে চান, তাঁদের সে-সুযোগ দিতে হবে।

(চ) কৃষিব্যাবসাকে ফলপ্রদ ও আকর্ষণীয় করতে হবে, এবং চাষিকে ঋণী হওয়ার সুযোগ দেওয়া হবে না।

(ছ) যিনি জমির মালিকানা দাবি করবেন, জমির পরিপোষণের দায়িত্ব তাঁর গ্রহণ করতে হবে।

বাংলার ভূমিসমস্যা এক নিজস্ব রূপ গ্রহণ করেছে। প্রাচীনকাল অবধি বাংলার ভূমিব্যবস্থা এক বিশিষ্ট ধারায় প্রবাহিত হয়েছে। জমির মালিক রাজা— এই সত্য বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন দেশাচারের সাহায্যে বিভিন্ন রূপ পরিগ্রহ করেছে। বাংলা দেশে রাজার মালিকানাস্বত্ব রাজস্ব আদায়ের অধিকারে পরিণত হল। এবং আমরা জানতে পারি যে, মোগল সম্রাট আকবরের শাসনকালে বাংলা দেশে জমিদারের সংখ্যা বহুল ছিল, এবং তাঁরা ধনী ও প্রবলপ্রতাপান্বিত ছিলেন। বাংলার বারোভুঁইয়ার প্রসিদ্ধি ইতিহাসে আখ্যাত আছে। বাংলার জমিদারবর্গ নানা শ্রেণিতে বিভক্ত ছিল। হিন্দু আমলে বংশানুক্রমিক চাকুরির প্রথা জমিদারবর্গের অধিকার প্রসারণে সাহায্য করেছে। যাঁরা রাজস্ব আদায়ের ভার পেতেন, যাঁরা গ্রামের মোড়ল ছিলেন, যাঁরা বিভিন্ন রাজবংশের অধিকারী ছিলেন— তাঁরা ক্রমশ তাঁদের প্রভাব বিস্তার করে সম্রাটের নিকট হতে বিশিষ্ট স্থানের রাজস্ব আদায়ের ভার পেলেন। মুসলমান আমলের শাসননীতি উক্ত বংশানুক্রমিক প্রথার বিরোধী হলেও বাংলা দেশে রাজস্ব আদায়ের সংস্থানকে মুসলমান রাজারা বিনষ্ট

করেননি। তাই বাংলা দেশে মুসলমান-শাসন সম্পূর্ণভাবে বিস্তার লাভ করতে পারেনি। ভূমিরাজস্বই ছিল তখন রাজ্যশাসনের প্রধান অবলম্বন, এবং রাজস্ব আদায়ের দায়িত্ব যাঁদের উপর ন্যস্ত ছিল, তাঁরাই ছিলেন বিভিন্ন স্থানের প্রকৃত নেতা। তাঁদের প্রভাব ছিল সুদূরপ্রসারী এবং প্রতাপ ছিল প্রবল। জমিদারবর্গের শ্রেণির ভেদানুসারে সম্মানের বিভেদ ছিল। বাংলা দেশে জমিদার ও স্বাধীন তালুকদার একই শ্রেণির ছিলেন— তফাত ছিল তাঁদের সম্মানে ও সম্পত্তির বাহুল্যে। তালুকদারের সম্পত্তি আয়তনে স্বল্প, কিন্তু তিনি জমিদারের অধীনে নন। যেসব তালুকদার জমিদার-বর্গের অধীনে ছিলেন, তাঁদের শ্রেণি ও গোত্র আলাদা— অবশ্য রায়তের এলাকায় তাঁদের ভুক্ত করা যায় না। আকবরের মন্ত্রী টোডরমল প্রবর্তিত জমির মাপজোখ ও বিলিব্যবস্থা বাংলা দেশে প্রযুক্ত হয়নি, তাই জমিদারবর্গের অধিকার ক্ষুণ্ন এবং রায়তের অধিকার প্রশস্ততর হবার সুযোগ ঘটেনি। মোগল আমলে বাংলার শাসনকর্তা জাফের খাঁর শাসনকালে জমিদারবর্গের দাবি নানাভাবে আহত হয়েছিল এবং তাঁর বর্ধিত রাজস্বের বিরোধিতা করবার দরুন অনেক জমিদারের কারাগৃহে প্রাণত্যাগ করতে হয়। কিন্তু পরবর্তী শাসনকালেই জমিদারবর্গ আবার তাঁদের জমিদারি ফিরে পান। মুসলমানের শাসননীতি ও রীতি জমিদারি প্রথার পরিপন্থী হলেও মুসলমান-রাজত্বকালে বাংলা দেশে জমিদারবর্গের প্রসার নানাভাবে সম্ভব হয়েছিল। দেশাচারের প্রভাবে জমির মালিকানাস্বত্বের সুযোগ ও সুবিধা লাভ করা জমিদারবর্গের পক্ষে সহজ হয়েছিল, কিন্তু সর্বস্তরের জমিদার সর্ববিধ সুবিধা লাভ করেননি বলে জমিদারবর্গের মালিকানাস্বত্ব সম্বন্ধে নানা ঐতিহাসিকের নানা মত আছে। বাংলা প্রদেশে জমিদারি প্রভাব বিস্তার একান্তই বাংলার নিজস্ব। ভারতের অন্য প্রদেশের ভূমিব্যবস্থার নজির বাংলা প্রদেশে প্রযোজ্য নয়।

১৬৯৮ সালে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি তদানীন্তন জমিদারবর্গের কাছ থেকে কলিকাতা, সুতানুটি ও গোবিন্দপুরের জমিদারি ক্রয় করেন। কলিকাতায় জমিদারি চালনা করে কোম্পানি নানাভাবে লাভবান হলেন। এইভাবে জমিদারি করবার প্রলোভন বাড়ল, এবং কোম্পানির লুব্ধ দৃষ্টি ক্রমশ বিস্তার লাভ করতে লাগল। ১৭৫৭ সালে চব্বিশ পরগনার জমিদারি কোম্পানির হাতে অর্পিত হয়। ১৭৬০ সালে মীরকাশিম বর্ধমান, চট্টগ্রাম ও মেদিনীপুর জেলার শাসনভার কোম্পানির হাতে ন্যস্ত করলেন। ১৭৬৫ সালে কোম্পানি বাংলার ও বিহারের অবশিষ্ট অংশের দেওয়ানি লাভ করলেন। চব্বিশ পরগনা ব্যতীত সর্বস্থানে জমিদারবর্গের মালিকানা স্বীকৃত হয়েছিল। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি জমিদারবর্গের প্রভাব দেখে বিস্মিত হয়েছিলেন এবং অনেক স্থলে তদানীন্তন জমিদারবর্গকে অস্বীকার করে জমির বিলিবন্দোবস্ত করতে চেষ্টা করলেন। কোম্পানি বুঝেছিলেন যে, গ্রামে জমিদারবর্গের অসীম প্রতাপ ও প্রভাব গড়ে উঠেছে। কিন্তু তা ভেঙে চৌচির করে না দিতে পারলে কোম্পানির শাসন ও প্রভাবকে সুপ্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব হবে না। পলাশি-যুদ্ধের পর থেকে দশক-বন্দোবস্তের পূর্ব পর্যন্ত কোম্পানির জমিবিলির নীতি অনুসন্ধান করলে উক্ত সত্য সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয়। তথাপি ১৭৮৯ সালে দশক-বন্দোবস্ত এবং ১৭৯৩ সালে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত জমিদারবর্গ ও জমিদার মালিকদের সঙ্গে স্থাপিত হয়। এটি ঐতিহাসিক রহস্য বা আকস্মিক ঘটনা বা দুর্ঘটনা নয়। জমিদারের প্রভাবকে অস্বীকার করে সুব্যবস্থার সঙ্গে ঊর্ধ্বতম ভূমিরাজস্ব আদায় যখন সম্ভব হল না, তখন কোম্পানির অনেক স্থানীয় কর্মচারী জমিদারবর্গের সঙ্গে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের আভাস দিতে লাগলেন। ১৭৮৪ সালে ব্রিটিশ পার্লামেন্টে ভারতীয় শাসন সম্বন্ধে উইলিয়াম পিট প্রবর্তিত 'ইন্ডিয়া বিল' পাস হয়, এবং সেই আইনের ৩৯ ধারায় অবর্ধমান রাজস্ব সংস্থানের ইঙ্গিত ছিল। ব্রিটিশ মন্ত্রণা-পরিষদের অনুরোধে লর্ড কর্নওয়ালিস ১৭৮৬ সালে ভারতের গভর্নর-জেনারেল হয়ে আসেন, এবং তিনি যে-অনুজ্ঞা বহন করে এনেছিলেন তাতে সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছিল যে, ১৭৮৪ সালের ভারতশাসন আইনের মর্ম যেন তিনি প্রবর্তন করেন। লর্ড কর্নওয়ালিস

বিলাতের কোর্ট অব ডিরেক্টরদের নিকটে জানতে চাইলেন যে, দশক-বন্দোবস্তকে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে রূপান্তরিত করবেন কি না। তার উত্তরে ১৭৯২ সালের সেপ্টেম্বর মাসে যে-লিপি তিনি পেয়েছিলেন, তা অনেকাংশে প্রধানমন্ত্রী পিটের রচনা। লর্ড কর্নওয়ালিস ভারতবর্ষে এসে নানা তথ্য অনুসন্ধানের পর যেসব মন্তব্য বিলেতে পাঠান, তার সঙ্গে সায় দিয়ে কোর্ট অব ডিরেক্টরস ব্রিটিশ মন্ত্রণা-পরিষদের পরামর্শানুসারে দশক-বন্দোবস্তকে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বলে ঘোষণা করতে অনুমতি দেন। আইনের চোখে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ভারতীয় শাসন-পরিষদের বিধান, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ব্রিটিশ মন্ত্রণা-পরিষদের, তথা ব্রিটিশ পার্লামেন্টের, নিদান। বাংলার তদানীন্তন সমাজব্যবস্থায় জমিদারি প্রথার দুর্বার শক্তির কাছে কোম্পানির সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হয় এবং চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত সেই ব্যর্থতা বহন করে আনল। এই বন্দোবস্ত রাজস্ব আদায়ের শ্রেষ্ঠ উপায় বলে গৃহীত হয়েছিল— তা সমগ্র সমাজের মঙ্গলপ্রসূ কি না, সে-বিষয় আলোচিত হলেও সম্যকভাবে বিবেচিত হয়নি বলে অনেকের বিশ্বাস। সমাজ-কল্যাণ বিধান করবার সমস্ত ভার তখনও রাষ্ট্র গ্রহণ করেনি— তাই চাষের ও চাষির কল্যাণব্যবস্থা জমিদারবর্গের হাতে অর্পিত হল— যদিচ জমিদারের দুশ্চেষ্টা দমন করবার দায়িত্ব রাষ্ট্র নিজে গ্রহণ করল। ইউরোপের ফরাসি বিদ্রোহ ও বাংলার চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত একই সময়ে সাধিত হল বটে, কিন্তু ঐতিহাসিক ঘটনা হিসাবে উক্ত ঘটনাদ্বয়ের ভিতর কোনো যোগসূত্র নেই। ইউরোপে ঘটল বিপ্লব, আমাদের দেশে সুপ্রতিষ্ঠিত হল প্রাচীন বনিয়াদ। প্রাচীন বনানীর ভিতর বাইরের আলো ঠিকরানো সহজসাধ্য নয়।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে যে-ভূমিব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, তার প্রধান সূত্রগুলি সংক্ষেপে নিম্নে দেওয়া হল :

(ক) বন্দোবস্ত জমির মালিকদের সঙ্গে করা হয়েছিল। বড়ো জমিদার বা ছোটো জমিদার বা তালুকদার বা চৌধুরী বা কৃষক জমিদার— যাঁকে জমির মালিক বলে গণ্য করা হয়েছিল, তাঁকেই বন্দোবস্তের প্রথম সুযোগ দেওয়া হয়েছিল। এই বন্দোবস্তের দরুন জমিদারবর্গের ভিতর শ্রেণি বা স্তর-বিভাগ বিনষ্ট হল, এবং যাঁদের সঙ্গে বন্দোবস্ত হল তাঁরা সবাই সমস্তরে প্রতিষ্ঠিত হলেন। যেসব মালিকগণ বন্দোবস্ত গ্রহণ করলেন তাঁরা তাঁদের জমিদারি ইচ্ছামতো ও গভর্নমেন্টের অনুমোদন ব্যতীত বিক্রয়, দান ও হস্তান্তর করবার অধিকার লাভ করলেন। যদি কোনো মালিক প্রস্তাবিত রাজস্বদানের শর্তে বন্দোবস্ত গ্রহণ করতে অস্বীকার করেন, তাহলে উক্ত জমির বন্দোবস্ত অন্য কোনো ইচ্ছুক পক্ষের সঙ্গে সাব্যস্ত হত। কিন্তু সেই মালিক তাঁর মালিকানাস্বত্ব হতে বঞ্চিত হতেন না।

(খ) স্ত্রীলোক, নাবালক, মূর্খ, উন্মাদ, অসচ্চরিত্র অথবা অন্য কোনো ত্রুটিবশত জমিদারি চালনায় অক্ষম বা অশক্ত— এবংবিধ মালিকের জমিদারি চালাবার জন্য কোর্ট অব ওয়ার্ডস স্থাপনের ব্যবস্থা গভর্নমেন্ট করেছিলেন। কোর্ট অব ওয়ার্ডস-এর অধীনে থাকাকালীন রাজস্বদানে ঘাটতি জমিদারি বিক্রয়ের হেতু বলে গৃহীত হবে না।

(গ) স্থিরীকৃত ভূমিরাজস্ব অপরিবর্তিত থাকবে এবং কোনো কারণে রাজস্ব কমাবার বা বাতিল করবার দাবি গৃহীত হবে না। রাজস্ব যথাসময়ে না দিলে মালিকের জমি বিক্রয় করে রাজস্বের ঘাটতি পূর্ণ হবে।

(ঘ) মালিক কীভাবে জমি বিলি করবেন, তার মূল বিধানগুলি মুখ্যত ১৭৯৩ সালের ৮নং রেগুলেশনে বর্ণিত হয়েছে। চুক্তিপত্রে মোট খাজনা এবং তা আদায়ের ও দেওয়ার শর্তগুলি লিখিত থাকবে, এবং সেই নিয়মানুসারে সমস্ত শর্ত পালিত হবে। চুক্তিপত্রে যে-খাজনা দাবি করা হবে, তার বেশি 'আবওয়াব' বলে অগ্রাহ্য হবে। এই চুক্তিপত্র বা পাট্টা দশ বৎসরকাল বহাল থাকবে এবং দশম বৎসরে আবার নতুন চুক্তিপত্র স্বাক্ষরিত হবে। ১৭৯৩ সালের ৪৪নং রেগুলেশনে বলা হয়েছে যে, রাজস্ব ঘাটতির

ফলে জমিদারি হস্তান্তরিত হলে নতুন মালিক 'পরগনা-হারে' খাজনা দাবি করে নতুন চুক্তি স্থাপন করতে পারেন। এই 'পরগনা-হার' কর্নওয়ালিস-কোডের কোনো রেগুলেশনে ব্যাখ্যাত হয়নি।

(ঙ) ভূমিরাজস্বের পরিমাণ নিরূপণের বিধান ১৭৯৩ সালের ৮নং রেগুলেশনে বর্ণিত আছে।

বাংলা।। বিগত বৎসরে যে-পরিমাণ রাজস্বের বন্দোবস্ত ছিল, মোটামুটি তা গৃহীত হল, যদিও গভর্নর-জেনারেলের শাসন-পরিষদের মতানুসারে তার অংশ কমানো সম্ভব হত। যে-তালুক পূর্বে কখনও ভূমিরাজস্ব দেয়নি অথবা যেখানে ক্ষেত্রভূমির উপস্বত্ব সঠিকভাবে নির্ধারণ করা সম্ভব নয়, সেখানে মালিকের জন্য সাধারণত দশ ভাগের এক ভাগ রেখে অবশিষ্ট অংশ গভর্নমেন্টকে রাজস্ব বাবদ দেওয়া হত (যদিও প্রয়োজনবোধে গভর্নর-জেনারেলের মন্ত্রণা-পরিষদ এই দশ পার্সেন্টকে বাড়িয়ে দিতে পারতেন)। বিগত বৎসরের ভূমিরাজস্বহারের কোনো পরিমাপ ছিল না, কারণ সাধারণত কোম্পানি জমির উৎপন্ন মালের পরিমাণ না জেনে খেয়াল বা প্রয়োজন অনুসারে রাজস্ব স্থিরীকৃত করতেন, এবং যেখানে বা যখন জমির আয়ের নির্ধারণ চেষ্টা চলেছিল বা হয়েছিল, তাহার সত্যতা সম্বন্ধেও ভিন্ন ভিন্ন মত পোষণ করা হয়।

'বিহার।। বঙ্গাব্দ ১১৯৬ সালের সদরজমা হতে যেন রাজস্ব কমানো না হয়, এইভাবে বিহারের রাজস্ব স্থিরীকরণ প্রস্তাবিত হয়েছিল, এবং ১১৯৬ সালের রাজস্বের সঙ্গে তদানীন্তন জমির আয়ের কোনো যোগই ছিল না।

মেদিনীপুর।। বঙ্গাব্দ ১১৯৬ সালের সদরজমা হতে রাজস্বের মোট সংখ্যা পরিবর্তন করবার হেতু থাকলে সেই পরিবর্তন সাধন করা উচিত— এবংবিধ বিধান কালেক্টর মহোদয়কে দেওয়া হয়েছিল। এই অনুশাসন বাংলা বা বিহারের বিধান অপেক্ষা অনেক হিতকর।

সাধারণত বলা হয় যে, রায়তের কাছ থেকে জমিদার যা আদায় করতেন তার দশ বা এগারো ভাগের এক ভাগ রেখে অবশিষ্ট ভাগ গভর্নমেন্টকে রাজস্ব বাবদ দিতে হত। সর্বক্ষেত্রে, এমনকি সাধারণভাবেও যে এই নিয়ম প্রযুক্ত হয়েছিল তা ১৭৯৩ সালের ৮নং রেগুলেশনের বাংলা, বিহার ও মেদিনীপুর-এর রাজস্ব স্থিরীকরণের বিধান আলোচনা করলে প্রতীয়মান হয় না। তদুপরি, জমিদার রায়তের নিকটে জমির আয়ের কত অংশ আদায় করতেন, তা কর্নওয়ালিস-কোডে আখ্যাত নেই।

(চ) জমির উন্নতি বিধানে বা নতুন কর্ষণযোগ্য জমি কর্ষণাধীন হলে ভূমিরাজস্ব বাড়ানো হবে না— এই সুনিশ্চিত আশ্বাস জমিদারবর্গকে দেওয়া হয়েছিল, এবং গভর্নর-জেনারেলের শাসন-পরিষদ আশা করেছিলেন যে, মালিকগণ সে-কারণে জমিকে এবং অধীনস্থ তালুকদার ও রায়তকে যথাযথভাবে পোষণ করবেন। অধীনস্থ তালুকদার, রায়ত ও অন্যবিধ কৃষকবর্গের হিতের জন্য প্রয়োজনমতো নানা বিধান ব্যবস্থা করবার অধিকার গভর্নমেন্ট নিজের হাতে রাখলেন এবং তজ্জন্য কোনো মালিক স্থিরীকৃত ও স্বীকৃত রাজস্বদানে আপত্তি উত্থাপন করতে পারবেন না।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত সাধিত হওয়ার সময় যেসব জনপদ জনবহুল ছিল এবং যেসব জেলায় কর্ষণযোগ্য জমির বেশির ভাগ কর্ষণাধীন ছিল, সেখানে ভূমিরাজস্বের চাপ জমিদারবর্গকে নিদারুণভাবে আঘাত করল। পক্ষান্তরে, যেসব জেলায় লোকসংখ্যা বিরল ছিল এবং খিলভূমিই বেশি ছিল, সেসব স্থানে পরে নতুন জমি কর্ষিত হওয়াতে ভূমিরাজস্বের হার সহজেই কমে গেল। মোট বাংলা দেশের বেশির ভাগ জেলাতেই লোকসংখ্যার বিরলতা এবং খিলভূমির প্রাচুর্য ছিল। বাংলা দেশে অতি সহজেই লোকসংখ্যা বাড়তে থাকে, তার প্রধান কারণ বাল্যবিবাহ ও জননপ্রিয়তা। ১৭৬৯-৭০ সালে যে-ভীষণ দুর্ভিক্ষ ও মহামারি বাংলা দেশে দেখা দেয়, তার ফলে অনেক লোক মারা যায় এবং বহু জনবহুল স্থান, বিশেষত পশ্চিমবঙ্গ, প্রায় জনশূন্য হয়ে পড়ে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের রাজস্ব স্থিরীকরণের সময় বাংলা

দেশ জনতায় উক্ত দুর্ভিক্ষের পূর্ববর্তী অবস্থায় পৌছোয়নি। দুর্ভিক্ষের প্রায় ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ বৎসর পরে, অর্থাৎ ১৮০২ সালের কাছাকাছি বাংলা দেশের জনসংখ্যায় প্রাক্-দুর্ভিক্ষ অবস্থা ফিরে এসেছিল বলা যায়। এবং তার পর থেকে লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পাবার জন্য নতুন অকর্ষিত জমি কর্ষণাধীন হল। ফলে, অচিরে ভূমিরাজস্বের অল্পতা প্রকট হল। যেসব জমিদারের খিলজমি বেশি ছিল, তাদের লাভের সীমা রইল না। লোকসংখ্যা ও চাষের অবস্থার দিক দিয়ে দেখলে বর্ধমান প্রদেশ তখন সবচেয়ে উন্নত ছিল এবং তারই ফলে ভূমিরাজস্বের চাপ বর্ধমানাধিপতির উৎকণ্ঠার কারণ হয়েছিল। এই উদ্‌বেগ থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্যই তাঁর জমিদারি পত্তনিবিলি করতে হয়। এবং এইসব পত্তনিদারদের সাহায্যে তাঁর পক্ষে স্থিরীকৃত ভূমিরাজস্বের শর্ত পালন করা সম্ভব হল।

কর্নওয়ালিস-কোড প্রবর্তন এবং চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সংস্থানের ফলে বাংলার জমি ও জমিদারি-সমস্যা যে-রূপ পরিগ্রহ করল, তা সংক্ষেপে এই :

(ক) জমিদার আইনের দৃষ্টিতে জমির মালিক বলে গৃহীত হলেন এবং মালিকানাস্বত্বের নানা অধিকারে ভূষিত হলেন। মালিক হওয়ার দরুন যে অধিকার ও দাবি আইনত রায়তকে দেওয়া হয়নি, তা জমিদারবর্গের এলাকাভুক্ত বলে গণ্য হল।

(খ) স্থিরীকৃত সদরজমা সম্পূর্ণভাবে না দিতে পারলে জমিদারি বিক্রয় হবে— এই ব্যবস্থা চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পূর্বে বহাল ছিল না, এবং সেই ব্যবস্থার ফলে জমিদারি হস্তান্তরের পথ সুগম হল।

(গ) জমিদারবর্গের যথেচ্ছ খাজনা আদায় এবং স্বেচ্ছাচার খর্ব হল। রাজস্ব বা খাজনা আদায়সংক্রান্ত মামলার দায়িত্ব দেওয়ানি আদালতের উপর স্থাপিত হল। আদালতের সাহায্যে বকেয়া খাজনা আদায়ের বিধান রাজস্বদানে বাধা সৃষ্টি করল।

(ঘ) স্বাধীন তালুকদার জমিদারবর্গ থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়াতে তাঁদের প্রভাব ও স্বার্থ নানাভাবে ব্যাহত হল।

(ঙ) নতুন আবওয়াব আদায় বন্ধ হওয়াতে জমিদারবর্গের আর্থিক অসুবিধা ও রাজস্বদানে ব্যাঘাত ঘটতে লাগল।

(চ) হাট, বাজার ও অন্যান্য ব্যাবসা থেকে কর আদায় করবার ভার জমিদারের হাত থেকে কেড়ে নেওয়া হল, এবং এইভাবে তাঁর অর্থাগমের সুযোগকে সংকীর্ণতর করে দেওয়া হল।

(ছ) খাজনা আদায়ের জন্য জমিদার দ্বারা অধীনস্থ তালুকদার বা রায়তকে গৃহে বন্ধ করে রাখা বা কোনো দৈহিক পীড়ন করা অবৈধ ও দণ্ডনীয় বলে গৃহীত হল।

(জ) দেশে শান্তিবিধানের জন্য জমিদারবর্গের যে-দায়িত্ব ছিল, তা গভর্নমেন্টের হাতে দেওয়া হল।

(ঝ) বড়ো বড়ো জমিদারি, জমিদারের মৃত্যুর পর তাঁর বিভিন্ন সন্তানের ভিতর বিভক্ত না হয়ে বড়ো ছেলের দখলে যেত, এরকম দেশাচার গড়ে উঠেছিল। কিন্তু কর্নওয়ালিস-কোড সেই রীতিকে সমর্থন না করে হিন্দু ও মুসলমান আইন অনুসারে সম্পত্তি বিভাগের বিধান ব্যবস্থা করল। এই বিধান ১৭৯৪ সালের ১ জুলাই থেকে প্রযুক্ত হল।

(ঞ) ভূমিরাজস্ব স্থিরীকৃত হওয়াতে ভূমির উপস্বত্বের উপর অন্যবিধ করস্থাপনের বাধা রইল না— শুধু ভূমিরাজস্বের পরিমাণ অপরিবর্তিত থাকবে। (এই অজুহাতে বাংলা দেশে জমির আয়ের উপর নানাবিধ 'সেস' বা কর প্রবর্তিত হয়েছে এবং তা সংগ্রহ করবার ভার জমিদারবর্গের উপর ন্যস্ত হয়েছে।)

কর্নওয়ালিস-কোডের সাহায্যে যে-ব্যবস্থা প্রবর্তিত হল তার মূল কাঠামো আজ পর্যন্ত বজায় থাকলেও নানা অদলবদল কিছুদিন পর থেকেই আরম্ভ হল। তখন ভূমিরাজস্ব ছিল গভর্নমেন্টের প্রধান লক্ষ্যবস্তু। তাই ভূমিরাজস্ব আদায়ের পথকে সুগম করবার জন্য জমিদারবর্গের অভিযোগের দিকে গভর্নমেন্ট সতর্ক ছিলেন। এই রাজস্বের প্রয়োজনীয়তার কবলে রায়তের বহু অভিযোগ বিলুপ্ত হয়েছে। গভর্নমেন্ট ও আদালত জমিদারের স্বার্থকে প্রাধান্য দান করেছেন। ১৮৫৯ পর্যন্ত জমিদারবর্গের অধিকার নানাভাবে প্রসারিত হয়েছে। ১৮৫৯ সালে যে 'রেন্ট বিল' পাস হয়, তারও তাগিদ ছিল জমিদারবর্গের জন্য খাজনা আদায়ের পথকে সুবিস্তৃত করা, কিন্তু ১৮৫৯ সালের আইনে গভর্নমেন্ট রায়তের স্বার্থ একেবারে বিস্মৃতির গহ্বরে জলাঞ্জলি দেননি। তার মূলকথা নিম্নে লিপিবদ্ধ হল :

(ক) জমিতে ক্রমাগত বারো বৎসর বসবাস বা চাষ করলে রায়ত এমন স্বত্ব লাভ করবে যে, যতদিন সে খাজনা দেবে, ততদিন তাকে তার জোত হতে উৎখাত করা যাবে না। এই রায়তিস্বত্ব প্রকৃতপক্ষে প্রাচীন 'খুদকাস্ত'-স্বত্ব হতে ভিন্ন।

(খ) রেভিনিয়্যু কোর্টের সাহায্যে খাজনা নির্ধারণ। দেওয়ানি আদালত থেকে রেভিনিয়্যু কোর্টে জমিদার-রায়তের খাজনা সাব্যস্ত করবার ব্যবস্থা।

(গ) জমিদার ও প্রজার ভিতর পাট্টা ও কবুলিয়ত অদলবদল করবার চেষ্টা।

(ঘ) খাজনার ঘাটতি বাবদ সম্পত্তি ক্রোক করবার আইন সংস্কার।

(ঙ) রায়তের উপস্থিতি দাবি করবার অধিকার বিমোচন।

১৮৮৫ সালের বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইনের মূলনীতি হল :

(ক) সম্পত্তি ক্রোক করবার আইন সংস্কার এবং রায়তের স্বার্থ বজায় রাখবার ব্যবস্থা।

(খ) জমিদার-প্রজার আইন সম্পর্কিত নানা সংজ্ঞার ব্যাখ্যান।

(গ) প্রথা ও প্রথাসম্ভূত অধিকারের স্বীকৃতি।

(ঘ) প্রজার শ্রেণিবিভাগ এবং বিভিন্ন শ্রেণির বিশিষ্টতার বর্ণনা।

(ঙ) আদালতের ডিক্রি ব্যতীত প্রজা উৎপাটন বন্ধ।

(চ) খাজনা বৃদ্ধির কারণ সবিশেষভাবে নির্ধারণ।

(ছ) রায়তের জমি ও স্বত্ব বিবৃতির ব্যবস্থা।

১৯২৮ সালের বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইনের প্রধান সূত্র হল :

(ক) 'টেনেন্ট'-সংজ্ঞা থেকে বর্গাদার ও ভাগদারকে উন্মোচন।

(খ) জমিদারকে 'সেলামি' দানে স্বত্ববান রায়তের জোত অবাধহস্তান্তরের ব্যবস্থা কিন্তু শতকরা দশ টাকা বেশি দামে জমিদারবর্গের উক্ত জোত ক্রয় করবার প্রথম অধিকার প্রদান।

(গ) নিম্ন-রায়তের রায়তিস্বত্ব লাভের ব্যবস্থা।

(ঘ) মানিঅর্ডারের সাহায্যে খাজনা দান।

(ঙ) সম্পত্তি ক্রোক করবার আইন সম্পূর্ণভাবে বাতিল।

(চ) কোনো-কোনো স্থলে খাজনা আদায়ের সুযোগ বিস্তার।

১৯৩৮ সালের বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইনের মূল সূত্র :

(ক) স্বত্ববান রায়তের জোত হস্তান্তর করবার জন্য যে জমিদারকে সেলামি দেওয়া হত, তা বাতিল হল এবং শতকরা দশ টাকার বেশি ক্ষতিপূরণ দিয়ে জমিদারের জোত কিনবার প্রথম অধিকার খর্ব হল।

(খ) খাজনা বৃদ্ধি করবার সমস্ত ধারা দশ বৎসরের জন্য রদ হল।

(গ) আবওয়াব আদায় করলে জরিমানার বন্দোবস্ত।

(ঘ) বকেয়া খাজনার সুদ বাৎসরিক শতকরা ১২½ টাকা থেকে ৬¼ টাকায় কমানো হল।

(ঙ) 'পাবলিক ডিম্যান্ডস রিকভারি অ্যাক্ট' অনুসারে বকেয়া খাজনা আদায়ের যে-সুবিধা জমিদারবর্গ পেতেন, তা একেবারে রদ করে দেওয়া হল।

(চ) রায়তের জোত বিভাগ করবার অধিকতর স্বাধীনতা দেওয়া হল।

বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইনের অদলবদল নানা অজুহাতে ঘটেছে এবং নানাকারণে প্রয়োজনীয় ও আদর্শ সংস্কার সাধিত হয়নি। জমির বা চাষের উন্নতির জন্য কোনো পক্ষ নিজের স্বার্থ বলি দিতে প্রস্তুত হননি। অধিকার সম্বন্ধে যেমন বিভিন্ন পক্ষ মুখর, তেমনই তাঁরা দায়িত্বপালন সম্বন্ধে মূক। গভর্নমেন্টের উপর প্রভাব যে-পক্ষের বেশি থাকত, জয়ী তাঁরাই হতেন। কিন্তু জাতির স্বার্থ তাতে বজায় থাকে না। বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইন আলোচনা করলে দেখা যায় যে, প্রজা তিনপ্রকার— মধ্যস্বত্বভোগী (প্রজাস্বত্ব আইনে তারা 'টেনিউর হোল্ডার' বলে পরিচিত), রায়ত এবং নিম্ন-রায়ত। যাঁরা মধ্যস্বত্বভোগী, অর্থাৎ জমিদার ও রায়তের মধ্যে অবস্থিত, তাঁদের বর্ণ ও গোত্র জমিদারের। মোটকথা তাঁরা ভূম্যধিকারীর দলে। এই মধ্যস্বত্বভোগীর বহু স্তর আছে এবং যেখানে জমিদারবর্গের মুনাফা বেশি, সেখানে মধ্যস্বত্বভোগীর স্তরবিন্যাস অত্যন্ত ব্যাপক হয়েছে। এই মধ্যস্বত্বভোগীর দায়িত্ব অধস্তন পক্ষ থেকে খাজনা আদায় করা এবং উর্ধ্বতন পক্ষকে স্থিরীকৃত খাজনা দান করা। এঁদের সঙ্গে চাষের উন্নতির বা অবনতির কোনো যোগ নেই। যেসব মধ্যস্বত্বভোগীর সঙ্গে স্বত্ববান রায়তের যোগ, তাঁরাও খাজনা আদায় করেই নিজের দায়িত্ব সম্পন্ন করেন। অধস্তন রায়ত বা মধ্যস্বত্বভোগীর নিকট হতে খাজনা আদায় করে উর্ধ্বতন মধ্যস্বত্বভোগী বা জমিদারকে তাদের দেয় খাজনা দিয়ে যে-মুনাফা তার রইল, তার সাহায্যে চলে তার জীবিকানির্বাহ এবং ভোগবিলাস। রায়তের স্বত্ব যতই বিস্তৃত হয়েছে, জমিদার ও মধ্যস্বত্বভোগীর দল শুধু খাজনা সংগ্রাহকের পদে অধিষ্ঠিত হয়েছেন। ভূমির সঙ্গে সংযোগ নেই, অথচ তাঁরা ভূম্যধিকারী। এই অসংগত ব্যবস্থা আজ আইনের সম্মতি দ্বারা পূত ও মূর্ত। যে নিজের দ্বারা বা পরিবারের অন্য লোকের সাহায্যে বা তার অংশীদারের দ্বারা চাষ করবার জন্য মালিক বা মধ্যস্বত্বভোগীর নিকটে জমিবিলি গ্রহণ করে, সে রায়ত। যে চাষের জন্য রায়তের নিকটে জমিবিলি গ্রহণ করে, সে নিম্ন-রায়ত। সাধারণত একশো বিঘার বেশি জমিবিলি কেহ গ্রহণ করলে, তাকে মধ্যস্বত্বভোগী বলে গণ্য করা হয়, যদি সে নিজেকে রায়ত বলে প্রমাণ করতে না পারে। রায়ত তিনপ্রকার, যথা (১) যার খাজনা বা খাজনার হার অপরিবর্তিতভাবে স্থিরীকৃত হয়েছে; (২) যার জোত ভোগ করবার অধিকার ও স্বত্ব আছে; এবং (৩) যার সেই অধিকার ও স্বত্ব নেই। ১৯৩৮ সালের প্রজাস্বত্ব আইনে রায়তের বিভিন্ন স্তর প্রায় একই শ্রেণিতে নিবদ্ধ হয়েছে, কারণ খাজনা বৃদ্ধি করবার যেসমস্ত বিধি ছিল তা ১৯৩৭ সালের ২৭ আগস্ট থেকে দশ বৎসরের জন্য বাতিল হয়েছে।

প্রজাস্বত্ব আইনের ফলে বা সাহায্যে বাংলার ভূমি-ব্যবস্থায় নিম্নলিখিত বিধান সম্মতি লাভ করেছে :

(ক) প্রজাস্বত্ব আইনে জমিদার বা মধ্যস্বত্বভোগী বা স্বত্ববান রায়তের কোনো কর্তব্যসম্পাদনের দায়িত্ব নেই— একমাত্র খাজনা দেওয়া বা সংগ্রহ করা ব্যতীত। চাষের বা চাষির উন্নতির জন্য তাঁদের কোনো জবাবদিহি নেই, এবং তাঁদের উদাসীনতার প্রতিকারের কোনো ব্যবস্থাই করা হয়নি।

(খ) চাষ না করে এবং নিজের জমিতে অধিবাসী না হয়ে রায়তিস্বত্ব ভোগ করা যায়। স্বত্ববান রায়ত তাঁর সমস্ত জোত নিম্ন-রায়তের কাছে বিলি করে মধ্যস্বত্বভোগীদের মতো চাষের ব্যাপারে উদাসীন থাকতে পারেন। রায়তের স্বত্ব একান্ত ব্যক্তিগত, তা জোতের চাষের সঙ্গে সংযুক্ত নয়। তাই প্রকৃত ও নিপুণ চাষির পরিপোষণের পরিকল্পনার অভাব প্রজাস্বত্ব আইনে লক্ষিত হয়।

(গ) নিম্ন-রায়তের সঙ্গে যোগ হল উর্ধ্বতন রায়তের এবং তাঁদের খাজনার মুনাফা ভোগ করেন স্বত্ববান রায়ত। নিম্নরায়তের মধ্যেও স্তরবিভাগ আছে। নিম্ন-রায়তের অভিযোগ মীমাংসার দায়িত্ব তার উধ্বর্তন রায়তের।

(ঘ) প্রজাস্বত্ব আইন মালিকানাস্বত্বের ভাগবাঁটোয়ারা করেছে কিন্তু জমির উন্নতির দিকে দৃষ্টি দেয়নি, তাই চাষের কোনো সুসংগত ব্যবস্থা করা তার দায়িত্ব ছিল না। এমনকি, যদি কেউ জমির উন্নতিকল্পে অর্থ, যত্ন ও উদ্যম ব্যয় করতে চান, রায়তের স্বত্ব ও নানাবিধ অধিকার তাঁর প্রচেষ্টাকে খর্ব করে দেবে। প্রজাস্বত্ব আইনে জমির উন্নতিবিধানের জন্য কোনো বন্দোবস্তই রচিত হয়নি।

(ঙ) হস্তান্তর ও বিভক্ত করবার সুযোগ থাকাতে রায়তের জোত এমনভাবে টুকরো করা যায় যে, একটি জোত এক টাকার অধিক খাজনা বহন করবে না। মোটামুটি বলা যায় যে, এক বিঘা পর্যন্ত রায়তের জোতকে বিভাগ করবার সম্মতি প্রজাস্বত্ব আইনে আছে।

চাষের উন্নয়ন এবং জমির পরিপোষণকে অস্বীকার করে স্বত্বের প্রসারণ সংগত নয়, বিশেষত কৃষির সঙ্গে আমাদের শিল্পের এবং অন্যবিধ আর্থিক উন্নতির সংযোগ যখন অত্যন্ত নিবিড়। ক্ষেত্রভূমি অর্থাৎ চাষের জমি যে প্রধানত ব্যক্তির নয়, তা যে সমগ্র জাতির, এই প্রতীতির সঙ্গে বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইনের সংশ্লেষ সুগভীর নয়। তারই ফলে, বাংলার ভূমিসমস্যা জাতিগত সমস্যার রূপে প্রকট হয়েছে। সমস্যাকে নিয়ে ছিনিমিনি খেললে সমস্যা জটিলতর হয় এবং সমাধানের পথ সংকীর্ণতর হয়। এই জটিল আবর্তে ও সংকীর্ণ বর্ত্মে বাঙালির সামাজিক সংস্থান ও আর্থিক ব্যবস্থা অপকর্ষের চরম সীমায় এসে উপস্থিত হয়েছে।

বাংলার আর্থিক অবস্থার সঠিক চিত্র পেতে হলে গভর্নমেন্ট-সংগৃহীত পরিসংখ্যানের উপর নির্ভর করতে হবে। ক্ষেত্রভূমির মাপজোখ এবং রাজস্ব ও খাজনার হার ইত্যাদি ভূমিসম্পর্কিত বিবিধ তথ্য জানতে হলে বিভিন্ন জেলার জরিপ-রিপোর্টের আশ্রয় নিতে হয়। কিন্তু ওইসব রিপোর্টে হালের তথ্য থাকে না। এই নিরুপায় অবস্থায় যতখানি সাম্প্রতিক তথ্য সংগ্রহ করা যায়, তার সাহায্যে বাংলার আর্থিক অবস্থার আলেখ্য নিম্নে দেওয়া হল।

বাংলা দেশে ৩৯,১৫৮,১৬৯ একর (acre) জমি চিরস্থায়ীভাবে জমিদারবর্গের সঙ্গে বন্দোবস্ত আছে, তার ভূমিরাজস্ব ২৩১ লক্ষ টাকা। অস্থায়ীভাবে জমিদারবর্গের সঙ্গে বন্দোবস্ত আছে, ১০,০৯৯, ৮৫৩ একর জমি এবং তার রাজস্ব ৮৩ লক্ষ টাকা। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত অনুসারে জমিদার জমির মালিক এবং তাই তাঁর দেয় খাজনাকে রাজস্ব (revenue) বলা হয় এবং যেখানে অস্থায়ী বন্দোবস্ত বা যেখানে গভর্নমেন্টের খাস মহল জমি (অর্থাৎ গভর্নমেন্ট জমিদার) সেখানে গভর্নমেন্ট যে-খাজনা পান, তাকে খাজনা (rent) বলে ধরা হয়। অস্থায়ী বন্দোবস্তের আয়ুষ্কাল শেষ হলে খাজনার হার গভর্নমেন্ট বাড়াতে পারেন। ভূমি ভোগ করবার জন্য গভর্নমেন্টকে যা দেওয়া হয়, তাকে ভূমি-রাজস্ব বলে গ্রহণ করলে গড়পড়তা প্রতি একর ভূমি-রাজস্বের হার দাঁড়ায় এরূপ :

	চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত	অস্থায়ী বন্দোবস্ত	খাসমহল
কর্ষিত জমি	১৫ আনা	১ টাকা ৪ আনা	৩ টাকা ২ আনা
মোট জমি	৯ আনা	১২ আনা	১ টাকা ১৫ আনা

সমগ্র ব্রিটিশ ভারতে শতকরা ৩৬ ভাগ জমি রায়তের সঙ্গে বন্দোবস্ত, শতকরা ৩৯ ভাগ জমি অস্থায়ীভাবে জমিদারবর্গের সঙ্গে বন্দোবস্ত এবং শতকরা ২৫ ভাগ জমি স্থায়ীভাবে বন্দোবস্ত।

জরিপ-রিপোর্টের মতে বাংলার কর্ষণাধীন জমি ২৮.৯ মিলিয়ন একর; রায়তি জমির পরিমাপ ৩১.১ মিলিয়ন একর (রায়তি বাস্তুভূমি ও অন্যান্য ভূমি ৬.২ মিলিয়ন একর); রায়তি কর্ষণাধীন ভূমি ২৪.৯ মিলিয়ন একর; জমিদার ও মধ্যস্বত্বভোগীর খাসজমির পরিমাপ ৪ মিলিয়ন একর।

বঙ্গীয় ফ্লাড কমিশন (১৯৪০) নিম্নলিখিত তথ্যের সন্ধান দিয়েছেন :

বাংলার ভূমিরাজস্ব ৩১১.৪৮ লক্ষ টাকা।

রায়তি খাজনা (বর্গা খাজনা সমেত) ১,১৩২.০৪) লক্ষ টাকা।

জমিদার ও মধ্যস্বত্বভোগীর খাসজমির খাজনা (রায়তি হারে গণ্য হলে) ১৫০.০৪ লক্ষ টাকা।

নিম্ন-রায়তবর্গের খাসজমির মোট খাজনা ১৮৮.০৫ লক্ষ টাকা জমিদার বা মধ্যস্বত্বভোগীর হাতে পৌছোয় না। তাঁরা শুধু রায়তি খাজনার উপভোক্তা।

বাংলা দেশে রাজস্ব-দেয় সম্পত্তির সংখ্যা ১০২; 'টেনিউর'-এর সংখ্যা ২.৭ মিলিয়ন; রায়তের সংখ্যা ১৬.২ মিলিয়ন; নিম্ন-রায়তের সংখ্যা ৪.৮ মিলিয়ন। মোটের উপর প্রতি রায়তি জোতের পরিমাপ ১.৯ একর, এবং নিম্ন-রায়তের জোতের পরিমাপ ০.৬৪ একর। ১৯,৫৯৯ সংখ্যক পরিবার সম্বন্ধে অনুসন্ধান করে দেখা গিয়েছে যে, ২ একরের কম জমি শতকরা ৪৬ পরিবারের আছে, ২-৩ একরেব মধ্যে শতকরা ১১.২ পরিবার, ৩-৪ একরের মধ্যে শতকরা ৯.৪ পরিবার, ৪-৫ একরের মধ্যে শতকরা ৮ পরিবার, ৫-১০ একরের মধ্যে শতকরা ১৭ পরিবার এবং ১০ একরের ঊর্ধ্বে শতকরা ৮.৪ পরিবার। সাধারণত ধরা হয় যে, অন্তত ৩ থেকে ৫ একর হল অর্থকরী জোতের পরিমাপ যার উপর একটি পরিবার (অর্থাৎ পাঁচ জন লোক) নির্ভর করতে পারে। অবশ্য জমির প্রকারভেদে এবং কৃষির প্রথাভেদে এই অর্থকরী জোতের পরিমাপ বাড়ে বা কমে।

একজন রায়ত-পরিবারের বিভিন্ন স্বত্ব থাকতে পারে। নিম্ন-রায়তি স্বত্বেরও নানা বিভাগ আছে। একজন রায়তের রায়তিস্বত্ব, নিম্ন-রায়তিস্বত্ব ও বর্গাস্বত্ব থাকতে পারে। ফ্লাড কমিশন ১৯,৫৯৯ সংখ্যক রায়ত-পরিবার সম্বন্ধে অনুসন্ধান করে দেখেছেন যে, শতকরা ১২.২ পরিবার মুখ্যত বর্গার উপর নির্ভরশীল এবং শতকরা ২২.৫ পরিবার স্বত্বহীন কৃষিশ্রমের উপর নির্ভরশীল। তাঁদের অনুসন্ধানে আরও প্রকাশিত হয়েছে যে, শতকরা ৬৫.৯ ভাগ কর্ষণাধীন জমি রায়ত-পরিবার দ্বারা কর্ষিত হয়, শতকরা ২১.১ ভাগ জমি বর্গাদার দ্বারা কর্ষিত হয় এবং শতকরা ১৩.১ ভাগ জমি শ্রমিক দ্বারা কর্ষিত হয়।

বাংলা দেশে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত জমিদারিতে রায়তি খাজনার হার প্রতি একর ৩ টাকা; অস্থায়ী বন্দোবস্ত জমিদারিতে রায়তি খাজনার হার প্রতি একর ৪ টাকা ৬ আনা এবং গভর্নমেন্ট খাসমহল জমিদারিতে রায়তি খাজনার হার প্রতি একর ৪ টাকা ১১ আনা। রায়তি ও নিম্ন-রায়তির খাজনার হার গড়পড়তা প্রতি একরে বাংলার নানা জেলায় কতটা বিভিন্ন, তা নিম্নে দেওয়া হল :

জিলা	রায়তি খাজনার হার : প্রতি একর	নিম্ন-রায়তি খাজনার হার : প্রতি একর
বাখরগঞ্জ	৪ টাকা ৮ আনা	৭ টাকা ৭ আনা
বাঁকুড়া	১ টাকা ১৩ আনা	২ টাকা ৭ আনা
বীরভূম	৩ টাকা ১৪ আনা	৬ টাকা ৪ আনা
বগুড়া	২ টাকা ১৪ আনা	৮ টাকা ৫ আনা
বর্ধমান	৩ টাকা ১৫ আনা	৭ টাকা ৬ আনা
চট্টগ্রাম	৪ টাকা ১১ আনা	৫ টাকা ৩ আনা
ঢাকা	২ টাকা ১৩ আনা	৫ টাকা ৬ আনা

দিনাজপুর	২ টাকা ৭ আনা	৫ টাকা ১২ আনা
ফরিদপুর	২ টাকা ৯ আনা	৩ টাকা ১৩ আনা
হুগলি	৮ টাকা ৩ আনা	১৬ টাকা ১ আনা
হাওড়া	৭ টাকা ১৫ আনা	১৭ টাকা ১ আনা
জলপাইগুড়ি	২ টাকা ৫ আনা	৩ টাকা ৯ আনা
যশোহর	২ টাকা ৮ আনা	৩ টাকা ১৪ আনা
খুলনা	৩ টাকা ৬ আনা	৫ টাকা ৪ আনা
মেদিনীপুর	৩ টাকা ১৫ আনা	৫ টাকা ৮ আনা
মালদহ	২ টাকা ৪ আনা	৫ টাকা ৫ আনা
মুর্শিদাবাদ	৩ টাকা ৭ আনা	৫ টাকা ১২ আনা
ময়মনসিংহ	২ টাকা ১৪ আনা	৪ টাকা ১১ আনা
নদিয়া	২ টাকা ৭ আনা	৪ টাকা ৮ আনা
নোয়াখালি	৪ টাকা ৪ আনা	৬ টাকা ১০ আনা
পাবনা	৩ টাকা ১ আনা	৫ টাকা ১০ আনা
রাজশাহি	৩ টাকা ৩ আনা	৫ টাকা ১৪ আনা
রংপুর	৩ টাকা	৬ টাকা ৮ আনা
ত্রিপুরা	৩ টাকা ২ আনা	৬ টাকা ১১ আনা
চব্বিশ পরগনা	৫ টাকা ১৩ আনা	১১ টাকা ১৩ আনা
দার্জিলিং	২ টাকা ৫ আনা	৩ টাকা

১৯৪১-৪২ সনের বাংলা গভর্নমেন্টের কৃষিবিষয়ক পরিসংখ্যান-বিবৃতি থেকে নিম্নলিখিত তথ্য সংগৃহীত হল :

কর্ষণাধীন ভূমির পরিমাপ ২৫.৪ মিলিয়ন একর।
কর্ষণযোগ্য পতিত জমি ৪ মিলিয়ন একর।
একাধিকবার কর্ষিত জমি ৫.৫ মিলিয়ন একর।
মোট কর্ষিত জমি ৩১ মিলিয়ন একর।
চাষের জমির পরিমাপ ২৩ মিলিয়ন একর।
মোট খাদ্যশস্যের জমি ২৫.৮ মিলিয়ন একর।
পাটের জমি ১.৫ মিলিয়ন একর।
বাংলা দেশের মোট আয়তন ৫০ মিলিয়ন একর।
বনভূমির আয়তন ৪.৬ মিলিয়ন একর।

১৯৪১ সনের আদমসুমারির তালিকা বাংলা দেশের অতিপ্রজতা বিষয়ে আভাস দেয়। বাংলার মোট জনসংখ্যা ৬০ মিলিয়ন এবং গড়পড়তা প্রতি বর্গ মাইলে ৭৪২ জন বসবাস করে। কৃষিপ্রধান দেশে এরূপ ঘনত্ব দারিদ্রের লক্ষণ। উন্নত কৃষি ও শিল্পের সাহায্য ব্যতীত ৬০ মিলিয়ন লোকের খাদ্যসমস্যা মেটাবার জন্য ২৫ মিলিয়ন একর জমি যথেষ্ট হতে পারে না।

বাংলার ভূমিসমস্যা ও কৃষিসমস্যার সম্যক পরিচয় লাভ করতে হলে ভূমি ও কৃষির অবনতির কারণ অনুসন্ধান করা প্রয়োজন। বাংলার দুর্গতির ইতিহাস হল এই ভূমি ও কৃষির দুর্গতির ইতিহাস। এই করুণ ইতিহাস পর্যালোচনা করলে নিম্নলিখিত লক্ষণগুলি সর্বাগ্রে চোখে পড়ে :

(ক) বাংলা দেশে, বিশেষত বর্ধমান ও প্রেসিডেন্সি বিভাগে, ভূমি ও কৃষির অবনতি নানা কারণে ঘটছে। উনিশ শতকের শেষার্ধে 'বর্ধমান ফিভার' নামে যে-সংক্রামক ব্যাধি দেখা দিল তার পর থেকে উক্ত দুই বিভাগে স্বাস্থ্য ক্রমশই অবনতির দিকে এগিয়ে চলল। সেই ব্যাধির হেতু নির্ধারণ প্রসঙ্গে বর্ধমান 'এপিডেমিক কমিশন'-এর রিপোর্ট এবং পরবর্তী রাজকর্মচারীদের অভিমত থেকে জানতে পারা যায় যে, বদ্ধ জলাশয় হল উক্ত সংক্রামক ব্যাধির মুখ্য কারণ। বাংলার নদী মাঝে মাঝে তার গতি বদলায়, এবং এই পরিবর্তনের ফলে অনেক স্থানের স্বাস্থ্য ও কৃষির অবনতি ঘটে। ম্যালেরিয়ার জন্য স্বাস্থ্য নষ্ট হয় এবং স্বাস্থ্য ভেঙে পড়লে কর্ষণযোগ্য জমি অব্যবহৃত থাকে। জমি কিছুদিন পতিত থাকলে ম্যালেরিয়ার আকর হয়ে ওঠে। এইভাবে বর্ধমান ও প্রেসিডেন্সি বিভাগের জমির অবনতি ঘটছে।

(খ) বাংলা দেশে অতিপ্রজতা এবং অন্নের অভাব থাকা সত্ত্বেও বহু পতিত জমি অব্যবহৃত অবস্থায় আছে। জলের অভাব, অর্থের অভাব, স্বাস্থ্যের অভাব, চেষ্টার অভাব— সমস্ত কিছুর অভাবেই পতিত জমির পরিমাণ বাড়ছে— যদিচ প্রতি বৎসর লোকের সংখ্যা বাড়ছে বই কমছে না।

(গ) আমাদের দেশে রায়তের শিক্ষার অভাব। তাছাড়া উন্নত চাষের চেষ্টা নেই বলে জমির উৎপাদিকা শক্তি ক্রমশই কমে আসছে। বাংলা দেশে সাধারণত ২৩ মিলিয়ন একর জমিতে মাত্র ৮ মিলিয়ন বা ১০ মিলিয়ন টন চাল উৎপন্ন হয়। অশিক্ষিত ও ভগ্নস্বাস্থ্য রায়তবর্গের সাহায্যে উন্নত চাষ প্রচলন সম্ভব হয় না।

(ঘ) জমিদারির মুনাফা এবং ভূমি-সম্পত্তির নির্বিঘ্নতা বাংলার ধনী ও মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়কে জমির দিকে আকৃষ্ট করেছে। ফলে, বাঙালির অর্থ ভূমিসম্পত্তির অধিকার লাভ করবার চেষ্টায় ব্যয়িত হয়েছে— শিল্প ও কৃষির 'উন্নতিকল্পে যথেষ্ট যত্ন ও অর্থ প্রযুক্ত হয়নি। বাংলার অধিকাংশ লোকই ভূমি-সম্পত্তির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট, এবং ভূম্যধিকারীদের ভিতর ব্যাপক স্তরবিন্যাস বাংলার সমাজের ও আর্থিক ব্যবস্থার বিশিষ্টতা।

(ঙ) আমাদের দেশে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় কৃষিকে জীবন-ধারণের অবলম্বন বা ব্যাবসার অঙ্গ হিসাবে গ্রহণ করেননি। ফলে, কৃষি-ব্যাবসা অত্যন্ত অনাদরে ও অযত্নে চালিত হয়। কৃষিকে ব্যাবসা হিসাবে না দেখে মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় শুধু লগ্নি-কারবারের প্রধান উপাদান বলে গ্রহণ করেন। তাই মহাজনি বাংলায় মধ্যবিত্ত শ্রেণির প্রধান ব্যবসায়। কৃষির অবনতির সঙ্গে লগ্নি-কারবারের বিপত্তি বেড়েছে।

(চ) রায়তের জোত অত্যন্ত অসংগতভাবে বিভক্ত; বিভিন্ন শ্রেণির রায়ত ও নিম্ন-রায়তের সংখ্যা ক্ষেত্রভূমির তুলনায় অত্যন্ত অধিক; চাষ করবার বলদের সংখ্যা বেশি, কিন্তু তাদের শক্তি স্বল্প; কৃষি-ব্যাবসাকে লাভবান করবার অন্তরায় বহুল; কর্ষণাধীন জমির উপর অত্যধিক লোকসংখ্যার চাপ; অপ্রতুল উপস্বত্বের উপর বহু রায়ত-পরিবার নির্ভরশীল— এবংবিধ বহু সমস্যার জালে বাংলার ভূমি-ব্যবস্থা আবদ্ধ।

বাংলার ভূমি-সমস্যার যে-আলেখ্য দেওয়া হল, তা হল বাঙালির প্রধান সমস্যা। এই সমস্যা বাঙালির দৈন্যের কারণ এবং জাতির পক্ষে লজ্জাকর।

২

বাংলার জমি, জমা ও জোত সম্বন্ধে যেসব সমস্যা গড়ে উঠেছে তার সমাধানের পথ সহজ নয়। সমাধানের পথ নির্ণয় করবার পূর্বে আমাদের নিম্নলিখিত বিষয় স্মরণ রাখতে হবে :

(ক) বাংলার পাটের জমির সঙ্গে কৃষকের আর্থিক অবস্থা অধিকতরভাবে যুক্ত থাকলেও ধান-জমির পরিমাণই বেশি। বাংলার বিভিন্ন জেলায় কর্ষিত জমির কত অংশ ধান-জমি তা দেখলে বুঝা যাবে যে বাংলা প্রধানত ধান উৎপাদনের দেশ।

ধান্যভূমির অংশ	ধান্যভূমির অংশ
নদিয়া—৯২.৪	দিনাজপুর—৮০.৫
মুর্শিদাবাদ—৮২.৩	রংপুর—৬০.৯

ধান্যভূমির অংশ	ধান্যভূমির অংশ
যশোহর—৮৫.৭	বগুড়া—৯৬.৩
ম—৯৭.৩	রাজশাহি—৮৭.৩
া—৯৪.৪	ঢাকা—৭৪.৬
মেদিনীপুর—৯৪.৮	ফরিদপুর—৮৪.৫
হুগলি—৯৫.১	ত্রিপুরা—৯৭.১
	চট্টগ্রাম—৯৭.১

বিভিন্ন জেলায় গড়পড়তা প্রতি বিঘায় কত ধান উৎপন্ন হয় তা ১৯৩৯ সালের বঙ্গীয় ধান ও চাল তদন্ত কমিটির রিপোর্ট থেকে দেওয়া হল :

বগুড়া	—	৪ থেকে ৮ মন	কিশোরগঞ্জ	—	৪ মন আউশ
					৮ মন আমন
দিনাজপুর	—	৬ মন			
রংপুর	—	৬ মন	কুমিল্লা	—	৫ থেকে ৭ মন
বরিশাল	—	৫ মন আমন	যশোহর	—	৬ মন
		৩ মন আউশ			
ঢাকা	—	৬ থেকে ৬$\frac{১}{২}$ মন	নদিয়া	—	৫ থেকে ৬ মন
			বাঁকুড়া	—	৬ থেকে ৮ মন
সিরাজগঞ্জ	—	৫ থেকে ৬ মন	মেদিনীপুর	—	৬ থেকে ৭ মন
ময়মনসিংহ	—	৩ থেকে ৪ মন আউশ	বর্ধমান	—	৬ মন
		৬ থেকে ৭ মন আমন	বীরভূম	—	৮ মন

(খ) বাংলা দেশে জমিদারের সংখ্যা প্রচুর এবং স্তরবিভাগ ব্যাপক কিন্তু বিত্তশালী জমিদারের সংখ্যা অত্যন্ত অল্প। বাংলার প্রাদেশিক আইনসভায় জমিদারবর্গের প্রতিনিধি নির্বাচন করবার ভোটদাতার সংখ্যা এক হাজারের অধিক নয়। যাঁরা বর্ধমান ও প্রেসিডেন্সি বিভাগে ভূমিরাজস্ব বা খাজনা বাবদ তিন হাজার টাকা দেন অথবা সাত শত টাকা পাবলিক ওয়ার্কস ও রোড সেস দেন এবং ঢাকা, রাজশাহি ও চট্টগ্রাম বিভাগে ভূমিরাজস্ব বা খাজনা বাবদ দুই হাজার টাকা অথবা পাঁচ শত টাকা পাবলিক ওয়ার্কস ও রোড সেস দেন, তাঁরাই ভোট দিতে পারেন। মোটকথা বলা যায় যে, বাংলা দেশে যেসব জমিদারবর্গের দশ হাজার টাকা আয়, তাঁরা ভোটের অধিকারী হন, অথচ এবংবিধ ভোটদাতার সংখ্যা মাত্র এক হাজার।

(গ) বাংলার রায়তবর্গ সাধারণত জীবনধারণের জন্য চাষ করেন, লাভের জন্য নয়। জোতের পরিমাপ অসম্ভবরকম ক্ষুদ্র হওয়ার দরুন চাষের প্রণালী অনুন্নত থেকে যায়, চাষির এবং বলদের অপচয় ঘটে। চাষের খরচ বাড়ে এবং জমির পূর্ণ ব্যবহার সম্ভব হয় না। কৃষিকে শিল্প, ব্যাবসা ও জীবনযাত্রা প্রচলনের বিধায়ক হিসেবে গ্রহণ করতে হবে। বাংলার রায়তবর্গের ধারণা অন্যরূপ, তাঁরা শুধু জীবনধারণের একমাত্র অবলম্বন হিসাবে গ্রহণ করেন। সেই অবলম্বনকে জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদে পরিণত করতে হলে যতটা শ্রম, দরদ ও প্রীতি থাকা প্রয়োজন তা নানা কারণে অবর্তমান। এ বিষয়ে চিনদেশের কৃষকের কার্যক্ষমতা প্রশংসনীয় ও অনুসরণীয়। বিজ্ঞানের সাহায্য গ্রহণ না করেও প্রতি কৃষকের উৎপাদনশক্তি কতটা উন্নত হতে পারে, তা চিনদেশে দেখা যায় এবং চৈনিক কৃষকের নিপুণ কর্মকুশলতা অত্যন্ত বিস্ময়কর। ভারতবর্ষে প্রতি একরে ৮৩৩ পাউন্ড চাল হয় এবং চিনদেশে প্রতি একরে ১৭৫০ পাউন্ড চাল হয়।

(ঘ) বাংলা দেশে জমিদার ও কৃষকবর্গ দু-পক্ষই ঋণভারে অবসন্ন। প্রাদেশিক ব্যাংকিং তদন্ত কমিটি প্রকাশ করেছেন যে, বাংলার কৃষকবর্গের ঋণ এক শত কোটি। অধ্যাপক প্রশান্ত মহলানবিশ পরিচালিত *সংখ্যা* পত্রিকার ১৯৩৪ সালে আগস্ট সংখ্যায় এক নিবন্ধে বলা হয়েছে যে, বাংলার কৃষকদের ঋণ প্রায় ২১০ কোটি এবং জমিদারবর্গের ঋণ ৪০.৬৮ কোটি টাকা। এই ঋণের কতটা অংশ প্রয়োজনে এবং কতটা খামখেয়াল বা নির্বুদ্ধিতার ফল, তা অনুসন্ধান করলে চারিত্রিক ও সামাজিক দুর্বলতার পরিচয় মিলবে। তাই ঋণ-বিমোচন সমস্যার সঙ্গে ব্যক্তিগত ও গোষ্ঠীগত সমস্যা জড়িত।

(ঙ) বাংলা দেশের জমিদারিপ্রথার রহস্য বুঝতে হলে জমিদার ও রায়তের স্তরবিভাগ সম্বন্ধে সঠিক ধারণা থাকা প্রয়োজন। এই স্তরবিভাগের সম্যক পরিচয় দেবার জন্য মি. জাস্টিস ফিল্ড তাঁর প্রামাণিক গ্রন্থে এক ছক কেটেছেন তা নিম্নে দেওয়া হল :
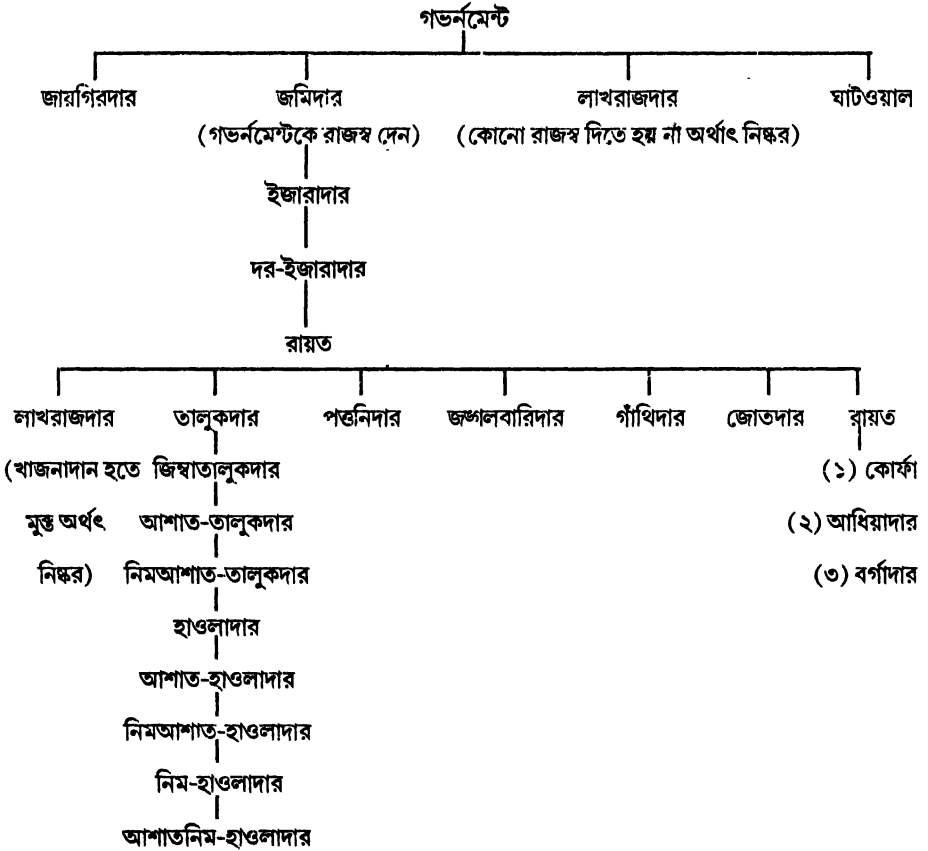
মধ্যস্বত্বভোগীদের ভিতর মৌরসিস্বত্ব (পুরুষানুক্রমে ভোগ্য), মোকররিস্বত্ব (নির্দিষ্ট খাজনা) এবং মৌরসি-মোকররিস্বত্ব আছে। বিভিন্ন জেলায় মধ্যস্বত্বভোগীর স্তরবিন্যাস বিভিন্নরূপে দেখা দিয়েছে। ফলে, বাংলার জমিদারিপ্রথা অত্যন্ত জটিল ও কুটিল পথ গ্রহণ করেছে এবং জমির মালিকানাস্বত্বে বহু লোক সংশ্লিষ্ট হয়েছে।

বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইনের সাহায্যে বাংলার জমিদার ও রায়তের ব্যক্তিগত সম্বন্ধ লোপ পেয়েছে। বকেয়া খাজনা আদায়, বকেয়া খাজনার দরুন উচ্ছেদসাধন এবং জমিদার-রায়তের পারস্পরিক আদান-

প্রদান সমস্তই আদালতের সাহায্যে হয়। জমিদারবর্গের অভিযোগ যে, খাজনা আদায়ের সহজ উপায় নেই, অথচ রাজস্বদানের সামান্য ত্রুটিও গভর্নমেন্ট ক্ষমার চোখে দেখেন না। দেওয়ানি আদালতের সাহায্যে খাজনা আদায় অত্যন্ত সময়সাপেক্ষ এবং বকেয়া খাজনার পরিমাণ ক্রমশ বাড়তেই থাকে। বকেয়া খাজনার মামলা অবিলম্বে নিষ্পত্তি না হবার নানাবিধ কারণের মধ্যে নিম্নলিখিত কারণ দ্রষ্টব্য :

(ক) আদালতের পিয়োন ও অন্যান্য কর্মচারীর সততার অভাব থাকার দরুন নোটিশ ইত্যাদি দিতে অত্যন্ত সময় লাগে।

(খ) বকেয়া খাজনার মামলা বিলম্বিত করবার ফিকিরফন্দি দমন করবার কোনো বিধান নেই এবং মিথ্যা ফিকিরফন্দির জন্য রায়তের শাস্তি বিধানের বন্দোবস্ত নেই।

(গ) যে-কোনো অজুহাতে মামলার দিন পিছানো সম্ভব। রায়তের অনুপস্থিতিতে মামলার ডিক্রি হলে রায়ত আবার ডিক্রি বাতিল করবার জন্য দরখাস্ত করতে পারেন।

(ঘ) বকেয়া খাজনার ডিক্রি পেলেও রায়তকে জোত হতে উচ্ছেদ করতে হলে আবার আদালতের সাহায্য নিতে হবে এবং সেই জোতে জমিদারের পক্ষে ব্যাবহারিক দখল পেতে অনেক হাঙ্গামা পোয়াতে হয়।

বাংলা দেশে খাজনার হার অধিক না হওয়া সত্ত্বেও খাজনা আদায়ের সুযোগ ও সুবিধা অত্যন্ত সংকীর্ণ। মাদ্রাজে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত এলাকাতে রেভিনিউ কোর্টের সাহায্যে বকেয়া খাজনা আদায় হয় এবং তার ফলে বকেয়া খাজনার পরিমাণ বাড়তে পারে না। পাঞ্জাবে জমিদার রেভিনিউ কোর্টের সাহায্যে খাজনা আদায় করেন এবং অল্পদিনেই বকেয়া খাজনার মামলার নিষ্পত্তি হয়ে যায়। যুক্তপ্রদেশেও রেভিনিউ কোর্টের সাহায্যে খাজনা আদায়ের বন্দোবস্ত আছে।

ভূমিসমস্যায় প্রধান প্রশ্ন হল যে জমি-বিলির বিধান কীভাবে সংঘটিত হলে জমি, চাষি ও সমগ্রজাতি সবচেয়ে বেশি লাভবান হবে। এই জমিবিলির বিভিন্ন রূপ সম্ভব; যথা :

(ক) জমিদারি প্রথা, অর্থাৎ জমিদার দেবেন তাঁর অর্থ ও নেতৃত্ব এবং অপসারণ করবেন কৃষিকর্মের সমস্ত বাধা এবং চাষি চাষ করবেন অত্যন্ত যত্নসহকারে এবং জমিদারের দাবি-দাওয়া মেটাবেন। এবং এই দু-পক্ষের পারস্পরিক সম্বন্ধ এমনভাবে চালিত হবে যে, কোনো পক্ষই যেন তাঁর কর্তব্য ও দায়িত্ব সম্পাদনে শিথিল না হন।

(খ) রায়তিস্বত্ব, অর্থাৎ জমির উপর রায়তের পূর্ণ অধিকার থাকবে এবং গভর্নমেন্টকে রাজস্ব দিয়ে অবশিষ্ট সবকিছু লভ্যাংশ রায়ত ভোগ করবেন। গভর্নমেন্টের কাছ থেকে রায়ত যেসব সাহায্য পাবেন, তার জন্য গভর্নমেন্টের উপযুক্ত পাওনা দিতে তিনি অস্বীকার করবেন না।

(গ) সংঘবদ্ধভাবে সমবায়-নীতি অনুসারে কৃষিকর্ম চালাবার জন্য গভর্নমেন্টের নিকট হতে জমির বন্দোবস্ত নেওয়া যায়। সমবায়বাদ ও সমভোগবাদ একার্থক নয়। রায়তিস্বত্ব বিনষ্ট না করেও রায়তবর্গ সমবায়-নীতি অনুসারে সংঘবদ্ধ হয়ে কৃষিকর্ম চালনা করতে পারেন কিন্তু সমভোগবাদ প্রবর্তিত হলে স্বত্ব-সংক্রান্ত প্রশ্ন অপ্রধান হয়ে ওঠে। রাশিয়ার 'কালেক্‌টিভ ফার্ম' এখনও সমভোগবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়নি, কারণ রাশিয়ার কালেকটিভ ফার্মে চাষি তাঁর উৎপন্ন মালের ধরন ও পরিমাণ অনুসারে পুরস্কৃত হন। রাশিয়ার আইন অনুসারে প্রত্যেক কৃষক-পরিবার নিজের দখলে দশটি ভেড়া, একটি গোরু, হাঁস ও মুরগি এবং একটি ছোটো বাগান (এক একরের প্রায় তিন-চতুর্থাংশ) রাখতে পারেন।

(ঘ) গভর্নমেন্ট জমিদারের পদে অধিষ্ঠিত হতে পারেন। চাষি গভর্নমেন্টের অধীনে ও আজ্ঞায় কৃষিকর্ম চালাবেন এবং গভর্নমেন্টের নিকটে বেতন পাবেন। স্বত্বহীন চাষি বেতনভোগী শ্রমিকের রূপ গ্রহণ করবেন।

বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন বিধান বিরাজ করে। সাধারত যে-দেশের চাষির জড়তা ও অলসতা বেশি এবং শিল্পের উন্নতি কম, সে-দেশে বেসরকারি জমিদারত্ব প্রচলন স্বাভাবিক, যদিচ ঐতিহাসিক ঘটনার উপর জমিদারিপ্রথার রূপ নির্ভর করে সবচেয়ে বেশি। যে-দেশে চাষির ব্যক্তিত্ব প্রকাশ সুস্পষ্ট, সে-দেশে স্বত্ববান রায়তের উদ্ভব সম্ভব এবং রায়তিপ্রথাই প্রবল থাকে। সমভোগবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়ে কৃষিকর্ম চালনা সম্ভব নয়, যদি শ্রেণিহীন সামাজিক বিধানের উপর 'স্টেট' প্রতিষ্ঠিত না হয়। বিভিন্ন স্বার্থ ও শ্রেণি বজায় থাকলে সমবায়নীতিতে কৃষিকর্ম প্রচলন সম্ভব— কিন্তু সমভোগবাদ একান্ত শ্রেণিহীন সমাজের পরিকল্পনা। রায়তিস্বত্ব অত্যন্ত উগ্র থাকলে, অথবা অলস ও কোনো ঝুঁকি গ্রহণে পরাঙমুখ জমিদারবর্গের প্রভাব স্বীকৃত হলে যন্ত্রের সাহায্যে চাষের উন্নয়ন সম্ভব হয় না। কৃষিকে শিল্পের ভিত্তিতে দাঁড় করাতে হলে জোতের সীমারেখা, রায়তের পরিপন্থী অধিকার, অর্থকৃপণ বা অক্ষম জমিদার— এ-সব বাধা অতিক্রম করতে হবে। কিন্তু এসব পরিকল্পনার সঙ্গে গভর্নমেন্টের অধিকার, এবং শাসকসম্প্রদায়ের শ্রেণিগত স্বার্থ নিবিড়ভাবে সংযুক্ত।

তাই জমিবিলি ব্যাপারে মালিকানাস্বত্ব জাতির কাছে অত্যন্ত বড়ো প্রশ্ন হয়ে দাঁড়ায়— কারণ চাষের উন্নয়নের সঙ্গে এই মালিকানা-প্রশ্নের যোগ সুগভীর। প্রথমত, চাষের জমির উপর জাতির অধিকার সবচেয়ে বেশি। দ্বিতীয়ত, আইনের চোখে জমির মতো অস্থাবর সম্পত্তির স্বামিত্ব চরম ও যথেচ্ছাচারী নয়। বিভিন্ন লোকের বিভিন্ন স্তরের অধিকার থাকতে পারে। তৃতীয়ত, চাষের উন্নয়নের প্রথম দায়িত্ব মালিকের— কারণ জমির অধিকারের সঙ্গে নানাপ্রকার দায়িত্বও সংযুক্ত থাকে। চতুর্থত, জমির উন্নয়ন বিধান জাতির কল্যাণ ও স্বার্থ দ্বারা প্রণোদিত হওয়া প্রয়োজন। পঞ্চমত, মালিকের উন্নয়নপ্রচেষ্টার দৃষ্টি ও সামর্থ্য থাকা আবশ্যক। এসব কারণে চাষের জমির মালিকানাস্বত্ব গভর্নমেন্টের দখলে থাকা সংগত। কারণ গভর্নমেন্ট জাতির প্রতিনিধি, জাতির কল্যাণের প্রতীক এবং জাতীয় স্বার্থের সেবক। কোনো গভর্নমেন্ট যদি দেশের সেবক না হয়ে দেশের শোষকের পদ গ্রহণ করেন, সে-প্রশ্ন আলাদা। দেশবাসীর সতর্ক ও সজ্ঞান দৃষ্টি থাকলে গভর্নমেন্টের স্বেচ্ছাচার বন্ধ হবে। গভর্নমেন্ট মালিক হলে তাঁর কর্তব্য সুষ্ঠুভাবে পালন করবেন, এবংবিধ বিশ্বাসে চাষের জমির স্বামিত্ব স্টেট গ্রহণ করলে দেশের কল্যাণ হবে বলে নানাভাবে আখ্যাত ও ব্যাখ্যাত হয়। বাংলা দেশে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে জমির মালিকানাস্বত্ব ব্যক্তিবিশেষের হাতে পড়লেও গভর্নমেন্টের খাসমহল সম্পত্তি আছে। কিন্তু সেই খাসমহল জমিদারিতে কৃষকের অবস্থা এবং চাষের উন্নয়নপ্রচেষ্টা অপেক্ষাকৃত শোচনীয়, তাই গভর্নমেন্ট জমির মালিক হলে চাষের বা দেশের অবস্থা উন্নততর হবে, এমন ভরসার হেতু কেউ খুঁজে পান না। অথচ ব্যক্তিবিশেষের খামখেয়ালের উপর জাতির এতবড়ো স্বার্থ ন্যস্ত করে আরামে দিনাতিপাত করা সমীচীন নয়, তার প্রমাণ নানাভাবে পাওয়া যাচ্ছে।

ভারতীয় গভর্নমেন্টের শাসনবিধানে ২৯৯ ধারা অনুসারে জমির মালিকানাস্বত্ব গভর্নমেন্টের অর্জন করতে হলে জমিদারকে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। ক্ষতিপূরণের হার বিধিবদ্ধ নেই, কিন্তু বিনা ক্ষতিপূরণে কাউকে সম্পত্তিচ্যুত করা হবে না, এমন আশ্বাস দেওয়া হয়েছে। তাই বাংলা দেশে আইনত বিনা অর্থব্যয়ে জমিদারের ধ্বংসসাধন সম্ভব নয়। বাংলা দেশে জমিদারিপ্রথা বিমোচনের আন্দোলন ক্রমশই জনপ্রিয় হচ্ছে কিন্তু এই আর্থিক ক্ষতিপূরণসমস্যার জালে জমিদারধ্বংস-প্রচেষ্টা আবদ্ধ। উক্ত জনপ্রিয় আন্দোলনের রহস্য উন্মোচন করা এই নিবন্ধের উদ্দেশ্য নয়, তবে এ-কথা বলা যায় যে, চাষের অবনতি ও চাষির দুর্গতি চিরস্থায়ী বন্দোবস্তসম্ভূত জমিদারিপ্রথার সঙ্গে সংযুক্ত— এমনতর বিশ্বাস ও

ধারণা প্রচারিত হয়েছে। এ-অভিযোগ মিথ্যা, সে-কথা বলা সুকঠিন, অথচ উক্ত অভিযোগ জমিদারিপ্রথা বিচারের প্রকৃত মাপকাঠি নয়।

বঙ্গীয় ল্যান্ড রেভিনিউ কমিশন (১৯৩৮-৪০) চাষের ও চাষির অবনতির নিম্নলিখিত কারণ দেখিয়েছেন :

(ক) জমির উপর লোকসংখ্যার ক্রমবর্ধমান চাপ।

(খ) জোতবিভাগের সুযোগ ও সুবিধা।

(গ) অর্থকরী জোতের অবনয়ন।

(ঘ) কৃষিজাত সামগ্রীর মূল্যহ্রাস।

(ঙ) অপ্রচুর পরিমাণে ধান্য উৎপাদন।

(চ) দোকর শস্য উৎপাদনের প্রথার অভাব।

(ছ) উন্নত চাষ-প্রণালীর অপ্রচলন।

(জ) পশ্চিম ও মধ্য-বঙ্গের নদীর অবনতি।

(ঝ) অনুপযুক্ত ও অসংগত বাঁধ।

(ঞ) কৃষিজাত মালের বিক্রয়ের সুসংগত ব্যবস্থার অভাব।

(ট) অনুন্নত ও স্বাস্থ্যহীন বলদ।

(ঠ) চাষির অসন্তোষজনক ঋণব্যবস্থা।

(ড) বঙ্গীয় কৃষি-ঋণ আইন দ্বারা ঋণ-সুযোগের সংকোচন।

উক্ত কারণ পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, জমিদারিপ্রথা বিদূরিত হলেও চাষ ও চাষির উন্নতির জন্য অন্যবিধ পরিকল্পনার প্রয়োজন। বঙ্গীয় ল্যান্ড রেভিনিউ কমিশনের অধিকসংখ্যক সভ্য অবশ্য এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত আধুনিক সময়ের উপযোগী নয়। এখানে একটি কথা স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, কর্নওয়ালিস কোড অনুমোদিত যে-জমিদারিপ্রথা প্রবর্তিত হয়েছিল তা প্রকৃতপক্ষে এখন বিরাজ করছে না। আইনের সাহায্যে ও দেশাচারের প্রভাবে জমিদারিপ্রথা যে-রূপ গ্রহণ করেছে, তা কখনও কর্নওয়ালিস কোডে পরিকল্পিত হয়নি। আজ যদি জমিদারিপ্রথা অচল হয়ে থাকে, তার জন্য গভর্নমেন্টের যতটা দায়িত্ব আছে, বোধ হয় আর কোনো পক্ষের ততটা দায়িত্ব নেই। জাতির তরফ থেকে অভিযোগ এই যে, গভর্নমেন্টের সংস্কার-বিধান যে-অকল্যাণের পথকে সহজ করেছে, সেদিকে জননায়কদের দৃষ্টি ছিল না। অজ্ঞানতাবশত একমাত্র চিরস্থায়ী বন্দোবস্তকে আমরা আঘাত করেছি। কিন্তু এ কথা কখনও আমাদের মনে জাগেনি যে, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রকৃত অর্থ ভূমিরাজস্বের চিরস্থিরীকরণ নয়, তার আসল রূপ হল কর্নওয়ালিস কোড প্রবর্তিত জমিদার ও রায়তের পারস্পরিক সম্বন্ধ বিধান। সেই বিধান আজ নানা কারণে প্রক্ষিপ্ত ও প্রচ্ছন্ন। তাই আজ জমিদার ও অধিকাংশ রায়ত পরভাগ্যোপজীবী এবং জমি ও চাষি পরাকৃত। এ-কথাও অবশ্য স্বীকার করতে হবে যে, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সমস্ত বিধান বজায় থাকলেও আধুনিক যুগের সর্ববিধ ও সর্বগ্রাসী প্রয়োজনের ক্ষুধা মেটানো সম্ভব হত না। সে-কথা সহজেই অনুমেয়।

বঙ্গীয় ল্যান্ড রেভিনিউ কমিশন জমিদারি ক্রয় করবার একটি হিসেব দিয়েছেন। যদি সর্বস্তরের জমিদারদের মুনাফার দশ গুণ, বারো গুণ বা পনেরো গুণ হিসাবে ক্ষতিপূরণ দেওয়া যায়, তা হলে মোট খরচ কতটা হয়, তা নিম্নে দেওয়া গেল :

	কোটি
পাওনা	১৩
ভূমিরাজস্ব বাবদ বাদ	২.৪১
জমিদারবর্গের সেস বাবদ বাদ	০.৪৬
	১০.১৩
জমিদারি চালনার খরচা বাবদ শতকরা ১৮ টাকা হিসাবে	২.৩৪
	৭.৭৯

মুনাফার দশ গুণ ক্ষতিপূরণ দিতে গেলে ৭৭.৯ কোটি টাকা প্রয়োজন। তদুপরি ১৩ কোটি টাকা বকেয়া খাজনার জন্য, ৫.৪ কোটি টাকা জরিপ করবার জন্য এবং ১.৩ কোটি টাকা তহশিল অফিস নির্মাণের জন্য প্রয়োজন হবে। মোট ৯৮ কোটি টাকা— শতকরা ৪ টাকা হিসেবে সুদ গণনা করলে ৩.৯২ কোটি টাকা হয়।

যদি মুনাফার বারো গুণ ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়, তা হলে মোট অর্থ প্রয়োজন ১১৩.৫৮ টাকা এবং ১৫ গুণ হলে, মোট অর্থ প্রয়োজন ১৩৬.৯৫ কোটি টাকা।

উক্ত হিসেবে ক্ষতিপূরণ দিলে জমিদারবর্গের লাভ-ক্ষতির পরিমাণ নিম্নলিখিত দৃষ্টান্ত থেকে পাওয়া যায় :

একজন জমিদার যদি খাজনা পান—	১০ লক্ষ টাকা
ভূমিরাজস্ব ও সেস বাবদ যদি দিতে হয়—	৫ লক্ষ টাকা
জমিদারি চালনার খরচ বাবদ (শতকরা ১৮ টাকা হিসেবে)	১.৮০ লক্ষ টাকা
	৩.২০ লক্ষ টাকা

মুনাফার দশ গুণ ও শতকরা ৪ টাকা হিসেবে সুদ গণনা করলে জমিদার পান ১.২৮ লক্ষ টাকা; বারো গুণ হলে ১.৫৩ লক্ষ টাকা এবং পনেরো গুণ হলে ১.৯২ লক্ষ টাকা। আপাতদৃষ্টিতে জমিদারের ক্ষতির পরিমাণ অত্যধিক মনে হলেও এ-কথা স্বীকার করতে হবে যে, কোনো জমিদারের সম্পূর্ণ খাজনা আদায় হয় না এবং উক্ত ক্ষতিপূরণ বিনা পরিশ্রমে তাঁদের হাতে আসবে। বিনা পরিশ্রমে মুনাফা অর্জনের প্রথা ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থাসম্মত কিন্তু তাতে ধনহীনদের অসহিষ্ণুতা বাড়ে বই কমে না।

এ-কথা পূর্বেই বলা হয়েছে যে, গভর্নমেন্টের হাতে জমিদারি গেলেই সমস্ত সমস্যার সমাধান হবে না। শুধু সমাধানের চেষ্টা আরম্ভ করবার পূর্বে এই মালিকানাস্বত্বের হস্তান্তরের প্রয়োজন। ভারতবর্ষ কৃষিপ্রধান দেশ— তাই কৃষির উন্নতি না ঘটলে শিল্প-বাণিজ্যের উন্নতি সম্ভব নয়। অর্থনৈতিক ব্যাখ্যানে আর্থিক উন্নতির মর্ম হল জাতীয় আয় বাড়ানো। অর্থাৎ লোকের ক্রয়শক্তি বাড়াতে হবে। এই ক্রয়শক্তি বাড়ানো ও জনসাধারণের জীবনধারণের উন্নততর ব্যবস্থা-বিধান একই আদর্শের অনুরণনে পরিকল্পিত হয় না। ভারতবর্ষে গড়পড়তা বার্ষিক আয় হল ৬৫ টাকা (১৯৩১-৩২ সালের হিসেব অনুসারে) অথচ অন্যান্য দেশের গড়পড়তা বাৎসরিক আয় হল এইরূপ :

	টাকা		টাকা
আমেরিকা	১,৪০৬	ফ্রান্স	৬২১
কানাডা	১,০৩৮	জার্মানি	৬০৩
ব্রিটেন	৯৮০	জাপান	২১৮
অস্ট্রেলিয়া	৭৯২		

১৯৩১-৩২ সালে ব্রিটিশ ভারতে মোট বাৎসরিক জাতীয় আয় ছিল ১,৭৬৬ কোটি টাকা— তন্মধ্যে কৃষিজনিত আয় ১,১৬৭ কোটি টাকা। অর্থাৎ কৃষির প্রাধান্য অত্যন্ত সুস্পষ্ট। কৃষির উপর নির্ভরশীল হলে গড়পড়তা আয়ের পরিমাণ দ্রুতগতিতে বাড়ানো মুশকিল কারণ কৃষিপ্রধান দেশে লোকসংখ্যা যে-পরিমাণে বাড়ে কৃষিজাত সামগ্রী সে-পরিমাণে বাড়ে না— অবশ্য যদি যন্ত্রের সাহায্যে কৃষির উন্নতির ব্যবস্থা না হয়। কৃষকের গড়পড়তা আয় বাড়লেই ব্যাবসা-বাণিজ্যের প্রসারণে সেই আয় ঝুঁকে পড়বে। কৃষকের উৎপাদন ক্ষমতা, জমির উৎপাদিকা শক্তি এবং কৃষিব্যাবসার আয় না বাড়াতে পারলে জাতির উন্নতি সম্ভব নয় এবং এই কৃষির উন্নতি ঘটলে ব্যাবসা-বাণিজ্যের উন্নতি সহজেই ঘটবে। গড়পড়তা অধিক আয় থাকলেও বণ্টনব্যবস্থার ত্রুটির জন্য চাষি দুর্ভোগের জালে বদ্ধ থাকতে পারে— সে-প্রশ্ন আলাদা। গড়পড়তা গণনা এক হিসেবে দেশের আর্থিক কল্যাণের পরিচায়ক নয় কারণ বণ্টনব্যবস্থায় গলদ থাকলে গড়পড়তা আয়ের মানদণ্ডে দেশের আর্থিক অবস্থা বিচার করলে কোনো সমাধানই মিলবে না।

কৃষির উন্নয়ন প্রচেষ্টায় নিম্নলিখিত বিষয়ে দৃষ্টি রাখতে হবে :

(ক) জমির নাইট্রোজেন, পটাশিয়াম এবং ফসফরাস যেন সম্পূর্ণভাবে বজায় থাকে।

(খ) রায়তের শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও স্বভাবের উন্নতিবিধানের এমন ব্যবস্থা থাকবে যেন কৃষিকর্ম কোনোভাবে ব্যাহত না হয়।

(গ) কৃষকের ব্যবসায়কে আয়জনক করবার জন্য সর্ববিধ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

(ঘ) সামাজিক, আর্থিক ও রাষ্ট্রীয় বিধান যেন উন্নততর কৃষিকর্মের আনুকূল্যে এবং কৃষকের কল্যাণের পরিকল্পনায় রচিত হয়।

ভারতবর্ষে কৃষিকে অবজ্ঞা করে শিল্পবাণিজ্যের উন্নতি সাধন করতে গেলে বিপত্তি অনেক এবং সম্ভবপর হবে না বলেই বিজ্ঞলোকের বিশ্বাস; কারণ দেশের ভিতর শিল্পজাত মালের বিক্রয়-সম্ভাবনা না থাকলে শিল্পোন্নতির পদে পদে বাধা ঘটে, বিশেষত ভারতবর্ষ যখন রাজনীতিক্ষেত্রে স্বাধীন নয়।

বাংলা দেশে পরাশ্রয়ী জমিদার, লোভী মহাজন এবং অশিক্ষিত ও ভগ্নস্বাস্থ্য কৃষকের হাতে কৃষিকর্মের ভার ন্যস্ত। গভর্নমেন্ট উদাসীন এবং উন্নতিসাধনের দায়িত্ব গ্রহণে পরাঙ্মুখ, অথচ নিজের শক্তির অপব্যবহারে বিমুখ নন। দেশবাসী উৎপাদনের অংশীদারদের মধ্যে অপরাধ বণ্টনের গুরুভারে ব্যস্ত। এমন অবস্থায় জমিদার ও রায়তের সম্বন্ধ বিকৃততর হচ্ছে, চাষের অবনতি ঘটছে, দেশের আর্থিক কাঠামো ভেঙে যাচ্ছে এবং অপচয় ও অবসাদের কালিমায় বাংলার গ্রাম প্রতিদিন অধিকতর আচ্ছন্ন হয়ে পড়ছে। বাংলার জমিদার ও রায়ত বাঙালি জাতিকে উৎসন্নের পথে এগিয়ে দিচ্ছে— এবং এই অধঃপতনের মূল কারণ গভর্নমেন্টের কল্পনাহীন পরিকল্পনা এবং দৃষ্টিহীন দৃষ্টিভঙ্গি।

পরিশিষ্ট

বাংলার জমিদারি ক্রয় সম্বন্ধে বিভিন্ন মতামত

১। স্যার ফ্রান্সিস ফ্লাউড-এর সভাপতিত্বে বঙ্গীয় ল্যান্ড রেভিনিউ কমিশন ১৯৪০ সালে যে-রিপোর্ট দাখিল করেছেন তাতে জমিদারি ক্রয় সম্বন্ধে নিম্নলিখিত সিদ্ধান্ত অনুমোদিত হয়েছিল :

(ক) লাখেরাজ, চিরস্থায়ী ও অস্থায়ী বন্দোবস্ত জমিদারিতে জমিদার ও সর্বস্তরের মধ্যস্বত্বভোগীর অধিকার ক্রয় করবার ব্যবস্থা করা উচিত।

(খ) সর্ববিধ অধিকারের সমভাবে ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা হবে। ক্ষতিপূরণের হার নিট লাভের দশ গুণ হিসেবে হবে। নিট লাভ গুনতে হলে ভূমিরাজস্ব, জমিদারবর্গের দেয় সেস এবং জমিদারি চালনার খরচ বাবদ পাওনার ১৮ ভাগ বাদ দিতে হবে।

(গ) ক্ষতিপূরণ স্থিরীকৃত করবার পূর্বে অস্থায়ী বন্দোবস্ত জমিদারির ভূমিরাজস্ব মোট পাওনার ৭০ ভাগ হিসেবে ধরা হবে।

(ঘ) সম্ভব হলে ক্ষতিপূরণের টাকা নগদ দেওয়া হবে। নতুবা ষাট বৎসর আয়ুষ্কালব্যাপী বন্ধকপত্রে দেওয়া হবে। ক্ষতিপূরণের টাকা পাঁচশোর কম হলে সর্বদাই নগদ দিতে হবে।

(ঙ) হিন্দু ও মুসলমানের দেবোত্তর সম্পত্তি গভর্নমেন্ট অধিকতর হারে ক্ষতিপূরণ দিয়ে ক্রয় করবেন। ক্ষতিপূরণের হার এমনভাবে স্থিরীকৃত হবে যে, বর্তমান আয় যেন কোনো প্রকারে না কমে যায়।

(চ) খাসমহল সম্পত্তিতেও মধ্যস্বত্বভোগীদের অধিকার লোপ পাবে এবং গভর্নমেন্টের সুবিধা অনুসারে তা ক্রয়ের বন্দোবস্ত করতে হবে।

২। বঙ্গীয়ল্যান্ড রেভিনিউ কমিশনের সভ্যদ্বয় জমিদারবর্গের প্রতিনিধি বর্ধমানের মহারাজাধিরাজ স্যার বিজয়চাঁদ মহাতব এবং শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী জমিদারি ক্রয় সম্বন্ধে এই মত পেশ করেছিলেন :

(ক) জমিদারি ক্রয় সমীচীন নয়, কিন্তু যদি জমিদারি ক্রয় সাব্যস্ত হয়, তা হলে জমিদার ও সর্ববিধ মধ্যস্বত্বভোগীর অধিকার ক্রয় করা প্রয়োজন।

(খ) ক্ষতিপূরণের হার এমন হওয়া প্রয়োজন যে জমিদারবর্গের বর্তমান নিট লাভ যেন কোনো প্রকারে মারা না যায়।

(গ) ক্ষতিপূরণ নগদ টাকায় দিতে হবে। যদি বন্ধকপত্রে দেওয়া হয়, তা হলে ভারত সরকারকে জামিনস্বরূপ গ্রহণ করতে হবে।

(ঘ) বকেয়া খাজনার দুই-তৃতীয়াংশের ক্ষতিপূরণ দিতে হবে।

(ঙ) যদি রায়তবর্গের বর্গাজমি জমিদারি ক্রয়ের পরিকল্পনা থেকে বাদ পড়ে, তা হলে জমিদারবর্গের খাসজমি (বর্গাজমি সমেত) অক্ষুণ্ণ থাকবে।

৩। বঙ্গীয় ল্যান্ড রেভিনিউ কমিশনের রিপোর্ট পর্যালোচনা করবার জন্য বাংলা গভর্নমেন্ট মি. সি. ডবলিউ গার্নারকে 'স্পেশাল অফিসার' পদে নিযুক্ত করেন। তিনি যে-রিপোর্ট দাখিল করেছিলেন, তাতে তিনি বলেন :

(ক) প্রথম অবস্থায় খাজনাভোগী রায়ত এবং দ্বিতীয় অবস্থায় খাজনাভোগী নিম্ন-রায়ত-এর অধিকার ক্রয় করবার ব্যবস্থা সংগত।

(খ) রায়তের বর্গা অধিকারকে বাদ দেওয়া উচিত। মালিক ও মধ্যস্বত্বভোগীর খাসজমিও বাদ দেওয়া সংগত।

(গ) নিট লাভের ১৫ গুণ ক্ষতিপূরণ হিসেবে দেওয়া উচিত। সবাইকে সমান হারে ক্ষতিপূরণ দিতে গেলে দেখতে হবে যে, বেশির ভাগ লোক যেন উপযুক্ত ক্ষতিপূরণে বঞ্চিত না হন।

(ঘ) নগদ টাকায় ক্ষতিপূরণ দিতে হবে, যদিও গভর্নমেন্ট ইচ্ছা করলে বন্ধকপত্রে দিতে পারেন।

৪। মউলবি ফজলুল হকের প্রধানমন্ত্রিত্বে ১৯৪৩ সালের ১৫ মার্চ বাংলা গভর্নমেন্টের ভূমিরাজস্ব বিভাগের মন্ত্রী শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রাদেশিক আইনসভায় জমিদারি ক্রয়ের যে-সিদ্ধান্ত প্রচার করেছিলেন তার মূল কথা নিম্নে দেওয়া হল :

(ক) গভর্নমেন্ট প্রথম দফায় সর্বপ্রকার খাজনা-সংগ্রাহকের অধিকার ক্রয়ের নীতি গ্রহণ করেছেন। আপাতত বর্গাপ্রথা অক্ষুণ্ণ থাকবে।

(খ) ক্ষতিপূরণের হার নিট লাভের ১০ থেকে ১৫ গুণ হবে— সম্পত্তি বা স্বত্বের রকমফের অনুসারে। দেবোত্তর সম্পত্তির জন্য নিট লাভের ২৫ গুণ ক্ষতিপূরণের হার ধার্য হবে।

(গ) এই ক্ষতিপূরণের হার নির্ধারণের জন্য এক 'ট্রাইবিউনাল' স্থাপিত হবে এবং তার সিদ্ধান্তই চরম বলে ধরা হবে।

(ঘ) প্রথমত পরীক্ষাস্বরূপ জমিদারি ক্রয়ের পরিকল্পনা একটি জেলায় প্রযুক্ত হবে।

'উৎস : *বাংলার রায়ত ও জমিদার* প্রকাশ : ১ জ্যৈষ্ঠ ১৩৫১।

ওয়াহাবি বিদ্রোহ (১৮২৪-১৮৭০)

সুপ্রকাশ রায়

ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে ভারতীয় জনগণের প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রাম 'সন্ন্যাসী বিদ্রোহ' ব্যর্থ হইয়া গেলেও, ভারতের বিদ্রোহী মানুষ কোনোদিন শান্তভাবে ইংরেজ শাসনকে মানিয়া লয় নাই; বাংলা ও বিহারের সন্ন্যাসী বিদ্রোহ আগুন জ্বালাইয়া দিয়া গিয়াছে, সেই আগুন কখনও কখনও সাময়িকভাবে নিস্তেজ হইয়া পড়িলেও আবার নূতন ইন্ধন পাইয়া, তাহা বারবার বিভিন্ন আকারে জ্বলিয়া উঠিয়া ইংরেজ রাজত্ব ধ্বংস করিবার উপক্রম করিয়াছে।

সন্ন্যাসী বিদ্রোহের অবসানের পূর্বেই, ১৭৮৪ খ্রিস্টাব্দে রাজমহলের পাহাড়িয়া আদিবাসীদের বিদ্রোহ উদ্ধত ইংরেজ শক্তিকে মাথা নত করিতে বাধ্য করিয়াছিল।

সন্ন্যাসী বিদ্রোহের অবসানের পূর্বেই ১৭৮৪ খ্রিস্টাব্দে বাঁকুড়া হইতে আরম্ভ হইয়া ১৭৯৯ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত বাঁকুড়া, বীরভূম ও মেদিনীপুরে ইংরেজ শাসন অচল করিয়া তুলিয়াছিল। মারাঠাদের নিকট হইতে দখল করা উড়িষ্যার* 'খুড়দা বিদ্রোহ' ১৮০৪ খ্রিস্টাব্দে উড়িষ্যার সদ্যপ্রতিষ্ঠিত ইংরেজ শাসনের ভিত্তি কাঁপাইয়া দিয়াছিল। ১৮১৭ খ্রিস্টাব্দ হইতে ১৮১৯ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত উড়িষ্যার 'পাইক বিদ্রোহ' ও 'খোন্দ জাতির বিদ্রোহ' এই প্রদেশ হইতে ইংরেজ শাসন কিছুদিন নিশ্চিহ্ন করিয়া ফেলিতে সক্ষম হইয়াছিল।

এইভাবে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার সর্বত্র বিদ্রোহের আগুন জ্বলিতে থাকার সময়েই অষ্টাদশ শতাব্দী শেষ হইয়া গেল। ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দ হইতে তেতাল্লিশটি বছর ধরিয়া ইংরেজরা প্রথমে বাংলা ও বিহার এবং পরে উড়িষ্যা প্রদেশেরও ধনসম্পদ শোষণ করিয়া, সেই বিপুল শক্তির সাহায্যে পাঞ্জাব ব্যতীত গোটা ভারতবর্ষই গ্রাস করিয়া ফেলিল। ভারতবর্ষ বিরাট দেশ, এত বড়ো একটা দেশকে গ্রাস করা কঠিন। তাই ধূর্ত ইংরেজ অজগরের শিকার গেলার মতো ভারতের জনগণের শক্তি ক্রমশ চূর্ণ করিয়া ধীরে ধীরে ভারতবর্ষকে গ্রাস করিতে লাগিল। ভারতবাসী, বিশেষ করিয়া ভারতের কৃষক

---

* পলাশি যুদ্ধের সময় খাস উড়িষ্যা ছিল মহারাষ্ট্র-শক্তির দখলে। সেই সময়ে হাওড়া, হুগলি ও মেদিনীপুর জেলা উড়িষ্যা প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত থাকিলেও ইংরেজরা এই তিনটি জেলা দখল করিয়া লয়। পরে ১৯০৩ খ্রিস্টাব্দে ইংরেজগণ মারাঠাদের নিকট হইতে উড়িষ্যা প্রদেশ দখল করে। ইহার পর উড়িষ্যায় 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত' প্রবর্তিত হয়।

জনসাধারণ, এই বিদেশি শত্রুকে তাহাদের সর্বশক্তি নিয়োগ করিয়া বাধা দিয়াছে, কিন্তু এই শক্তিমানও খল শত্রুর সঙ্গে যুঝিয়া উঠিতে পারে নাই। এক-একটি অঞ্চল দখল করার সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজ শাসকগণ তাহাদের দখলভুক্ত অঞ্চলের প্রাচীন স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রাম-সমাজ ভাঙিয়া চুরমার করিয়া জনগণের জীবনযাত্রার উপায়সমূহ নিশ্চিহ্ন করিয়া ফেলিয়াছে। ইহার ফলে লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি মানুষ উচ্ছন্নে গিয়াছে, তাহারা সর্বস্ব হারাইয়া পথে বসিয়াছে আর ইংরেজ শাসকগণ সেইসকল অঞ্চলে জমিদারি প্রথা প্রভৃতি শোষণ ও উৎপীড়নমূলক অর্থনীতি চাপাইয়া দিয়া নিজেদের শাসন ও শোষণের ব্যবস্থাকে দৃঢ়ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে।

ইংরেজগণ ভারতে যে শাসন ও শোষণের ব্যবস্থা কায়েম করিল, তাহার প্রধান শিকার হইল সংখ্যাধিক্য মুসলমান চাষি। ইহা ব্যতীত, ইংরেজরা মুসলমান শাসকদের হাত হইতেই এদেশের শাসনক্ষমতা কাড়িয়া লইয়াছে। তাহারা প্রথমে মুসলমান নবাব সিরাজউদ্‌দৌলার হাত হইতে বাংলা ও বিহার দখল করিয়াছে। তারপর দিল্লির শাসন ক্ষমতা মোগল সম্রাটের নিকট হইতে কাড়িয়া লইয়াছে। তাই ভারতের মুসলমানগণ কোনোদিন এই বিদেশিদের ক্ষমা করে নাই। তাহারা ইংরেজ শাসনের আরম্ভ হইতেই দীর্ঘকাল পর্যন্ত এই বিদেশি শাসকদের সহিত অসহযোগিতা করিয়াছে। সেই হেতু ১৭৯৩ খ্রিস্টাব্দে যখন চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তিত হয়, তখন প্রধানত হিন্দুরাই ইংরেজ শাসকদের সহিত সহযোগিতা করে এবং প্রায় সকল জামিদারিই হিন্দুদের হস্তগত হয়। ইহার ফল দাঁড়াইল এই যে, বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার প্রায় সকল জমিদারই হিন্দু, আর তাহাদের অধীনস্থ চাষিদের অধিকাংশই মুসলমান। তখন হইতে শেষ পর্যন্ত ইংরেজ শাসক, জমিদার-মহাজন ও অপরাপর প্রতিক্রিয়াশীলগণ এই সুযোগ গ্রহণ করিয়া বাংলা ও বিহারের প্রায় সকল কৃষকবিদ্রোহকে সাম্প্রদায়িক আখ্যা দিয়া হিন্দু-মুসলমানের সাম্প্রদায়িক বিরোধে পরিণত করিবার প্রয়াস পাইয়াছে। ফলে বহু কৃষকবিদ্রোহ ব্যর্থ হইয়া গিয়াছে।

বিদেশি ইংরেজগণ ভারতের মুসলমানদের হস্ত হইতেই ভারতের বিরাট সাম্রাজ্য ও ক্ষমতা কাড়িয়া লইয়াছে। তাই ভারতে সকল মুসলমান এই বিদেশিদের চির-শত্রুরূপে গ্রহণ করিয়াছে। ভারতের মুসলমানরাই ইংরেজ-রাজের বিরুদ্ধে সর্বাপেক্ষা বেশি বিদ্রোহ করিয়াছে, ভারতের মাটি হইতে ইংরেজ-রাজত্বের উচ্ছেদের জন্য সকলপ্রকার চেষ্টা ও শক্তি নিয়োগ করিয়াছে। তাই মুসলমানদের শান্ত করিতে এবং তাহাদের সহযোগিতা লাভ করিতে ব্যর্থ হইয়া ভারতের বড়োলাট লর্ড মেয়ো এই হতাশাময় খেদোক্তি করিয়াছিলেন : 'মহারানির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করাই কি ভারতীয় মুসলমানদের ধর্মের অনুশাসন?' লর্ড মেয়োর এই খেদোক্তি সম্পূর্ণ সত্য বলিয়া প্রামাণিত হইয়াছিল। যে-বিদেশি ইংরেজগণ মুসলমানদের হস্ত হইতে ভারতের বিশাল সাম্রাজ্য ও রাজনৈতিক ক্ষমতা কাড়িয়া লইয়াছে, তাহাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করাকে মুসলমানগণ তাহাদের ধর্মের অনুশাসন হিসাবেই গ্রহণ করিয়াছিল। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে ওয়াহাবি বিদ্রোহ-এর যে আগুন সারা ভারতে ছড়াইয়া পড়িয়া ভারতের ইংরেজ শাসন নিশ্চিহ্ন করিয়া ফেলিতে উদ্যত হইয়াছিল, তাহাও প্রথমে মুসলমানগণের ধর্মের অনুশাসন হিসাবেই আরম্ভ হইয়া ইংরেজ বিরোধী স্বাধীনতা-সংগ্রাম ও জমিদার মহাজন-বিরোধী শ্রেণিসংগ্রামে পরিণত হইয়াছিল।

*　　*　　*

তখন উনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিক। পাঞ্জাব ব্যতীত প্রায় সারা ভারতের বুকের উপর দিয়া ইংরেজ-রাজের অত্যাচারের তাণ্ডব ভারতের প্রাচীন সমাজ-ব্যবস্থা ও সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রা ভাঙিয়া চুরমার করিয়া ছুটিয়া চলিয়াছে, ভারতের সাধারণ মানুষ মরণ-যন্ত্রণায় আর্তনাদ করিতেছে। ভারতের

সকল সম্প্রদায়ের মানুষের আর্থিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় জীবন উচ্ছন্নে গিয়াছে। এমন সময় মুসলমান ধর্মের সংস্কার সাধনের সংকল্প লইয়া রায়বেরিলির সৈয়দ আহম্মদ ব্রেলভি মক্কা হইতে ফিরিয়া আসিলেন। তিনি মক্কা হইতে লইয়া আসেন ওয়াহাবি আন্দোলনের নূতন আদর্শ। ওয়াহাবি আন্দোলনের আদর্শ হইল মুসলমানদের ভিতর হইতে তখনকার প্রচলিত বহু কুসংস্কার দূর করিয়া মুসলমান ধর্মকে নূতন করিয়া গড়িয়া তোলা।

ওয়াহাবি শব্দের অর্থ হইল নবজাগরণ। আরবের আবদুল ওয়াহাব এই আদর্শের প্রবর্তক। তাঁহার নাম অনুসারেই এই আন্দোলনের নাম হইয়াছিল 'ওয়াহাবি আন্দোলন'। ধর্মের ব্যাপার হইলেও এই আদর্শের ভিতরে ছিল তখনকার প্রচলিত মুসলমান ধর্মের বিরুদ্ধে একটা বিদ্রোহের আহ্বান। এই বিদ্রোহের আহ্বান লইয়াই সৈয়দ আহম্মদ ব্রেলভি মক্কা হইতে ফিরিয়া আসেন।

সৈয়দ আহম্মদের জীবন কাহিনি ভারতের বিদেশি ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহেরই কাহিনি। তিনি কৈশোরে যুদ্ধবিদ্যা শিখিয়াছিলেন। তার পর ভারতের স্বাধীনতার শত্রু ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার উদ্দেশ্য লইয়াই তিনি পিন্ডারি কৃষকদের বিদ্রোহে যোগদান করেন। বিদ্রোহী পিন্ডারি কৃষকদের এক সৈন্যদলের সেনাপতিরূপে ইংরেজদের বিরুদ্ধে প্রথম যুদ্ধেই তিনি বিশেষ খ্যাতি লাভ করেন। পিন্ডারিরা শেষপর্যন্ত ইংরেজদের কাছে পরাজিত ও ছত্রভঙ্গ হইয়া যায়। ইহার পর সৈয়দ আহম্মদ তীর্থ করিবার উদ্দেশ্যে মক্কা যাত্রা করেন।

মক্কা হইতে ফিরিয়া সৈয়দ আহম্মদ তাঁহার নূতন ওয়াহাবি আদর্শ চারি দিকে প্রচার করিতে থাকেন। তাঁহার এই নূতন আদর্শের মধ্যে ধর্মের গোঁড়ামি ছিল বটে, কিন্তু এই গোঁড়ামির ফলেই বিদেশি ইংরেজ-রাজ হইল ভারতের মুসলমানদের প্রধান শত্রু। ইংরেজরা তখন সবেমাত্র পাঞ্জাব ছাড়া প্রায় সমগ্র উত্তর ভারতের উপর জাঁকিয়া বসিয়াছে। তাহারা মুসলমান-বাদশাহের নিকট হইতে ভারতের শাসন ক্ষমতা কাড়িয়া লইয়াছে। ইংরেজ-রাজের কৃষিব্যবস্থা (চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত—জমিদারি প্রথা) মুসলমান চাষিকে শোষণের চাকার তলে পিষিয়া মারিতেছে। ইংরেজরা গোটা ভারতবর্ষই গ্রাস করিতে উদ্যত হইয়াছে, ভারতবর্ষ বিদেশি ইংরেজদের কুক্ষিগত। তাই সৈয়দ আহম্মদ ভারতবর্ষকে 'শত্রুর দেশ' (অর্থাৎ শত্রু কবলিত দেশ) বলিয়া অভিহিত করিলেন। সৈয়দ আহম্মদের আদর্শে অনুপ্রাণিত ওয়াহাবি মুসলমানগণ এই বিদেশি শত্রুকে উচ্ছেদ করিয়া সকলপ্রকার অত্যাচারের মূলোৎপাটন ও ধর্মরাজ্য প্রতিষ্ঠার শপথ গ্রহণ করিল।

১৮২০ খ্রিস্টাব্দ হইতে ১৮২২ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত সৈয়দ আহম্মদ ভারতের উত্তর অঞ্চল ঘুরিয়া তাঁহার এই নূতন ধর্মমত প্রচার করিলেন। সমগ্র উত্তর ভারতে লক্ষ লক্ষ মুসলমান আহম্মদের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিল। ইহার পর, তিনি সারা বিহার ঘুরিয়া বিহারের মুসলমানদের অনুপ্রাণিত করিয়া তুলিলেন। বিহারের পাটনা হইল ওয়াহাবিদের প্রধান কেন্দ্র। কালক্রমে পাটনা নগরীই সারা ভারতের ওয়াহাবি আন্দোলনের কেন্দ্র হইয়া ওঠে। ইহার পর সৈয়দ আহম্মদ কলিকাতায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি কলিকাতা নগরীকে কেন্দ্র করিয়া সারা বাংলা দেশে তাঁহার নূতন আদর্শ প্রচার করিতে আরম্ভ করেন। বাংলার মুসলমানগণ প্রায় সকলেই চাষি, আর তাহারা তখন জমিদার ও নীলকর সাহেবদের অমানুষিক শোষণ ও অত্যাচারে জর্জরিত। ইহার পূর্বেই বাংলার চাষিদের মধ্যে নিজ হইতেই একটা বিদ্রোহের আগুন ধূমায়িত হইয়া উঠিতেছিল। সৈয়দ আহম্মদের এই নূতন আদর্শ বাংলার চাষিদের মধ্যে নূতন আশার আলোক জ্বালিয়া দিল। বাংলার লক্ষ লক্ষ মুসলমান চাষি সৈয়দ আহম্মদের এই নূতন ধর্মপ্রচারের মধ্য দিয়া শুনিল এক বিদ্রোহের আহ্বান। ১৮২৪ খ্রিস্টাব্দে সৈয়দ আহম্মদ গিয়া উপস্থিত হইলেন উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে। তিনি উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের মুসলমানদের

ওয়াহাবি আদর্শে উদবুদ্ধ করিয়া তুলিলেন। আপাতত তিনি উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশেই তাঁহার কর্মকেন্দ্র স্থাপন করেন। এই অঞ্চলে কর্মকেন্দ্র স্থাপনের পিছনে ছিল একটা গভীর উদ্দেশ্য।

তখন পাঞ্জাবে চলিতেছিল রণজিৎ সিংহের নেতৃত্বে শিখদের অখণ্ড আধিপত্য। বাংলা দেশের মতোই পাঞ্জাবের অধিকাংশ লোক, বিশেষত অধিকাংশ চাষিই মুসলমান। মুসলমান চাষিদের উপর শিখ জায়গিরদার ও জমিদারদের নিরঙ্কুশ অত্যাচার ও শোষণ মুসলমান চাষিদের সহ্যের সীমা ছাড়াইয়া গিয়াছিল, তাহারা শিখ জায়গিরদার ও জমিদারদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিবার সুযোগ খুঁজিতেছিল। ঠিক এই সময়ে আহম্মদের প্রচারের ফলে পাঞ্জাবের মুসলমান চাষিদের মধ্যে বিদ্রোহের আগুন জ্বলিয়া উঠিল।

সৈয়দ আহম্মদ কেবল একটি নূতন ধর্মমতের প্রচারক নহেন, তিনি মনেপ্রাণে বিদ্রোহী, তাঁহার ওয়াহাবি আদর্শ বিদ্রোহেরই আদর্শ। তিনি একদিকে যেমন এক বিদ্রোহী ও আদর্শের প্রচারক, তেমনই অন্যদিকে বিদ্রোহের নেতৃত্ব গ্রহণেও সক্ষম। পাঞ্জাবের মুসলমান চাষিদের বিদ্রোহে তিনি নিজেই নেতৃত্ব গ্রহণ করিলেন। এই বিদ্রোহ ক্রমশ ভীষণ আকার ধারণ করিল। অল্পদিনের মধ্যেই এই বিদ্রোহ পাঞ্জাবের শিখদের বিরুদ্ধে মুসলমানদের ধর্মযুদ্ধের অর্থাৎ 'জেহাদের' রূপ গ্রহণ করিল। কেহ কেহ যে ওয়াহাবি বিদ্রোহকে হিন্দু-বিরোধী আন্দোলন বলিয়া ব্যাখ্যা করেন, ইহা হইল তাহার একটি কারণ। কিন্তু কৃষক-বিদ্রোহ-ই ছিল এই আন্দোলনের মূল কথা। অবশ্য এই ধর্মযুদ্ধ বা জেহাদের ফলে শিখ-চাষিদের আন্দোলন বিদ্রোহ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে।

১৮২৭ খ্রিস্টাব্দে শিখদের বিরুদ্ধে সৈয়দ আহম্মদের নেতৃত্বে ওয়াহাবিদের ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। আহম্মদ উত্তর ভারতে যে বিরাট ওয়াহাবি কর্মীসংঘ গড়িয়া তুলিয়াছিলেন, এবার এই ধর্মযুদ্ধে যোগদানের জন্য তিনি সেই কর্মীদের আহ্বান করিলেন। এই ধর্মযুদ্ধের সংবাদ শুনিবামাত্র সারা ভারতের ওয়াহাবিরা উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের দিকে যাত্রা করিল। যুদ্ধের গোড়ার দিকে শিখরা ওয়াহাবিদের নিকট কয়েকবার পরাজিত হইল। রণজিৎ সিংহের শিখরাজ্যের উপর ওয়াহাবিদের আক্রমণ চলিতেই লাগিল। ওয়াহাবিদের এক বিরাট বাহিনী পাঞ্জাবের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া ১৮৩০ খ্রিস্টাব্দের জুলাই মাসে পশ্চিম পাঞ্জাবের রাজধানী পেশোয়ার দখল করিল।

কিন্তু ওয়াহাবিরা বেশিদিন পেশোয়ার দখল করিয়া রাখিতে পারিল না। অন্তর্দ্বন্দ্বের ফলে ও উপযুক্ত সেনাপতির অভাবে ওয়াহাবি বাহিনী পিছু হটিতে বাধ্য হইল। ১৮৩১ খ্রিস্টাব্দে শিখদের সহিত এক ভীষণ যুদ্ধে সৈয়দ আহম্মদ স্বয়ং নিহত হইলেন। তাঁহার মৃত্যুর ফলে ওয়াহাবি বাহিনীর মধ্যে সাময়িকভাবে হতাশা ও বিশৃঙ্খলা দেখা দিল।

অল্প সময়ের মধ্যেই ওয়াহাবিদের হতাশা ও বিশৃঙ্খলা কাটিয়া গেল। তাহাদের মধ্যে আবার উৎসাহ ফিরিয়া আসিল। ওয়াহাবি বাহিনী আবার পূর্ণোদ্যমে শিখদের উপর আক্রমণ আরম্ভ করিল। এই আক্রমণের ফলে শিখরাজ্য টলিয়া উঠিল। এই যুদ্ধের মধ্যেই পাঞ্জাব ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের মাঝামাঝি সিতানা নামক স্থানে ওয়াহাবিরা এক শক্তিশালী দুর্গ নির্মাণ করে। এবার এই দুর্গই হইল সারা ভারতের ওয়াহাবি বিদ্রোহের প্রাণকেন্দ্র। এই দুর্গ প্রতিষ্ঠার পর হইতে কেবল পাঞ্জাবেই নয়, সারা ভারতে ওয়াহাবিরা বিদ্রোহ আরম্ভ করে। এবার সেই বিদ্রোহের আঘাত পড়িতে লাগিল ইংরেজদের উপর, সেই আঘাতে ভারতের ইংরেজ শাসন কাঁপিয়া উঠিল।

এতদিন ইংরেজ শাসকগণ একটা গূঢ় রাজনৈতিক উদ্দেশ্য লইয়া ওয়াহাবিদের আন্দোলনে ও প্রচারে বিশেষ কোনো বাধা দেয় নাই। ইংরেজ শক্তি তখন পর্যন্ত পাঞ্জাব বিজয় সম্পূর্ণ করিতে পারে নাই। পাঞ্জাব-কেশরী রণজিৎ সিংহের শিখরাজ্য পাঞ্জাবের উপর আক্রমণ ও তাহা অধিকার করিয়া

লইবার সাহস ও শক্তি তখন ইংরেজদের ছিল না। ইংরেজরা একটা উপযুক্ত সুযোগ খুঁজিতেছিল। শিখ ও ওয়াহাবিদের এই ভ্রাতৃবিরোধকে ধূর্ত ইংরেজ তাহাদের পাঞ্জাব জয়ের পক্ষে সুযোগ বলিয়াই মনে করিল। ওয়াহাবিরা যখন শিখরাজ্য আক্রমণ করে, তখন ইংরেজরা নিরপেক্ষ দর্শকের ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিল, এমনকি তাহারা তখন শিখদের বিরুদ্ধে ওয়াহাবিদের আক্রমণ পরোক্ষভাবে সমর্থনও করিয়াছিল, ইংরেজরা মনে করিয়াছিল যে, হিন্দু-মুসলমানের এই আত্মঘাতী যুদ্ধের ফলে ওয়াহাবিরা ও শিখরা উভয়েই দুর্বল হইয়া পড়িবে, তখন পাঞ্জাব জয় করা ও ওয়াহাবিদের দমন করা দুই-ই সহজ হইবে।

কিন্তু ওয়াহাবি মুসলমান চাষির কাছে শিখ জায়গিরদার ও জমিদারগোষ্ঠী শত্রু হইলেও তাহাদের চেয়েও বড়ো শত্রু বিদেশি ইংরেজ। তাই ওয়াহাবিরা সারা ভারত ব্যাপিয়া ইংরেজ-রাজের বিরুদ্ধে তীব্র আঘাত হানিতে আরম্ভ করিল। এই আঘাতের সঙ্গে সঙ্গেই ওয়াহাবিদের প্রতি ইংরেজ শাসকদের নিষ্ক্রিয়তা শূন্যে মিলাইয়া গেল। এবার ধূর্ত ইংরেজ রাজনৈতিক খেলা শেষ করিয়া পূর্বের মতো পশুশক্তি লইয়া দেখা দিল।

সারা উত্তর ভারতে, বিহারে, বাংলায় ওয়াহাবি বিদ্রোহের আঘাতে ভারতের ইংরেজ শাসন এক মহা সংকটের মুখে আসিয়া পড়িল। ইংরেজ সেনাপতি সিডনি কটনের সেনাপতিত্বে একটা বিরাট ইংরেজ সৈন্যবাহিনী ওয়াহাবি বিদ্রোহের প্রাণকেন্দ্র সিতানার দুর্গটাকে ধূলিসাৎ করিতে ছুটিয়া আসিল। পনেরো দিন ধরিয়া ইংরেজ বাহিনীর সঙ্গে ওয়াহাবিদের ঘোরতর যুদ্ধ হইল। কিন্তু বিদ্রোহীদের অস্ত্রশক্তি সামান্য; তাই উন্নত অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত ইংরেজ বাহিনীর সম্মুখে বেশিদিন দাঁড়াইতে না পারিয়া বিদ্রোহীরা পিছু হটিতে লাগিল। অবশেষে তাহারা সিতানার দুর্গ পরিত্যাগ করিয়া কিছু দূরে মহবান্ নামক পার্বত্য প্রদেশের মলকা নামক এক উপত্যকায় আশ্রয় গ্রহণ করিল। কিন্তু এই বিপর্যয় সত্ত্বেও ওয়াহাবিদের সংগ্রাম বন্ধ হইল না, তাহারা এই অঞ্চলে গেরিলা-কৌশলে যুদ্ধ চালাইতে লাগিল। ইহা ব্যতীত বিদ্রোহীরা সমগ্র উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, পাঞ্জাব, বিহার ও বাংলা দেশে প্রাণপণে আক্রমণ চালাইয়া ইংরেজদের অস্থির করিয়া তুলিল।

বিহার

সিতানার দুর্গের পতনের পর ওয়াহাবিদের যুদ্ধের শেষ না হইলেও ইহার পর হইতে সিতানার দুর্গের পরিবর্তে বিহারের পাটনাই ওয়াহাবিদের প্রধান কেন্দ্রে পরিণত হয়। ক্রমশ পাটনার সহিত সমগ্র ভারতের বিভিন্ন কেন্দ্রের যোগাযোগ প্রতিষ্ঠিত হয়। বিহার প্রদেশের বিভিন্ন অঞ্চল জুড়িয়া ব্রিটিশ শক্তির উপর আক্রমণ চলিতে থাকে। ওয়াহাবিরা পাটনায় এক প্রতিদ্বন্দ্বী সরকার প্রতিষ্ঠা করিয়া বসে। বিহারের কয়েকটি জেলা ইংরেজ শক্তির কবল হইতে মুক্ত হয়। আর সেইসকল জেলায় বিদ্রোহীদের স্বাধীন সরকার জনসাধারণের সুখস্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা করে। এইসকল জেলায় ইংরেজদের নানাবিধ শোষণ-ব্যবস্থা নিশ্চিহ্ন করিয়া ফেলা হয়। বিদ্রোহী সরকারের কর্মচারীরা স্বাধীন সরকারের নামে ট্যাক্স আদায়, জমির নূতন বিলিব্যবস্থা প্রভৃতি করিতে থাকে। জেলায় জেলায় বিদ্রোহী সরকারের বিচারালয়, সরকারি দপ্তরখানা প্রভৃতিও প্রতিষ্ঠিত হয়। এইসকল জেলার প্রধান কেন্দ্র পাটনা। যে জেলাগুলিতে বিদ্রোহীরা ইংরেজ শক্তিকে উৎখাত করিতে পারিল না, সেখানে তাহারা জনসাধারণের ভেতরে গোপন আন্দোলন চালাইতে থাকে।

ওয়াহাবি বিদ্রোহ সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী হইয়া উঠে বাংলা দেশে। সৈয়দ আহম্মদ যখন বাংলা দেশে প্রচার করিতে আসেন, তাহার পূর্ব হইতেই এই আন্দোলন বাংলা দেশে আরম্ভ হইয়া গিয়াছিল। এই প্রদেশে এই আন্দোলনের স্রষ্টা হইলেন ফরিদপুরের মউলভি শরিয়তুল্লা। সৈয়দ আহম্মদের বহু পূর্বেই তিনি মক্কা গিয়াছিলেন এবং সেখানে দীর্ঘ বিশ বৎসর কাল বাস করিয়াছিলেন। মউলভি শরিয়তুল্লা মক্কায় থাকিতেই ওয়াহাবি আদর্শের সমর্থক হন এবং দেশে ফিরিয়া আসিয়াই ওয়াহাবি আদর্শ অনুসারে ইসলাম ধর্মের সংস্কারে মন দেন। ওয়াহাবি আদর্শই তাঁহাকে বিদেশি ইংরেজ শাসনের বিরোধী করিয়া তোলে।

ভারতে বিদেশি শাসনের উচ্ছেদ তাঁহার কাছে মুসলিম ধর্মের সংস্কার ও 'ধর্মরাজ্য' প্রতিষ্ঠার পক্ষে অপরিহার্য বলিয়া মনে হয়। এই উদ্দেশ্যে তিনি 'ফরাজি' নামে এক বিশেষ সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠা করেন। এই সম্প্রদায়টিকে তিনি ইংরেজ-বিরোধী জঙ্গি চেতনা দ্বারা উদবুদ্ধ করিয়া তোলেন এবং সেইভাবেই তিনি সারা বাংলাব্যাপী এক শক্তিশালী গোপন সংগঠন গড়িয়া তুলিতে থাকেন। বাংলা দেশে বিদ্রোহ আরম্ভ করার পূর্বে বিশেষ গোপনতা ও সতর্কতা অবলম্বন করার প্রয়োজন ছিল। কারণ, তখন বাংলা দেশে ইংরেজ শাসনের শক্ত ভিত্তি গড়িয়া উঠিয়াছিল। ইহার সঙ্গে সঙ্গে তিনি জেলায় জেলায় কর্মী পাঠাইয়া তাঁহার আন্দোলন বিস্তারের ব্যবস্থা করেন এবং প্রচার করেন যে, ওয়াহাবি আদর্শ কার্যকর করার পক্ষে বিদেশি শাসন হইল প্রধান অন্তরায়; সুতরাং ইংরেজদের বিরুদ্ধেই মুসলমানদের সর্বশক্তি নিয়োগ করা কর্তব্য। মউলভি শরিয়তুল্লা তাঁহার পরিকল্পনা অনুসারে বিদ্রোহের আয়োজন করিলেন বটে, কিন্তু বিদ্রোহ আরম্ভ হইবার পূর্বেই তাঁহার মৃত্যু হয়।

শরিয়তুল্লার মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র দুদুমিয়াঁ বাংলা দেশের পূর্বাঞ্চলের ওয়াহাবি আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। তিনিও তাঁহার পিতার ন্যায় নিজ গ্রাম বাহাদুরপুরেই এই আন্দোলনের কেন্দ্র স্থাপন করিয়া প্রচার ও সংগঠন বাড়াইয়া তুলিতে থাকেন। দুদুমিয়াঁর সুযোগ্য নেতৃত্বে ওয়াহাবি আন্দোলন ও সংগঠন ক্রমশ ফরিদপুর, চব্বিশ পরগনা, নদিয়া প্রভৃতি জেলায় ছড়াইয়া পড়ে। ফরিদপুর, বিক্রমপুর, খুলনা, চব্বিশ পরগনা প্রভৃতি কয়েকটি জেলায় এই আন্দোলন ক্রমশ কৃষকের দাবিদাওয়ার আন্দোলনে পরিণত হয়। নীলকর সাহেব ও জমিদারদের অমানুষিক অত্যাচার ও শোষণের বিরুদ্ধে হিন্দু ও মুসলমান কৃষক একত্র হইয়া সংগঠিতভাবে প্রচণ্ড অন্দোলন আরম্ভ করিয়া দেয়। এই আন্দোলনের প্রধান নায়ক দুদুমিয়াঁর প্রভাব-প্রতিপত্তি এতদূর বাড়িয়া গিয়াছিল যে, তাঁহার নির্দেশে পঞ্চাশ হাজার হিন্দু-মুসলমান কৃষক যে-কোনো সময় জমিদার ও ইংরেজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিতে দ্বিধা করিত না।

তখন বিদেশি ইংরেজ শাসকদের পৃষ্ঠপোষিত জমিদার ও নীলকুঠির মালিকদের অবাধ অত্যাচার বাংলার হিন্দু ও মুসলমান চাষিদের উপর দিয়া সমানভাবেই চলিয়াছে। ইহাদের অত্যাচারে বাংলার চাষি অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছে। তাহারা ওয়াহাবি নেতাদের সাম্প্রদায়িক ধর্মের ধ্বনি ভুলিয়া গিয়া সমবেতভাবে দুদুমিয়াঁর নেতৃত্বে অত্যাচার ও শোষণের বিরুদ্ধে দাঁড়াইল। সংঘবদ্ধ চাষিরা জমিদার, নীলকুঠির মালিক ও ইংরেজ শাসকদের অগ্রাহ্য করিতে লাগিল। তাহারা লাঠির বদলে লাঠি খুনের বদলে খুন এবং অত্যাচারের বদলে অত্যাচার আরম্ভ করিল। বাংলার বিদেশি শাসকগণ ও তাহাদের সহচরগণ আবার ব্যাপক গণ-বিদ্রোহের সম্মুখীন হইল।

এইভাবে বাংলার ওয়াহাবিরা বিদেশি শাসনের উচ্ছেদ করিয়া ছোটো ছোটো অঞ্চলে স্থানীয় স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা করিল। ফরিদপুর, খুলনা, বিক্রমপুর, চব্বিশ পরগনা ও যশোহর জেলার বহু গ্রামাঞ্চলের

সংগঠিত ওয়াহাবি চাষি ইংরেজ শাসনকে অগ্রাহ্য করিয়া নিজেদের স্বাধীন বলিয়া ঘোষণা করিল। বিদ্রোহীরা এইসকল স্বাধীন গ্রামাঞ্চলে জনসাধারণের সরকার, বিচারালয়, পুলিশ ও ফউজ তৈরি করিয়া ফেলিল। এই স্বাধীন সরকার জনসাধারণের নিকট হইতে ট্যাক্সও আদায় করিতে লাগিল। কিন্তু ওয়াহাবিদের মধ্যে দুদুমিয়াঁ ব্যতীত অন্য কোনো উপযুক্ত নায়ক না থাকায় বাংলার এই স্বাধীন গ্রামাঞ্চলগুলিকে ঐক্যবদ্ধ ও সংহত করিয়া সেখানে একটি সুগঠিত শাসন প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হয় নাই। কিন্তু তাহা হইলেও বহু গ্রামাঞ্চলের স্বাধীন সরকার কিছুদিন পর্যন্ত বিচ্ছিন্নভাবে একাকী ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালাইয়াছিল। এক এক করিয়া সবগুলিই ইংরেজ শাসক, নীল কুঠির মালিক ও জমিদারদের মিলিত আক্রমণে নিশ্চিহ্ন হইয়া যায়।

বাংলার কোনো দরদি ঐতিহাসিক এইসকল সংগ্রামের ইতিহাস লিখিয়া যান নাই। তাই এইসকল গণ-বিদ্রোহ ও গণ-সংগ্রামের গৌরবময় কাহিনি বিস্মৃতির গর্ভে বিলীন হইয়া গিয়াছে। কিন্তু ইংরেজ ঐতিহাসিকদের শত চেষ্টা সত্ত্বেও কলিকাতা ও তাহার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের ওয়াহাবি বিদ্রোহের একজন নায়কও সেই নায়কের পরিচালিত বিদ্রোহের কাহিনি বাংলা তথা ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে এক নূতন অধ্যায় যোজনা করিয়া গিয়াছে। তখনকার বাংলা ও ভারতের শাসক প্রবল-পরাক্রান্ত ইংরেজ শক্তির বিরুদ্ধে কলিকাতার নিকটবর্তী এক গ্রামাঞ্চলের সেই সামান্য চাষি-নেতার বিদ্রোহের কাহিনি চিরদিন বাংলা তথা ভারতের চির-বিদ্রোহী সাধারণ মানুষের স্মৃতিপটে জাগ্রত থাকিবে। সেই বিদ্রোহী চাষি-নায়ক হইলেন তিতুমিয়াঁ বা তিতুমির।

* * *

১৮২১ খ্রিস্টাব্দ। তখন সৈয়দ আহম্মদ তাঁহার ওয়াহাবি আদর্শ প্রচার করিতে কলিকাতায় আসিয়া পৌঁছিয়াছেন। এই বিদ্রোহী নেতাকে দেখিবার জন্য বাংলার বিভিন্ন জেলা হইতে হাজার হাজার লোকে আসিতেছে, তাঁহার কথা শুনিতেছে, তাঁহারা সকলে নূতন একটা বিদ্রোহী আদর্শ, তাহাদের নিপীড়িত জীবনে একটা নূতন আশার আলো লইয়া ফিরিয়া যাইতেছে। একদিন আহম্মদের সঙ্গে দেখা করিতে আসিলেন এক দীর্ঘকায়, বলিষ্ঠ মুসলমান যুবক। যুবকের বীরোচিত দেহ, চোখের নির্ভীক দৃষ্টি আহম্মদের মনোযোগ আকর্ষণ করিল। তিনি যুবকের সঙ্গে বহুক্ষণ আলোচনা করিলেন। যুবক এক নূতন প্রেরণা, নূতন সংকল্প লইয়া বাড়ি ফিরিলেন। এই যুবকই তিতুমির। তিতুমির চব্বিশ পরগনা জেলার গোবরডাঙা গ্রামের এক গৃহস্থ চাষির ছেলে, খাটিয়া খাওয়া মানুষ; বাল্যকাল হইতেই জমি-জমায় কাজ করার ফলে লোহার মতো শক্ত তাঁর দেহখানি। তখন জমিদার, চোর-ডাকাতের অত্যাচারে সাধারণ মানুষ ভীত, সন্ত্রস্ত। তাই তিতু আত্মরক্ষা ও পাড়াপড়শিদের বাঁচাইবার জন্য শিখিলেন মুষ্টিযুদ্ধ, লাঠি খেলা, অসি খেলা, তির ছোড়া প্রভৃতি। শক্তিমত্তায় তিতুর জুড়ি নাই। তিতু তাঁর দৈহিক শক্তি ও গুণের জন্য নদিয়ার জমিদারের অধীনে চাকরি পাইলেন। কিন্তু জমিদারের গোলামি তাঁর ভালো লাগিল না, তিনি চাকরি ছাড়িয়া গ্রামে ফিরিলেন। ঠিক এই সময় সৈয়দ আহম্মদের সঙ্গে তাঁহার দেখা হইল। এই সাক্ষাতের পর তিনি যেন একটা মহৎ উদ্দেশ্যের সন্ধান পাইলেন।

তিতু ওয়াহাবি আদর্শে অনুপ্রাণিত, ওয়াহাবি আদর্শ তাঁহাকে অন্যায়ের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের জন্য পাগল করিয়া তুলিল। বিদ্রোহের সংকল্প লইয়া তিনি এক দল গড়িতে আরম্ভ করিলেন। তখন কৃষকের উপর অত্যাচার বন্ধ করিবার জন্য তিতু জমিদারদের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করিলেন। তিতুর আন্দোলনের বিরুদ্ধে মুসলমান জমিদার ও হিন্দু জমিদারগণ একজোট হইল। তিতু ও তাঁর দলের লাঠির ভয়ে তাহারা ইংরেজ শাসকদের আশ্রয় লইল। ইংরেজ শাসকগণ এই প্রকারের একটা সুযোগের অপেক্ষাতেই ছিল। চাষি-বিদ্রোহ দমন করিবার জন্য ইংরেজ সরকারের পুলিশ আসিল, তিতুর নামে হুলিয়া বাহির

হইল। তখনও তিতুর বিদ্রোহের আয়োজন সম্পূর্ণ হইয়া উঠে নাই। তাই তিনি গা ঢাকা দিলেন। তিতু লুকাইয়া থাকিয়াই বিদ্রোহের আয়োজন করিতে লাগিলেন।

তিতু কলিকাতা ও চব্বিশ পরগনায় তাঁহার গোপন কর্মকেন্দ্র স্থাপন করিলেন। এবং সেখান হইতে চাষি আন্দোলন ও বিদ্রোহের সংগঠন পরিচালনা করিতে থাকেন। ফরিদপুরের দুদুমিয়াঁর মতো তিতুও লাঠির বদলে লাঠি অত্যাচারের বদলে অত্যাচার চালাইতে লাগিলেন। চাষি-আন্দোলন ও তিতুর শক্তি দেখিয়া জমিদারগোষ্ঠী ভয়ে দিশেহারা হইয়া গেল। যেখানেই চাষির উপর জমিদারদের অত্যাচার হইত, সেইখানেই তিতুর গোপন বাহিনী জমিদারদের উচিত শিক্ষা দিত।

তিতুর কাছে জমিদারের জাত বিচার নাই, ধর্মের প্রভেদ নাই। জমিদার চাষির শত্রু, জমিদার হিন্দুই হউক অথবা মুসলমানই হইক, চাষির উপর অত্যাচারের প্রতিফল তাহাকে পাইতেই হইবে। তিতু অত্যাচারীর যম— আর সেই অত্যাচারী হইল জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে সকল জমিদার ও তাহাদের মুরুব্বি ইংরেজ শাসক।

তিতুর সংগঠন ও শক্তি ধ্বংস করিবার জন্য জমিদার ও পুলিশ একত্রে দল বাঁধিল। চব্বিশ পরগনার গ্রামে গ্রামে জমিদারদের পাইক-বরকন্দাজ ও পুলিশের মিলিত বাহিনী প্রবেশ করিয়া চাষিদের উপর ভীষণ অত্যাচার আরম্ভ করিল। তাহারা চাষিদের ঘরবাড়ি জ্বালাইয়া, তাহদের শস্য থালাবাসন বিছানাপত্র কাড়িয়া লইতে লাগিল। এই অমানুষিক অত্যাচারে চব্বিশ পরগনার চাষিরা পাগল হইয়া উঠিল। তিতুও নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া রহিলেন না, চাষিদের লইয়া তিতুর গড়া বাহিনী জমিদারদের উপর পালটা আক্রমণ আরম্ভ করিল। জমিদারের টাকাকড়ি ও বাড়ি লুট হইতে লাগিল। জমিদারদের পাইক-বরকন্দাজগণ তিতুর বাহিনীর হাতে মার খাইয়া চাকরি ছাড়িয়া পালাইতে লাগিল। চব্বিশ পরগনার চাষিরা এবার মরিয়া হইয়া বিদ্রোহ ঘোষণা করিল। গ্রামের চাষিরা তাহাদের স্বাধীনতা ঘোষণা করিল, তাহারা তাহাদের স্বাধীন সরকার গঠন করিল, পুলিশ-ফউজ তৈরি করিল, জনসাধারণের বিচারালয় বসাইল।

তখন ১৮৩১ খ্রিস্টাব্দ। সারা বাংলা দেশে ওয়াহাবি আন্দোলন ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে সশস্ত্র বিদ্রোহের রূপ গ্রহণ করিতেছে। বাংলার বিভিন্ন জেলা চাষি-বিদ্রোহের অগ্নিস্পর্শে চঞ্চল হইয়া উঠিতেছে। অন্যায়, অত্যাচার, শোষণের বিরুদ্ধে বাংলার হাজার হাজার বিদ্রোহী কৃষকের মৃত্যুভয়হীন সংগ্রামের প্রচণ্ড আঘাতে বিদেশি শাসকের গদি টলমল করিয়া উঠিয়াছে। এই প্রচণ্ড ঝড়ের আঘাতে ইংরেজ শাসনের বনিয়াদ বুঝি চুরমার হইয়া যায়। চব্বিশ পরগনার চাষি বিদ্রোহী তিতুমিরের চাষি-বাহিনী বাংলা তথা ভারতের ইংরেজ শাসকদের ভীত সন্ত্রস্ত করিয়া তুলিল। শাসকগণ তাহাদের সকল শক্তি দিয়া এই বিদ্রোহ দমন করিবার আয়োজন করিল।

১৮৩১ খ্রিস্টাব্দের ১৪ নভেম্বর। ইংরেজ সেনাপতি ক্যাপটেন আলেকজান্ডারের নেতৃত্বে এক ইংরেজ সৈন্যবাহিনী তিতুর বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিল। সংবাদ পাইয়া তিতু তাহার বাহিনী লইয়া প্রস্তুত হইলেন। ইংরেজ বাহিনী গোবরডাঙার দিকে আগাইয়া আসিতে লাগিল— আর তিতুর বাহিনী চার দিকে লুকাইয়া থাকিয়া হঠাৎ আক্রমণের সুযোগ খুঁজিতে থাকিল। অবশেষে গোবরডাঙার নিকটবর্তী এক ময়দানে তিতুর বাহিনী ইংরেজ সৈন্যদের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল। তিতুর সৈন্যদের হাতিয়ার হইল বিষাক্ত তির-ধনু ও ঢাল, তরবারি আর বর্শা, অপরদিকে ইংরেজ সৈন্যদের হাতে রহিয়াছে উন্নত ধরনের রাইফেল। কিন্তু তিতুর বাহিনীর হঠাৎ আক্রমণে মাত্র দেড় ঘণ্টার মধ্যে প্রায় সকল ইংরেজ সৈন্য নিহত হইল। সেনাপতি আলেকজান্ডার আহত হইয়া পালাইয়া বাঁচিলেন।

১৭ নভেম্বর ইংরেজ সৈন্যদের আর-একটা বড়ো দল আসিল নদিয়ার ম্যাজিস্ট্রেটের অধীনে। তিতুর কাছে পরাজিত হইয়া ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবও সসৈন্যে পলাইতে বাধ্য হইলেন। এই পরাজয়ের সংবাদে কলিকাতার বড়ো সাহেবরা প্রমাদ গনিলেন। এবার এক হাজার সৈন্যের এক সুসজ্জিত বাহিনী আসিল তিতুর বিরুদ্ধে। তাহারা সঙ্গে আনিল কয়েকটি কামান আর এক হাজার বন্দুক। গোবরডাঙার ময়দানে নির্ভীক তিতু তাঁহার ঢাল বর্শা ও তির-ধনুকে সজ্জিত বাহিনী লইয়া ইংরেজ বাহিনীর সম্মুখীন হইলেন। এবার ঘোরতর যুদ্ধের পর ইংরেজ বাহিনীর নিকট তিতু পরাজিত হইলেন। তিতু তাহার হতাবশিষ্ট সৈন্য লইয়া পলাইয়া গেলেন।

এই পরাজয়ের পর তিতু তাঁহার ছত্রভঙ্গ বাহিনী গোবরডাঙার নিকটস্থ তেতুলিয়া গ্রামে একত্র করিতে লাগিলেন। তার পর বিদ্রোহীরা সকলে মিলিয়া পরামর্শ করিয়া স্থির করিলেন, ইংরেজ বাহিনীকে বাধা দিতেই হইবে। কিন্তু খোলা ময়দানে অপেক্ষাকৃত বেশি শক্তিশালী ইংরেজ বাহিনীর সম্মুখে দাঁড়ানো সম্ভব নয়। তাই রাতারাতি কেল্লার মতো একটা কিছু তৈরি করা স্থির হইল। তখন তিতুর সৈন্যসংখ্যা মাত্র পাঁচ শত। তিতু পাশের গ্রামের চাষিদের নিকটে সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। গ্রামের শত শত চাষি আসিয়া তিতুর বাহিনীর শক্তি বৃদ্ধি করিল। তিতুর সৈন্যরা আশপাশের বাঁশঝাড় উজাড় করিয়া হাজার হাজার বাঁশ কাটিল। সেই বাঁশ দিয়া তৈরি হইল এক অপূর্ব কেল্লা। বাঁশের কেল্লার মধ্যে তিতুর বাহিনী আশ্রয় গ্রহণ করিল।

এদিকে বিজয়ী ইংরেজ বাহিনী তাড়া করিয়া আসিতেছে। তিতুর বিদ্রোহী চাষি-বাহিনীকে নিশ্চিহ্ন করিয়া ফেলিবার জন্য তাহারা এক হাজার সৈন্য, আর কয়েকটা কামান লইয়া আসিতেছে। ইংরেজ বাহিনী চলিয়াছে তেতুলিয়া গ্রামের পথে। হঠাৎ তাহাদের অগ্রগতি রুদ্ধ হইল, ইংরেজ বাহিনী থমকিয়া দাঁড়াইল। বাঁশের কেল্লা হইতে আসিয়া পড়িতেছে অসংখ্য বিষাক্ত তির, সেই তিরে বিদ্ধ হইয়া বহু ইংরেজ সৈন্য প্রাণ দিল। বাঁশের কেল্লায় থাকিয়া তিতু আর তাহার সেনাপতি গোলাম মাসুমের পরিচালনায় বিদ্রোহী-বাহিনী ইংরেজ শত্রুকে স্তব্ধ করিয়া দিল। এবার ইংরেজ বাহিনী তাহাদের কামানের মুখ ঘুরাইল কেল্লার দিকে। কেল্লাকে অবিলম্বে উড়াইয়া দিতে না পারিলে তাহাদের সর্বনাশ। তির-ধনুক আর বর্শায় সজ্জিত তিতুর বীর বাহিনীর সঙ্গে ইংরেজ বাহিনীর কামানের লড়াই আরম্ভ করিল। কয়েকটা কামান অবিশ্রান্তভাবে গোলা-বর্ষণ করিতে লাগিল বাঁশের কেল্লার উপর। অন্যদিকে সেই গোলাবর্ষণ উপেক্ষা করিয়া বিদ্রোহীরা ইংরেজ সৈন্যদের উপর ঝাঁকে ঝাঁকে তির ছুড়িতে লাগিল। বিদ্রোহীদের বিষাক্ত তির বিঁধিয়া বহু ইংরেজ সৈন্য প্রাণ দিল। ইহা এক অপূর্ব যুদ্ধ, অদ্ভুত এই বাঁশের কেল্লা। বর্বর, মদমত্ত ইংরেজরাও বাঙালি বীর তিতুর অদ্ভুত সাহস আর রণ-নৈপুণ্য দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া গেল। পৃথিবীর সামরিক ইতিহাসে এই যুদ্ধের কোনো তুলনা নাই।

এইভাবে যুদ্ধ চলিল প্রায় আড়াই ঘণ্টা। তিতু একটা ধনুক লইয়া প্রাণপণে তির ছুড়িতেছিলেন। সহসা কামানের গোলার আঘাতে তিনি সাংঘাতিকরূপে আহত হইয়া পড়িয়া গেলেন। সেনাপতি গোলাম মাসুমও বন্দুকের গুলিতে ভীষণ আহত। বিদ্রোহীরা বুঝি যুদ্ধে হারিয়া যায়। প্রচুর রক্তপাত সত্ত্বেও তিতু লাঠিতে ভর করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন, সৈন্যদের সাহস দিতে লাগিলেন। নূতন উদ্যমে ইংরেজদের উপর তিরবৃষ্টি আরম্ভ হইল। ভয়ে ইংরেজ সৈন্য দিশেহারা হইয়া গেল। সহসা আকাশে একখণ্ড কালো মেঘ দেখা দিল, মাত্র কয়েক মিনিটের মধ্যে আকাশ মেঘে ঢাকিয়া গেল। ভীষণ ঝড় উঠিল। সেই ঝড়ে তিতুর বাঁশের কেল্লা ভাঙিয়া পড়িল। একটা প্রকাণ্ড বাঁশ আসিয়া পড়িল তিতুর মাথায়, তিতু অচেতন হইয়া পড়িয়া গেলেন। ইংরেজ বাহিনী পৈশাচিক উল্লাসে সেই ভাঙা কেল্লার

মধ্যে প্রবেশ করিয়া যাহাকে পাইল, তাহকেই হত্যা করিতে লাগিল। আহত অবস্থায় তিতু ও তাঁহার সেনাপতি গোলাম মাসুমকে ইংরেজরা ঘিরিয়া ধরিয়া বেয়নেট-বিদ্ধ করিয়া হত্যা করিল।

বাঙালি চাষি যুবক, বিদ্রোহী বীর তিতুমিরের সৈন্যরা পরাজিত হইল এবং স্বাধীনতা-সংগ্রাম ব্যর্থ হইয়া গেল। এইভাবে ভবিষ্যৎ বাঙালি বংশধরদের জন্য তিতু দান করিয়া গেলেন তাঁহার বিদ্রোহী জীবন ও অতুলনীয় দেশভক্তি। তিতুর অপূর্ব বাঁশের কেল্লা পরাধীন ভারতের দুর্যোগের আঘাতে উড়িয়া গিয়াছে বটে, কিন্তু সেইদিন হইতে তাহার বাঁশের কেল্লা বিদ্রোহের ইতিহাসের এক পরম বিস্ময়রূপে ভারতের কোটি কোটি কৃষককে অন্যায় ও শোষণের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের পতাকা উড্ডীন করিবার জন্য প্রেরণা জোগাইয়া আসিতেছে।

* * *

তিতুমীরের বিদ্রোহ ব্যর্থ হইবার পরে, বাংলা দেশে ওয়াহাবি আন্দোলন নিস্তেজ হইয়া পড়ে। এই আন্দোলনের প্রধান কেন্দ্র এবার বাংলা দেশ হইতে আবার পাটনায় স্থানান্তরিত হয়। পাটনার সদর দপ্তর আবার কর্মচঞ্চল হইয়া উঠে। এই সময় পাটনা কেন্দ্রের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন সৈয়দ আহম্মদের দুই জন যোগ্য শিষ্য— উলায়েৎ আলী ও এনায়েৎ আলী। উলায়েৎ ও এনায়েৎ আলীর নেতৃত্বে পাটনা আবার সারা ভারতের সংগ্রাম কেন্দ্রে পরিণত হয়।

উলায়েৎ ও এনায়েৎ আলী বাংলা ও সমগ্র দক্ষিণ ভারত পরিভ্রমণ করিয়া বিদেশি ইংরেজ শত্রুর বিরুদ্ধে বিদ্রোহের বাণী প্রচার করিতে থাকেন। এনায়েৎ আলী মালদহ, রাজশাহি, বগুড়া, নদিয়া, ফরিদপুর এবং পাটনার সকল শক্তি কেন্দ্রীভূত করেন। আলীভ্রাতৃদ্বয়ের চেষ্টায় বাংলা দেশে আবার আন্দোলন দানা বাঁধিয়া উঠিতে থাকে। তাঁহাদের উদাত্ত কণ্ঠের ধ্বনি হইল— যদি নরক-যন্ত্রণা হইতে ত্রাণ পাইতে চাও, তবে হয় বিদেশি বিজেতার বিরুদ্ধে প্রতি মুহূর্তে সংগ্রাম কর, আর ন-হয়— এই অভিশপ্ত দেশ ছাড়িয়া পলাইয়া যাও। জেলায় জেলায় প্রকাশ্যে জনসাধারণের মধ্যে এই ধরনের প্রচার চলিতে থাকে।

এই দুই নেতার চেষ্টায় বাংলা দেশে ওয়াহাবিদের কার্যকলাপ আবার জঙ্গিরূপ ধারণ করে। বাংলা দেশে এই আন্দোলন ক্রমশ বারাসত, সাতক্ষীরা, যশোহর, ঢাকা, ফরিদপুর, বাখরগঞ্জ, নদিয়া, পাবনা, রাজশাহি, রংপুর, ত্রিপুরা, নোয়াখালি, ময়মনসিং ও শ্রীহট্ট জেলায় ছড়াইয়া পড়ে। এই আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে এইসকল স্থানে কৃষকেরা জমিদার ও নীলকুঠির সাহেবদের বিরুদ্ধেও প্রবল আন্দোলন আরম্ভ করিয়া দেয়।

এই সময় উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশেও আবার ওয়াহাবি বিদ্রোহীরা মাথা তুলিতে থাকে। এই সময়ে ওয়াহাবিরা সিতানার দুর্গ দখল করে এবং সেখানেই ওই অঞ্চলের কেন্দ্র স্থাপন করিয়া পাঞ্জাবের উপর আক্রমণ চালাইতে থাকে। ইতিমধ্যে ১৮৪৮ খ্রিস্টাব্দে পাঞ্জাবের শিখশক্তির পতন ঘটিয়াছে। ইংরেজরা ১৮৫০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যেই সমগ্র পাঞ্জাব দখল করিয়া লইয়াছে। ইংরেজরা পাঞ্জাব দখল করিবার পর ওয়াহাবিরা আবার নূতন করিয়া পাঞ্জাবের ব্রিটিশ শাসনের উপর আক্রমণ চালাইতে থাকে।

এইভাবে সৈয়দ আহম্মদের দুই শিষ্য উলায়েৎ ও এনায়েৎ আলীর নেতৃত্বে ওয়াহাবি আন্দোলন ও ওয়াহাবি বিদ্রোহ নূতন শক্তি সঞ্চয় করিয়া, সারা ভারতে আত্মপ্রকাশ করে। সুদূর উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত হইতে বাংলার পূর্ব প্রান্ত পর্যন্ত এই দুই হাজার মাইলের মধ্যে বিদ্রোহের ঘাঁটি প্রতিষ্ঠিত হয়। এইসকল কর্মকেন্দ্রে প্রচারকদের প্রচার শিক্ষা এবং সৈনিক ও সেনাপতিদের যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা হয়। এইভাবে প্রচার ও আন্দোলনের ফলে সমগ্র ভারত একটি বিরাট আগ্নেয়গিরির প্রচণ্ড বিস্ফোরণে বিদেশি শাসকদের শক্তি ধূলিসাৎ হইবার উপক্রম হয়।

ইতিমধ্যে পাঞ্জাবের বিদ্রোহীরা ইংরেজ শত্রুর উপর আক্রমণ আরম্ভ করিয়া দেয়, ইংরেজরাও তাহাদের সকল শক্তি লইয়া বিদ্রোহীদের ধ্বংস করিবার জন্য চেষ্টা করে। ইংরেজ শাসকেরা ১৮৫০ হইতে ১৮৫৮ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে কেবলমাত্র উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধেই ষোলোটি অভিযান এবং ১৮৬৩ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে আরও বিশটি অভিযান পরিচালনা করে। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে এইসকল আক্রমণের সময় সারা ভারতের ওয়াহাবিরা ধনবল ও জনবল দিয়া তাহাদিগকে সাহায্য করে।

১৮৫৭-৫৮ খ্রিস্টাব্দে ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামের ইতিহাসে এক নূতন পথের সন্ধান দিয়া ভারতের প্রথম স্বাধীনতা-সংগ্রাম শেষ হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু ওয়াহাবি বিদ্রোহ সেই সংগ্রামের পরেও পূর্ণোদ্যমে চলিয়াছে। ওয়াহাবিরা ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের অভ্যুত্থানেও তাহাদের সমগ্র শক্তি লইয়া যোগদান করিয়াছিল। অবশ্য সিপাহি-অভ্যুত্থান ব্যর্থ হইয়া যাইবার পর, কিছুদিনের জন্য ওয়াহাবি আন্দোলনেও স্তব্ধতা দেখা দেয়— কিন্তু তাহা নিতান্তই সাময়িক। ১৮৬৩ খ্রিস্টাব্দে ওয়াহাবিরা আবার ইংরেজ শক্তির উপর আক্রমণ আরম্ভ করিয়া দেয়। সিপাহি-অভ্যুত্থানকে ধ্বংস করিয়া ইংরেজ শাসকগণ বিপুল শক্তি সঞ্চয় করে এবং সেই শক্তি লইয়া তাহারা সিপাহি-অভ্যুত্থানের মতো ওয়াহাবি বিদ্রোহকেও প্রচণ্ড আঘাতে চূর্ণ করিয়া ফেলিবার জন্য বিরাট আয়োজন সম্পূর্ণ করিয়া তোলে।

১৮৬৪ খ্রিস্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাস হইতে ইংরেজরা সর্বত্র ওয়াহাবিদের উপর আক্রমণ আরম্ভ করিল। ব্রিটিশ সেনাপতি স্যার নেভিল চেম্বারলেন প্রায় পাঁচ হাজার সৈন্যের এক বাহিনী লইয়া উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলের বিদ্রোহীদের উপর আক্রমণ করিল। আম্বালা গিরিসংকটে ওয়াহাবি বাহিনী ইংরেজ সৈন্যদের সম্মুখীন হইল। দুই দিন ধরিয়া প্রচণ্ড যুদ্ধ চলিল। ইংরেজ বাহিনী কামান-বন্দুকের জোরে শেষ-পর্যন্ত জয়লাভ করিলেও তাহাদের ক্ষতি হইল অপূরণীয়। দুই দিনের যুদ্ধের পর দেখা গেল, ইংরেজদের অতি অল্প সৈন্যই বাঁচিয়া আছে। তাই এই যুদ্ধ ইংরেজদের কাছে অর্থহীন হইল। কিন্তু শেষপর্যন্ত আত্মকলহের ফলে ওয়াহাবিরা তাহাদের আক্রমণ-শক্তি, এমনকি সংগ্রাম-শক্তিও হারাইয়া ফেলে। এই সুযোগে ইংরেজরা কূটনীতির সাহায্যে ওয়াহাবিদের শক্তি ছত্রভঙ্গ করিয়া দেয়। এবার তাহাদের মধ্যে দেখা দেয় দারুণ বিশৃঙ্খলা। তাহার সঙ্গে সঙ্গেই ইংরেজরা আর-একটা সামরিক অভিযান চালাইয়া উত্তর-পশ্চিমের ওয়াহাবিদের শক্তি চূর্ণ করিয়া ফেলে।

এই অঞ্চলের ওয়াহাবিরা আবার তাহদের ছত্রভঙ্গ শক্তি সংহত করিয়া তুলিতে থাকে এবং ১৮৬৮ খ্রিস্টাব্দে আবার তাহারা ইংরেজ শাসকদের উপর আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হইয়া ওঠে। এই সংবাদ পাইবামাত্র শাসকগণ কূটনীতির মারফত ওয়াহাবিদের সমর্থক উপজাতীয় মুসলমানদের ওয়াহাবি আন্দোলন হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলে এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে ভারত সরকারের জঙ্গিলাট স্বয়ং একটি বিরাট বাহিনী লইয়া ওয়াহাবিদের পার্বত্য ঘাঁটি আক্রমণ করেন। প্রথম দিকে ওয়াহাবিদের নিকট জঙ্গি লাটের পরাজয় ঘটিবার উপক্রম হয় এবং ইংরেজ বাহিনী পিছু হটিতে থাকে। কিন্তু স্থানীয় উপজাতীয় অধিবাসীরা সহসা ওয়াহাবিদের সাহায্য বন্ধ করিয়া দেয়। ইহার ফলে শেষপর্যন্ত ইংরেজরাই জয় লাভ করে। প্রাণপণে যুদ্ধ করিয়াও ইংরেজদের উন্নত সমরকৌশল ও অস্ত্রশস্ত্রের কাছে ওয়াহাবি সেনারা পরাজয় স্বীকার করিতে বাধ্য হয়। ওয়াহাবিদের পক্ষে এই পরাজয়ের ফল হইল মারাত্মক। এই অঞ্চলের ওয়াহাবি বাহিনী এই সামরিক বিপর্যয় ও অন্তর্দ্বন্দ্বের ফলে ভাঙিয়া খানখান হইয়া গেল। ইহার পর তাহাদের যুদ্ধ করিবার ক্ষমতা সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হইল।

এই সামরিক বিপর্যয়ের ফলে সারা ভারতের ওয়াহাবি বিদ্রোহীদের মধ্যে দারুণ হতাশা দেখা দেয়। সারা ভারতের বিদ্রোহীরা উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের এই যুদ্ধ জয়যুক্ত করিয়া তুলিবার জন্য সমগ্র

শক্তি দিয়া সাহায্য করিয়াছিল। কিন্তু তাহদের সকল চেষ্টা যখন ব্যর্থ হইয়া গেল, তখন তাহাদের মনে আর জয়ের কোনো আশাই রহিল না। অন্যদিকে, বিজয়ী ইংরেজরা বিদ্রোহীদের হতাশায় ভাঙিয়া পড়িতে দেখিয়া, তাহাদের ধ্বংসাবশিষ্ট শক্তি শেষ আঘাতে চূর্ণবিচূর্ণ করিয়া ফেলিবার আয়োজন করিল। তাহারা একই সময়ে সারা ভারতব্যাপী আক্রমণ আরম্ভ করিল। হতাশাচ্ছন্ন বিদ্রোহীরা সেই আঘাতে ছিন্নভিন্ন হইয়া গেল। চারি দিকে বিদ্রোহী নেতারা ইংরেজ শাসকদের হাতে ধরা পড়িতে লাগিলেন। শাসকরা বড়ো বড়ো বিদ্রোহী নেতাদের গ্রেফতার করিবার সঙ্গে সঙ্গে গুলি করিয়া হত্যা করিল।

ঠিক এই সময়ে ওয়াহাবি আন্দোলন ও সংগঠন সম্পর্কে কতকগুলি বিশেষ গোপন তথ্য ইংরেজদের কাছে ধরা পড়িয়া গেল। এইসকল গোপন তথ্য শত্রুর হস্তগত হইবার ফলে, বিদ্রোহীদের সকল আশা নির্মূল হইল। ইংরেজ সরকার বিদ্রোহীদের সকল কেন্দ্রের শক্তি সামর্থ্যের হিসাব, মূল সংগঠক ও নেতাদের নামধাম, তাঁহাদের প্রচারকৌশল, প্রচারের পুস্তক-পুস্তিকা, কোশাগার প্রভৃতির খবর জানিয়া গেল। ইহার সঙ্গে সঙ্গে চলিল চারি দিকে খানাতল্লাশ ও গ্রেফতার। বিদ্রোহীদের সকল আশা নির্মূল হইল। এইভাবে ভারতের বিদ্রোহী মুসলমান কৃষক প্রায় অর্ধশতাব্দী কাল ধরিয়া বিদেশি ইংরেজ শক্তিকে প্রাণপণে বাধা দিয়া অবশেষে ইতিহাসের অনিবার্য নিয়মে বিদেশি শত্রুর উন্নততর শক্তির নিকট পরাজিত হইল।

এইবার বিদ্রোহী নেতাদের লইয়া আরম্ভ হইল বিচারের প্রহসন। উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের যুদ্ধ শেষ হইবার পূর্বেই, ১৮৬৪ খ্রিস্টাব্দে পাঞ্জাবের আম্বালা শহরে একদল বিদ্রোহী নেতার বিচার আরম্ভ হয়। এই মামলার এগারো জন বিদ্রোহী নেতার প্রত্যেকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। ইহার পর ১৮৬৫ খ্রিস্টাব্দে দ্বিতীয় মামলা পাটনায় আরম্ভ হয়। ১৮৬৯-৭০ খ্রিস্টাব্দে রাজমহল, মালদহ, রাজশাহি প্রভৃতি স্থানেও মামলা চলে। এইসকল মামলার বিচারেও প্রায় সকল বিদ্রোহী নেতারই যাবজ্জীবন কারাদণ্ড ও তাঁহাদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হয় সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য হইল, কলিকাতার কলুটোলার বিখ্যাত ব্যবসায়ী আমির খাঁর মামলা। এই মামলা সারা ভারতে চাঞ্চল্য জাগাইয়া তুলিয়াছিল। আমির খাঁ কলিকাতার হাইকোর্ট অবধি লড়িয়াছিলেন। তাঁহার পক্ষ সমর্থন করিয়াছিলেন বোম্বাই হাইকোর্টের বিখ্যাত অ্যাডভোকেট অ্যানেস্টসাহেব।

স্বদেশি ও বিদেশি বহু ভুয়া ঐতিহাসিকদের মন-গড়া ইতিহাস মিথ্যা প্রতিপন্ন করিয়া তিনি প্রমাণ করিয়াছিলেন যে, ওয়াহাবি বিদ্রোহ কোনো সাম্প্রদায়িক ঘটনা নয়। এই বিদ্রোহে ভারতের বিদেশি শাসনের উচ্ছেদ করিয়া স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার জন্য ভারতের কোটি কোটি মানুষের বিদ্রোহ। কলিকাতা হাইকোর্টে অ্যানেস্টসাহেবের বক্তৃতার মধ্য দিয়া যেসকল তথ্য প্রকাশিত হয়, সেইসকল তথ্য স্বদেশি যুগের শত শত কর্মীকে জ্বলন্ত প্রেরণা দিয়াছে, দেশের স্বাধীনতার জন্য প্রাণ উৎসর্গ করিতে উদ্‌বুদ্ধ করিয়াছে, কংগ্রেসের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নায়ক বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয় সেই কথা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন।

কলিকাতার মামলার বিচারে আমির খাঁ যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরে দণ্ডিত হন এবং তাঁহার সকল সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হয়। এই দণ্ডাদেশের ঠিক পরেই ১৮৭১ খ্রিস্টাব্দের অক্টোবর মাসে এই মামলার বিচারপতি নর্ম্যানসাহেব ওয়াহাবিদের গুলিতে নিহত হন। ইহার কিছুদিন পর তৎকালীন বড়োলাট লর্ড মেয়ো আন্দামান ভ্রমণে যাইয়া দ্বীপান্তরিত ওয়াহাবিদের এক জনের ছুরিকাঘাতে প্রাণ দেন। ইংরেজ-শাসকরা এই বিদ্রোহ চূড়ান্তভাবে দমন করিলেও বিদ্রোহীরা ছড়াইয়া রহিল জেলের

মধ্যে-বাহিরে, এখানে-ওখানে সর্বত্র।— বিদ্রোহ দমন করা সম্ভব হইলেও বিদ্রোহীদের মনকে দমন করা, তাহাদের সংগঠন চূর্ণ করা ইংরেজ শাসকদের সাধ্যাতীত।

* * *

ওয়াহাবি বিদ্রোহ সাম্প্রদায়িক অথবা প্রকৃত স্বাধীনতা আন্দোলন কি না তাহা লইয়া পণ্ডিতদের মধ্যে মতভেদ ও বিতর্কের অন্ত নাই। কিন্তু বহু পণ্ডিত ব্যক্তি যে এই বিদ্রোহ সম্পর্কে রায় দিবার সময় ঐতিহাসিক তথ্যের উপর নির্ভর না করিয়া, কেবলমাত্র নিজেদের ও অপরের অনুমানের উপরই নির্ভর করিয়াছেন, তাহার বহু প্রমাণ দেখা যায়। কিন্তু এ কথা সত্য যে, বিদ্রোহের প্রধান নায়কদের ধর্মের ধ্বনি এই বিদ্রোহের ব্যর্থতার বিভিন্ন কারণের অন্যতম। বহু ক্ষেত্রে মুসলমানদের সাম্প্রদায়িক ধর্মের জিগিরের ফলেই এই বিদ্রোহ যথেষ্ট ব্যাপকতা লাভ করিতে বা অন্যান্য সম্প্রদায়ের সমগ্র জনগণকে ইহার মধ্যে টানিয়া আনিতে পারে নাই। কিন্তু এ কথা ভুলিয়া গেলে চলিবে না যে, ধনতন্ত্র ও শিল্পবিকাশের পূর্ব-যুগে প্রায় প্রত্যেক দেশে এইপ্রকার ধর্মীয় ধ্বনির সাহায্যেই কোনো যুদ্ধ বা বিদ্রোহের জন্য ব্যাপক জনসমাবেশের পন্থা গ্রহণ করা হইত। ইহা অনগ্রসর সামাজিক স্তরেরই অবশ্যম্ভাবী পরিণতি। তখন ভারতবর্ষ চলিয়াছিল এক ভয়ংকর অরাজক ও হতাশাচ্ছন্ন অবস্থার মধ্য দিয়া। বিদেশি আক্রমণের ফলে তখন ভারতের প্রাচীন গ্রাম্য সমাজ-ব্যবস্থা ভাঙিয়া চুরমার হইয়া গিয়াছিল। ভারতীয় জনগণের আর্থিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং ধর্মীয় জীবনে এক চরম দুর্যোগ নামিয়া আসিয়াছিল। এই অবস্থায় বিদ্রোহের নায়কগণের দৃষ্টির এই সংকীর্ণতা মোটেই অস্বাভাবিক নয়, বরং তৎকালীন অবস্থার জন-সমাবেশের জন্য ধর্মের ধ্বনির আশ্রয়ই ছিল নিতান্ত স্বাভাবিক ও অনিবার্য ঘটনা।

ভারতের ইতিহাসের এই দীর্ঘতম বিদ্রোহ বিফল হইলেও তাহা ভারতের কোটি কোটি মানুষের জন্য রাখিয়া গিয়াছে বিদেশি শাসকের বিরুদ্ধে রক্তরাঙা এক সংগ্রামের পথ। আজ অবধি কোটি কোটি কৃষক, সাধারণ মানুষ সেই পথে চলিয়া আসিয়াছে।

আজিও তাহদের সেই পথ চলা শেষ হয় নাই।

সাঁওতাল বিদ্রোহ

মহম্মদ আবদুল্লাহ্ রসুল

ইংরেজ রাজত্বের দুশো বছরের শাসন ও জুলুমের বিরুদ্ধে ভারতবর্ষে বহু কৃষক বিদ্রোহ হয়ে গেছে। বিদেশি শাসনের বিরুদ্ধে আমাদের দেশে কৃষকরাই প্রথম স্বাধীনতার পতাকা ঊর্ধ্বে তুলে ধরেছিল। বাংলা দেশে কৃষকদের বিদ্রোহগুলি এক গৌরবময় ঐতিহ্য সৃষ্টি করেছে। সন্ন্যাসী বিদ্রোহ, ২৪ পরগনা জেলায় তিতুমিরের বিদ্রোহ, ফরিদপুর জেলায় দিদুমিরের নেতৃত্বে কৃষক বিদ্রোহ, সাঁওতাল কৃষকদের বিদ্রোহ, নীল চাষিদের বিদ্রোহ, পাবনা ও বগুড়ার রায়তদের বিদ্রোহ—এমনই যেসব বড়ো বড়ো সংগ্রাম হয়েছিল তার মধ্যে সাঁওতাল বিদ্রোহের গুরুত্ব সমধিক।

সাঁওতাল কৃষকদের বিদ্রোহ ঘটেছিল একবার নয়, বারবার —১৮১১, ১৮২০, ১৮৩১ এবং ১৮৫৫-৫৬ সনে; পরে আবার ১৮৭১, ১৮৭৪-৭৫, এবং ১৮৮০-৮১ সনের বিদ্রোহ। এইসমস্ত বিদ্রোহের মধ্যে সবচেয়ে গুরুতর ও ব্যাপক ছিল ১৮৫৫-৫৬ সনের বিদ্রোহ।

কেন এই বিদ্রোহ?

নিরীহ, সরল-প্রকৃতি ও শান্তিপ্রিয় সাঁওতাল কৃষকরা কেন বিদ্রোহ করেছিল? সাঁওতাল চাষিরা যখন জঙ্গল কেটে জমি হাসিল করত এবং সেই জমিতে গতরের মেহনত ঢেলে প্রচুর ফসল ফলাত, অমনি জমিদারদের জিভে জল সরত সেই জমি কেড়ে নেবার জন্য। ব্যাপারীরা তাদের নানাভাবে ঠকাত এবং নামমাত্র দাম দিয়ে তাদের সমস্ত ফসল আত্মসাৎ করে নিত। মহাজনরা অতিরিক্ত হারে চক্রবৃদ্ধি সুদে কর্জ দিয়ে তা আদায়ের নামে তাদের ঠকিয়ে সর্বস্বান্ত করত ও শেষে একেবারে সারা জীবনের জন্য তাদের গোলাম বানিয়ে রাখত। জমিদার, মহাজন ও ব্যবসায়ীদের ঘুষে পুষ্ট হয়ে পুলিশ ও আমলারা তাদের অযথা হয়রান ও পীড়ন করত। এবং ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির পুঁজিবাদী বানিয়া সরকার, তাদের উপর যে অকথ্য জুলুম ও পীড়ন চালাত, তার কোনোরকম প্রতিকার করত না, সমস্ত অবস্থা জেনেশুনেও কেবল মোটা রাজস্ব আদায় করে কোম্পানির মুনাফা বৃদ্ধির তালে থাকত।

এই শোষণ, পীড়ন ও প্রতারণার ব্যবস্থা ক্রমে নিরীহ সাঁওতাল কৃষকদেরও সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে যায়। তখন তারা বিদ্রোহের আগুন জ্বেলে দেয়।

বিদ্রোহের আসল কারণ ছিল সাঁওতালদের নিশ্চিন্ত হয়ে নিজেদের জমি বজায় রাখবার ও চাষ করবার এবং চাষের ফসল ভোগ করবার স্বাভাবিক প্রবৃত্তি এবং সেজন্য সমস্ত অন্যায় শোষণ ও অত্যাচার থেকে রক্ষা পাবার আকাঙ্ক্ষা। তাই বিদ্রোহের মূল দাবি ছিল জমি চাই, অত্যাচারী ও ঠগবাজ মহাজন ও ব্যাপারীদের শোষণ থেকে এবং বিদেশি শাসন থেকে মুক্তি চাই। জমিদারি-মহাজনি ও বিদেশি ইংরেজদের শাসনব্যবস্থা এই উভয়েরই বিরুদ্ধে তারা বিদ্রোহ করেছিল, দুইয়েরই অবসানের জন্য তারা হাজার হাজার কৃষকের রক্ত ও জীবন দিয়ে লড়েছিল।

পুরোনো পরিচয়

বাংলা, বিহার ও ওড়িশার, অর্থাৎ এককালের সুবে বাংলার সাঁওতালরা একটা বড়ো উপজাতি। সংখ্যার দিক থেকে ভারতের মধ্যে এটি বৃহত্তম। ১৯৫১ সনের আদমশুমারির হিসাবে পশ্চিমবাংলায় তাদের সংখ্যা ছিল ৮ লাখ ৪৫ হাজার। সাঁওতালি ভাষা যাদের মাতৃভাষা এমন লোকের সংখ্যা ছিল সারা ভারতে ২৮ লাখ; তার মধ্যে বিহারে ১৭ লাখ, পশ্চিমবাংলায় ৬ লাখ ৬৪ হাজার, ওড়িশায় ৩ লাখ ৩৬ হাজার এবং আসামে ৯৩ হাজার। পশ্চিমবাংলায় যে জেলাগুলিতে বেশি সাঁওতালের বাস সেখানে তাদের সংখ্যা এই : বীরভূমে ৭৮ হাজার, বাঁকুড়ায় ১ লাখ ৩৭ হাজার, মেদিনীপুরে ২ লাখ ২ হাজার, বর্ধমানে ১ লাখ ২৭ হাজার, মালদহে ৭২ হাজার, পশ্চিম দিনাজপুরে ৯৪ হাজার এবং হুগলিতে ৪৮ হাজার। পূর্ববঙ্গেও কিছু সাঁওতাল আছে।

১৯৭১ সনের সেন্সাস অনুসারে সাঁওতাল উপজাতির সংখ্যা : সারা ভারতে ৩৬,৩৩,৪৫৯; পশ্চিমবাংলায় ১৩,৭৬,৯৮০; ওড়িশায় ৪,৫২,৯৫৩; বিহারে ১৮,০১,৩০৪। পশ্চিমবাংলায় কয়েকটি জেলায় : মেদিনীপুরে ২,৮৬,০১০; পুরুলিয়ায় ১,৯৬,৬৩২; বর্ধমানে ১,৮০,২৮০; বাঁকুড়ায় ১,৫৭,৮০৬; পশ্চিম দিনাজপুরে ১,৩০,৪৭৩; বীরভূমে ১,০৪,৭২২; মালদায় ৯০,২৮৫; হুগলিতে ৭৫,১৩২।

সাঁওতালদের নিজস্ব ভাষা আছে। এই ভাষা তার প্রকৃতির দিক থেকে বাংলা বা হিন্দি ভাষার সঙ্গে মেলে না। এতকাল এই ভাষার নিজস্ব কোনো বর্ণমালা ছিল না। তাই বাংলা, হিন্দি, রোমান প্রভৃতি বর্ণমালার সাহায্যেই এই ভাষা লেখা হত। পঞ্চাশের দশকেও সাঁওতালি ভাষায় শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা কিছুই ছিল না। [এখন (১৯৮০) অবস্থার কিছু পরিবর্তন ঘটছে। একটা নতুন বর্ণমালা, 'অলচিকি' রচনা করা হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট গভর্নমেন্ট এই অলচিকি বর্ণমালাকে সাঁওতালি ভাষার বর্ণমালা বলে স্বীকৃতিও দিয়েছে।]

তাদের সমাজব্যবস্থা, রীতি রেওয়াজ অসাঁওতাল বাঙালি বা বিহারিদের সমাজব্যবস্থা থেকে অনেক বিষয়ে ভিন্ন। তাদের মধ্যে জাতিভেদ নাই। তামাম সাঁওতাল উপজাতির মধ্যে সাতটি গণ বা গোষ্ঠী আছে, সামাজিক দিক দিয়ে তারা সকলেই সমান। প্রত্যেক গোষ্ঠীর নিজস্ব নাম বা পদবি আছে। পদবিগুলি এই : কাসদা, মুর্মু, সরন (সরেন), হাসদি (হাসদা), মাবুডি (মারডি), কেস্কু (কিস্কু) ও টাডু (টুডু)। অন্য মতে পদবিগুলি এই : জ্যেষ্ঠ থেকে কনিষ্ঠ— হাঁসদা, মুর্মু, কিসকু, হেমব্রম, মারডি, সরেন ও টুডু। মানডি বা মারানডি মারডিরই ভিন্ন রূপ। মারাং বুরু (বৃহৎ পর্বত) তাদের সকলের জাতীয় দেবতা। শিবকেও অনেকে দেবতা বলে মানে।

সাঁওতাল জাতির উৎপত্তি সম্বন্ধে নানারকম প্রবাদ ও কাহিনি প্রচলিত আছে। মারাং বুরুর ইচ্ছা অনুসারে এই জাতির আদি পিতা ও মাতার সাত পুত্র ও সাত কন্যা হতে এই সাত গণ বা

সংকুলান না হওয়ায় তারা চাইচম্পায় চলে যায়। পরে যায় সিলদায়, সেখান থেকে সিকারে, সেখান থেকে ছোটোনাগপুরে, তার পর উত্তরে ওসিরে পর্যন্ত। এইভাবে এক অঞ্চল ছেড়ে অন্য অঞ্চলে যাওয়ার কারণ সম্ভবত এই ছিল যে তারা চাষের জন্য জমি ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা পেত না এবং জঙ্গলে পাহাড়েও তাদের জন্য যথেষ্ট খাদ্য সংস্থান হত না।

সপ্তদশ শতক নাগাদ তারা বাঁকুড়া ও মেদিনীপুর জেলায় ঢোকে। সেখানে জমির ষোলোআনা মালিক না হওয়ায় তাদের খাজনা দিতে হত এবং মোড়লের মারফত এজমালিতে সে খাজনা দিত।

দামনে কোহ্ এলাকায়

জঙ্গল সাফ করার কাজে ও চাষের কাজে সাঁওতালদের যথেষ্ট দক্ষতা ছিল। তাই জমিদাররা নিজ নিজ জঙ্গলে চাষাবাদ করবার জন্য তাদের উৎসাহ দিত। এই উপায়ে জমিদাররা তাদের মেহনত দিয়ে নিজেদের আয় বাড়িয়ে নিত।

ঊনবিংশ শতকের প্রথম দিকে তারা দামনে কোহ (রাজমহল পাহাড়তলি) এলাকায় আসতে থাকে। সেখানে বিস্তর উর্বর জমি পতিত বা জঙ্গলে ঢাকা পড়ে ছিল। তারা এখানে এসেছিল জমি পাবার জন্য এবং তাদের উৎসাহ দেওয়া হয়েছিল বন কেটে জমি হাসিল করবার জন্য। পঁচিশ বছরের মধ্যে প্রায় এক লাখ সাঁওতাল এসে প্রায় পাঁচ লাখ বিঘা জমি হাসিল ও আবাদ করে। তারা ভাবত সে জমি তাদের নিজেদের; কিন্তু অল্পকালের মধ্যে তা জমিদার মহাজনদের হাতে চলে যেতে থাকে। জমিহারা হয়ে তখন তারা তাদের পরগনাইত বা মোড়লদের সহিত আলোচনা করে কী উপায়ে জমি ফেরত পাওয়া যায়।

সেকালে রাজমহলের পাহাড় এলাকায় যে পাহাড়িয়ারা বাস করত তারা পাহাড়তলির জমি চাষ করবার জন্য নীচে আসত না। সমতলের অসাঁওতাল বাঙালি কৃষকরাও এগিয়ে গিয়ে সে জমি চাষ করতে ভরসা পেত না। সেখানে প্রচুর উর্বর জমি ছিল, অথচ নিজেদের এলাকায় থেকে সাঁওতালরা জমি পাচ্ছিল না। ১৭৯০ সনে ইংরেজ কোম্পানির সরকার ঘোষণা করে যে হাসিল করা জমির উপর আর কর ধার্য করা হবে না। ঘোষণায় আরও বলা হয় যে কোনো কৃষক যত খুশি জমি চাষ করতে পারে।

দামনে কোহ বা বর্তমান রাজমহলের পাহাড়তলি অঞ্চলকে ১৮৩২ সনে বেড়া দিয়ে ঘিরে ফেলা হয়। এই অঞ্চল পড়ে তখনকার ভাগলপুর, বীরভূম ও মুর্শিদাবাদ জেলার মধ্যে। দামনে কোহের আয়তন ছিল ১৩৬৩ বর্গমাইল। তার মধ্যে ৫০০ বর্গমাইলে পাহাড় ছিল না। ১৮৫০ সনে এই ৫০০ বর্গমাইল এলাকায় প্রায় অর্ধেক অংশে জঙ্গল ছিল, বাকি অর্ধেক হাসিল করা হয়েছিল।

অষ্টাদশ শতকের শেষ ভাগে ও ঊনবিংশ শতকের প্রথম ভাগে বাঁকুড়া, মেদিনীপুর, বীরভূম, কটক, মানভূম, ছোটোনাগপুর, হাজারিবাগ ইত্যাদি অঞ্চল থেকে দামনে কোহ্ এলাকায় এসে সাঁওতালরা বসবাস করতে থাকে। ১৮৩৬ সন পর্যন্ত সেখানে সাঁওতাল ও ভুঁইয়ারা, প্রধানত সাঁওতালরা, ৪২৭ খানি গ্রাম প্রতিষ্ঠা করেছিল বলে জানা যায়। তার পর তাদের সংখ্যা খুব বেড়ে যায় এবং ১৮৫১ সন নাগাদ প্রায় ১৫০০ গ্রামে তাদের সংখ্যা হয় ৮৩ হাজার।

ব্যাপারী ও মহাজনের হামলা

দামনে কোহ্ এলাকায় এসে চাষবাস করে সাঁওতালরা প্রথমে অনেকটা নিশ্চিন্ত বোধ করেছিল। কিন্তু অল্পকালের মধ্যেই তাদের এই অবস্থায় নতুন উৎপাত দেখা দিল। অনেক বাঙালি, ভোজপুরি ও ভাটিয়া ব্যাপারী ও মহাজন দামনে কোহ্ এলাকায় এসে তাদের কারবার শুরু করল।

তখন সাঁওতালদের মধ্যে আধুনিক মুদ্রা অর্থনীতির প্রচলন বিশেষ হয়নি, টাকাপয়সার লেনদেন তেমন ছিল না। তাদের সমাজে স্বাভাবিক অর্থব্যবস্থার প্রভাবই ছিল বেশি। তারা জমি চাষ করত তার ফসল নিজেরা ভোগ করবে বলে, এবং কিছু অংশ বিনিময় করে কাপড়-চোপড়, তেল-নুন ইত্যাদির প্রয়োজন মেটাবে বলে।

ব্যাপারীরা এসে কেনাবেচার কারবার শুরু করে। তারা সরলচিত্ত সাঁওতাল কৃষকদের ফসল মাটির দরে কিনে নিয়ে বাইরে চালান করে আর সেই সঙ্গে বাইরে থেকে আমদানি করা লবণ ও অন্যান্য পণ্য চড়া দরে তাদের মধ্যে বিক্রি করে। অনেক মহাজনও এ কারবার করত। দর কম বা বেশি ছাড়া তাদের আরও ঠকিয়ে কেনবার ও বেচবার জন্য তারা দু-রকম বাটখারা বা পাথর রাখত। কেনবার সময় ব্যবহার করত বড়ো বাটখারা, তার নাম ছিল কেনারাম বা বড়োবউ। আর বেচবার সময় ব্যবহার করত ছোটো বাটখারা, তার নাম ছিল বেচারাম বা ছোটোবউ।

ব্যাপারীরা তাদের ফসল কিনে ও অন্যান্য পণ্য তাদের নিকট বিক্রি করে অত্যধিক মুনাফা লুটত। সেই মুনাফাকে আরও ফাঁপিয়ে তুলত সুদের কারবার করে। কোনো সাঁওতাল কৃষক পরিবার নতুন এসে জমি হাসিল করবার সময় খোরাকির জন্য ব্যাপারীর নিকট কিছু ধান চাইলে সে ধার দিত, কিন্তু জমি হাসিল করা ও ফসল বোনা হলেই সেই জমি দখল করত।

আবার, কোনো পরিবার তাদের খোরাকির ধান ফুরিয়ে যাবার পর সামাজিক ক্রিয়া উপলক্ষে যদি ব্যাপারীর নিকট কাজ চাইত, সে তাদের উপবাস থেকে বাঁচবার মতো সামান্য পরিমাণে ধান কর্জ দিত। কিন্তু কর্জ ধানের ভাত খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাদের মহাজনের গোলাম হয়ে থাকতে হত। তারা দেনা শোধ করবার জন্য যতই খাটুক না কেন, যতই টানাটানি করে ও সঞ্চয় রেখে সংসার চালাক না কেন, ব্যাপারী তাদের সমস্ত ফসল দখল করে নিত এবং বাকি দেনার জন্য পরের বছরের ফসলের উপর দাবি রাখত। এমনিভাবে বছরের পর বছর সমস্ত রক্ত নিংড়ে দিয়েও খাতক তার দেনার দায় থেকে কখনও রেহাই পেত না।

এই অন্যায় জুলুম বরদাস্ত করতে না পেরে যদি কোনো খাতক জঙ্গলে চলে যাবার কথা বলত, তা হলে মহাজন তাকে কোনো কথা জানতে না দিয়ে গোপনে আদালতে যেত এবং ঘুষের সাহায্যে তার উপর ডিক্রি জারি করাত। খাতক হঠাৎ দেখত তার গোরু, মোষ, তৈজসপত্র, হাঁড়িথালা পর্যন্ত নিলাম হয়ে গেল। স্ত্রীর সম্মানের চিহ্ন যে সামান্য লোহার বালাটুকু, তাও বাদ যেত না, ছিনিয়ে নেওয়া হত।

এই এলাকার জন্য যে ইংরেজ জজ নিযুক্ত হয়েছিল, সে সরকারের রাজস্ব আদায় নিয়েই ব্যস্ত থাকত, জনগণের ছোটোখাটো নালিশ শোনবার তার অবসর ছিল না। অধস্তন দেশি কর্মচারীরা প্রত্যেকেই অত্যাচারীদের পয়সা খেত, পুলিশও ছিল তার শরিক। এসবের খবর গভর্নমেন্টও রাখা দরকার মনে করত না অথবা জেনেও জানত না। একজন মাত্র ইংরেজ অফিসারকে পাঠানো হয়েছিল সাঁওতালদের দেখাশোনা করতে। দেখাশোনা কিছু হত না, কিন্তু কোনো অত্যাচার না হলেও সেই অফিসারের ব্যবস্থাপনায় চাষের খেত বাড়ানো হত, তাতে রাজস্বও বাড়ত; রাজস্ব বেড়ে হয়েছিল ১৮৩৮ সনে ৬৬৮ পাউন্ড থেকে ১৮৫৪ সনে ৬৮০৩ পাউন্ড।

মহাজন ও ব্যাপারীদের বর্বর অত্যাচারের কোনো প্রতিকার ছিল না। আদালত ছিল বহু দূরে। নির্যাতিত গরিব কৃষক ও অন্যান্য শ্রমজীবীরা কেঁদে মরত, কেউই তাদের সাহায্য করত না। নিরাশ হয়ে সাঁওতালরা বলত, ভগবান মহৎ, কিন্তু বড়ো দূরে আছে।

মহাজনের হিংস্র থাবা

জমিদারেরও শকুন দৃষ্টি তাদের জমির উপর পড়েছিল। আর মহাজনের দেনা দশ গুণ শোধ করা হলেও তার জের কোনোদিন মিটত না। যখন ফসল ও গোরুবাছুর দিয়েও দেনা শোধ করা যেত না, তখন মহাজনের ঘরে তাদের সপরিবারে গোলাম হয়ে বাঁধা পড়ে থাকতে হত অথবা জঙ্গলে পালিয়ে গিয়ে অনাহারে মরতে হত। মহাজনের এই অমানুষিক অত্যাচার তাদের পক্ষে ক্রমে অসহনীয় হয়ে উঠল।

এই অবস্থায় অসম্ভব জুলুম ও পীড়নের মধ্যে ১৮৫৪ সন পর্যন্ত সাঁওতালদের থাকতে হয়। মহাজনের পীড়ন সহ্য করতে না পেরে ১৮৪৮ সনে তিনটি এলাকার সমস্ত সাঁওতাল বাসিন্দা জমি-জায়গা ফেলে হতাশ মনে জঙ্গলে চলে গিয়েছিল। কিন্তু তামাম এলাকার অধিকাংশ লোকই পেটের দায়ে মহাজনের দাস হয়ে থাকতেই বাধ্য হয়।

অনেক সাঁওতাল কৃষকের সামান্য দেনার জন্যও বাঁধা দেবার মতো জমি বা ফসল কিছুই থাকত না। এই ধরনের লোকদের মধ্যে কারও বাপ মারা গেলে সৎকারের জন্য দু চার টাকা ধার করতে তাকে মহাজনের দুয়ারে যেতে হত। সেজন্য বন্ধক রাখবার কিছু না থাকায় সৎকারের পর থেকে দেনা শোধ না হওয়া পর্যন্ত তাকে সপরিবারে মহাজনের গোলামি করতে হত। মহাজন অবশ্য চাইত না এই দেনা শোধ হোক। তাই অন্য জায়গায় কাজ করে যাতে সে শোধ দিতে না পারে, সেজন্য তাকে দিনরাত নিজের কাজে খাটিয়ে আটক রাখত। এই খাতক মরে গেলে ছেলেদের জন্য কেবল দেনার বোঝাই রেখে যেত। দেনা ও তার আনুষঙ্গিক গোলামি চলত পুরুষানুক্রমে। দেনা প্রথমে সামান্য দু চার টাকা হলেও অল্পকালের মধ্যেই শতকরা ৩৩ টাকা চক্রবৃদ্ধি হারের সুদে ফুলেফেঁপে উঠত। শতকরা ৫০০ টাকা হারেও সুদ আদায়ের সংবাদ পাওয়া যায়। মহাজন খাতককে চাষের ও ফসলের মরশুমে সকল সময় কাজে নিযুক্ত রাখত। তা অসহ্য হলে খাতক যদি কাজ করতে না চাইত, মহাজন তার আহার বন্ধ করে দিত। সে যদি অপরের কাজ করতে যেত, মহাজন আদালতের ডিক্রি আনিয়ে এবং জেলের ভয় দেখিয়ে তাকে ঠান্ডা করত।

সরকারি আমলাদের নির্যাতন

সাঁওতাল কৃষকদের উপর যখন এই নিদারুণ শোষণ ও পীড়ন চলছিল, সেই সময়ে (১৮৫৪) এক সরকারি মুখপত্রেই স্বীকার করা হয়েছিল যে জমিদার, নায়েব, গোমস্তা, পেয়াদা, পুলিশ, আমলা, এমনকি ম্যাজিস্ট্রেট পর্যন্ত সবাই মিলে নিরীহ গরিব সাঁওতাল কৃষকদের উপর নির্মম অত্যাচার চালায়। বার্ষিক শতকরা ৫০ থেকে ৫০০ টাকা হারে সুদ আদায়, বেআইনি আদায়, জোর করে জমি দখল, মারধর— তাদের উপর সবই চলে।

দামনে কোহের মাটিতে দেহের সমস্ত শ্রম দিয়ে সোনা ফলিয়ে এত সম্পদ পয়দা করছিল যে সাঁওতাল কৃষকরা, তাদের উপর এই বর্বর আক্রমণ চলছিল অবাধে, বিদেশি পুঁজিবাদী শোষকদের 'সুসভ্য' নাকের ডগার উপর। সরকারি কাগজপত্রেও সে কথা বারবার প্রকাশ পেয়েছিল। কিন্তু অত্যাচারী জমিদার-মহাজন ব্যাপারী শ্রেণির উৎপাত বন্ধ করবার দিকে বিদেশি কোম্পানির সরকারের আগ্রহ দেখা যায়নি কোনো দিন।

এই অত্যাচারের সঙ্গে সঙ্গে সাঁওতালদের উপর আরও এক জুলুমের পথ খুলে দেওয়া হয়েছিল। এই এলাকা দিয়ে রেললাইন তৈরির কাজ তখন শুরু হয়ে গিয়েছিল। এই কাজে যে-সমস্ত ইংরেজ কর্মচারী নিযুক্ত হয়েছিল তারা সাঁওতালদের কাছ থেকে বিনা পয়সায় খাসি, মুরগি

ইত্যাদি কেড়ে নিত, অন্যায়ভাবে তাদের উপর জুলুম চালাত। তারা দু-জন সাঁওতাল মেয়ের ইজ্জত নষ্ট করে এবং একজন পুরুষকে খুন করে।

গণ-জাগরণের সূত্রপাত

সাঁওতাল কৃষকরা বহু কষ্টে ও পরিশ্রমে যে জমি জঙ্গল কেটে হাসিল করেছিল সে জমি তাদের হাত থেকে বেরিয়ে জমিদার-মহাজনদের হাতে চলে যেতে লাগল। মেহনত করে যে ফসল তারা ফলাচ্ছিল তা ব্যাপারী ও মহাজনরা অন্যায়ভাবে জোর করে এবং ঠকিয়ে দখল করে নিচ্ছিল। সামান্য দেনার দরুন অন্যায় ও মিথ্যা সুদের দায়ে জঙ্গলের মুক্ত ও সরল এই মানুষগুলি মহাজনদের নিকট মাথা বিক্রি করে তাদের গোলামি করতে বাধ্য হচ্ছিল।

এইসমস্ত ঠগবাজ অত্যাচারীদের নিষ্ঠুর পীড়ন থেকে রক্ষা পাবার জন্য আইন-আদালত থেকে তারা কোনোই সাহায্য পেত না, বরং শোষক শ্রেণিদের স্বার্থে আদালত ও পুলিশ অযথা তাদেরই হয়রান ও পীড়ন করত, সর্বস্বান্ত করে দিত। যেমন এখনও অনেক পরিমাণে চলে কৃষকদের উপর পুলিশের জুলুম ও পীড়ন। আর কোম্পানির সরকার তাদের রক্ষা করার কথা চিন্তা না করে নিজের মুনাফার টাকা গুনতে ব্যস্ত থাকত।

এই অবস্থা ক্রমে যখন অসহ্য হয়ে উঠল তখন সাঁওতালদের মধ্যে বিক্ষোভের আগুন ধোঁয়াতে শুরু করল। তারা ছিল নিরীহ ও সরল প্রকৃতির মেহনতকারী মানুষ। শোষণ ও অত্যাচার যে হচ্ছিল তা তারা হাড়ে হাড়ে অনুভব করছিল। কিন্তু কেন যে মানুষ এইভাবে জুলুম করে তা বুঝছিল না, শোষক শ্রেণির শ্রেণিস্বার্থ শোষকদের যে কতখানি পৈশাচিক ও অমানুষিক করে তোলে তা ছিল তাদের বোঝার বাইরে। তারা শুধু এই সহজ কথাটা বুঝতে পারছিল যে অত্যাচারী লোকগুলো খারাপ, এবং সরকার ও তার পুলিশও যখন এই খারাপ লোকগুলোর পক্ষে থেকে তাদেরই উপর অন্যায়ভাবে জুলুম পীড়ন চালায়; তখন তারাও খারাপ। এই ছিল সাঁওতাল কৃষকদের জীবনের বাস্তব ও জীবন্ত অভিজ্ঞতা : মহাজন ও ব্যাপারীরা তাদের শত্রু, সরকারও শত্রু।

এমনই সময়ে নিকটের রেললাইন তৈরির কাজে বহু সাঁওতাল মজুর হিসাবে যোগ দেয়। গ্রামে মহাজনের গোলমি করে যা পেত তার চেয়ে ভালো মজুরিতে তারা রেললাইনে কাজ করত। মজুরিও পেত নগদ পয়সায়। কাজও সেখানে করত অনেক লোক একসঙ্গে। লাইনের কাজ করে তারা বুঝল মজুর হিসাবে মহাজনের দাসত্ব ছাড়াও তাদের বাঁচবার একটা পথ হতে পারে।

বিক্ষোভ ও গোপন আলোচনা

তখন থেকে সাঁওতালদের মনে এক নতুন চিন্তা ও চেতনা জাগল। কৃষকদের মধ্যে কানাঘুসা শুরু হল। গোপনে গোপনে রাত্রে নানা স্থানে বৈঠক চলতে লাগল মহাজনদের জুলুম কেমন করে বন্ধ করা যায় তার আলোচনার জন্য। ১৮৫৪ সনের প্রথম দিকে লক্ষ্মীপুরে সাসানের পরগনাইত বীর সিং-এর নেতৃত্বে একটা বড়ো দল তৈরি হল। এই দলের মাতব্বর ব্যক্তিদের মধ্যে ছিলেন বোরিয়োর বীর সিং মাঝি, সিন্দ্রির কাওলা পরামাণিক, এবং হাতবাঁধার ডোমন মাঝি।

ধনী শোষকের দল গরিবদের উপর জুলুম করত বলে জ্ঞানপাপী হিসাবে সব সময়েই তারা দুর্ভাবনার মধ্যে থাকত। সাঁওতাল কৃষকদের এই নতুন ও গোপন কার্যকলাপের সংবাদ তাদের ভীত ও সন্ত্রস্ত করে তুলল। তারা পুলিশে ও পাকুড় রাজ এস্টেটে খবর দিল। পাকুড় রাজের দেওয়ান জগবন্ধু রায় ছিল অত্যন্ত অসৎ ও শয়তান লোক। সকল সময়েই সে সাঁওতালদের বিরুদ্ধে মহাজনদের মদত দিত : সেটা ছিল তার শ্রেণিস্বার্থ! সেই ঘৃণিত দেওয়ান বীর সিং-কে জমিদারি কাছারিতে ডাকিয়ে এনে মোটা জরিমানা করল এবং তখনই জরিমানার টাকা দিতে বলল। বীর সিং

যখন বললেন তিনি নির্দোষ এবং জরিমানার টাকা দেবার ক্ষমতা তাঁর নাই, তখন তাঁর অনুগামীদের সামনেই দেওয়ান তাঁকে নিষ্ঠুরভাবে জুতাপেটা করল।

পীড়নের জবাব

এই অপমানের ফলে বীর সিং ও তাঁর অনুগামী সাঁওতালদের মনে ভীষণ আগুন জ্বলে উঠল। প্রতিশোধ নেবার আগ্রহ প্রবল হয়ে দেখা দিল। তাদের মধ্যে কিছু লোক প্রতিশোধ হিসাবে অত্যাচারী ধনী মহাজনদের বাড়ি ডাকাতি আরম্ভ করল। এই ঘটনাকে সেই সময়কার এক সরকারি মুখপত্রে বলা হয় এ হল মহাজনদের নিষ্ঠুর অত্যাচারের উপযুক্ত প্রতিশোধ।

গোলযোগ শুরু হলে এক রাত্রে তারা বারহাইতের নিকট কুসমা গ্রামে এক ধনী মহাজনের বাড়ি লুঠ করে; বারহাইত তখন ওই এলাকার প্রশাসন কেন্দ্র। মহাজন পরদিন থানার দারোগা মহেশলাল দত্তের নিকট খবর পাঠায়। সেখানে ভজা পরগনাইতের ভাই গোচ্চো বাস করতেন। গোচ্চো ছিলেন ধনী সাঁওতাল। তাঁর টাকার উপর মহাজনের বিশেষ লোভ ছিল। তারা দারোগার নিকট গোচ্চোর বিরুদ্ধে চুরির অভিযোগ আনলে। দারোগা গোচ্চোকে মারপিট করায় তিনি বললেন, শয়তান দারোগা যেসমস্ত শান্তিপ্রিয় সাঁওতালকে চালান দিতে চায়, তাদের বাঁধবার জন্য কত দড়ি জোগাড় করতে পারে দেখব।

দারোগা অবশ্য গোচ্চো বা তাঁর দলের কাউকেই তখনই গ্রেফতার করতে সাহস পায়নি। কিন্তু পরের বছরে মহাজনদের প্ররোচনায় ও নির্দেশে মহেশ দারোগা গোচ্চো ও তাঁর দলের অনেক সাঁওতালকে গ্রেফতার করে ও কঠোর সাজা দেয়।

এর কয়েক মাস পরে যে প্রচণ্ড ঝড় আসছিল, এইসকল ঘটনার মধ্যে তারই বীজ বোনা

কুখ্যাত মহেশ দারোগা ছিল মহাজনদের হাতের লোক। তাদের ঘুষের টাকায় তার পেট মোটা হত। ডাকাতি ও গোলযোগ দমনের নামে সে সাঁওতাল কৃষকদের উপর যে বর্বর অত্যাচার চালাচ্ছিল এবং যেভাবে তাদের অপমান ও লাঞ্ছনা করছিল, তা আর তারা বরদাস্ত করতে পারছিল না। জমিদার, মহাজন ও পুলিশের এই জুলুম পীড়নের কাহিনি সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে সারা সাঁওতাল সমাজের মধ্যেই প্রবল বিক্ষোভ সৃষ্টি করেছিল। সকল এলাকাতেই তাদের মনে প্রতিরোধের আকাঙ্ক্ষা জাগছিল। সেই সঙ্গে তারা উদ্ধারের পথ সম্বন্ধেও চিন্তা করছিল।

প্রতিরোধের পথ

তাই ১৮৫৫ সনের গোড়ার দিকে বীরভূম, বাঁকুড়া, ছোটোনাগপুর ও হাজারিবাগ থেকে ছ সাত হাজার সাঁওতাল এসে দামনে কোহে জমায়েত হয়। তাদের আসার উদ্দেশ্য ছিল আগের বছরে তাদের সাথিদের উপর যে পীড়ন ও নির্যাতন চালানো হয়েছিল এবং বীর সিং-কে যেভাবে অপমানিত ও লাঞ্ছিত করা হয়েছিল, তার প্রতিশোধ নেওয়া। তারা তাদের সরল যুক্তি দেখিয়ে বলে ডাকাতি হয়েছে ধনী মহাজনদের বাড়ি। মহাজনরা আগে তাদের সর্বস্ব কেড়ে নিয়ে পীড়ন করেছে। কিন্তু ডাকাতির জন্য তাদের সাজা দেওয়া হল, অথচ যে মহাজনদের শোষণ ও জুলুমের কারণে তারা আইন ভঙ্গ করেছে তাদের শাস্তি হল না কেন? যে সমাজব্যবস্থায় শোষক শ্রেণিদের শোষণের অবাধ সুযোগকে রাখাই তাদের শাসনব্যবস্থার লক্ষ্য, সেখানে তাদের এই সহজ ও সরল যুক্তি যে অচল, তা তারা বোঝেনি। তাই এই অবিচার তাদের সহ্য হল না।

পরিস্থিতি ঘোরালো হয়ে উঠেছিল। শোষণ, অত্যাচার, লাঞ্ছনা, অপমান সমস্ত শ্রমজীবী মানুষের মনকে বিষাক্ত করে তুলেছিল। এই অবস্থা কেউই আর বরদাস্ত করতে পারছিল না। সকলেই ভাবছিল এখনই একটা বিহিত ব্যবস্থা দরকার। সেজন্য পথ খুলতেও বেশি দেরি হল না। সেই পথই ছিল গৌরবময় বিদ্রোহের পথ।

ওই এলাকার তখনকার শাসনকেন্দ্র বারহেট বা বারহাইত-এর নিকটবর্তী ভগনাডিহি গ্রামে বাস করতেন দুই ভাই সিধু ও কানু (সিদু বা সিদে এবং কানহু) নামে দৃঢ় চরিত্রের মানুষ। তাঁদের আরও দুই ভাই ছিলেন চাঁদ ও ভৈরব। সকলেই ভূমিহীন সাঁওতাল কৃষক। পূর্বে তাঁদের অবস্থা সচ্ছল ছিল কিন্তু একবার ফসল না হওয়ায় মহাজনের দুয়ারে যাবার পর দেনার দায়ে তাঁদের পরিবার অর্থনীতিক দিক থেকে ধ্বংস হয়েছিল। তাঁদের গ্রামের ও অন্যান্য গ্রামের লোকদের অবস্থাও ছিল তাই।

সিধু ও কানু অন্য অনেক সাঁওতালের মতো উদ্‌বেগের সহিত সমস্ত অবস্থা লক্ষ করছিলেন। বীর সিং ও গোচ্চোর অপমান ও পীড়ন তাঁদের মনে দারুণ আঘাত দিয়েছিল। তার পরও সাঁওতালদের বিরুদ্ধে নতুন নতুন অভিযোগ আনা হচ্ছিল। একদিন সাতক্কাঠিয়া (সাতখেতিয়া) গ্রামে গিয়ে মহেশ দারোগা এলোপাথাড়ি সাঁওতালদের গ্রেফতার করলে। একরার করাবার জন্য তাদের উপর অকথ্য অত্যাচার চালাল। কয়েকজন নেতৃস্থানীয় সাঁওতালকে গাছের সঙ্গে বেঁধে রেখে চাবুক মারা হল।

ভগনাডিহির সিদ্ধান্ত

তখন সিধু ও কানুর গ্রামে জমায়েত হবার জন্য সাঁওতালদের ঐতিহ্য অনুসারে পাতাসমেত ছোটো শালের ডাল পাঠিয়ে চারদিকে তাদের ডাক দেওয়া হল ১৮৫৫ সনের ৩০ জুন (১২৬২ বঙ্গাব্দের আষাঢ়ের মাঝামাঝি) রাত্রে ভগনাডিহি গ্রামে ৪০০ গ্রামের প্রতিনিধি ১০ হাজার সাঁওতাল কৃষকের বিরাট জমায়েত হল। জনগণের বিপুল উৎসাহের মধ্যে সভায় সিদ্ধান্ত হল যে অত্যাচারী শোষকদের হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য সকলকে এক হয়ে দাঁড়াতে হবে।

সভা থেকে এই ফরমান জারি করা হল যে এখন থেকে কেউ জমির জন্য কোনোরকম খাজনা দেবে না, প্রত্যেকেরই যত খুশি জমি চাষ করবার স্বাধীনতা থাকবে, আর সাঁওতালদের সমস্ত ঋণ এখন বাতিল হবে।

সাঁওতাল নেতারা ঘোষণা করলেন যে তারা জমিদার ও মহাজনদের অত্যাচার থেকে মুক্ত হবার জন্য সংকল্প করেছেন এবং আরও সংকল্প করেছেন যে তাঁরা মুলুক দখল করে নিজেদের সরকার কায়েম করবেন। আসলে এই স্বাধীনতার লক্ষ্য ছিল শোষণ ও পীড়ন থেকে মুক্তি, নিজেদের উৎপাদন কর্ম করবার ও মেহনতের ফসল ভোগ করবার অবাধ অধিকার। এই গণতান্ত্রিক অধিকার কায়েম করাবার জন্যই প্রয়োজন ছিল স্বাধীনতা।

এইসকল বক্তব্য জানাবার জন্য সভার নির্দেশ মোতাবেক কির্তা, ভাদু, সন্নো ও সিধু গভর্নমেন্টকে, কমিশনারকে, ভাগলপুরের ও বীরভূমের কালেক্টর ও ম্যাজিস্ট্রেটদের; দিঘি ও রাজমহল থানার দারোগাদের এবং কয়েকজন জমিদারকে ও অন্যান্যকে চিঠি লিখলেন। জমিদারদের নামের চিঠিগুলি ছিল চরমপত্র। তাতে লেখা হল ১৫ দিনের মধ্যে জবাব চাই। কিন্তু কেউই চিঠির উত্তর দেওয়া দরকার মনে করেনি। (এ চিঠি সরকারি নথিতে পাওয়া যায়নি বলে প্রকাশ।)

ভগনাডিহির সভার এই সিদ্ধান্ত ছিল বিদ্রোহের সিদ্ধান্ত। বিদ্রোহের মূল দাবি ছিল : জমি চাই; মুক্তি চাই। জমিদার, মহাজন ও গভর্নমেন্টের শোষণ ও জুলুম থেকে মুক্ত হয়ে শান্তির সহিত

উৎপাদনের কাজ ও জীবনধারণ করবার সংকল্প নিয়ে সাঁওতাল কৃষকরা তাদের বিদ্রোহের পথে পা বাড়ায়।

বিদ্রোহের কারণ বলে যা ঘোষণা করা হয়েছিল তার মধ্যে ছিল এই অভিযোগগুলি মিথ্যার প্রাধান্য, কর্তৃপক্ষের অবহেলা, মহাজনদের শোষণ ও প্রতারণা, আমলাদের দুর্নীতি এবং পুলিশের জুলুম।

বিদ্রোহের নেতারা ধারণা করেছিলেন ইংরেজ শাসকরা সমস্ত অবস্থা তদন্ত করে দেখবে। কিন্তু শাসকদের সময় কোথায় তদন্ত করবার? সস্তা প্রশাসন জনগণের কথা চিন্তা না করে কেবল রাজস্বের কথাই ভাবতে পারে। সাঁওতাল এলাকার প্রশাসনে সেই কাজই হয়েছিল। জনগণের অবস্থা সম্বন্ধে ইংরেজদের শাসনপদ্ধতির অজ্ঞতা যখন তাদের উপর বিদ্রোহের মতো ভয়ংকর শাস্তি ডেকে এনেছিল, তার জন্য সেই পদ্ধতিই ছিল দায়ী।

বিদ্রোহে গরিব হিন্দু-মুসলমান

বিদ্রোহে যোগ দিয়েছিল কি শুধু সাঁওতাল কৃষকরাই? না, সাঁওতাল ছাড়া স্থানীয় অসাঁওতাল বাঙালি ও বিহারি হিন্দু ও মুসলমান গরিব কৃষক ও কারিগররাও অনেকেই তাতে যোগদান করে। তাদের মধ্যে ছিল কামার বা লোহার, কুমোর, তেলি, গোয়ালা, চামার, ভুঁইয়া, বাগদি, হাড়ি, ডোম ইত্যাদি জাতি বা বর্ণের হিন্দুরা এবং মুসলমানদের মধ্যে বিশেষ করে মোমিনরা। তাদের যোগ দেবার কারণ ছিল এই যে শ্রেণিস্বার্থের দিক দিয়ে সাঁওতাল কৃষকদের থেকে তাদের অবস্থার তেমন কোনো তফাত ছিল না। জমিদার, মহাজন ও ব্যাপারীদের শোষণ ও জুলুম সাঁওতালদের মতো কমবেশি তাদের উপরও চলত, পুলিশ ও আইন আদালতের নির্যাতন তাদেরও ভোগ করতে হত। ধনী ও গরিবের এই লড়াইয়ে এবং ধনীদের শোষণ ও পীড়নের সমর্থক সরকারের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে তাদের স্বার্থ ও সাঁওতালদের স্বার্থ ছিল মূলত অভিন্ন।

বিদ্রোহে যেসকল অসাঁওতাল বাঙালি বা বিহারি ছিল তারা সাধারণত সাঁওতালদের মতো প্রত্যক্ষ যুদ্ধের কাজে যোগ দেয়নি। কিন্তু তারা যুদ্ধের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে যোগাযোগ রেখেছিল। তাদের কাজ ছিল প্রধানত শত্রুপক্ষের খবর সংগ্রহ করে আনা, পথ দেখানো, যুদ্ধের নাগরা বাজানো, কাজের ধারা ঠিক করে দেওয়া ইত্যাদি। তা ছাড়া কামারদের কাজ ছিল যুদ্ধের জন্য তির, টাঙ্গি, তলোয়ার ইত্যাদি অস্ত্র তৈরি করে দেওয়া। এইসকল বিষয়ে সাহায্য করে অসাঁওতাল বাঙালি-বিহারী হিন্দু-মুসলমান গরিব কৃষক ও কারিগররা বিদ্রোহী সাঁওতালদের যথেষ্ট শক্তি জুগিয়েছিল। যুদ্ধের জন্য তাদের এই সাহায্য ছিল শুধু মূল্যবান নয়, অপরিহার্য। সমস্ত অত্যাচারী ধনীর বিরুদ্ধে তামাম শোষিত গরিব এক হয়েছিল।

ভগনাডিহির উদাত্ত আহ্বানে সাঁওতাল অসাঁওতাল সমস্ত শোষিত ও নিপীড়িত জনগণের জমাট বিক্ষোভ সশস্ত্র বিদ্রোহের আকারে ফেটে পড়ল। জমি চাই, মুক্তি চাই— এই আওয়াজ সমস্ত সাঁওতাল ও অন্যান্য গরিবদের মাতিয়ে তুলল। এই নতুন প্রেরণা তাদের মন থেকে সব বাধা ও সংকোচ দূর করে দিলে। এখনকার মতো স্থায়ী আন্দোলন ও সংগঠন তখন ছিল না। কিন্তু জমি ও শোষণ মুক্তির জন্য প্রবল আকাঙ্ক্ষা শ্রমজীবী ও শোষিত শ্রেণি হিসাবে তাদের মনে গভীর সংগ্রামী চেতনা এনে দিল।

অত্যাচারীদের খতম করার ডাক

বিদ্রোহীদের প্রথম আঘাত পড়ল শয়তান মহেশ দারোগার উপর যখন সে ৭ জুলাই দলবল-সহ বিদ্রোহীদের নিকট গিয়ে জমিদারদের খাজনা দেবার জন্য তাদের শান্তভাবে চাষবাস করতে উপদেশ দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে তাদের বিরুদ্ধে চুরির অভিযোগ আনলে। এই লোকটাকে সাঁওতালরা মনে-প্রাণে

ঘৃণা করত, কারণ তাদের উপর সে দীর্ঘকাল ধরে নানাভাবে অন্যায় জোরজুলুম ও পীড়ন চালিয়েছিল।

দারোগার মুখে তাদের বিরুদ্ধে চুরির অভিযোগ শুনে বিদ্রোহীরা বলল, যদি আমাদের বিরুদ্ধে কোনো প্রমাণ থাকে তা হলে আমাদের বেঁধে নিয়ে যাও। তাদের জেরার মুখে দারোগা স্বীকার করল যে সে মহাজনদের ঘুষ খেয়ে এই অভিযোগ এনেছে।

তৎসত্ত্বেও কোনো প্রমাণ না দেখিয়েও সে বিদ্রোহীদের বাঁধতে হুকুম দেয়। অমনি বিদ্রোহী জনতা তাকে আর তার সঙ্গী মহাজন, চৌকিদার ও বরকন্দাজদের বেঁধে ফেলে এবং দারোগা সমেত মোট ১৯ জনের মাথা কেটে ফেলে। পাঁচকেঠিয়া (পাঁচখেতিয়া) বাজারেও পাঁচ জন অত্যাচারী মহাজনকে হত্যা করা হয়। এই মহাজনদের নাম : মানিক চৌধুরী, গোরাচাঁদ সেন, সার্থক রক্ষিত, নিমাই দত্ত ও হিরু দত্ত। বিদ্রোহের নেতাদের নির্দেশ ছিল যে কেবল সুদখোর ধনী মহাজনদের হত্যা করতে হবে এবং অন্য সকল শ্রেণির লোককে রক্ষা করতে হবে।

বিদ্রোহের প্রসার

বিদ্রোহ চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল। দলে দলে বিদ্রোহীরা বিভিন্ন দিকে অগ্রসর হতে লাগল। গোচ্চো কয়েক হাজার লোক নিয়ে খাঁপুর-বাহাদুরপুরের দিকে যান এবং সিধু, কানু ও তাঁদের অন্য দু-ভাই বিশাল বিদ্রোহী বাহিনী নিয়ে সুলতানাবাদ দখলের জন্য মহেশপুরের দিকে অগ্রসর হন।

বিদ্রোহীদের এই শক্তি দেখে জমিদার, মহাজন ও ঠগবাজ ব্যাপারীর দল ঘরবাড়ি ফেলে পালাতে থাকে। বিদ্রোহীরা অল্প সময়ের মধ্যে বোরিয়ো থেকে কোহলগাঁও পর্যন্ত তামাম এলাকা নিজেদের দখলে এনে ভাগলপুর ও রাজমহলের দিকে অগ্রসর হতে থাকে। ক্রমে এই দুই শহরের মধ্যেকার এলাকাও তারা দখল করে। ডাক ও রেল বন্ধ হয়ে যায়। পিরপাঁইতি থেকে সকরিগলি পর্যন্ত সড়কও তাদের হাতে এসে পড়ে।

শেষপর্যন্ত বিদ্রোহ যতখানি এলাকায় বিস্তৃত হয়েছিল তার মধ্যে ছিল বীরভূম জেলা, ভাগলপুর জেলার বিস্তীর্ণ অংশ এবং মুর্শিদাবাদ জেলার কিছু অংশ। এই এলাকার উত্তরে ছিল গঙ্গানদী, পূর্বে গঙ্গা ও ভাগীরথীনদী ও দক্ষিণে অজয় ও বরাকর নদী, এবং পশ্চিমে হাজারিবাগ ও মুঙ্গের জেলা। বর্তমানে এই এলাকার মধ্যে আছে সমগ্র সাঁওতাল পরগনা জেলা এবং বীরভূম ও ভাগলপুর জেলার অনেক অংশ। এর উত্তর ও পূর্ব সীমানার নিকট দিয়ে রেললাইন গেছে। বিদ্রোহের প্রধান ক্ষেত্র ছিল এই এলাকার উত্তর-পূর্ব অংশ, তবে অন্যান্য অংশেও তার যথেষ্ট জোর ছিল।

কোনোরকম সামরিক শিক্ষা না থাকা সত্ত্বেও এবং পূর্ব থেকে কোনোরকম সংগঠন না থাকলেও হাজার হাজার সাঁওতাল কৃষক সমস্ত কাজ ফেলে, চাষের মরশুমে চাষের কাজ পর্যন্ত ছেড়ে দিয়ে স্বেচ্ছায় বিদ্রোহে যোগদান করেছিল। জীবন-মরণ সমস্যা না হলে কৃষক কখনও এমন কাজ করতে পারে না। তারা ছিল সত্যিকার গণবাহিনী এবং গণবাহিনীর উপযুক্ত শৃঙ্খলার সঙ্গে তারা লড়েছিল। তারা সাধারণত ছোটো ছোটো দলে বিভক্ত হয়ে ঘোরাফেরা করত কিন্তু যুদ্ধের নাগরা বাজলে সঙ্গে সঙ্গে এক-একটা জায়গায় দশ হাজার লোকের জমায়েত হত, তেমনই শৃঙ্খলার সঙ্গে সরেও যেত। যুদ্ধে তাদের অস্ত্র ছিল তিরধনুক, টাঙ্গি, কুঠার ও তলোয়ার। বিষাক্ত তির তারা ব্যবহার করেনি। অনেক সময় তারা গেরিলা কায়দায়ও যুদ্ধ করেছিল।

সরকারি দমনব্যবস্থা

ইংরেজ কোম্পানির সরকার অবশ্য বিদ্রোহ শুরু হবার পর চুপ করে বসে থাকেনি। যত বেশি সম্ভব সৈন্য একত্র করে গভর্নমেন্ট বিদ্রোহ দমন করতে পাঠিয়েছিল এবং এই কাজের জন্য একজন

বিশেষ কমিশনার নিযুক্ত করেছিল। ধনী জমিদার-মহাজনরা এবং বিদেশি নীলকররা এই কাজে গভর্নমেন্টকে সাধ্যমতো সাহায্য করলে। মুর্শিদাবাদের নবাব নিজ খরচে ত্রিশটা হাতি পাঠিয়ে দিলেন। দলে দলে সরকারি সৈন্যরা বিদ্রোহ দমনে অগ্রসর হল।

কিন্তু জুলাই মাসে অনেক ক্ষেত্রে বিদ্রোহীদের কাছে সরকারি সেনা পরাস্ত হল। ১৬ জুলাই পিরপাঁইতির নিকট মেজর বারোজের সেনাবাহিনী বিদ্রোহীদের কাছে পরাজিত হল। তারা হটে গিয়ে পিরপাঁইতি পৌছল এবং পরে নৌকাযোগে কোহলগাঁও পালাল। সুন্দরা নদীর তীরে পালারপুরে এক হাজার সৈন্যের একটি বাহিনীর অনেক সিপাই বিদ্রোহীদের হাতে মারা পড়ে এবং তাদের নায়ক পালিয়ে যায়। ২৭ জুলাই খয়রাসোল থেকে ছ-মাইল দূরে বিদ্রোহীদের আক্রমণ সহ্য করতে না পেরে সরকারি বাহিনী পালিয়ে যায় এবং লেফটেনান্ট টোলমেন ও ১৩ জন সিপাই নিহত হয়।

জুলাই মাসে বিদ্রোহীরা গঙ্গার দক্ষিণ তীর বরাবর কোহলগাঁও থেকে রাজমহল পর্যন্ত দামনে কোহের উত্তরে মুর্শিদাবাদ সীমান্তে সক্রিয় ছিল। রেলের ইঞ্জিনিয়ার ভিগর্স তখন ছিলেন রাজমহলের শাহ সুজার প্রাসাদ সঙ্গী দালানে এবং স্থানটি তিনি সুরক্ষিত করেন। তাই রাজমহল বিদ্রোহীদের দখলে যায়নি।

মুর্শিদাবাদের জেলাশাসক টুগুডের নেতৃত্বে বহরমপুর থেকে সৈন্যদল এসে গেলে ১৫ জুলাই মহেশপুরে যে সংঘর্ষ হয় তাতে বিদ্রোহীরা পরাস্ত হয়। এই সংঘর্ষে সিধু ও তাঁর অন্য দু-ভাই কানু ও ভৈরব আহত হন। আরও ২০০ বিদ্রোহী হতাহত হন। ২৪ জুলাই সরকারি সেনা সাঁওতালদের প্রধান ঘাঁটি বারহাইত পৌছোয় ও দখল করে। রঘুনাথপুরের যুদ্ধেও বিদ্রোহীরা পরাজিত হয়।

বিদ্রোহ দমনে এত বেশি সরকারি আড়ম্বর সত্ত্বেও তা ছড়িয়ে পড়ে গোড্ডা, পাকুড়, মহেশপুর, মুর্শিদাবাদ ও বীরভূমে। বিদ্রোহে ৩০ থেকে ৫০ হাজার সাঁওতাল কৃষক অস্ত্র ধারণ করেছিল। এ ছাড়া বহুসংখ্যক হিন্দু ও মুসলমান অসাঁওতাল বাঙালি ছিল। সরকার পক্ষে একটা স্তরে কামান বন্দুক নিয়ে ১২ হাজার থেকে ১৪ হাজার সুসজ্জিত ও সুশিক্ষিত সৈন্য যুদ্ধে নেমেছিল।

বিদ্রোহীরা অগ্রসর হতে হতে লিটিপাব্বুর তিন জন অতি কুখ্যাত মহাজনকে ধরে ফেলে ও খতম করে। বহু 'দিকু' বা অসাঁওতালের সাহায্য তারা পেতে থাকে। ক্রমে এই বিদ্রোহের মধ্যে সাঁওতাল ও অসাঁওতালদের মধ্যেকার জাতি ও ধর্মের তফাত দূর হতে থাকে। সকলের মূলত অভিন্ন শ্রেণিস্বার্থই প্রকট হয়ে ওঠে।

সিধু, কানু চাঁদ ও ভৈরবের নেতৃত্বে সাঁওতাল বাহিনী তিন দিন ঘেরাও করে রাখার পর পাকুড় দখল করে। জমিদাররা পূর্বেই সরে পড়েছিল। কিন্তু সেখানকার সবচেয়ে ধনী ও নিষ্ঠুর মহাজন দীনদয়াল রায় বিদ্রোহীদের হাতে ধরা পড়ে। বিদ্রোহী বাহিনীর আগে আগে যেসকল গরিব হিন্দু ও মুসলমান পথ দেখিয়ে চলছিল তারা সেই ঘৃণিত মহাজনের দিকে কুকুর লেলিয়ে দেয়। দীনদয়াল তার চাকর জগন্নাথ সরদারকে কেনা গোলামের মতো পীড়ন করত। সেই তাকে বিদ্রোহীদের নিকট ধরে নিয়ে যায়।

দীনদয়াল ও তার অনুচররা সাঁওতালদের উপর সকলরকম অত্যাচার চালিয়েছিল। মায়ের কোল থেকে তাদের শিশুদের ছিনিয়ে নিয়ে গিয়ে হত্যা পর্যন্ত করেছিল। বহু অত্যাচার সইবার পর এখন সুযোগ পেয়ে জগন্নাথ টাঙ্গি দিয়ে তার এক-একটি অঙ্গপ্রত্যঙ্গ কাটতে থাকে আর বলতে থাকে, এইসব আঙুল দিয়ে তুই সুদের টাকা গুনতিস। এই হাত দিয়ে ভুখা গরিবের মুখের গ্রাস কেড়ে নিতিস।

গণহত্যা ও গ্রামদাহ

বিদ্রোহ দমনের নামে সরকারি সৈন্যদল গণহত্যা করত এবং সাঁওতাল গ্রামগুলি আগুন দিয়ে ধ্বংস করতে থাকে। কাপ্তেন শেরবিল ১২ খানা ও মেজর শাকবরা ১৫ খানা সাঁওতাল গ্রাম ধ্বংস করে। বিশেষভাবে সামরিক হুকুম দিয়ে এমনই বহু গ্রাম ধ্বংস করা হয়। ভগনাডিহি গ্রামও সরকার-পক্ষ জ্বালিয়ে দেয়। সরকারি গোলাগুলির আঘাতে যেসকল সাঁওতাল কৃষক নিহত হন, তাঁদের রক্তে রাজমহল পাহাড়ের মাটি লাল হয়ে যায়। হাজার হাজার বিদ্রোহী শহিদের রক্তের স্রোত বর্ষার ভরা গঙ্গার স্রোতের সঙ্গে গিয়ে মিশতে থাকে। কিন্তু নিজেদের ঘরবাড়ি, জমি ও স্বাধীনতা রক্ষার জন্য তাদের দুর্জয় সাহস তাদের এক পা-ও পিছু হটতে দেয়নি। পাহাড়ের মতো অটল থেকে তারা বীর বিক্রমে লড়েছিল। তারা পালাতে বা মাথা নত করতে জানত না।

প্রায় এক মাস ধরে লড়াই ব্যাপকভাবে চলবার পর খাদ্যাভাব ও রোগব্যাধির কারণে বিদ্রোহের তেজ কিছু কমে যায়। তখন বিদ্রোহ দমনের জন্য বিভিন্ন কেন্দ্র থেকে গভর্নমেন্ট বিস্তর সৈন্য আনিয়ে গণহত্যা ও গ্রামদাহ ইত্যাদি চালাতে থাকে।

১৭ আগস্ট সরকার এক ঘোষণা প্রচার করে। তাতে সমস্ত বিদ্রোহীকে দশ দিনের মধ্যে আত্মসমর্পণ করতে বলা হয় ও প্রচার করা হয় যে আত্মসমর্পণ করলে নেতাদের ও যাদের বিরুদ্ধে হত্যার অভিযোগ আছে তাদের বাদ দিয়ে বাকি সকলকে ক্ষমা করা হবে। বিদ্রোহীরা এই ঘোষণাকে ঘৃণার সহিত বর্জন করে।

মাসখানেক নরম থাকবার পর বিদ্রোহীরা নতুন শক্তি সঞ্চয় করে আবার পুরোদমে প্রচণ্ড বিক্রমে যুদ্ধের ময়দানে বেরিয়ে আসে। বীরভূম জেলার মধ্যে যেসব বাহিনী অভিযান করতে থাকে তার মধ্যে একটিতে ছিল তিন হাজার এবং আর-একটিতে সাত হাজার বিদ্রোহী। সরকারি আমলারা অবস্থা দেখে পালিয়ে যায়। ব্যাপক এলাকা জুড়ে লড়াই চলতে থাকে। আবার হাজার হাজার বিদ্রোহী সাঁওতাল কৃষককে হত্যা করা হতে থাকে। বীরভূমের পালারপুরে এক দিনে কাপ্তেন কোপির আদেশে প্রায় দেড় হাজার বিদ্রোহীকে হত্যা করা হয়।

বিদ্রোহের নেতাদের ধরিয়ে দিতে পারলে প্রচুর অর্থ পুরস্কার দেওয়া হবে বলে সরকার ঘোষণা করে; সিধুর জন্য ধার্য করে ১০ হাজার টাকা, অন্যদের জন্য ৫ হাজার ও ১ হাজার করে।

আত্মসমর্পণ কিছুতেই নয়

সরকারি সৈন্যদের হামলা থেকে আত্মরক্ষার জন্য সরে গিয়ে একবার ৪৫ জন বিদ্রোহী একটা মাটির ঘরে আশ্রয় নেয়। তখন সৈন্যরা তাদের ঘেরাও করে আত্মসমর্পণ করতে বললে ঝাঁকে ঝাঁকে তির ছুড়ে তার জবাব দিতে থাকে। সিপাইরা গুলি চালাতে থাকে। ক্রমে যখন দেখা গেল আর তির আসে না, তখন একজন সিপাই ভিতরে ঢুকে দেখে এক বৃদ্ধ সাঁওতাল ছাড়া বাকি সকলেই শহিদ হয়েছেন। বৃদ্ধকে সে আত্মসমর্পণ করতে বললে বৃদ্ধ তাঁর টাঙ্গি দিয়ে তাকে হত্যা করেন।

সৈন্যদের এই ধরনের হত্যাকাণ্ড সম্বন্ধে পরে মেজর জারভিস নামে এক সেনাপতি বলেছিলেন, 'একে যুদ্ধ বলে না, এ ছিল গণহত্যার ব্যাপার। তারা আত্মসমর্পণ করতে জানত না। যতক্ষণ তাদের নাগরা বাজবে, তারা সকলেই দাঁড়িয়ে পড়বে এবং নিজেদের গুলি করে হত্যা করতে দেবে। তাদের তীরে প্রায়ই সরকারি সৈন্যরাও মারা যেত। এই যুদ্ধে এমন সিপাই ছিল না যে নিজের কাছে নিজে লজ্জিত বোধ না করত। বন্দিরা প্রায়ই ছিল আহত লোক। এমন সাহসী ও সত্যবাদী মানুষ আমি আর দেখিনি।'

সামরিক আইন জারি

বিদ্রোহ দমনের এত ঘটা, বিপুল সৈন্যবাহিনী নিয়োগ, আত্মসমর্পণের জন্য ঘোষণা ইত্যাদি সত্ত্বেও যখন মাসের পর মাস বিদ্রোহের আগুন জ্বলতেই লাগল, তখন গভর্নমেন্ট ১০ নভেম্বর সামরিক আইন জারি করলে। সামরিক আইন জারি হল গঙ্গার দক্ষিণ তীরে ভাগলপুর জেলার সমগ্র এলাকায়, ভাগীরথীর দক্ষিণ তীরে মুর্শিদাবাদ জেলার সমগ্র এলাকায় এবং সারা বীরভূম জেলায়।

তার পর জেনারেল লয়েড ও জেনারেল বার্ডের নেতৃত্বে চোদ্দো হাজার সৈন্য সারা বিদ্রোহ এলাকা ঘিরে ফেলে এবং ধীরে ধীরে সাঁওতালদের ঘেরাও করতে থাকে। অন্তত ১০ হাজার বিদ্রোহীকে হত্যা করা হয়। ৩১ ডিসেম্বর সরকার ঘোষণা করে বিদ্রোহ সম্পূর্ণ দমন করা হয়েছে। কিন্তু তার পরেও তিন মাস পর্যন্ত বিচ্ছিন্নভাবে কতকগুলি এলাকায় বিদ্রোহের জের চলতে থাকে।

ধৃত বিদ্রোহীদের হত্যা ও জেল

নভেম্বর মাসের শেষ ভাগে জামতাড়া এলাকায় ওপরবাঁধার নিকট কয়েকজন বিদ্রোহীর সঙ্গে কানুকে ধরে ফেলা হয়। সিধু তার পূর্বেই ধরা পড়েন ঘাটিয়ারিতে। তাঁকে ভগনাডিহি নিয়ে গিয়ে গুলি করে হত্যা করা হয়। (অন্য তথ্য—ফাঁসি দেওয়া হয়।) কানুর বিচার হয় আদালতে। তার পূর্বে ২০ ডিসেম্বর তাঁর বিবৃতি নেওয়া হয়। বিচারের পর তাঁকে গুলি করে হত্যা করা হয়। অন্য অনেক বিদ্রোহীকে ধরে জনগণের মধ্যে সন্ত্রাস সৃষ্টি করবার উদ্দেশ্যে সিউড়ি শহরের কেন্দুয়ার ডাঙায় সকলের সামনে খোলা ময়দানে ফাঁসি দেওয়া হয়।

কানুর বিবৃতি গ্রহণ করেন অ্যাশ্‌লে ইডেন (সহকারী বিশেষ কমিশনার)। বিবৃতিতে কানু বলেন, 'মহাজনরা বড়ো দারোগার নিকট নালিশ করে যে সিধু ও কানু ডাকাতির জন্য লোক জমা করেছে, এবং সেজন্য তাকে ১০০ টাকা দিয়ে আমাদের ধরতে বলে। ...দারোগা তাঁদের ধরতে এলে তিনি বলেন, আমি ডাকাতি করেছি প্রমাণ করতে পারলে আমাকে জেলে দিন। মহাজন বলে হাজার টাকা খরচ হলেও তোমাকে জেলে পাঠাব। মহাজনরা ও দারোগা খুব রেগে যায় এবং আমাকে বাঁধতে হুকুম দেয়। মহাজনরা আমার ভাই সিধুকে বাঁধতে শুরু করলে আমি তলোয়ার বের করি। তখন আমার ভাইকে তারা ছেড়ে দেয়। আমি মানিক মুদির মাথা কেটে ফেলি এবং সিধু দারোগাকে হত্যা করেন। আর আমার সিপাইরা অন্য পাঁচ জনকে খুন করে; তাদের নাম জানি না। পরে আমরা ভগনাডিহি ফিরে আসি।'

দীর্ঘ আট মাস ধরে ইংরেজ কোম্পানির পুঁজিবাদী সরকার হাজার হাজার উন্নত অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত ও শিক্ষিত সৈন্য দিয়ে সাঁওতাল কৃষকদের উপর গণহত্যা চালাবার এবং তাদের গ্রামগুলি জ্বালাবার ও ধ্বংস করবার পর যখন এই বিদ্রোহ ধীরে ধীরে থেমে গেল, তখনও এই শোষিত ও নির্যাতিত কৃষকদের উপর সরকার প্রতিহিংসা নিতে দ্বিধা করলে না। বন্দি হিসাবে ৫২ খানা গ্রামের ২৫১ জনের বিচার হল। তাদের মধ্যে ছিল সাঁওতাল ১৯১, ন্যাস ৩৪, ডোম ৫, ধাঙড় ৬, কোল ৭, গোয়ালা ১, ভুঁইয়া ৬ ও রাজোয়ার ১।

এই ২৫১ জনের মধ্যে তিন জনকে ছেড়ে দেওয়া হয়। বাকি ২৪৮ জনকে 'লুটের' অভিযোগে অপরাধী সাব্যস্ত করা হয়। তাদের মধ্যে ৪৬ জন ছিল ৯/১০ বছরের বালক। তাদের বেত মেরে ছেড়ে দেওয়া হয়। বাকি সকলকে সাত থেকে ১৪ বছরের মেয়াদে সাজা দেওয়া হয়।

সংখ্যালঘু জাতি বলে স্বীকৃতি

বিদ্রোহ দমনের পর সাঁওতালদের দাবিদাওয়া ও অভিযোগের প্রতিকার সম্বন্ধে সরকারি তদন্ত হয়। তদন্ত করেন অ্যাশ্‌লে ইডেন (পরে বাংলার ছোটোলাট)। তদন্তের ফলে দামনে কোহ্‌ও পার্শ্ববর্তী

সাঁওতাল অধ্যুষিত এলাকা নিয়ে সাঁওতাল পরগনা নামে একটা পৃথক ননরেগুলেটেড জেলা গঠন করা হয় ও তার শাসনব্যবস্থা থাকে ভাগলপুর কমিশনারের অধীন এক জন ডেপুটি কমিশনারের উপর। সেজন্য প্রয়োজনীয় আইন (১৮৫৫ সনের ৩৭ নং ও ১৮৫৭ সনের ১০ নং আইন) তৈরি হয়। বিদ্রোহীদের দ্রুত বিচার ও শাস্তির জন্য ১৮৫৫ সনের ডিসেম্বরে ৩৮ নং আইনও পাশ করা হয়।

কৃষিজীবী সাঁওতাল উপজাতির জমি ও মুক্তির জন্য এই যে বিরাট ও শক্তিশালী গণ অভ্যুত্থান তাতে ৩০ থেকে ৫০ হাজার সাঁওতাল যোগদান করে। তাছাড়া বহু অসাঁওতালও বিদ্রোহের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত ছিল। কোনো কোনো হিসাবে তাদের মধ্যে অর্ধেক লোককে অর্থাৎ ১৫ থেকে ২৫ হাজার সাঁওতালকে ইংরেজ সরকার বিদ্রোহ দমনের নামে হত্যা করে। এই গণহত্যা, গ্রামদাহ ও কারাদণ্ডের পরও বিদেশি শোষকশ্রেণির অনেক মুখপাত্র চেয়েছিল তামাম সাঁওতাল জাতিটাকেই আবার শাস্তি দিতে। এমনই রক্তলোলুপ নরপিশাচ এই শোষকের দল। তারাই ছিল জালিয়ান-ওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডের ইংরেজ নায়ক জল্লাদ ডায়ারের পূর্বপুরুষ।

বিদ্রোহ তার দাবি সরাসরি ও পুরোপুরি আদায় করতে পারেনি, এ কথা ঠিক। বীর সাঁওতাল কৃষকরা প্রাণপণে সংগ্রাম করে এবং হাজারে হাজারে জীবন বিসর্জন দিয়ে বীরভূম, মুর্শিদাবাদ ও ভাগলপুর জেলার বিস্তীর্ণ এলাকা সাময়িকভাবে দখল করে নিলেও বিদ্রোহ স্থায়ীভাবে বিজয়ী হতে পারেনি। কিন্তু এ সংগ্রাম ব্যর্থ হয়েও যায়নি।

সাঁওতাল কৃষক বিদ্রোহীদের সংগ্রাম সরাসরি বিজয়ী না হলেও এই সংগ্রাম বাংলার ও ভারতের কৃষক সংগ্রামের ঐতিহ্যকে আরও উজ্জ্বল ও গৌরবমণ্ডিত করেছে, বিদ্রোহীদের বীরত্বের কাহিনি পরবর্তী কৃষক সংগ্রামে ও তথাকথিত সিপাহি বিদ্রোহকে প্রেরণা জুগিয়েছে, সারা দেশের ইতিহাসে সংগ্রামী জনগণের মর্যাদা বৃদ্ধি করেছে। তাই সাঁওতাল বিদ্রোহের বীর শহিদদের নাম আজও আমরা শ্রদ্ধার সহিত স্মরণ করি, আজও তাঁদের উদ্দেশে লাল সালাম জানাই।

বিদ্রোহ বিজয়ী না হলেও ব্যর্থ হয়ে যায়নি। সাঁওতালদের দাবির অনেকটা অংশ গভর্নমেন্টকে মেনে নিতে হয়েছিল। বিদ্রোহের পূর্বে দীর্ঘকাল ধরে তারা জমি ও খাদ্যের অভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছিল, এখন একটা নির্দিষ্ট বাসভূমির ব্যবস্থা হল।

বিদ্রোহোর পর গভর্নমেন্টকে তাদের একটা জাতীয় মাইনরিটি বা সংখ্যালঘু জাতি বলে স্বীকৃতি দিতে হল। সাঁওতালদের বাসের জন্য রাজমহল ও দামনে কোহ এলাকা সমেত বীরভূম ও ভাগলপুর জেলার বিস্তৃত অংশ নিয়ে সাঁওতাল পরগনা নাম দিয়ে একটা নতুন জেলা গঠন করা হল। সেখানে কৃষকরা অনেকে জমিও পেলে।

বিভেদের চেষ্টা ব্যর্থ

এই স্বীকৃতির সাথে সাথে গভরমেন্ট অসাঁওতাল বাঙালি ও অন্যান্য জাতি থেকে সাঁওতালদের বিচ্ছিন্ন করে রাখতে চেয়েছিল। সেজন্য তাদের অঞ্চলে অসাঁওতাল বাঙালিদের অবাধ যাতায়াত বন্ধ করলে। কিন্তু বিদেশি খ্রিস্টান মিশনারিদের জন্য কোনো বাধা তো থাকলই না, বরং তাদের মিশনারিদের প্রভাবে আনবার জন্য গভমেন্ট সমস্ত সুযোগসুবিধা দিতে লাগল, যাতে অসাঁওতাল বাঙালি ও সাঁওতালদের মধ্যে স্থায়ী ও গভীর বিভেদ সৃষ্টি করা যায়।

কিন্তু সাঁওতাল কৃষকদের মধ্যে বিদ্রোহের সময় যে একই শ্রেণিস্বার্থের উপর ঘনিষ্ঠ সংগ্রামী একতা কায়েম হয়েছিল, এই বিভেদ নীতির সাহায্যেও সরকার তা নষ্ট করতে পারেনি। প্রথম থেকেই অসাঁওতালরাও সাঁওতাল পরগনা জেলায় বসবাস করে আসছে। ১৮৭২ সনের সেন্সাস অনুসারে এই

জেলার মোট জনসংখ্যা ছিল ৯, ২৩, ৫৩২। তার মধ্যে সাঁওতালের সংখ্যা ছিল ৪, ৫৫,৫১৩।

বর্তমান কৃষক আন্দোলন সাঁওতাল ও অসাঁওতাল সকল কৃষককেই একই অধিকারের ভিত্তিতে সমানভাবে টানছে। সকলেই আগ্রহের সহিত সভার ডাকে সাড়া দিচ্ছে। সাঁওতালদের জাতিসত্তা সম্বন্ধেও কৃষক সভা সচেতন আছে।

গভর্নমেন্ট মিশনারি পাঠিয়ে সাঁওতালদের সভ্য করবার উদ্দেশ্যে তাদের শিক্ষার জন্য কিছু কিছু পৃথক স্কুল তৈরি করেছিল। কিন্তু সাঁওতাল ছেলেমেয়েদের তাদের মাতৃভাষায় শিক্ষা দেবার যথেষ্ট ব্যবস্থা করেনি।

শহিদের প্রতি সালাম

জমি, খাজনা, সুদ, ট্যাক্স, শিক্ষা ও সংস্কৃতি ইত্যাদি বিষয়ে সাঁওতাল উপজাতির জন্য প্রয়োজনীয় সুযোগসুবিধা না দিয়ে তার পরিবর্তে শোষণ ও পীড়ন চলতে দেওয়ার ফলে এই বিদ্রোহের পরও তাদের মধ্যে কয়েকবার ব্যাপক গণ বিদ্রোহ ঘটে গেছে। বিদেশি সরকার যা করেছে তাই নিয়ে তারা সন্তুষ্ট থাকতে পারেনি। তাদের জমি যাতে জমিদার মহাজনরা কেড়ে নিতে না পারে, সেজন্য পরে উপজাতি হিসাবে তাদের রক্ষার জন্য সামান্য আইনগত ব্যবস্থা হয়েছিল বটে, কিন্তু তা যথেষ্ট নয়। আবার যেটুকু আইন হয়েছিল তাকে গুরুত্ব দিয়ে কার্যকর না করায় তার বিশেষ কোনো মূল্য ছিল না।

দেশ স্বাধীন হবার পর কংগ্রেসি শাসনেও সাঁওতাল কৃষকদের অবস্থার উন্নতির বা নতুন কোনো প্রচেষ্টাই হয়নি। যে সরকারি সাংগঠনিক ব্যবস্থা হয়েছিল তফশিলি জাতি ও তফশিলি উপজাতি কমিশন মারফত, বাস্তব জীবনে তার বিশেষ কোনো গুরুত্ব দেখা যায়নি। তাদের জন্য জমির প্রয়োজন মেটানো এবং সমস্ত শোষণ থেকে তাদের মুক্ত করা কোনো বুর্জোয়া-জমিদার শ্রেণির শাসন চলতে থাকলে সম্ভব হবে না। দেশের সংবিধানও সেজন্য বড়ো অন্তরায়।

উপজাতি হিসাবে সাঁওতালদের জমি হস্তান্তর সম্বন্ধে যেটুকু আইনগত বাধা আছে, তাকে কার্যকর করার জন্য ইংরেজ শাসকদের মতো কংগ্রেস সরকারও কিছুই করেনি। তাদের মাতৃভাষায় শিক্ষা দেবার এবং ভাষা, বর্ণমালা ও সংস্কৃতির বিকাশের পথেও কংগ্রেস সরকারের কোনো উল্লেখযোগ্য অবদান নাই। সাঁওতালরা জানে কংগ্রেসের স্বদেশি সরকারও শোষক শ্রেণিদেরই সরকার। তাই বিদ্রোহের আগে তাদের বাপদাদাদের যেজন্য লড়তে হয়েছিল, আজ তাদেরও সেইজন্য লড়তে হবে! শ্রেণিসংগ্রাম ছাড়া তারা কিছুই আদায় করতে পারবে না। তাই লড়বার জন্য তারা কৃষক হিসাবে অন্যান্য কৃষকদের মতো দলে দলে কৃষক সভায় যোগ দিচ্ছে। গোটা দেশে কৃষক সভার নেতৃত্বে যে ব্যাপক ও সংগ্রামী কৃষক জাগরণ দেখা দিচ্ছে সেই জাগরণের পথ কেউই রোধ করতে পারবে না।

বিদ্রোহের পূর্বে সাঁওতাল বিদ্রোহের কৃষক শহিদরা যে সংগ্রামের আগুন জ্বেলে গিয়েছিলেন, সে আগুনের শিখা সারা ভারতে বহু এলাকায় ছড়িয়ে পড়েছিল। ১৮৫৭-৫৮ সনের ভারতীয় সেনা বিদ্রোহ থেকে শুরু করে তার শিখা দেখা গিয়েছিল বাংলার নীল চাষিদের বিদ্রোহে (১৮৬০-৬১)। পাবনা ও বগুড়ার (এখন বাংলাদেশে) রায়ত অভ্যুত্থানে (১৮৭২), দাক্ষিণাত্যের মারাঠা কৃষকদের অভ্যুত্থানে (১৮৭৫-৭৬), বাংলার তেভাগা আন্দোলনেও (১৯৪৬-৪৭) তা জ্বলেছিল। সেই একই আগুন বারবার জ্বলেছিল মালাবারের (কেরালা) মোপলা কৃষকদের বিদ্রোহের মধ্যেও। সে আগুন আজও নিভে যায়নি; আজও তা শোষিত ও নিপীড়িত কৃষক সমাজের বুকের মধ্যে তুষের আগুনের মতো ধিকিধিকি জ্বলছে, আর মাঝে মাঝে দীর্ঘ শিখা বিস্তার করছে।

উৎস : *সাঁওতাল বিদ্রোহের অমর কাহিনী*, প্রকাশ : ডিসেম্বর ১৯৫৪।

সন্ন্যাসী বিদ্রোহ (১৭৮৩—১৮০০)

সুপ্রকাশ রায়

পলাশির যুদ্ধে জয়লাভের পর ইরেজদের 'ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি' প্রথমে নবাবি নামধারী কয়েকজন সাক্ষীগোপাল শাসককে সম্মুখে রাখিয়া দেওয়ানি বা রাজস্ব আদায়ের ভার লইয়া বাংলা ও বিহারের বুকের উপর জাঁকিয়া বসিল। রাজস্ব আদায়ের নামে বাংলা ও বিহারের উপর চলিল অবাধ লুণ্ঠন। বিদেশি ব্যবসায়ী শাসকগণ পরাজিত বাংলা ও বিহারের মানুষদের উপর চাপিয়া বসিয়া, সর্বস্ব লুণ্ঠনের দ্বারা তাহাদের শ্বাস রোধ করিয়া মারিবার উপক্রম করিল। জনৈক ইংরেজ লেখকের ভাষায়, 'যেন একটা মহাবলশালী রক্তপিপাসু দানব উন্মত্ত হইয়া ইহার ধরাশায়ী শিকারের দেহের সমস্ত রক্তটুকু নিঃশেষে পান করিতে আরম্ভ করিয়াছে।' ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সেই ভয়ংকর লুণ্ঠন মানব-সভ্যতার ইতিহাস চিরকালের জন্য কলঙ্কিত করিয়া রাখিয়াছে।

বণিক-শাসকগোষ্ঠী বাংলা ও বিহারের ধনসম্পদ তিন প্রকারে লুণ্ঠন করিতে লাগিল। প্রথম লুণ্ঠন চলিল, রাজস্ব আদায়ের নামে। ইংরেজ-শাসনের পূর্বে রাজস্বের পরিমাণ ছিল ফসলের এক-চতুর্থাংশ, ইংরেজ বণিক-শাসক তাহা বাড়াইয়া করিল দ্বিগুণ। এমনকি, কোথাও কোথাও তাহা তিনগুণ পর্যন্ত উঠিল। দ্বিতীয় লুণ্ঠন চলিল, ব্যবসায়ের নামে। কৃষক তাহাদের কাঁচামাল ইংরেজ বণিকদের কাছে সস্তাদামে বিক্রয় করিতে ও ইংল্যান্ডের পণ্য অসম্ভব চড়াদামে ক্রয় করিতে বাধ্য হইল। কৃষকের কুটির-শিল্প জোর করিয়া ভাঙিয়া দেওয়া হইল এবং ইহা ইংরেজ বণিকদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় হটিয়া গিয়া ধ্বংস হইল। তাহার ফলে আদিম কালের স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রাম্য সমাজ-ব্যবস্থা ভাঙিয়া চুরমার হইয়া গেল। তৃতীয় লুণ্ঠন হইল, ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ইংরেজ কর্মচারী ও দেশীয় গোমস্তাদের ব্যক্তিগত অবাধ লুণ্ঠন।

কোম্পানির স্থানীয় কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ ছিল, যেন এক-একটি ক্ষুদ্র নবাব। ভারতের মাটিতে পা দিবার সঙ্গে সঙ্গে তাহারা ভারতবাসীর উপর যে অবাধ অত্যাচার ও উৎপীড়ন চালাইতে আরম্ভ করিল, যেভাবে ভারতবাসীর ধনসম্পদ লুণ্ঠন করিয়া দেশে গিয়া বিলাস-ব্যসনে গা ভাসাইতে লাগিল এবং নবাব আখ্যা লাভ করিল, তাহা তৎকালীন ইংল্যান্ডের জনসাধারণ,

এমনকি শাসকগণও, বরদাস্ত করিতে পারে নাই। আবার সেই সময়ে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বাংলা শাসন ও ভারতের ব্যবসায় পরিচালনার জন্য ইংল্যান্ডের কুখ্যাত গুন্ডাদের ধরিয়া ভারতবর্ষে পাঠাইতে লাগিল।

ইংল্যান্ডের তৎকালীন ইতিহাস হইতে জানা যায়, সেই সময়ে ইংল্যান্ডের পিতামাতারা তাহাদের উচ্ছন্ন-যাওয়া গুন্ডা-বদমায়েশ সন্তানদের বাগ মানাইতে না পারিয়া এদেশে পাঠাইতে— হয় ভারতবর্ষের ভয়ংকর ম্যালেরিয়ায় মরিবার জন্য, না-হয় ভারতবর্ষ হইতে বিপুল ধনসম্পদ লইয়া নবাব হইয়া ফিরিবার জন্য।* ক্লাইভ, ওয়ারেন হেস্টিংস্ প্রভৃতিকেও তাঁহাদের পিতামাতা এদেশে পাঠাইয়াছিলেন— ম্যালেরিয়ায় মরিবার জন্য, অথবা নবাব হইয়া দেশে ফিরিবার জন্য। তাঁহাদের কেহই ম্যালেরিয়ায় তো মরেন নাই বরং তাঁহারা নবাব হইয়া দেশে ফিরিয়াছিলেন।

এই অবাধ লুণ্ঠন ও শোষণের ফলে বাংলা ও বিহারের সাধারণ মানুষ সব হারাইয়া পথের ভিখারি হইল, অত্যাচার ও শোষণের ফলে চাষিরা জমিজমা হারাইয়া বনেজঙ্গলে পলাইয়া গেল, বিদেশি ইংরেজদের লুণ্ঠনে দেশে হাহাকার পড়িয়া গেল। কিন্তু ইহাতেও বণিক-শাসকগণের ক্ষুধা মিটিল না, তাহারা এবার আরও বেশি মুনাফার জন্য দেশীয় ধনপতিদের সঙ্গে মিলিত হইয়া বাংলা ও বিহারের জনগণের বিরুদ্ধে এক বিরাট ষড়যন্ত্র পাকাইয়া তুলিল। এই ষড়যন্ত্র ভারতের ইতিহাসের কুখ্যাত 'ছিয়াত্তরের মন্বন্তর' সৃষ্টির ষড়যন্ত্র। ছিয়াত্তরের মন্বন্তর কোনো দৈব দুর্বিপাকের ফলে ঘটে নাই, ইংরেজ বণিকগোষ্ঠী ও বাংলার জগৎশেঠ, উমিচাঁদ প্রভৃতি বিশ্বাসঘাতক ধনপতিরা একত্রে মিলিত হইয়া তাহাদের মুনাফার সীমাহীন ক্ষুধা মিটাইবার জন্য সেই মন্বন্তর সৃষ্টি করিয়াছিল। ইংরেজ বণিকরা এবং বাংলা ও বিহারের ধনপতিরা একচেটিয়া মুনাফার জন্য বাংলা ও বিহারের সমস্ত খাদ্য কিনিয়া রাখিল। মানুষের সৃষ্টি করা এক ভয়ংকর দুর্ভিক্ষে সারা বাংলা ও বিহার শ্মশানে পরিণত হইল।

এই ভয়ংকর দুর্ভিক্ষের কবলে পড়িয়া বাংলা ও বিহারের কোটি কোটি মানুষ প্রথমে ভিক্ষার ঝুলি কাঁধে লইল। কিন্তু কে দিবে ভিক্ষা, সকলেরই তো অবস্থা একই। চাষিরা গোরু লাঙল বেচিল, বীজ ধান খাইল, তার পর পুত্র-কন্যা বিক্রয় করিল। লোক গাছের পাতা খাইতে লাগিল, তারপর খাইতে আরম্ভ করিল গ্রামের কুকুর, বিড়াল ও ইঁদুর। ফলে দেখা দিল— ভয়ংকর মহামারি। অনাহারে ও মহামারিতে বাংলা ও বিহার উজাড় হইয়া গেল— বাংলা ও বিহারের গ্রাম জনশূন্য হইয়া শ্মশানে পরিণত হইল। ইংরেজ রাজকর্মচারীদের হিসাবেই দেখা যায় যে, এই দুর্ভিক্ষে বাংলা দেশে মরিয়াছিল এক কোটি লোক, অর্থাৎ মোট জনসংখ্যার এক-তৃতীয়াংশ, আর বিহারে মরিয়াছিল, প্রায় এগারো লক্ষ।

এই দুর্ভিক্ষ ও মহামারির গ্রাস হইতে যাহারা বাঁচিল, তাহারাও ইংরেজ-রাজের অত্যাচার হইতে রক্ষা পাইল না। ইংরেজ-রাজের কর ও খাজনা দিতেই হইবে। এই ভয়ংকর দুর্ভিক্ষের মধ্যে খাজনা বাড়িয়া গেল, নানারকম করের বোঝা জনসাধারণকে পিষিয়া মারিতে লাগিল। খাজনা আদায়ের জন্য গ্রামে গ্রামে সৈন্যদল ঢুকিয়া কৃষকের যথাসর্বস্ব লুণ্ঠন করিয়া লইল, তাহাদের ঘরবাড়ি ভাঙিয়া আগুন জ্বালাইয়া দিল। সর্বস্বান্ত কৃষকদের নিকট হইতে খাজনা আদায়ের জন্য ইংরেজ-রাজ সীতাব রায়, দেবী সিং, মহম্মদ রেজা খাঁ, হরেরাম প্রভৃতি বিহার ও বাংলার কুখ্যাত গুন্ডা ও ডাকাতদের নিযুক্ত করিল। তাহাদের অত্যাচারে কৃষকগণ গ্রাম ছাড়িয়া বনে জঙ্গলে আশ্রয়

---

* রেজিনাল্ড রেনল্ডস্—*হোয়াইট সাহিবস ইন ইন্ডিয়া।*

লইল। সারা বাংলা ও বিহার কৃষকের মরণ-আর্তনাদে ভরিয়া গেল। বাংলা ও বিহারের শাসনকর্তা ওয়ারেন হেস্টিংস ইংল্যান্ডের মালিকগণের নিকট প্রেরিত রিপোর্টে সদম্ভে ঘোষণা করিলেন: 'দুর্ভিক্ষ ও মহামারিতে লক্ষ লক্ষ মানুষের মৃত্যু সত্ত্বেও রাজস্ব আদায় ব্যাহত হয় নাই, বরং এবার পূর্বাপেক্ষা অধিকতর রাজস্ব আদায় হইয়াছে।'

এইভাবে সোনার বাংলা ও বিহার জনশূন্য শ্মশানে পরিণত হইল, আর সেই শ্মশানের বুকের উপর ইংরেজ-রাজের শোষণ ও উৎপীড়নের রাজত্ব দৃঢ় ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হইতে লাগিল।

ইংরেজ-রাজ ও তাহাদের দেশীয় অনুচরদের শোষণ ও উৎপীড়নের বিরুদ্ধে বাংলা ও বিহারের সাধারণ মানুষ এবং কৃষকরা রুখিয়া দাঁড়াইতে লাগিল। বাংলা ও বিহারের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত ইংরেজ-বিরোধী সংগ্রামের ধ্বনিতে কম্পিত হইয়া উঠিল। বাংলা ও বিহারে আবার প্রাণ-চাঞ্চল্য জাগিয়া উঠিল।

ভারতবাসীকে তাহাদের পরাধীন ও অসহায় অবস্থা স্মরণ করাইয়া দিবার জন্য বহু সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ-শাসক বারংবার সদম্ভে ঘোষণা করিয়াছেন: 'আমরা তরবারির বলেই ভারত জয় করিয়াছি, তরবারির বলেই ভারতবাসীকে দাবাইয়া রাখিব।' ভারতবাসী, ভারতের কৃষক, কোনোদিন সেই সত্য অস্বীকার করে নাই বা ভুলিয়া যায় নাই। ইংরেজ-শাসনের আরম্ভ কাল হইতেই ভারতের কৃষক সশস্ত্র বিদ্রোহের দ্বারা— তরবারির দ্বারা— নিজেদের অধিকার ও ভারতের স্বাধীনতা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিবার প্রয়াস পাইয়াছে। সন্ন্যাসী বিদ্রোহ নামে খ্যাত বিদ্রোহ ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে ভারতীয় কৃষকদের ও কর্মহারা কারিগরগণের প্রথম সশস্ত্র বিদ্রোহ। ১৭৬৩ খ্রিস্টাব্দে, পলাশি যুদ্ধের মাত্র ছয় বৎসর পরে, ইংরেজ-রাজের শোষণ ও উৎপীড়নের কবল হইতে ধ্বংসপ্রাপ্ত বাংলা ও বিহারকে বাঁচাইবার জন্য বাংলা ও বিহারে কৃষকবিদ্রোহের আগুন জ্বলিয়া উঠিল।

বাংলা ও বিহারের সাধারণ মানুষ, হিন্দু-মুসলমান, চাষি হাতিয়ার লইয়া রুখিয়া দাঁড়াইল। লাঠি, বন্দুক, তরবারি যে যাহা-কিছু পাইল, তাহা লইয়া, তাহারা দল বাঁধিল। বাংলা ও বিহারের কয়েকজন বীরনেতা বিদেশি ইংরেজ-রাজের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিবার জন্য ডাক দিলেন, তাহাদের কানে দিলেন স্বাধীনতার অগ্নিমন্ত্র, বুকে দিলেন সাহস, তাহাদের মধ্যে জাগাইয়া তুলিলেন দেশভক্তি। পলাশির যুদ্ধে পরাজয়ের প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য বাংলা ও বিহার পাগল হইয়া উঠিল। বিহার ও বাংলার ভিন্ন অঞ্চল হইতে দাঁড়াইলেন, মজনু সাহ, অনুপনারায়ণ, ভবানি পাঠক, দেবী চৌধুরাণী, নুরুল মহম্মদ, পীতাম্বর, শ্রীনিবাস প্রভৃতি কয়েকজন বীরনেতা। তাঁহাদের নেতৃত্বে বাংলা ও বিহারের বিভিন্ন অঞ্চলের কৃষকদের লইয়া রীতিমতো সৈন্যদল গড়িয়া উঠিল, তাঁহারা সেই দলগুলিকে যুদ্ধবিদ্যা শিখাইলেন এবং পরস্পরের মধ্যে যথাসম্ভব যোগাযোগ স্থাপন করিবার চেষ্টা করিলেন।

ইংরেজ শাসকগণ এই বিদ্রোহীদের 'সন্ন্যাসী' বা 'ফকির' নামে অভিহিত করিয়াছেন। কিন্তু এই বিদ্রোহীরা কেহ ফকিরও নন কিংবা গেরুয়াধারী সন্ন্যাসীও নন। ইঁহারা ছিলেন গৃহবাসী সাধারণ মানুষ, বাংলা ও বিহারের আজীবনের দুঃখ-লাঞ্ছনার ভারে প্রপীড়িত কৃষক-কারিগর জনসাধারণ। উইলিয়াম হান্টার, টমসন্, গ্যারাট প্রভৃতি ইংরেজ ঐতিহাসিকগণ এই বিদ্রোহীদের জমিহারা, গৃহহারা কৃষক ও মোগল সাম্রাজ্যের ধ্বংসোন্মুখ সৈন্যবাহিনীর কর্মহারা সৈনিক বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

তখন মোগল সাম্রাজ্যের বিশাল সৈন্যবাহিনী ভাঙিয়াচুরিয়া খানখান হইয়া গিয়াছে। সেই-সকল কর্মহারা সৈন্যগণ ক্ষুধার জ্বালায় অস্থির হইয়া অন্নের জন্য সারা ভারত ঘুরিয়া বেড়াইত। তাহারাও কৃষকের সন্ত্রাস। তাই তাহারা বাংলা ও বিহারের বিদ্রোহী কৃষকদের সঙ্গে মিলিত হইয়া তাহাদের স্বতঃস্ফূর্ত বিদ্রোহকে সংগঠিত রূপ দিয়া পরিচালিত করিয়াছে। এই অভিজ্ঞ সৈনিকদের যোগ্য পরিচালনার ফলে, এই বিদ্রোহ দুর্দমনীয় হইয়া উঠিয়াছিল, বিদ্রোহী বাহিনীর নিকট ইংরেজ সৈন্যগণকে বারবার পরাজয় বরণ করিতে হইয়াছিল এবং এই বিদ্রোহ দীর্ঘকাল স্থায়ী হইয়াছিল।

মজ্‌নু সাহ ছিলেন এই বিদ্রোহের প্রধান নায়ক এবং এই বিদ্রোহের প্রাণস্বরূপ। সেদিন তাঁহার নাম সারা বিহার ও বাংলার জনসাধারণের মনে অভয় জাগাইয়া তুলিত; তাঁহার নামে ইংরেজ শাসক ও তাহাদের অনুচরবর্গ ভয়ে শিহরিয়া উঠিত। বিদেশি ইংরেজ শাসকদের বিরুদ্ধে বিহার ও বাংলার জনসাধারণকে জাগাইয়া তুলিবার জন্য মজ্‌নু বিহারের প্রান্ত হইতে বাংলার ময়মনসিংহ জেলার শেষ প্রান্ত পর্যন্ত সর্বত্র ঘুরিয়া ঘুরিয়া স্বতঃস্ফূর্তভাবে গড়িয়া ওঠা অসংখ্য কৃষক-বাহিনীর মধ্যে যোগাযোগ স্থাপনের চেষ্টা করিয়াছেন। সেকালের ইতিহাস হইতে জানা যায় যে, তিনি এমনকি রানি ভবানী প্রভৃতি জমিদারগণকেও এই বিদ্রোহে যোগদান করিতে আহ্বান করিয়াছিলেন। কিন্তু জমিদারগণ তাঁহার সেই আহ্বানে সাড়া দেন নাই, বরং বিদ্রোহ দমন করিবার জন্য তাঁহারা তাঁহাদের সমগ্র ধনবল ও জনবল দ্বারা ইংরেজ শাসকদের সাহায্য করিয়াছেন।

এইভাবে বাংলা ও বিহারের বিভিন্ন অঞ্চলে এক এক জন নায়কের অধীনে কৃষকবিদ্রোহীরা ইংরেজ রাজের বিরুদ্ধে স্বাধীনতার যুদ্ধ আরম্ভ করিবার জন্য প্রস্তুত হইল। বিদেশি শাসকদের বিরুদ্ধে বাংলা ও বিহারের বুকে প্রথম স্বাধীনতা-যুদ্ধের আগুন জ্বলিয়া উঠিল।

বিদ্রোহের আরম্ভ—ইংরেজি ১৭৬৩ খ্রিস্টাব্দ। পলাশির যুদ্ধের মাত্র ছয় বছর পরের কথা। বিদ্রোহীরা প্রথম আক্রমণ হানিল পূর্ব-বাংলার ইংরেজদের প্রধান ঘাঁটি ঢাকার কুঠিগুলির উপর। তখন ইংরেজদের কুঠিগুলি ছিল এক-একটি শয়তানের ঘাঁটি। এই কুঠিগুলি হইতে ইংরেজ বণিকরা ব্যাবসা-বাণিজ্যের নামে বাংলা ও বিহারের জনসাধারণের যথাসর্বস্ব লুণ্ঠন করিত। এইগুলিই ছিল তখনকার ইংরেজ-রাজের শোষণ ও শাসনের বনিয়াদ। সেইজন্য ভারতের বুক হইতে এই শয়তানদের উচ্ছেদের জন্য বিদ্রোহীরা তাহাদের আক্রমণের প্রথম ও প্রধান লক্ষ্যরূপে এ কুঠিগুলি বাছিয়া লইল। বাংলা দেশের ঢাকার কুঠির স্থান কলিকাতার পরেই। সেইজন্য বিদ্রোহীরা ঢাকার কুঠিকেই প্রথমে নিশ্চিহ্ন করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিল।

ঢাকার কুঠির উপর বিদ্রোহীদের প্রথম আক্রমণ আকস্মিক ঘটনা নয়। তখন এদেশের শিল্পজাত পণ্য নামমাত্র মূল্যে আত্মসাৎ করিয়া মুনাফা লুঠিতে গিয়া ইংরেজ বণিকরা রাজশক্তির সাহায্যে বাংলা ও বিহারের উন্নত কুটির-শিল্পটিকেই ধ্বংস করিয়া ফেলিতে আরম্ভ করিয়াছিল। ইতিহাসপ্রসিদ্ধ ঢাকাই মসলিন বস্ত্রের শিল্পের উপর ইংরেজ বণিকদের আক্রমণ তখন পূর্ণোদ্যমে আরম্ভ হইয়াছে। এই আক্রমণের ফলে হাজার হাজার তন্তুবায় কর্মচ্যুত হইয়া ধ্বংসের পথে চলিয়াছে, ঢাকার অন্যান্য শিল্পের কারিগরদের অবস্থাও শোচনীয় হইয়া উঠিয়াছে। ঢাকার কুঠির উপর আক্রমণ ইহারই পরিণতি।

বিদ্রোহীরা ঢাকার কুঠির উপর আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হইল। ইতিমধ্যে ইংরেজরা বহু পাইক, বরকন্দাজ ও কয়েকটি কামান দ্বারা কুঠির রক্ষা-ব্যবস্থা শক্তিশালী করিয়া তুলিয়াছে। কাজেই বিদ্রোহীরা সতর্ক হইয়া রাত্রির অন্ধকারে চুপিচুপি আগাইয়া চলিল কুঠির দিকে। তাহারা নিঃশব্দে

কুঠিটি চারদিক হইতে ঘিরিয়া ফেলিয়া হঠাৎ আক্রমণ আরম্ভ করিল। এই আকস্মিক আক্রমণে হতভম্ব হইবামাত্র এক ঘণ্টার যুদ্ধে ইংরেজরা পরাজিত ও বন্দি হইল। বিদ্রোহীরা তাহাদের সকল সম্পত্তি লুণ্ঠন করিল। বহু টাকা, কামান ও বন্দুক বিদ্রোহীদের হস্তগত হইল।

এই আক্রমণের পর ইংরেজগণ সতর্ক হইয়া গেল। ঢাকা শহর সুরক্ষিত করিবার জন্য তাহারা বহু সৈন্যসামন্ত লইয়া আসিল এবং পূর্ববঙ্গের বিদ্রোহীদের উপর ব্যাপক আক্রমণ আরম্ভ করিল। বিদ্রোহীরা হটিয়া গিয়া চারি দিক হইতে উত্তরবঙ্গে মিলিত হইতে লাগিল। এই সময় হইতে উত্তর-বঙ্গই হইল বিদ্রোহী-বাহিনীর প্রধান ঘাঁটি।

সেসময় উত্তরবঙ্গে কুচবিহারের রাজার অত্যাচার ও উৎপীড়ন চরম আকার ধারণ করিল। কুচবিহারের রাজার মুরুব্বি হইল ইংরেজ। ইংরেজদের সাহায্যে খাজনা ও কর আদায়ের জন্য রাজা গরিব কৃষকদের ঘরবাড়ি জ্বালাইয়া ও যথাসর্বস্ব লুণ্ঠন করিয়া তাহাদের জীবন অসহনীয় করিয়া তুলিয়াছিল। বিদ্রোহীরা কুচবিহারের রাজার অত্যাচার দমন করিবার জন্য প্রস্তুত হইল। রাজা ভীত হইয়া ইংরেজ-রাজের সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। ফলে, একটি ইংরেজ সৈন্যবাহিনী কুচবিহারে ছাউনি ফেলিল।

এদিকে বিদ্রোহীরা উপযুক্ত আয়োজন করিয়া কুচবিহার আক্রমণ করিল। উভয় দলে ভীষণ যুদ্ধ বাধিল। এক দিকে বিদ্রোহী বাহিনী এবং অপর দিকে রাজা ও ইংরেজদের সৈন্যদল। স্থানীয় কৃষকগণ বিদ্রোহীদের সঙ্গে যোগ দিল। রাজা ও ইংরেজ তাহাদের শত্রু, সেইজন্য এই যুদ্ধ তাহাদেরই যুদ্ধ। এই যুদ্ধে রাজা ও ইংরেজদের মিলিত বাহিনী সম্পূর্ণ পরাজিত হইল। বিদ্রোহীরা কুচবিহার দখল করিয়া রাজবংশের অপর এক ব্যক্তিকে শাসনকর্তা নিযুক্ত করিল।

১৭৬৪ খ্রিস্টাব্দ। বিহারের সারন জেলায় বিরাট মেলা বসিয়াছে। হাজার হাজার নরনারী আসিয়াছে মেলা দেখিতে। ইংরেজদের অনুচর শয়তান-তুল্য দেবী সিংহও বহু পাইক-বরকন্দাজ লইয়া উপস্থিত। সে আসিয়াছে মেলার যাত্রীদের নিকট হইতে জোর করিয়া কর আদায় করিতে। যাহারা মেলায় আসিবে, তাহাদেরই কর দিয়া যাইতে হইবে। এই অন্যায় জুলুমে সাধারণের মধ্যে প্রবল বিক্ষোভ দেখা দিল। দেবী সিংহের জুলুম বন্ধ করিবার জন্য বিহারের বিদ্রোহীরা প্রস্তুত হইল।

পাঁচ হাজার বিদ্রোহী সৈন্য সন্ন্যাসী-বেশে মেলায় জনসমুদ্রে মিশিয়া রহিল, তাহাদের সেনাপতি স্বয়ং মজনু সর্দার। দেবী সিংহের ফউজ আসিয়া সমগ্র মেলা চার দিক হইতে ঘিরিয়া ধরিল, তার পর আরম্ভ হইল মেলার যাত্রীদের নিকট হইতে বলপূর্বক কর আদায়। পাইক-বরকন্দাজগণ সকলের টাকাকড়ি কাড়িয়া লইতে লাগিল। হঠাৎ সেনাপতি মজনু সর্দারের বাঁশি বাজিয়া উঠিল, পাঁচ হাজার বিদ্রোহী-সৈন্যের তরবারির আঘাতে শত্রুর সকল সৈন্য নিহত হইল। মেলার ময়দানের উপর দেবী সিংহের ফউজের রক্তের স্রোত বহিল। তাহাদের সেনাপতি হাসান খাঁ বিদ্রোহীদের হাতে বন্দি হইল।

১৭৬৫ খ্রিস্টাব্দ। ইতিমধ্যে বিদ্রোহীদের সৈন্যসংখ্যা বহুগুণ বাড়িয়া গিয়াছে। রাজশাহিতে তাহাদের প্রধান ঘাঁটিটি তাহারা মাটির প্রাচীর দিয়া ঘিরিয়া ও চারি দিকে গড়খাই কাটিয়া একটা বিরাট দুর্গে পরিণত করিয়াছে। বিরাট দুর্গ যেন একটা শহর। দুর্গের মধ্যে বসিয়াছে বহু কামারশাল, সেখানে দিনরাত কামান, বন্দুক, ঢাল, সড়কি প্রভৃতি প্রস্তুত হইতেছে। সেইসব কামারশালে দেশের শত শত দক্ষ কারিগর দিবারাত্র কাজ করিতেছে।

এবার বিদ্রোহী নেতারা স্থির করিলেন, উত্তরবঙ্গের সব ইংরেজ কুঠি ধূলিসাৎ করিয়া দিবে। প্রথমে বিদ্রোহীরা রাজশাহির কুঠিগুলি আক্রমণ করিয়া নিশ্চিহ্ন করিয়া ফেলিল। তার পর তাহাদের আক্রমণ চলিল দিনাজপুরের কুঠিগুলির উপর। সেই আক্রমণে উত্তরবঙ্গের হাজার হাজার কৃষক, সাধারণ মানুষ বিদ্রোহীদের পাশে দাঁড়াইয়া যুদ্ধ করিল। ক্রমশ রাজশাহি ও দিনাজপুরের বিভিন্ন অঞ্চল কুঠিয়াল ইংরেজ বণিকের কবলমুক্ত হইতে লাগিল এবং সেখানে পুনরায় স্বাধীনতা ফিরিয়া আসিল।

এবার বিদ্রোহীদের অভিযান আরম্ভ হইল রংপুরের দিকে। রংপুরের দিকে বিদ্রোহী বাহিনীর অভিযানের সংবাদে ইংরেজগণ অত্যন্ত ভীত হইয়া উঠিল। ইংরেজ সেনাপতি ক্যাপটেন টমাস বিশাল সৈন্যবাহিনী লইয়া ছুটিয়া চলিল রংপুরের দিকে। টমাসের বাহিনী চলিয়াছে এক গোপন পথে। কিন্তু তাহাদের রংপুর পৌঁছিবার বহু পূর্বেই স্থানীয় আদিবাসীদের মারফত বিদ্রোহীরা ইংরেজ বাহিনীর আগমনের সংবাদ পাইয়া গেল। বিদ্রোহীরা স্থির করিল ইংরেজ বাহিনী রংপুর পৌঁছিবার পূর্বেই তাহাদের উচিতশিক্ষা দিতে হইবে। রংপুরের পথে জাফরগঞ্জ নামক স্থানে বিদ্রোহী-বাহিনী ইংরেজদের সম্মুখীন হইবার জন্য প্রস্তুত হইল।

১৭৭২ খ্রিস্টাব্দে ৩০ ডিসেম্বর ভোরের দিকে জাফরগঞ্জের নিকটে দুই দলের সাক্ষাৎ ঘটিল। প্রথমে আক্রমণ করিল ইংরেজ বাহিনী। বারবার পরাজয়ের পর এবার তাহারা মরিয়া হইয়া উঠিয়াছে। ইহা ব্যতীত বিদ্রোহী বাহিনীর আক্রমণে সমগ্র উত্তরবঙ্গ হইতেই তাহাদের দখল, তাহাদের ব্যাবসা-বাণিজ্য, তাহাদের শোষণ নিশ্চিহ্ন হইবার উপক্রম হইয়াছে। তাহা হইলেই সমগ্র বাংলা দেশেই তাহাদের অস্তিত্ব বিপন্ন হইবে। কাজেই ইংরেজরা প্রাণপণে আক্রমণ করিল। বিদ্রোহীরা সংখ্যায় মাত্র দেড় হাজার। ইংরেজ বাহিনীর আক্রমণের বেগ সহ্য করিতে না পারিয়া তাহারা ক্রমশ পিছু হটিতে লাগিল। বিদ্রোহীদের পিছু হটিতে দেখিয়া ইংরেজ বাহিনী জয়ের উল্লাসে মত্ত হইয়া তাহাদের সকল গোলাবারুদ নিঃশেষ করিয়া ফেলিল। বিদ্রোহী-বাহিনীর চতুর সেনাপতিদের বুঝিতে বিলম্ব হইল না যে, ইংরেজদের শক্তি ফুরাইয়া আসিয়াছে, শীঘ্রই তাহাদের গোলাবারুদ নিঃশেষ হইয়া যাইবে। বিদ্রোহীরা আরও কিছুক্ষণ পিছু হটিতে লাগিল। ক্রমশ ইংরেজদের আক্রমণ নিস্তেজ হইয়া আসিল। এবার বিদ্রোহীদের পালা। বিদ্রোহীরা সুযোগ বুঝিয়া ইংরেজ-বাহিনীর উপর হঠাৎ পালটা আক্রমণ করিয়া তাহাদের ঘিরিয়া ফেলিল। ইংরেজ সৈন্যরা যুদ্ধ করিয়া দলে দলে প্রাণ দিল। বহু ইংরেজ সৈন্য পলাইয়া বনে, জঙ্গলে ও গ্রামে ঢুকিল। কিন্তু বিদ্রোহীরা গ্রামবাসীদের সাহায্যে তাহাদের খুঁজিয়া বাহির করিয়া বন্দি করিল। সেনাপতি টমাস যুদ্ধে নিহত হইলেন।

বিদ্রোহীরা একে একে উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলা উদ্ধার করিতে করিতে আগাইয়া চলিল। এইভাবে রাজশাহি, দিনাজপুর ও রংপুর জেলার বৃহদংশ ইংরেজদের কবল হইতে মুক্ত হইল। এবার বগুড়া জেলার পালা। বিদ্রোহীদের বিভিন্ন দল বগুড়া জেলায় প্রবেশ করিয়া ইংরেজ বণিকদের বহু কুঠি নিশ্চিহ্ন করিয়া ফেলিল। বিদ্রোহীদের এই অগ্রগতির সংবাদ পাইয়া ইংরেজ শাসকগণ পূর্বের অপেক্ষাও শক্তিশালী এক বাহিনী পাঠাইল বগুড়ার দিকে। এই বাহিনীর নায়ক হইয়া আসিলেন ইংরেজদের সর্বাপেক্ষা অভিজ্ঞ সেনাপতি ক্যাপটেন এডওয়ার্ডস্। ইংরেজ-বাহিনীর সৈন্য-সংখ্যা আট হাজার, আর বিদ্রোহীদের সংখ্যা মাত্র চার হাজার। কাজেই বিদ্রোহীরা সম্মুখ-যুদ্ধ এড়াইয়া সমগ্র ইংরেজ-বাহিনীটাকে বিপর্যস্ত করিবার মতলব আঁটিল। তাহারা চারি দিকে ছড়াইয়া পড়িয়া জনসাধারণের সঙ্গে এমনভাবে মিশিয়া রহিল যে, ইংরেজরা একজন বিদ্রোহীকেও খুঁজিয়া পাইল না।

এইবার ইংরেজরা বিরাট এক আয়োজন করিয়াছে। তাহাদের সৈন্যদলের সঙ্গে রহিয়াছে কয়েকটি কামান আর বিপুল পরিমাণ গোলাবারুদ। এই বাহিনীর পরিচালনায় রহিয়াছেন সর্বাপেক্ষা অভিজ্ঞ ও বয়স্ক সেনাপতি ক্যাপটেন এডওয়ার্ডস্ স্বয়ং। শত্রুর এই বিপুল শক্তি দেখিয়া বিদ্রোহীরা বগুড়া জেলা হইতে পিছু হটিয়া অন্যদিকে আক্রমণ করিল। তাহারা কুচবিহারের অন্তর্গত সন্তোষপুরের দুর্গ ধ্বংস করিয়া ফেলিল, তার পর ছোটো ছোটো দলে বিভক্ত হইয়া রংপুর, দিনাজপুর, জলপাইগুড়ি, কুচবিহার প্রভৃতি উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় ইংরেজদের ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিল। ইতিমধ্যে ইংরেজরা ইংল্যান্ড হইতে বহু সৈন্য আমদানি করিল এবং এদেশ হইতেও বহু সিপাহি সংগ্রহ করিল। তার পর তাহারা একযোগে সারা উত্তরবঙ্গ জুড়িয়া বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে ভীষণ আক্রমণ আরম্ভ করিল।

এইভাবে একই সময়ে চারি দিক হইতে আক্রান্ত হইয়া বিদ্রোহীরা ভীষণ অসুবিধায় পড়িয়া গেল। এখন তাহারা অন্তত কিছুদিনের জন্য সম্মুখ-যুদ্ধ বন্ধ করিয়া গেরিলা পদ্ধতিতে যুদ্ধ আরম্ভ করিল। এই সময়ে সবচেয়ে বড়ো যুদ্ধ হইয়াছিল দিনাজপুর জেলার বালুরঘাট অঞ্চলে। এই যুদ্ধে বিদ্রোহীরা ইংরেজ-বাহিনীর বিরুদ্ধে সম্মুখ-যুদ্ধ ও গেরিলা-যুদ্ধ— এই উভয় যুদ্ধ-কৌশলই প্রয়োগ করিল। এই যুদ্ধে ইংরেজ-বাহিনী সম্পূর্ণরূপে পরাজিত ও ছত্রভঙ্গ হইয়া যায় এবং তাহাদের সেনাপতি ক্যাপটেন এডওয়ার্ডস্ বিদ্রোহীদের তরবারির আঘাতে নিহত হন।

দিনাজপুরের এই যুদ্ধে পরাজিত হইয়া ইংরেজ সৈন্যদের মনোবল ভাঙিয়া পড়িল। বিদ্রোহীদের গেরিলা-যুদ্ধের ফলে তাহারা ভীষণ অসুবিধায় পড়িয়া গেল। যে শত্রুদের চোখে দেখা যায় না, তাহাদের উপর আঘাত হানা চলে না। ইংরেজ-বাহিনী এই যুদ্ধে অতিষ্ঠ হইয়া উঠিল, উত্তরবঙ্গ হইতে পলাইয়া যাওয়া ব্যতীত তাহাদের আর কোনো উপায় রহিল না। ইংরেজ-বাহিনীর পলায়নের সঙ্গে সঙ্গেই বিদ্রোহীরা আবার চারি দিকে তাহাদের ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা করিতে লাগিল। এই সুযোগে তাহারা উত্তরবঙ্গে কয়েকটি দুর্গ নির্মাণ করিল। দুর্গে কামান-বন্দুকের ছোটো ছোটো কারখানা বসিল, জল-যুদ্ধের জন্য বজরা আর ছিপ তৈরি হইতে লাগিল। বড়ো বড়ো নদীর বাঁকে বহু নৌ-কেন্দ্র গড়িয়া উঠিল। এবার স্থল-যুদ্ধেরও বিপুল আয়োজন চলিল।

সে সময়ে এদেশে বর্তমান কালের মতো রাস্তাঘাট ছিল না, রেলপথ তো নয়ই। তখন জলপথই ছিল যাতায়াতের একমাত্র পথ। সেকালের নদীগুলি ছিল অন্যরকম। বর্তমান কালের মতো হাজা বা মজা নদী নয়। বড়ো বড়ো নদীই ছিল পূর্ববঙ্গে যাতায়াতের একমাত্র পথ এবং ছিপ, বজরা বা নৌকায় যাইতে হইত। তাই পূর্ববঙ্গের ইংরেজ রাজত্বের উচ্ছেদ করিবার উদ্দেশ্যে বিদ্রোহীরা বহু নৌ-ঘাঁটি, বজরা ও ছিপ তৈরি করিল। এইভাবে তাহাদের বড়ো একটা জল-বাহিনীও গড়িয়া উঠিল।

উত্তরবঙ্গে ইংরেজ শক্তির উপর প্রচণ্ড আঘাত দিয়া এবার বিদ্রোহীরা একটা প্রকাণ্ড নৌ-বাহিনী লইয়া ঢাকার দিকে যাত্রা করিল। ঢাকা তখনও ইংরেজদের বড়ো ঘাঁটি। এই ঘাঁটি ধ্বংস করিয়া এই অঞ্চলের জনসাধারণকে ইংরেজদের শোষণ হইতে মুক্ত করিতে বিদ্রোহীরা প্রতিজ্ঞা করিল। বিদ্রোহীদের নৌ-অভিযানের সংবাদ ইংরেজদের কানে পৌঁছিতে বিলম্ব হইল না। তাহারা অবিলম্বে ঢাকার কুঠির শক্তি বহুগুণ বাড়াইয়া ফেলিল, কুঠিতে আরও বহু সৈন্য, বহু কামান-বন্দুক আসিল।

বহু ছিপ ও বজরা লইয়া বিদ্রোহীরা ঢাকার দিকে দ্রুত আগাইয়া চলিল। তাহারা পথের উপর সকল ইংরেজ-কুঠি লুণ্ঠন করিয়া ধূলিসাৎ করিয়া দিল। বিদ্রোহীদের এই নৌ-অভিযানে বাধা দিবার

জন্য ইংরেজরাও বহু বজরা ও ছিপ লইয়া একটা বড়ো নৌ-বাহিনী পাঠাইল। উভয় পক্ষের সাক্ষাৎ হইল গোয়ালন্দের নিকট। বিদ্রোহীরা বিপুল বিক্রমে ইংরেজদের নৌ-বাহিনীর উপর আক্রমণ চালাইল। গোয়ালন্দের পদ্মা ভীষণ চঞ্চল হইয়া উঠিল, দুই পক্ষের সৈন্যদের রক্তে বিশাল পদ্মার জল লাল হইয়া গেল। জল-যুদ্ধে নিপুণ বিদ্রোহীদের আক্রমণে ইংরেজ-পক্ষের সকল বজরা ও ছিপ পদ্মাগর্ভে ডুবিয়া গেল।

এই জয়লাভের সঙ্গে সঙ্গেই বিদ্রোহীদের নৌ-বাহিনী আরও অগ্রসর হইয়া ঢাকা কুঠির উপর আক্রমণ করিল। মাত্র আধ ঘণ্টার যুদ্ধেই কুঠির সকল সৈন্য নিহত হইল, কুঠির বড়োকর্তা লিস্টারসাহেব কোনোরকমে পলাইয়া প্রাণ বাঁচাইলেন। বিদ্রোহীরা ঢাকার কুঠি লুঠ করিয়া বহু টাকা, বিপুল খাদ্য ও পণ্য এবং বহু বন্দুক হস্তগত করিল।

এদিকে ইংরেজদের ব্যাপক আক্রমণের ফলে উত্তরবঙ্গের বিদ্রোহীরা কিছুদিন চুপ করিয়া ছিল। ইংরেজদের আক্রমণে ভাটা পড়িলে বিদ্রোহীরা আবার কিছুদিন পরে নূতন উদ্যমে শত্রুর ঘাঁটির উপর আক্রমণ আরম্ভ করিল। বিদ্রোহীদের অন্যতম সেনাপতি নুরুল মহম্মদের অধীনে এক বড়ো বাহিনী রাজশাহি জেলায় ইংরেজ বণিকদের প্রধান ঘাঁটি রামপুর-বোয়ালিয়ার উপর আক্রমণ করিয়া কুঠির বহু টাকার সম্পত্তি হস্তগত করিল। কুঠির প্রধান কর্তা বেনেটসাহেব স্বয়ং বিদ্রোহীদের হাতে বন্দি হইলেন। এই সময়ে বিদ্রোহীদের আর-একটি বাহিনী রংপুরের ঘাঁটির উপর আক্রমণ করিল। কুঠির বড়োকর্তা মার্টেলসাহেব প্রাণপণে যুদ্ধ করিয়া নিহত হইলেন।

উত্তরবঙ্গের বিদ্রোহীরা কিছুদিন চুপচাপ থাকার ফলে ইংরেজরা ভাবিয়াছিল যে বিদ্রোহীরা বুঝি ধ্বংস হইয়া গিয়াছে। এইসকল আক্রমণে তাহারা ভীষণ চিন্তিত হইয়া উঠিল। বিদ্রোহীদের ধ্বংস করিবার জন্য আবার তাহারা বিপুল আয়োজন করে। বহু সৈন্যসামন্ত লইয়া ইংরেজ সেনাপতি ক্যাপটেন ম্যাকেঞ্জি রংপুরের দিকে যাত্রা করেন। সেনাপতি ম্যাকেঞ্জি ছিলেন সেযুগের ইংরেজ সেনাপতিদের মধ্যে সবচেয়ে অভিজ্ঞ; এবারও ইংরেজরা সঙ্গে আনিয়াছে বহু কামান ও গোলা-বারুদ। ইংরেজরা ভাবিয়া লইল যে, এবার আর উত্তরবঙ্গের বিদ্রোহীদের রক্ষা নাই। সেনাপতি ম্যাকেঞ্জি তাঁহার এই অভিযানের সংবাদ খুব গোপন রাখিলেন এবং প্রকাশ্য পথে না চলিয়া তিনি সসৈন্যে চলিলেন এক গোপন পথে। তিনি স্থির করিলেন, হঠাৎ রংপুর আক্রমণ করিয়া বিদ্রোহীদের নিশ্চিহ্ন করিয়া ফেলিবেন।

তাঁহার আয়োজন হইল নিখুঁত, কিন্তু বিদ্রোহীদের নিকট তাঁহার সকল গোপন কথাই প্রকাশ হইয়া গেল। তাঁহাদের পথের দুই পাশের জনসাধারণই বিদ্রোহীদের নিকট সকল সংবাদ পৌঁছাইয়া দিল। ইংরেজদের সৈন্য এবং অস্ত্র সংখ্যাও বিদ্রোহীরা জানিয়া ফেলিল। শত্রুর এই বিরাট অভিযানের সংবাদ পাইয়া তাহারা রংপুর ত্যাগ করিল, আর সেনাপতি ম্যাকেঞ্জি দ্রুত রংপুর দখল করিয়া ফেলিলেন। তিনি চার দিক খুঁজিয়া এক জন বিদ্রোহী সৈন্যেরও সন্ধান পাইলেন না।

ক্যাপটেন ম্যাকেঞ্জির এই শোচনীয় ব্যর্থতার পর আসিলেন লেফটেন্যান্ট স্মিথ। সেনাপতি স্মিথও বহু অনুসন্ধানের পর বিদ্রোহীদের কোনো সন্ধান না পাইয়া সসৈন্য ফিরিয়া চলিলেন। সেনাপতি ম্যাকেঞ্জি ফিরিতেছিলেন একাকী, কিন্তু স্মিথ ফিরিয়া চলিলেন সসৈন্যে। বিদ্রোহীরা কিন্তু সেনাপতি স্মিথকে নিরাপদে যাইতে দিতে নারাজ। তাহারাও লুকাইয়া থাকিয়া ইংরেজ-বাহিনীর পিছু লইল। ইংরেজ-বাহিনী চলিয়াছে নেপালের কাছাকাছি দুর্গম তরাই অঞ্চলের মধ্য দিয়া। বিদ্রোহীরা সুযোগ বুঝিয়া প্রচণ্ড বেগে ইংরেজ-বাহিনীর উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল। সেই আকস্মিক আক্রমণের বেগ সহ্য করিতে না পারিয়া ইংরেজ-সৈন্য ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িল।

সেনাপতি লে, স্মিথ স্বয়ং বিদ্রোহীদের হস্তে নিহত হইলেন। বিদ্রোহীরা আবার রংপুর দখল করিয়া লইল।

এবার রংপুরের বিদ্রোহীদের দমন করিতে আসিলেন ক্যাপটেন এডওয়ার্ড। এডওয়ার্ড বহু সৈন্যসামন্ত লইয়া বীরদর্পে রংপুরে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, রংপুর জনশূন্য, বিদ্রোহীরা পলাইয়াছে। তিনি কোনো বিদ্রোহী সৈন্যকেই খুঁজিয়া পাইলেন না। শত্রুর বিপুল শক্তি দেখিয়া বিদ্রোহীরা সম্মুখ-যুদ্ধ এড়াইয়া ছদ্মবেশে স্থানীয় জনসাধারণের সঙ্গে মিশিয়া রহিল। তাহারা চুপ করিয়া থাকে না, সুযোগমতো বাহির হইয়া ইংরেজ সৈন্যদের ছোটো ছোটো দলের উপর আক্রমণ করিয়া ও কুঠি, রসদ, গোলা, বারুদ ও অস্ত্রশস্ত্র লুঠপাট করিয়া উধাও হইয়া যায়। ইংরেজ সৈন্যরা বিদ্রোহীদের নাগাল পায় না, চোখেও দেখে না, অথচ তাহাদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ। ইংরেজ বীরেরা ভারত জয় করিতে আরম্ভ করিয়া এমন সাংঘাতিক শত্রুর সম্মুখীন কোনো দিন হয় নাই।

এইভাবে বিদ্রোহীরা সেনাপতি এডওয়ার্ডের সৈন্যবাহিনীকে হয়রান ও দুর্বল করিয়া অবশেষে এক দিন অকস্মাৎ তাহাদের সম্মুখীন হইল। সেনাপতি এডওয়ার্ডের বাহিনীতে ইংরেজসৈন্যও ছিল, আবার দেশীয় সিপাহিও ছিল। সিপাহিরা এদেশীয় কৃষকের সন্তান, কেবল অভাবে ইংরেজদের অধীনে চাকরি করিতে বাধ্য হইয়াছে। কিন্তু তাহাদের সহানুভূতি ছিল সকল সময়েই কৃষকবিদ্রোহীদের প্রতি। এই যুদ্ধে দেশীয় সিপাহিরা বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে অস্বীকার করিল। সেনাপতি এডওয়ার্ড তখন নিরুপায় হইয়া কেবল ইংরেজ সৈন্যদের লইয়াই যুদ্ধ করিলেন। এই যুদ্ধে সেনাপতি এডওয়ার্ড স্বয়ং এবং তাঁহার দলের প্রত্যেকটি ইংরেজ সৈন্য নিহত হইলেন।

এই পরাজয়ের ফলে ইংরেজ-শাসকগণ ভীষণ শঙ্কিত হইয়া উঠিল। বঙ্গদেশে এইবার কোম্পানির রাজত্ব বুঝি যায়, বাঙালিরা বুঝি পলাশি যুদ্ধের পরাজয়ের প্রতিশোধ তুলিয়া লয়। ইংরেজ শাসকগণ এবার মরিয়া হইয়া উত্তরবঙ্গের সিপাহিদের দমনের জন্য সচেষ্ট হইল। দেশীয় সিপাহিদের উপর আর ভরসা না করিয়া তাহারা এবার দেশ হইতে বহু সৈন্য লইয়া আসিল এবং বিহার ও অন্যান্য অঞ্চল হইতেও ইংরেজ সৈন্যদের সরাইয়া লইয়া একত্রে সমবেত করিল। এইভাবে একই সময়ে উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলে আক্রমণ চালাইবার জন্য তাহাদের বিপুল আয়োজন সম্পূর্ণ করিয়া তুলিল। সুদূর ইংল্যান্ডেও এই অভিযানের জন্য সাজ সাজ রব পড়িয়া গেল।

ইংরেজ-বাহিনী কয়েকটি দলে ভাগ হইয়া উত্তরবঙ্গের দিকে আগাইয়া চলিল। সমগ্র উত্তরবঙ্গকেই যেন এবার তাহারা বাংলার বুক হইতে নিশ্চিহ্ন করিয়া ফেলিতে চায়। ইংরেজ-বাহিনী দ্রুত আগাইয়া চলিল। পথে বিদ্রোহীরা তাহাদের কয়েকবার বাধা দিবার চেষ্টা করিয়া পরাজিত হইল। স্বয়ং মজনু সর্দার বগুড়ার নিকট এক ভীষণ যুদ্ধে পরাজিত হইয়া বিহারে পলায়ন করিলেন। সেই অভাবনীয় জয়লাভের পর পাঁচটি ইংরেজ সৈন্যদল উত্তরবঙ্গ চষিয়া ফেলতে লাগিল। জনসাধারণের উপর ভীষণ অত্যাচার উৎপীড়ন চলিল। বিদ্রোহীরা তখন তাহাদের সমগ্র শক্তি লইয়া আত্মরক্ষায় ব্যস্ত। তিস্তানদীর তীরে এক ভীষণ যুদ্ধে পরাজিত হইয়া সেনাপতি নুরুল মহম্মদ পলাইয়া গেলেন। তাঁহার সৈন্যবাহিনী ছত্রভঙ্গ হইয়া গেল। অপর সেনাপতি পীতাম্বর করতোয়া নদীর তীরে শোচনীয়ভাবে পরাজিত হইলেন। ইংরেজদের অপেক্ষাকৃত শক্তিশালী বাহিনীর বিরুদ্ধে গেরিলা-যুদ্ধের কৌশল অবলম্বনের পরিবর্তে সম্মুখযুদ্ধের কৌশল গ্রহণ করার ফলেই বিদ্রোহীরা এইভাবে চার দিকে পরাজয় বরণ করিতে বাধ্য হইল।

ইংরেজ-বাহিনীর এই আক্রমণের ফলে বিদ্রোহীরা চার দিকে ছড়াইয়া পড়িল। বিদ্রোহীদের কয়েকটি দল ইংরেজ-বাহিনীর বেড়াজাল ভেদ করিয়া পশ্চিমবঙ্গে আসিয়া উপস্থিত হইল। এমনকি তাহাদের একটি দল যে ১৭৭২ খ্রিস্টাব্দে ইংরেজদের প্রধান ঘাঁটি কলিকাতার কাছে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল, তখনকার কোম্পানির কর্মচারীদের বিবরণ হইতেই ইহা জানা যায়। এইভাবে বিদ্রোহীদের কয়েকটি দল পশ্চিমবঙ্গের মেদিনীপুর, বর্ধমান, বিষ্ণুপুর, রায়পুর প্রভৃতি বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল।

এদিকে বিদ্রোহীদের পরপর কয়েকবার পরাজয়ের ফলে ইংরেজরা ধরিয়া লইল যে, বিদ্রোহীরা সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হইয়া গিয়াছে। কিন্তু মাত্র এক বৎসর শেষ হইতে না হইতেই বিদ্রোহীরা আবার নূতন শক্তি লইয়া দেখা দিল। মজনু সর্দার বিহার হইতে এক বড়ো সৈন্যবাহিনী সংগ্রহ করিয়া বাংলা দেশে ফিরিয়া আসিলেন। নুরুল মহম্মদ, পীতাম্বর, ভবানী পাঠক প্রভৃতি বিদ্রোহী সেনাপতিরাও বঙ্গদেশ হইতে দুইটি সৈন্যবাহিনী গঠন করিয়া মজনুর সঙ্গে মিলিত হইলেন।

অবিলম্বে ইংরেজ-বাহিনীর সহিত আবার পূর্ণোদ্যমে যুদ্ধ আরম্ভ হইল। প্রথমদিকে কয়েকটি ইংরেজ সৈন্যদল একে একে পরাজিত হইল। সমগ্র উত্তরবঙ্গ পুনরায় বিদ্রোহীদের পদভরে কাঁপিয়া উঠিল। রাজশাহির দুর্গশীর্ষে আবার স্বাধীনতার পতাকা উড়িতে লাগিল। বাংলার জনসাধারণ আবার নতুন আশায় বুক বাঁধিল।

ধ্বংসের পরিবর্তে নতুন শক্তিতে বিদ্রোহীদের আবির্ভূত হইতে দেখিয়া ইংরেজ শাসকগণ প্রমাদ গনিল। আবার তাহারা প্রাণপণে যুদ্ধের আয়োজন করিতে লাগিল। কলিকাতা হইতে নূতন নূতন ইংরেজ-বাহিনী ছুটিল উত্তরবঙ্গের দিকে। এবারে প্রথম যুদ্ধ হইল রংপুরের পশ্চিম দিকে। একদিকে নুরুল মহম্মদের বিদ্রোহী-বাহিনী, অপরদিকে ক্যাপটেন টমাসের অধীনে বড়ো একদল ইংরেজ সৈন্য। পাঁচ ঘণ্টা ধরিয়া ঘোরতর যুদ্ধ চলিল। যুদ্ধের প্রারম্ভে ইংরেজ-বাহিনী কামান হইতে প্রচণ্ড গোলাবর্ষণ করিয়া অগ্রসর হইতে লাগিল, আর বিদ্রোহীরা সেই গোলাবর্ষণের বেগ সহ্য করিতে না পারিয়া পিছু হটিতে লাগিল। কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই ইংরেজদের গোলা নিঃশেষ হইয়া গেল। তার পর আরম্ভ হইল বিদ্রোহীদের আক্রমণ। ইংরেজ সৈন্যদল শোচনীয়ভাবে পরাজিত হইল এবং সেনাপতি টমাস যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ হারাইলেন।

এই অভাবনীয় জয়লাভের ফলে বিদ্রোহীরা উৎসাহে মাতিয়া উঠিল। তাহাদের সেনাপতি নুরুল মহম্মদ ও পীতাম্বর জয়ের উল্লাসে মত্ত হইয়া ইংরেজদের প্রধান ঘাঁটি খাস কলিকাতার উপর আক্রমণের জন্য ছুটিয়া চলিলেন। কিন্তু বিদ্রোহীদের প্রধান সেনাপতি মজনু সর্দার এখনই কলিকাতা আক্রমণ উচিত বলিয়া মনে করিলেন না। আরও কিছুকাল গেরিলা কৌশলে যুদ্ধ করিয়া ইংরেজদের শক্তি ক্ষয় করিতে তিনি পরামর্শ দিলেন। নুরুল মহম্মদ ও পীতাম্বর সেই পরামর্শ অগ্রাহ্য করিয়াই ছুটিলেন কলিকাতার দিকে।

এই সংবাদ পাইয়া ইংরেজরা কলিকাতা রক্ষার সমস্ত আয়োজন করিল। বড়ো বড়ো ইংরেজ সৈনদল কলিকাতার প্রত্যেকটি পথের উপর ঘাঁটি করিল, আর সেইসব সৈন্যদলের সঙ্গে রহিল বড়ো বড়ো কামান। বিদ্রোহী-বাহিনী কলিকাতার নিকটবর্তী হইবার পূর্বেই মাঝপথে তাহাদের ছত্রভঙ্গ করিবার উদ্দেশ্যে একটি ইংরেজ-বাহিনী গোপনে যাত্রা করিল। এই বাহিনীর নায়ক ইংরেজদের সর্বশ্রেষ্ঠ সেনাপতি লেফটেন্যান্ট ম্যাকডোনাল্ড। বিদ্রোহীরা কলিকাতার দিকে আগাইয়া আসিতেছে যশোরের পথে।

লে. ম্যাকডোনাল্ড-এর বাহিনী চুপি চুপি যশোরের পথে অগ্রসর হইল। নুরুল ও পীতাম্বরের অধীনে বিদ্রোহী-বাহিনী দ্রুত কলিকাতার পথে আগাইয়া চলিয়াছে। দুই বিদ্রোহী সেনাপতি তখন তাঁহাদের পূর্বের জয়ের উল্লাসে এতই মত্ত যে, ইংরেজ-বাহিনীর গোপন সংবাদ লইবার প্রয়োজনও তাঁহারা বোধ করিলেন না। তাঁহারা তখন পলাশির পরাজয়ের প্রতিশোধ ও বাংলার স্বাধীনতা পুনঃপ্রতিষ্ঠার স্বপ্নে বিভোর। এদিকে ইংরেজ-বাহিনী তাঁহাদের নিকটবর্তী হইল।

সন্ধ্যার দিকে বিদ্রোহী-বাহিনী যশোরের কাছে মোগলহাট নামক স্থানে ছাউনি ফেলিল। সারা দিনের পথশ্রমে সৈন্যরা শ্রান্ত-ক্লান্ত। অবিলম্বে তাহারা গভীর নিদ্রায় মগ্ন হইল। ইংরেজ-বাহিনী বিদ্রোহী সৈন্যদের উপর আক্রমণ করিল শেষরাত্রে। এই অতর্কিত আক্রমণে ও তাহাদের শক্তিশালী কামানের প্রচণ্ড গোলাবর্ষণে বহু বিদ্রোহী সৈন্য প্রাণ দিল। বীর বিদ্রোহী সেনার পবিত্র রক্তে মোগলহাটের শস্যক্ষেত্র রঞ্জিত হইয়া গেল। সেনাপতি নুরুল মহম্মদ ও পীতাম্বর বাংলার স্বাধীনতার জন্য বীরের মতো প্রাণ দিলেন। মোগলহাট বাংলার দ্বিতীয় পলাশি হইয়া রহিল।

এই শোচনীয় পরাজয়ের পর বিদ্রোহীরা সর্বত্র পরাজিত হইতে লাগিল। উত্তরবঙ্গে মজনু সর্দার পর পর কয়েকবার পরাজিত হইলেন। অবশেষে মজনু ক্যাপটেন স্টুয়ার্টের কাছে চূড়ান্তভাবে পরাজিত হইয়া বাংলা দেশ হইতে পলায়ন করিলেন। তাঁহার সৈন্যবাহিনী ছত্রভঙ্গ হইয়া গেল। বিদ্রোহীদের প্রধান ঘাঁটি রাজশাহির দুর্গ ইংরেজদের কামানের গোলায় ধূলিসাৎ হইয়া গেল।

এই শোচনীয় পরাজয়ের পর সারা বাংলা ও বিহারে বিদ্রোহীদের সামরিক শক্তি ভাঙিয়া ছত্রভঙ্গ হইয়া যাইতে লাগিল। ইহার পরেও বিদ্রোহী সেনাপতি ও নেতারা তাঁহাদের শক্তি গড়িয়া তুলিবার জন্য বহুবার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু সেরূপ সাফল্য লাভ করিতে পারেন নাই। ইহার পর বিদ্রোহী সৈন্যগণ বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত হইয়া বাংলা ও বিহারের সর্বত্র ইংরেজদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়াছে। এইভাবে ১৮০০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত এইসব বিদ্রোহী সৈন্যদল ইংরেজদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালাইয়াছিল। সেই সংগ্রামও অবশেষে এক দিন ইংরেজ শাসকদের বীভৎস অত্যাচরের ফলে স্তব্ধ হইয়া যায়। বিদ্রোহী নেতারা একে একে ইংরেজ শাসকদের হাতে ধরা পড়িয়া বন্দুকের গুলিতে ও ফাঁসিকাষ্ঠে প্রাণ দেন।

এইভাবে পলাশির যুদ্ধের পর ভারতে ইংরেজ শাসনের প্রথম দিকে বাংলা ও বিহার তথা ভারতের প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রাম ব্যর্থ হইয়া গেল। কিন্তু এই ব্যর্থতার মধ্য দিয়া বাঙালি ও বিহারবাসীদের রক্তে লেখা আরম্ভ হইল ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের এক নূতন ইতিহাস।

বাংলায় বোমার সূচনা

হেমচন্দ্র কানুনগো

কয়েক সপ্তাহ আগে অর্থাৎ ১৯০৭ খ্রিস্টাব্দের ৬ ডিসেম্বর বাংলার লাট 'ফ্রেজার সাহেব'-এর গাড়ি বোমা দিয়ে উড়িয়ে দেবার চেষ্টা হয়েছিল— আমারই বাড়ির কাছে। তাই বম্বেতে এই খবর পেয়ে একটু বিব্রত হয়েছিলাম। মেদিনীপুরের বিপ্লবী বন্ধুদের কাছে এই ঘটনার বিশেষ বিবরণ শুনলাম। বারীনের এও একটা honest attempt। 'রণনীতি'র ধারা অনুযায়ী, জাঁদ্রেলের নাকি রণক্ষেত্রে অর্থাৎ ঘটনাস্থলে যাওয়া নিষিদ্ধ; তাই বুঝি বারীন খড়্গপুরে থেকে শ্রীমান বিভূতিকে খড়্গপুরের প্রায় দশ কী বারো মাইল দূরে নারায়ণগড় থানার অন্তর্গত একটা নির্জন স্থানে রেললাইনের তলায় কয়েক পাউন্ড ডিনামাইট পুঁতে দিয়ে আসতে পাঠিয়েছিল। 'লাটসাহেব'-এর গাড়িটা নাকি জখম হয়েছিল। যাই হোক, এই অপরাধের অপরাধীকে ধরে দিতে পারলে সরকার থেকে এক হাজার আর বি. এন. রেলকোম্পানি থেকে পাঁচ হাজার টাকা পুরস্কার দেওয়া হবে বলে ঘোষণা করা হয়েছিল।

বিপ্লববাদীদের দ্বারা যে এ ঘটনা ঘটতে পারে, অথবা বিপ্লববাদী বলে কোনো জীবের অস্তিত্ব যে বাংলা দেশে থাকতে পারে, সে ধারণা তখন বেঙ্গল পুলিশের গজায়নি। তার প্রমাণ, তাঁরা নাগপুরি কুলিদের ভেতর থেকে, কীরকম করে একদল আসামি বের করে আইনকানুন মোতাবেক তাদের অপরাধী সাব্যস্ত করে ফেলেছিলেন।

উক্ত ৬ ডিসেম্বরের পরের দিন মেদিনীপুরে বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মিলনীর বাৎসরিক অধিবেশন হয়েছিল। তাতে মধ্যপন্থী আর চরমপন্থীদের যেরকম উৎকট ঝগড়াঝাঁটি বেধেছিল এবং চরমপন্থীদের পৃথক কনফারেন্সে ইংরেজ সরকারকে যেরকম, বেশ করে দু-কথা শুনিয়ে দেওয়া হয়েছিল, তা থেকে নাকি মেদিনীপুরের পুলিশ কলকাতায় আর মেদিনীপুরে গুপ্তসমিতির গন্ধ পেয়েছিল বলে, ছ-সাত মাস পরে, মেদিনীপুর বোমার মামলার এজাহারে প্রকাশ করেছিল। কিন্তু গন্ধ পেলে এই ঘটনার অনেক দিন পরে উক্ত নির্দোষ কুলি বেচারাদের অকারণ দণ্ড দিয়ে, অক্ষয় কলঙ্কের কালিমা ব্রিটিশ জাস্টিসের গায়ে আর এমন করে লেপে দিত না। পরে কিন্তু ওই কুলিদের নির্দোষ বলে ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল। তা ছাড়া সেই ডিসেম্বরের ২৩-এ ঢাকার ম্যাজিস্ট্রেট 'এলেন' (Mr. Allen) সাহেবকে অকারণে কে পিস্তল দিয়ে

গুলি করেছিল। যদিও নাকি বিপ্লববাদীদের প্রায় সবগুলি দল এই কীর্তির অধিকারী বলে নিজেদের মধ্যে দাবি করেছিল, তথাপি ওইজন্য কেউ অপরাধী সাব্যস্ত হয়ে দণ্ড পায়নি।

এই ঘটনার সপ্তাহখানেকের মধ্যে সুরাট কংগ্রেসে যে বিলেতি কায়দায় তাণ্ডবলীলা সংঘটিত হয়েছিল, তাতে স্পষ্টই লক্ষিত হবার কথা ছিল— বাঙালি এক নতুন ভাবে অনুপ্রাণিত হয়েছে। এ সত্ত্বেও খড়্গপুরের উক্ত কুলিদের দণ্ড দেওয়াতে এইটে প্রমাণিত হয় যে, পুলিশ তখনও বৈপ্লবিক সমিতির খোঁজ পায়নি, এমনকি সন্দেহও করেনি।

এইসব দেখেশুনে নিশ্চিন্ত মনে কলকাতায় এসেই— দেবব্রতবাবুর সঙ্গে দেখা করলাম আর শুনলাম, কলকাতায় বিপ্লববাদীরা অনেক ছোটো ছোটো দলে ভাগাভাগি হয়ে গেছে। তার মধ্যে চার-পাঁচটা দল প্রধান ছিল। 'ক'বাবু তখন কলকাতায় ছিলেন না। কাজেই বারীনের কাছে খবর দিতে দেবব্রতবাবুকে অনুরোধ করে অন্য এক জন বড়ো নেতার খোঁজে গেলাম। এঁকে পূর্বে 'গ'বাবু বলে উল্লেখ করেছি। ইনি 'ক'বাবুর বিশেষ বন্ধু বলেই সে যাবৎ জানতাম। এঁরই উৎসাহ এবং সহানুভূতিতে আর অনেকটা এঁরই অভিপ্রায়মতো, দেশ উদ্ধারের তথাকথিত একটা পাকা পন্থার সন্ধান করতে বিদেশ গেছলাম। ইনি আর-এক জন নেতার সঙ্গে থাকতেন। যাই হোক, প্রথমেই অত্যন্ত নির্বন্ধ সহকারে এঁরা বলেছিলেন, আমি যেন বারীনের সঙ্গে দেখা পর্যন্ত না করি অর্থাৎ বারীনের দলের সঙ্গে কোনো সম্পর্কও না রাখি। কেন রাখব না, তার একটা খুব সংগত কারণ কিন্তু তাঁরা তখন আমায় বাতলে দেননি। এই মাত্র বলেছিলেন যে, 'ক'বাবু বারীনের কথা ছাড়া আর কারও কথা কানে তোলেন না। আর অন্যে যে suggestion দেয়, ঠিক তার উলটো করাই বারীনের স্বভাব। বিশেষত বারীন নাকি গুপ্তসমিতির বিশেষ গোপনীয় কাজগুলি এমনভাবে তখন করছিল; যেন তা সাধারণে প্রকাশ করাই তার উদ্দেশ্য। কাজেই সে অবিলম্বে পুলিশের খপ্পরে যাবেই। আর তার সঙ্গে যারা যোগ দেবে তারাও সেই খপ্পরে যেতে বাধ্য। আসল কথা গুপ্তসমিতির কাজে 'ক'বাবুর ওপর তাঁরা বিশ্বাস হারিয়েছিলেন।

আমি কিন্তু বিলেত যাবার আগে 'ক'বাবুর প্রতি কেন যে বিশ্বাস হারিয়েছিলাম, তা পূর্বে বলেছি। তখন 'গ'বাবুকেই অধিকতর যোগ্য নেতা বুঝেছিলাম। অথচ বিলেত থেকে ফিরে এসে সে কথা একেবারে ভুলে গেছলাম। এর বিশেষ কারণ এই ছিল যে, শিষ্য বা চ্যালাদের যখন নিজেকে বড়ো বলে জাহির করবার সাধ গজায়, তখন চিরাচরিত প্রথা অনুযায়ী গুরুর হরেকরকম অতিরঞ্জিত মহিমাকীর্তন করলেই অনেক স্থলে সে সাধ পূর্ণ হয়। আমারও দশা তাই হয়েছিল। প্যারিসে 'ক'বাবুকে শুধু ভারতের আদর্শ নেতা বলে ক্ষান্ত হতাম না, সর্বজ্ঞ মহাপুরুষ বলে, বিশেষ করে রাষ্ট্রনৈতিক ব্যাপারে অদ্বিতীয় বলেও, জাহির করতাম; আর লোকের কাছে আমার কদর বেড়ে যেত। সেই লোকগুলি অবশ্য ভারতবাসী।

তার পর বিদেশ থেকে 'ক'বাবুর যত কাছ-পানে আসতে লাগলাম, বেহুঁশে ততই ভক্তিটাও ক্রমে বেড়ে আসতে লাগল। বিদেশ যাবার আগে, কুইকসোটসুলভ স্বভাববিশিষ্ট বলে, বারীনের প্রতিও যে একটা বিদ্রুপের ভাব জেগে উঠেছিল, বিদেশ থেকে দেশে ফিরে, তাও ভুলে গেছলাম। তার কারণ কলকাতায় যতগুলি বৈপ্লবিক দল ছিল, তাদের মধ্যে একমাত্র বারীনই, ভালোই হোক বা মন্দই হোক, বিশেষ-কিছু বৈপ্লবিক কাজ করবার চেষ্টা (যা honest attempt বলে অভিহিত হয়েছিল) কচ্ছিল; দেশে ফিরে তা দেখে মনে হয়েছিল, যাই হোক, বারীন তো তবু কিছু করছে, অন্য সকলে তো খালি বকুনি দিয়েই ক্ষান্ত আছে। তা ছাড়া প্যারিসে থাকতে বারীনের চিঠি পেয়েছিলাম। তাতে অনেক কিছু ছিল; সব মনে নেই, খালি এইটে মনে পড়ছে যে, আমি ফিরে এলে 'কাজ' (action) আরম্ভ করতে যত টাকা

চাই, তা বারীন দেবে। আমি ফিরে এসে বুঝেছিলাম, আমার প্যারিসে আঁটা মতলব কাজে পরিণত করতে হলে আমার এক জন 'গৌরী সেন' দরকার, অথচ আমি বিলেত যাবার আগে নিজের এক কপর্দকও থাকতে, অন্যের কাছে হাত পাতব না বলে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছিলাম। কিন্তু যে সময়ের কথা লিখছি, সে সময় ভারতজুড়ে বৈপ্লবিক গুপ্তসমিতিতে ছেয়ে ফেলতে বিপুল অর্থের প্রয়োজন ছিল। কাজেই রুপেয়া দেনেওয়ালা চাই-ই। বারীন যে টাকার কথা লিখেছিল, তা যে সবটাই ফাঁকি, তা 'ক'বাবু আর বারীনের প্রতি নতুন করে গজানো বাড়াবাড়ি ভক্তির চাপে ধরতে পারিনি।

আরও একটা কথা, মনে মনে একটা বিপুল আশা পুষেছিলাম; বৈপ্লবিক গুপ্তসমিতিকে পূর্ণ সাফল্যে মণ্ডিত করব বলে যেসকল হিকমত শিখে এসেছিলাম, তা নেতাদের— বিশেষত 'ক'বাবু আর তাঁর বিশেষ কর্মী বারীনকে দেখালেই এমন খুশি হয়ে যাবেন যে, আমার আশা পূর্ণ করতে তাঁদের অদেয় কিছুই থাকবে না। সেইজন্যই কলকাতায় এসেই আগে 'ক'বাবু অথবা বারীনের সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছিলাম।

কিন্তু অন্য দু-জন বড়ো নেতার নিষেধ শুনে বারীনের সঙ্গে তখনকার মতো দেখা না করাই স্থির করলাম। তখুনি দেবব্রতবাবুকে নিষেধ করতে গিয়ে কিন্তু শুনলাম, বারীন পরদিন দেখা করবে বলেছে। পরদিন সকালে বাড়ি থেকে সরে পড়বার আগেই বারীন এসে হাজির।

দেশ থেকে আমার অনুপস্থিতির দেড় বছর যাবৎ, বারীন কত শত কাজ করেছিল; তার বিবরণ দিতে লাগল। মানিকতলার মুরারিপুকুর গার্ডেনে প্রকাণ্ড এক বোমার কারখানা খোলা হয়েছে, তাতে সব বোমার খোল ঢালাই হচ্ছে। দেওঘরে, না ওইরকম কোনো-একটা জায়গায়ও বোমার কারখানা খোলা হয়েছিল ইত্যাদি আরও অনেক কিছু শুনেছিলাম।

পূর্বদিন উক্ত নেতাদের কাছেও শুনেছিলাম, বারীন দ্বারা সে যাবৎ বিদেশিকে ইহলোক হতে সরাবার ও ডাকাতি করবার প্রায় শতাধিক সংকল্প ও চেষ্টা হয়েছে; সবই পূর্বোক্ত honest attempt-এ পরিণত হয়েছিল। নিজের কাজের হিসেব দিয়ে বারীনকে খুশি করতে, কম চেষ্টা করেছিলাম বলে মনে হয় না। সে খুব খুশি হয়েছিল বলে তো বুঝতে পারিনি। ইউরোপীয় ধরনে বৈপ্লবিক দল গঠনের কথাতেও তার আগ্রহ একটুও দেখতে না পেয়ে বড়ো আশ্চর্য বোধ হয়েছিল।

তার পর আমি সপ্তাহখানেক ধরে অনেক দলের নেতাদের মতামত অনুসন্ধান করে বুঝলাম, সবাই নিজেদের দলগঠন-প্রণালীতে কোনোরকম বিশেষ পরিবর্তন করতে নারাজ। এটা আমার পক্ষে বড়োই হতাশার কারণ হয়েছিল। এটা তখন জানতাম না যে, এদেশের অতি বড়ো নেতা হতে শুরু করে গেঁয়ো মোড়ল পর্যন্ত সকলেই অন্যের প্রদর্শিত কোনো নতুন মত বা পন্থা, যতই যুক্তিসংগত হোক, অথবা হাতে-কাজে করে ফল দেখিয়ে দিলেও, তা নিতে একেবারে অনভ্যস্ত।

যাই হোক, এইসব মুশকিলে পড়েই পূর্বোক্ত 'গ'বাবুর অভিমত অনুযায়ী পৃথকভাবে দল গঠন করতে সংকল্প করলাম। বারীন খুব কাজের লোক বলে তখন জানলেও, কোনো চেষ্টা সফল কী করে করতে হয়, তা সে কিছুতেই জানতে চাইত না; অথবা তার সকল চেষ্টা আখেরে ব্যর্থ হয় ভেবে অগত্যা 'ক'বাবু ও বারীনকে ছেড়ে দিতে মনস্থ করেছিলাম। অবশেষে সকল দল থেকে কর্মী ভাঙিয়ে নিয়ে একটা সর্বাঙ্গসুন্দর সমিতি গঠন শুরু করা স্থির হল। তদনুযায়ী 'গ'বাবু এক জন ধনী নেতার হাতে আমায় তুলে দিয়ে কলকাতা ছেড়ে চলে গেলেন। সেই অতিবড়ো ধনীমশায় তখন দানশীলতার পরাকাষ্ঠা হঠাৎ দেখিয়ে ফেলেছিলেন; তাই বাংলা দেশে এক জন বড়ো স্বদেশপ্রেমিক নেতা বলে ষোড়শোপচারে পূজা পাচ্ছিলেন। তাঁকে আমার সমস্ত মতলব খুলে বলে ফেলেছিলাম। বেশ বুঝেছিলাম, তা শুনে তিনি

বিলক্ষণ ভয় পেলেন। প্রায় পনেরো দিন তাঁর কাছে যাওয়া-আসা করেছি। অনেক ঘুরিয়েফিরিয়ে ছিলেন, বচনও দিয়েছিলেন অনেক। তার মধ্যে বেশির ভাগ ছিল 'ক'বাবুর নিন্দা অথচ আসল কাজের জন্য টাকাকড়ি দেবার নামটিও করতেন না। তখন বুঝলাম, ইনি সত্যই বারীনের বর্ণিত আরামকুর্শিতে বসে চায়ের পেয়ালায় চুমুক দেনেওলা ভারত উদ্ধারকারী অকালকুষ্মাণ্ড নেতা।

এই ব্যাপারের পর সদ্য বিলেতে অর্জিত আমার উদ্যম উৎসাহ কর্মপ্রবণতা আদি সবই আরও উধাও হয়ে গেছল। এর পরে ধারকর্জ করেও অত টাকার জোগাড় করতে না পেরে, অগত্যা নতুন দল গড়বার খেয়াল তখনকার মতো ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছিলাম।

এইরকম বৃথা কাজে আর তার পর কলকাতায় থাকার ছুতোস্বরূপ একটা ব্যাবসার সাজগোজ করে নিতে প্রায় এক মাস কেটে গেল। ইতিমধ্যে 'ক'বাবুও কলকাতায় এসে পড়লেন। দেখা করতে গেছলাম ভক্তি উপহার দিতে। তিনিই ছিলেন শেষ আশার স্থল; দুর্ভাগ্য এই যে, অতিকষ্টে দু চারটি মাত্র কথার উত্তর দিয়ে বিদায় দিলেন; দেখে তখন অবাক হয়ে গেলাম। অবিনাশভায়াকে আড়ালে জিজ্ঞেস করে জেনেছিলাম, তিনি ধ্যানধারণা নিয়েই নাকি সর্বদা মগ্ন থাকেন, কারোর সঙ্গে বড়ো-একটা কথা বলেন না।

যাই হোক, আমি কী করব, জিজ্ঞেস করাতে বলেছিলেন— বারীনের কাছে যেতে। অগত্যা বারীনের দলে আবার যোগ দেওয়া ভিন্ন গত্যন্তর ছিল না। বারীন কিন্তু এর আগেই কয়েকবার আমার বাড়ি এসেছিল, আর আমার বিলেতে অর্জিত 'বিদ্যে চটপট মেরে নিতে' স্বনামধন্য উল্লাসভায়াকেও পাঠিয়েছিল। ইউরোপ থেকে বৈপ্লবিক কাজের জন্য নিতান্ত আবশ্যক যতসব বই আর কাগজপত্র এনেছিলাম, সে সমস্তই বারীন ক্রমে আদায় করে নিয়েছিল। আমার খুবই আশা হয়েছিল, বারীন ওই-সকল পড়ে পাশ্চাত্য প্রথায় তার গুপ্তসমিতিকে নতুন করে গড়ে তুলবে। কিন্তু তা হল না। একমাত্র বোমা তয়েরের হিকমত ব্যতীত বাকি যত-কিছু, এমনকি, বৈপ্লবিক দল গঠনের কায়দাকানুন পর্যন্ত এদেশের পক্ষে একেবারে নিরর্থক, শুধু তাই নয়, অনিষ্টকর বলেই সে শিষ্যমহলে জাহির করেছিল। তার মতে ওসব জড়বাদীদের দেশেই খাটে। এ দেশ ধর্মের দেশ, এখানে কিছুতেই পাশ্চাত্য কোনো-কিছু খাটবে না। আমাদের দেশে এবংবিধ dogma-র কাছে যুক্তিতর্ক খাটবে না। অথচ বিপ্লবের সমস্ত ব্যাপারটাই বিদেশীয় অনুকরণ।

তবে আমি বারীনের গোঁড়া ভক্ত হতে পারলে এই বিলেতি প্রণালীটা নিলেও সে নিতে পারত। ভক্তের মতো ভক্ত সাজতে পারলে, ব্যক্তিবিশেষকে, এমনকি suggestion-phobia-গ্রস্ত গুরুকেও যে স্বমতে আনা যায় বা তাকে দিয়ে আবশ্যকমতো কোনো-কিছু করিয়ে নেওয়া যেতে পারে, আমার সে জ্ঞান তখনও গজায়নি।

সে যাই হোক, আমার কাছে খালি বোমার বিদ্যেটা মেরে নেবার জন্য যে বারীণ একটু বেশিরকম ব্যস্ত হয়ে পড়েছিল, তার কারণ— বোমা ফাটাতে পারলে হাজার হাজার টাকা পাবার অঙ্গীকার দু তিন বছর যাবৎ পেয়ে আসছিল, কিন্তু বোমাও ফাটে না, টাকাও আসে না। অথচ টাকার অভাবটা হয়েছিল বড়ো বেশি।

যে সময়ের কথা লিখছি (১৯০৮) তার মাসকতক আগে শ্রীমান উল্লাসকর প্রেসিডেন্সি কলেজে সাহেব ঠেঙিয়ে কোনোগতিকে বারীনের হাতে এসে পড়েছিল। আমার সঙ্গে প্রথম দর্শনেই, গান গেয়ে হেসে-খেলে নেহাত আপনজন হয়ে গেছল। যাই হোক, আমার মনে হয়, উল্লাসের মতো এত সরল, মহৎ, কপটতার লেশমাত্রহীন, ভাবপ্রবণ যুবককে বৈপ্লবিক তাণ্ডবলীলার কর্মী করা যে নিতান্ত হৃদয়হীনতার ও নির্বুদ্ধিতার কাজ হয়েছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

উল্লাসভায়ার সঙ্গে আলাপের দু এক দিন পরে স্বনামধন্য শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এক অদ্ভুত বেশে দেখা দিলেন। তাঁর শ্রীচরণ দুখানি ছিল পাদুকাহীন। শ্রীঅঙ্গের অধোভাগে ছিল মুক্তকচ্ছ করে পরা গৈরিক বাস; তদূর্ধ্বে গৈরিক পাঞ্জাবি; আর সযত্নে মুণ্ডিত-মস্তকে ছিল টিকি। দাড়ি-গোঁফ যে ছিল না সে কথা বলাই বাহুল্য। এ হেন ভণ্ডামির ঠাট দেখে ভক্তি উথলে না উঠলেও, (সত্য বলতে কী, বরং ভয়ংকর বিটকেল বলে মনে হলেও) একটুখানি আলাপের পর মনে করতে বাধ্য হয়েছিলাম যে, বাংলা দেশে গুপ্তসমিতির সভ্য হবার মানুষ যদি কেউ থাকে তো এই ইনিই তাদের মধ্যে উপযুক্ততম। আলাপের পর দেখেছিলাম, অন্য বিষয়ে যেমন, ভোজনেও ওঁর toleration-এর অন্ত ছিল না। অহিন্দুর স্পৃষ্ট, প্যাঁজ দিয়ে রাঁধা মাংস, কিছুতেই তাঁর অরুচি বলতে শুনিনি; উপেন ১৯০৭ সালের গোড়াতে বৈপ্লবিক ব্যাপারে যোগ দিয়েছিলেন।

কলকাতায় তখন যে-কটা বৈপ্লবিক দল ছিল, তার কোনোটাই কাজের কোনো ধার ধারত না। বিপ্লব-সম্বন্ধীয় কাজের মধ্যে কেবলমাত্র পাশ্চাত্য বা 'আনন্দমঠ'-এর প্রথায় terroristic কাজ করবার যাকে বলে ভয়ংকর চেষ্টা, তা বারীনেরই ছিল। দেশে বিপ্লব সংঘটিত করতে হলে terroristic কাজ ছাড়া অবশ্যকরণীয় সদ্য আবশ্যক অন্য কাজ যে থাকতে পারে, তা হয়তো বারীন মনে করত না, কাজেই বোধ হয়, 'ক'বাবুও করতেন না; অথবা করণীয় বলে যা-কিছু মনে করতেন, তা হল কেবল স্বদেশি সনাতন আধ্যাত্মিক প্রথায় সুসম্পন্ন হবে মনে করেই মুরারিপুকুর বাগানবাড়িতে কর্মীদের ধর্মের সাধনভজন শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা করেছিলেন, তার গুরু নিযুক্ত হয়েছিলেন উপেনভায়া। এই ব্যবস্থা কতকটা বাধ্যতামূলক অর্থাৎ compulsory ছিল।

যাই হোক, terroristic কর্মের চেষ্টা থাকলেও তা সফল করবার মতো ইচ্ছা যে বারীনের খুব ছিল, তার প্রমাণ বড়ো-একটা পাওয়া যায়নি। honest attempt-তক করবার অধিকার আমাদের আছে তার পর 'মা ফলেষু কদাচন'। গুপ্তসমিতির অতি গুহ্য কাজের জন্য মুরারিপুকুরের যে বাগানবাড়ি মনোনীত করা হয়েছিল, (১৯০৭ সালের মাঝামাঝি) তা এমন স্থানে অবস্থিত ছিল, যেখানে নতুন লোক কেউ গেলে এলে, নিকটবর্তী লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ না করে পারে না। তা ছাড়া সেখানে বসতি এমন বিরল যে, ওই বাগানে কে কী করছে না করছে, স্থানীয় লোকের তা জানবার কৌতূহল হওয়াই স্বাভাবিক। অধিকন্তু আরও অসুবিধা অনেক সেখানে ছিল। তার পর যেসকল জিনিস সেখানে তয়ের করবার চেষ্টা হচ্ছিল, সে সমস্তই অকারণ কষ্ট বলে তখন বিবেচিত হয়েছিল। এইসকল কারণে শহরের যেখানে ঘন বসতি, সেইখানে একটা সুবিধামতো বাড়িতে বোমা তয়েরের আড্ডা বা স্কুল করতে বারীনকে অনেক কষ্টে রাজি করা হল।

বাড়ি খোঁজা হতে লাগল। ইতিমধ্যে চন্দননগরের মেয়রকে মারবার জন্য একটা বোমার ফরমায়েশ বারীন করে পাঠাল। প্রথমত, আমি কিছুতেই তখন বুঝতে পারিনি যে, নতুন ছাঁচে আমাদের সমিতিকে রীতিমতো গড়বার, terroristic কাজে যথেষ্ট লোককে সুচারুরূপে শিক্ষা দেবার, সমস্ত ভারতে ওইরূপ শিক্ষিত লোকের দ্বারা গুপ্তসমিতি গঠন করবার এবং সকল প্রদেশে এক সঙ্গে terroristic work করবার মতো সামর্থ্য লাভ করবার আগে, কেন বৈপ্লবিক হত্যা করবার খেয়াল 'ক' বাবুর মতো মানুষের মাথায় জেগে উঠেছিল। এখন মনে হচ্ছে, ভারতের মতো ধর্মের দেশে ওইসব ব্যাপার যে একেবারে অসম্ভব, সে জ্ঞান তখনও কর্তাদের গজায়নি। গজালে নিশ্চয়ই তখন তাঁরা বোমা-ব্যাধিগ্রস্ত হতেন না। যাই হোক, মাসকতক পরে কিন্তু অনেকের সে জ্ঞান বিলক্ষণরূপে হয়েছিল জেলে।

দ্বিতীয়ত, এত লোক থাকতে বেচারা ফরাসি মেয়র ম. তার্দিভেলের ওপর পছন্দটা গিয়ে পড়ল কেন? মনে হচ্ছে, তখন এর প্রতিবাদ করেছিলাম। কারণটা যা শুনেছিলাম তা বিশেষ কিছু নয়*; তবু

* চন্দননগরে বিনা পাসে যে কেউ নাকি রাইফেল, পিস্তল আদি যে-কোনো আগ্নেয়াস্ত্র কিনতে পারত। এ অধিকার হতে বঞ্চিত করবার জন্য ওই সময়ে, ফরাসি মেয়র—ম. তার্দিভিল এক আইন প্রবর্তনের চেষ্টা করেছিলেন। তাই তাঁকে দণ্ড দেবার জন্য বোমার ব্যবস্থা হয়েছিল। এ বোমা যখন তয়ের হয় তখন অন্য অনেকের সঙ্গে সেখানে নরেন গোঁসাইও ছিল।

কেন ওই হত্যা ব্যাপারে সাহায্যে করেছিলাম, তা এখন বেশ বুঝতে পারছি। সদ্য প্যারিসে অর্জিত বিদ্যেটা জাহির করবার প্রবৃত্তি এমন উৎকট হয়ে উঠেছিল যে, তার প্রকোপে অন্য সব আদর্শের ধারণা অর্থাৎ বিপ্লববাদের উদ্দেশ্য প্রচার, নিখিল ভারতীয় বৈপ্লবিক কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা ইত্যাদির খেয়াল সব তলিয়ে গেছল। তার পর 'ক'বাবুর ওপর অন্ধবিশ্বাস; অতবড়ো জ্ঞানী লোক যখন আদেশ দিয়েছেন তখন এটা উচিত না হয়ে যায় না। পরে এই কাজটার অন্যায্যতা সম্বন্ধে বাদানুবাদ করতে গিয়ে শুনেছিলাম, 'ক'বাবুর কাছে 'বাণী' এসেছিল। সেই 'বাণী' বারীন জারি করেছিল। এই বাণীর কথা পরে বলব।

যাই হোক, আমার তখন খুব জ্বর, আর তখনও বোমা তয়েরের তোড়জোড় কিছুই জোগাড় করা হয়নি, অথচ বোমা চাই সন্ধের আগে। যা মালমশলা মুরারিপুকুরে ছিল, আর. ডি. ওয়ালডির দোকানে যা পাওয়া গেল, তাতেই একটা বোমা তয়ের হল। বোমা ফেটেও ফাটল না, কিন্তু এর ফল হল উলটো।

নারায়ণগড়ে লাটসাহেবের গাড়ির তলায় যে বোমা ফেটেছিল তার তদন্ত ও আদালতে তার বিচার বিভ্রাট ওই সময়ের কিছু আগে খতম হয়ে গেছল। আগেই লিখেছি, জন কতক নাগপুরি কুলি অপরাধী সাব্যস্ত হয়েছিল। ভারতীয় শাসনযন্ত্রের কর্ণধার যাঁরা, তাঁরা ওই বেঙ্গল পুলিশের নির্ধারণে সন্দিহান হয়ে শ্রীযুক্ত শশিভূষণ দে নামক এক জন ভারতীয় পুলিশ বিভাগের ইন্‌স্পেকটারকে বিশেষভাবে তদন্তের জন্য, বোধ হয়, এই চন্দননগরের ঘটনার পরেই পাঠিয়েছিলেন। যাই হোক, শশীবাবু বোধ হয়, চরমপন্থী নেতাদের ওপরেই আগে দৃষ্টিপাত করেছিলেন। রজনী মিত্র কি ওইরকম নামের এক জনকে, দেশের দুঃখে তার বিগলিত প্রাণটা, দেশের জন্য উৎসর্গ করতে 'ক'বাবুর কাছে নাকি পাঠানো হয়েছিল। তিনি মুরারিপুকুরে বারীনের কাছে তাকে পাঠান।

এই সময় কলকাতায় যে-কটা দল ছিল, প্রায় সব দলেরই কর্মী অপেক্ষা নেতা-উপনেতার সংখ্যা অধিক ছিল। তাই কর্মীর জন্য সব দলই হ্যাংলা হয়ে ছিল। বারীনের দলেরও সেই দশা। বারীন উক্ত রজনীকে পেয়ে লুফে নিয়েছিল। অর্থাৎ 'আনন্দমঠ'-এর সত্যানন্দি কায়দায়, সম্মোহিত করবার জন্য কারখানা দেখাতে লেগে গেল, কোথায় বোমা মজুত ছিল, কোথায় রিভলবার, কোথায় রাইফেল, কোথায় বোমার খোল ঢালাই হয় আর কোথায় সিদ্ধিলাভের জন্য নাক-টিপে সাধনা করা হয়। সে কিন্তু আর দ্বিতীয়বার বাগানে দেখা দেয়নি। তার পর থেকে যারা বাগানে যাতায়াত করেছিল, তাদের পেছনে বা বাগানের মানুষেরা যেখানে যেখানে যেত, সেইখানেই পুলিশের চর বিরাজমান থাকত।

অনেক চেষ্টার পর ভবানীপুরে একটি বাড়ি পাওয়া গেল। ১৯০৮ খ্রিস্টাব্দের বোধ হয় মার্চের মাঝামাঝি বোমা শেখাবার স্কুল হল সেইখানে। চার-পাঁচ জন ছাত্র প্রথম জুটেছিল। তার মধ্যে এক জন কানাইলাল। তার সঙ্গে এইখানে প্রথম আলাপ হয়। মুখে কথা ছিল না বললেই হয়, কিন্তু খুব বুদ্ধিমান অথচ ম্যালেরিয়া-রোগী। আর ছিল শ্রীমান ইন্দুভূষণ রায়, যে পোর্টব্লেয়ারে গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করেছিল এবং পূর্ব-উল্লিখিত নিরাপদ ওরফে নির্মল রায় সেও নাকি এখন আর ইহলোকে নেই। এখানে চাকরবাকর রাখা হত না। সকলে পালা করে রান্নাবান্নার কাজ সেরে নিত। আমি দু এক দিন কখনও কখনও ওই আড্ডাতে থেকে যেতাম। সকালে অদ্ভুত রকমের— হালুয়া নামের অপভ্রংশ খানিকটা দিয়ে জলযোগ হত। দু-বেলা ভাতের যা ব্যবস্থা, তার চেয়ে জেলখানার সাধারণ কয়েদিদের যা খেতে দেয়, তা অনেক ভালো বলতে হবে। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য যা, তা হচ্ছে থালার প্রতিভূ মাটির সানকি; খাওয়া হয়ে গেলে সব-কখানা সানকি তুলে নিয়ে পায়খানা আর চৌবাচ্চার মাঝখানকার সংকীর্ণ স্থানটাতে ফেলে রাখা হত। তরকারির তেল মেখে সানকিগুলি এমনি হয়ে থাকত যে, জলে ধুতে গেলে পরিষ্কার তো হতই না, অধিকন্তু তেলে-জলে মিলেমিশে বিতিকিচ্ছিরি হয়ে যেত। তাই একখানি ন্যাকড়া রাখা

হয়েছিল, যা দিয়ে দিন দিন ওই সানকিগুলি মোছা হত। তবে একটা বিশেষ সুবিধা এই ছিল যে, সানকিগুলির রং ছিল মিশমিশে কালো। যাই হোক, এই প্রথা মুরারিপুকুর বাগান থেকে আমদানি করা হয়েছিল। বিছানা ছিল কত কালের তেলচিটে মাখানো বালিশ আর মাদুর।

বোমা দিয়ে মানুষ মারবার করদানি শেখার জন্য বারীনের নিকট দু এক জন যুবক চেয়েছিলাম। প্রথমে পাঠিয়েছিল শ্রীমান সুশীলকে। সেই সঙ্গে প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেট কিংসফোর্ডসাহেবকে মারবার আদেশ দিয়েছিলেন কর্তারা। তাঁর অপরাধ, তিনি স্বদেশি মোকর্দমার আসামিদের দণ্ড দিতেন। সাহেব কোন্ হোটেলে থাকেন, কোন্ পথে কখন আদালতে যান, কোন্ পথে আসেন, আর শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র লাহিড়ী মহাশয়— যাঁকে আমরা গোয়েন্দা বিভাগের আসল মালিক বলে ধরে নিয়েছিলাম, তিনি কোথায় থাকেন, সন্ধ্যার পর কোথায় যান, তাঁর গতিবিধি ইত্যাদি অনুসন্ধানের কাজে সুশীল যেরকম বুদ্ধিমত্তা ও কর্মকুশলতার পরিচয় দিয়েছিল, তা দেখে মনে হয়েছিল, এমন ছেলে বেঁচে থাকলে এক জন প্রকৃত কাজের নেতা হবে। তবে কেন এরূপ নিশ্চিত মৃত্যুর ব্যাপারে ভবিষ্যতের আশাস্থল এমন এক জনকে বারীন মনোনীত করল? কারণটা যা শুনেছিলাম, তার মর্ম এই— মেদিনীপুর সমিতির এক জন পুরোনো সভ্য নিরাপদ ওরফে নির্মল রায় বৈপ্লবিক কাজের কীরকম যোগ্য কর্মী ছিল, তা পূর্ব পরিচ্ছেদে বলেছি। যে সময়ের কথা লিখছি, সে সময় সে মুরারিপুকুর বাগানে এক জন বিশেষ কর্মী ছিল। তাকেই প্রথমে আমাদের সমিতির কে কী করছে, না করছে আমায় জানাবার জন্য বৈপ্লবিক দলের গোয়েন্দাস্বরূপ নিযুক্ত করেছিলাম। এত লোক থাকতে সুশীলের মতো ছেলেকে হত্যাকারী মনোনীত করবার কারণ তাকে জিজ্ঞেস করে জেনেছিলাম যে, যারা মুরারিপুকুরের মঠে ধর্মসাধনা করত না, তারা যত কাজের লোকই হোক না কেন, বৈপ্লবিক কাজে অযোগ্য বলে বিবেচিত হত। সুশীলও কদিন নাক টিপেছিল, কিন্তু তার ফলাফলটা নাকি সহজ সত্য কথায় প্রকাশ করে বলে ফেলত। কাজেই তার নাম খরচের খাতায় উঠেছিল।

উৎস : *বাংলায় বিপ্লব প্রচেষ্টা*।

বৈপ্লবিক হত্যার প্রথম উদ্যম

হেমচন্দ্র কানুনগো

বাংলা প্রদেশকে দু-ভাগ করবার পর পূর্ববঙ্গের লাট হয়েছিলেন স্যার ব্যামফিল্ড ফুলার সাহেব। তিনি ভারী খোশমেজাজি লোক ছিলেন। লোক তাঁকে পথেঘাটে সেলাম না করলে তিনি ভারী চটে যেতেন। কোনো কোনো স্থানে 'বন্দেমাতরম' বলা দণ্ডনীয় হয়েছিল। স্কুল-কলেজের অনেক ছেলে এইজন্য অনেকপ্রকার দণ্ড ভোগ করেছিল। কোথাও কোথাও ছাত্রদের কোনোপ্রকার রাষ্ট্রনৈতিক আন্দোলনে যোগ দেওয়া নিষিদ্ধ হয়েছিল। এইরকম ছোটোখাটো ব্যাপার নিয়ে পূর্ববঙ্গে ও আসামে হরেকরকম অত্যাচার চলছিল।

সেই সময় (১৯০৬ খ্রিস্টাব্দের এপ্রিল) 'পুণ্যে-বিশাল-বরিশালের' প্রাদেশিক সম্মিলনীতে যে স্মরণীয় দুর্ঘটনা ঘটেছিল, তাতে বাংলার রাষ্ট্রনৈতিক আন্দোলনের আদিগুরু সুরেন্দ্রনাথের গ্রেপ্তার, বিপিনচন্দ্র, ভূপেন্দ্রনাথ, উপাধ্যায়, কাব্যবিশারদ ও অন্য অনেক নেতা এবং ডেলিগেটদের নাকি সিপাহির রেগুলেশন ডান্ডার—কাউকে কাউকে-স্বাদ আর কাউকে বা স্বাদের বিভীষিকা—উপভোগ করতে হয়েছিল। শুধু তাই নয়, পৈতৃক প্রাণটা বাঁচাবার জন্য খানায় পড়তে, প্রাচীর ডিঙোতে আর পগার পার হতেও হয়েছিল। অধিকন্তু বহুকালের জন্য সেখানে 'পিটুনি পুলিশ'ও বসানো হয়েছিল। এর ফলে এই ঘটনার ঠিক পরেই কিন্তু বিপ্লববাদের মন্ত্রগুলি লোকের কানে সহজে ঢুকত; এমনকি, অনেক হোমরাচোমরা মডারেটও বিপ্লবের খেয়ালে সই দিতেন।

এইসকল কারণে দেশের অনেক লোকের জাত-ক্রোধটা ফুলার সাহেবের ওপর ঘনিয়ে উঠেছিল। ফুলার সাহেবকে কেউ বধ করেছে, ঘরের দরজা ভেজিয়ে আরাম-কুরশিতে বসে এই খোশ খবরটা শোনবার জন্য তখন অনেক গণ্যমান্য লোক কায়মনোবাক্যে প্রত্যাশা করছিল। এমনকি ঘাতককে দুপাঁচ হাজার বকশিশ দেওয়ার অঙ্গীকারও দুচার জন করে ফেলেছিলেন।

আমাদের বারীন এ সুযোগ ছাড়বার পাত্রই ছিল না। কে এক জন বারীনের হাতে নগদ ১ হাজার বায়নাস্বরূপ অগ্রিম দিয়ে ফেলেছিলেন। টাকা বের করবার নেতৃসুলভ শক্তিলাভের সাধনা সে সবে শুরু করেছে।

নেপালের রাজার অস্ত্রশস্ত্র তৈরির কারখানায় নাকি একজন বাঙালি প্রধান মিস্ত্রি ছিল। তাকে দলভুক্ত করে তার সব বিদ্যে মেরে নিয়েছে, বারীন সুবিধামতো লোকের কাছে এইরকম বলত। এই বিদ্যে মেরে নেওয়া কথাটা বারীনের মুখে অনেক বার শুনেছি। আসলে একটি তখনকার কলেজ ক্লাসের কেমিস্ট্রি-জানা ছেলের সাহায্যে সে 'কলেরিয়া'পটাশের একরকম বিস্ফোরক তয়ের করেছিল। তাই দুটি প্রকাণ্ড লোহার ফাঁপা গোলার মধ্যে পুরে বোমা বলে জাহির করত। বিশেষ দরকার হলে তার মধ্যে থেকে, একটু গুঁড়ো বের করে দেশলাই ধরিয়ে দিত, আর অমনি ফোঁস করে জ্বলে উঠত। এই দেখে, আর খানিক বচনের তুবড়ি শুনেই অতি সন্তর্পণে ধনীরা মনে করতেন, ইংরেজদের দফা এইবার রফা। দেখছি, এই বোমা জিনিসটার একটা জাদুকরী শক্তি আছে। অতি বড়ো বুদ্ধিজীবী লোকও বোমা দেখলেই কেমন ঘেবড়ে যেতেন। যুক্তিতর্ক সব ঘুচে গিয়ে মুখখানা কেমন মুষড়ে যেত। বিপ্লবীদের প্রকৃত মুরোদ কতটুকু, বিশেষ করে বোমাটার শক্তি কতটুকু, সে সন্দেহের আর স্থান থাকত না। যাই হোক, ফুলার লাটকে মারতে না পারলে যে ওই ১ হাজার টাকা ফিরিয়ে দিতে হবে, এ শর্তটা করিয়ে নিতে কিন্তু ভুল হয়নি।

এই হাজার টাকা পেয়ে দুটি তথাকথিত বোমা আর দুটি রিভলবার নিয়ে বারীন reconnoiter (অর্থাৎ বধ্যকে আক্রমণের স্থান ও সুযোগাদি অনুসন্ধান) করবার জন্য ফুলার লাটের গ্রীষ্মাবাস শিলং-এ যাত্রা করল। বন্দোবস্ত করে গেল, সেখান থেকে টেলিগ্রাম করলে কলকাতা থেকে এক জন হত্যাকারী পাঠানো হবে।

অনেকের ধারণা আছে যে, লটারি করে হত্যাকারী নির্বাচিত হত। এ কথা সম্পূর্ণ মিথ্যা। তখন নেতা-উপনেতার অভাব ছিল না বটে, কিন্তু কাজের লোক ছিল না বলেই সত্য কথা বলা হয়। বাংলা দেশের নানা স্থানে, বিশেষ করে বম্বে, সেন্ট্রাল প্রভিন্সে, উড়িষ্যায়, বিহারে ও মাদ্রাজে গুপ্তসমিতির বড়ো বড়ো কেন্দ্র ছিল বলে বলা হত। পরে জানতে পেরেছিলাম ও নিজেও অনেক স্থানে পরে গিয়ে দেখেছি, বোধ হয়, বম্বে ছাড়া অন্য কোথাও উল্লেখযোগ্য তেমন-কিছুই ছিল না। বিপ্লববাদে একটু-আধটু সহানুভূতিবিশিষ্ট দু এক জন মাত্র লোকের যেখানে সন্ধান পেয়েছিলেন, কর্তারা সেই স্থানটাকে মস্ত কেন্দ্র বলে ধরে নিয়েছিলেন।

দুঃসাহসের কাজ করবার একটা স্বাভাবিক প্রবৃত্তি অনেকের মধ্যে আছেই। বিশেষত স্বদেশের জন্য প্রাণ দেওয়ারূপ বীরত্ব দেখাবার ঝোঁক সদ্য নতুন করে তখন বিদেশ থেকে আমদানি হয়েছিল। উত্তেজনার মুখে স্বদেশপ্রেমের দু চার জন নেতার সামনে এই বীরত্ব দেখাবার আন্তরিক প্রবৃত্তি খড়ের আগুনের মতো দপ করে জ্বলে উঠতে পারে সত্য; এবং সেই মুহূর্তে হাতে একটি বোমা বা পিস্তল দিয়ে, তক্ষুনি স্বদেশ-উদ্ধারের জন্য একটি হত্যাকাণ্ড ঘটাতে দিলে যত সহজে তা সুসম্পন্ন হতে পারে, একটু সময় দিলে আর তা হয় না। তখন এই ধাতের বীরত্ব দেখাবার প্রবৃত্তির বদলে প্রাণের মায়া অন্য কোনো নিরাপদ (non-violent) প্রবৃত্তির বেশ ধরে মহত্তর হয়ে দেখা দেয়। যে দেশে এই বীরত্ব খুব সস্তা, অর্থাৎ পাশ্চাত্য দেশের লোকের মধ্যেও অনেক স্থলে এই ভাবটা ধরা পড়ে; আমাদের দেশের তো কথাই নেই। এই হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে যুদ্ধের হত্যাকাণ্ডের তফাত বিস্তর; তথাপি যুদ্ধের সময় নিয়ত উত্তেজনাটা জাগিয়ে রাখবার জন্য কত চেষ্টাই না করা হয়।

সে কথা থাক, এখন আসল কথা বলি। প্রথমে নাকি মেদিনীপুরের এক জন বিপ্লবপন্থী যেতে রাজি হয়েছিলেন; পরে কী কারণে তিনি যেতে পারলেন না। তখন ক্ষুদিরামের নাম করা হল। পূর্বোল্লিখিত পতিতার সহিত তার সম্ভ্রবের কথা আমি ইতিপূর্বে কোনো নেতার কাছে বলেছিলাম।

সেজন্য হোক বা ছেলেমানুষ বলেই হোক, অথবা অন্য কোনো কারণেই হোক, তাকে তখন পাঠানো কারও মত হল না। তার পরও মেদিনীপুর সমিতির অন্য এক জন যেতে রাজি হল। তখন স্থির হল, বারীনের 'তার' এলেই তাকে শিলং যেতে হবে।

সে ছিল সংসারী মানুষ, তার ছেলেপিলেও কয়েকটি ছিল। পুরোপুরি নিজেকে বিপ্লবের কাজে লাগাবার জন্য সে চাকরি থেকে লম্বা ছুটি নিয়েছিল। কিন্তু সেই সময় তার ছেলের চিকিৎসার জন্য কলকাতায় অনেকদিন যাবৎ সপরিবারে থাকতে হয়েছিল। তাই কলকাতার নেতাদের বৈঠকে যাওয়া-আসা করত। সেখানে তখন ফুলারবধের মন্ত্রণা চলছিল। তার ফলে সে ফুলারবধের ভার পেল এবং সঙ্গে সঙ্গে ছেলেপুলেদের দেশে রেখে এল। চার-পাঁচ দিন অপেক্ষা করবার পর তাকে পাঠাবার জন্য শিলং থেকে 'তার' এল।

সেই দিন সন্ধ্যার ট্রেনে সে গোয়ালন্দ যাত্রা করল। সেটা বোধ হয়, ১৯০৬ খ্রিস্টাব্দের মে মাসের প্রথম সপ্তাহ। সঙ্গে নিয়েছিল ২টি রিভলবার, এক সুট সাহেবি পোশাক আর পথের আবশ্যকীয় অন্য দু-একটি জিনিস। সন্ধেবেলা তাকে শিয়ালদা স্টেশনে পৌঁছে দিতে গেছলেন পূর্বোল্লিখিত শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত। ভূপেনবাবু সেদিন সারা বিকেলবেলাটা তাঁর সঙ্গে ছিলেন। পরস্পরের মধ্যে একটা অনাবিল শ্রদ্ধার ভাব ছিল; তথাপি উভয়ের মধ্যে চিরবিদায়সূচক কাঁদুনির অভিনয় হয়নি বটে, কিন্তু স্টেশনের গাড়ি ছাড়বার অব্যবহিত পূর্বে ভূপেনবাবু সেই মৃত্যুপথের যাত্রীকে একটা ভারী অদ্ভুত রহস্যজনক অনুরোধ করেছিলেন। খুব গম্ভীরভাবে অত্যন্ত আগ্রহের সহিত তিনি তাকে বলেছিলেন, 'দেখ ভাই, তুমি তো শীগগির মরবেই, মৃত্যুর পর যদি কিছু থাকে, তবে কোনো গতিকে আমাকে একটিবার জানাবে, এই প্রতিজ্ঞা করো'। যদিও আত্মা, পরকাল, স্বর্গ আদি সম্বন্ধে তার তেমন বিশ্বাস ছিল না, তথাপি সে বিষয়ে ভূপেনবাবুর সঙ্গে ঝগড়া না করে অসংকোচে বলেছিল— পরকালে যদি কিছু থাকে, আর তা মর্তলোকে জানালে যদি তার অনন্ত কুম্ভীপাকেও চিরকাল বাস করতে হয়, তা সত্ত্বেও সে ভূপেনবাবুকে এ তথ্য নিশ্চয় জানাবে। কিন্তু সে প্রতিজ্ঞা সে এখনও পালন করতে পারেনি। কারণ, সে এখনও মরেনি। ভূপেনবাবুকে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছে, এখনও সে তা ভোলেনি; মৃত্যু পর্যন্ত ভুলবেও না। তার মৃত্যুর পর যদি ভূপেনবাবু কিংবা মর্তলোকের কেউ সর্বসাধারণের পক্ষে প্রমাণযোগ্য পরলোকের কোনো তথ্য না পান, তবে নিশ্চয় জানবেন যে, মৃত্যুর পর আর কিছুই নেই— মৃত্যুই শেষ।

তার পর ট্রেন তো ছেড়ে দিল, কিন্তু ভূপেনবাবুর সেই পরকাল-সমস্যা তার মনকে এমনই পেয়ে বসল যে ট্রেনের তৃতীয় শ্রেণির হরেকরকম বিড়ম্বনা তাকে একটুও জ্বালাতন করতে পারেনি। পরে শিলং পৌঁছোতে আরও পাঁচ দিন লেগেছিল। শিলং পৌঁছোবার ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই যে তাকে মরতে হবে অথবা ফাঁসির আসামি হতে হবে, এটা সে একেবারে স্থির করে ফেলেছিল। বারীন সেখানে সমস্ত ঠিক করে রাখবে। নির্দিষ্ট হত্যাকারী গেলেই তাকে স্থানটি দেখিয়ে দেবে, সময়টা বলে দেবে, লাটসাহেবকে চিনিয়ে দেবে, শেষে বোমাটি তার হাতে তুলে দেবে! বড়োজোর এক ঘণ্টা অপেক্ষার পর লাটসাহেব দর্শন দেবেন, পরক্ষণেই দুড়ুম।

তার পর দুটি রিভলবারের বারোটা গুলি শেষ হওয়ার আগেই হয়তো অনুধাবনকারীর গুলিতে মৃত্যু অথবা পরে ধৃত হয়ে ফাঁসির প্রতীক্ষা। ফুলার-বধের ভার নিয়ে অবধি, সেদিন পর্যন্ত কতবার যে এই দৃশ্যটা সে মানসিক দৃষ্টিতে দেখেছিল, তার ইয়ত্তা নেই। আরও অনেকরকম তার ভাববার বস্তু ছিল। পরকাল সম্বন্ধেও তার ভাসা ভাসা চিন্তা এসেছিল, কিন্তু ভূপেনবাবুর সেই তাজ্জব অনুরোধের

পর পরকালের চিন্তাটা এক নতুন ভাব নিয়ে এল অর্থাৎ যদি পরকাল থাকে, তবে সেখানেও তাকে শহিদ (martyr) হতেই হবে।

যাই হোক, তার এইরকম চিন্তার অনুসরণ করবার আগে আমার বলা উচিত, সে এমন দার্শনিক বা অধ্যাত্মবাদীসুলভ তত্ত্বানুসন্ধান করবার শক্তি কেমন করে পেয়েছিল। কোনো কালে তার মধ্যে দার্শনিকতার বা আধ্যাত্মিকতার বিন্দুবিসর্গও ছিল না। তবে নাকি মৃত্যু আসন্ন জানলে, মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্বে নেহাত গোঁয়ার বা অতিপণ্ডিতও পরকাল-চিন্তারূপ বাতিকগ্রস্ত হয়ে পড়ে। কারণ, আ-গোঁয়ার-পণ্ডিতও মনে করতে আঁতকে ওঠে যে, মৃত্যুতেই নিজ অস্তিত্বের খতম। আমাদের সেই হত্যাকারীর পক্ষে অধ্যাত্মচিন্তার এও কারণ হতে পারে। কিন্তু আমরা জানি তার হঠাৎ দার্শনিক হয়ে উঠবার আরও অনেক সাত্ত্বিক কারণ ঘটেছিল।

পরদিন সকালে সে গোয়ালন্দ পৌঁছে এক হোটেলে গিয়ে উঠেছিল, এর আগে সে কখনও পূর্ববঙ্গে যায়নি। হোটেলস্বামীর প্রাঞ্জল অভ্যর্থনার পরে খেতে বসল। এক দিকে তীব্র ক্ষুধার জ্বালা, অন্য দিকে লংকার ভীষণ ঝাল, সহ্য করতে না পেরে হোটেলওয়ালাকে লংকাবিহীন কোনো খাদ্য পাওয়া যেতে পারে কিনা জিজ্ঞেস করায়, দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে যে বক্তিমে সে দিয়েছিল, তার কিছু এই— 'মরিচ যদি না কাইবার পারলা, তয় এহানে আইচ কিয়ত্তি? দ্যাখছস না এহানে এত্তউলা লোক পত্তিদিন কাইচে, কই কেউ তো কহনও মরিচা কাইয়া মইর‍্যা যায় না' ইত্যাদি। এ-হেন ন্যায়ের বিধান তখন তার পক্ষে বেশ সংগত বলে মনে হয়েছিল। একটুখানির জন্য এই সামান্য লংকার জ্বালা যদি সহ্য করতে না পারবে, তবে সে যে ভীষণ কাজে যাচ্ছিল, তা সম্পন্ন করবে কেমন করে? কাজেই যন্ত্রণা সহ্য করবার শক্তি তার কতটুকু আছে, তা পরীক্ষা করবার জন্য, নাকে-চোখে ঝরঝর করে জলপড়া সত্ত্বেও টপাটপ গিলে ফেলতে লাগল। ক্রমে পেটের ভিতরটা দাউদাউ করে জ্বলে উঠল। অগত্যা খাওয়া শেষ করে তাড়াতাড়ি গৌহাটি যাওয়ার স্টিমারে গিয়ে উঠল। আলাপ করবার মতো সঙ্গী কেউ জুটল না বা আলাপের প্রবৃত্তিও হল না। সন্ধের পর তাকে ভীষণ পেটের অসুখে পেয়ে বসল, অগত্যা দ্বিতীয় শ্রেণিতে আশ্রয় নিতে হয়েছিল। সঙ্গে ক্লোরোডিন ছিল, পুরোমাত্রায় তা চালানো সত্ত্বেও, পরদিন সকাল থেকে তা রক্তামাশয়ে পরিণত হল। আরও অধিক মাত্রায় ক্লোরোডিন চালাতে রোগের বাড়াবাড়ি একটু কমলেও রক্ত বন্ধ হল না।

এখন বলি, সেই লোকটি কেমন করে এমন উদ্ভট রকমের আধ্যাত্মিকতা লাভ করেছিল। একজন অসাধারণ পণ্ডিতজির কাছে লীলা শব্দের সঠিক ব্যাখ্যা শুনেছিলাম। তিনি বহুকাল ধরে বহু চেষ্টায় দার্শনিক (metaphysician) বা অধ্যাত্মবাদী হওয়ার বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব আবিষ্কার করেছিলেন। তাঁর কাছে শোনবার আমার সৌভাগ্য হয়েছিল যে, পূর্বপুরুষের কারও উন্মাদ রোগ থাকলে তার বংশধরদের ওই- রকম অধ্যাত্মবাদী বা দার্শনিক হওয়া সহজে সম্ভব হয়। আর গাঁজা, সিদ্ধি, আফিম অথবা ওইজাতীয় কোনো সাত্ত্বিক নেশাও সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষভাবে এই আধ্যাত্মিক শক্তি দান করে। তৃতীয়ত অম্ল, অজীর্ণ, শূল অথবা উদরের পুরোনো পীড়াগ্রস্তের পক্ষেও এই শক্তি সহজলভ্য হয়। যার এ-হেন রোগভোগের সৌভাগ্য হয়নি, তার পক্ষে নানাপ্রকার কৃচ্ছ্রসাধন দ্বারা ওইসকল সাত্ত্বিক রোগের আক্রমণযোগ্য করে শরীরটাকে অগত্যা তৈরি করতে হয়। বুদ্ধদেব শেষকালে এর উলটো ব্যবস্থা করেছিলেন বলে নাকি অধ্যাত্মদর্শনের শূন্যবাদী হয়েছিলেন।

আমাদের এই হত্যাকারীর এক মামা নাকি ঘোরতররূপে উন্মাদ ও সাধক ছিলেন। আর সদ্য হলেও ক্লোরোডিনের মারফত অহিফেনের সাত্ত্বিক নেশাটা বেশ মশগুল হয়েছিল। তার পর শিলং

পৌঁছোনো পর্যন্ত কোনোরূপে শরীরটাকে টিকিয়ে রাখবার জন্য স্টিমারে হিন্দু খাবারের দোকানে বাসি অখাদ্য না খেয়ে চট্টগ্রামবাসী মুসলমান ভায়াদের হোটেলের ভাত আর তরকারির (rice and curry) তরকারিটা বাদ দিয়ে, নুন মেখে খালি ভাতই দুটিখানি কোনোরকমে গিলে ফেলত। কারণ, সেই নিষিদ্ধ পক্ষীর তরকারিটা লঙ্কায় ভরপুর। সুতরাং কৃচ্ছ্রসাধনের দ্বারা শরীরের যে অবস্থা ঘটতে পারত, তারও তাই ঘটেছিল। অধিকন্তু স্টিমারে যে চার-পাঁচ দিন তাকে থাকতে হয়েছিল, দিনে আর রেতে শবাসন করেই থাকত। উদরের পীড়া তো হয়েই ছিল।

একটাতেই যখন যথেষ্ট, তখন দার্শনিকত্ব লাভের সব-কটা কারণের যোগাযোগে সে অতি দারুণ দার্শনিক হতে বাধ্য হয়েছিল।

এখানে একটা কথা বলে রাখা নেহাত অসংগত হবে না। রাষ্ট্রনৈতিক হত্যাকারীদের হত্যা করতে যাওয়ার অব্যবহিত পূর্বে তার মানসিক অবস্থা কেমন হয়, তা লিখে হুবহু বর্ণনা করা অন্তত আমার পক্ষে সম্ভব বলে মনে হয় না। কারণ এ-হেন ব্যাপার ভাষায় প্রকাশ করাই কঠিন। অথচ এ কথা যতখানি পারি, তা না লিখলে এরকম প্রবন্ধ লেখার অঙ্গহানি হয়। অধিকন্তু আঠারো-উনিশ বছর আগে হত্যাকারীর মনের তখনকার ঠিক যে ভাবটা জানতে পেরেছিলাম, এখন লিখতে গিয়ে তখনকার সেইরকম আবহাওয়ার মধ্যে না পড়ে লিখলে তার সতেজতাটুকু বজায় রাখা যায় না। সেই সময় দু-বছরের মধ্যে তিনবার সেই লোকটি এইরকম নরহত্যা করতে গেছিল (সে কথা বিশেষ করে পরে বলব)। প্রথমবার সম্ভাবিত হত্যাকাণ্ডের ২৪ ঘণ্টা পূর্বে সে জেনেছিল যে, আপাতত হত্যা করা হল না। দ্বিতীয়বার পাঁচ কি ছ-মিনিট এবং তৃতীয়বার প্রায় পাঁচ-ছ সেকেন্ড আগে তা জেনেছিল। হত্যা করা হল না, এটা জানবার পরক্ষণে সমস্ত শক্তি দিয়ে সংযমিত মনের হঠাৎ এমনই প্রচণ্ড প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হয় যে, পূর্বক্ষণের অনুভূতি পরক্ষণে ঠিক ঠিক আবার ধারণা করা একেবারে অসম্ভব হয়ে পড়ে। তাই বলছিলাম, এতগুলি সুদীর্ঘ বছরের কত শত তাণ্ডব ঘটনার পর, এরকম বিষয় লিখতে গেলে, তা যে একটুও পরিবর্তিত হবে না এবং পরবর্তী নানা রকমের অনুভূতির ছায়া পূর্বের আসল ঘটনা বা ভাবের ওপর যে পড়বে না এ কথা কোনো লেখকই বলতে পারেন না।— কারণ, এটা অনিবার্য। তাই এরকম লিখতে গিয়ে এখনকার ভাবের ছাঁচে তা বাধ্য হয়ে ঢালাই করলেও, আশা করি, লেখার আর পাঠের উদ্দেশ্য এতে ব্যর্থ হবে না। তা ছাড়া বৈপ্লবিক হত্যা করবার পূর্বে, হত্যার পরে ধরা পড়লে, কোনো বৈপ্লবিক কাজে পুলিশের হাতে ধরা পড়বার সম্ভাবনা হলে বা ধরা পড়লে এবং ফাঁসির হুকুম হওয়ার পূর্বে, এমনকি, পরেও স্বদেশপ্রেমিকদের মধ্যে অতি বড়ো নেতা হতে শুরু করে সামান্য বিপ্লবকর্মী পর্যন্ত, কীরকম মনোভাবের বশবর্তী হয়ে, মতটা বদলে ফেলেন ও কত অনর্থ ঘটান, তা জেনে রাখা সকলের উচিত; বিশেষ করে অধ্যাত্মবাদী নেতাদের।

এখন আসল কথা বলি। উক্ত ফুলার বধকারীর আধ্যাত্মিক তত্ত্বে অর্থাৎ মৃত্যুর পর আত্মার অস্তিত্বে এবং ইহকালের কর্মফলে, পরকালে আত্মার সুখ দুঃখ ভোগ সম্বন্ধে যেমন বিশ্বাস ছিল না, এ কথা পূর্বেই উল্লেখ করেছি, কিন্তু পূর্বোক্ত নানা কারণে বারেবারে পরকাল মেনে নেওয়ার ঝোঁক সে সামলাতে পারল না। কারণ, পরকালের তথাকথিত সুখের উজ্জ্বল আশার (সন্দেহজনক হলেও) একটা বিশাল মোহিনী শক্তি আছে। মরণোন্মুখ ব্যক্তিকে এ আশার মোহ যে লোভনীয় সোয়াস্তি দেয়, তা সে তখন বেহুঁশে অনুভব করেছিল। বিশেষত যে কাজ সে করতে যাচ্ছিল, তা অতীব পুণ্যকর্ম বলেই তার বদ্ধমূল ধারণা ছিল। সেই পুণ্যকর্মের ফলটা ইহকালে ভোগের সম্ভাবনা তো আর ছিল না। কাজেই যুক্তিতর্কের দ্বারা বিশ্বাস না করতে পারলেও তবু পরকাল থাকাটাই যেন তার পক্ষে বাঞ্ছনীয় হয়ে পড়েছিল।

সে, যে অবস্থায় পড়েছিল, তাতে পরকালের এই প্রলোভনটা একেবারে ত্যাগ করা তার পক্ষে কঠিন হয়েছিল। মৃত্যু আসন্ন জেনে ইহলোকের বিষয়ভোগ থেকে বঞ্চিত হওয়ার আতঙ্কে যখন মন একেবারে অভিভূত হয়ে পড়ে তখন মৃত্যুর বিভীষিকা হতে অব্যাহতি লাভের জন্য পরকালের এই মিথ্যা প্রলোভনে নির্ভর করা ছাড়া আর অন্য উপায় থাকে না। পরকালের এই প্রলোভনে অন্ধভাবে বিশ্বাস করতে পারলে, মানুষকে দিয়ে ইহকালে, যে-কোনো কাজ যে করিয়ে নিতে পারা যায়, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। এই অন্ধবিশ্বাস মানুষকে যে পশুতে পরিণত করে, তা জেনেও তখনকার মতো সেও যখন আত্মার পরকাল মেনে নিয়েছিল, তখন সেই প্রলোভনের শক্তি অনুভব করেছিল।

অথচ আবার সংসারভোগের বাসনা অর্থাৎ জীবনের মায়া আর মৃত্যুর ভয়, এমনই প্রচণ্ডরূপে স্বতঃস্ফূর্ত যে, যারা পরকালে বিশ্বাসবান, তাদের কাছেও পরকালের এতবড়ো প্রলোভনটা কার্যত তুচ্ছ হয়ে যায় যদি সদ্য মৃত্যুর হাত থেকে এড়াবার কিছুমাত্র উপায় থাকে। এইরূপে মৃত্যু অহেতুক ভীতিপ্রদ হয়ে দাঁড়ায়। এই হত্যাকারীর অবস্থাও অনেকক্ষণের জন্য কতকটা তাই হয়েছিল।

সে, মৃত্যুর পরে যে স্বর্গে যাবে, এ বিশ্বাস কেমন করে তখন তার মনে ক্রমে জেগে উঠেছিল, তা সে বুঝতে পারেনি। সে ভাবতে লাগল, স্বর্গে গিয়ে প্রথমে সে কী দেখবে বা অনুভব করবে, কাদের দেখবে ইত্যাদি। তার পর স্বর্গের সুখটা কেমন হতে পারে, আন্দাজ করবার চেষ্টা করেছিল। স্বর্গে পঞ্চেন্দ্রিয়ভোগ্য সুখ কি সম্ভব? ইন্দ্রিয় সব তো দেহের সঙ্গে ইহকালে থেকেই যাবে! নিশ্চয় ইন্দ্রিয়াতীত কোনো রকমের সুখ স্বর্গে আছেই। যদি তাই হয়, তা বিচ্ছিন্ন কী অবিচ্ছিন্ন? বিচ্ছিন্ন হলে মর্তসুখের সঙ্গে তার তফাত কী রইল? তা হতেই পারে না। কিন্তু অবিচ্ছিন্ন সুখ কি বেশি দিন ভালো লাগবে? দুঃখ না থাকলে সুখের ধারণা কি সম্ভব হতে পারে?

এইরকম খেয়ালের মধ্যে হঠাৎ তার মনে সন্দেহ দেখা দিল এবং সেজন্য একটু বিরক্তও হল। তখন ভূপেনবাবুকে মনে পড়ল। ভূপেনবাবু, স্বামী বিবেকানন্দের আপন ভাই। স্বামীজি ছিলেন অধ্যাত্মবাদের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গুরু। পরকালের অস্তিত্ব সম্বন্ধে নিজের ভাইয়ের যখন প্রত্যয় জন্মাতে বা সন্দেহ ভঞ্জন করতে পারেননি, তখন সাতসমুদ্র তেরো নদীপারের ইহকালসর্বস্ব লোকগুলিকে পরকালের প্রলোভন দেখাতে গেছলেন কেন? পরকাল 'আছে', এ কথা যেমন বিস্তর মহাপুরুষ বলেছেন, তেমনই 'নেই' এ কথা বলা সত্ত্বেও অনেকে মহাপুরুষ বলে গণ্য। তাছাড়া পরকাল সম্বন্ধে নানা মুনির নানা মত। কোন্‌টা সত্য? পরকালের অস্তিত্ব সম্বন্ধে 'হ্যাঁ' বলাতে স্বার্থ আছে। 'নেই' যাঁরা বলেছেন, তাঁদের বরং স্বার্থ ত্যাগ করতে হয়েছে—অর্থাৎ পরকালের সুখভোগের মোহিনী আশারূপ প্রভূত স্বার্থ ত্যাগ করতে হয়েছে; লোকপূজার বদলে লোকনিন্দার ভাজন হতে হয়েছে। স্বার্থের সঙ্গেই মিথ্যার সম্বন্ধ অধিক। অতএব 'হ্যাঁ' যাঁরা বলেছেন, তাঁরা হয়তো কাল্পনিক স্বার্থের জন্যই মিথ্যা বলে থাকবেন।

আবার কারও কারও মতে নাকি আত্মা সুখদুঃখের অতীত, তা যদি হয়, তবে এ-হেন আত্মা ও এ-হেন পরকাল নিয়ে মাথাব্যথা করা পাগলামি ভিন্ন আর কিছুই নয়।

অনেকে বলেন, পরজন্ম আছে অর্থাৎ ইহকালের কৃত 'সু' বা 'কু' কর্মের ফলে মৃত্যুর পর আত্মা অধিক উন্নত বা হীনজীবী হয়ে জন্মাতে পারে। যদি তাই হয়, তবে এই নরহত্যা স্বর্গীয় বিধাতা পুরুষের বিচারে যে কুকর্ম বলে প্রতিপন্ন হবে না, তার প্রমাণ কী? নিজের স্বার্থের জন্য নরহত্যা যদি মানুষের বিচারে অপরাধ বলে গণ্য হয়, তবে নিজ দেশের স্বার্থের জন্য নরহত্যা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের বিচারপতির বিচারে পুণ্য বলে গণ্য হবে কেমন করে? পরকাল বলে যদি কিছু থাকে, তবে এই নরহত্যার জন্য তা যে একেবারে ঝরঝরে হয়ে যাবে, তাতে আর সন্দেহ নাই।

ঠিক এরকম না হলেও এই ধরনের অধ্যাত্মচিন্তার গোলকধাঁধায় ঘুরপাক খেয়ে, স্বদেশের জন্য সমর্পিত-প্রাণ কত ছোটোবড়ো বিপ্লববাদী যে ধর্মের দোহাই দিয়ে কত কুকীর্তি করেছে, তা খুব অল্প লোকই জানেন। আবার অনেকে তা জানলেও বিশ্বাস করতে পারেন না। কারণ নেতাদের মতিভ্রম হয় না বলেই আমাদের ধারণা। এই বৈপ্লবিক কাজ অত্যন্ত ভীষণ। হাতে-কাজে এ কাজ করতে গেলে আকস্মিক ভীষণ বিপদে, জেলে, দ্বীপান্তরে, অন্তরিনে পচবার ও ফাঁসিতে ঝুলবার ভয় সদাই থাকে। এইরকম ভীষণ বিপদের সম্ভাবনা যখন ঘনিয়ে আসে, তখন বিপ্লবের কাজকর্ম ছেড়ে দিয়ে My mission is over বলে প্রাণটা বাঁচাবার প্রবৃত্তি স্বভাবত অত্যন্ত প্রবল হয়ে পড়ে। কিন্তু তাতে লোকাপবাদ আছে। আর যার একটু কনশেন্স বলে জিনিসটা আছে (প্রকৃতপক্ষে এ দেশে এ জিনিসটা নেই বললেই হয়), তার তখন সেই আপদটাকে ধামা চাপা দেওয়ার ওজুহাত দরকার হয়ে পড়ে। ফল কথা, ওই অবস্থায় এমন একটা ফাঁকি (Subterfuge) দরকার হয়ে পড়ে— যার দ্বারা লোকনিন্দা বা আত্মগ্লানির বদলে লোকপূজ্য হওয়া ও আত্মতৃপ্তি লাভ করা সহজসাধ্য হতে পারে। আমাদের দেশের লোকের পক্ষে এরূপ স্থলে ধর্ম বা আধ্যাত্মিকতা হচ্ছে সেই পরম গৌরবজনক পন্থা, যার দোহাই দিয়ে দেশদ্রোহিতার মতো মনুষ্য-সমাজের সবচেয়ে অনিষ্টকর— সবচেয়ে সাংঘাতিক হীন পাপ করেও লোকসমাজে পূজা, গৌরব অর্জন করা যায়। কারণ, আমাদের দেশে সমাজের অতীব অনিষ্টকর কাজও যেমন আধ্যাত্মিক ব্যাপারে অতীব পুণ্যকর্ম বলে গণ্য হয়, তেমনই সমাজের অতি কল্যাণকর কাজও অতি পাপ বলে ঘৃণ্য হয়। পাশ্চাত্য দেশে সমাজের ঐহিক হিতাহিতের মাপকাঠিতে ধর্মাধর্ম, পাপপুণ্য, কর্তব্যাকর্তব্যের ওজন করা চলে; সেখানে গুপ্তসমিতির সভ্যশ্রেণিভুক্ত হতে হলে যে শপথ করে দীক্ষা গ্রহণ করতে হয়, তার মর্ম তলিয়ে না বুঝে আমরা আমাদের গুপ্তসমিতির দীক্ষার ব্যাপারটা, তাদের নিছক অনুকরণ করেছি মাত্র। সে দেশে শপথ ভঙ্গ করে মহাত্মা পাদরি হলেও লোকাপবাদ, আত্মগ্লানি ও গুপ্তসমিতির পক্ষ হতে দণ্ডবিধানের কিছুমাত্র ত্রুটি হয় না, কাজেই সেখানে শপথটা সার্থক হয়। আর আমাদের দেশে শপথের যে শুধু মূল্য নেই, তা নয়। এখানকার লোকমত-ই শপথ ভঙ্গ করাবার প্রশ্রয় দেয়; যতদিন তথাকথিত ভারতীয় সভ্যতার মূলাধার এই সনাতন ধর্মের প্রাধান্য অটুট থাকবে, ততদিন লোকমতও ওইরকম অন্যায় অসংগতই থাকবে; ততদিন আমাদের চরিত্রবল বলে কোনো বস্তু সম্ভবই হবে না— ততদিন কোনোপ্রকার স্বাধীনতা এ দেশে সম্ভব তো হবে না, বরং তর্কের খাতিরে হবে বলে ধরে নিলেও তা অনর্থের কারণ হবেই।

যাই হোক, উল্লিখিত হত্যাকারীর পক্ষে এ অবস্থায় লাটবধের সংকট থেকে সম্মান ও গৌরবের সহিত অব্যাহতি লাভ করতে আমাদের যে সুবিধাজনক স্বদেশি পন্থার উল্লেখ করলাম, তাও তখন তার মনে এসেছিল, অর্থাৎ আত্মগ্লানি ও লোকনিন্দা থেকে মুক্তির জন্য নিজের মনকে এবং যথাসময়ে অন্যকে এই বলে বোঝাতে পারত যে, স্বয়ং ভগবানের ইচ্ছা ব্যতীত, পরকালের চিন্তা তার মনে এল কেমন করে? এই কথাটা পরক্ষণে আরও একটু পরিষ্কার হয়ে দাঁড়াত যে, ভগবানের বাণী সে যেন নিজের কানে স্পষ্ট শুনতে পেয়েছে। পরে লোকের কাছে প্রচারকালে সেই কথাটাই হয়ে দাঁড়াত— সে, ভগবানের আদেশ পেয়েছে যে, তার দ্বারা ভগবান আরও মহত্তর কর্ম সাধন করাবেন বলে যন্ত্র রূপে তাকে গড়ে তুলছেন। সামান্য নরহত্যা তার কর্ম নয়, এই প্রত্যাদেশ সে স্ব-কর্ণে শুনেছে ইত্যাদি। এ-হেন প্রত্যাদেশ অনেকেই পালন করেছেন।

যাই হোক, ভণ্ডামি তার ভালো লাগল না। কিন্তু পরকালের চিন্তা তাকে বারেবারে বেমালুম পেয়ে বসেছিল। শেষকালে এই সিদ্ধান্তে এসেছিল যে, পূর্বজন্মে কে কী ছিল, তা সেও যেমন জানে না,

তেমনই অন্য কেউ জানতে (অন্তত এ কালে) পেরেছে বলে শোনেনি। পূর্বজন্মের স্মৃতি এ জন্মে আত্মার সঙ্গে আসতে যদি না পারে, তবে এ জন্মের স্মৃতি পরজন্মে যাবে কী করে? যদি না যায়, তবে পরজন্মে বা পরকালে সুখদুঃখের মানে হয় না। ইহকালের সঙ্গে পরকালের তুলনা করতে না পারলে, দুই কালের মধ্যে সম্বন্ধ কিছু থাকতে পারে বলে ধারণা করা যায় না। কাজেই তার তখনকার দার্শনিক বুদ্ধিতে বুঝে ফেলেছিল, পরকালের সমস্ত ব্যাপারটা বোকা বোঝাবার জন্য ভণ্ডদের স্তোকবাক্য মাত্র। সুতরাং পরকালের চিন্তারূপ অকারণ কষ্ট আর সে করবে না।

তখন তার মনে হল, কাজ করতে গিয়ে ফলাফল চিন্তা করা পাপ, নিষ্কাম-কর্মই ঠিক। *গীতার* প্রতি তার ভক্তি উছলে উঠল। অনেকক্ষণ ধরে *গীতার* মহৎ উপদেশসকল স্মরণ করে সে বেশ-একটু শান্তি পেল। কিন্তু এও আবার মনে পড়ল, *গীতাতেও* পরকালের হাঙ্গামা বিস্তর। বিশেষত ভগবান কৃষ্ণ প্রিয়তম শিষ্য অর্জুনকে নিষ্কামধর্মে দীক্ষা দিতে গিয়ে, প্রথমেই কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধরূপ কর্মের ফলাফল সম্বন্ধে নিশ্চয়াত্মক স্তোকবাক্য দিয়েছিলেন। অর্থাৎ যুদ্ধে জিতলে ইহকালে রাজ্যলাভ, আর মরলে পরকালে স্বর্গভোগ। পরিণামে কিন্তু ভগবানের আশ্বাসবাণীও মিথ্যা হয়েছিল; কারণ অর্জুন তো যুদ্ধে মরলেন না, কাজেই সদ্য স্বর্গ জুটল না। যুদ্ধে জয় লাভ করেও সুখে রাজ্যভোগ হল না, অধিকন্তু আত্মগ্লানি আর লাঞ্ছনা ভোগটা যথেষ্টই হয়েছিল।

সে তখন একেবারে বুঝে ফেলল, নিষ্কাম ধর্মটর্ম সব ফাঁকি। বচনের প্যাঁচেও এটা সম্ভব হয় না। অর্জুনের মতো নিষ্কামকর্ম করবার যারা ভাণ করে, অথবা ভগবান কৃষ্ণের মতো নিষ্কামধর্মের যারা বুকনি দেয়, তারাও ইহকালে লোকসমাজে নাম, যশ, পূজা পাবার জন্যই করে। কেউ বেঁচে থেকে তা ভোগ করবার কামনা করে, আর কেউ বা মৃত্যুর পর এক দিন, নিকট বা দূর-ভবিষ্যতে লোকের পূজা পাবে, এই কামনা করেই তা করে। একমাত্র এই নাম-যশই মানুষকে অমর করতে পারে।

এই সিদ্ধান্তে আসবার পর তার চিন্তার বিষয় হল, ফুলার সাহেবকে হত্যা করতে পারলে তার সম্বন্ধে কে কী মনে করবে! যারা তাকে কেউকেটা বলে মনে করত, তারা না জানি তাকে কী চোখেই দেখবে। তার কথা খবরের কাগজে কত লেখালেখি করবে। শুধু ভারতে নয়, সারা দুনিয়ায় তার নাম ঘোষিত হবে, ইত্যাদি।

কল্পনায় ভাবী গৌরবের খেয়াল করতে করতে হঠাৎ তার মনে পড়ল, হত্যা-ব্যাপারে ধরা পড়লে পুলিশ যাতে না তাকে শনাক্ত করতে পারে, তার জোগাড় সে আগেই করেছে; আর শেষপর্যন্ত সেই চেষ্টা করবে বলে স্থির করেছে। এখন তার গবেষণার বিষয় হল. তবে কি ধরা পড়বার পর তার নামটা যাতে পুরোদস্তুর জাহির হয়, সেইভাবে পুলিশের কাছে একরার করবে? তাতে তার অনেক আত্মীয় বন্ধুবান্ধব লাঞ্ছিত হতে পারে; গুপ্তসমিতিই লুপ্ত হতে পারে। তবে কি নিজের নাম-যশের জন্য গুপ্তসমিতির আপদ জেনেশুনে সে ডেকে আনবে? তা-ই বা কেন! যেমন দু-দশ জন লোকের বিপদ ঘটতে পারে, তেমন তার এমন অনেক বন্ধু আছে, যারা তার আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে আরও বৃহত্তর বৈপ্লবিক সমিতি গড়ে তুলতে পারবে— আরও মহত্তম কাজ করতে পারবে। এইভাবে সে greatest good to the greatest number থিয়োরিটা নিজের মনের মতো করে খাটিয়ে নিয়ে একটুখানি নিশ্চিত হতে না হতেই আবার তার মনে এই 'কিন্তু' এল যে, কেবল নামের জন্যই কি ভালো কাজ করা আর মন্দ কাজ না-করা উচিত? জগতে কেউ কি নাম-যশের আকাঙ্ক্ষা-রহিত হয়ে লোকহিতকর কোনো কাজ করতে পেরেছে? তখন সে একে একে অনেক মহাপুরুষদের ওইরকম কর্মের প্রবর্তক নাম-যশ কিনা, খুঁজতে গিয়ে এমন এক জনও পেল না—যাঁর একটু না একটু নাম-যশের কামনা ছিল না। বরং

দেখল, যাঁরা এর দ্বারা যত অধিক পরিচালিত হয়েছেন তাঁরা তত অধিক মহৎ কাজ করতে পেরেছেন; আর তাঁরাই তত অধিক প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন।

কিন্তু এও সে ভেবেছিল যে, জগতে এমন অনেক আদর্শ বিপ্লব সংঘটিত হয়েছে, যার মূলে নিশ্চয় এমন সব পথপ্রবর্তক এবং পথপ্রদর্শক কর্মী ছিলেন— যাঁরা আত্মগোপন করেছিলেন বলেই সেইসকল বিপ্লব সফল হতে পেরেছিল; অথচ তাঁদের পবিত্র নাম লোকসমাজে অবিদিত। সেই অজ্ঞাতনামা মহাপ্রাণদের প্রতি শ্রদ্ধায়, আর সেই আত্মগোপনরূপ কাজের মহিমায় তার মন এমনই মুগ্ধ হয়ে উঠল যে, greatest good to the greatest number থিয়োরিটা আবার অন্যভাবে ব্যাখ্যা করতে বাধ্য হয়েছিল। তাতে সে আবার বুঝে ফেলল, আত্মগোপন করাটাই অবশ্য উচিত। অর্থাৎ আত্মগোপন করার ওপরেই বৈপ্লবিক গুপ্তসমিতির ভিত্তি স্থাপিত; আর গুপ্তসমিতির ওপর বিপ্লবের সিদ্ধি অর্থাৎ দেশের স্বাধীনতা নির্ভর করছে। আত্মপ্রকাশ করলে তার গুণমুগ্ধ ভক্তেরা তার প্রদর্শিত অন্য আদর্শের সঙ্গে, আত্মপ্রকাশরূপ এমন সুবিধাজনক আদর্শটাও একই কারণে অনুকরণ করবে। তখন এক-এক জন ধরা পড়বে, আর একবারের ঠেলায় এক-একটি গুপ্তসমিতি সমূলে লোপাট হয়ে যাবে।

তা যেন হল, কিন্তু পরকালে আত্মার যদি স্বর্গভোগ না-ই থাকে, আর ইহলোকেও মৃত্যুর পূর্বে বা পরে নাম-যশ আদির আশা তাকে ত্যাগ করতে হয়, তবে দেশ স্বাধীন হল বা না হল, তাতে তার কী? তবে স্বদেশপ্রীতিরূপ ভূতের বোঝা কেন সে বয়ে মরতে যাচ্ছে? এই প্রীতির ঠেলায় সে যাবে জেলে, সে পচে মরবে দ্বীপান্তরে, সে ঝুলবে ফাঁসিকাঠে, আর বাহাদুরি নেবেন সেই নেতারা— যাঁরা এসব মাথা পেতে নিতে পারবেন না।

দেশের জন্য আত্মত্যাগ করবেন কেন, এই সমস্যার সমাধান করতে গিয়ে আমাদের নেতারা বড়ো মুশকিলে পড়েন। কারণ, এ সমস্যার নামগন্ধ ভারতীয় প্রাচীন সভ্যতার মধ্যে অর্থাৎ শাস্ত্রে খুঁজে পান না; নতুন করে এমন কিছু গড়েও তুলতে পারেন না, অর্থাৎ স্বদেশপ্রীতির এমন উচ্চ আদর্শও উদ্ভাবন করতে পারেন না, যার মহিমায় অনুপ্রাণিত হয়ে ধন, মান, প্রাণ আদি সর্বস্ব উৎসর্গ করতে পারলে মানুষ ধন্য হতে পারে। অন্য দেশে তা পেরেছে। অথচ এই আদর্শ যারা গড়ে তুলেছে, যারা তা কাজে পরিণত করেছে, আর যারা তা নিত্য নতুন নতুন ভাব-ঐশ্বর্যে সমৃদ্ধ করে তুলছে, তারা হচ্ছে পাশ্চাত্য দেশের লোক। তাদের সভ্যতার এই আদর্শ নিতে গেলে তাদের অনুকরণ করা হয়। আবার এ দেশে অনুকরণ করা ঘৃণ্য বলে বিবেচিত। তাই স্পষ্টভাবে অনুকরণ করলে নেতাদের মর্যাদা থাকে না। যেহেতু, এই নেতারাই পাশ্চাত্য আদর্শকে ঘৃণা করতে আমাদের শিখিয়েছেন। কাজেই কীসের জন্য, আত্ম-উৎসর্গ করে আমরা স্বদেশ উদ্ধার করতে যাব, তার হেতু দেখাতে বাধ্য হয়ে, নেতারা পরকালে এমন একটা কাল্পনিক সুখের ঘোরালো আশার প্রলোভন সৃষ্টি করেছেন যার প্রচুর সমর্থন এদেশের শাস্ত্র আর লোক-মত সর্বদা করে থাকে।

যাই হোক, কেন দেশের জন্য আত্মবলি দেব, তার হেতু দেখাতে গিয়ে, বঙ্কিমচন্দ্র আনন্দমঠ-এ যে আদর্শের উল্লেখ করেছেন, তা হচ্ছে সনাতন হিন্দুধর্মের উদ্ধার; আর তার চেষ্টাতে আত্মদান করতে পারলে, পরকালে স্বর্গসুখ লাভ। এটাকে একটু ঘষেমেজে আজকালের নেতারা করেছেন, হিন্দুর সনাতন সভ্যতার পুনরুদ্ধার ও পাশ্চাত্য অন্য জাতিকে তা দান, যার জন্য আমাদের আত্মত্যাগ, আর ইংরেজের কবল থেকে দেশ উদ্ধার করতে হবে।

ওই সমস্যার এরকম সমাধান তার পক্ষে তখন সম্ভব হল না। স্বদেশের স্বাধীনতালাভের জন্য বিপ্লববাদের ধারণা এবং তা প্রচারের চেষ্টা, এ যাবৎ যতটুকু এদেশে হয়েছে, যদিও তা সেই পাশ্চাত্য আদর্শের অনুকরণ মাত্র, তথাপি আমরা ভারতবাসী সেই আদর্শের অন্তর্নিহিত স্বরূপটির অনুসরণ করি

না বা তার একবার খোঁজও রাখি না; নেতারাও তা খোঁজ করবার ও আমাদের তা শেখাবার মুশকিল থেকে অব্যাহতি লাভের জন্য আমাদের অনুকরণাতঙ্কের আশ্রয় নিয়ে থাকেন। আমাদের হত্যাকারীও সেই পাশ্চাত্য আদর্শের স্বরূপ সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ ছিল। তথাপি স্বদেশের জন্য প্রাণ দিয়ে 'কীর্তির্যস্য স জীবতি' বাক্যটির মর্যাদা রক্ষার পথে এতদূর এগিয়ে গিয়ে ফিরে আসার লজ্জা সে কোথায় রাখবে, তা খুঁজে পেল না। লাটসাহেবকে বধ করতে পারবে না বলে ফিরে এলে, কে কী মনে করবে, প্রথমে এইটেই হয়েছিল তার ভাবনার কথা। তার পর যতদিন সে বেঁচে থাকবে, ততদিন নিজের কাছে কত হীন হয়ে থাকতে হবে; আত্মগ্লানিতে তার বেঁচে থাকার সুখটুকু তেতো হয়ে যাবে; আর কত দিন বা বাঁচবে, তার নিশ্চয়তাও নেই। এক দিন তো রোগে ভুগে, আরও অনেককিছু করে মরতেই হবে। এই রক্তামাশা যে গ্রহনিতে পরিণত হয়ে একটু একটু করে তাকে মৃত্যুর গ্রাসে সঁপে দেবে না, তাই বা কে বলতে পারে? ঘরে ফিরবার পূর্বেই যে সেই বন্ধুবান্ধবহীন বিদেশে পথের পাশে পড়ে থেকে শেয়াল-কুকুরের ভক্ষ্য হতে হবে না, তার ঠিক কী?

এইরকম রোগে ভুগে মরার হরেকরকম চিন্তা করতে করতে তার বড়ো আদরের এক মেয়ের কথা মনে পড়ল। মাসাধিককাল তার টাইফয়েডের যাতনা ভোগ ও মৃত্যুর দৃশ্য প্রাণের ভিতর জেগে উঠল। তখন বেঁচে থেকে যে-কোনো মুহূর্তে হরেকরকম কুৎসিত রোগের আক্রমণের জন্য প্রতিনিয়ত প্রতীক্ষা করার চাইতে ফাঁসিতে মৃত্যু তার কাছে কাম্য হয়ে উঠল।

এই কাম্য মৃত্যুর ফলাফল চিন্তা করে সে দেখল, পরকাল যদি নেহাত না-ই থাকে, তবে মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব পর্যন্ত আত্মপ্রসাদরূপ আনন্দ তো থাকবেই। অধিকন্তু আত্মগোপন করা সত্ত্বেও অন্তত চার-পাঁচ জন, তার এই আত্ম-বলিদানের খবর রাখবেন। একদিন না একদিন তাঁদের কেউ না কেউ নিশ্চয় তার নামটা ছাপার অক্ষরে প্রকাশ করবেনই। তখন নিজ মুখে আপন কাজের কীর্তন করে যতটা নাম-যশ হত, তার চাইতে আত্মগোপন করার জন্য ঢের বেশি লোকপূজা সে নিশ্চয় পাবে।

অবশেষে আত্মপ্রসাদ লাভের কামনায় হোক বা নামের জন্যই হোক, সে ফুলারসাহেবকে বধ করতে নিজের মনকে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ করল। তার পর তার মনে অন্য যত কিছু চিন্তা এসেছিল সব সে ঝেড়ে ফেলে দিয়েছিল। কিন্তু একটিমাত্র দুঃখ, থেকে থেকে তার মনে দেখা দিচ্ছিল। সেটি হচ্ছে, তার গুণমুগ্ধ আত্মীয়বন্ধুদের কাছ থেকে প্রাণ খুলে শেষ বিদায় নিতে পারল না; অর্থাৎ কিনা, তাদের হাহুতাশ, কাঁদুনি, কাতরানি আদি থেকে মরণোন্মুখ ব্যক্তি যে শেষ তুষ্টিটুকু পায়, সেটুকু তার ভাগ্যে জুটল না!

যাই হোক, ষষ্ঠদিন খুব সকালে তাদের স্টিমার গৌহাটির ঘাটে গিয়ে লাগল। পেটের অসুখটা একটু কমেছিল। ক্লোরোডিনের মারফত আফিং-এর মাত্রাও কমে এসেছিল। কাজেই তার দার্শনিক গবেষণারূপ ব্যাধিও প্রায় সেরে গেছিল। তাই গৌহাটির প্রাকৃতিক দৃশ্য তার মনকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল। কয়েকদিনের পর স্নান এবং পেট ভরে জলযোগ সেরে প্রায় নটার সময় শিলং-এর জন্য টাঙা চড়ে বসল। ক্রমে যত এগোতে লাগল, ততই অভিনব প্রাকৃতিক দৃশ্য তাকে অভিভূত করে ফেলতে লাগল। সৌন্দর্যের প্রতি তার মনের একটু স্বাভাবিক টান ছিল। একে তো সে অত সুন্দর দৃশ্য কখনও দেখেনি বা এমন মনোরম আবহাওয়া কখনও উপভোগ করেনি, তার ওপর আর ঘণ্টাকতক পরে সব শেষ হয়ে যাবে, এই আপশোশে পৃথিবীটা বড়োই উপভোগ্য বলে তার মনে হতে লাগল। তখন চারিদিক হতে যেন কত রকমের সৌন্দর্য নানা ছন্দে তার চোখে বিকশিত হল। পৃথিবীর ওপর এরকম মায়ার সঙ্গে সঙ্গে নিজের জীবনের ওপর মায়াও বেমালুম আবার জেগে উঠতে লাগল।

এই মায়াটা এতই স্বতঃস্ফূর্ত যে, স্টিমারের এতসব দার্শনিক গবেষণা তখন তার মনে স্বপ্নের মতো বোধ হতে লাগল। তার পর ফুলারবধের সংকল্পও তার মনে দেখা দিল। সৌন্দর্যের মোহে সে সংকল্প শিথিল হওয়ার ভয়ে, সৌন্দর্য উপভোগে গা ঢেলে দেওয়াটা অন্যায় হয়েছে বলে, জোর করে তার মনকে বুঝিয়ে ফেলল, সৌন্দর্য-অনুভূতি মনের একরকম সংস্কার মাত্র এবং তার পক্ষে তা পরিত্যাজ্য। কিন্তু 'কমলি ছোড়তি নেহি'; বিশেষ চেষ্টা সত্ত্বেও সৌন্দর্য তাকে ছাড়ল না। বৃথা চেষ্টার পর অগত্যা সে মনকে প্রবোধ দিতে লাগল যে, সে তো মরবেই, তবে যতক্ষণ বেঁচে আছে, ততক্ষণ আত্মপ্রবঞ্চনা না করে এই নির্দোষ সুখটুকু সে কেন না ভোগ করবে?

যাই হোক, তার পর শিলং-এর দিক থেকে একখানা টাঙা আসতে দেখা গেল। সেটা পাশ কাটিয়ে যাওয়ার সময় সে দেখল, টাঙাতে একটি চেনামুখ বসে; সে বারীন। তড়াক করে নেমে গিয়ে বারীনকে জিজ্ঞেস করল, শিলং থেকে তার ফিরে আসবার কারণ কী? উত্তরে বারীন এইরকম বলেছিল, 'শিলং-এ হবে না, গৌহাটি ফিরে আসতে হবে'। শিলং গিয়ে ওঠবার জন্য এক জন ভদ্রলোকের নাম বলে দিয়েছিল।

ছুটে গিয়ে সে শিলং-এর টাঙায় আবার চড়ে বসেছিল। 'শিলং-এ হবে না, গৌহাটিতে চেষ্টা হবে' এই-কটি কথার মধ্যে বুঝতে বেগ পাওয়ার মতো যদিও কিছুই ছিল না, তথাপি এই শুনেই তার মন হতভম্ব হয়ে গেল। ফুলার লাটকে বধ করবার ভার নিয়ে অবধি দশ-বারো দিন যাবৎ এই নরহত্যারূপ ভীষণ কাজটা সম্পন্ন করবার জন্য প্রস্তুত হতে গিয়ে জীবনের বা সংসারের মায়া কাটাতে তাকে কত শক্তি প্রয়োগ করতে হয়েছিল, ভুক্তভোগী ব্যতীত অন্যের পক্ষে তা অনুমান করা অসম্ভব। আবার জীবনের আশা, সংসারের মায়া বেহুঁশে হঠাৎ তার মনে গজিয়ে উঠল।

নরহত্যার প্রতি এমন দুর্দমনীয় বিতৃষ্ণা আর জীবনের প্রতি এমন অসংগত মায়া বা যে মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী, তার প্রতি অহেতুক এত ভয়ের কারণ কী?

ভারতবাসী, বিশেষ করে বাঙালি আমরা সকলে বৈষ্ণব ধর্মাবলম্বী না হলেও স্বভাবত প্রায় সকলেই বোষ্টম। সে যদিও বোষ্টম ছিল না, তথাপি বাঙালি তো বটে। জাল, জালিয়াতি, জুয়াচুরি, প্রতারণা, বিশ্বাসঘাতকতা ইত্যাদি হীন কাজ করতে, এমনকি নরহত্যার পরামর্শ পর্যন্ত দিতে, ভদ্র ইতর নির্বিশেষে আমরা কুণ্ঠিত হই না। অথচ যে পাঁঠার ঝোলের লোভে আমাদের রসনা সদাই ব্যাকুল, কোনো বাঙালিকে সেই পাঁঠা কাটতে দিয়ে তার মনের অবস্থাটা দেখলে, অথবা যে বানর, বিদেশি বণিক অপেক্ষাও আমাদের উৎপন্ন-জাত লভ্যের অধিক অন্তরায়, সেই বানরকে প্রাণে মেরে ফেলতে বলে দেখলে আমাদের বাঙালি-চরিত্রের স্বভাবগত বিশেষত্ব যে বোষ্টমত্ব, তা ধরা পড়ে। এ-হেন বাঙালির পক্ষে বিনা উত্তেজনায় নরহত্যা, বিশেষত লাটহত্যা যে উৎকট রকমের স্বভাববিরুদ্ধ, আজকাল তা অনুমান করা তত সহজ হবে না। কারণ, এরকম দুষ্কর্ম দণ্ডনীয় হলেও পাশ্চাত্যের অনুকরণে ইদানীং এদেশে অনেক সংঘটিত হওয়াতে, আর এটা তত স্বভাববিরুদ্ধ বলে মনে না-ও হতে পারে; আর বর্তমানের অহিংস নীতির কৃপায় অচিরে শুধু বাঙালি চরিত্র নয়, ভারতীয় চরিত্রের স্বাভাবিক (instinctive) বৈশিষ্ট্য যে আবার খাঁটি বোষ্টমত্ব হবে, তাতে আর বিন্দুমাত্রও সন্দেহ করবার কিছুই নেই।

কিন্তু কোনো রকমে কেবল বেঁচে থাকবার উদ্দেশ্যে বেঁচে থাকবার প্রবৃত্তি এদেশে এত উৎকট কেন? জীব মাত্রেরই স্বভাবে যে এ প্রবৃত্তিটা অত্যন্ত প্রবল, তা বলা বাহুল্য মাত্র। মানুষের মতো বিচার-বুদ্ধিসম্পন্ন জীবের পক্ষে অন্য কথা। মানুষের বেঁচে থাকবার প্রবৃত্তি যেমন স্বভাবগত, তেমনই অন্যের

মঙ্গলের জন্য, কেবল আত্মপ্রসাদ লাভরূপ স্বার্থ ছাড়া, জেনেশুনে নিজের ব্যক্তিগত যে-কোনো স্বার্থ ত্যাগ করা, এমনকি, মৃত্যুকে স্বেচ্ছায় আলিঙ্গন করার প্রবৃত্তি মানুষ মাত্রেরই মধ্যে হুঁশে বা বেহুঁশে একটু না একটু আছেই। এ দুটি হচ্ছে সম্পূর্ণ বিপরীত ভাবাপন্ন প্রবৃত্তি। একটি যে পরিমাণে যেখানে বেশি থাকে, অন্যটি সেই পরিমাণে সেখানে কম হয়ে যায়। আমাদের দেশের লোকের মধ্যে কিন্তু প্রথমটির যেরকম আধিক্য বা প্রাদুর্ভাব, আর দ্বিতীয়টির যতখানি অভাব, এমনটি নিশ্চয় আর কোথাও কেউ দেখাতে পারবেন বলে মনে হয় না। এমনকি, অসভ্য আদিম নিবাসীদের বা অনেক জন্তুজানোয়ারদের মধ্যেও তা দেখা যায় না কেন?

আমাদের মধ্যে অপত্যস্নেহ জানাবার লোভনীয় রীতির সঙ্গে আমাদের প্রাণটি বাঁচাবার এই বাড়াবাড়ি চেষ্টার বিশেষ সম্বন্ধ আছে বলে মনে হয়। অভিভাবকেরা শৈশব হতে শিশুদের প্রাণটা বাঁচাবার, বা যেখানে প্রাণহানির একটুও সম্ভাবনা আছে, এমন ব্যাপার থেকে তফাতে রাখবার জন্য, এত- রকম অনুষ্ঠানের ও চেষ্টার এত আড়ম্বর দেখান, আর অতিরিক্ত স্নেহ জানাতে গিয়ে ছেলেদের মনে এই কথাটা অনর্থক এত করে এঁকে দেন যে, অসৎ, চিরব্যাধিগ্রস্ত বা মনুষ্য নামের কলঙ্ক হয়েও, খালি বেঁচে থাকাটাই যেন জীবনের একমাত্র সার্থকতা।

শিশু-সন্তানের খালি প্রাণটি বাঁচিয়ে রাখবার জন্য, কুসংস্কারবশে আমরা অকারণ এমন সব অনুষ্ঠান আয়োজনের ব্যবস্থা করি যে, তাতে করে সন্তান তো স্বল্পায়ু এবং চিররুগ্ন হয়ই, অধিকন্তু তার এমন মানসিক অধঃপতন ঘটে যার ফলে জাতীয় উন্নতি সুদূরপরাহত হয়। এ তো অনেক দূরের কথা, মোটামুটি শিশুর স্বাস্থ্যরক্ষা বলে জিনিসটা আমরা করিও না, জানিও না। অন্য দেশের সঙ্গে এদেশের শিশুমৃত্যুর তুলনা করলেই তা ধরা পড়ে। এ ছাড়া আঁতুড় বলে যে অমানুষিক ব্যাপারটা ঘরে ঘরে শিশুর বাঁচন- মরণের নিয়ন্ত্রীরূপে বিরাজ করছে, সে কথা ভাবলে সত্যই মনে হয় না যে, আমরা আমাদের অপত্যের শারীরিক বা মানসিক কোনোরকম হিত কামনা করি। আমরা শিশুর মঙ্গলের জন্য শিশুকে স্নেহ করি না, করি শুধু স্নেহ করে সুখ পাই বলে।

অবশ্য আজকাল কোনো কোনো স্থলে আঁতুড়ের একটু-আধটু উন্নতি হয়েছে বটে, কিন্তু আঁতুড় বলে জিনিসটা লোপ পায়নি। তার পর শিশুপালন বলে যে একটা বিজ্ঞানসম্মত বিদ্যা আছে, তাও আমরা স্বীকার করি না। আবার 'যা অদৃষ্টে আছে, তাই হবে' এ সত্যের ওপরও নাকি আমরা দৃঢ় বিশ্বাস করি। এ সত্ত্বেও ছেলের প্রাণটা বাঁচিয়ে রাখবার কতকগুলি অকারণ চেষ্টার যে ঢং দেখাই, তাতে বেঁচে থাকার জন্য বেঁচে থাকাটাই জীবনের প্রধান লক্ষ্য বলে একটা ধারণা ছেলেদের অস্থিমজ্জাগত হয়ে যায়।

লাটবধের জন্য প্রেরিত হত্যাকারী সেদিন অপরাহ্নে শিলং-এ পৌছোল। একটু খোঁজ করতে না করতেই বারীন যে লোকটির কথা বলে দিয়েছিল, পথে তাকে পেল। হত্যাকারীকে তিনি চিরপরিচিতের ন্যায় এত অধিক খাতির দেখালেন যে, তাকে টিকটিকি বলেই প্রথমে তার সন্দেহ হল। পথে যেতে যেতে কথাবার্তায় সে বুঝল, তার শিলং-এ যাওয়ার মতলব আদি সবই ওই ভদ্রলোকটি জানেন।

তিনি তাকে নিয়ে অন্য এক ভদ্রলোকের বাড়ি উঠলেন। সেখানে আরও দু তিন জন এসে জুটলেন। বারীন সেখানে কী করতে গেছল আর কী করেছিল, সবিস্তারে তাকে তাঁরা বললেন। ফুলারসাহেব রোজ সকালে ঘোড়া চড়ে বেড়াতে যেতেন। বেড়াবার পথে কোনো একটা রাস্তায় নাকি এমন সুবিধাজনক স্থান ছিল, সেখান থেকে বোমা ছুঁড়ে ফেললেই লাটসাহেব তো ঘোড়াসমেত কাত হতেনই, অধিকন্তু হত্যাকারী লম্বা দিলে ধরতেও পারত না, দেখতেও কেউ পেত না। কিন্তু বারীন ও

তার সঙ্গী এক দিন একটা গুলি-ভরা রিভলবার ঘষেমেজে সাফ করতে করতে হঠাৎ সেটা আওয়াজ হয়ে গেল। তাতে উক্ত সঙ্গীর হাতের তেলো ফুটো হয়ে গেছল। তাকে তখন নাকি অগত্যা হাসপাতালে যেতে হয়েছিল। তাই লোকজানাজানি হয়ে গেল। যেখানে বারীনরা ছিল, সেখানকার কেউ এ ষড়যন্ত্রের কথা কিছুই জানত না। কাজেই এ ব্যাপারে সন্দেহজনক বলে সেখান থেকে তাদের বিতাড়িত হতে হয়েছিল। আর ফুলারসাহেবও সেই সময় গৌহাটি যাত্রা করেছিলেন। এইসব কারণে শিলং ছেড়ে বারীনকে গৌহাটি ফিরে আসতে হয়েছিল।

বারীনের কাছে শিলং-এর ওই ভদ্রলোকেরা আমাদের গুপ্তসমিতির বৈপ্লবিক কার্যকলাপের সব লোমহর্ষক বিবরণ শুনেছিলেন, তা হলেও ওই হত্যাকারীর কাছে আরও শোনবার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। প্রথমে যদিও তার একটু সন্দেহ হয়েছিল এবং গুপ্তসমিতির কোনো-কিছু একটুও প্রকাশ করবে না বলেই দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়েছিল, তথাপি শেষপর্যন্ত তার সে পণ কার্যত রাখতে পারল না। কারণ, লোকের কৌতূহল বাড়াবার বা তা নিবারণ করবার অথবা কাউকে আশ্চর্যান্বিত করে দেওয়ার একটা সংক্রামক প্রবৃত্তি অনেকেরই মধ্যে আছে। পাঁচ জনের মজলিশে এক জন একটা আশ্চর্যজনক বা কৌতূহল-উদ্দীপক ঘটনার উল্লেখ করলে, সঙ্গে সঙ্গে অন্যেরও সেরকম ঘটনা উল্লেখ করবার প্রবৃত্তি আপনা হতে জেগে ওঠে। অনেক স্থলে তা একটু বেশি চিত্তাকর্ষক করবার জন্য তাতে অনেক মিথ্যার ফোড়ন দিতে হয়। এরকম মিথ্যা ধর্তব্য বা দোষের বলে আমরা মনেই করি না। এতে উভয়ত বেশ আনন্দ উপভোগ করা ছাড়া এমন মিথ্যার কথকরা শ্রোতার ভক্তি ও পূজা পেয়ে থাকে।

রূপকথা যেমন শৈশবের বিষয়, পুরাণ আদিও তেমনই মানবসমাজের শৈশবের জিনিস। আদিকালে এ-হেন শৈশবসুলভ স্বভাবের সুযোগ নিয়ে প্রায় সকল মানবসমাজে এই পুরাণাদির ভিতর দিয়েই প্রচ্ছন্নভাবে সমাজকর্তারা সুবিধামতো সমাজশাসন-উপযোগী ভাব ও শিক্ষা বিস্তার করতেন। এখন অনেক সমাজের জনসাধারণ সেই শৈশবের বেহুঁশ অবস্থা ছাড়িয়ে গেছে। কিন্তু আমাদের ভারতীয় জনসাধারণ এখনও সে অবস্থার মায়া সম্যক কাটাতে পারেনি।

ভারতবাসী আমরা আদিম অবস্থার মানুষের মতো কোনো মহৎ উদ্দেশ্যের অছিলায় বিস্ময় বা কৌতূহল-উদ্দীপক মিথ্যা কথা শুনে অথবা শুনিয়ে ভক্তি-পূজা আদি দিতে বা আদায় করতে আজও অভ্যস্ত। যে দেশের লোকের এখনও এ-হেন স্বভাব, তাদের দ্বারা এরকম গুপ্তসমিতি গঠন যে কেমন বিড়ম্বনা, তা সহজে অনুমেয়।

বারীনের কাছ থেকে শিলং-এর ওই ভদ্রলোকেরা যা জেনেছিলেন, গুপ্তসমিতির মন্ত্রগুপ্তির পুরোদস্তুর নিয়ম রক্ষা করতে হলে তা মিথ্যা বলে উড়িয়ে দেওয়াই ওই হত্যাকারীর উচিত ছিল। কিন্তু তার সে প্রবৃত্তি হল না। তবে নিজ মুখে তেমন-কিছু তাদের না বলে নিজের মনকে বোঝাতে পেরেছিল যে, সে সমিতির নিয়ম রক্ষা করেছে। অথচ তার ভাবভঙ্গির দ্বারা বিলক্ষণ বুঝিয়ে দিয়েছিল যে, তাঁরা যা শুনেছেন, তা অতি সামান্য মাত্র; তার বেশি এমন অনেককিছু আছে—যা তাদের জানানো সংগত নয়।

যাই হোক, বারীনকে এরকম বৈপ্লবিক কাণ্ড সংঘটন করাবার এক জন পাকা তদ্বিরকারক বলেই সে আগে হতে ধরে নিয়েছিল। এখন সে ধারণা সম্বন্ধে তার প্রথম সন্দেহের উদ্রেক হল। লাটবধরূপ এমন ভীষণ ষড়যন্ত্রের ব্যাপার এত লোককে বলা উচিত কিনা সে তর্কও তার মনে তখন এসেছিল।

তখন উচিত বলেই তার মনে হয়েছিল এইজন্য যে, স্থানীয় লোককে এসব কথা না বললে তাদের সাহায্য পাওয়া যেত না, আর স্থানীয় লোকের সাহায্য ব্যতীত এরকম হত্যার কাজ সুসাধ্য হতে

পারে না। এ ছাড়া এই উপায়ে বিপ্লববাদ প্রচারও সহজ হয়, সেই সঙ্গে বিপ্লববাদীদের প্রতি লোকের ভক্তিশ্রদ্ধা বাড়ে। কিন্তু অনুচিত কেন, তা প্রমাণ করার মতো যুক্তি যদিও তার মাথায় তখন আসেনি, তথাপি ওই কাজটা অসংগত বলেই তার মনে লেগেছিল।

পরে কিন্তু অনেক দেখে এবং ভুগে, এই জ্ঞান সে সঞ্চয় করেছিল যে, এরকম ব্যাপারের কথা বলে বেড়ালে, সদ্য যেরকম অত্যধিক পূজা অথবা শ্রদ্ধা জোটে, তাতে স্বদেশের মঙ্গলের জন্য বৈপ্লবিক হত্যা বা কোনো মারাত্মক কাজ করবার ঐকান্তিক ইচ্ছার বদলে, ওইরকম পূজা আদি পাওয়াটাই মুখ্য উদ্দেশ্য হয়ে দাঁড়ায়। তাদেরও ঠিক তাই হয়েছিল। বিশেষত অতিরঞ্জন বা মিথ্যা দ্বারা যে প্রেরণা আসে, তা সাধারণত নিতান্ত ক্ষণস্থায়ী। কারণ, মিথ্যা ধরা পড়তে বেশি দেরি লাগে না। তখন প্রতিক্রিয়ার ঠেলা সামলানো মুশকিল হয়ে পড়ে। কারণ, মানুষ স্বভাবত অল্পবিস্তর ক্ষুদ্র-স্বার্থের দাস। তা ছাড়া এই ভাবের মিথ্যা কথায় প্রথমে বিশ্বাস করে, পরে যখন লোকে বুঝতে পারে যে, সে প্রতারিত হয়েছে, তখন তার ঘৃণা কিংবা ক্রোধ নিজের আহাম্মুকির ওপর না হয়ে, প্রতারকের ওপরেই হয়ে থাকে। তার ফলে প্রতারকের মন্দ কামনা করা প্রতারিতের পক্ষে স্বাভাবিক হয়ে পড়ে। সেইজন্য অনেক স্থলে সেইসকল বিপ্লবীদের প্রদত্ত মিথ্যা বা অতিরঞ্জিত খবরের বেচাকেনা চলে। এইরূপে তা প্রতিপক্ষের অন্যায় উৎপীড়নের অজুহাত হয়। পরবর্তী ঘটনার মধ্যে এসকল কথার যৌক্তিকতা সম্বন্ধে মনোযোগ আকর্ষণ করাবার জন্যই এখানে এত ভণিতার আবশ্যক হল।

পরদিন সন্ধেবেলা সে গৌহাটিতে ফিরে এল। ফুলারবধ না করেই, শিলং-এ আশাতীত শ্রদ্ধা-ভক্তির স্বাদ, সে এমন করে পেয়েছিল যে, বধ করে একটা অক্ষয় কীর্তি রেখে যাওয়ার উচ্চাশাজনিত আগেকার উদ্যম ক্রমে মিইয়ে গেছল। শিলং-এর মতো গৌহাটিতেও দেখল, অনেকে ভিতরের কথা, বারীনের কাছ থেকে জেনেছেন। সেখানেও উক্ত বোমার ভিতরকার একটু গুঁড়ো বের করে তাতে আগুন ধরিয়ে দেখানো হয়েছিল, কেমন ফোঁস করে ওঠে। কাজেই সেখানে খাতিরও বেশ জমেছিল। গৌহাটিতে তিন-চার দিন একসঙ্গে থেকে বারীনকে চেনবার প্রথম সুযোগ তার জুটল।

ফুলারবধের প্ল্যান আগাগোড়া শুনে তা একটু-আধটু পরিবর্তন করবার মতলব দিতে গিয়ে দেখল, বারীনের কাছে ও সবকিছু চলবে না। অথচ নিজের একটা মতলব পাকাপাকি করে ফেলে, সেটা কাজে পরিণত করবার চেষ্টাও বারীনের ছিল না। অর্থাৎ যাকে want of resolution বলে, সেই জিনিসটাই সে দেখতে পেয়েছিল। মোটামুটি ভাবটা ছিল এই যে, আপনা থেকে ফেটে যায়, এমনভাবে বোমাটা ফুলারসাহেবের গতিবিধির পথে রেখে দিয়ে, কোনো নিরাপদ স্থানে গিয়ে তারা যেন শুনতে পায় যে, সাহেব তাদের বোমাতে মারা গেছে। তা করতে শ-দুই হাত লম্বা fuse বা বাতি দরকার। তা পুড়ে বোমাতে আগুন লাগতে যতক্ষণ সময় লাগবে, ততক্ষণে তারা পোঁটলাপুঁটলি নিয়ে অনেক দূরে সরে পড়তে পারে ইত্যাদি।

সেখানে একটি ভদ্রলোক বসে বসে এইসব জল্পনাকল্পনা শুনছিলেন। চুপিচুপি উঠে গিয়ে খানিক পরে তিনি একগাদা কল্পনার অতীত সব জিনিস নিয়ে ফিরে এলেন। আমাদের গুপ্তসমিতির পক্ষে এই জিনিসগুলি হয়ে দাঁড়াল 'রাধার ন-মন তেল'রও-এ অধিক।' রাধার সৌভাগ্যবশত তখনকার দিনে এত অধিক তেল জোটানো অসম্ভব ছিল। কাজেই রাধাকে আর নাচতে হয়নি। কিন্তু তার চেয়েও অসম্ভব জিনিস জুগিয়ে, এখনকার দিনে বারীনকে নাচতে বাধ্য করেছিলেন গৌহাটির ওই অদ্ভুত ভদ্রলোকটি। তিনি বড়ো একটা কথা বলতেন না। বারীনদের মন্ত্রণার মাঝখান থেকে কোনোকিছু অভাবের কথা যখন শুনতেন, অতি দুষ্প্রাপ্য হলেও প্রায় তখনই তা জোগাতেন। যাই হোক, কেবল তাঁরই তখনকার কেরামতিতে শেষপর্যন্ত আমাদের তথাকথিত ইজ্জত রক্ষা হয়েছিল।

তার পর উল্লিখিত বোমা অন্য দুএকটা জিনিস কীরকম কাজ দেবে অথবা আদৌ কাজ দেবে কিনা, দূরে জঙ্গলের মধ্যে গিয়ে পরীক্ষা করে দেখবার জন্য বারীনকে রাজি করা হল। তারা দল বেঁধে অন্ধকার রাত্রে কাদা হেঁটে জঙ্গলের দিকে বেরিয়ে পড়ল। সাহেবপুলিশ পাছে বোমার শব্দ শুনতে পায়, এই ভয়ে পাঁচ-ছ মাইল দূরে যাওয়া স্থির হয়েছিল। কিন্তু মাইল-দুই যাওয়ার পর দলের এক জন বললেন, ওই জঙ্গলে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড হাতি দলে দলে বের হয়। এই না শুনে হাতির ভোঁতা পায়ের তলায় তাদের এমন মূল্যবান প্রাণগুলি খামোখা দেওয়া উচিত যে নয়, তা শাব্যস্ত হয়ে গেল। কাজেই একটু আপশোশ করে দলটা ফিরে এল।

তার পরেও অনেক জল্পনাকল্পনা চলতে লাগল। এইসব থেকে সে বুঝেছিল, ফুলারবধটাই বারীনের কাছে সবচেয়ে বড়ো কাজ ছিল না। বিপ্লববাদ প্রচার আর সেই সঙ্গে আত্মপ্রচারটাই ছিল মুখ্য কাজ। এই প্রচারের ধরনটা ছিল এই যে, তারা ফুলার লাটকে বধ করতে এসেছে; তাদের সঙ্গে বোমা, রিভলবার আদি কত কী আছে; কত বড়ো বড়ো লোক তাদের দলে আছেন; তারা কতরকম ভীষণ কাজ করেছে; এইসব দেখেশুনে ও তাদের সম্পাদিত *যুগান্তর* পড়ে লোকের বোঝা উচিত, তারা কেউকেটা। কাজেই তাদের পূজা দেওয়া উচিত, চেলা হওয়া উচিত ইত্যাদি।

তখন সে কতকটা অনুমান করতে পেরেছিল যে, ফুলারবধের সম্ভাবনা বড়ো কম। অথচ বারীনের মতের বিরুদ্ধে কোনো কথা বলতে গেলে তাঁর সঙ্গে বনিবনা তো হবেই না; অধিকন্তু 'ক'বাবুর বিরাগভাজন হতে হয়। কাজেই এখন থেকে *ডন-কুইকসোটে*-এর স্যাঙ্কো পাঞ্জার মতো তাকে বারীনের আজ্ঞাবহ অনুচর হতে হল। স্যাঙ্কোর মতো তার মাঝে মাঝে যখন কাণ্ডজ্ঞান জন্মাত, তখন বারীনের ওপর মনে মনে ভারী চটে যেত। আর অন্য সময়ে স্বাধীন ভারতে একটা অক্ষয় কীর্তি রেখে যাওয়ার আশায় বারীনের সকল কথায় সায় দিয়ে চলাই উচিত বলে মনে করত। কিন্তু এও সত্য যে কুইকসোটের মতো বারীনের অনন্যসাধারণ অনেক গুণে এই ভারতীয় স্যাঙ্কোও মুগ্ধ হয়েছিল।

তিন-চার দিন পরে সেই অদ্ভুত জোগাড়ে লোকটার কৃপায় বারীনরা জানতে পারল, ফুলার সাহেবের যে ভ্রমণ বিবরণী (tour programme) সাধারণকে জানাবার জন্য বের হত, সে অনুযায়ী কাজ হত না। অর্থাৎ অন্য যে বিবরণী অনুযায়ী লাটসাহেব ভ্রমণ করতেন, তা সাধারণকে জানতে দেওয়া হত না। এ থেকে অনুমান করা যেতে পারে যে, লাটসাহেবকে কেউ যে হত্যা করতে পারে, এ সন্দেহ তার মনে স্থান পেয়েছিল।

যাই হোক, গুপ্ত ভ্রমণবিবরণী থেকে তারা জানতে পেরেছিল, বরিশালে গিয়ে সাহেবকে ধরতে পারবে। তাই আমাদের স্যাঙ্কোকে সঙ্গে করে বাংলার কুইকসোট স্টিমার-যোগে বরিশাল রওয়ানা হল। দিনকতক পরে এক দিন সকালবেলা ঘাট থেকে একটু দূরে তাদের স্টিমার গিয়ে দাঁড়াল। তখন তারা দেখল, জেটিতে ফুলারসাহেবের স্পেশ্যাল স্টিমার 'ব্রহ্মকুণ্ড' ভিড়ানো রয়েছে; ঘাটের ওপরে রাস্তার দু-ধারে কাতারে কাতারে বিস্তর লালপাগড়ি পাহারা দিচ্ছে। টুপি, সামলা, কোট, চোগা, চাপকান আদি নানা বেশধারী হরেকরকম লোক লাট-অভ্যর্থনার জন্য ভিড় করে দাঁড়িয়ে আছেন।

'ব্রহ্মকুণ্ড' হতে নেমে অভ্যর্থনা সেরে ফুলারসাহেব বরিশাল শহরে প্রবেশ করলেন। পূর্ব-উল্লিখিত বরিশালের প্রাদেশিক কনফারেন্সের পর লাটসাহেবের এই প্রথম আগমন। সামনে দিয়ে একটা প্রকাণ্ড বাঘ দূরে চলে গেলে; নতুন কাঁচা শিকারির যে সোয়াস্তিমিশ্রিত আপশোশ হয়, ফুলার-শিকারীদেরও প্রায় তাই হয়েছিল।

এমন দাঁওটা হাতছাড়া হল, এই দুঃখ করতে করতে বোমা রিভলবার আদি পূর্ণ দুটো ব্যাগ ঘাড়ে করে আমাদের স্যাঙ্কো কুইকসোটের পিছনে পিছনে, গেঁয়ো চালে যেতে যেতে, ঘেরাও ঘরওয়ালা

হোটেল খুঁজে কোথাও পেল না। সব হোটেলে তিন দিকে চাঁচড়ার বেড়া দেওয়া সারি সারি বাঁশের মাচান আগন্তুকদের থাকবার জন্য নির্দিষ্ট। এত সাংঘাতিক জিনিসপত্র নিয়ে ওরকম জায়গায় থাকা নিরাপদ নয় দেখে অগত্যা তারা এক জন স্বদেশি নেতার বাড়িতে উঠে পড়ল। তিনি কুলপরিচয় জেনে বারীনকে খুবই খাতিরযত্ন করলেন।

সেই সময়ে বরিশালে ভীষণ দুর্ভিক্ষের জন্য স্বর্গীয় লোকপূজ্য অশ্বিনীবাবুর বাড়িতে দাতব্য ভাণ্ডার খোলা হয়েছিল। তিনি দিনরাত কীরকম অক্লান্ত পরিশ্রমে লোকসেবা করতেন, তা দেখে হতভম্ভ হয়ে যেতে হত। বরিশাল ছাড়া আশেপাশের অন্য জেলা হতেও নিত্য শত-শত লোক শুধু অন্নবস্ত্র ভিক্ষার জন্য নয়, নানা বিষয়ের পরামর্শ করতে বা উপদেশ নিয়ে আসত। কারও ছেলে কিংবা মেয়ের বিয়ে, কী করবে পরামর্শ চাই, কারও গৃহস্থালি ঝগড়া, কারও ছেলে অবাধ্য, কারও বা ব্যারাম সারে না, কারও গোরু হারিয়েছে, ইত্যাদি যত-কিছু মুশকিল, অশ্বিনীবাবুর কাছে তার আশানের ব্যবস্থা না নিলেই নয়। বড়োই আশ্চর্য এই যে, কেউ প্রায় হতাশ হয়ে ফিরত না। যদি দেবতা বলে কিছু থাকে, তবে অশ্বিনীবাবু তাই ছিলেন।

বরিশালবাসীগণ, বিশেষত যুবকগণ, অশ্বিনীবাবুর গুণের মর্যাদা উপযুক্ত রকমেই করেছিলেন। কিন্তু আত্মমর্যাদার ভিত্তি, যে আত্মনির্ভরতার ওপর গঠিত, আর আপন বিচার বুদ্ধির অনুশীলন দ্বারা যে আত্মশক্তি উপলব্ধি হয়, তা যেন তাঁরা খুব বেশি করে ক্ষুণ্ণ করেছিলেন। আমাদের ভক্তির দেশে আমার এ কথাটা আপাতত নেহাত ধৃষ্টতার পরিচায়ক বলেই বিবেচিত হবে। কিন্তু এ কথাও ধ্রুবসত্য যে, পরনির্ভরতা বলে জিনিসটা, দেশের নেতা, বিদেশি কর্তা বা স্বয়ং ভগবানের ওপর হলেও যতদিন আমাদের স্বভাবে তা থাকবে, ততদিন, যে-কোনো স্বাধীনতার জন্য এই তথাকথিত বিপ্লব-চেষ্টা, যা ইদানীং শুরু হয়েছিল, কার্যত অসম্ভব থাকবেই।

বারীন বড়ো আশা করেছিল, বরিশালে একটা মস্তবড়ো বৈপ্লবিক গুপ্তসমিতি দেখতে পাবে, অথবা সহজে সেরকম একটা গড়ে তুলতে পারবে। কারণ, সদ্য কয়েক মাস আগে উক্ত বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মিলনীর অধিবেশনে বাংলার তখনকার সমস্ত বড়ো বড়ো নেতাদের এমন লাঞ্ছনা, বরিশালবাসী, বিশেষ করে সেখানকার ছাত্রগণ নিজেদের চোখে যেমনটি করে দেখেছিল, দেশে তেমন আর কোথাও কেউ তখনও দেখেনি। তার পর 'পিটুনি পুলিশ'-এর পিটুনি যেমন তারা হজম করেছিল, এমনটিও সে যাবৎ কেউ করেনি। বরিশালের ব্যাপার সম্বন্ধে কাগজে পড়েই অন্য স্থানের কত লোক বিপ্লববাদে নতুন করে সহানুভূতি না দেখিয়ে পারেনি। ওই ঘটনার পর বৈপ্লবিক দলে টেনে নেওয়ার সবচেয়ে অমোঘ মন্ত্র হয়েছিল বরিশালের লাঞ্ছনার উল্লেখ করা। তাই বারীনের মনে ভয়ও হয়েছিল, কলকাতার ওপর চাঁটি মেরে 'পুণ্যেবিশাল বরিশাল'ই বুঝি বিপ্লবের পীঠস্থান হয়ে দাঁড়ায়।

বারীন প্রথমে সেখানকার অনেক সভাসমিতির সঙ্গে ভিড়ে গিয়ে খুঁজতে লাগল, তাদের ভিতরের মতলব কী। সপ্তাহখানেক পরে যখন দেখল, বৈপ্লবিক ভাবের কোথাও নামগন্ধও নেই, তখন নিজের মামুলি কায়দা আরম্ভ করল, অর্থাৎ তারা যে কত বড়ো বৈপ্লবিক গুপ্তসমিতি গড়ে তুলেছে, সমস্ত বাংলা দেশে তার যে কত শাখাকেন্দ্র খোলা হয়েছে, ভারতে অন্য প্রদেশে যে ওইরকম সমিতির কাজ কত এগিয়ে গেছে ইত্যাদি এমন কায়দাদোরস্ত করে বারীন বলতে লাগল, আর শ্রোতারা শুনে, অন্তত খালি তখনকার মতো, বিপ্লবের ভাবে এমন অনুপ্রাণিত হয়ে গেল যে, তা দেখে বারীনের ওপর আমাদের স্যাঙ্কোর ভক্তি গদগদ হয়ে উঠল।

সেখানকার ছাত্রমহলে তখন এক জন অপ্রতিদ্বন্দ্বী মোড়ল ছিলেন। প্রথমে তাঁর স্কন্ধে চাপাবার চেষ্টা হল। তাঁকে বোমার মশলা কিছু সংগ্রহ করে দিতে হবে আর তাঁর বাড়িতে লুকিয়ে বোমা আদি রোদে শুকিয়ে নিতে হবে, এই ছুতো করে তারা ওই ভদ্রলোকটির বাড়ি গিয়ে তাদের ব্যাগ খুলে, সব তোড়জোড় দেখাল, আর মামুলি কায়দায় বচনও অনেক ঝাড়ল। কিন্তু এত করেও বরিশালে উলটো ফল ফলল। সেখানে কেবল একমাত্র কর্তার ইচ্ছায় কর্ম হয়।

ফুলারসাহেব দু এক দিন পরে সেখান থেকে নিরাপদে চলে গেলেন। তখন পূর্বোক্ত কনফারেন্সে দুর্ঘটনার কর্তা যেসকল সাহেব (মি. কেম্প আর মি. ইমারসন?)— তাঁদের বধ করবার চেষ্টা করতেই হবে, এই অছিলায় সেখানে তাদের কিছুদিন থাকা দরকার হয়ে পড়ল। তাই সাহেবদের কুঠি, ক্লাবহাউস এবং সাহেবদের অন্যান্য গতিবিধির স্থান চিনিয়ে দেওয়ার জন্য অর্থাৎ reconnoiter করবার জন্য, সেখানকার জনকতককে তাদের সাহেব-বধের মতলবটা আগেই বলতে হয়েছিল। তারা যে সেখানে একটা হত্যাকাণ্ড ঘটাবার চেষ্টায় আছে, এ কথাটা অনেকের মধ্যে খুব সম্ভব এই কারণে জানাজানি হয়ে গেছল। এইজন্যই হোক বা পূর্বোক্ত মোড়লমশায়ের কাছে শুনেই হোক, সেখানকার কর্তা, বিপ্লববাদের বিরুদ্ধে নাকি নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিলেন। তাই অন্য স্থানের মতো সেখানে যুবকদের মধ্যে সাড়া না পেয়ে তর্কযুদ্ধে কর্তাকে জয় করবার জন্য আমাদের কুইকসোট, তাঁর কাছে বৈপ্লবিক গুপ্তসমিতি গঠনের আবশ্যকতা সম্বন্ধে কথা তুলতেই, বাংলার অন্য নেতাদের মতো তিনি আগেই বলে দিলেন, তিনি যে পথে চলছেন সে পথ ছেড়ে, নতুন করে অন্যপথে যাওয়ার তাঁর সামর্থ্যও নেই প্রবৃত্তিও নেই।

তার পর সেই দিনই তিনি আমাদের কুইকসোট ও স্যাঙ্কোকে, 'ধরি মাছ না ছুঁই পানি' করে পুলিশের হাতে ধরিয়ে দেওয়ার এমন একটা কৌশল খেললেন যে, তারা পরদিন ভোরে পাততাড়ি গুটিয়ে পালাতে বাধ্য হয়েছিল।

সেখানে একটাও রিভলবার কারও কাছে ছিল না। একটা এমন অস্ত্র কাছে থাকলে, আবার কোনো দুর্ঘটনার সময়, উত্তেজনার বশে সেটার যদি সদ্ব্যবহার হয়ে যায়, হয়তো এই আশায়, তারা উক্ত মোড়ল- মশায়কে একটা ভালো রিভলবার দিয়ে এসেছিল। কয়েক মাস পরে স্বয়ং মোড়লমশায়ের বরাতে তাদের প্রত্যাশিত লাঞ্ছনাও লাভ হয়েছিল। পুলিশের তোফা ঠ্যাঙানি খেয়ে রিভলবারের সদ্ব্যবহারের বদলে কর্তার হুকুম নিয়ে, খবরের কাগজে লেখা, আর সাহেবকে বলে দেওয়ারূপ অস্ত্রের না কি শুধু পাঁয়তাড়া দেখিয়েই বীরচূড়ামণি বলে, বিশেষ করে ছাত্রমহলে, তিনি পূজিত হয়েছিলেন।

উল্লিখিত কনফারেন্সের সময় একটা বালক পুলিশের অজস্র ডান্ডা খেয়েও 'বন্দেমাতরম' বলা বন্ধ করেনি। তার পরের ডান্ডা-পেটা হতে হতে নিকটের একটা পুকুরে গিয়ে পড়ে; তখনও ডুব দিতে দিতে 'বন্দেমাতরম' বলে আরও ডান্ডা খেতে থাকে। চারিদিকে অনেক লোক দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বালকের সেই অপূর্ব বীরত্ব দেখে গৌরব অনুভব করছিল, আর দেশীয় প্রায় সকল খবরের কাগজে পরে বড়ো বড়ো অক্ষরে লিখিত সেই বীরত্বের কাহিনি পড়ে প্রায় বাঙালিমাত্রেই তখন ধন্য হচ্ছিল।

ওপরের ঘটনাগুলি থেকে সহজে অনুমিত হয় যে, বাংলা দেশে অহিংসবাদটা সদ্য নতুন পাওয়া নয়। এটা বাঙালি-চরিত্রের ভিতরকার জিনিস, বাঙালি চরিত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য, আর গৌরবের বস্তু। এই অহিংসবাদের খাতিরেই বাঙালি সৈন্যশ্রেণিভুক্ত হতে পারে না। সত্যি করে সদ্য মারামারি-কাটাকাটির কোনো সম্ভাবনা নেই, তথাপি 'ইউনিভারসিটি কোর'-এ বিশেষ চেষ্টা সত্ত্বেও যথেষ্ট সৈন্য জোটে না। এ বিষয়ে দুনিয়াতে আমরা অতুলনীয়।

আমাদের কুইকসোট আর স্যাঙ্কো আবার গৌহাটি রওয়ানা হল। পথে এক দিন চাঁদপুরে নেমেছিল। পূজাও পেয়েছিল। গৌহাটি এসে জানতে পারল লাটসাহেব রংপুর দিয়ে যাবেন। দু তিন দিন পরে তারা রংপুর রওয়ানা হল। সেখানে প্রথমে থাকবার স্থান জোটেনি। তখন সেখানে স্বদেশি আন্দোলন পুরোমাত্রায় চলছিল। একটি গুপ্তসমিতিও সবে গড়ে উঠেছিল। লাঠিখেলা, কুস্তি, দৌড়োনো, এয়ারগানে চাঁদমারির তালিম ইত্যাদি চলছিল। দু তিন জন ভদ্রলোক অন্তরের সহিত এইসব কাজে লেগে পড়েছিলেন। তাঁরাই সেখানকার নেতা ছিলেন। উপনেতার বোধ হয় বেশি বাড়াবাড়ি ছিল না। কর্মী ছিল কতকগুলি বালক।

সেখানকার সমিতিও মেদিনীপুর সমিতির মতো কলকাতার কেন্দ্রসমিতির আধিপত্যের জ্বালায় অস্থির হয়ে উঠেছিল। কলকাতা থেকে নেহাত অর্বাচীন বালক বা যুবক, নিজেকে কলকাতার কেন্দ্র থেকে প্রেরিত প্রচারক বা পরিদর্শক বলে পরিচয় দিয়ে, কলকাতার বাইরে স্থানীয় প্রবীণ নেতাদের ওপর বৃথা চাল মারত, আর টাকা আদায়ের চেষ্টা করত। রংপুরে কটি প্রবীণ ভদ্রলোক এজন্য কলকাতার নেতাদের ওপর হাড়ে হাড়ে চটেছিলেন। তাই বারীনকে তাঁরা খুব একচোট শুনিয়ে দিলেন। অনেক লোক সেখানে ছিলেন। বারীন এত লোককে এঁটে উঠতে পারল না। বোমা রিভলবার আদি দেখানোর অথবা লাটবেলাট বধ mission-এর টোপ ফেলবারও সুবিধা পেল না। অগত্যা কয়েকজন বিশেষ ব্যক্তিকে বলল যে, তাঁদের মধ্যে বিশিষ্ট কোনো এক জনকে গোপনে, তাদের রংপুরে আসবার গুরুতর উদ্দেশ্য, আর সেজন্য স্থানীয় নেতাদের সাহায্য কীরকম দরকার, তা বলতে পারে। তাঁরা একজনকে পাঠালেন। সন্ধ্যার পর নির্জন এক পুকুরঘাটে তাঁর সঙ্গে কথা আরম্ভ হল। স্যাঙ্কোও আত্মারাম 'সরকারের ঝুলি' অর্থাৎ বোমা আদি-পূর্ণ দুটি ব্যাগ ঘাড়ে করে গেছল। যেসকল কথাবার্তা হয়েছিল, তার ভাবটা ছিল এই— কলকাতার গুপ্তসমিতি কতসব গুরুতর ব্যাপার সাধন করে ফেলেছে, জিলায় জিলায় কতসব কেন্দ্র খুলেছে, সমস্ত ভারতময় আর আমেরিকা-ইউরোপেও তাদের লোক গিয়ে কীরকম জোগাড়যন্ত্র এবং কাজ করছে, আরও অনেককিছু, যার সবটা খুলে বলা গুপ্তসমিতির নিয়মবিরুদ্ধ বলেই বলতে পারছে না। খালি ইঙ্গিতে মাত্র কিঞ্চিৎ জানাতে বাধ্য হচ্ছে ইত্যাদি। অবশেষে ঝুলি থেকে বোমা বের করে, তা থেকে একটু গুঁড়ো নিয়ে দেশলাই ধরিয়ে দিতেই, অমনি ফোঁস করে জ্বলে উঠল। তার পর বলেছিল, রিভলবার দুর্ঘটনার জন্য শিলং-এ ফুলারবধের চেষ্টা ফসকে গেছে, তাই রংপুরে সেই চেষ্টা তারা করতে এসেছে। এইসকল দেখেশুনে সেই ভদ্রলোক খুশি হয়ে গেলেন। আমাদের কুইকসোট ও স্যাঙ্কোর থাকার এবং ভোজনের ব্যবস্থা হয়ে গেল। আর সাধ্যমতো সাহায্য করতে তাঁরা রাজিও হলেন। আমাদের স্যাঙ্কো বচনের সাফাই দেখে মনে মনে বারীনকে বেজায় তারিফ করেছিল। যাই হোক, এই প্রকারে তারা দুজন রংপুরে বেশ আড্ডা গেড়ে বসল, আর নিরাপদে ফুলারসাহেবকে কীরকম করে মারা যেতে পারে, তার মতলব আঁটতে লাগল।

অনেক মতলব ভাঙাগড়ার পর অবশেষে স্থির হল এমনভাবে রেললাইনের নীচে বোমা পুঁতে রাখতে হবে যেন গাড়ি সেই লাইনের ওপর এসে পড়ামাত্র আপনা হতে বোমা ফেটে ট্রেনখানা ভেঙে চুরমার হয়ে যায়। তখন এই মতলব কাজে পরিণত করবার আবশ্যক জিনিস কেনবার জন্য, স্যাঙ্কো কলকাতা রওনা হল। সেখানে 'ক' বাবুর কাছে, সে যাবৎ ফুলারবধ চেষ্টার সমস্ত বিবরণ বলে টাকার অভাব জানাল। তিনি তৎক্ষণাৎ প্যাঁটরা হাতড়ে, সবসমেত পঁচিশটা টাকা মাত্র তাঁর সম্বল আছে, দেখালেন। তাই স্যাঙ্কোর হাতে তুলে দিলেন। দরকারি দু একটা কিছু কিনে সে সেই দিনই রংপুরে যাত্রা করল।

আমাদের কুইকসোট স্যাঙ্কোর মারফত আশানুরূপ টাকা না পেয়ে 'ক' বাবুকে টাকা পাঠাবার জন্য আবার তাগাদা দিয়েছিল। টাকার কোনো উপায় না দেখে, 'ক' বাবু নরেন গোঁসাইকে রংপুরে পাঠিয়ে আদেশ দিলেন, ডাকাতি করে টাকা সংগ্রহ করা চাই।

ডাকাতিতে নরেন গোঁসাই সবচেয়ে পটু বলে ধরে নেওয়া হয়েছিল। আর সে-ও সেইভাবে বড়াই করত। সে ছিল শ্রীরামপুরের প্রসিদ্ধ জমিদার গোঁসাইবাবুদের এক জন বংশধর। তিন-চার পুরুষ আগে বাংলার অনেক জমিদারই উক্ত কর্মে নিপুণতা দেখাতে পারলে যে গৌরব অনুভব করতেন সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। তবে শ্রীরামপুরের গোঁসাই জমিদাররা কখনও তেমন নিপুণ ছিলেন কি না জানি না। আমাদের গুপ্তসমিতির আর্থিক অবস্থা বিশেষ করে প্রধান কেন্দ্রের অবস্থা কেমন ছিল, এ থেকে তা সহজে অনুমিত হতে পারে। আমাদের বদ্ধমূল ধারণা ছিল (এখনও আছে, বরং বেশি হয়েছে), অর্থকরী-কর্ম সম্পূর্ণভাবে ত্যাগ না করলে কেউ দেশ উদ্ধারের প্রকৃত নেতা, এমনকি, সামান্য কর্মীরও যোগ্য হতে পারে না।

তার পর ধুবড়িতে এক জন লোক এইজন্য পাঠানো হল যে, লাটসাহেব স্পেশাল ট্রেনে রংপুরের দিকে রওনা হলেই সে তৎক্ষণাৎ রংপুরে টেলিগ্রাম করবে। তা হলে রংপুরে এই ট্রেন পৌঁছোবার ঘণ্টাখানেক পূর্বে, সেখানকার স্টেশন থেকে এক মাইল আগে, একটা সুবিধামতো জায়গায়, লাইনের তলায় ব্যাটারি লাগিয়ে বোমা রেখে আসা হবে। আর ওই স্টেশনের বিপরীত দিকে এক মাইল দূরে, আমাদের স্যাঙ্কো ও মজঃফরপুর বোমার ব্যাপারে প্রফুল্ল চাকি, লাইনের ওপর লাল লণ্ঠন নিয়ে হাজির থাকবে। লাটসাহেবের স্পেশাল ট্রেন রাত্রেই রংপুর স্টেশন দিয়ে যাবে বলে ধরে নেওয়া হয়েছিল। লাল আলোটা এমনভাবে লাইনের ওপর রাখা হবে, দূর থেকে যেন মনে হয়, একটা লোক লাল আলো ধরে দাঁড়িয়ে আছে। যদি স্টেশনের ওধারে উক্ত বোমা কোনো গতিকে ফসকে যায়, তা হলে লাটসাহেবের স্পেশাল ট্রেন, স্টেশনের এধারে এসে লাল আলো দেখে, নিশ্চয় দাঁড়াবে। তখন দু-দিক থেকে ওই দু-জন রিভলবার নিয়ে লাটসাহেবের কামরাতে উঠে পড়ে গুলি চালাবে।

আক্রমণের এই দুটি মতলবের, শেষটার ওপর একেবারে আমল দেওয়া হয়নি। কারণটা বোধ হয় এই ছিল যে, শেষটাতে প্রথমটার চেয়ে কার্যসিদ্ধির সম্ভাবনা যেমন অনেক বেশি ছিল, কার্যসিদ্ধির পর ধরা পড়ে ফাঁসিতে ঝুলবার ভয়ও তেমনই ছিল। এই প্রচেষ্টা গোড়াতে যাই হোক, পরে ক্রমশ যত দেরি হতে লাগল, ততই কেবল অছিলা রূপে পরিণত হল; বিপ্লববাদ প্রচার আর সেই সঙ্গে আত্মপ্রচারটাই হয়ে দাঁড়াল প্রধান কাজ।

এই বন্দোবস্ত পাকা করবার পর ডাকাতির চেষ্টা শুরু হল। কারণ ফুলারসাহেবের রংপুরে যাওয়ার দেরি ছিল।

উৎস : *'বাংলায় বিপ্লব প্রচেষ্টা'*, নবম পরিচ্ছেদ।

বাঙালির গান

কাজী মোতাহার হোসেন

সংগীতের ভিতর দিয়াই জাতীয় জীবনের মর্মকথা প্রকাশিত হয়। হৃদয়ের গভীর অনুভূতির যে এক অনির্দেশ্য ছায়াময় রূপ আছে, সংগীতের অস্পষ্টতার ভিতর দিয়াই তাহার সুন্দরতম প্রকাশ হয়। সাধারণ ভাষার অর্থ সুনির্দিষ্ট, সূচিমুখের ন্যায় চোখা চোখা। বিন্দুর পর বিন্দু-সম্পাতে রেখাপাত হইতে পারে বটে, কিন্তু তাহা কখনও তুলির পোঁচের মতো সমগ্র হয় না। সংগীতে সুরের খেলা যেন তুলির পোঁচ বুলাইয়া মনের মধ্যে এক অখণ্ড সৌন্দর্য বা রূপের কল্পনা জাগাইয়া তোলে। সংগীতে ব্যবহৃত হাবভাব নৃত্যাদি মনের স্বাভাবিক ভাব সঞ্চারের অপরূপ প্রকাশ। গীতের ভাষা দ্বারা অতীন্দ্রিয় ভাবকে যেন একটু কায়া দেওয়া হয়। তখন এই স্থূলতার উপযুক্ত সমাবেশে অপূর্ব কায়া-ছায়াময় ভাবের খেলা সম্পূর্ণ হয়, এবং অনেকটা ধরা-ছোঁওয়ার ভিতরে আসে।

যে কথা গদ্যেই সম্পূর্ণ প্রকাশ করা যায়, তাহাকে যেমন পদ্যে গাঁথিবার প্রয়োজন নাই, তেমনি যে ভাব পদ্যেই সুপ্রকাশিত হইতে পারে, তাহাকে আর সংগীতে ফুটাইয়া তুলিবার সার্থকতা কী? পদ্যে এমন কিছু অনির্বচনীয়তা আছে, যাহার প্রকাশ গদ্যে অসম্ভব: আবার সংগীতে এমন একটু আবেগ-বিহ্বলতা আছে, যাহা পদ্যের ছন্দে বা ভাষায় ধরা দেয় না। এই কথাটি মনে রাখিলে, সংগীতে কথা ও সুর লইয়া যে দ্বন্দ্ব চলিয়াছে, তাহার স্বরূপ উপলব্ধি করা যাইবে। শুধু সুরে সংগীত হয়, কিন্তু সুরবিহীন কথায় সংগীত হয় না। যন্ত্র-সংগীতে রাগ-রাগিণীর আলাপ ও গৎ শ্রোতার মনে যে ভাবোদ্রেক করে, বা যন্ত্রীর মনের যে সব কল্পনা ও ভাবকে প্রকটিত করে, তাহাতেই সংগীতের সার্থকতা। যে হৃদয়ে ভাব উদ্‌বুদ্ধ হইবে, পূর্ব হইতেই তাহার ভিতরে যথেষ্ট পরিমাণে উৎকর্ষ বা ভাব-গ্রহিতা থাকা চাই। ব্যক্তিগত বিশেষ ভাবকে অতিক্রম করিয়া, তাহার ভিতরকার সর্বজনীনতা উপলব্ধি করাই প্রকৃত সংগীত-রসজ্ঞের কাজ। কাজেই সমঝদারের সংখ্যা অল্প হওয়াই স্বাভাবিক। এইভাবে দেখিতে গেলে সংগীতকে বারোয়ারি ব্যাপার বলা চলে না— এ কেবল জনকয়েক গুণী লোকেরই উপভোগ্য।

তাহা হইলে সংগীতের ভিতর দিয়া "জাতীয় জীবনের মর্মকথা" কীরূপে প্রকাশিত হইতে পারে, স্বভাবতই এই প্রশ্ন আসিয়া পড়ে। বাস্তবিক পক্ষে যাহাদের মর্মকথা প্রকাশিত হয়, তাঁহারা কয়েকজন

অতিশয় বিশেষ লোক— গুণী স্রষ্টা ও দরদি বোদ্ধা। কিন্তু কোন জাতির বিশিষ্ট প্রতিভাবান শিল্পীর সৃষ্টিই (হয়ত একটু রূপান্তরিত ভাবে) সাধারণের সম্পদ হইয়া থাকে। সুর-স্রষ্টাগণ পারিপার্শ্বিক অকথা ও ব্যাপারাদি হইতে রস সঞ্চয় করিয়া যে-কল্পনা ও ভাবের মূর্তিদান করেন, তাহা সাধারণের অন্তরতম অব্যক্তভাবের অভিব্যক্তি, এবং অনেকটা তাহার ভবিষ্যৎ আদর্শের নিয়ন্ত্রকও বটে।

সুরের ঝংকারে ঠিক কোন্ ভাবটি প্রকাশ করা স্রষ্টার অভিপ্রেত, তাহার একটু ইঙ্গিত পাওয়া যায় বোল বা বাণী হইতে। এরূপ কথা দ্বারা ভাব-ব্যঞ্জনার বহুলতা একটু ক্ষুণ্ণ হইতে পারে, তবুও অনেকের পক্ষেই বোধ-সৌকর্যের জন্য ইহার প্রয়োজন আছে। তাই, ভিন্ন ভিন্ন শ্রোতার উপযোগী হইতে হইলে, বাণীর পরিমাণও কম বেশি হওয়া চাই। এক দিকে উচ্চাধিকারীর জন্য যেমন বাণীবিহীন সুরই যথেষ্ট; অন্যদিকে নিম্নাধিকারীর জন্য তেমন বাণীবহুল পদাবলি না হইলে চলে না। সংগীত এক দিকে যেমন সুরের খেলায় বাষ্পায়িত, অন্য দিকে তেমনি পদের আবৃত্তিতে ভারাক্রান্ত। অধিকাংশের জন্য মধ্যপথই প্রশস্ত।

সুর হিসাবে দেখিতে গেলে বাঙালির সেতার, এস্রাজ, বেহালা বাঁশি, কাঁসি, শানাই, কর্নেট, তবলা, মৃদঙ্গ, হারমোনিয়ম, খোল, করতাল, আবার কদাচিৎ বীণ, শারদ, রবাব, জলতরঙ্গ প্রভৃতি দেশি বিদেশী নূতন পুরাতন নানারকম যন্ত্রে সুর বেসুর সব রকমই বাজে। ইহাদের মধ্যে কতকগুলি যন্ত্র একক বাজাইলে অতি মনোহর শুনায়; আবার কতকগুলি একক বাজাইলে দুঃসহ বোধ হয়, কিন্তু অন্য যন্ত্রের সহযোগে বাদিত হইলে, অনেকটা সুসহ হয়। রাগ-রাগিণীর সুর-বিস্তার, তাল-লয়ের নিখুঁত হিসাব, গমক, মিড়, মূর্ছনা তেহাই প্রভৃতির দ্বারা মনোহর ভাবে রাগিণীর মূর্তি প্রকটিত করিয়া তুলিবার কৌশল আমাদের দেশে ওস্তাদদের ভিতর বেশ পরিণতি লাভ করিয়াছে। কিন্তু পাশ্চাত্য সংগীতে ব্যবহৃত 'হারমনি' বা কর্ড না থাকাতে মনে হয় আমাদের সংগীত কিছু অপুষ্ট—নিবিড়তা থাকিলেও ইহাতে ব্যাপকতা নাই; ইহাতে গীতিকাব্যের মাধুর্য আছে, কিন্তু মহাকাব্যের বিশালতা নাই। তারের যন্ত্রে চিকারি ও জুরির সাহায্যে সুরকে পুষ্ট করিবার যে পদ্ধতি আছে, তাহা অতি সামান্য। শুনিয়াছি মৈহর নামক স্থানে ওস্তাদ আলাউদ্দীন পাশ্চাত্য ধরনে কন্সার্ট ও ব্যান্ডের পরিকল্পনা করিয়া শিষ্যদিগকে তৈয়ার করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। এ স্থলে বলিয়া রাখা ভাল, আধুনিক ইউরোপীয় কোরাস্ ও অরকেস্ট্রা গঠন করিতে সময় সময় আড়াই শত হইতে তিন শত লোকের প্রয়োজন হয়। যাহা হউক, হারমনির ব্যবহার ব্যতিরেকেই গমক, তান, প্রক্ষেপ প্রভৃতির সাহায্যে ভারতীয় সংগীত,— সঙ্গে সঙ্গে বাঙালির সংগীত— যতটা ভাব-প্রকাশ-ক্ষম হইয়াছে তাহাতে সমগ্র জাতির সুর বিচার ও রস-বোধের প্রশংসাই করিতে হইবে।

সুরের পরিকল্পনা, রাগ-রাগিণীর পরিপূর্ণ রূপ বিস্তার, একটি জাতির শ্রেষ্ঠ কল্পনা ও ধ্যান-ধারণার বিষয়; তার লক্ষ্য শুধু আর্টের আনন্দ বা সৌন্দর্য-রস সৃষ্টি। সেখান হইতে নামিয়া আসিয়া আমরা ব্যবহারিক ক্ষেত্রে সুরকে নানা উদ্দেশ্যের পরিচারক রূপে দেখিতে পাই। সং সাজিয়া গানের সাহায্যে ঔষধের বিজ্ঞাপন দেওয়া, রেল স্টিমারে বা রাস্তায় গানের সাহায্যে ভিক্ষা করা এবং এরূপ আরও কয়েক স্থলে সংগীতের দুর্গতি দেখিয়া বাস্তবিকই দুঃখ হয়। যাহা হউক, এরূপ নিকৃষ্ট শ্রেণির গানের আলোচনা না করিয়া সাধারণভাবে কণ্ঠ-সংগীতের কয়েকটি বিভাগ সম্বন্ধে কিছু বলিবার চেষ্টা করিতেছি।

প্রথমেই বলিতে হয়, বাঙালি ভাবপ্রবণ বা ভক্তিপ্রবণ জাতি। এজন্য ভক্তিরসাত্মক ও পরমার্থ বিষয়ক গানের প্রাচুর্য থাকা খুবই স্বাভাবিক। বাঙালি জাতি আবার বাক্‌চতুর। এজন্য বাংলা গান পদ বহুল। হিন্দুস্থানি গান যেখানে চার লাইনেই সু-সমাপ্ত হইয়া যায়, সেখানে গড়পড়তায় বাংলা গানের দৈর্ঘ দশ বারো লাইন হইবে। গানের দৈর্ঘ্য হিসাবে ইহা উর্দু বা পার্শি গজলের সহিত তুলনীয়। তাহা ছাড়া

বাঙালির কীর্তন, পাঁচালি, পদাবলি এবং পালাগান প্রভৃতি দৈর্ঘ-হিসাবে বোধ হয় অতুলনীয়। নিধুবাবুর টপ্পার পূর্ববর্তী কাল পর্যন্ত বাংলায় প্রণয়-সংগীতের খুব অভাব দেখিতে পাওয়া যায়। মনে হয় তখন পর্যন্ত দেব-দেবীর লীলা হিসাবেই প্রণয়-সংগীতের চর্চা হইত। লৌকিক ভাব দেব-দেবীর উপর আরোপ করিয়া তাহারই আড়ালে প্রচ্ছন্নভাবে প্রণয়-সংগীত গাওয়া হইত। নিধুবাবুই সর্বপ্রথম হিন্দুস্থানী সংগীতের রীতিতে প্রত্যক্ষভাবে বহুতর বাংলা প্রণয়-সংগীত রচনা করেন, এবং সুকৌশল সুর-বিন্যাসে বাঙালিমাত্রকেই মুগ্ধ করেন। নিধুবাবু বা রামনিধি গুপ্ত হুগলি জেলায় জন্মগ্রহণ করিয়া ১১৪৮ সাল হইতে ১২৩৫ সাল পর্যন্ত ৮৭ বৎসর জীবিত ছিলেন। ইহার পূর্বে কবিবর ভারতচন্দ্র রায় গুণাকরও সরল বাংলা ভাষায় এমন অনেকগুলি গান রচনা করিয়া গিয়াছিলেন, যাহা পরবর্তী কালে টপ্পা সুরে গাওয়া হইত। রায় গুণাকর ১১১৯ হইতে ১১৬৭ সাল পর্যন্ত মাত্র ৪৮ বৎসর বাঁচিয়াছিলেন। পর পৃষ্ঠায় নিধুবাবু ও ভারতচন্দ্রের গানের কিছু নমুনা দিতেছি ঃ—

কালংড়া—জলদ তেতালা।

"মুকুরে আপন মুখ হেরিলে যে হই সুখী।
নয়নে আমার, বাস হে তোমার, এই সে কারণ দেখি।।
আদর্শে দর্শন মুখ, সৌন্দর্য হয় অধিক,
রূপের যতন, তোমার কারণ, জানে হে তোমার আঁখি।।

—নিধুবাবু

সোহিনী—জলদ তেতালা।

"কি হল আমার সই বল কি করি।
নয়ন লাগিল যাহে কেমনে পাশরি।।
হেরিলে হরিষ চিত, না হেরিলে মরি
তৃষিত চাতকী যেন থাকে আশা করি
ঘন-মুখ হেরি সুখী, দুখী বিনে বারি।"

—নিধুবাবু

ঝিঁঝিট খাম্বাজ

ওহে পরাণ বঁধু গীত গায়ে না
তিল নাহি সহে তালে, বেতাল বাজায়ো না।
তনু মোর হৈল যন্ত্র, যত শির তত তন্ত্র,
আলাপে মাতিল মন, মাতালে নাচায়ো না।।
তুমি বল যাই যাই, মোর প্রাণ বলে তাই,
বার বার গায়ে গায়ে মুরখে শিখায়ো না।।
অপরূপ মেঘ তুমি, দেখি আলো হয় ভূমি,
না দেখিলে অন্ধকার, আঁধার দেখায়ো না।।
ভারতীর পতি হও, ভারতের ভার লও,
না ঠেলিয়া ও ভারতী ভারতে ছাড়ায়ো না।।'

—বিদ্যাসুন্দর

'নিধু বাবুর পরবর্তী টপ্পাকারের মধ্যে শ্রীধর কথক অতিশয় বিখ্যাত। ইঁহার জন্মস্থান হুগলি জেলায়। ইনি বঙ্গের দ্বিতীয় শোরি মিঞা—

"ভালবাসিবে বলে ভালবাসিনে,
আমার স্বভাবে এই, তোমা বিনে আর জানিনে।
বিধু মুখে মধুর হাসি, দেখিতে বড় ভালবাসি,
তাই তোমায় দেখতে আসি, দেখা দিতে আসিনে।"

"সখি আমায় ধর ধর,
উরু নিতম্ব হৃদি পয়োধর-ভারে,
ভূমেতে ঢলিয়া পড়ি।"

বাংলায় ভক্তি-সংগীতের মধ্যে মায়ের নামের সংগীত অর্থাৎ শ্যামাসংগীতই বোধ হয় প্রধান স্থান অধিকার করিয়া আছে। তাহার পরই হয়ত কৃষ্ণ ও রাধা বিষয়ক সংগীত। শ্যামা সংগীতের অক্ষয় ভাণ্ডার স্বরূপ আমরা ভক্ত রামপ্রসাদের যুগ স্মরণ করিতে পারি। কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ চব্বিশ পরগনার অন্তর্গত হালিশহর ষ্টেশনের নিকট কোন গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। কৃষ্ণনগরের মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র ইঁহার একজন পৃষ্ঠপোষক ছিলেন; এক সময় ইনি নবাব সিরাজউদ্দৌলাকেও কতকগুলি গান শুনাইয়া মোহিত করিয়াছিলেন। বৈষ্ণব পদাবলি গানের পরে সম্ভবত রামপ্রসাদই সর্ব প্রথমে সাহস করিয়া বাঁধা ওস্তাদি রাগ-রাগিণীর ব্যতিক্রম করিয়া স্বরচিত গানে নিজস্ব সুর দিয়াছিলেন; তাঁহার নাম অনুসারে রামপ্রসাদী সুর বহুকাল যাবৎ প্রসিদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। আজ পর্যন্ত বহু শ্যামা-সংগীত ও স্বদেশী-সংগীত রামপ্রসাদী সুরে গীত হইয়া থাকে। রামপ্রসাদ প্রথম জীবনে কলকাতায় এক ধনীর গৃহে মুহুরিগিরি করিতেন। তিনি জমাখরচের খাতায় নিম্নলিখিত গানটি লিখিয়া রাখিয়াছিলেন।

"আমায় দেও মা তবিলদারী; আমি নিমকহারাম নই শঙ্করী।।
পদরত্ন-ভাণ্ডার সবাই লুটে, ইহা আমি সইতে নারি।।
ভাঁড়ার জিম্মা যার কাছে মা, সে যে ভোলা ত্রিপুরারি।।
শিব আশুতোষ, স্বভাব-দাতা তবু জিম্মা রাখ তারি।
অর্দ্ধ অঙ্গ জায়গীর তবু শিবের মাইনে ভারী।।
আমি বিনা মাইনার চাকর কেবল চরণ ধূলার অধিকারী।
যদি তোমার বাপের ধারা ধর, তবে বটে আমি হারি।।
যদি আমার বাপের ধারা ধর, তবে তোমা পেতে পারি।
প্রসাদ বলে, এমন পদের বালাই লয়ে আমি মরি।
ও-পদের মত পদ পাই তো, সে পদ লয়ে বিপদ সারি।।"

রাম প্রসাদের উৎকৃষ্ট রত্নরাজির মধ্যে "এমন দিন কি হবে মা তারা, যখন তারা তারা তারা বলে......." "গেল দিন মিছে রঙ্গ রসে, আমি কাজ হারালেম কাজের বশে......" "জগৎ-জননী তারা, ও মা তারা, জগৎকে তরালে আমাকে ডুবালে....." প্রভৃতি অনেক গান বোধ হয় প্রত্যেকেই শুনিয়াছেন। আমি আর একটি মাত্র গান উদ্ধৃত করিতেছি—

"আর ভুলালে ভুলব না গো
আমি অভয় পদ সার করেছি, ভয়ে হেলব দুলব না গো।
বিষয়ে আসক্ত হয়ে, বিষের কূপে উলব না গো।
সুখদুঃখ ভেবে সমান, মনের আগুন ভুলব না গো।।
ধনলোভে মত্ত হয়ে দ্বারে দ্বারে বুলব না গো।
আশা-বায়ু-গ্রস্ত হয়ে, মনের কথা খুলব না গো।।

মায়া-পাশে বন্ধ হয়ে প্রেমের গাছে ঝুলব না গো।
রামপ্রসাদ বলে দুধ খেয়েছি, ঘোলে মিশে ঘুলব নাগো।”

আজু গোঁসাই, রামদুলাল, মুকুন্দ দাস প্রভৃতিও রামপ্রসাদের অনুকরণে অনেক গান লিখিয়াছেন।

ভক্তিমূলক গানের মধ্যে, বাউল, ভাটিয়ালি, দেহতত্ত্ব, ব্রহ্মসংগীত প্রভৃতি নানা প্রকার গান আছে। এই সমস্ত গানের রচয়িতা শুধু পণ্ডিত-সমাজ নহে; সাধারণ কৃষক বা নিরক্ষর ফকিরেরাও অনেক উৎকৃষ্ট গান বাঁধিয়াছেন। কয়েকটি উদাহরণ দিতেছি :—

১. “ঘরের মাঝে অনেক আছে।
কোন্ ঘরামি ঘর বেঁধেছে, এক পাড়ে দুই থাম দিয়াছে।।
সে ঘরের ছাউনি আছে, চামের এক বেড়া আছে
আর একটি বাতি আছে, নিবায় বাতি কু-বাতাসে।।
ঘরের মাঝে খুপরি আছে, আর খোপে তার
কেহ না যায় কারো কাছে, যার যার মত সে সে আছে।”

“রংমহলে লুট করে ভাই ছয় জনে। (ও মন, তুমি) সাধ
ভক্তি-কপাট এঁটে দিয়ে; মূলধন রাখ গোপনে;
ঘর-চোরাতে যুক্তি করে বেড়ায় ধনের সন্ধানে।।
অবকাশে রাখিবে ধন কেহ যেন না জানে।
কেহ নহে মিত্র, সবাই শত্রু, লুটবে পেলে পতনে।।
রবি-সুত বশীভূত ঐ ছ-জনে।
গাঁট কাটা ঐ ছ-টা (তোমায়) ধরিয়ে দেবে শমনে।
সামাল সামাল, সকল বা-মাল, রাখবে অতি যতনে,
শুন মন সকল ধন রাখ হরির চরণে।।”

ব্রহ্ম-সংগীতের প্রবর্তক রাজা রামমোহনের একটি সংগীত উদ্ধৃত করিতেছি ঃ

“মনে কর শেষের সে দিন ভয়ংকর
অন্যে কথা কবে কিন্তু তুমি রবে নিরুত্তর।
যার প্রতি যত মায়া, কিবা পুত্র কিবা জায়া
তব মুখ স্মরি তত হইবে কাতর।।
গৃহে হায় হায় শব্দ, সম্মুখে স্বজন স্তব্ধ
দৃষ্টিহীন, নাড়ি ক্ষীণ হিম কলেবর।
অতএব সাবধান, ত্যজ দম্ভ অভিমান,
বৈরাগ্য অভ্যাস কর, সত্যেতে নির্ভর।।”

বাংলা ভাষায় ভগবান বা পরলোক-সংক্রান্ত যত গান আছে, তাহার পর্যালোচনা করিলে কতকগুলি ভাবের প্রাধান্য দেখা যায়। সংসার অনিত্য, দিন কয়েক এই স্থান হইতে পাথেয় সংগ্রহ করিয়া ভবনদী পার হইয়া অনিত্য-ধামে প্রস্থান করিতে হইবে। কালীতে বা কৃষ্ণে বা গুরুপদে ভক্তি রাখাই শমন-দমন করিবার উৎকৃষ্ট পন্থা। ছয় রিপু এবং পাঁচ ইন্দ্রিয়— ইহারাই মানুষকে দাগা দিয়া বিপাকে ফেলে। শোক, মৃত্যু, জরা প্রভৃতিকে ভগবান-প্রদত্ত দান-স্বরূপ গ্রহণ করিতে হইবে, কারণ সবই ভগবানের মায়া, তিনিই দান করেন, তিনিই গ্রহণ করেন, তিনিই সহ্য করেন। ইহা ব্যতীত গিরিশ ঘোষের “রাম-রহিম

না জুদা কর ভাই, দিলকো সাচ্চা রাখো জি", দুলাল মুন্শির "জেনেছি জেনেছি তারা, তুমি জান ভোজের বাজি, যে তোমায় যে-ভাবে ডাকে তাতে তুমি হওমা রাজি;" প্রভৃতি গানে হিন্দু-মুসলমান প্রভৃতি বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রীতি-স্থাপনের চেষ্টা দেখিতে পাওয়া যায়। ভগবান-সংক্রান্ত গানে শুধু ভক্তির পরিচয় নয়, তাহাতে বাঙালির তার্কিকতা ও তত্ত্ব-নিরূপণ প্রচেষ্টাও প্রচুর পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়। উদাহরণস্বরূপ, একটি গানের ভণিতা উল্লেখ করিলেই যথেষ্ট হইবে। সেটি এই—"খ্যাপা বলে, অনন্ত তুই নিতান্ত বাতুল, ও তোর সকল কথা ভুল, বাঁশবনেতে ফোটে কখন কি পারিজাতের ফুল।" এখানে তত্ত্ব উদঘাটনের জন্য বড়ো বেশি ব্যাকুলতা দেখা যায়।

বাঙালির তার্কিকতার আর এক পরিচয় দেখিতে পাই কবির দলের লড়াইয়ে। এখন যেমন গ্রামে গ্রামে নগরে নগরে সখের যাত্রা ও থিয়েটারের ছড়াছড়ি দেখিতে পাওয়া যায়। নিধুবাবুদের আমলের প্রায় ৫০ বৎসর পূর্বে সেইরূপ কবির দলের খুব আদর ছিল। হরুঠাকুর, রামবসু, রঘুনাথ প্রভৃতি এই সময়ের বিখ্যাত কবিগীতি রচয়িতা।

এতদ্ব্যতীত লালু নন্দলাল, গোঁজলাগুঁই, কেষ্টা মুচি, ভোলা ময়রা, নীলু ঠাকুর, যজ্ঞেশ্বরী, নিত্যানন্দ বৈরাগী, সাতু রায়, আনটুনী সাহেব, নীলমণি পাটনি, গদাধর মুখোপাধ্যায়, ভবানী বেনে প্রভৃতি নানা শ্রেণির অনেক কবিওয়ালা ও বাঁধনদারের নাম ও সুখ্যাতি শুনা যায়। ইহা হইতে এইরূপ গানের জনপ্রিয়তা কতকটা অনুভব করা যায়।

ইহাদের কল্পনা-শক্তি ও উপস্থিত বুদ্ধি খুব তীক্ষ্ণ ছিল। কত উদ্ভট পদপূরণ সমস্যা ইঁহারা অনায়াসে সমাধান করিয়া ফেলিতেন, শুনিলে আশ্চর্য বোধ হয়। হরুঠাকুর বা হরেকৃষ্ণ দীর্ঘাঙ্গী ১১৪৫ সালে কলকাতার সিমুলিয়ায় জন্মগ্রহণ করেন। একদিন শোভাবাজারের মহারাজ নবকৃষ্ণ সভাস্থ পণ্ডিতদিগকে একটি সমস্যা পূরণ করিতে দেন, তাহার শেষ চরণে থাকিবে—"বড়শি গিলেছে যেন চাঁদে," কোনো পণ্ডিতের সমস্যা-পূরণই মহারাজের মনঃপুত না হওয়াতে তিনি হরুঠাকুরকে তলব করিলেন। হরুঠাকুর তখন গামছা কাঁধে গঙ্গাস্নান করিয়া আসিতেছিলেন। সেই বেশেই মহারাজের সভায় উপস্থিত হইলেন। সমস্যার কথা শুনিয়া তিনি তৎক্ষণাৎ এইভাবে তাহার মীমাংসা করিলেন—

"একদিন শ্রীহরি, মৃত্তিকা ভোজন করি,
ধূলায় পড়িয়া বড় কাঁদে।
রানি অঙ্গুলি হেলায়ে ধীরে, মৃত্তিকা বাহির করে,
বঁড়শি গিলেছে যেন চাঁদে।"

শুনিয়া মহারাজ সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে এক হাজার টাকা পুরস্কার প্রদান করেন, এবং সেই হইতে হরুঠাকুর মহারাজের একজন সভাসদের মধ্যে গণ্য হন। হরুঠাকুর এক শখের কবির দল সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তাঁহার খ্যাতি দেশময় রাষ্ট্র হইয়া পড়িয়াছিল। নানা স্থান হইতে তাঁহার দলের নিমন্ত্রণ আসিতে থাকায়, শেষে সখের দলকে পেশাদারি দলে পরিণত করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। অবশেষে মহারাজের সভাসদ হইবার পর তিনি উক্ত পেশাদারি দলের সংস্রব একেবারে ত্যাগ করেন।

কবির গানে মহড়া, চিতেন, অন্তরা, পরিচিতেন প্রভৃতি অঙ্গ আছে। চিতেন অনেকটা কোরাসের মত। গানগুলি প্রায়ই খুব লম্বা— বাছিয়া বাছিয়া খুব ছোটো একটি উদাহরণ দিতেছি—

মহড়া :— আমারে সখি ধর ধর। ব্যথার ব্যথিত কে আছে আমার। পথ শ্রান্তে নহি কাতর। হৃদে নব-ঘন-দলিতাঞ্জন-বরণ উদয়ে অবশ শরীর।।

চিতেন : অঙ্গ থর থর, কাঁপিছে আমার, আর না চলে চরণ। সেই শ্যাম প্রেম-ভরে, পুলক অন্তরে, সম্বরা যে ভাব অম্বর।।

অন্তরা ঃ—হায় সে যে কটাক্ষের অপাঙ্গ ভঙ্গিম, বয়ান করে, কী কব। লেগেছে যাহারে, প্রবেশি অন্তরে,
সেই সে বুজেছে ভাব।

চিতেন ঃ—"কুলশীল ভয়, লজ্জা তার যায় না রাখে জীবন-আশ।
তার জলে বা, স্থলে বা, অন্তরিক্ষে কিবা, সন্দেহ নাহি মরিবার।।"

কবি-গীতিরই একটি রূপান্তর পাঁচালি। বিখ্যাত দাশরথি রায় বাঙ্গালার পাঁচালি রচয়িতাদের সম্রাট। ইনি ১২১২ সালে বর্ধমান জেলায় জন্মগ্রহণ করেন, এবং ১২৬৪ সালে ৫২ বৎসর বয়সে সজ্ঞানে গঙ্গালাভ করেন। যৌবনের প্রারম্ভেই ইনি অক্ষয় পাটনির কবির দলে প্রবেশ করেন। তাঁহার মাতুল লোকলজ্জা ভয়ে অনেক ভর্ৎসনা করিয়া তাঁহাকে ছাড়াইয়া লইয়া তিন টাকা বেতনের মুহুরিগিরি কার্যে নিযুক্ত করিয়া দেন। কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই তিনি চাকরি ত্যাগ করিয়া আবার অক্ষয় পাটনির দলে প্রবেশ করেন। অবশেষে মামার তাড়নায় উক্ত দল ত্যাগ করিয়া নিজেই পালা রচনা করিয়া একটি পাঁচালির দল সৃষ্টি করেন। ইহাই রসরাজ দাশরথি রায়ের অমৃতময়ী পাঁচালি রচনার প্রাথমিক ইতিহাস। উদাহরণ ঃ—

কেন শ্যামা গো, তোর পদতলে স্বামী।
তুই সতী হয়ে পতি' পরে, করিলি কি বদনামি।।
কার সনে মা ঝগড়া করো, আপনা ছেলে আপিন্ মারো।
বুঝি ঝগড়া নৈলে রৈতে নারো, নারদ মুনির মামি।।
মান অপমান নাই ভবানী, মাতুল বেটা বাতুল জানি।
আমি কখন জানিনে আছে তোর এত খ্যাপামি।।

পাঁচালি গানে এক দাশরথি রায়ের পরেই রসিকচন্দ্র রায়ের আসন নির্দিষ্ট করা যাইতে পারে। ইনি ১১খানি পাঁচালি রচনা করিয়া গিয়াছেন। অনেক কবি, যাত্রা, কীর্তন, তর্জা ও বাউল সম্প্রদায়ের গান তিনি লিখিয়া দিতেন। অশ্লীলতা দোষে "জীবন তারা" নামে তাঁহার একখানি পদ্যময় আখ্যায়িকা পুস্তক বাজেয়াপ্ত হইয়া যায়। ইনি হুগলি জেলার অধিবাসী। কবি, পাঁচালি, হাফ্ আখড়াই প্রভৃতিতে প্রধানত পৌরাণিক ঘটনাদি অবলম্বন করিয়া পদ-রচনা ও প্রতিযোগিতা হয়। ইহাতে অনেক সময় ঈর্ষা-দ্বেষ-জাত অশ্লীলতা থাকিলেও সাধারণ লোকের পক্ষে এগুলি বেশ শিক্ষণীয় হয়।

তর্জা গানও এই শ্রেণির ব্যাপার। বর্ধমান জেলায়ই ইহার অধিক প্রচলন ছিল। আজকাল যাত্রা-থিয়েটারের যুগে এগুলি অন্তর্হিত হইয়াছে বলিলেই চলে।

যাত্রা ঠিক কোন্ সময় হইতে আরম্ভ হইয়াছে, তাহা নির্ণয় করা সুকঠিন। পূর্বে রাজা-মহারাজা কিম্বা শৌখিন বড় লোকদের বাড়িতে হাফ্ আখড়াই-এর বৈঠক বসিত। ইহাতে গানও আবৃত্তি হইত। কৃষ্ণকমল গোস্বামী (১২১৭-১২৯০) মহাশয় রামলীলা ও সুবল-সংবাদ বিষয়ক অনেক গান লিখিয়া গিয়াছেন। আর রসিক কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত (১২১৮-১২৬৫) সখের ও পেশাদারি কবির দলে ও হাফ্ আখড়াই-এর দলে গান বাঁধিয়া দিতেন। তাঁহার *পাষণ্ড-পীড়ন* পত্রিকার কবিতার কথা আজ পর্যন্ত সাহিত্যামোদী ব্যক্তিরা স্মরণ করিয়া থাকেন। তাঁহার একটি গান উদ্ধৃত করিলাম।

"দিন দুপুরে চাঁদ উঠেছে রাত পোহান ভার।
হল পূর্ণিমাতে অমাবস্যা, তের প্রহর অন্ধকার।।
এসে বেন্দাবনে বলে গেল বামা বোষ্টমী,
একাদশীর দিনে হবে জন্ম-অষ্টমী।।
আর ভাদ্দর মাসে, সাতুই পৌষে চড়ক পূজার দিন এবার।।

ঐ ময়রা মাগি মরে গেল মেরে বুকে শূল,
আর বামুনগুলো ওষুধ নিয়ে মাথায় বচ্ছে চুল।।
কাল বৃষ্টি জলে ছিষ্টি ভেসে পুড়ে হ্ল ছারখার।
ঐ সূর্যি মামা পূর্বদিকে অস্ত চলে যায়,
আর উত্তর দক্ষিণ কোণ থেকে আজ লাগছে বাতাস গায়।।
সেই রাজার বাড়ির টাটু ঘোড়া, সিং উঠেছে দুটো তার।
ঐ কলু রামী ধোপা শামী হাস্‌তেছে কেমন,
এক বাপের পেটেতে এরা জন্মেছে কজন;
কাল কামরূপেতে কাক মরেছে কাশীধামে হাহাকার।"

এগুলি পরবর্তী দ্বিজেন্দ্রলালের হাসির গানের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়।

যা হউক, অনুমান একশত বৎসর পূর্বে কলকাতার বহুবাজারে রাধামোহন সরকার নামক একজন গণ্যমান্য লোক ছিলেন। তিনি ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দরের একটি যাত্রাদল স্থাপন করেন। "এই বিদ্যাসুন্দরের যাত্রাই নাকি কলকাতার বা বাংলাদেশের প্রথম সখের যাত্রা। রাধামোহন বাবুর বয়স তখন ত্রিশ বৎসর। যাত্রার আখড়াই রাত্রিকালে হইত; কিন্তু সারাদিন বৈঠক চলিত। মতিলাল গোষ্ঠী (হৃদয়রাম), বাঁড়ুজ্যে গোষ্ঠী, ধর গোষ্ঠী সকলেই এই যাত্রায় যোগদান করিয়াছিলেন। কথিত আছে টেলিমেকস অনুবাদক রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় যাত্রায় সখি সাজিতেন।" একদিন মধ্যাহ্নে বৈঠক বসিয়াছে এমন সময় এক ফিরিওয়ালা "চাঁপাকলা" বলিয়া পথে চীৎকার করিয়া উঠিল। তৎক্ষণাৎ বিশ্বনাথ মতিলাল মহাশয় হুকুম দিলেন, "কে আছিস রে, চাঁপাকলাওয়ালাকে ধরে আন শুদ্ধ 'গান্ধার' বলেছে।" এই চাঁপাকলাওয়ালা— গোপাল উড়ে। বাবুদের অনুগ্রহে তাহার ১০ টাকা বেতন ধার্য হইল। ক্রমে ওস্তাদের নিকট ঠুংরি ও অন্যান্য গান শিখিয়া রাধামোহনের সখের যাত্রাকে গুলজার করিয়া তুলিলেন। ইনি মালিনী সাজিয়া দর্শকবৃন্দকে মোহিত করিয়া দিতেন। প্রভুর মৃত্যুর পর ইনি সহজ বাংলা ভাষায় নূতন বিদ্যাসুন্দরের পালা রচনা করিয়া জীবনের অবশিষ্ট দশ বৎসরকাল বাংলার সকল বিশিষ্ট বারোয়ারিতে আসর পাইয়া বিশেষ প্রতিষ্ঠা অর্জন করেন।

যশ ও যোগ্যতায় হুগলি জেলার গোবিন্দ অধিকারী গোপাল উড়ের সমকক্ষ ছিলেন। ইনি কৃষ্ণ যাত্রায় নিজে দূতী সাজিতেন। তাঁহার দূতীগিরি দেখিবার জন্য দশ ক্রোশ রাস্তা হাঁটিয়া লোকে যাত্রা দেখিতে যাইত। "চুক্তির টাকা" ব্যতীত তিনি আসরে অনেক টাকা উপহার পাইতেন। তাঁহার গানে মোহিত হইয়া অর্থহীন লোকে গাত্র-উত্তরীয় পর্যন্ত খুলিয়া পারিতোষিক দিতেন। তিনি ১২০৫ সালে জন্মগ্রহণ করিয়া ১২৭৭ সালে লোকান্তর প্রাপ্ত হন। ইনি আবার কীর্তনের দোহারও গাইতেন। যাত্রার গানে ইহার অনুপ্রাস বেশ মনোহর। একটি নমুনা দিতেছি ঃ—

চম্পক বরণী বলি, দিলি যে চমক কলি
এ ফুলে এ কল আছে কে জানে।
এ তো ফুল নয় ভাই ত্রিশূল অসি, মরমে রহিল পশি
রাই-রূপসীর রূপ অসি হানে প্রাণে।।
শ্রীরাধাকুণ্ডবাসী শ্রীরাধা-তুল্যবাসী
অসি সরসী বাসি কাননে।
এখন বিনে সেই রাই রূপসী।

জ্ঞান হয় সব বিষরাশি, গরলগ্রাসী নাশি জীবনে।
আমার মিথ্যা নাম রাখালরাজ
রাখাল সঙ্গে বিরাজ,
রাখালের রাজ অঙ্গে কাজ কি জানে।
যদি নাই পাই রাধা, জীবনে যার নাইরে রাধা
আনিতে জীবন-রাধা
যারে সুবল সুবোল-বদনীর স্থানে।।

ইহার আর একটি গান "শুক-শারি সংবাদ" বড়ই চমৎকার। এই গান শুনিলে দ্বিজেন্দ্রলালের "কৃষ্ণ বলে আমার বদন তুলে চাও" গানটি মনে পড়িয়া যায়। গোবিন্দ অধিকারীর গানটির কিয়দংশ এই :—

"বৃন্দাবন-বিলাসিনী রাই আমাদের
রাই আমাদের রাই আমাদের
আমরা রাইয়ের রাই আমাদের।।
শুক বলে আমার কৃষ্ণ মদনমোহন।
শারি বলে আমার রাধা বামে যতক্ষণ;
নৈলে শুধুই মদন।
শুক বলে আমার কৃষ্ণ গিরি ধরেছিল।
শারি বলে আমার রাধা শক্তি সঞ্চারিল;
নৈলে পারবে কেন?
শুক বলে আমার কৃষ্ণের মাথায় ময়ূর পাখা।
শারি বলে আমার রাধার নামটি তাতে লিখা;
ঐ যে যায় গো দেখা।।
শুক বলে আমার কৃষ্ণের চূড়া বামে হেলে।
শারি বলে আমার রাধার চরণ পাবে বলে;
চূড়া তাইতে হেলে।।
শুক বলে আমার কৃষ্ণের বাঁশি করে গান।
শারি বলে সত্য বটে, বলে রাধার নাম;
নৈলে মিছে সে গান।।
শুক বলে আমার কৃষ্ণ জগতের গুরু।
শারি বলে আমার রাধা বাঞ্ছাকল্পতরু;
নৈলে কে কার গুরু।।
শুক বলে আমার কৃষ্ণ জগতের কালো।
শারি বলে আমার রাধার রূপে জগৎ আলো;
নৈলে আঁধার কালো।।
শুক বলে আমার কৃষ্ণের শ্রীরাধিকা দাসী।
শারি বলে সত্য বটে সাক্ষী আছে বাঁশি;
নৈলে হত কাশীবাসী।।

শুক বলে আমার কৃষ্ণ জগতের প্রাণ।
শারি বলে আমার রাধা জীবন করে দান;
থাকে কি আপন প্রাণ?
শুক শারি দুজনার দ্বন্দ্ব ঘুচে গেল
রাধাকৃষ্ণের প্রীতে একবার হরি হরি বল।
(বলে বৃন্দাবনে চল)।।"

যাত্রার আসর করিলে লোকের স্থান সংকুলান করা কীরূপ কঠিন ব্যাপার, তাহা দেখিলেই বুঝিতে পারা যায় যে, দেশের লোক যতই শিক্ষাভিমানী হউক না কেন এখন পর্যন্ত যাত্রার প্রতি বা তৎসংশ্লিষ্ট ধর্ম-চিত্রের প্রতি দেশের জনসাধারণের যথেষ্ট প্রাণের টান রহিয়াছে।

এইবার কীর্তনের বিষয় একটু বলিব। একটি বিষয় আপনারা হয়ত লক্ষ করিয়াছেন যে, হুগলি, কলকাতা ও তৎসন্নিকটবর্তী স্থানেই অধিকাংশ গায়ক ও বাঁধনদারের আবাসস্থল ছিল। সাহিত্য ক্ষেত্রেও আমরা তাহাই দেখিতে পাই। রাজধানীর সন্নিকট বলিয়া, না অন্য কোন প্রাকৃতিক কারণে এরূপ ঘটিয়াছে তাহা বিশেষজ্ঞেরা বিবেচনা করিবেন। আমরা কীর্তনের প্রবর্তক 'মধুকান' বা মধু কিন্নরের আবির্ভাবে এই অবস্থার কিঞ্চিৎ ব্যতিক্রম দেখিতে পাই। ইহার আবাস যশোহর জেলার বনগ্রাম মহকুমায়। ইনি ১২২৫ সালে জন্মগ্রহণ করেন, এবং যৌবনে ঢাকার প্রসিদ্ধ গায়ক ছোটোখাঁ ও বড়োখাঁর নিকট সংগীত শিক্ষা করেন। অতঃপর যশোহর জেলার রাধামোহন বাউলের নিকট ঢপ শিক্ষা করেন। "এই ঢপ সংগীতেই আজ তাঁহার নাম অমরত্ব লাভ করিয়াছে। তিনি ক্রমে ক্রমে মান, মাথুর, অক্রুর-সংবাদ ও কুরুক্ষেত্র প্রভৃতি পালা রচনা করেন। তাঁহার সংগীতগুলি ভক্তি প্রধান। গানের সুরে তিনি কাহারও অনুকরণ করেন নাই— স্বয়ংই আবিষ্কার করিয়াছেন। মধুকানের সুর এখন প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে।" ১২৭৫ সালে কৃষ্ণনগরে ঢপ গাহিতে গাহিতে হঠাৎ তাঁহার যকৃতে ও বুকে পিঠে ভয়ংকর বেদনা হয়। সঙ্গে সঙ্গে প্রবল জ্বরও দেখা দেয়। এই রোগে তিনি ৫৫ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করেন। তাঁহার একটি গান এই—

"কমলিনি আজ একটি, কমলে কামিনি দেখি
চরণ-কমলে নীলকমলে কে দিল কমল-মুখী।।
একেত শ্যাম কাল-কমল, জলে ভাসে নয়ন-কমল
কর-কমল চরণ-কমল, কমলা সেবিত কমল-পদ গো
সেই কমল-আঁখি পড়ে তোর চরণ-কমলে
ও মা ও মা করলে এ কী, গঙ্গা যার চরণ-কমলে,
হয়ে ত্রিলোক নিস্তারিল, সে দায় পড়ে তোর পায় ধরিল
তুই কেন তায় হলি সুখী।।
যার নাভি-কমলে ব্রহ্মা হয়ে কল্লেন সৃষ্টি স্থিতি
সে আজ ভাসে মান-তরঙ্গে, দেখিনে তার স্থিতি,
যে করে সৃষ্টি-স্থিতি লয়, সূদন কয় আজ মনে এই লয়
প্রলয় কল্লে চাঁদমুখী।।"

মধুকানের পূর্বেও যে কীর্তন একেবারে ছিল না, এমন নহে। কারণ, "জানা যায় মধুকানের পূর্বে গোবিন্দ অধিকারী গোলোকচন্দ্র দাস অধিকারীর নিকট কীর্তন শিখিয়াছিলেন, এই সূত্রে অনেক মহাজন

পদাবলি তাঁহার কণ্ঠস্থ হইয়া যায়। গোলোকচন্দ্রের কীর্তনের দল ছিল, গোবিন্দ অধিকারী উক্ত দলে কীর্তনের দোহারি করিতেন। শেষে নিজেই একটি কীর্তনের দল করিয়া বসেন। কিন্তু সে দলের সুযশ না হওয়াতে সেই কীর্তনের দলকেই অবশেষে তিনি যাত্রার দলে পরিণত করিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করেন।" যাহা হউক, একথা সত্য যে মহাজন-পদাবলি ভাঙিয়া নিজস্ব সুর দিয়া গান রচনা করিয়া কীর্তনকে মনোজ্ঞ করিয়া লোক সমাজে প্রচার করিবার সম্মান মধুকানেরই প্রাপ্য।

কীর্তন গান অদ্যাবধি বাঙালির বিশেষত্ব হইয়া রহিয়াছে। অনেকে মিলিয়া খোল করতাল ও মৃদঙ্গ লইয়া যখন কীর্তন গাওয়া হয় তখন এক চমৎকার ভাবের সৃষ্টি হয়; এমন কি অনেকে দশাপ্রাপ্তও হইয়া থাকেন। কীর্তন সাধারণত একতালায় গীত হয়, কিন্তু সময় সময় ইহাতে তাল-ফেরতা দেওয়া হয়, এবং অবস্থা বিশেষ ও ভাবাবেগ বশত তালের গতি একটু দ্রুত বা মন্দীভূত করিলেও সেটা তেমন দূষণীয় বলিয়া গণ্য হয় না। রেকর্ড সংগীতে মানদাসুন্দরী, বেদানা দাসী প্রভৃতি কীর্তনীয়া আধুনিককালে বিশেষ যশ অর্জন করিয়াছেন। সেসব হিন্দুবাড়িতে রেকর্ডের সংগ্রহ আছে, সেখানে বোধ হয় অন্তত এক চতুর্থাংশ রেকর্ডই কীর্তন গান। কিছু কাল পূর্বে, অর্থাৎ রবীন্দ্র-নজরুল-অতুলপ্রসাদী গানের পূর্বে এই অনুপাত আরও অধিক ছিল, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

আধুনিক যুগে আসিবার পূর্বে বিখ্যাত রসিক রূপচাঁদ পক্ষীর বিষয় একটু বলা আবশ্যক। ইনি ১২২১ সালে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহাদের আদি নিবাস চিল্কাহ্রদের নিকটে হইলেও ইহার পিতা ও ইনি কলকাতাবাসী ছিলেন। সকল প্রকার সংগীত রচনাতেই ইনি সিদ্ধ-হস্ত ছিলেন। বিশেষত, বিদ্রূপাত্মক সংগীত রচনায় ইনি অতুলনীয়। ইঁহার রচিত প্রায় সমুদয় গানে পক্ষী বা খগরাজ ভনিতা দেখা যায়। রূপচাঁদ বড়ই আমোদ-প্রিয় ও রসিক লোক ছিলেন। পক্ষী উপাধিধারী বলিয়া তাঁহার গাড়িখানি কতকটা খাঁচার আকারের ছিল। তিনি সেই গাড়ি চড়িয়া কলকাতার বড় বড় লোকের বাড়ি গিয়া উপস্থিত হইতেন। কোন আশ্চর্য ঘটনা বা হুজুগ উঠিলেই তিনি তদ্‌বিষয়ে সংগীত রচনা করিতেন। অনেক পল্লিগ্রামে আজ পর্যন্ত অনেক স্বভাব কবি দেখিতে পাওয়া যায়,— যাঁহারা ঝড়, ভূমিকম্প, রেলপুল বা অন্যান্য সমসাময়িক বিষয় লইয়া সংগীত রচনা করিয়া থাকেন। বেউলা সুন্দরীর গান, নদের চাঁদের গান, ময়নামতীর গান প্রভৃতি প্রাচীনতর এবং বৃহত্তর উদাহরণ। যাহা হউক, রূপচাঁদ পক্ষীর একটি কমিক গানের কিয়দংশ দেওয়া যাইতেছে।

> "আ মরি কী নাকাল, কন্যার বিবাহ কা
> আজকাল হচ্ছে বঙ্গ দেশেতে
> মাতৃদায় পিতৃদায় এর আগে লাগে কোথায়
> ভিঁটে মাটি চাটি হয় বিয়ের ব্যয়েতে।
> বল্লালি বাঁধাকুল প্রায় হল নির্মূল,
> বিশ্ববিদ্যালয় স্কুল শুরু যে হতে।
> সম্বন্ধ না হতে বরের মুরব্বিতে
> লম্বা ফর্দ দেন হাতে নবাবি মতে।
> বাইশ পোঁচ কালা কাফ্রি, (পাশ করার বিষম জারি,
> পাত্রী খোঁজেন সুশ্রী, কিন্নরী হতে।
> পাকাবাড়ি, মার্বেল ম্যাজ, দরওয়ানের রূপার ব্যাজ
> হীরের আংটি, সোনার ল্যাজ, ঝুল্‌বে পশ্চাতে।।......

দাতব্য পাঠশালা, চিরকাল ছেলে পড়ে
বিয়ের সম্বন্ধ এলে দেন স্কুলেতে।।......
চার-পেশের কর্তাপক্ষ, ঠিক যেন সর্বভক্ষ্য
যার ছেলে গণ্ডমূর্খ, সে মরে দুঃখেতে।।
ছেলে হলে গুণবন্ত, একরাত্রে হতাম ভাগ্যবন্ত
পোড়াকপালি ভ্যাড়াকান্ত ধস্নে গর্ভেতে।
অলংকার চায়না ইদানী, কোম্পানির কাগজ রেডিমনি
বাড়ির পাট্টা সোনার গিন্নি, চায় হাতে হাতে।।
মেয়ের বেলা বেলতলা, নিমতলা ছাদ খোলা।
মরা দুগাছা সোনার বালা ছাঁদনা তলাতে।।
উচ্চশিক্ষার প্রভাবে দেশের উন্নতি হবে
সামাজিক কুক্রিয়া যাবে বিদ্যা-জ্যোতিতে।
হিতে হল বিপরীত, পাশ করায় বাড়ায় কুরীত
এ শিক্ষা কার মনোনীত হয় অনিষ্ট যাতে।
বিয়ে কর্তে টাকা যায়, ছি ছি মরে যাই লজ্জায়
আর্যের কলঙ্ক রটায় আর্যাবর্তবাসীতে।।
খগপতির এই মিনতি, যার যেরূপ হয় সংগতি
দেওয়া লওয়া সেই পদ্ধতি হোক ধর্ম মতে।
বিবাহের ঘোর বিপদ, হায়রে কী হাস্যাস্পদ
মানুষ্য কি চতুষ্পদ হল ভারতে।।"—

সম্প্রতি একটি রেকর্ড বাহির হইয়াছে, "নয়ত আমি হেলা-ফেলা যেমন তেমন মেয়ে, কলেজ থেকে এবার আমি, পাশ করেছি বি-এ," এ গানটিরও ব্যঙ্গসুর— উদ্ধৃত গানের ন্যায়।

হাসির গান সম্পর্কে প্যারিমোহন কবিরত্নের একটি গানের কিঞ্চিৎ নমুনা দেখাইতেছি— ইনি ত্রয়োদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে জীবিত ছিলেন। গানটি এই—

ওরে মন তোমারে আজ বাদে কাল
ভবের পটল তুলতে হবে।।
এখন উপায় আছে ভেবে নে ভবানী ভবে।।
কোথা থাকিবে ঘরবাড়ি, পড়ে গড়াগড়ি যাবে
গাল পাটা কটা গোঁপে, কে আদরে আতর মাখবে।।
পোমেটম হেয়ারে দিয়ে, চেয়ারে কে বসে রবে।।
বিধু-মুখে নিধুর টপ্পা গান করে কে প্রাণ জুড়াবে।।
বুকের ছাতিয়ে ফুলিয়ে চাবুক মেরে কে জুড়ি হাঁকাবে
আরামে আরামে গিয়ে খুশি হয়ে কে খাসি খাবে।।
দুটি নয়ন করে রাঙ্গা রগ টেনে কে কথা কবে
যখন পাঁচে পাঁচ মিশাবে তখন পাঁচভুতে সব লুটে খাবে।।
খাটে তুলে ঘাটে যখন সুঁদরি কাঠে সাধ মিটাবে
প্যারী বলে যাবার সময় মোসাহেব কে সঙ্গে যাবে।।

ইঁহাদের উত্তরাধিকারী ডি. এল. রায় ও কান্ত কবির হাসির গান আজও বাঙালির আদরের সামগ্রী। ইঁহারা সাধারণত বিলাতির অনুকরণ, জাতিভেদ, বিবাহ-রহস্য, স্ত্রৈণতা, ফাঁকা বক্তৃতা, ধর্মের নামে ভণ্ডামী, অনাচার প্রভৃতি সমস্যা লইয়াই বিদ্রূপ-কশাঘাত করিয়া গিয়াছেন।

আধুনিক যুগে কী সুর হিসাবে, কী ভাব হিসাবে, কী রচনাভঙ্গি হিসাবে, বাংলা সংগীতে অনেক পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। অবশ্য এক জন দ্বারা সে পরিবর্তন সাধিত হয় নাই। পূর্ব হইতেই তাহার সূচনা দেখা গিয়াছিল। থিয়েটারে সুরকে চমৎপ্রদ করিবার জন্য রাগিনীর ভাঙচুর আরম্ভ হইয়াছিল। বড় বড় তানের পরিবর্তে ভাবোপোযোগী ঝুরা তানের প্রচলন দেখা গিয়াছিল। নাট্যাচার্য গিরিশচন্দ্র ঘোষের "রাঙ্গা জবা কে দিল তোর পায় মুটো মুটো", "যাই গো ওই বাজায় বাঁশি প্রাণ কেমন করে" "কি ছার আর কেন মায়া-কাঞ্চন কায়া তো রবে না" "আমি বৃন্দাবনে বনে বনে ধেনু চরাব" "আমার পাগল বাবা পাগলি আমার মা" "বলে ফুল দুলে দুলে তুলে দে লো বঁধুর গলে"— প্রভৃতি শতাধিক গান অত্যন্ত বিখ্যাত হইয়া রহিয়াছে।

২৪ পরগনার মনোমোহন বসু মহাশয় যাত্রা, থিয়েটার, পাঁচালি, হাফ-আখড়াই, কবি, বাউল, সংকীর্তন প্রভৃতি সর্বপ্রকার রচনায় সিদ্ধহস্ত ছিলেন। ইঁহার কতিপয় নাটক বাংলার সম্পদ স্বরূপ। ইঁহার রচনায়ও নূতন ভাবের রাগিণীর সংমিশ্রণ দেখা যায়।

কিন্তু যে প্রতিভাবান পুরুষ বাংলা সংগীতে যুগান্তর উপস্থিত করিয়াছেন, সংগীতকে পঙ্ক হইতে উদ্ধার করিয়া গৃহস্থের বাড়িতে স্থান দান করিয়াছেন, সংগীতের কঠোর বন্ধন ছিন্ন করিয়া তাহার সাবলীল গতিভঙ্গি দিয়াছেন, তিনি কবি-সম্রাট রবীন্দ্রনাথ। তিনি ব্রহ্ম-সংগীত, প্রণয়-সংগীত, স্বভাব-সংগীত, উৎসব-সংগীত, শোক-সংগীত, জাতীয়-সংগীত, ঋতু-সংগীত, ক্রিয়া-সংগীত প্রভৃতি সর্বপ্রকার সংগীত-সম্পদে বাংলা ভাষাকে ভূষিত করিয়াছেন। আগেকার সংগীতে কথাগুলি অনেক সময়ই অত্যন্ত অনাবৃত রুচিহীনতার পরিচয় দিত; কিন্তু রবীন্দ্রনাথ তাঁর স্বাভাবিক তীক্ষ্ণ কবি-অনুভূতির দ্বারা সংগীতে সুরুচি দান করিয়াছেন। তাঁর ভাষা অত্যন্ত মার্জিত ও আভাস-পূর্ণ হওয়াতে (সুর ছাড়া) শুধু বাণীতেই তার চমৎকারিত্ব! সুরের সহযোগে তো একেবারের সোনায় সোহাগা হয়। রবীন্দ্রনাথের অনেক গানে বাউল ও কীর্তনের রেশ লক্ষ করা যায়। অতিরিক্ত সূক্ষ্ম বলিয়া অনেকে বলিয়া থাকেন, ছাত্র-ছাত্রী মহলে তাঁহার গান যেরূপ চলিতেছে, সাধারণ অশিক্ষিত দেশবাসীর অন্তঃকরণে সেরূপ সাড়া দিতেছে না। এ অভিযোগ অনেকাংশেই সত্য। তবে ক্রমান্বয়ে দেশবাসী শিক্ষিত হইয়া উঠিলে হয়তো এ গান সাধারণ লোকের চিত্তকেও স্পর্শ করিবে। আমরা আশা করি, এই গানের প্রভাবেই দেশের লোকের রুচি-সৌষ্ঠব ও সাধারণ সৌন্দর্যবোধ একটু উৎকর্ষ লাভ করিবে। কিছুদিন পূর্বে কান্ত কবি রজনী বাবুর গানটা যতটা চলিত, আজকাল ততটা চলে না। বোধ হয় রবীন্দ্র-সংগীতের প্রসারই ইহার একটি প্রধান কারণ। "রবীন্দ্রনাথ রাগ-রাগিণীর খিঁচুড়ি করিয়া ফেলিয়াছেন"— এই তাঁহার বিরুদ্ধে ওস্তাদদিগের একটি প্রধান অভিযোগ। কিন্তু তিনি সু-সঙ্গত ভাবে নূতন ভাব প্রকাশের জন্য নূতন ভঙ্গি দিতে পারিয়াছেন কিনা, তাহাই আমাদের বিচার্য। সার্থক ভঙ্গি দিতে পারিলে খিঁচুড়িকে অপদার্থ না বলিয়া উপাদেয় সৃষ্টিই বলিতে হয়। রবীন্দ্রনাথ বাস্তবিকই উপাদেয় বস্তু সৃষ্টি করিয়াছেন। ভাবানুগত সুর-সংযোগ করিতে গিয়ে তিনি বিশুদ্ধ রাগিণীতে যে ব্যতিক্রম করিয়াছেন তাহা অতিশয় চমকপ্রদ ও উপভোগ্য হইয়াছে। তিনি দীর্ঘদ্রুত-তান, মিড়, আল গমকের সাহায্য ছাড়াই, অন্য উপায়ে স্বরের যে ব্যঞ্জনা দিয়াছেন, তাহা কবিকল্পনারই উপযুক্ত। তাঁহার গানের যে সমস্ত স্বরলিপি বাহির হইয়াছে তাহাতে রাগ-রাগিণী বা তালের কোন উল্লেখ নাই। তাই বলিয়া যে কোন রাগিণী হয় নাই, বা বেতালা হইয়াছে তাহা নহে, স্বরলিপির প্রত্যেকটি গান মাত্রা অনুসারে সুবিভক্ত করা আছে। তবে তিনি যে শান্তিনিকেতনের স্কুলে তবলার রেওয়াজ ত্যাগ করিয়াছেন তাহা বোধ

হয় অন্য কারণে। বাণীর অনুগত সুরের প্রাধান্যই তাঁহার গানের প্রধান সৌন্দর্য। তালের দিকে অতিরিক্ত মনোনিবেশ করিতে গিয়া সুর যেন ক্ষুণ্ন না হয়, এই বোধ হয় তাঁহার উদ্দেশ্য। সম্ভবত তিনি মনে করেন, সুর ও ভাব প্রাণের ভিতর বসিয়া গেলে, অঙ্গের যে স্বাভাবিক দোলন ও বাক্যের যে স্বাভাবিক নিঃসরণ হয়, তাহাই শ্রেষ্ঠ তাল। যাহা হউক, রবীন্দ্রনাথের গান সকলেরই সুপরিচিত, তাঁহার বিশাল রত্নভাণ্ডার হইতে দুই একটা গান উদ্ধৃত করিবার বিশেষ কোন প্রয়োজন আছে বলিয়া মনে হয় না।

অতুলপ্রসাদ সেন মহাশয় রবীন্দ্রনাথের প্রণালীতেই অনেক সুন্দর সুন্দর বিরহ-সংগীত ও অন্যান্য গান রচনা করিয়াছেন। তাহার অনেকগুলি ঠুংরি ভঙ্গিতে গীত হইয়া থাকে। শ্রীযুক্ত দিলীপকুমার রায় বাংলা গানে লখ্‌নউ সুর দিয়া তাহার একটু আভিজাত্য সম্পাদনের চেষ্টা করিয়াছেন। নিধুবাবুও টপ্পাগানে এইরূপ চেষ্টা করিয়াছেন। আমার মনে হয়, দিলীপ বাবুর প্রধান বিশেষত্ব ঠুংরি গানের কৌশলে নয়, সে বিশেষত্ব ইউরোপীয় ভঙ্গি উপযুক্ত স্থলে নিম্নস্বর ও উচ্চ-স্বরের সাহায্যে বৈচিত্র্য সম্পাদনে। দিলীপ বাবু সুকণ্ঠ পুরুষ, তাঁহার গান কাজে কাজেই চিত্তাকর্ষক হয়। কিন্তু আমার মনে হয়, অন্য লোকে তাঁহার অনুকরণে চড়াসুর চাপাইয়া বা আনুনাসিক করিয়া গাইলে ততটা সুশ্রাব্য হয় না। যাহা হউক এরূপ কৌশল, বাংলা গানে নতুন আমদানি, কিছুকাল না গেলে ইহার প্রকৃত মূল্য বুঝা দুষ্কর। অতুলপ্রসাদের অনেকগুলি গান গজল সুরেও গাওয়া হইয়া থাকে। মোটের উপর ইঁহার মর্মস্পর্শী গান বাংলা সাহিত্যের সম্পদ বৃদ্ধি করিয়াছে।

বাংলা গানে গজল সুরের প্রবর্তক কবি নজরুল ইসলাম। ইনি কবিতায় ও রচনায় সহজবোধ্য উর্দু শব্দ যোজনা করিয়া ভাষায় তেজ ও শ্রী উভয়ই বর্ধিত করিয়াছেন। বাংলা ভাষায় ইংরাজির মতো পদ্যাংশে ঝোঁক ব্যবহৃত হয় না। কিন্তু সংগীতে উর্দু সুরের লালিত্য ও তেজোময় আনন্দ আনিবার জন্য হুবহু উর্দু গজলের সুর বাংলায় খাপ খাওয়াইয়াছেন। তাঁহার অনেকগুলি গানের অংশবিশেষ গজলের অনুকরণে শে এর বা স-সুর আবৃত্তি ব্যবহৃত হয়। এই উপায়ে দীর্ঘ গজল গানের এক ঘেয়ে সুরকে অবসাদ হইতে রক্ষা করা হয়। তাহা ছাড়া ঠুংরির খোঁচ থাকাতে, অর্থাৎ অপ্রত্যাশিতভাবে অন্য রাগিণীর খোঁচ দিয়া মিষ্ট করা হয় বলিয়া, নজরুল-গীতি বড়ই মনোজ্ঞ হয়। নজরুলের স্বদেশী গান, সাম্যবাদীর গান, কারাগারের গান, জাতি-বিচারের গান প্রসিদ্ধ হইয়া গিয়াছে। তাহা ছাড়া গজল গানও লোকের মুখে মুখে বঙ্গদেশের সীমানা ছাড়াইয়া বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে। এই গানের আর একটি বিশেষত্ব ইহা হৃদয়ের গভীর ও প্রবল ভাবের স্বাভাবিক অভিব্যক্তি। এজন্য এগুলি সহজেই সর্বসাধারণের মর্মস্থান স্পর্শ করে। দুই একটি গানে একটু অশ্লীলতার আভাস পাওয়া যায়, কিন্তু মোটের উপর এগুলি সজীব ও প্রবল বলিয়াই সহজে হৃদয় অধিকার করে।

উপরে যে সমস্ত গানের বিষয় বলা হইল, তাহা ছাড়াও বাঙালির বিবাহ-বাসরের গান, হোলি গান, জারিগান, সারিগান, গম্ভীরা উৎসবের গান, চৈত্রপূজার গান, ঝুমুর গান, মাদারপিরের গান, গাজির গান, মনসার ভাসান, মারেফেতি গান প্রভৃতি কত যে আছে তাহার ইয়ত্তা করা সুকঠিন।

মোটের উপর গানের ভিতর দিয়া বাঙালি হৃদয়ের কোমলতা, সহজ ধর্মনিষ্ঠা, বাক্‌পটুতা এবং নানাবিধ সামাজিক রীতি-নীতির যে সমস্ত পরিচয় পাওয়া যায়, কোন অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তি তদ্বিষয়ে গবেষণা করিলে অনেক তথ্য নিরূপণ করিতে পারেন। অধুনা নজরুল ইসলামের ইসলামি সংগীত ও সুকণ্ঠ গায়ক আব্বাসউদ্দীনের গীত রেকর্ডের কল্যাণে ব্যাপকভাবে প্রচারিত হইয়া মুসলিম সমাজেও আধুনিক ধরনের উৎকৃষ্ট বাংলা হাম্‌দ্‌, না'ত সমা'-ধর্মী গজলের আদর হইয়াছে। পূর্ববর্তী মা'রেফতী, মুর্শিদা ও ভাটিয়ালি গানের সহিত যুক্ত হইয়া ইহাতে মুসলিম ঐতিহ্য-বাহী বাংলা সংগীতের অভাব কতকটা পূর্ণ হইয়াছে।

উৎস : *সঞ্চরণ*, ঢাকা সেগুণ প্রেস, ১৯৬১, পুনর্মুদ্রণ, প্রথম মুদ্রণ ১৯৩৭, সন্তোষ লাইব্রেরি, বাংলা বাজার, ঢাকা।

বাংলার রসকলা-সম্পদ

গুরুসদয় দত্ত

'আত্মানং বিদ্ধি'—'আপনার আত্মাকে চিনিয়া লও'—এই সারগর্ভ অনুশাসনের অন্তর্নিহিত গভীর সত্যটি ব্যক্তি ও জাতি উভয়ের পক্ষেই সমানভাবে প্রযোজ্য; কারণ প্রত্যেক ব্যক্তির যেমন এক-একটি স্বতন্ত্র আত্মা আছে, সেইরূপ প্রত্যেক জাতিরও আপনার একটি স্বতন্ত্র আত্মা আছে। যে ব্যক্তি নিজের আত্মার প্রকৃতির সঙ্গে সম্যক পরিচয় স্থাপন করিয়া তাহার সঙ্গে সমন্বয় রাখিয়া জীবন গঠন না করে, সে জীবনে কখনও চরম সার্থকতা লাভ করিতে পারে না। তেমনই আবার যে জাতি আপনার নিজস্ব আত্মার সঙ্গে সম্যক পরিচয় স্থাপন করিয়া ও তাহার সহিত অবিরত ঘনিষ্ঠ যোগসূত্র বজায় রাখিয়া চলিতে না পারে, সেই জাতির জীবন যে কেবল ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয় এবং বিশ্ব-মানবের সংকৃষ্টি ভাণ্ডারে সেই জাতি যে বিশেষ কোনো মূল্যবান দান করিতে পারে না তাহা নহে, সেই দুর্ভাগ্য জাতির অন্তর্গত ব্যক্তিসমূহের জীবনও মানুষের আত্মার চরম পরিণতির দিক দিয়া ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয় এবং তাহারা শুধু অন্য কোনো সুসংকৃষ্ট জাতির আধ্যাত্মিক দাস-মাত্র হইয়া কালাতিপাত করে।

ব্যক্তির এবং জাতির তাহাদের স্বকীয় আত্মার সঙ্গে এই যে পরিচয় ও সমন্বয়ের কথা বলা হইল, ইহা শুধু জ্ঞান-বিজ্ঞানের মানসিক যুক্তির প্রক্রিয়ার ভিতর দিয়া সম্ভব হয় না। জাতীয় দর্শনশাস্ত্রের আধ্যাত্মিক গবেষণার ভিতর দিয়া ইহা কতকটা সম্ভবপর হয় বটে; কিন্তু ইহার প্রকৃষ্ট পথ জাতীয় রসকলার ভিতর দিয়া। ব্যক্তির ও জাতির আত্মা আত্মপ্রকাশ করে সবচেয়ে সহজ, সরল ও স্পষ্টভাবে—তাহার রসকলা (art)-পদ্ধতির ভিতর দিয়া। প্রত্যেক জাতির রসকলা সেই জাতির আত্মার আশা, আকাঙ্ক্ষা ও আদর্শের ভাষাস্বরূপ।

জাতীয় রসকলা একদিকে যেমন জাতির আত্মার অভিব্যক্তি-স্বরূপ, তেমনই আবার ইহা জাতির প্রতিভা এবং শক্তির প্রতিনিয়ত পুনরুজ্জীবন ও পূর্ণবিকাশের প্রেরণা জাগাইয়া দেয়। নানা যুগে যে-সকল ব্যক্তি মহাপুরুষের আসনে অধিষ্ঠিত হইয়া অমরতা লাভ করিয়া গিয়াছেন এবং বিশ্বমানবের প্রাণে নব-প্রেরণা জাগাইয়া দিয়াছেন, তাঁহাদের জীবনী পর্যালোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাই যে, তাঁহারা তাহা করিতে পারিয়াছেন—তাঁহাদের আপন-আপন জাতিগত বৈশিষ্ট্যের ধারার সহায়তায়

আত্মার বিকাশ ও শক্তি বর্ধন করিয়া। বিশ্বের নানা দেশ হইতে প্রেরণার আহরণ যে জীবনের পূর্ণ-বিকাশের বিশেষ সহায়ক, তাহাতে সন্দেহ নাই; কিন্তু ইহাও নিঃসন্দেহ যে বৃক্ষ যেমন আপন উৎপত্তি-ভূমির সুগভীর তলদেশে শিকড় প্রোথিত করিয়া তথা হইতে প্রতিনিয়ত জীবনী-রস আহরণ ব্যতীত স্বাস্থ্যবান, শক্তিমান ও ফুলে-ফলে সুশোভিত বিশাল মহিরুহে পরিণত হইতে পারে না, তেমনিই যে ব্যক্তির বা জাতির চরিত্র ও মনোবৃত্তি আপন দেশের ও জাতির আত্মার অন্তর্নিহিত বৈশিষ্ট্যের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত নয়, অথবা সেই বৈশিষ্ট্যধারা কর্তৃক অনুপ্রাণিত নয়, সেই ব্যক্তি ও জাতি কখনও জীবনে চরম উৎকর্ষ ও আনন্দ লাভ করিতে পারে না; পরন্তু তাহারা অন্যান্য জাতির আধ্যাত্মিক দাস হইয়া আত্মনিকৃষ্টতা-বিশ্বাসের গভীর লজ্জায় অবনত মস্তক ও বিশ্বমানবের কৃপার পাত্রস্বরূপ হইয়া থাকে।

মানুষের পরিকল্পিত যাবতীয় রসকলায়, প্রতিভা-গৌরবে বাঙালি জাতির স্থান যে বিশ্বমানবের আসরে কত দূর উচ্চে, তাহার উপলব্ধি বাংলার বাহিরের লোকের কথা দূরে থাকুক, আধুনিক শিক্ষিত ও অর্ধশিক্ষিত শহুরে বাঙালিরও নাই।

এই তো গেল আধুনিক শহুরে শিক্ষিত বাঙালির মনোভাব ও অকথা। অপরদিকে কিন্তু আমরা দেখিতে পাই যে, যাহারা প্রাচীন বাংলার সংকৃষ্টি প্রসূত সমুজ্জ্বল রসকলা-প্রতিভার ধারা যুগের পর যুগ সন্তর্পণে চর্চা করিয়া সযত্নে রক্ষা করিয়া আসিতেছে, তাহারা আধুনিক শহুরে শিক্ষিত ও অর্ধশিক্ষিত বাঙালির কাছে অবজ্ঞাত, নির্যাতিত ও পদদলিত হইয়া এত কষ্টে অর্ধাসনে জীবন যাপন করিতেছে, অথবা অনশনে প্রতি বৎসর এত দ্রুত গতিতে মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছে যে, বাংলার যে গৌরবময় অমূল্য জাতীয় সম্পদের তাহারা বাহক, তাহার সহিত যদি আধুনিক ভ্রান্তশিক্ষা-বিমূঢ় বাঙালি অবিলম্বে শ্রদ্ধাবনত মস্তকে পরিচয় স্থাপন না করিয়াও এই সম্পদের বাহক অপূর্ব প্রতিভাবান জাতীয় রসশিল্পীদের সামাজিক ও আর্থিক দুঃখদৈন্য দূর করিয়া তাহাদিগকে শিক্ষকের আসনে বরণ করিয়া জাতির আত্মার সঙ্গে পুনরায় ঘনিষ্ঠ যোগসূত্র স্থাপন না করে, তাহা হইলে বাঙালি জাতিকে তাহার আপন আত্মার সহিত চিরদিনের জন্য বিচ্ছিন্ন হইয়া জীবন যাপন করিতে হইবে।

কাব্যরসকলার ক্ষেত্রে চণ্ডীদাস ও বৈষ্ণব কবিগণ হইতে আরম্ভ করিয়া মধুসূদন ও রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ প্রতিভাশালী রসশিল্পীদের গৌরবের বলে বাঙালি আজ কতকটা মাথা তুলিয়া চলিতে আরম্ভ করিয়াছে। কিন্তু কী স্থপতিকলায়, কী ভাস্কর্যে, কী চিত্রকলায়, কী সংগীতে, বাংলার নিজস্ব প্রতিভা-প্রসূত রসসম্পদ কিছু আছে বলিয়া শিক্ষিত বাঙালি আজকাল স্বপ্নেও ভাবে না।

অথচ ইহা নিঃসন্দেহ যে, এইসকল ক্ষেত্রে, বাঙালি প্রাচীন যুগে যে কেবল উচ্চ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল তাহা নহে, আধুনিক শিক্ষিত বাঙালি যাহাদের নিকট হইতে 'ভারতীয় রসকলা' অথবা 'প্রাচ্য-রসকলা' শিক্ষা করিতে প্রবৃত্ত, তাহাদের অনেকেই প্রাচীন যুগে বাঙালির কাছে এইসকল রসকলার শিক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন।

বহু শত বৎসরের উপেক্ষা ও অবজ্ঞা সত্ত্বেও আজ পর্যন্তও এইসকল ক্ষেত্রে আমাদের দীনদরিদ্র পল্লিশিল্পীগণ সেই গৌরবময় জাতীয় প্রতিভার ধারা অল্পাধিকভাবে বহন করিয়া আসিতেছে। কিন্তু অবশেষে আজ তাহা বর্তমান বাংলার শিক্ষিত ও অর্ধশিক্ষিত বাঙালির কাছে উপযুক্ত আদর ও উৎসাহের অভাবে অনেক স্থলেই নির্মূলপ্রায় হইয়া যাইতেছে।

আধুনিক শিক্ষিত ও অর্ধশিক্ষিত বাঙালি যদি আপন জাতির আত্মার সহিত চিরদিনের জন্য বিযুক্ত হইয়া বেড়াইতে না চায়, তবে এখন এইজাতীয় প্রতিভা-সম্পদকে ও তাহার দীনদরিদ্র বাহকদিগকে অবিলম্বে চিনিয়া লইয়া সামাজিক ও আর্থিক লাঞ্ছনা হইতে তাহাদিগকে মুক্তি দান করুক ও জাতির

শিল্পশিক্ষার পদে বরণ করুক। নতুবা চিরদিনের জন্য বাঙালির আধ্যাত্মিক আত্মহত্যা ও আত্মবৈশিষ্ট্য-হীনতা স্থিরনিশ্চয়।

বাঙালিকে ইহা বুঝিতে হইবে যে, যদিও বাংলা দেশ ভারতবর্ষের অন্যতম একটি অঙ্গ এবং যদিও বাংলার সংকৃষ্টি ও সভ্যতা ভারতের যুক্ত সংকৃষ্টি ও সভ্যতার একটি অংশস্বরূপ এবং অন্যতম উপাদান ও শাখাস্বরূপ, তথাপি ইহা নিঃসন্দেহ যে, বাংলার একটি নিজস্ব সংকৃষ্টি আছে যাহা সে ভারতের যুক্ত সংকৃষ্টিতে দান করিয়াছে ও করিতেছে, যাহা ভারতের অন্যান্য প্রদেশের সংকৃষ্টির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট অথচ তাহাদের থেকে পৃথক এবং যাহা বাংলার জাতীয় আত্মার প্রকৃতির বিশিষ্ট অভিব্যক্তিস্বরূপ ও পরিচায়ক এবং ইহাও নিঃসন্দেহ যে, বাংলার নিজের আধ্যাত্মিক অস্তিত্বের, চরিত্রের ও জীবনের বিকাশের দিক হইতে এবং ভারতের সংকৃষ্টি পূর্ণবিকাশের দিক হইতে বাংলাকে তাহার স্বকীয় আত্মার এই নিজস্ব প্রতিভা-বৈশিষ্ট্যকে সযত্নে এবং সগর্বে মানিয়া ও চিনিয়া লইতে হইবে এবং বাঙালিকে ইহা হইতে তাহার প্রাথমিক ও প্রধান অনুপ্রাণনা আহরণ করিতে হইবে। তবেই বাঙালির আপন সৃজনীশক্তির বিকাশ হইবে। তবেই বাঙালি আপন জীবনের ও চরিত্রের পূর্ণ বিকাশ সাধন করিতে পারিবে এবং ভারতের উদার যুক্ত সংকৃষ্টিতে এবং বিশ্বমানবের বিশাল সংকৃষ্টিতে আপনার বিশিষ্ট দান দিয়া সার্থক ও ধন্য হইতে পারিবে।

প্রথমে স্থপতিকলার কথা ধরা যাউক।

অশোক-যুগের সাঁচি ও ভারহুতের মুসলমান-যুগে দক্ষিণ-ভারতে বিজাপুরের ও উত্তর-ভারতে দিল্লি ও আগ্রার মোগল-প্রাসাদশ্রেণির এবং বর্তমান যুগে সুদূর রাজপুতানার বাস্তুগৃহের স্থপতিগণের যে সৌন্দর্যময় নির্মাণ-কলা আজ আমাদের প্রশংসা অর্জন করে, সেই স্থপতিগণ যে প্রাচীন যুগে আমাদের বাংলারই কুটিরশিল্পের উদ্ভাবিত, সুমধুর স্থপতিকলা হইতে প্রচুর অনুপ্রাণনা ও নির্মাণক্ষেত্রে রূপকল্পনার আদর্শ সংগ্রহ করিয়াছিল তাহা সুপ্রমাণিত হইয়াছে। তথাপি আধুনিক শিক্ষিত বাঙালির অবজ্ঞা ও উপেক্ষার ফলে আজ বাংলার বনিয়াদি কুটির-নির্মাণ-পদ্ধতিকুশল স্থপতিগণ ও তাহাদের অপূর্ব শিল্প-নিপুণতা বাংলা দেশ হইতে দ্রুত বিলুপ্ত হইয়া যাইতেছে।

লোকসংগীতের ক্ষেত্রেও আমরা কী দেখিতে পাই? যে রবীন্দ্রনাথের গীতিকাব্যের অনুপম প্রতিভাগৌরবে ও সৌন্দর্যে আজ জগৎবাসী ও বঙ্গবাসী মুগ্ধ তাঁহার সেই গীতিকাব্যের অনুপ্রাণনার মুল উৎস যে আমাদের বাংলার শতসহস্র লোকসংগীত-বিশারদ পল্লিবাসীগণ, তাহাদিগের কাছে শিক্ষিত বাঙালি তাহার অনুপ্রাণনা গ্রহণ করিতে যাওয়া লজ্জাজনক ও হেয় জ্ঞান করে, তাহাদের অনুপম লোকসংগীত-কলাপ্রতিভা রীতিমতোভাবে শিক্ষা করিবার ও অক্ষুণ্ন রাখিবার জন্য কোনো চেষ্টা অথবা তাহাদের সামাজিক ও আর্থিক অবস্থার দীনতা দূর করিবার জন্য কোনো চেষ্টা শিক্ষিত বাঙালি করে না, এবং ইহার ফলে এই অনুপম জাতীয় সম্পদও দেশ হইতে বিলুপ্তপ্রায় হইতে চলিয়াছে।

বৎসরেক কাল পূর্বে বাংলার প্রাচীন গৌরবময় রায়বেঁশে যোদ্ধাদের বংশধরগণের উন্মাদনাময় রণতাণ্ডব রায়বেঁশে-নৃত্যের আবিষ্কার না-হওয়া পর্যন্ত শিক্ষিত বাঙালি বিশ্বাস করিত যে, নৃত্যকলার ক্ষেত্রে বাংলার নিজস্ব কোনো পদ্ধতি বা দান নাই।

বিগত বৎসরেক কালমধ্যে আমাদের ইহা প্রমাণ করিবার সুযোগ হইয়াছে যে, বাংলার নিজস্ব রায়বেঁশে বীর নৃত্য, কাঠি নৃত্য, জারি নৃত্য, বাউল নৃত্য, কীর্তন নৃত্য ও ধূপ নৃত্য ইত্যাদিতে তাণ্ডব ও মধুর উভয়প্রকার নৃত্যের আদর্শেরই এমন সুন্দর ভাণ্ডার রহিয়াছে যে নৃত্যকলা ক্ষেত্রে প্রাথমিক ও প্রধান অনুপ্রাণনার জন্য বাঙালির আর অন্যত্র যাইবার কোনো প্রয়োজন নাই। মেয়েলি ব্রত নৃত্য ও

লাস্য নৃত্যেরও নানাবিধ সুন্দর এবং বিশুদ্ধ পদ্ধতি বাংলা দেশের পল্লিতে এখনও জীবন্ত রহিয়াছে। সুতরাং কী পুরুষদের কী মেয়েদের নৃত্য বিষয়ে প্রাথমিক ও প্রধান অনুপ্রাণনার জন্য বাঙালির বাংলার বাহিরে যাইবার প্রয়োজন তো নাই-ই; পরন্তু ইহাদিগের বিশুদ্ধ ও সুন্দর পদ্ধতিগুলি অন্যত্র হইতে আমদানি নৃত্যের সঙ্গে মিশ্রিত হইয়া ভেজাল হইয়া না দাঁড়ায় এবং তাহাদের নিজস্ব সরল সুন্দর ও বিশুদ্ধ প্রকৃতি না হারায়, তৎসম্বন্ধে সকল বাঙালির সবিশেষ সচেষ্ট হওয়া প্রয়োজন।

ভাস্কর্যকলায় বাংলার পল্লিভাস্করদের স্থান যে অতি উচ্চে তাহা মাত্র কয়েকটি উদাহরণ হইতে আমরা বুঝিতে পারিব। এখানে প্রথমে একটি কথা বলিয়া রাখা প্রয়োজন। বাংলা দেশের নৈসর্গিক অবস্থানমূলক কারণবশত পাথরের অপেক্ষাকৃত অভাবে বাংলার ভাস্করগণ যে বেশির ভাগ পাথরের পরিবর্তে কাঠের ও মাটির উপরে তাঁহাদের শিল্পকৌশল প্রয়োগ করিতে বাধ্য হইয়াছেন, ইহাতে তাঁহাদের ভাস্কর্যকলা কৌশলের বিন্দুমাত্রও গৌরবহানি বর্তায় না। পরন্তু ইহা সর্ববাদীসম্মত যে, কাষ্ঠভাস্কর্যে সুনিপুণ ভাস্কর যদি পাথরের কাজ করিবার সুযোগ লাভ করেন তাহা হইলে তাহাতেও তিনি তাঁহার শিল্পকৌশল ষোলো আনা মাত্রায় প্রদর্শন করিতে পারেন এবং ইহাও নির্ধারিত হইয়াছে যে, সুদূর অতীতে অশোক-যুগে সাঁচি ভারহুতের ভাস্কর্য শিল্পীগণ প্রথম কাঠের কাজে তাঁহাদের অভিজ্ঞতা অর্জন করিয়াছিলেন। পাথরের কাজেও বাংলার ভাস্করগণ পাল-যুগের সুবিখ্যাত ভাস্কর্যে অনুপম কলাকৌশল প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। বর্তমান সময়ে শহুরে ও সমৃদ্ধ বাঙালির কাছে উৎসাহের অভাব বাংলার জাতীয় ভাস্করগণ পল্লির কুটিরে স্থপতিকলার আনুষঙ্গিক কাষ্ঠভাস্কর্যেই প্রধানত তাহাদের শিল্পকৌশল প্রদর্শন করিয়া আসিতেছে। শহুরে, শিক্ষিত ও সমৃদ্ধ আধুনিক বাঙালির কাছে এ সব কাজ প্রায়ই অজ্ঞাত থাকিলেও পশ্চিম-বাংলার পল্লিগ্রামে বনিয়াদি কুটিরগুলিতে ইহাদের অনিন্দ্যসুন্দর ও সুনিপুণ কলাকৌশলের যথেষ্ট নিদর্শন এখনও পাওয়া যায়, এবং আমার বিশ্বাস যে, ইহাদের পূর্বপুরুষগণের ভাস্কর্যনিপুণতাও বাংলার প্রাচীন যুগের স্থপতিদের স্থাপত্যশিল্পনিপুণতার ন্যায়, অশোক-যুগে সাঁচি ও ভারহুতের ভাস্করদিগকে অনুপ্রাণিত করিয়াছিল।

বাংলার এই বর্তমান পল্লিভাস্কর্যকলা বাংলার সাধারণ পল্লিজীবনের সঙ্গে রসকলার ঘনিষ্ঠ সংযোগের একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। ইহার উদাহরণ প্রধানত পাওয়া যায় তিনপ্রকার কাজে :

১. কার্নিশের ব্র্যাকেট বা 'শুঁড়ো' গুলিতে (বেশির ভাগ ব্র্যাকেটগুলি হাতির শুঁড়ের পরিকল্পনায় নির্মিত বলিয়া এইগুলিকে সাধারণত 'শুঁড়ো' বলিয়া অভিহিত করা হয়);

২. চালার বরগা ইত্যাদির উপর 'বোঠে' নামক আলংকারিক কাষ্ঠনির্মিত আকৃতিগুলিতে এবং

৩. দরজার চৌকাঠের পাটায়।

ইহাদের প্রত্যেক শ্রেণির অনেকগুলি চমৎকার উদাহরণ আমি বীরভূম জেলা হইতে সংগ্রহ করিয়াছি। এইগুলির শিল্পকৌশল এত সুনিপুণ ও মনোমুগ্ধকর যে, পৃথিবীর কোনো দেশের ভাস্কর্যের সঙ্গে নিপুণতার তুলনায় ইহাদের হার হইবে না বলিয়া আমি বিশ্বাস করি। এই উদাহরণগুলি হইতে স্পষ্ট বুঝা যাইবে যে যেসকল চিনদেশীয় মিস্ত্রির দল আজকাল কলিকাতা শহরে কাঠের কাজে একচেটিয়া আধিপত্য স্থাপন করিয়াছে ও যাহারা আমাদের দেশের ধনকুবেরদের কাছে লম্বা লম্বা মাহিনা পাইতেছে, তাহাদের চেয়ে আমাদের বাংলার পল্লিভাস্করগণ শিল্পনিপুণতার দিক দিয়া এবং ভাস্কর্য-রসকলায় প্রতিভার দিক দিয়া কোনো অংশে ন্যূন তো নহেই বরং শ্রেষ্ঠ। পরিকল্পনায় নিখুঁত, নির্মলতায় ও গৌরবে, ভাবের ও রসের নিবিড় অভিব্যঞ্জনায়, কারুকার্যের সুনিপুণ ছন্দে এবং স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে মানবদেহের অঙ্গ প্রত্যঙ্গের সৌন্দর্য ও লালিত্যের রূপসৃষ্টিতে এইগুলি জগতের ভাস্কর্যশিল্পে যে অতি উচ্চ স্থান অর্জন

করিবে তাহাতে সন্দেহ নাই। গ্রাম্য নাপিত কর্তৃক ভুঁড়িওয়ালা পণ্ডিত-মহাশয়ের ক্ষৌরকর্ম ও নাপিতানি কর্তৃক শুচিবাইগ্রস্তা পণ্ডিত জায়ার পায়ে আলতা পরানোর ভাস্কর্যটি অনুপম রসাভিব্যঞ্জনায় ও শিল্পনিপুণতায় পৃথিবীর মধ্যে একটি অদ্বিতীয় স্থান অধিকার করিবার যোগ্য। প্রয়োজনীয় অংশগুলির কারুকার্য সম্পূর্ণরূপে করিবার ও নিষ্প্রয়োজনীয় গুটিকয়েক অংশ ইচ্ছাপূর্বক অসম্পূর্ণ রাখিবার যে প্রণালী রদ্যাঁ (Rodin) প্রভৃতি বর্তমান যুগের শ্রেষ্ঠ ভাস্করের নিপুণতার চূড়ান্ত লক্ষণ বলিয়া পরিগণিত হয়, বাংলার দীনদরিদ্র পল্লিভাস্করগণের কাজে এই উচ্চপ্রতিভামূলক লক্ষণের স্বভাবজাত অসংখ্য নিদর্শন পাওয়া যায়।

এই অনুপম কৌশলসম্পন্ন পল্লিভাস্করগণ ও তাহাদের স্বভাবসিদ্ধ কলাকৌশল বাঙালির একটি জাতীয় সম্পদ। কিন্তু বর্তমানকালে উৎসাহের অভাবে ইহারা এবং ইহাদের শিল্পকৌশল অতি শীঘ্রই বাংলা দেশ হইতে সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হইতে চলিয়াছে। এখনও চেষ্টা করিলে ইহাদিগকে অবলুপ্তি হইতে রক্ষা করা যাইতে পারে। কিন্তু আর বিন্দুমাত্রও বিলম্ব করিলে তাহা অসম্ভব হইয়া পড়িবে।

সর্বশেষে এখন চিত্রশিল্পের কথা বলি। বাংলার নিভৃত পল্লিগ্রামের দৈনন্দিন জীবনে চিত্রকলার যেসকল ব্যবহার সাধারণত পাওয়া যায়, তাহা তিন ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে : প্রথমত, 'পটুয়া'-জাতীয় লোকের পুরুষানুক্রমিক প্রথানুসারে অঙ্কিত লম্বা লম্বা চিত্রপট; দ্বিতীয়ত, পল্লিগ্রামের মেয়েদের অঙ্কিত আলিম্পনা ও প্রাচীরচিত্র এবং তৃতীয়ত, মাটির ঘোড়া ও পুতুল এবং কাঠের পুতুল ইত্যাদির উপর চিত্রাঙ্কন।

এই তিনপ্রকার চিত্রের দৈনন্দিন অজস্র ব্যবহারে বাংলার পল্লিজীবন এককালে কী অতুল সৌন্দর্যের অভিব্যক্তিতে পরিপূর্ণ ছিল এবং বর্তমান বাংলার শহরের ভ্রান্তশিক্ষাপ্রসূত কৃত্রিম ও প্রাণহীন আদর্শ এখনও যেসকল সুদূর পল্লিতে পৌঁছিতে পারে নাই, সেখানে পল্লিজীবন এখনও যে কী অতুল সৌন্দর্যের অভিব্যক্তিতে পরিপূর্ণ আছে, তাহা শিক্ষিত ও অর্ধশিক্ষিত শহুরে বাঙালির অভিজ্ঞতা ও ধারণার অতীত। বাংলার নিরক্ষর সরল পল্লিবাসী স্ত্রীপুরুষগণের অন্তরে বিশ্বের সৃষ্টির আনন্দরসের নিবিড় দৈনন্দিন অনুভূতি ও তাহাদের অন্তরে অনুভূত পরব্রহ্মের সেই সহজ নির্মল আনন্দের সহজ-সরল অভিব্যক্তি এই বিচিত্র ছন্দোবন্ধ বর্ণ-সন্নিবেশরূপে বাংলার সুদূর নিভৃত পল্লিতে পল্লিতে এখনও যে পরিমাণে আত্মপ্রকাশ করিতেছে, পৃথিবীর অন্য কোনো দেশে সেরূপটি নাই বলিয়া আমি বিশ্বাস করি। 'বর্ণ-সংগীত'-এর (colour music) এই অসাধারণ প্রতিভা বাংলার পল্লির স্ত্রীপুরুষের চরিত্রকে যুগের পর যুগ সুমার্জিত করিয়া বাংলার প্রাচীন সংকৃষ্টিকে একটি অতুলনীয় মধুর ও গৌরবময় রূপ দিতে সহায়তা করিয়াছিল। আমাদের বর্তমান শহরের ভ্রান্তশিক্ষা ও বর্বরতামূলক আদর্শের প্রাণহীন প্রভাবের ক্রমবিস্তারের ফলে বাঙালির এই অতুল ও অবলীলাময় রসানুভূতির এবং রসাভিব্যক্তির স্বভাবজাত প্রতিভাস্বরূপ অমূল্য জাতীয় সম্পদ একেবারে বিলুপ্ত হইতে চলিয়াছে।

মাটিতে ও পিঁড়ি ইত্যাদিতে হাতের আঙুল দিয়া আলিম্পন দিবার যে সুন্দর প্রথা বাংলার পল্লিগ্রামের মেয়েদের মধ্যে এখনও আছে, তাহার কথা অনেকেই জানেন কিন্তু পশ্চিম-বাংলার মেয়েদের তুলিকার লীলাময় ব্যবহার দ্বারা নানা বর্ণে শোভিত প্রাচীরচিত্র অঙ্কিত করিয়া আপন আপন বাড়িঘরকে প্রতি বৎসর সৌন্দর্যমণ্ডিত করিয়া রাখিবার যে অতুলনীয় প্রথা এখনও বর্তমান আছে, তাহা আবিষ্কার করিবার সুযোগ ও সৌভাগ্য এক বৎসরকাল পূর্বে আমার হইয়াছিল। ঘরে ঘরে মেয়েদের হস্তাঙ্কিত এই প্রাচীর-চিত্রকলার সৌন্দর্যের গৌরবের ফলে পশ্চিম-বাংলার সুদুর নিভৃত প্রদেশের এক-একটি গ্রামকে এখনও এক-একটি ছোটোখাটো রকমের 'জীবন্ত অজন্তা' বলিয়া অভিহিত করিলে অত্যুক্তি হইবে না।

বাংলার পল্লিচিত্র শিল্পের যে তিনপ্রকার পদ্ধতির কথা বলা হইল, ইহার মধ্যে গ্রাম্য 'পটুয়া'দের অঙ্কিত লম্বা চিত্রপটগুলিই সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট ও উচ্চাঙ্গের চিত্র রসকলা। বাংলার সামাজিক ও ধর্মসম্বন্ধীয় রীতিনীতির পরিবর্তনে এবং বর্তমান শিক্ষার ফলে ইহা এখন বিলুপ্তপ্রায়। কিন্তু এই বিলুপ্তপ্রায় অবস্থায়ও ইহা যে এখনও বাংলার জাতীয় জীবনের একটি শ্রেষ্ঠতম ও গৌরবময় সম্পদ, তাহা নিঃসন্দেহভাবে বলা যাইতে পারে।

বর্তমানকালে বাংলা দেশে কলিকাতার কালীঘাট অঞ্চলের পটুয়াদের অঙ্কিত চিত্রকলা সাধারণের কাছে পরিচিত। কালীঘাটের পটুয়াগণ শহুরে ও বিজাতীয় আবহাওয়ায় পড়িয়া তাহাদের প্রাচীন বিশুদ্ধ ও সুন্দর পটাঙ্কন-কৌশল প্রায় হারাইয়া ফেলিয়াছে। কিন্তু বাংলার সুদূর পল্লিতে পল্লিতে দীনদরিদ্র গ্রাম্য ও পটুয়া শ্রেণির মধ্যে এখনও সেই প্রাচীন ধারা ন্যূনাধিকভাবে বর্তমান রহিয়াছে এবং তাহাদের পূর্বপুরুষদের অঙ্কিত পটের যে-কয়েকটি নিদর্শন সংগ্রহ করিবার সৌভাগ্য আমার হইয়াছে তাহাতে বাংলার এই পল্লিবাসী পটুয়াশ্রেণির চিত্রশিল্পে অসাধারণ নৈপুণ্য দেখিয়া অবাক হইতে হয়। বিশ-পঁচিশ বৎসর পূর্ব পর্যন্ত ইহারা এইসকল পট বাড়িতে বাড়িতে দেখাইয়া এবং তৎসঙ্গে রামলীলাপটের, কৃষ্ণলীলাপটের, শক্তিপটের ও যমপটের কাহিনি স্বরচিত গীতি কবিতায় সহজ ও সরলভাবে বিবৃত করিয়া এবং সুললিত সুরে তাহা আবৃত্তি করিয়া গাহিয়া গাহিয়া বিস্তর রোজগার করিয়া বেড়াইত। সম্প্রতি আধুনিক যান্ত্রিক সভ্যতার ও শহুরে শিক্ষার প্রভাব বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে ইহার চাহিদা এবং ইহার গুণগ্রাহিতা বাংলার গ্রাম হইতে বিলুপ্ত হইয়া যাইতেছে এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে অনুপম শিল্পকলা-নিপুণ এই গ্রাম্য পটুয়াদের অন্নসংস্থান হওয়াও দায় হইয়া পড়িয়াছে। চাহিদার অভাবে বাধ্য হইয়া ইহাদের মধ্যে বেশির ভাগ লোককেই পট-আঁকা ও পট-দেখানো ব্যাবসা ছাড়িয়া জনমজুরের ব্যাবসা গ্রহণ করিতে হইয়াছে। ইহা ছাড়া ভারত-ইতিহাসের ও বাংলার ইতিহাসের প্রহেলিকাময় আবর্তনে হিন্দুর শিল্পশাস্ত্রে অসাধারণ ব্যুৎপন্ন এই সুনিপুণ চিত্রকরগণ এখনও হিন্দুদের পূজার জন্য দেবদেবীর ছবি আঁকার ও মাটির প্রতিমা গড়িবার কাজ করায় ব্যাপৃত থাকা সত্ত্বেও হিন্দুসমাজের গণ্ডি হইতে বিতাড়িত হইয়া হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়েরই ঘৃণ্য বলিয়া বিবেচিত হইতেছে এবং এই দুই ধর্মসম্প্রদায়ের সীমান্তপ্রদেশে অনশনে ও অর্ধাশনে অতি দুর্ভাগ্যময় ও দীনতাময় জীবন যাপন করিতেছে।

সামাজিক নিদারুণ নিপীড়ন সত্ত্বেও ইহারা ইহাদের যে পুরুষানুক্রমিক রসকলা-সম্পদ সযত্নে চর্চা ও বহন করিয়া আনিয়া বর্তমান বাংলাকে দান করিয়াছে, তাহা অমূল্য ও অতুলনীয় এবং জগতের রসকলার আসরে ইহা যে একটি শ্রেষ্ঠ আসন লাভ করিবে তাহা নিঃসন্দেহ। ইহাও নিঃসন্দেহ যে, ইহাদের রসকলা-পদ্ধতি অতি প্রাচীন ভারতের প্রাগ্-বৌদ্ধযুগের আদিম রসকলা-পদ্ধতির অবিকল-প্রবাহিত বিশুদ্ধ পরম্পরার অভ্রষ্ট ও অপরিবর্তিত রূপ ধারা। ভারতের অন্যান্য প্রদেশে সেই অতি প্রাচীন প্রাগ্-বৌদ্ধযুগের চিত্রকলা-পরম্পরা তাহার আদিম ধারার বিশুদ্ধতা অক্ষুণ্ণ রাখিয়া এখনও বাঁচিয়া থাকিতে সমর্থ হয় নাই। কিন্তু বাংলার প্রতিভা যে সেই অসাধ্য-সাধনে সক্ষম হইয়াছে, বাংলার দীন-দুঃখী পটুয়াগণের চিত্রকলা তাহার জীবন্ত প্রমাণ।

মুদ্রারাক্ষস প্রভৃতি প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থসমূহে যে 'চিত্রলেখা'গুলির ও যমপট ইত্যাদি চিত্রপটের তাহাদিগের 'চিত্রকর' ও প্রদর্শকদিগের ভূরি ভূরি উল্লেখ পাওয়া যায়, সেই চিত্রকরগণ যে ইহাদেরই পূর্বপুরুষ ছিলেন এবং সেইসকল চিত্রলেখা ও চিত্রপট যে ইহাদের পূর্বপুরুষদেরই তুলিকাসৃষ্ট অতুল রূপ-সমৃদ্ধিতে বিভূষিত ছিল তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ হইতে পারে না এবং পাল-যুগে বিখ্যাত 'নাগ'-পদ্ধতিপন্থী চিত্রকর ধীমান ইহাদের পূর্বপুরুষ ছিলেন বলিয়া অনুমান যুক্তিসংগত মনে হয়। কারণ

এখনও ইহারা পটে নাগচিত্র-সুশোভিত মনসাদেবীর প্রতিকৃতি অঙ্কন করিতে অভ্যস্ত। আজকাল সাধারণ লোকে ইহাদিগকে 'পটুয়া' নামে অভিহিত করিলেও ইহারা আপনাদিগকে প্রাচীন সংস্কৃত 'চিত্রকর' নামেই অভিহিত করিয়া থাকে এবং ইহারা যে প্রাচীন ভারতের 'চিত্রলেখা' অঙ্কনকারী চিত্রকরদের বংশসম্ভূত, ইহার একটি আশ্চর্য প্রমাণ এই যে, বর্তমান হিন্দুসমাজে সাধারণ লোকের কথা দূরে থাকুক সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতদের মধ্যেও চিত্র আঁকার প্রক্রিয়াকে 'লেখা' নামে অভিহিত করিবার প্রথা যদিও সম্পূর্ণ লোপ পাইয়া গিয়াছে তথাপি এই চিত্রকরগণ এই সূত্রে কখনও 'অঙ্কন' অথবা 'আঁকা' কথা ব্যবহার করে না। পরন্তু সর্বদাই সেই অতি প্রাচীন 'লেখা' কথাটিই আজ পর্যন্ত ব্যবহার করিয়া থাকে। চিত্রশিল্পকুশলতার সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের পূর্বপুরুষদের ব্যবহৃত পরিভাষাগুলিও ইহারা যুগের পর যুগ সযত্নে বহন করিয়া আসিতেছে।

এতদিন আমরা অজন্তার সুবিখ্যাত চিত্রকলা-পদ্ধতিকেই ভারতের সর্বাপেক্ষা প্রাচীন চিত্রকলা-পদ্ধতির একমাত্র অবশিষ্ট উদাহরণ বলিয়া ধরিয়া লইতাম; কিন্তু এখন হইতে বাংলার এই নিজস্ব চিত্রকলাই সেই গৌরবময় স্থান অধিকার করিবে। ইহা ছাড়া বাংলার এই প্রাচীন চিত্রকলা-পদ্ধতির আরও যে-কয়েকটি গৌরবময় বিশেষত্ব আছে তাহা ইহাকে বিশ্বের চিত্রকলার সর্বোচ্চ আসনে বসাইবে বলিয়া আমি বিশ্বাস করি।

দেশবিদেশের অন্যান্য বিখ্যাত অতিমার্জিত চিত্রপদ্ধতির ন্যায় বাংলার এই নিজস্ব চিত্রপদ্ধতি বিশ্বমানবের আদিম যুগের সহজসরল ভাব, পৌরুষের ভাব, অকৃত্রিমতার ভাব এবং সজীবতা, সরলতা ও তেজস্বিতার ভাব হারায় নাই। একদিকে যেমন এইসকল গুণ ইহাতে সম্পূর্ণরূপে বিদ্যমান রহিয়াছে তেমনিই আবার এই মুক্ত ভাবের সঙ্গে সঙ্গে ইহা অন্যান্য আধুনিক মার্জিত চিত্রকলা-পদ্ধতির সমতুল অথবা ততোধিকভাবে লাবণ্য ও লালিত্য যোজনা করিতে সক্ষম হইয়াছে। ইহাতে অতি-বিলাসিতার, অতি-আলংকারিকতার ও অতি-সাম্প্রদায়িকতার মুদ্রাদোষের অথবা কোনোরূপ আড়ষ্টতা-দোষের ছাপ পড়ে নাই। বাংলার এই অপূর্ব চিত্রকলা একদিকে যেমন চিরপ্রাচীন তেমনিই অপরদিকে আবার ইহা চিরনূতন। এই চিত্রকলার ভাষার অক্ষর-প্রকরণ অতি স্বল্প ও সহজ। ইহা কেবল রেখার সতেজ, সুনিপুণ, প্রখর ও ভাবব্যঞ্জক প্রয়োগ এবং অল্প কয়েকটি প্রাথমিক বর্ণের অমিশ্র ব্যবহারের উপর নির্ভর স্থাপন করে। ইহার ভাষার ব্যাকরণ অতি সহজ ও অতি প্রাঞ্জল। পরিপ্রেক্ষিতের মাপকাঠির খুঁটিনাটি ও আলোছায়ার খেলাধুলার চতুরতা ও বাহুল্য মিশাইয়া ইহা কখনও আপনার ব্যাকরণকে অযথা জটিল করিয়া তুলিবার প্রয়াস করে নাই। ইহার আকার-বিন্যাস ও বর্ণসমাবেশ ও সমন্বয় অতি শোভন ও অনিন্দ্যসুন্দর। আলংকারিকতার চূড়ান্ত কৌশলও যে এই চিত্রকরগণ প্রদর্শন করিতে পারে তাহারও শ্রেষ্ঠ প্রমাণ এইসকল প্রাচীন পট হইতে পাওয়া যায়। কিন্তু বাংলার এই প্রাচীন চিত্রকলার কেবলমাত্র ইন্দ্রিয়তৃপ্তির উদ্দেশ্যে রূপ-কল্পনার বিলাসিতার অযথা বাড়াবাড়ি নাই, অথচ ইহা রস-প্রাচুর্যে ভরপুর। ইহাতে অঙ্কিত মনুষ্যগণের আকৃতি হাবভাব সম্পূর্ণভাবে কৃত্রিমতা ও মুদ্রাদোষবিহীন এবং সাধারণ মানুষের সহজ ও জীবন্ত ভাব পরিপূর্ণ। একদিকে বাংলার এই পল্লিশিল্পীদের জীবজন্তু-অঙ্কনের ক্ষমতা যেমন অসাধারণ নৈপুণ্যের পরিচায়ক, তেমনই অপরদিকে মানুষের অন্তরতম মনোভাবের অবিকল ব্যঞ্জনা একমাত্র তুলির অবলীলাময় টানে ফুটাইয়া তুলিতে ইহাদের ক্ষমতাও জগতে অদ্বিতীয়। বৃক্ষলতাদি পত্রের অঙ্কনের অতি চমৎকার ও মনোহর আলংকারিক রীতিও এই চিত্রপটগুলির ও এই চিত্রকরদের একটি অন্যতম বিশেষ আধুনিক ভারতীয় চিত্রকলার শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ-বিন্যাসের ও ভাবব্যঞ্জনার আদর্শে যে অস্বাভাবিকতা, দুর্বলতা, কৃত্রিমতা ও অতি-কবিভাব

লক্ষিত হয়, বাংলার এই প্রাচীন চিত্রকলা-পদ্ধতিতে সেইসকল দুর্বলতা ও দোষ নাই। এইসকল চিত্রপটে একদিকে পুরুষদেহের বীরোচিত অঙ্গ প্রত্যঙ্গের ভাব ভঙ্গির অঙ্কন প্রণালী ও অপরদিকে নারীদেহের লীলায়িত রূপলাবণ্য-মাধুরীর বিচিত্র অঙ্কনকৌশলের স্বভাবজাত সমাবেশ দেখিয়া অবাক হইতে হয়। অনুকরণমূলক অঙ্কনবাহুল্য বর্জন করিয়া ইঙ্গিতে ভাবের ও রসের পরিপূর্ণ ব্যঞ্জনাশক্তি এইসকল চিত্রপটের একটি বিশিষ্ট লক্ষণ। ইহার একটি চিত্রেও কোনোরকম ভাবের অপরিস্ফুটতা অথবা ধোঁয়াটে ধরন নাই। চিত্রে অতি-পরিস্ফুটভাবে কাহিনি বিবৃত করিবার অসাধারণ ক্ষমতা এই চিত্রকলা-পদ্ধতি ভারতের আদিম যুগ হইতে পূর্ণভাবে বজায় রাখিয়া আসিতে সমর্থ হইয়াছে। রামপটে অঙ্কিত কর্মযোগমূলক পৌরুষকাহিনির ইতিহাস ও প্রাচীন ভারতের পারিবারিক জীবনপ্রণালী শক্তিপটে অঙ্কিত গভীর আধ্যাত্মিক জ্ঞানমূলক দার্শনিকের সত্য এবং কৃষ্ণপটের আধ্যাত্মিক প্রেমমূলক 'রমন্তকতা' (Romanticism)-র ভাবতরঙ্গ বাংলার এইসকল প্রাচীন শিল্পীগণ অতি সরল ও সহজভাবে সাধারণের বোধগম্য করিয়া চিত্রপটে তাহাদিগকে অসাধারণ ভাবব্যঞ্জক ও অনিন্দ্যসুন্দর রূপ প্রদান করিয়া তাহাদের অদ্ভুত প্রতিভার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। সর্বোপরি বাংলার পল্লিগ্রামের সরল প্রকৃতির স্ত্রী-পুরুষগণের চরিত্রের একটি অনির্বচনীয় ও অতুলনীয় নিজস্ব মাধুর্যরসে এইসকল চিত্রপটের রেখা বর্ণ ও রূপকল্পনা ওতপ্রোতভাবে পরিপ্লাবিত।

বাংলার এই প্রাচীন চিত্রশিল্পীগণ রসকলার সঙ্গে ধর্মের যে ঘনিষ্ঠ ও অটুট সম্বন্ধ তাহা কখনও ভুলিয়া যান নাই এবং তাহা মানুষের মনে অবিরত জাগাইয়া দিবার জন্য প্রত্যেক চিত্রপটের শেষ ভাগে যমরাজার সভায় চিত্রগুপ্তের অভ্রান্ত খাতার চিত্র ফুটাইয়া তুলিয়া এবং যমরাজার অনুশাসনে ধর্মের অন্তিম জয় ও অধর্মের অন্তিম পরাজয়ের কাহিনি অতি জ্বলন্তভাবে বিবৃত করিয়া সমাজে ধর্মভাবের প্রচলন বজায় রাখিবার অমূল্য সহায়তা করিয়াছেন।

পাশ্চাত্য জগতের চিত্রকলা-রূপসির আত্মা আজ তাহার বহু যুগের পুঞ্জীভূত বিলাসবেশভূষার জটিলতার ভারে প্রপীড়িত হইয়া পরিপ্রেক্ষিতের ভেলকিবাজি ও আলোছায়াপাতের মরীচিকাময় বেড়াজালের আবেষ্টনের পীড়নে ক্লান্ত ও অবসন্ন হইয়া সহজসরল আত্মপ্রকাশের আগ্রহে তাহার বিলাস-হর্ম্যরাজি পরিত্যাগ করিয়া আফ্রিকা ও আমেরিকার বনজঙ্গলে মানবজাতির আদিম লালিত্যহীন সরলতার মধ্যে সহজসরল আত্মপ্রকাশের উপযোগী যে চিত্রভাষার অনুসন্ধানে ব্যর্থপ্রয়াসে উন্মাদের ন্যায় খুঁজিয়া বেড়াইতেছে, বাংলার পল্লির সুমধুর চিত্রলেখা-লক্ষ্মী আজ তাঁহার সলজ্জ অবগুণ্ঠন ঈষৎ উন্মোচন করিয়া সেই অতিবাঞ্ছিত অনুপম ও একাধারে প্রাঞ্জল অথচ শক্তিময়, লাবণ্যময়, প্রাণময়, কৃত্রিমতাবিহীন এবং ভাবব্যঞ্জনায় ও রসব্যঞ্জনায় ভরপুর চিত্রভাষার সন্ধান বিশ্বমানবকে মিলাইয়া দিবে।

উৎস : *প্রবাসী*, বৈশাখ, ১৩৩৯।

আমাদের শিল্পকলা

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

আগে গাছ বাড়লে তবে তো তার ফল-ফুল, তেমনই আগে জাত বাড়লে তবে তার শিল্পকলা—ইত্যাদি কথা তর্কের মুখে বক্তৃতার জোরে প্রায়ই শুনি এবং হয়তো বলেও থাকব; কিন্তু হঠাৎ মনে পড়ল যে, ফলন্ত ফুলন্ত বীজ বলে একটা পদার্থ আছে এবং সেই পদার্থটিই তাল তমাল বট অশ্বত্থ হয়ে বাড়ে। মালী না থাকলেও ফলন্ত বীজ গাছ হয়ে বাড়তে থাকে আপনার রস আপনি খুঁজে নিয়ে, কিন্তু অফলন্ত বীজ যদি হয় তবে সার-মাটিতেও নিষ্ফলা রয়ে যায় সেটি।

শিশু দাঁত নিয়েই জন্মায়, শুধু দাঁত ফোটে ছেলে একটু বড়ো হলে; জাতির মধ্যে তেমনই জাতিটার যে সব বিকাশ ভবিষ্যতে হবে তা ধরা থাকে, কালে সেগুলো ফুটতে থাকে ভালো-মন্দ আবহাওয়ার বশে। কোনো ছেলের কথা ফোটে আগে, কোনো ছেলে কথা বলে দেরিতে, কিন্তু যে ছেলে বোবা তার কথা বড়ো হয়েও ফোটে না, বুড়ো হয়েও ফোটে না— যতই কেন ভালো আবহাওয়ায় সে থাকুক না।

বয়সে দাঁত পড়ল চুল পাকল, দাঁতও বাঁধালেম চুলও কালো করলেম; দুটোই শৌখিন জিনিসের মতো, শিকড় গাড়ল না জীবন্ত মানুষের রক্ত চালানোর ক্ষেত্রে। এইভাবে জাতীয় শিল্প সংগীত কবিতার রং ধরানো যায় একটা বুড়ো জাতির গায়ে, কিন্তু সেই কৃত্রিম রং তো টেকে না বেশিদিন এবং সেটা দিয়ে জাতির জরা এবং মরার রাস্তাও বন্ধ করা চলে না এক দিনও।

যেখানে জাতীয় জীবন বলে একটা-কিছু নেই সেখানকার মানুষগুলির সঙ্গে কতকগুলি শিক্ষাগার পাঠাগার কর্মশালা ধর্মশালা আখড়া আড্ডা আশ্রমভবন ইত্যাদি যেন-তেন প্রকারেণ জুড়ে দিলেই যে ঠিক ফলটি পাওয়া যাবে এমন কোনো কথা নেই। মরা আমগাছে নাইট্রোজেন বৃষ্টি করে আঁকশি হাতে বসে ফল পায় কি কেউ?

জাত দু তিন রকমের আছে; যেমন, স্ক্রুপ জাত অর্থাৎ জাতে বড়ো গাছ কিন্তু এক বিঘতের বেশি তার বাড় নেই, ডালপালাগুলো চিনের পায়ের মতো বিষম বাঁকাচোরা, দেখতে গাছের মতো ঝাঁকড়া কিন্তু ফল দেয় না, টবে ধরা থাকে। আর-এক রকমের জাত স্কোপ জাত, মৃত জাত, শুকনো গাছ, অনেক কালের মরা কাঠ, দেশবিদেশে পাখি কাঠবেড়াল বনবেড়াল কাগাবগার খোপ আর দাঁড়ের কাজ করছে। স্ক্রুপ জাতের সুবিধে আছে যে, কোনো গতিকে টব থেকে ছাড়া পেলে সে তেজে বেড়ে উঠতে পারে, স্কোপ জাতের সে সুবিধে নেই, খোপেখাপে ফোঁপরা কাঠ তাতে টেবিল-চৌকিও তৈরি হয় না, জ্বালাতে গেলে ধুঁয়া হয়, শুধু সেটা নিয়ে দেহতত্ত্বের এবং জাতিতত্ত্বের নানা গভীর কথা সমস্ত আলোচনা করা চলে। একদিকে বাড়-হারানো বড়ো জাত, অন্য এক দিকে বাড়-দাবানো বড়ো জাত, ভারতবর্ষী জাত বলতে এ দুটোর কোন্‌টা বলা শক্ত। আমি দেখি আমাদের আজকের জাতীয় জীবনটা এই দুয়ের খিচুড়ি। ছিল জাত হবিষ্যান্নজীবী, হল ক্রমে খেচরান্নজীবী। আগের জাত ভালো ছিল এখন হল মন্দ, এ কথা আমি বলিনে। জাতীয় জীবনের পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী, কেউ তাকে ঠেকাতে পারে না, কালের উপযোগিতার নিয়ম মেনে তবে বাঁচে জাত। আর্যজাতি এককালে ছিল আমমাংসভোজী, তার পর খেতে শুরু করলে আমানি এবং এখন খাচ্ছে আম আমানি দুই-ই,— একই জাত শুধু কালের পরিবর্তনের মধ্যে পড়ে ভিন্ন চেহারা ধরছে। এটার জন্যে ভাবনা নেই, শুধু ভাববার বিষয় এই যে, জাতটির জীবনীশক্তির দৌড় বাড়ের দিকে, না, তার উলটো দিকে। আজ যদি কেউ আমাকে বলে হবিষ্যান্ন ধরলেই তুমি ঠিক তোমার আগেকার তাদের শিল্পকলায় বিশুদ্ধি ইত্যাদি সমস্তই পেয়ে যাবে, বিশুদ্ধ সংগীত বিশুদ্ধ কবিতা বিশুদ্ধ সাহিত্য এবং বিশুদ্ধ কর্মকাণ্ড সমস্তই এসে যাবে দেশ ও জাতির কবলে, তবে তাকে এই কথাই তো বলব যে, কালকের মতো হয়ে পড়ার জন্য মাদুলি ধারণ করে নিতে ব্যস্ত হয়ে লাভ কী? সেকালের রক্ষাকবচ একালের জীবন-সংগ্রামে তো কাজের হবে না, সেকাল রাখলে যে একাল যায়, তার কী? নদীর জাত বাঁচাতে গিয়ে নদীর চলাচল বন্ধ করায় কোন্ লাভ? চিনদেশ ভোজনবিলাসী, তারা তিন শত বছরের হাঁসের ডিম খেয়ে রসনা তৃপ্ত করে, কিন্তু তা খেয়ে প্রাচীন চিনের শিল্পসম্পদ পাবে বলে তারা বিশ্বাস করে না একেবারেই— শখ হয় তাই খায়, সুস্বাদু বলে।

পুরোনো চাল ভালো, পুরোনো শাল ভালো, পুরোনো কাঁথা তাও ভালো, সকল ভালো জিনিসের ভাণ্ডার বলতে পার আমাদের প্রাচীন আমলকে, তথাপি পুরোনো হয়ে যাওয়া যে ভালো এ কথা তো কেউ বলছে না আমরা ছাড়া।

আজকের কালে প্রাচীন শিল্পের আদর যথেষ্ট দেখে আমরা দলে দলে কেউ বৌদ্ধযুগের মতো কেউ মোগল আমলের মতো ছবি মূর্তি গানবাজনা ইত্যাদি করে বসি; শুধু এই নয়, পুরাণের পাতা থেকেই কেবল ছবি মূর্তি হাবভাব ইত্যাদিও হুবহু নিয়ে কার্য করতে লেগে যাই। তা হলেই বা কী হবে? এইভাবে সাময়িক আদর বা অনাদরের বিচার করে চলায় ব্যাবসার-বুদ্ধি বৃদ্ধি পায় কিন্তু এতে করে রসবোধ জাগে না জাতির অন্তরে এবং জাতিটাও এতে করে নিজের শিল্পসম্পদ পেয়ে ধন্য হয়ে যায় না।

জাতিটাকে যখন চৌরঙ্গি-বাতে ধরল তখন তার হাতে পায়ে বুকে পিঠে পুরোনো ঘি মালিশ করে দেখা গেল বেশ চলেফিরে বেড়াতে লাগল সে, তাই বলে পুরোনো ঘিয়ে লুচি ভেজে তাকে তুষ্ট ও পুষ্ট করা তো চলল না, যে কবিরাজ পুরোনো ঘিয়ের ব্যবস্থা করেছিলেন তিনিই তখন বললেন টাটকা গাওয়া ঘিয়ে লুচি ভাজতে।

আজকের হাঁস তিনশো বছর আগেকার ডিম পাড়বার সাধনা করবার আয়োজন করে বসলে পরমহংস বলে তাকে ভুল করে না কেউ, তেমনই আজকের জাত কালকের ভূত নামাতে শবসাধনার আয়োজন করছে দেখলে তার সিদ্ধিলাভের পক্ষে সন্দেহ অনেকখানি থেকে যায়।

আজকের সঙ্গে কালকের নাড়ির সম্বন্ধ আছে। আজকের শিল্প কালকের শিল্পের উপরে বসে পদ্মাসনা শবাসনা— এটা সত্যি কথা, কিন্তু এই শবাসনার সাধনায় অনাচার ঘটলে ভূতপ্রেত এসে সাধকের ঘাড় ভাঙে, সিদ্ধিদাত্রী বরদা আসেন না— এটা জানা কথা।

শবাসনার জন্যে ব্যস্ত নই, শব খুঁজছি কেবল, এতে করে অতীতের ভূতের কবলে পড়ে কর্ম পণ্ড হওয়া বিচিত্র নয়। সাধাসাধি করে হাতেপায়ে ধরে লোককে দিয়ে কার্য হয়, সে সিদ্ধি কার সিদ্ধি?—যে সাধছে বা যে মারছে কেবল তারই নয় কি? আমার কথায় ভুলে বা ধমকানি শুনে যদি আজ দেশসুদ্ধ ছবি মূর্তি গড়তে লেগে যায় আমি যেমনটি চাই তেমনি করে, তবে তার ফল দেশ পাবে, না, দেশের যারা আমার কথায় উঠল বসল তারা পাবে? আমার খেয়ালমতো আমি লোক লাগিয়ে ঘর বাঁধলাম, সে ঘর আমার ঘর হল, আমি তার আশ্রয় পেলেম, ছায়া পেলেম, মিস্ত্রি মজুর তারা ঢুকতেই পেলে না বৈঠকখানায়। যে গুরু হাত ধরে নিয়ে গেলেন শিষ্যকে শিল্পজগতে তিনিই যথার্থ গুরু; যে গুরু ঘাড় ধরে শিষ্যকে বললেন, 'আমার আজ্ঞানুবর্তী হয়ে যেমন বলি তেমনই চল', সে গুরু গুরুমশাই, তিনি নিজের বেতন বাড়িয়ে গেলেন ছাত্রের দৌলতে।

আগেও ছিল, এখনও আছে, এক-এক শ্রেণির লোক, জাতের কর্তা হয়ে ওঠে তারা, যার জাত নেই তাকে জাত দিতে জানে না, যে জাত ঘুমুচ্ছে তাকে জাগাতে হলে কী করা উচিত তাও জানে না, জাত মারবার ফন্দিই তাদের মাথায় ঘোরে, পাশাঙ্কুশ-হস্তে তারা যমরাজের মতো বসে থাকে জাতকে বাঁধবার পাশ আর জাতকে মারবার অঙ্কুশ দুই অস্ত্র সর্বদা উঁচিয়ে।

আগেও ছিলেন এখনও আছেন অন্য এক-এক শ্রেণির লোক যাঁরা বরাভয়হস্তে বুদ্ধদেবের মতো দ্বারে দ্বারে হেঁটে বেড়ান, সমস্ত মানবজাতির হাতে ভিক্ষা নিয়ে তাঁরা জগৎবাসীকে ধন্য করে যান, অভয় দিয়ে নির্ভয় করেন, বর দিয়ে শক্তিমান করেন। ঘুমন্ত জাতির মুমূর্ষু জাতির আশার প্রদীপের শিখা এইসব জাগ্রত মানব-আত্মা, যাঁরা রাত্রির অন্ধকারের মধ্য দিয়ে আলো বহন করে আনেন।

কালসূত্রে ধরা রইল কালকের সকালের সঙ্গে আজকের সকাল, কালকের জাতির সঙ্গে আজকের জাতি, কাব্যকলা সংগীতকলা শিল্পকলা, জ্ঞানবিজ্ঞান নিয়ে প্রাচীন ভারতবর্ষের জাতীয় জীবনটিও তেমনই কালসূত্রে গাঁথা রইল— বেজোড় মুক্তা! আজকের আমাদের জাতির উপরে সবচেয়ে যে বড়ো দায়িত্ব তা হচ্ছে এই অতীতকালের মালায় যে বেজোড় মুক্তা দুলছে তার সঙ্গী আর-একটি কালসূত্র গেঁথে যাওয়া। আমাদের জীবন কেমন জিনিসটা

ধরে গেল আগেকার জীবনের পাশে এই নিয়ে আমাদের পরে যারা আসবে তারা আমাদের গুণপনা বিদ্যাবুদ্ধি সমস্তেরই বিচার করবে। অতীতের পাশে আজ আমরা যাই ধরি, কাচই ধরি মাটির ঢেলাই ধরি কালে সেই আজকে ধরা তুচ্ছ জিনিস তাও মালার একটা অংশ ধরে থাকবেই— চাঁদের কোলে কলঙ্কের মতো। পরবর্তী কেউ এসে অনুকূল সমস্ত প্রবন্ধ লিখে কিংবা মাটির ঢেলার আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা দিয়ে হয়তো আমাদের আজকের তুচ্ছ কাজ সমস্তের গভীর অর্থ বের করে ভবিষ্যতের বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা দেবে; কিন্তু এমনও লোক থাকবে সেদিন যে সজোরে এই ঘোরতর রকমে মালা মাটি করাটাকে অভিসম্পাত দিয়ে আজকের আমাদের জাতীয় সভ্যতার বিরুদ্ধে সমালোচনা করে চলবে ক্রমাগত। এইভাবে হয়তো, কতকাল ধরে তা কে জানে, মালা ফিরবে অনুকূল ও প্রতিকূল ভাবে জাতিতত্ত্ববিদ-জাতীয় ঐতিহাসিক জাতীয় শিল্প-সমালোচক প্রভৃতির হাতে, মাটির ঢেলার পাশে আর-একটি দানা তারা গাঁথবে না, শুধু হাওয়াই গেঁথে যাবে দিনের পর দিন, তার পর হঠাৎ এক দিন সারা দেশ সমস্ত পৃথিবী দেখতে পাবে হয়তো মাটির ঢেলার পাশেই আর-একটি অপূর্ব সুন্দর জীবন-বিন্দু ধরা পড়েছে কালসূত্রে। এই জীবন-বিন্দু-জাতীয় কোনোরকম শিক্ষাগার হাসপাতাল ল্যাবোরেটারি লাইব্রেরি ইউনিভারসিটি কিংবা সিটি ফাদারদের চা খাওয়ার পেয়ালায় কিংবা আর্ট স্কুলের রঙের বাটির মধ্যে জন্মায়নি, মহাকাল একে সবার অসাক্ষাতে জন্ম দিয়েছে কোনো-এক লোকের বুকের ভাষায়, তার পর এক দিন সেই একটি লোকের জীবন ও বিন্দু মহাকালই নিংড়ে নিয়ে ধরেছে নিজের বিজয়মালার মধ্যে।

এই যখন হল তখন এল জাতি, বিচার করে ভেবেচিন্তে একটা মহাসভা ধূমধামে বসিয়ে সকলে জাতীয় কবি, জাতীয় শিল্পী, জাতীয় যে-কেউ তার মূর্তি প্রতিষ্ঠার জন্য চাঁদা তুলতে বের হল এবং জাতীয় গৌরব অনুভব করায় আয়োজন সার্থক করার চেষ্টায় কোথায় ন্যাশনাল কনসার্ট, ন্যাশনাল থিয়েটার, ন্যাশনাল হোটেল আছে সেখানে বায়না দিতে ছুটল ও কাজটা যাতে ন্যাশনাল রকমে হয় তার জন্যে একটা রেজোলিউশন পাস করিয়ে নিয়ে খেটেখুটে অকাতরে গিয়ে নিদ্রিত হল নিজের কেল্লায়। মহাজাতি রাজকন্যা ঘুমিয়ে থাকে, মহাকাল দৈত্যের মতো তাকে ধরতে এসে কেল্লার দরজায় ধাক্কা দিয়ে বলে, কে জাগে? রাজকুমারী সাড়াশব্দ দেন না, সাড়া দেয় যে পাহারা দিচ্ছে মহাজাতির শিয়রে। কে জাগে?— সওদাগরের পুত্র জাগে। কাল নিরস্ত হয়, আবার আসে দ্বিতীয় প্রহরে, কে জাগে?— মন্ত্রীপুত্র জাগে। তৃতীয় প্রহর যায়, কাল ফিরে এসে বলে, কে জাগে?—কোটালের পুত্র জাগে। রাত-শেষে অন্ধকার পাতলা হয়, কাল ছুটে এসে বলে, কে জাগে? কে জাগে?—রাজপুত্র জাগে?

বারেবারে এইভাবে মানবজাতি ঘুমোয়, জাতির শিয়রে জাগরণ, বসে থাকে কালের কবল থেকে তাকে বাঁচাতে, সকাল হলে এদের কাজ শেষ হয়ে যায়। এদের রাতের গাঁথা অসমাপ্ত মালা রাজকুমারীর ঘরের দুয়ারে পড়ে থাকে, সে মালা মহাজাতি শাহজাদির হাতে গাঁথা মালা নয়, সে চাহার দরবেশ—তাদের জপমালা। রাজকুমারী তাকে অনেক সময় মাড়িয়ে চলে যান নিজের গরবে, হয়তো-বা রাজকুমারীর দাসী পেয়ে যায় সে মালা ঘর ঝাঁট দিতে, কিংবা ঘরের দুয়োরে আলপনা টানতে বসে অথবা এমনি চলে যেতে যেতে!

উৎস : *বাগেশ্বরী শিল্পপ্রবন্ধাবলি*, ১৯৪১।

পট ও পটুয়া

গুরুসদয়

সংস্কৃত ভাষায় 'পট্ট' বা 'পট' বলিতে মূলত কাপড় বুঝায়। প্রাচীন ভারতে কাপড়ের উপর চিত্র লিখিবার রীতি ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল। যে কাপড়ের উপর চিত্র লিখিত হইত, পট বলিতে বিশেষ করিয়া সেই কাপড়টিকেই বুঝাইত। কালক্রমে পটের শেষোক্ত অর্থ অধিকতর প্রচলিত হইল। এই জন্য 'পটকার' বা 'পট্টীকার' বলিতে চিত্রকরসমাজকে বুঝাইতে লাগিল। 'পট' শব্দের উত্তর সম্বন্ধ-বাচক 'উয়া' প্রত্যয়যোগে 'পটুয়া' শব্দের উৎপত্তি। সাধুভাষা বা পুরাতন বাংলার শব্দ 'পটুয়া'র আধুনিক প্রাদেশিক রূপভেদ পউট্যা, পউটা, পটো (পোটো)। 'পটুয়া'রা নিজেদের 'চিত্রকর' জাতি বলিয়া উল্লেখ করে।

বাংলা দেশে 'পটুয়া' জাতি ছাড়াও অপর কোনো কোনো জাতির লোক চিত্র লিখিয়া থাকে। দৃষ্টান্তস্বরূপ আচার্য-ব্রাহ্মণ ও কুম্ভকার-সমাজের নাম করা যাইতে পারে। কিন্তু ইহারা জাতিতে চিত্রকর সংজ্ঞার অন্তর্গত নয়। ইহাদের বিষয় বর্তমানে আমাদের আলোচ্য নয়।

এখন কাপড়ের উপর চিত্র লিখিবার রীতি প্রায় লোপ পাইয়াছে। কাগজের উপরেই সাধারণত চিত্র লিখিত হয়; কিন্তু 'পট' নামটি রহিয়া গিয়াছে। কাপড়ের উপর অঙ্কিত প্রাচীন চিত্র এখনও দুই-চারিটি পাওয়া যায়; আমার সংগ্রহেও উহা রহিয়াছে।

বহুচিত্র দীর্ঘপট ও পটুয়া-সংগীত

বাংলা দেশের পটগুলিকে সাধারণত দুই শ্রেণিতে বিভক্ত করা যায় : ১. একচিত্র-সম্বলিত ছোটো ছোটো 'চৌকা' পট, ২. পর-পর অঙ্কিত বহুচিত্র-সম্বলিত 'দীঘলপট' বা 'জড়ানোপট'। এই বহুচিত্র দীর্ঘপটগুলি অবলম্বন করিয়াই পটুয়াগণ গীতিকাব্য রচনা করে এবং সুর-সহযোগে তাহা আবৃত্তি করে। বীরভূম, বর্ধমান, মুর্শিদাবাদ প্রভৃতি অঞ্চলের পটুয়াগণ ৮-১০ হাত হইতে ২০-২৫ হাত দীর্ঘ কাগজের উপর এই শ্রেণির বহুচিত্র দীর্ঘপট প্রস্তুত করিয়া উহার উপর এক-একটি কাহিনির বিবৃতিসূচক পর-পর অনেকগুলি চিত্র অঙ্কিত করে এবং বাংলার নানা জেলায় ঘুরিয়া ছবি দেখাইবার সঙ্গে সঙ্গে ওই কাহিনিগুলি সুর-সহযোগে আবৃত্তি করিয়া থাকে। প্রত্যেক দীর্ঘপটের দুই

প্রান্তে দুইটি বাঁশের দণ্ড লাগান হয়; শেষ প্রান্তের দণ্ড হইতে জড়াইতে আরম্ভ করিয়া সমস্ত পটটি গুটাইয়া রাখা হয়। সুতরাং দীর্ঘপটের প্রথম চিত্রের উপরিভাগে সংলগ্ন দণ্ডটি বাহিরে থাকে। পট দেখাইবার সময় জড়ানো পটটি একটি বাঁশের ছোটো চারপায়ার উপর রাখা হয়; প্রদর্শক পটুয়া বাঁ হাতে উপরিভাগের দণ্ডটি তুলিয়া সর্বপ্রথমে প্রথম চিত্রটি খুলিয়া দেখায় ও ডান হাতে চিত্রে অঙ্কিত বিষয়গুলি নির্দেশ করিয়া তাহার কাহিনি সুর-সহযোগে বিবৃত করে। তার পর উপরের দণ্ডটি ঘুরাইয়া প্রদর্শিত প্রথম চিত্রটি তাহার উপর জড়াইয়া দ্বিতীয় চিত্রটি উন্মোচন করে এবং তাহার কাহিনি এইরূপভাবে বিবৃত করে। এইপ্রকারে দীর্ঘপটে অঙ্কিত সমস্ত চিত্রগুলি প্রদর্শন করার সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের বিষয়বস্তুগুলি গীতিকাব্যে বিবৃত করা হয়।

পটুয়া-শিল্প ও পটুয়া সংগীতের অনুসন্ধান ও প্ররক্ষণ-ব্যবস্থা

বাংলা দেশে আজকাল পটুয়া-শিল্পের প্রতি যে অনুরাগ প্রকাশ পাইতেছে উহা বাংলার গণ-সংগীত, গণ-নৃত্য ও গণ-শিল্পের প্রতি নব অনুরাগের ইতিহাসেরই একটি অঙ্গস্বরূপ। এই নব অনুরাগ-সৃষ্টির ইতিহাস সম্বন্ধে দুই-চারটি কথা এখানে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

১৯২৯ অব্দের নভেম্বর মাসে আমি যখন মৈমনসিংহ জেলার কালেক্টর ছিলাম, তখন সেখানে সেই জেলার হিন্দুদের মধ্যে প্রচলিত বাউলসংগীত ও বাউলনৃত্য এবং মুসলমানদের মধ্যে প্রচলিত জারিসংগীত ও জারিনৃত্য ইত্যাদি মূল্যবান গণ-সংস্কৃতির প্ররক্ষণ ও পুনঃপ্রচলনের উদ্দেশ্যে একটি 'গণ-গীতি ও গণ-নৃত্য সমিতি'র প্রতিষ্ঠা করি। ১৯৩০ অব্দে আমি বীরভূম জেলায় বদলি হই; এবং সেখানে রায়বেঁশে নৃত্য, কাঠিনৃত্য ও গীত, ঝুমুর নৃত্য ও গীত প্রভৃতি মূল্যবান পল্লি-সংস্কৃতির এবং তৎসহ পল্লির অন্যান্য গণ-শিল্পের, যথা— প্রাচীর-চিত্রের, এবং কাষ্ঠ-ভাস্কর্যের পুনরাবিষ্কার করি। লোকসমক্ষে সেগুলির মূল্য যথাযথভাবে বুঝাইবার জন্য এবং পল্লি-সংস্কৃতির সম্বন্ধে আরও গভীরভাবে গবেষণা করিবার জন্য আমি ১৯৩১ অব্দের জানুয়ারি মাসে 'বঙ্গীয় পল্লি-সম্পদ-রক্ষা সমিতি'র প্রতিষ্ঠা করি।

এই গবেষণায় প্রবৃত্ত হইয়া ১৯৩১ অব্দে বীরভূমের নানা গ্রামে ঘুরিয়া ঘুরিয়া সেই জেলার পল্লি-সংস্কৃতির অন্যান্য নিদর্শনের সহিত পটুয়া ও পটুয়া-সংগীতের সঙ্গে আমার পরিচয় লাভ হয়। পশ্চিম বাংলার রাঢ়প্রদেশের পটুয়াদের অঙ্কিত রঙিন বহুচিত্র দীর্ঘপটের অস্তিত্ব সম্বন্ধে বর্তমান বাংলার দুই-একজন শিল্পী ও শিল্প রসিক তখনও অবগত ছিলেন বটে, কিন্তু ইহাদের চিত্র শিল্পের প্রকৃত মূল্যের সম্বন্ধে খুব কম লোকেরই তখন ধারণা ছিল; এবং এই চিত্র শিল্পের ব্যাপক প্রসারের সম্বন্ধেও শিক্ষিত-সমাজের অতি অল্পলোকই অবগত ছিলেন। বিশেষ করিয়া এই পটুয়াগণ পট-চিত্র-অঙ্কন ছাড়াও যে কাব্য রচনা করিয়া সেগুলি গাহিয়া চিত্র প্রদর্শন করিয়া থাকে, এবং সেই কাব্যগুলির যে সাহিত্য হিসাবে সবিশেষ মূল্য আছে তৎসম্বন্ধে আমাদের দেশের বর্তমান শিক্ষিত সমাজ তখন সম্পূর্ণ অজ্ঞ ছিলেন বলিলে অত্যুক্তি হইবে না।

১৯৩২ অব্দের মার্চ মাসে কলিকাতায় ইন্ডিয়ান সোসাইটি অব ওরিয়েনটাল আর্ট (Indian Society of Oriental Art)-এর আনুকূল্যে সেই সমিতির ভবনে আমি একটি গণ-শিল্প-প্রদর্শনীর অনুষ্ঠান করি। ভারতের শিল্প-ইতিহাসে ইহাই প্রথম গণ-শিল্প-প্রদর্শনীর বিধিবদ্ধ অনুষ্ঠান। এই প্রদর্শনীতে বাংলার নিজস্ব আলপনা-শিল্প, কাঁথাশিল্প, মৃৎশিল্প ও কাষ্ঠভাস্কর্য-শিল্প প্রভৃতি নানা পল্লি-শিল্পের সঙ্গে যে কেবল পটুয়াদের অঙ্কিত বহুসংখ্যক রঙিন বহুচিত্র দীর্ঘপট প্রদর্শিত

হইয়াছিল, তাহা নহে; পটুয়া-সংগীতও যে একটি শ্রেষ্ঠ ও সরস শিল্প তাহা প্রতিপন্ন ও ঘোষণা করিবার জন্য আমি বীরভূমের তিন-চারি জন পটুয়াকে প্রদর্শনীর উদ্বোধন-উৎসবে উপস্থিত করিয়া তাহাদের দ্বারা তাহাদের অঙ্কিত বহুচিত্র দীর্ঘপট গীতি-কাব্যের সুর সহযোগে গানের সঙ্গে প্রদর্শন করাই। ডক্টর শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *প্রবাসী*-সম্পাদক শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, ডক্টর শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন, ডক্টর শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি মনীষীগণ পটুয়া-চিত্রের এই অপূর্ব প্রদর্শনী-দর্শনে ও পটুয়া সংগীত শ্রবণে মুগ্ধ হইয়া জাতীয় রসশিল্প হিসাবে ইহাদের উচ্চ স্থান পাইবার দাবি স্বীকার করেন।

প্রদর্শনীর পূর্বে গ্রামে গ্রামে ব্যক্তিগতভাবে অনুসন্ধান ও তৎসম্পর্কিত গবেষণার ফলে পশ্চিম বাংলার পটুয়াদের ইতিহাস ও বর্তমান অবস্থা-সম্বন্ধে এবং তাহাদের অঙ্কিত চিত্রশিল্প ও তাহাদের দ্বারা রচিত গীতিকাব্যের শিল্প-হিসাবে মূল্য-সম্বন্ধে আমি যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলাম, তাহা আমি একটি কবিতার আকারে লিপিবদ্ধ করি এবং ইংরাজিতে তাহার পদ্যানুবাদ করি। এই বাংলা ও ইংরাজি উভয় কবিতাই উল্লিখিত লোকশিল্প-প্রদর্শনীর উদ্বোধন-সভায় পঠিত হয়।

পটুয়া-শিল্পের বর্তমান অবস্থা

বাংলার পল্লিচিত্র-শিল্পের মধ্যে গ্রাম্য পটুয়াদের অঙ্কিত বহুচিত্র দীর্ঘপটগুলিই সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট ও উচ্চাঙ্গের রস-শিল্প। বাংলার সামাজিক ও ধর্ম-সম্বন্ধীয় রীতিনীতির পরিবর্তনে এবং বর্তমান শিক্ষার ফলে ইহা এখন বিলুপ্তপ্রায়। কিন্তু এই বিলুপ্তপ্রায় অবস্থাতেও ইহা যে এখনও বাংলার জাতীয় জীবনের একটি শ্রেষ্ঠতম গৌরবময় সম্পদ তাহা নিঃসন্দেহভাবে বলা যাইতে পারে।

বর্তমানকালে বাংলা দেশে কলিকাতার কালীঘাট অঞ্চলের পটুয়াদের অঙ্কিত চিত্রকলা সাধারণের কাছে পরিচিত। কালীঘাটের পটুয়াগণ শহুরে ও বিজাতীয় আবহাওয়ায় পড়িয়া তাহাদের প্রাচীন, বিশুদ্ধ ও সুন্দর পটাঙ্কন-কৌশল প্রায় হারাইয়া ফেলিয়াছে। কিন্তু পশ্চিম-বাংলার সুদূর পল্লিতে-পল্লিতে দীন দরিদ্র গ্রাম্য পটুয়া-শ্রেণির মধ্যে এখনও সেই প্রচীন ধারা ন্যূনাধিকভাবে বর্তমান রহিয়াছে। তাহাদের পূর্বপুরুষদের অঙ্কিত পটের যে কয়েকটি নিদর্শন সংগ্রহ করিবার সৌভাগ্য আমার হইয়াছে, তাহাতে বাংলার এই পল্লিবাসী পটুয়া-শ্রেণির চিত্রশিল্পে অসাধারণ নৈপুণ্য দেখিয়া অবাক হইতে হয়। পঁচিশ-ত্রিশ বৎসর পূর্ব পর্যন্ত ইহারা এইসকল পট বাড়ি বাড়ি দেখাইয়া এবং তৎসঙ্গে রামলীলা-পটের, কৃষ্ণলীলা-পটের, শক্তি-পটের ও যম-পটের কাহিনি স্বরচিত গীতিকবিতায় সহজ ও সরলভাবে বিবৃত করিয়া এবং সুললিত সুরে তাহা গাহিয়া গাহিয়া বিস্তর রোজগার করিয়া বেড়াইত। সম্প্রতি আধুনিক যান্ত্রিক সভ্যতার ও শহুরে শিক্ষার প্রভাব-বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে ইহার চাহিদা এবং গুণগ্রাহিতা বাংলার গ্রাম হইতে বিলুপ্ত হইয়া যাইতেছে, এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে অনুপম শিল্পকলা-নিপুণ এই গ্রাম্য পটুয়াদের অন্ন-সংস্থান হওয়া দায় হইয়া পড়িয়াছে। চাহিদার অভাবে বাধ্য হইয়া ইহাদের মধ্যে বেশির ভাগ লোককেই পট-আঁকা ও পট-দেখানো ব্যবসায় ছাড়িয়া দিয়া জন-মজুরের বৃত্তি গ্রহণ করিতে হইয়াছে। ইহা ছাড়া, হিন্দুধর্মের মূলনীতিগুলিতে অসাধারণ ব্যুৎপন্ন এই সুনিপুণ চিত্রকরগণ এখনও হিন্দুদের পূজার জন্য দেবদেবীর ছবি আঁকা ও মাটির প্রতিমা গড়িবার কাজে ব্যাপৃত থাকা সত্ত্বেও ভারত-ইতিহাসের ও বাংলার ইতিহাসের প্রহেলিকাময় আবর্তনে হিন্দুসমাজের গণ্ডি হইতে বিতাড়িত হইয়া হিন্দু ও মুসলমান

উভয় সম্প্রদায়েরই ঘৃণ্য বলিয়া বিবেচিত হইতেছে; এবং এই দুই ধর্ম-সম্প্রদায়ের গন্ডির বাহিরে অনশনে ও অর্ধাশনে অতি দুর্ভাগ্য দীন জীবন যাপন করিতেছে।

সামাজিক নিদারুণ নিপীড়ন সত্ত্বেও ইহারা পুরুষানুক্রমে যে চিত্রকলা-সম্পদ্ সযত্নে চর্চা ও বহন করিয়া আনিয়া বর্তমান বাংলাকে দান করিয়াছে, তাহা অমূল্য ও অতুলনীয়; এবং জগতের চিত্রশিল্পের আসরে ইহা যে একটি শ্রেষ্ঠ আসন লাভ করিবে তাহা নিঃসন্দেহ। ইহাদের চিত্র-শিল্প-পদ্ধতি প্রাচীন ভারতের প্রাক্-বৌদ্ধযুগের আদিম চিত্রকলা-পদ্ধতির অবিরল প্রবাহিত, অভ্রষ্ট ও অবিচ্ছিন্ন পরম্পরাগত রূপ-ধারা বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। ভারতের অন্যান্য প্রদেশে সেই অতি-প্রাচীন প্রাক্-বৌদ্ধযুগের চিত্রশিল্প তাহার আদিম পদ্ধতির ধারাবাহিকতা অক্ষুণ্ণ রাখিয়া বাঁচিয়া থাকিতে সমর্থ হয় নাই। কিন্তু বাংলার প্রতিভা যে সেই অসাধ্য-সাধনে সফল হইয়াছে, বাংলার দীন-দুঃখী পটুয়াগণের চিত্র-কলা তাহার জীবন্ত প্রমাণ।

ইহাদের বর্তমান অতি শোচনীয়, আর্থিক ও সামাজিক দুর্গতির মধ্যেও ইহারা উৎসাহ ও সুযোগ পাইলে এখনও বাংলার প্রাচীন নিজস্ব জাতীয় ধারা অনুযায়ী রেখা ও বর্ণের অনুপম বলিষ্ঠতা, রসবত্তা ও সৌষ্ঠব-সম্পন্ন চিত্র অঙ্কিত করিতে পারে।

পটুয়ার প্রাচীন ইতিহাস

প্রাগৈতিহাসিক যুগ হইতেই মানুষ চিত্র লিখিয়া* আসিতেছে। ভারতবর্ষেও চিত্র-লিখন ও চিত্র-প্রদর্শন রীতি অতি প্রাচীন। প্রাচীন গ্রন্থসমূহে এই বিষয়ের প্রচুর উল্লেখ আছে।

বাণভট্টের *হর্ষচরিত* সপ্তম শতাব্দীর প্রথমপাদে রচিত হয়। সেখানে যমপট-ব্যবসায়ীর কথা লিখিত হইয়াছে—

> রাজা প্রভাকরবর্ধনের পীড়ার কথা শুনিয়া হর্ষবর্ধন শিকার হইতে ফিরিয়া রাজধানীতে প্রবেশ করিয়াছেন। হর্ষবর্ধন নগরে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন—দোকানের পথে অনেকগুলি কৌতুহলী বালকদ্বারা পরিবৃত একজন যমপট্টিক বা যমপট-ব্যবসায়ী পট দেখাইতেছে। লম্বা লাঠিতে ঝুলানো পট বাঁ হাতে ধরিয়াছে, ডান হাতে একটা শরকাঠি দিয়া চিত্র দেখাইতেছে। ভীষণ মহিষারূঢ় প্রেতনাথ প্রধান মূর্তি। আরো অনেক মূর্তি আছে। যমপট্টিক গাহিতেছে—
>
> মাতাপিতৃসহস্রাণি পুত্রদারশতানি চ।
> যুগে যুগে ব্যতীতানি কস্য তে কস্য বা ভবান্।।...

বিশাখাদত্ত-প্রণীত সুবিখ্যাত মুদ্রারাক্ষস নাটক অষ্টম শতাব্দীতে রচিত বলিয়া পন্ডিতেরা মনে করেন। তাহাতেও যম-পটের উল্লেখ রহিয়াছে; যথা—

> (নানাস্থান হইতে গুপ্ত তথ্য সংগ্রহ করিয়া পাটলীপুত্রে ফিরিয়া চাণক্যের গৃহে প্রবেশ-মুখে)
> চর— পণমহ জমস্স চলনে কিং কজ্জং দেবএহিং অণ্ণেহিং।
> এসোক্খু অণ্ণভত্তাণং হরই জীঅং চড়পড়ন্তং।।
> অপি চ পুরিসস্স জীবিদব্বং বিসমাদো হোই ভত্তিগহিআদো।

* 'চিত্রলেখা' শব্দটি বহু প্রাচীন। প্রাচীন ভারতে 'চিত্র' শব্দে অঙ্কিত ছবি ও ক্ষোদিত বা উৎকীর্ণ ভাস্কর্য-শিল্প উভয়ই বুঝাইত। তখন তুলি দিয়া অঙ্কিত ছবিকে 'লেপ্য' চিত্র ও উৎকীর্ণ চিত্র হইতে বিশ্লিষ্ট করিবার জন্য 'লেখ্য' চিত্র, এবং ছবি অঙ্কন করাকে 'চিত্রলেখন' বলা হইত। বর্তমানে পটুয়াগণ 'চিত্রলেখা' কথাটির উপরিউক্ত ব্যুৎপত্তি-সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ থাকা সত্ত্বেও 'পট আঁকা' না বলিয়া 'পটলেখা' বলিয়া থাকে। এই 'লেখা' কথাটি হইতেই তাহাদের সঙ্গে প্রাচীন চিত্রলেখকদের সংযোগ সহজেই অনুমান করা যায়। আমরা বর্তমান প্রসঙ্গে তাই চিত্রাঙ্কন না বলিয়া 'চিত্রলিখন' ব্যবহার করিয়াছি।

মাবেই সব্বলোঅং জো তেণ জমেন জীআমো।।

জাব, এদং গেহং পবিসিঅ জমপডং দংসঅন্তো পবিসিঅ গীআইং গাআমি।

এতদ্ভিন্ন কালিদাসের (পঞ্চম শতাব্দী?) *অভিজ্ঞান-শকুন্তলা* এবং *মালবিকাগ্নিমিত্র* নাটকদ্বয়ে, ভবভূতির (অষ্টম শতাব্দী) *উত্তররামচরিত* নাটকে চিত্র-লিখন ও চিত্র-দর্শনের বিশেষরূপ উল্লেখ আছে। মধ্যযুগে পরাশরস্মৃতি, রূপগোস্বামীর *বিদগ্ধ-মাধব* নাটক এবং গোপালভট্টের হরিভক্তি-*বিলাস* গ্রন্থ হইতেও প্রাচীন সমাজে চিত্রানুরাগের পরিচয় পাওয়া যায়।

হর্ষচরিত ও *মুদ্রারাক্ষস*-এ যে যমপট্টিক অর্থাৎ যমপট-ব্যবসায়ীর উল্লেখ আছে, তাঁহারা সুদীর্ঘ পটের উপর ধর্মরাজ যমের মূর্তি এবং যমালয়ের নানা ভয়ঙ্কর দৃশ্য লিখিয়া গীতি-সহযোগে গৃহস্থ-বাড়িতে সেই পট দেখাইতেন। যমালয়ে পাপী যে নিদারুণ শাস্তি ভোগ করে, চক্ষের সম্মুখে তাহা প্রত্যক্ষ করিয়া মানুষকে পাপ ও অন্যায় হইতে বিরত করিবার উদ্দেশ্যে এই পটগুলি গীতি-সহযোগে প্রদর্শিত হইত। বাংলার পটুয়ারা অদ্যাপি এইরূপ যমপট দেখাইয়া থাকে। এমনকি তাহাদের দেখাইবার প্রণালীও হর্ষচরিতে উল্লিখিত প্রণালীর অনুরূপ।

অতএব সন্দেহ নাই, এই চিত্রকর জাতি সুপ্রাচীন। প্রাচীন কাল হইতে ইহারা চিত্র লিখিয়া লোকের মনোরঞ্জন এবং তাহাদের মনে ধর্মভাব উদ্দীপিত করিয়া আসিতেছে।

ছবিলাল চিত্রকরের বাস বীরভূমের পানুড়িয়া গ্রামে। তখন তাহার বয়স ষাট বৎসর। তাহাকে প্রশ্ন করা হইল, কী করিয়া তাহাদের জাতির উৎপত্তি হইয়াছে। পটুয়াজাতির উৎপত্তি সম্পর্কে যে কিংবদন্তি পুরুষপরম্পরাক্রমে চলিয়া আসিতেছে, নিরক্ষর বৃদ্ধ পটুয়া তাহা বলিতে লাগিল। তাহারই ভাষায় উহা অবিকল লিপিবদ্ধ করিয়া লওয়া হইয়াছে—

আমরা বিশ্বকর্মার পুত্র বটি, আমরা বাঙ্গালীর ছেলে; কর্মদোষে ছোট হয়ে পড়েছি।

আমাদের একটি পূর্বপুরুষ মহাদেবের বিনা হুকুমে তাঁর ছবি এঁকে ফেলেছিল, তাতে তাঁর ভয় হ'ল যে মহাদেব হয়ত রাগ করবেন। তখন মহাদেব সে দিকে আসছিলেন। পাছে মহাদেব জানতে পারেন যে সেই ছবি সে-ই এঁকেছে, সে জন্যে সে তাড়াতাড়ি ছবি আঁকার তুলিটি মুখের ভিতর পুরে লুকিয়ে দেয়। তাতে তুলিটি সকড়ি হ'য়ে গেল।

তখন মহাদেব বললেন, তুলিটি সকড়ি কেন করলে?

সে বললে, ভয়ে।

মহাদেব বললেন, সে তুলিটা দূরে ফেলে না দিয়ে মুখে দিয়ে সকড়ি করে অন্যায় করেছে। তাই তিনি রাগ করে বললেন, তোরা এর জন্যে পতিত হলি। যা, তোরা ছোট হয়ে সমাজে থাক গে।

তারপর সব জ্ঞাতিরা কাঁদতে কাঁদতে এসে মহাদেবকে বললে— আমরা খাব কি করে? তখন মহাদেব বললেন— তোরা হিন্দুও হবি না, মুসলমানও হবি না। তোরা মুসলমানের রীত কর্‌বি আর হিন্দুর কর্ম কর্‌বি অর্থাৎ ছবি আঁকবি ও পড়বি।

সেই থেকে আমরা মুসলমানদের মত নামাজ করি আর হিন্দুর মত দেব-দেবতার ছবি আঁকি ও সেই সব গান করি। আর আমাদের নামগুলি সব হিন্দুর মত— যেমন ভক্তি, হরেন্দ্র, নোঙ্গর, পঞ্চানন, সতীশচন্দ্র, গরীব, সমস্ত।

ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণের (একাদশ বা দ্বাদশ শতাব্দী) দশম অধ্যায়ে চিত্রকর জাতির উৎপত্তির একটি কাহিনি পাওয়া যায়। তাহার সহিত পূর্বোক্ত অশিক্ষিত পটুয়া-কথিত কিংবদন্তির অনেক মিল

আছে। ব্রাহ্মণবেশী ভগবান্ বিশ্বকর্মার ঔরসে গোপকন্যাবেশী অপ্সরা ঘৃতাচীর গর্ভে চিত্রকর জাতির আদিপুরুষ জন্ম লাভ করেন। বিশ্বকর্মা ও ঘৃতাচীর পুত্র জন্মিয়াছিল নয় জন :— তাঁহাদের নাম মালাকার (মালাকর), কর্মকার, শঙ্খকার, কুন্দিবক (তন্তুবায়), কুম্ভকার, কাংস্যকার, সূত্রধর, চিত্রকার (চিত্রকর), ও স্বর্ণকার। এই হিসাবে পটুয়ারা হিন্দুসমাজের অপর শিল্পী-শ্রেণির সগোত্র, তাহাদেরই মতো সম্মানার্হ।

চিত্রকরেরা কী কারণে এই সম্মান হারাইয়া সমাজে হীন বলিয়া পরিগণিত হইল, ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে তাহারও উল্লেখ আছে। ইহারা ব্রাহ্মণ-নির্দিষ্ট চিত্র-পদ্ধতির ব্যতিক্রম করিয়াছিল, তাই ব্রাহ্মণগণ ক্রুদ্ধ হইয়া অভিশাপ দিয়াছিলেন; তখন হইতে ইহারা সমাজে পতিত হইল। কিংবদন্তিতেও অভিশাপের কাহিনি পাইতেছি। মহাদেবই হউন, আর ব্রাহ্মণই হউন— পুরাণ ও লোক-প্রবাদ উভয়ই স্বীকার করিতেছে, চিত্রলিখন কর্মে তাহারা শাস্ত্রীয় রীতির বিরুদ্ধ পথ অবলম্বন করিয়াছিল বলিয়া সমাজ হইতে বিতাড়িত হইয়াছিল। পরশুরামের নিম্নোদ্ধৃত শ্লোকটিও এই অনুমানের পোষকতা করিতেছে বলিয়া বোধ হয়—

ব্যতিক্রমেণ চিত্রাণাং সদ্যশ্চিত্রকঁরস্তথা।
পতিতো ব্রহ্মশাপেন ব্রাহ্মণানাঞ্চ কোপতঃ।।

[চিত্রকর চিত্রসকলের ব্যতিক্রম করায় ব্রাহ্মণগণ-দ্বারা ক্রোধে শাপগ্রস্ত হইয়া সদ্য পতিত হইয়াছে।]

পটুয়ার জাতিভ্রষ্টতা-সম্পর্কে একটি অনুমান

বাংলার গণজাতির হিন্দুধর্মের রূপ চিরকালই শাস্ত্রীয় ব্রহ্মণ্যধর্মের রূপ হইতে পৃথক হইয়া আসিয়াছে। বাঙালির স্বভাবত অদম্য স্বাধীন আত্মা ধর্মাচরণ-ক্ষেত্রে ও দেবমূর্তি-পরিকল্পনায় শাস্ত্রীয় বিধিবিধানের খুঁটিনাটি দাসের মতো মানিয়া লইতে পারে নাই; পরন্তু তাহার আত্মার নিজস্ব ভাব ও রসপ্রেরণা-প্রসূত রূপে সে দেবদেবীর কল্পনা করিয়াছে। তাই বাংলার গণজাতীয় রাধাকৃষ্ণ-রূপকল্পনা পুরাণের পরিকল্পনা হইতে পৃথক। তাহার রাম-লক্ষ্মণ-সীতার পরিকল্পনা বাল্মীকি বা কৃত্তিবাসের *রামায়ণ*-এর পরিকল্পনা হইতে পৃথক, এবং তাহার শিবদুর্গার পরিকল্পনা শাস্ত্রীয় ও পৌরাণিক শিবদুর্গার পরিকল্পনা হইতে পৃথক।

গণজাতির প্রয়োজনের আহ্বানে ও স্বকীয় আত্মার অনুপ্রেরণার ফলে বাংলার জাতীয় শিল্পী পটুয়াগণ তাহাদের গীতিকায়, চিত্রে ও মৃন্ময়ী প্রতিমা-পরিকল্পনার ক্ষেত্রে শাস্ত্রীয় বিধিবিধানের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়া বাংলার নিজস্ব ভাব ও রসের ব্যঞ্জনাময় রূপ-কল্পনা করিতে সাহস প্রদর্শন করিয়া ব্রাহ্মণসমাজের ভ্রূকুটি উপেক্ষা করিয়াছিল বলিয়াই যে তাহারা সমাজ হইতে ব্রাহ্মণগণ কর্তৃক পাতিত হইয়াছিল এইরূপ মনে হয়। কিন্তু ব্রাহ্মণগণ কর্তৃক ও সমাজ কর্তৃক নির্যাতিত হইয়াও এই-জাতীয় ভক্ত সাধক শিল্পীগণ জাতীয় ভাবধারা ও রূপধারাকে যে বর্জন করে নাই, ইহা বাংলার গণজাতীয় আত্মার দুর্দমনীয় স্বাধীনতা-প্রিয়তারই প্রকৃষ্ট পরিচয়।

বাংলার জীবন ও সাহিত্যে পটগীতির স্থান

বাংলার জীবনে ও বাংলা সাহিত্যে পটগীতির একটি বিশিষ্ট স্থান আছে। বাংলার অধ্যাত্মজীবনে সর্বাপেক্ষা গভীর স্তরের ভাবধারা ও রসধারা এই পট-গীতিতে রূপায়ন লাভ করিয়াছে— সহজ অনাড়ম্বর ভাষায় ও ছন্দে। ইহা কোনো অভিজাত-সমাজের ভাববিলাসব্যঞ্জক সাহিত্য নয়— জাতির

সাধারণ জনগণের প্রাণ যে অনাবিল ও বিলাস-কলুষহীন ভাবধারার ও কল্পনাধারার জীবন্ত প্রবাহে ভরপুর ছিল তাহার এবং বাঙালি হিন্দুর গভীর অন্তশ্চরিত্রের ও ধর্মবিশ্বাসের রসপূর্ণ অথচ সহজ স্বাভাবিক ও সরলতামাখা রূপায়ন।

বৌদ্ধ-পরবর্তী যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া উনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত বাংলার আত্ম-সংস্কৃতির ও সভ্যতার মূল-উৎসের সন্ধান এই পটগীতি বা পটুয়া সংগীতগুলিতে যেরূপ সহজ, সরল, সুস্পষ্ট ও অনাড়ম্বরভাবে পাওয়া যায়, সেরূপ আর কোথাও পাওয়া যায় কি না সন্দেহ।

পটুয়া, পটচিত্র ও পটগীতির অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ

অদ্যাবধি আমাদের দেশের শিল্পী ও কলারসিকগণ পটুয়াদিগের অঙ্কিত চিত্রের কেবলমাত্র চিত্র-হিসাবে মূল্য নির্দেশ করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। কিন্তু এইরূপ প্রয়াস যে ভ্রমাত্মক তাহা এই চিত্র শিল্পের প্রকৃতির সম্বন্ধে সম্যক অনুধাবন করিলেই প্রতিপন্ন হইবে।

আজকাল শিল্পী বলিতে আমরা যাহা বুঝি, পশ্চিম-বাংলার পটুয়াগণ সেই শ্রেণির শিল্পী নহে। ইহারা স্বকপোলকল্পিত অথবা আত্ম-খেয়ালপ্রসূত কোনো বিষয়ের চিত্র লিখনের চেষ্টা করে নাই। জাতির গভীর অধ্যাত্ম-জীবনে যে ভাব-নদীর ধারা অবিরত প্রবাহিত হইত, ইহারা সেই ভাব ধারায় আপন আত্মাকে ওতপ্রোতভাবে পরিপ্লুত করিয়া একান্তভাবে তাহারই ভক্তসাধক হইয়া সেই ভাবধারা-সঞ্জাত রসাবলির সহজ রূপ সৃষ্টি করিয়াছে— চিত্রে, কাব্যে ও সুরে। সুতরাং একাধারে ইহারা ভক্ত-সাধক, কবি, গায়ক ও চিত্রশিল্পী— অর্থাৎ একদেশদর্শী শিল্পী নহে; আত্মার সুগভীর ভাবরসের ও ভক্তির, চিত্র-শিল্পের, কাব্যের ও সুরের স্রষ্টা ও সাধকরূপ পূর্ণাঙ্গ শিল্পী। জাতির অন্তরাত্মার গভীর ভাবরসের ও ভক্তির সরল ও একান্ত সাধনা ব্যতীত ইহারা এই পূর্ণাঙ্গ শিল্প রচনা করিতে কদাপি সমর্থ হইত না।

ইহাদের রচিত গীতিকাব্যগুলি বাংলার হিন্দুজাতির গণ-সমাজের অধ্যাত্ম-জীবনের ধ্যানমন্ত্র-স্বরূপ। এই ধ্যানমন্ত্রগুলি সম্পূর্ণ আয়ত্ত করিয়া পটুয়াগণ তাহাদের সাহায্যে আপন আপন মনোমধ্যে সহজ ও স্বতঃস্ফূর্তভাবে রূপ কল্পনা করিয়া তুলিত; এবং সেই রূপ-পরিকল্পনা আপনা হইতেই তুলিকার টানে ও রং-এর বিন্যাসে পটভূমিতে বিনা আয়াসে প্রতিফলিত হইয়া উঠিত। সুতরাং ইহাদের চিত্র-লিখনের প্রণালী ও উৎস বর্তমান শিল্পীদের ধ্যানহীন আয়াস-সাধিত শিল্পসৃষ্টির প্রণালী হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্নই ছিল। তাই যদিও আজকাল অনেক শিল্পী পটচিত্রের অনুকরণে চিত্র লিখনের চেষ্টা করেন, তথাপি সেগুলি প্রাণহীন বাহ্য রেখা ও রং-এর বিন্যাসেই পর্যবসিত হয়,— ধ্যানলব্ধ রূপ-কল্পনা প্রতিফলনের সজীবতা, সরসতা ও শিষ্টতা লাভ করিতে সফল হয় না; জাতির আত্মার গভীরতম ভাবরসের জীবন্ত রূপায়ন দান করিতে পারে না।

পটগীতি ও পটচিত্রের জাতীয় স্ব-ভাব ও স্ব-ধারাগত রূপ

আয়াসলব্ধ ও অনুকরণগত নয় বলিয়া বাংলার এই ভক্তসাধক শিল্পীদের গীতিকাব্যের ভাব ও ভাষা এবং পটচিত্রের ধারা বাঙালি জাতির আত্মার স্ব-ভাব ও স্ব-ধারায় গঠিত এবং একান্তভাবে বিজাতীয়তা-দোষবর্জিত। বস্তুত জাতির আত্ম-সংস্কৃতির দিক দিয়া বিচার করিতে গেলে এই পটগীতি ও পটচিত্রগুলি সম্যগভাবে বাংলার স্বাধীন শিল্প ও বাংলার আত্মার চিরন্তন স্বাধীনতা-পরায়ণতার প্রকৃষ্ট ও স্বতঃস্ফূর্ত নিদর্শন।

বাঙালির জীবনকে আবার সংস্কৃতির ক্ষেত্রে স্বাধীনতা অর্জন করিতে হইলে বাংলার মানুষকে ও শিল্পীদিগকে এই জাতির স্ব-ভাব, স্ব-ছন্দ ও স্ব-ধারার সাধনা করিতে হইবে। এই দিক দিয়া দেখিতে গেলে জাতির ভবিষ্যৎ শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে পটগীতি ও পটচিত্রের মূল্য অসীম ও অতুলনীয়।

পটচিত্র ও পটগীতির পরস্পর সহযোগিতা

পটচিত্রগুলি পটগীতির হুবহু প্রতিকৃতি-মূলকভাবে রচিত হয় নাই; আবার পটগীতিগুলিও পটচিত্রের হুবহু বর্ণনাত্মক নহে। বস্তুত ইহারা একে অন্যের পরিপোষক। চিত্রে যাহা রূপায়িত হইয়াছে, শিল্পীগণ গীতিকায় তাহার বর্ণনা না করিয়া তাহার অন্তর্নিহিত ভাব ও রসের অভিব্যঞ্জনা করিয়াছে এবং এক চিত্র হইতে অপর চিত্রের বিষয়বস্তুতে উপনীত হইবার পথে মধ্যবর্তী ভাব ও ঘটনার রসাত্মক বর্ণনা করিয়াছে। গীতিকায় যাহা উহ্য, তাহার অভিব্যঞ্জনা দেওয়া হইয়াছে চিত্রে; আবার চিত্রে যাহা উহ্য, তাহার অভিব্যঞ্জনা দেওয়া হইয়াছে গীতিকায়।

জাতির গণ-সমাজের সাধারণ ভাষাকে পটুয়া-শিল্পীগণ আড়ম্বরহীনভাবে কাব্যে রূপ দিয়াছে। কোনো কষ্টকল্পিত বা আয়াসসাধ্য অলংকারের বালাই ইহাতে নাই, অথচ অন্তরের ভাবের প্রাচুর্যের ও ভক্তির একনিষ্ঠ প্রবাহের ফলে এই গীতিকাগুলি সহজ স্বতঃস্ফূর্ত রসসম্পদে ভরপুর। এই সকল গুণাবলির বিদ্যমানতার ফলে বাংলার গণ-সাহিত্যে পটুয়া গীতি গৌরবময় স্থান লাভ করিবে।

বাঙালির জীবনের নিখুঁত রূপ

কী কৃষ্ণলীলা কাব্যে, কী রামলীলা কাব্যে, কী শিবের শঙ্খপরানো কাব্যে, কী শিবের মাছধরা কাব্যে, কী গো-পালন কাব্যে বাংলার স্ত্রী-পুরুষের ও বাংলার জীবনের এক-একটি নিখুঁত প্রতিকৃতি রচিত হইয়াছে। শিল্পীর জাতীয় ভাব তাহাকে সংস্কৃত *রামায়ণ, মহাভারত* ও *পুরাণ* ইত্যাদির কেবলমাত্র অনুকরণে বিরত করিয়াছে। শিল্পী জাতির মজ্জাগত আদর্শগুলিকে আপন জাতীয় স্ব-ভাবের ও স্ব-রূপের ছাপ দিয়া সম্পূর্ণ নব সৃষ্টিময় শিল্প রচনা করিয়াছে। ধর্ম, দর্শন ও পুরাণের মূল তত্ত্বগুলি যে বাঙালি হিন্দুসমাজের গণ-জীবনে অতি সহজভাবে অনুসঞ্চারিত হইয়া দৈনন্দিন ভাব ও চিন্তাধারার অঙ্গীভূত হইয়াছিল, তাহার একটি বিশেষ পরিচয় আমরা এই পটুয়া সংগীতের মধ্যে পাই। তথাকথিত অশিক্ষিত পটুয়া-রচিত সংগীতগুলিতে দার্শনিক ও পৌরাণিক তত্ত্বগুলি অবলীলাক্রমে মিশিয়া গিয়াছে। বৈষ্ণব কবিতার ও পদাবলির সঙ্গে কোথাও কোথাও সামঞ্জস্য থাকিলেও বৈষ্ণব কবিতায় ও পদাবলিতে যে আড়ম্বরপূর্ণ ভাব-বিলাসিতার উদাহরণ পাওয়া যায়, পটুয়া-গীতিতে তাহার সম্পূর্ণ অভাব লক্ষিত হইবে। পটুয়া-শিল্পীর বৃন্দাবন বাংলাদেশে, অযোধ্যা বাংলা দেশে, শিবের কৈলাস বাংলা দেশে, তাহার কৃষ্ণ, রাধা, গোপগোপীগণ সম্পূর্ণ বাঙালি। রাম, লক্ষ্মণ ও সীতা বাঙালি, শিব ও পার্বতীও পুরা বাঙালি। বড়াই বুড়ির ছবি বাঙালি ঠাকুরমা ও দিদিমার নিখুঁত রসময় প্রতিমূর্তি। রামের বিবাহ হইয়াছে ছাতনাতলায়। পার্বতীর কাছে সব অলংকার হইতে শাঁখার মর্যাদা ও আদর বেশি।

এইজাতীয় শিল্পীগণের ধ্যানে দেবতাগণও বাঙালি রূপ ছাড়া অন্য রূপ ধরিয়া থাকিতে সমর্থ হন নাই। বাঙালির সাধারণ জীবনকে দেবভাবে পরিকল্পিত করিয়া ইহারা জাতির আত্মাকে পরম গৌরব দান করিয়াছে। তাই বাংলার ঘরে ঘরে ও দ্বারে দ্বারে সাধারণ নরনারীর ও বালক-বালিকার

কাছে বৎসরের পর বৎসর প্রদর্শিত এই চিত্রসম্পদ ও বৎসরের পর বৎসর গীত এই গীতিকা-সম্পদ বাংলার গণ-শিক্ষার ও গণ-সংস্কৃতির এক অমূল্য ও অতুলনীয় প্রণালীস্বরূপ হইয়া উঠিয়াছিল এবং বাংলার আবালবৃদ্ধবনিতার জীবনকে এক অদ্ভুত আনন্দ রসময় জগতের সন্ধান দিতে সমর্থ হইয়াছিল।

বাংলার লোক বর্তমান যান্ত্রিক সভ্যতার দাসত্ব হইতে আপন আত্মাকে মুক্ত করিয়া যে-কোনো অধ্যাত্ম আদর্শই গ্রহণ করুক না কেন, জাতির গণ-সমাজের কোটি কোটি নরনারীর জীবনকে প্রকৃত শিক্ষা ও প্রকৃত সংস্কৃতিতে পূর্ণ করিতে হইলে বাংলার পটুয়া-শিল্পীর অতুলনীয় শিল্প-প্রণালীরই অনুরূপ প্রণালী অবলম্বন করিতে হইবে।

পটুয়াদের অঙ্কিত চিত্রশিল্পের মূল্য

দেশ-বিদেশের অন্যান্য বিখ্যাত অতিমার্জিত চিত্রপদ্ধতির ন্যায় বাংলার এই নিজস্ব চিত্রপদ্ধতি বিশ্বমানবের আদিম যুগের সরল ভাব, পৌরুষের ভাব, অকৃত্রিমতার ভাব এবং সজীবতা, সরসতা ও তেজস্বিতার ভাব হারায় নাই। এক দিকে যেমন এই সকল গুণ ইহাতে সম্পূর্ণরূপে বিদ্যমান রহিয়াছে, তেমনই আবার এই মুক্ত ভাবের সঙ্গে সঙ্গে ইহা অন্যান্য আধুনিক মার্জিত চিত্রকলা-পদ্ধতির সমতুল অথবা তদধিকভাবে লাবণ্য ও লালিত্য যোজনা করিতে সমর্থ হইয়াছে। ইহাতে অতি-বিলাসিতার, অতি-আলংকারিকতার ও অতি-সাম্প্রদায়িকতার মুদ্রা-দোষের অথবা কোনোরূপ আড়ষ্টতা-দোষের ছাপ পড়ে নাই। এই চিত্রকলার ভাষার অক্ষর-প্রকরণ অতি স্বল্প ও সহজ। ইহা কেবল রেখার সতেজ, সুনিপুণ, প্রখর ও ভাবব্যঞ্জক প্রয়োগ এবং অল্প কয়েকটি প্রাথমিক বর্ণের অমিশ্র ব্যবহারের উপর নির্ভর করে। ইহার ভাষার ব্যাকরণ অতি সহজ ও অতি প্রাঞ্জল। পরিপ্রেক্ষিতের মাপকাঠির খুঁটিনাটি ও আলোছায়ার লীলাখেলার চতুরতা ও বাহুল্য মিশাইয়া ইহা কখনও আপনার ব্যাকরণকে অযথা জটিল করিয়া তুলিবার প্রয়াস করে নাই। ইহার আকারবিন্যাস এবং বর্ণসমাবেশ ও সমন্বয় অতিশোভন ও অনিন্দ্যসুন্দর। আলংকারিকতার চূড়ান্ত কৌশলও যে এই চিত্রকরগণ প্রদর্শন করিতে পারে, তাহারও শ্রেষ্ঠ প্রমাণ এই সকল প্রাচীন পট হইতে পাওয়া যায়। কিন্তু বাংলার এই প্রাচীন চিত্রকলায় কেবলমাত্র ইন্দ্রিয়তৃপ্তির উদ্দেশ্যে রূপকল্পনার বিলাসিতার অযথা বাড়াবাড়ি নাই, অথচ ইহা রসপ্রাচুর্যে ভরপুর। ইহাতে অঙ্কিত মনুষ্যগণের আকৃতি ও হাবভাব সম্পূর্ণভাবে কৃত্রিমতা ও মুদ্রাদোষবিহীন এবং সাধারণ মানুষের সহজ ও জীবন্ত ভাবে পরিপূর্ণ। এক দিকে বাংলার এই পল্লিশিল্পীদের জীবজন্তু-অঙ্কনের ক্ষমতা যেমন অসাধারণ নৈপুণ্যের পরিচায়ক, তেমনই অপর দিকে মানুষের অন্তরতম মনোভাবের অবিকল ব্যঞ্জনা তুলির অবলীলাময় টানে ফুটাইয়া তুলিতেও ইহাদের ক্ষমতা অদ্বিতীয়। বৃক্ষলতাদির পত্রের অঙ্কনের অতি চমৎকার ও মনোহর আলংকারিক রীতিও এই চিত্রপটগুলির ও এই চিত্রকরদের একটি অন্যতম বিশেষত্ব। এইসকল চিত্রপটে এক দিকে পুরুষদেহের বীরোচিত অঙ্গপ্রত্যঙ্গের ও ভাবভঙ্গির অঙ্কনপ্রণালী ও অপর দিকে নারীদেহের লীলায়িত রূপলাবণ্য-মাধুরীর বিচিত্র অঙ্কন-কৌশলের স্বভাবজাত সমাবেশ দেখিয়া অবাক হইতে হয়। অনুকরণ-মূলক অঙ্কন-বাহুল্য বর্জন করিয়া ইঙ্গিতে ভাবের ও রসের পরিপূর্ণ ব্যঞ্জনাশক্তি এই সকল চিত্রপটের একটি বিশিষ্ট লক্ষণ। ইহার একটি চিত্রেও কোনোরকম ভাবের অপরিস্ফুটতা অথবা ধোঁয়াটে ধরণ নাই। চিত্রে অতি-পরিস্ফুটভাবে কাহিনি বিবৃত করিবার অসাধারণ ক্ষমতা এই চিত্রকলাপদ্ধতি ভারতের আদিমযুগ

হইতে পূর্ণভাবে বজায় রাখিয়া আসিতে সমর্থ হইয়াছে। রামপটে অঙ্কিত কর্মযোগমূলক পৌরুষ-কাহিনির ইতিহাস ও প্রাচীনভারতের পারিবারিক জীবন প্রণালী, শক্তিপটে অঙ্কিত গভীর আধ্যাত্মিক জ্ঞানমূলক দার্শনিক সত্য, এবং কৃষ্ণপটের আধ্যাত্মিক প্রেমমূলক ভাবতরঙ্গ— বাংলার এইসকল প্রাচীন শিল্পীগণ অতি সরল ও সহজভাবে সাধারণের বোধগম্য করিয়া চিত্রপটে অঙ্কিত করিয়াছে এবং উহাদিগকে অসাধারণ ভাবব্যঞ্জক অনিন্দ্যসুন্দর রূপ প্রদান করিয়া তাহাদের অদ্ভুত প্রতিভার পরিচয় প্রদান করিয়াছে। সর্বোপরি বাংলার পল্লিগ্রামের সরল প্রকৃতির স্ত্রী-পুরুষগণের চরিত্রের একটি অনির্বচনীয় ও অতুলনীয় নিজস্ব মাধুর্যরসে এইসকল চিত্রপটের রেখা, বর্ণ ও রূপকল্পনা ওতপ্রোতভাবে পরিপ্লাবিত।

বাংলার এই প্রাচীন চিত্র শিল্পীগণ রস শিল্পের সঙ্গে ধর্মের যে ঘনিষ্ঠ ও অটুট সম্বন্ধ তাহা কখনও ভুলিয়া যায় নাই; এবং উহা মানুষের মনে অবিরত জাগাইয়া দিবার জন্য প্রত্যেক চিত্রপটের শেষভাগে যমরাজার সভায় চিত্রগুপ্তের অভ্রান্ত খাতার চিত্র ফুটাইয়া তুলিয়া এবং যমরাজার অনুশাসনে ধর্মের অন্তিম জয় ও অধর্মের অন্তিম পরাজয়ের কাহিনি অতি জ্বলন্তভাবে বিবৃত করিয়া সমাজে ধর্মভাবের প্রচলন বজায় রাখিবার অমূল্য সহায়তা করিয়াছে।

পটগীতির শ্রেণিবিভাগ ও প্রকৃতি

পটগীতিগুলি সাধারণত তিন শ্রেণিতে বিভক্ত করা যায়; যথা— ১. লীলা-কাহিনি— কৃষ্ণ-লীলা, রাম-লীলা, গৌরাঙ্গ-লীলা, শিবপার্বতী-লীলা। ২. পাঁচ-কল্যাণী— এগুলি বিশেষ কোনো লীলা-কাহিনি বা আখ্যায়িকা অবলম্বনে রচিত নয়। নানা দেবদেবী-সম্বন্ধে ছড়ার পাঁচমিশালি সমাবেশ। ৩. গোপালন-বিষয়ক গীতিকা। কৃষ্ণ-লীলা, রাম-লীলা ও গৌরাঙ্গ-লীলা গীতিকার রচনাপ্রণালির একটি বৈশিষ্ট্য আছে। পটুয়াগণ সমস্ত আখ্যায়িকার বিবরণ দিবার চেষ্টা করে নাই, আখ্যায়িকার যে ঘটনাগুলিতে বিশেষ করিয়া গভীর ভক্তিরস, প্রেমরস, বাৎসল্যরস অথবা দাম্পত্যরসের সমাবেশ আছে, সেইগুলিকে তাহারা বাছিয়া লইয়া ওই রসগুলি নিবিড়ভাবে কাব্যে প্রকাশ করিবার চেষ্টা করিয়াছে। জাতীয় সংস্কৃতির অংশরূপে কাহিনিগুলি মোটামুটিভাবে জাতির সমগ্র জনগণের মনোরাজ্যের সাধারণ পটভূমিতে যে বিদ্যমান রহিয়াছে, ইহা তাহারা ধরিয়া লইয়াছে। তাই কাহিনির অন্তর্ভুক্ত কেবলমাত্র গভীর রসপূর্ণ ঘটনাগুলিকে আরও উজ্জ্বল করিয়া তুলিবার জন্য তাহাদের অঙ্কিত চিত্রের এবং তাহাদের রচিত কাব্যের ও গীতের দ্বারা এইগুলির উপরই বিশেষ করিয়া উজ্জ্বল ও রঙিন আলোকসম্পাত করিয়াছে; এবং এই ঘটনাগুলির অনুভূতিকে জাতির জনগণের মনোজগতে বৎসরের পর বৎসর নূতন করিয়া জাগাইয়া তুলিয়া জাতির সাধারণ জনগণের জীবনকে অনুপ্রাণিত এবং একটি সম-সংস্কৃতির ঐক্যসূত্রে যুক্ত করিয়া রাখিবার অমূল্য সহায়তা করিয়াছে।

শিব-পার্বতীর লীলাকে বাংলার চিত্রকরগণ বাংলার পারিবারিক ও দাম্পত্যজীবনের অনুরূপ করিয়া রচনা করিয়াছে। শিবকে তাহারা চিত্রিত করিয়াছে বাংলার গৃহস্বামীরূপে, এবং পার্বতীকে চিত্রিত করিয়াছে বাংলার সাধারণ গৃহিণীরূপে। শিব ও দুর্গাকে তাহারা শাস্ত্রীয় রূপ দিয়া জাতির সাধারণ জীবন হইতে বিচ্ছিন্ন অতিদূরের জিনিস করিয়া দেখে নাই, অথবা অভিজাত-সমাজের গৃহস্থ ও গৃহিণীর বিলাসী রূপ দেয় নাই। দুর্গাকে বাগদিনীর রূপে চিত্রিত করিতে তাহারা সাহস করিয়াছে। তাহাদের স্বভাবজাত অসাধারণ কবিত্ব-প্রতিভার ফলে তাহারা দেখাইতে পারিয়াছে যে, বাগদির মেয়ে সমাজের চক্ষে ঘৃণ্য ও অস্পৃশ্য হইলেও বাস্তবিকপক্ষে ভগবতীরই অংশ; এবং

প্রকৃত কবির ও স্পষ্টদর্শীর চক্ষে সকল সম্প্রদায়ের নারীর মধ্যেই ভগবতীর রূপ সমানভাবে বিরাজিত। বাংলার সাধারণ মানুষের জীবনের মর্যাদার অতুলনীয় চিত্রণ এই সংগীতগুলির একটি বৈশিষ্ট্য। শিবদুর্গার লীলাচিত্রের বর্ণনার ছলে বাংলার সাধারণ গৃহস্থদম্পতির জীবনের নিবিড় কৌতুক-রসাত্মক দিকটা পটুয়াগণ তাহাদের সহজ কবিত্বশক্তির মধ্য দিয়া অতি সুন্দর অথচ সহজ বর্ণনা করিয়াছে। বাংলার কৌতুক রসসাহিত্যে ইহা উচ্চ স্থান লাভের যোগ্য। 'চাষ-পালা' গীতিকার মধ্যে মহাশক্তির পরিচালনায় লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের বীজের সাহায্যে ভীমের প্রয়োগে পৃথিবীর সৃষ্টি একটি অনুপম সৌন্দর্যময় পরিকল্পনা। 'গো-পালন' গীতিগুলিতে কপিলার মর্ত্যে অবতীর্ণ হইতে প্রথমে অনিচ্ছা-প্রকাশ এবং পরে মনুষ্যজাতির সেবার জন্য দেবগণের সনির্বন্ধ মিনতিতে স্বীকৃত হইবার করুণ কাহিনি পড়িয়া পাষাণ-হৃদয়ও বিগলিত হইবে; এবং গো-জাতির প্রতি হিন্দুর ভক্তির মূল উৎস যে কোথায় তাহার সহজ ও সরল নির্দেশ পাওয়া যাইবে। আজকালকার নব সভ্যতার ফলে গোজাতির প্রতি বাংলার শিক্ষিতা নারীদের অবজ্ঞা ও নির্দয়তাপূর্ণ ব্যবহারের যে নির্মম চিত্র পটুয়াগণ অঙ্কিত করিয়াছে, এবং তাহার কঠোর শাস্তির যে কবিত্বময় নির্দেশ করিয়াছে তাহা হইতে পরিচয় পাওয়া যাইবে যে, এই পটুয়াগণ কেবলমাত্র ভক্ত, সাধক বা ভাবুক কবি নহে, পরন্তু নির্ভীক ও স্পষ্টভাষী সমাজ-সংস্কারক।

জাতির মনোরাজ্যের সর্বাপেক্ষা উচ্চ আদর্শগুলি পটুয়াগণ অপরিসীম নিষ্ঠা ও ভক্তিপূর্ণ সাধনার দ্বারা সংগীত ও চিত্রে রূপায়িত করিয়াছে এবং উহাদের ভিতর দিয়া জাতীয় জীবনকে গভীর অধ্যাত্ম আদর্শে অনুপ্রাণিত করিয়া আসিতেছেন।

উৎস : *'পটুয়া সংগীত'* প্রকাশ—১৯৩৯।

পল্লিশিল্প

জসীম উদ্‌দীন

চাঁদের আলোকে সকল ধরণি দেখা যায়। কিন্তু সে আলো আমাদের গৃহের অন্ধকার দূর করে না। সেখানে একটি ক্ষুদ্র মাটির প্রদীপের প্রয়োজন। বাহির হইতে অনেক জ্ঞান-গবেষণার সহিত আমরা পরিচিত হইয়াছি, কিন্তু মাটির প্রদীপের মতো নানারূপ গ্রাম্য শিল্পকলা আমাদের গৃহকে উজ্জ্বল করিয়া রাখিয়াছে।

পল্লির শিল্পকলা সাধারণত রূপ পাইয়াছে মাটিতে, পাথরে, কাঠে, কাপড়ে, মানুষের দেহে, কাগজে, বেতের বন্ধনীতে কোথাও রঙিন রেখা হইয়া কোথাও কঠিন দাগ কাটিয়া, আবার কোথাও রঙিন সূত্রের মায়াজাল রচনা করিয়া। ইহারা কেহ মানুষের অঙ্গে জড়াইয়া আছে, কেহ-বা গৃহের বিবিধ আসবাবপত্রের মধ্যে লুকাইয়া আছে; কখনও আবার ধর্মের পঞ্চপ্রদীপের আলোকে উজ্জ্বল পথের পথিক হইয়া মানুষের সহজ সৌন্দর্য-স্পৃহার একান্ত সাথী হইয়া আমাদের গৃহে রূপের শতদল সাজাইয়াছে।

মাটির গায়ে আলপনার রেখায় আমরা যে ছবি দেখিতে পাই সেইরূপ ছবিই আমরা দেখিতে পাই পাথরের ফলকে, ছুতার-মিস্ত্রির কারুকার্য আঁকা কাষ্ঠখণ্ডে, দেহের উলকিতে, গহনায়, রঙিন কাঁথায় এবং গৃহের সূক্ষ্ম বেত্রবন্ধনীতে। ছবি তোলার প্রণালী পৃথক পৃথক স্থানে পৃথক হইলেও তাহাদের পরস্পরের মধ্যে একটা সামঞ্জস্য আছে। এই সামঞ্জস্যের ভিতর দিয়া আমাদের দেশের বিভিন্ন স্তরের শিল্পীদের মধ্যে একটি মিলন-সেতু গড়িয়া উঠিয়াছে। তাহারা যেন একই প্রেরণা লইয়া নানা পথে ধাবিত হইয়াছে, কিন্তু কেহই কাহাকেও ছাড়িয়া যায় নাই। যে মেয়েটি রঙের উপর রং মিশাইয়া পিঁড়ি চিত্র করে, গ্রাম্য পটুয়ার আঁকা রথের গায়ের রঙিন ছবিরও সে একজন বড়ো সমঝদার। মাটির মেঝেতে কাঁথা বিছাইয়া কৃষাণ গৃহিণী রঙিন সূত্র ধরিয়া যেসব লতাপাতা, প্রজাপতি, ফুল আঁকে হয়তো ঘর বাঁধিতে বাঁধিতে তাহার কৃষাণ-স্বামী তাহারই অনুকরণে সূক্ষ্ম বেত জড়াইয়া জড়াইয়া চালের বাতার সহিত পরদা বন্ধনী, গোখুরা বন্ধনী প্রভৃতি রচনা করিয়াছে।

মাটির গায়ে যেসব পল্লিশিল্প রূপ পাইয়াছে তাহার মধ্যে আলপনার কথা সকলের আগে মনে পড়ে। এই আলপনার আর্ট কতকটা হিন্দু মেয়েদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। কোনো ব্রত বা পূজা-পার্বণ ছাড়া অন্য কোনো ব্যাপারে ইহার প্রচলন দেখা যায় না। গরিবের ঘর নিকাইয়া চালচিত্র আঁকিয়া তাহাকে মনের মতো করিয়া সাজাইয়া তবে দেবতাকে সেখানে আহ্বান করিতে হইবে। মাটির উপরে চালের গুঁড়া-গোলার রেখা। ফুলের মতো বেশিক্ষণ ইহাদের বাঁচাইয়া রাখা যায় না। তাই ইহার অঙ্কন-প্রণালীকে খুব সহজ করিয়া ছবির বিষয়বস্তুটিকে সম্পূর্ণভাবে ফুটাইয়া তুলিবার চেষ্টা না করিয়া মাত্র কয়েকটা সহজ রেখার সাহায্যে শিল্পীর মনোভাবের ইঙ্গিত দেওয়া হইয়াছে।

আলপনার ছবিগুলিকে সাধারণত আট ভাগে ভাগ করা যাইতে পারে, যথা—১. পদ্ম, ২. লতা, ৩. গাছ ফুল পাতা ইত্যাদি, ৪. নদী পুকুর পল্লিজীবনের দৃশ্য, ৫. পশুপক্ষী ও নানা জন্তু, ৬. চন্দ্র সূর্য গ্রহ-নক্ষত্র, ৭. আভরণ ও নানা আসবাব, ৮. পিঁড়িচিত্র।

সাধারণত লক্ষ্মীপূজায়, তারাব্রতে, ভাদুলীব্রতে, বসুধারাব্রতে এবং গ্রাম্য বিবাহের উৎসবে আলপনা আঁকার প্রচলন দেখা যায়। ইহাদের প্রত্যেকটি অনুষ্ঠানে বিভিন্ন রকমের আলপনা আঁকিতে হয়। যেমন তারাব্রতে চন্দ্র সূর্য গ্রহ-নক্ষত্রের ছবি প্রধান, আবার লক্ষ্মীপূজা বিবিধ প্রকারের লক্ষ্মীর পদচিহ্ন। ইহাদের প্রত্যেকটি উৎসব উপলক্ষ করিয়া যেমন নানা রকমের আলপনা তেমনই নানা রকমের গান ও ছাড়া। ময়মনসিংহ গীতিকার কাজল রেখা পালা হইতে প্রাচীন আলপনার একটি বর্ণনা উদ্ধৃত করিয়া এ বিষয়ে আমাদের বক্তব্য শেষ করিব।

উত্তম শালিধানের চাল জলে ভিজাইয়া ধুইয়া রাজকন্যা কাটিয়া লইলেন। তাহা পিঠালি করিয়া প্রথমে বাপ আর মায়ের চরণ অঙ্কিত করিলেন। তার পর জোড়া 'টাইল', ধানছড়া, তার মাঝে মাঝে গৃহলক্ষ্মীর পদচিহ্ন, শিবদুর্গা, কৈলাসভবন, পদ্মপত্রে লক্ষ্মীনারায়ণ, হংসরথে বসিয়া জয়া বিষহরি, ডরাই, ডাকুনি, সিদ্ধা বিদ্যাধরী, শ্যাওড়ার বন সমেত বনদেবী, রক্ষাকালী, বাহন-সহ কার্তিক, গণেশ, লক্ষ্মণের সহিত রামসীতা, গঙ্গা, গোদাবরী, হিমালয় পর্বত, পুষ্পকরথে বসিয়া ইন্দ্র যম সমুদ্র সাগর চন্দ্র সূর্য, জঙ্গালের মধ্যে ভাঙা মন্দির ইত্যাদির চিত্র মাটিতে আঁকিয়া ঘৃতের পঞ্চপ্রদীপ জ্বালাইয়া রাজকন্যা ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন। এই ধরনের আলপনা আঁকার পদ্ধতি আজকাল মেয়েরা প্রায় ভুলিয়াই গিয়াছেন। যশোহর অঞ্চল হইতে সুধাংশুবাবু যেসব আলপনা আবিষ্কার করিতেছেন তাহা কতকটা এই ধরনের।

মাটির গায়ে যেমন আলপনা তেমনই মাটি দিয়া কুমারেরা বিচিত্র রকমের হাঁড়িকুড়ি, লক্ষ্মীর সরা, প্রদীপ, জোড়খুঁটি, নানা দেবদেবীর প্রতিমা ও বহু প্রকারের পুতুল তৈরি করিয়া থাকে। কোনো কোনো কুমার-গৃহিণী চিত্রবিদ্যায় বেশ নিপুণ। তাঁহারা বিবাহের বরণডালার সরা কুলা এবং পিঁড়ি চিত্র করিয়া বেশ দু-পয়সা আয় করিয়া থাকে। পুরুষেরা সাধারণত কাদাছানার কঠিন কাজটি সম্পাদন করিয়া দেয়। মেয়েরা পুরুষদের তৈরি কাদার ডেলার উপর সূক্ষ্ম কারুকার্য করে। লক্ষ্মীপূজার সরার উপর তুলি ধরিয়া তাহারা অতি অল্প সময়ের মধ্যে সুন্দর সুন্দর ছবি আঁকিয়া দেয়। এইসব ছবি সাধারণত রাধাকৃষ্ণের যুগলমূর্তি কিংবা দুর্গা মহাদেব ইত্যাদি দেবদেবীর প্রতিকৃতি। কুমার-মেয়েরা ছাড়াও গ্রামের বহু হিন্দু মেয়ে বিবাহের বরণ-কুলা সরা এবং পিঁড়িতে অতি সুন্দর চিত্র আঁকিতে পারে।

মাটির পুতুল সাধারণত কুমারদের ছোটো ছোটো ছেলেমেয়েরা তৈরি করিয়া থাকে। এইসব পুতুল কোথাও নানারূপ ছাঁচের সাহায্যে, আবার কোথাও শুধু হাতেই তৈরি হয়। কলিকাতার নিকটবর্তী কুমারেরা ছাঁচের সাহায্যেই পুতুল তৈরি করিয়া থাকে।

কৃষ্ণনগরের পুতুলের গল্প করিয়া আমরা গর্ব অনুভব করিয়া থাকি। কৃষ্ণনগরের পুতুল একসময় ইউরোপে এত আদর পাইয়াছিল যে, তৃতীয় নেপোলিয়ান সেকালের সর্বশ্রেষ্ঠ কুমার যদু পালকে ফ্রান্সে আহ্বান করিয়াছিলেন। বিশেষ করিয়া অনুধাবন করিলে আমরা দেখিতে পাইব কৃষ্ণনগরের পুতুল অপেক্ষাও অনেক ভালো পুতুল বাংলার নানা গ্রামের কুমারেরা তৈরি করিয়া থাকে। কৃষ্ণনগরের পুতুলকে খাঁটি বাংলার পুতুল বলিয়াও উল্লেখ করা যায় না। কৃষ্ণনগরের কুমারদের এত নাম এইজন্য যে, তাহারা বিজাতীয় রুচির খোরাক জোগাইতে পারিয়াছে। বস্তুত ইংরেজ শাসনের প্রারম্ভে নীলকুঠির সাহেবদের চাহিদা অনুসারে কৃষ্ণনগরের কুমারেরা এদেশি আদর্শ ছাড়িয়া ইউরোপীয় আদর্শে পুতুল গড়িতে আরম্ভ করে। তখন হইতে তাহারা এদেশিয় সমাজ-জীবনের নানা ফোটোগ্রাফির নকশা তৈরি করিয়া বিদেশে চালান দিয়া আসিতেছে।

এইখানে শোলার খেলনার কথা না বলিয়া পারিলাম না। গ্রাম্য মেলা বা আড়ং হইতে ছেলেরা শোলার খাঁচা, পাখি, কুমির, রথ, আনারস, কাঁঠাল, হরিণ, ময়ূর, ফুল প্রভৃতি কিনিয়া আনে। শোলার খেলনা সাধারণত খুব ছোটো শিশুদের জন্য। শিশুকে শোয়াইয়া রাখিয়া তাহার মাথার উপর খেলনাগুলি ঝুলাইয়া দেওয়া হয়। সেগুলি বাতাসে দোলে। তাহা দেখিয়া শিশু দু-হাত নাড়িয়া খেলা করে। ইহা ছাড়া শোলার খেলনা ঘর সাজাইবার কাজেও ব্যবহৃত হয়। দেশি জমিদারদের কাছারিতে পুণ্যাহ উৎসবে প্রজাদের গলায় একপ্রকার শোলার মালা পরাইয়া দেওয়া হয়। আগে মুসলমানদের বিবাহের সময় বরকে এক ছাতি মাথায় দিয়া শ্বশুরবাড়ি যাইতে হইত। আজ কাল মোটরে চড়িয়া, পালকিতে চড়িয়া আধুনিক বরেরা বিবাহ করিতে যায়, কিন্তু আগে তো লোকের এসব দিকে শখ ছিল না। গ্রাম্য মালাকরেরা মাসের পর মাস অতি নিপুণ হস্তে ধরিয়া ধরিয়া শোলার ফুল পাতা লতা পাখি ইত্যাদি দিয়া এই রঙিন ছত্রের রচনা করিত। এই ছত্র হস্তে লইয়া পদব্রজেই বর বিবাহ করিতে যাইত। শিবরামপুরে এক বৃদ্ধ মালাকর এখনও এইরূপ ছাতি তৈরি করিতে পারে। দুর্গাপূজার মেলার সময় নৌকার ব্যাপারীরা শোলার ফুল দিয়া মালা দিয়া নৌকার গলুই সাজায়। দৌড়ের নৌকাও শোলার লতা ফুল দিয়া সাজানো হইয়া থাকে। হিন্দুদের বিবাহে বরের মাথার টোপর মালাকর প্রস্তুত করিয়া থাকে। কোনো কোনো টোপরে এত সূক্ষ্ম কারুকার্য থাকে যে তাহা বহুমূল্যে বিক্রীত হয়। মালাকরেরা সাধারণত স্ত্রীপুরুষে মিলিয়া কাজ করিয়া থাকে। শোলা কাটিবার জন্য একপ্রকার পাতলা ছুরি এবং বঁটি ইহারা গ্রাম্য কামারদের কাছ হইতে তৈয়ার করিয়া লয়। আজকাল পাটের চাষ হওয়ায় শোলার চাষ খুব কম হয়। ব্যবসায়ে লাভ নাই দেখিয়া জীবিকার জন্য বহু মালাকর অন্যান্য বৃত্তি অবলম্বন করিতেছে।

কাপড়ের উপর যেসব পল্লিশিল্প ধরা দিল কাঁথা তার মধ্যে প্রধান। আলপনার মতন কাঁথা সেলাইয়ের ছবিগুলিকেও নানা ভাগে ভাগ করা যাইতে পারে। যথা—১. বিবিধ লতা, ২. পাতা ফুল, ৩. মাছ পাখি, ৪. দেবদেবীর ছবি, ৫. হাতি ঘোড়া ময়ূর ইত্যাদি। কাঁথার উপরে যেমন নানা রকমের ছবি হয়, সেইগুলি আঁকিবার জন্যও নানা রকমের ফোড় দিবার প্রণালী আছে। তাহারা নিজেরাই অনেক সময় ছবির উপরে 'ডেকোরেশন'-এর কাজ করে। এই সেলাইগুলির নাম তেরছা সেলাই, বখেয়া সেলাই, বাঁশপাতা সেলাই ইত্যাদি। বেশির ভাগ কাঁথাতে লাল, কালো, সাদা ও হলদে এই চারি রঙের পরিচয় পাওয়া যায়। কোনো কোনো কাঁথাতে সবুজ ও নীল রং দেখিতে পাই।

কাঁথা সেলাইয়ের সুতা তৈরি এবং রং নির্বাচন এক কঠিন ব্যাপার। কেহ কেহ পুরাতন শাড়ির পাড় হইতে একটি একটি করিয়া সুতা বাহির করিয়া ছোটো ছোটো নাটাইয়ে গুটাইয়া রাখে।

তার পর সেই সুতাকে পাকাইয়া বা একটি একটি দ্বারা কাঁথা সেলাই করে। হাট হইতে তাঁতিদের বা বেনেদের কাছ হইতেও কেহ কেহ রঙিন সুতা কিনিয়া লয়। হাঁটু মেলিয়া বসিয়া পায়ের আঙুলের সঙ্গে সুতার একটি আল জড়াইয়া দুই হাতে সাধারণত মেয়েরা সুতায় পাক দেয়। এক আলে পাক হইলে তাহা দাঁত দিয়া কামড় দিয়া ধরিয়া অন্য আলে পাক দেয়। এইরূপে নানা রঙের আট নয় আল সুতা পাক দেওয়া হইলে এক এক আল, হাতের চারি আঙুল একত্র করিয়া তাহাতে জড়াইয়া দড়ি করিয়া পাক দিয়া রাখে।

কার্পেটে ফুল তুলিতে মেয়েরা কোলের উপর রাখিয়া তাহা সেলাই করে। কেহ কেহ ফ্রেমেও কাপড় আটকাইয়া লয়। কিন্তু কাঁথা সেলাই সেভাবে করিতে হয় না। ঘরের মেঝেয় মাদুরের উপর কাঁথাখানা মেলিয়া ধরিয়া তাহার উপরে বসিয়া তবে তাহা সেলাই করিতে হয়। সাধারণত দুই পাট কিংবা তিন পাটের কাঁথাই নকশি করা হয়। তাহার অপেক্ষা বেশি পাটের কাঁথা শীত নিবারণের জন্য ব্যবহৃত হয়। তাহার উপরে কেহ কারুকার্য করে না। কাপড়ের প্রত্যেক পরতকে পাট কহে। দুই পাটের কাঁথার অর্থ দুই পাল্লা কাপড় যে কাঁথায় ব্যবহৃত হয় সেই কাঁথা। এই কাঁথা সেলাইয়ের সমস্ত উপকরণ সাধারণত ছোটো ছোটো বটুয়ার মধ্যে রাখা হয়। সুঁচে মরিচা ধরিবে মনে করিয়া কেহ কেহ তাহা তেলের শিশির মধ্যেও রাখে। এই সুঁচ মেয়েদের নাক কান বিঁধাইবার কাজেও ব্যবহৃত হয়।

কোনো কোনো সময়ে একখানা কাঁথা সেলাই করিতে বারো বছর সময় লাগিয়াছে এরূপও শোনা যায়। শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর শ্রীহট্টে একখানা ভালো কাঁথার খোঁজ পাইয়াছিলেন। সেই কাঁথায় একটি বিধবা মেয়ে তাহার বিবাহের গায়ে হলুদ হইতে আরম্ভ করিয়া সমস্ত ঘটনা আঁকিয়া রাখিয়াছিলেন। এরূপও শোনা যায় যে, মাতা যে কাঁথা সেলাই করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন মায়ের মৃত্যুর পর কন্যা তাহা আজীবন সেলাই করিয়াও শেষ করিতে পারেন নাই। তাঁহার মৃত্যু হইলে বংশের পরবর্তী কোনো কন্যা তাহা সমাপ্ত করিয়াছেন। ইহা কম ধৈর্যের কথা নহে।

আগে এইসব কাঁথা কেহই বিক্রি করার জন্য তৈরি করিত না। লোককে দেখাইয়া প্রিয়জনকে উপহার দিয়া গ্রাম্য শিল্পীরা সুখী হইত।

কাঁথা সেলাই করিতে গিয়া এদেশের মেয়েরা কাপড়ের উপর কাঁথার মতোই নকশা করিয়া আরও অনেক জিনিস তৈয়ার করিয়াছেন, সেগুলিকে কাঁথা সেলাইয়ের পর্যায়ভুক্ত করা যাইতে পারে। যথা—

১. পান সুপারি রাখার বটুয়া,

২. জপের মালার থলে,

৩. বৈরাগীর ঝোলা,

৪. বালিশ যাহাতে মাথার তেল লাগিয়া ময়লা না হইয়া যায় তজ্জন্য তাহার উপরে আচ্ছাদন দেওয়ার 'ব্যাটন'। 'ব্যাটন' বোধ হয় বেষ্টনী শব্দের অপভ্রংশ,

৫. মুসলমানদের দস্তরখানার কাপড়। মুসলমানেরা সাধারণত বিছানার উপর বসিয়া আহার করে। আহারের সময় মাছের কাঁটা আলুর খোসা ইত্যাদি ফেলিবার জন্য একখানা দস্তরখানা কাপড় বিছাইয়া দেওয়া হয়। বাড়িতে কোনো নূতন অতিথি আসিলে সাধারণত তাহার আহারের সময়ই নকশিকরা দস্তরখানার কাপড় বিছানো হয়।

৬. কোরান শরিফ জড়াইয়া রাখার ঝোলা,

৭. 'সারিন্দা' (একপ্রকার বাদ্যযন্ত্র) রাখিবার ঝোলা।

পল্লিগ্রামের শিকা আর-এক সুন্দর জিনিস। ছোটো একখানা খড়ের ঘরের চালের বাতায় আনন্দলহরি ফুলঝুরি, আদরফানা, সাগর ফেনা, কেলিকদম্ব প্রভৃতি নানা ধরনের শিকায় রঙিন পানের বাটা, গহনার ঝাঁপি, সিন্দুরকৌটা প্রভৃতি মেয়েদের অতি শখের জিনিসগুলি দুলিতে থাকে। কোনো কোনো শিকার বুননের সহিত অভ্র রাংতা ব্যবহৃত হয়। শিকায় শিকায় গরিব চাষির ছোটো ঘরখানি ঝলমল করে। বিছানাবালিশ টাঙাইয়া রাখিবার জন্য মেয়েরা রঙিন সুতা দিয়া ঝালি তৈয়ার করে। তাহাও দেখিতে অতি সুন্দর। আজকাল মাটির প্রদীপের চলন উঠিয়া গিয়াছে। এই প্রদীপের সলিতা রাখিবার জন্য আগে মেয়েরা রং-বেরঙের কাপড় দিয়া সলিতা-দানি তৈরি করিতেন। তাহাতেও নানাপ্রকার সূক্ষ্ম কারুকার্য থাকিত।

বাংলা দেশের পাটার উপর যেসব ছবি দেখা যায় সে সম্বন্ধে একটি কথা বলিব। বাংলা দেশের বুকে একদিন মাটির মাদল বাজাইয়া যে সুন্দর মানুষ-দেবতা অশ্রুজলের মন্দাকিনী বহাইয়াছিলেন তাহারই উজ্জ্বল ইতিহাস সাধারণত এই সময়ের পুথির পাতায় বা মলাটের পাটায় অঙ্কিত দেখিতে পাই। চৈতন্যদেবের আবির্ভাব ও তিরোভাবের পূর্বে এই ধরনের ছবি আঁকা পুথি বাংলা দেশে খুব কমই পাওয়া যায়।

কালীঘাটের পট লইয়া আজকাল অনেকে আলোচনা করিতেছেন। এই পট আঁকিবার পদ্ধতি অতি চমৎকার। পটুয়াদের ঘরে ছেলে বুড়ো মেয়ে সকলে বসিয়া এই পট আঁকে। প্রত্যেকে এক একটি রং লইয়া বসে। একজন রেখা টানে আর-একজন গায়ে রং দেয়, অন্য জন চুল আঁকে। এমনি করিয়া অতি অল্প সময়ের মধ্যে একখানি পট সম্পূর্ণ আঁকা হয়। ইহাতে সকলেরই শিক্ষা এবং মনে সৃষ্টির আনন্দ জন্মে।

আমাদের দেশে যাহারা প্রতিমার চালচিত্র আঁকে তাহাদের ভাস্কর বা আচার্য ব্রাহ্মণ বলে। ইঁহারা গ্রামের সকলপ্রকার চিত্রকার্য সম্পাদন করেন। আমাদের ফরিদপুরে চৌধুরীদের রথের গায়ে এরূপ একজন ভাস্করের আঁকা অনেকগুলি সুন্দর সুন্দর ছবি আছে। তাহার কতকগুলি দেবদেবীর লীলাবিষয়ক, আবার কতকগুলি পল্লীজীবনের নানা ঘটনা সংবলিত। আজকাল জার্মানি হইতে ছাপমারা চালচিত্র বাজারে বিক্রি হইতেছে দেখিয়া দেশি ভাস্করদের অর্থ উপার্জনের পথ সংকীর্ণ হইয়া উঠিয়াছে।

চারি বৎসর আগে কবি পরিমলকুমার ঘোষ মহাশয় বলিয়াছিলেন যে, আগে বিক্রমপুর জেলায় গ্রাম্য মুসলমানেরা একপ্রকার গাজির পট দেখাইয়া বাড়ি বাড়ি ঘুরিত। আমরা বহু অনুসন্ধান করিয়া এই পটের খোঁজ পাইয়াছি। পট এখনও আমাদেব হস্তগত হয় নাই। যে ছড়াটি গাহিয়া গাহিয়া এই পট বাড়ি বাড়ি দেখানো হইত তাহা এখানে উদ্ধৃত করিলাম :

পেরথমেতে দেখেন কর্তা ঠাকুর জগন্নাথ
রাম লক্ষ্মণ নয়া হনু লংকা চইলা যায়।
রাবণ আইস্যা যোগীর বেশে সীতা হরণ করে
সুর্পনখার নাক যেমন লক্ষ্মণঠাকুর কাটে।
কামরতি বামন দেখেন ছিন্নমস্তা কালী
তার পরেতে দেখেন কর্তা ময়ূরপঙ্খি নাও।
গাজির ভাই কালু আইল নিশান ধরিয়া
গাজির আছে একটা বাঘ নাম যে খান্দিয়া।

ঘর দুয়ার দুলিয়া বাঘে মানুষ লইয়া যায়।
চুল নাই বুইড়া বিটি খোপার লাইগা কান্দে
কুমারেরা কচুপাতা ঢিপলা দিয়া খোপা ডাগুর করে।
সুন্দর বুইনা বাঘ ছিল আড়ে আড়ে চায়।
তারা বুইনা বাঘ যেমন সেলাম জানায়।
পালের প্রধান বড়ো আবালটা বাঘে লইয়া যায়।
সাত সের চাইলের পিঠা খাইল বুড়ি কাঁথা মুড়ি দিয়া।
দাঁতটিং দাঁতটিং বইলা বুড়ি জামাই বাড়ি যায়।
গোটা দুই তিন কিল দিল বুড়ির আসরে পাসরে
গোটা চার পাঁচ কিল দিল বুড়ির গুষ্টার উপরে
নন্দ ঘোষের বাপে আইল হুক্কা হাতে লইয়া
দুই বাঘের একমাথা ধরিছে যুগান।

বর্ণনা পড়িলে সহজেই মনে হইবে এই পটে হিন্দু-মুসলমান সকলপ্রকার লোকেরই রুচির প্রতি লক্ষ রাখা হইয়াছে। এই পট সাধারণত প্রস্থে দুই হাত এবং দৈর্ঘ্যে ত্রিশ-চল্লিশ হাত হইত। একটা বাঁশের সঙ্গে পট জড়াইয়া দুইটা বাঁশের সঙ্গে তাহা বাঁধিয়া দেওয়া হইত। তাহারা থামের কাজ করিত। গানের সঙ্গে সঙ্গে থিয়েটারের সিনের মতো ধীরে ধীরে উপরের বাঁশ কপিকলের সাহায্যে ঘুরাইয়া ছবিগুলিকে মেলিয়া ধরা হইত। গ্রামের লোকেরা তাহা দেখিয়া হাসিয়া গড়াইয়া পড়িত। কোনো কোনো দলে সাজপোশাক পরিয়া ছবির বিষয়বস্তুগুলি দেহভঙ্গির সাহায্যেও দেখানো হইত। এরূপ দলকে কাচের দল বলে। সাধারণত পৌষ মাঘ মাসে এরূপ দল বাহির হইয়া থাকে। গুরুসদয় দত্ত বীরভূম জেলা হইতে রামায়ণ মহাভারতের ঘটনাসংবলিত এইরূপ কয়েকখানা পট সংগ্রহ করিয়াছেন।

বাংলা দেশে এককালে বেত ও বাঁশের কঞ্চির সাহায্যে ঘরের নানাপ্রকার আসবাব ও ব্যবহারোপযোগী দ্রব্যসামগ্রী তৈরি করা হইত। আমাদের শীতলপাটি এক আশ্চর্য জিনিস। যাহারা পাটি বোনে তাহাদিগকে 'পাইটা' বলে। পাটিয়া মেয়েদের মধ্যে যে যতগুলি পাটি বুননের যো বা প্রণালী জানে বিবাহে সে তত কুড়ি টাকা পণ পায়। ফরিদপুর জেলার সাঁতইরের শীতলপাটি একদিন সমস্ত ভারতে প্রসিদ্ধ ছিল। এখানকার পাটি রাজা সীতারামের পুরবাসিনীদের মধ্যে একটা বিলাসের সামগ্রী বলিয়া পরিচিত ছিল।

উত্তরবঙ্গে অনেক স্থানে এখনও বেতের দ্বারা সম্পূর্ণ গৃহ নির্মাণ করা হয়। ঢাকা জেলার বেতিয়া রমণীদের হাতের তৈরি একটি বেতের ঝাঁপি ও পান রাখিবার একটি ডালা আমরা সংগ্রহ করিয়াছি। বেত ঘুরাইয়া সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ফুল বানাইয়া তাহাতে রং লাগাইয়া কী অপূর্ব দ্রব্য তাহারা তৈরি করে।

আজকাল করোগেট টিনের আমদানি হইয়া সুন্দর খড়ের ঘরের শখ মানুষের চলিয়া যাইতেছে। সেই সঙ্গে ভালো ভালো ঘরামিরাও ঘরের সূক্ষ্ম কাজ ভুলিয়া যাইতেছে। জোড়বাংলা, বারো বাংলা, বারো দুয়ারি, পূব দুয়ারি, আটচালা, দোচালা, চৌচালা ঘর, রংমহল, আলমটুঙ্গি, জলটুঙ্গি প্রভৃতি ঘরের নাম শুনিলে কান জুড়াইয়া যায়। ইহার এক এক ঘরের সঙ্গে এক এক রকমের কারুকার্য।

আমাদের ফরিদপুর জেলা হইতে পঞ্চাশ মাইল দূরে কালুখালি অঞ্চলের ছরাজান মিয়াঁ বহু বৎসর আগে একখানা খড়ের ঘর তৈরি করাইয়া গিয়াছেন। আজও তিন-চারি দিনের পথ হইতে লোক গামছায় চাল চিঁড়া বাঁধিয়া এই ঘর দেখিবার জন্য আসে। শুনিয়াছি তাঁহার বাড়ির কোন্ নববধূ নাকি শ্বশুরবাড়িতে পাকা ঘর নাই বলিয়া পাড়াগাঁয়ে আসিতে চাহেন নাই। শ্বশুর তাই প্রতিজ্ঞা করিলেন খড় দিয়া তিনি এমন ঘর বাঁধিবেন যাহা পাকাবাড়ির সৌন্দর্যকেও পরাস্ত করে। এই ঘর তৈরির বিষয়ে নানরূপ গল্প আছে। যে ঘরামি একদিনে একটি রুয়া চাঁচিয়াছে তাহাকেও গৃহকর্তার মনঃপূত হয় নাই। ইহার প্রত্যেকটি রুয়া এত ধরিয়া ধরিয়া চাঁচা হইয়াছে যে, একটি রুয়া চাঁচিতে একজন ঘরামির দুই দিন সময় লাগিয়াছে। সর্বাইন্দ্যা গ্রামের দুই জন নমঃশূদ্র ঘরামির তত্ত্বাবধানে প্রথমে এই ঘরের কাজ আরম্ভ হয়। পরে ঢাকা জেলা হইতে একজন মুসলমান ঘরামিকেও নিযুক্ত করা হয়। শোনা যায় যে এই ঘরামি এত সরু বেত চাঁচিতে পারিত যে, তাহা অনায়াসে সুঁচের ছিদ্রপথে যাওয়া-আসা করিত। তাহাদের সাহায্য করিবার জন্য ত্রিশ-চল্লিশ জন ঘরামিকে নিযুক্ত করা হইয়াছিল। ঘরের কাজ সমাধা হইলে গৃহস্বামী হিন্দু দুইজন ঘরামিকে পুরস্কার এবং জায়গির প্রদান করেন। কিন্তু মুসলমান ঘরামিকে পরে নিযুক্ত করা হইয়ছিল বলিয়া তাহাকে আর কোনো পুরস্কার দেওয়া হয় নাই। ইহাতে সে মনঃক্ষুণ্ণ হইয়া ঘরের মধ্যে এক্স্থানে একটু ফাঁক রাখিয়া যায়। বৃষ্টি পড়িলেই সেখান দিয়া জল গড়াইয়া পড়িত। অপর দুইজন হিন্দু ঘরামি পরে বহু চেষ্টা করিয়াও সে ত্রুটি সারিতে পারে নাই। এই ঘরের প্রত্যেকটি রুয়া প্রায় ত্রিশ হাত। এত বড়ো রুয়া জোড়া না দিয়া তৈরি করিবার জো নাই। কিন্তু সেই রুয়া বাঁশের সঙ্গে এমন করিয়া মিলাইয়া দেওয়া হইয়াছে যে, কিছুতেই তাহা টের পাওয়া যায় না। ঘরের আটনের জোড়াও বুঝিবার উপায় নাই। এই ঘরের সঙ্গে গোখুরা বন্ধন, পরদা বন্ধন (প্রজাপতি বন্ধন) প্রভৃতি নানাপ্রকার বন্ধন আছে। তা ছাড়া ঘরের বাজারের সঙ্গে, ফুসির সঙ্গে, ছাটনের সঙ্গে অভ্র ও মিনার পাত জড়াইয়া তাহাতে সুচিক্কণ বেতের কারুকার্য করা হইয়াছে। আটনের সঙ্গে যে মোটা বেতের বন্ধন দেওয়া হইয়াছে সেই বেতের গায়ে সাদা রং লাগানো। প্রত্যেক রুয়ার গোড়ায় লতা ও ফুলের নকশা কাটা, তাহাতে নীল এবং লাল রং জড়ানো। এখন এই ঘরের অবস্থা কতকটা জীর্ণশীর্ণ। অভ্র ও রং-বেরঙের মিনার পাতগুলি উঠিয়া গিয়াছে। গ্রামের বৃদ্ধেরা বলে, আগে এই ঘরের ভিতরে দাঁড়াইয়া উপরের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে অভ্র এবং মিনার পাতের রঙে চোখ ঝলসিয়া যাইত। রাত্রিবেলা এই ঘরে যখন ঝাড়লণ্ঠন জ্বলিত তখন মিনা ও অভ্রের পাতের উপর নানা রকমের বন্ধনগুলি সাগরের নানা রঙের জললহরির উপর তারকার প্রতিবিম্বের মতো আলোকে ঝলমল করিত।

এই ধরনের ঘর আজকাল কেহ তৈরি করে না বটে, কিন্তু গ্রামের বহু বাড়িতে এখনও এরূপ কারুকার্য-সমন্বিত ফুলচাং দেখিতে পাওয়া যায়। রূপকথার অনেক স্থানে পাওয়া যায় কোনো কোনো ঘরে আন্ধারি অভ্র দিয়া তৈরি হইত। সোনা দিয়া তাহার রুয়া মোড়া হইত। নানারূপ পাখির রঙিন পালকে সেই ঘরের ছাউনি দেওয়া হইত। 'মলুয়ার' পালা হইতে আমরা একজন সাধারণ গ্রাম্য চাষির ঘরের বর্ণনা উদ্ধৃত করিব :

শীতলপাটি দিয়া বিনোদ ঘরের দিল বেড়া
উলু ছোনে ছাইল ঘর দেখতে মনোহরা।
ঝাপে ঝোপে করে বিনোদ কামেলার কাম
দেখিতে সুন্দর বাড়ি চান্দের সমান।
মাছুয়া পক্ষের পাখ দিয়া সাজুয়া বানায়।

বাংলা দেশের দারুশিল্প তাহার সর্বাপেক্ষা গৌরবের জিনিস। এদেশের পল্লিগ্রামে ভ্রমণ করিলে অতি সহজেই চোখে পড়িবে, সাধারণ ছুতার মিস্ত্রিরা কাঠের উপর কত অপূর্ব কারুকার্য করিয়া রাখিয়াছে। ঘরের চৌকাঠ, কাঠের বেড়া, খাট, পালঙ্ক, সিন্দুক, বাক্স, লাঠি, সারিন্দা, দোতারা, কাঠের ও বাঁশের গুঁড়ির হুঁকা, রথ, পালকি, গাড়ি, শ্রাদ্ধের বৃষকাষ্ঠ প্রভৃতি সব জিনিসের উপরই এইসব শিল্পীরা সৌন্দর্যের শতদল ফুটাইয়া তুলিয়াছে। ফরিদপুর জেলায় নৈলাগ্রামে সেদিন একখানা ঠাকুরের আসন দেখিয়া আসিলাম। চার কোণে চারিটি হাতি। প্রত্যেক হাতির মাথায় এক একটি সিংহ। সিংহ হাতির শুঁড় বাঁকাইয়া ধরিয়াছে। তাহারই উপরে আসনখানা অবস্থিত। আসনের সামনের দিকটা মাথায় করিয়া আছে চারিজন বৈরাগী; একজনের হাতে কমণ্ডলু, আর-একজন হরিপ্রেমে মাতোয়ারা, আর দুইজন তীর্থযাত্রা করিয়াছে। আসনখানার চারিদিকে চারিজন পরি পাখা মেলিয়া উড়িয়া চলিয়াছে। সামনের দিকে ব্রজগোপিনীরা কেহ নাচিতেছে, কেহ তবলা বাজাইতেছে, কেহ গান করিতেছে। প্রত্যেকটি ছবি যেন জীবন্ত। এই আসনের উপরে আর-একখানা ক্ষুদ্র আসন এবং তাহার উপরে আরও একখানা। প্রত্যেক আসনের চারি ধার কাগজের সূক্ষ্ম ঝলমের মতো তক্তার উপর কারুকার্য করিয়া সাজানো হইয়াছে। ইহা ছাড়া এই আসনের চার পাশে রাধাকৃষ্ণ, দশাবতার ও রাসের বহু চিত্র অঙ্কিত রহিয়াছে। তাহা কোনো গ্রাম্য পটুয়ার আঁকা। সামনের দিকের ছবিগুলি প্রায় মুছিয়া গিয়াছে। অন্যদিকের ছবিগুলি এখনও বোঝা যায়। শুনিলাম বহু শিল্পীর বহু বৎসরের সাধনায় এই আসনখানি তৈরি হইয়াছিল।

বাংলা দেশের পল্লিগ্রামে বেড়াইলে শ্রাদ্ধের বহু স্তম্ভ দেখা যায়। ইহার উপরে গঠিত বৃষ, হরপার্বতী এবং স্তম্ভরূপী মনুষ্যমূর্তি কোনো কোনো স্থানে অতি সুন্দর হইয়া থাকে। এদেশে ভালো পাথর পাওয়া যায় না, তাই বাংলার ভাস্করশিল্প দারুশিল্পে রূপান্তরিত হইয়াছে। (হ্যাভেল)

ময়মনসিংহ জেলায় কিশোরগঞ্জে এক বৃদ্ধ মুসলমান খুব সুন্দর সুন্দর কাঠের পানের বাটা তৈরি করে। তাহার গায়ে রঙিন লতাপাতা ও ফুল আঁকা হয়। এক কিশোরগঞ্জ ছাড়া আর কোথাও এরূপ পানের বাটা আমরা দেখি নাই।

উৎস : '*প্রবাসী*' শ্রাবণ ১৩৩৯।
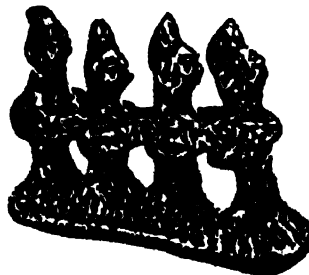
পুরাতন বাংলা গান

রাজ্যেশ্বর মিত্র

যে যুগে বাঙালি গাইয়েরা ধ্রুপদ গানে মুখর সে যুগে বাংলা গান যে ধারায় চলেছে তার গতিপ্রকৃতি সম্পূর্ণ বিভিন্ন। তার কায়দা, রূপায়ণ, গায়নভঙ্গি এবং আবেদন একেবারেই অন্যরকম। যে ওস্তাদ প্রচণ্ড দাপটে হিন্দুস্থানি ধ্রুপদ গাইলেন, তিনিই যখন বাংলা গান গাইতে বসলেন তখন তাঁর ধরনটা পালটে গেল, কণ্ঠ মসৃণ হয়ে গেল, ফুটে উঠতে লাগল টপ্পার দানাদার ফুলকি, একটা ভাবাবেগ যেন তাঁকে মন্ত্রবলে সমাহিত, ধ্যানস্থ করে গেল। অবশ্য, সব সময়ই যে এটা হত তা নয়, এই বছর-কুড়ি আগেও এক বাঙালি ধ্রুপদির মুখে শুনেছিলাম 'ভালোবাসিবে বলে ভালোবাসিনে'। এমন মনোহর টপ্পাকেও তিনি যেন দুন, বাঁটের ফর্মুলায় ফেলে একেবারে লড়াই করতে লেগে গেলেন। প্রতি বার সমের মুখে এসে ডান হাতের তর্জনী দিয়ে যেভাবে মেঝের ওপর খোঁচা দিচ্ছিলেন তাতে সিমেন্ট না হয়ে মাটি হলে তার চার পাশ গর্তে গর্তে ছেয়ে যেত নিশ্চয়। তিরিশের দশকে এরকম কয়েকজন গাইয়ে ছিলেন কলকাতায়, যাঁরা প্রচুর পুরাতন বাংলা গান জানতেন কিন্তু সে ক্ষেত্রেও তবলার সঙ্গে যুদ্ধ করাই ছিল তাঁদের আদর্শ। আসর পণ্ড করবার দরকার হলে লোকে এঁদের ডেকে আনত। কিন্তু, এটা নিতান্তই ব্যতিক্রম। যাঁরা যথার্থ ভালো গাইয়ে ছিলেন, বা বাংলা গান সৃষ্টি করে গেছেন তাঁরা কখনোই এভাবে গাইতেন না, কারণ তা হলে উদ্দেশ্যটাই বিফল হয়ে যেত।

এই উদ্দেশ্যটা যে কী—সেটা বহুদিন ধরে চিন্তা করে এসেছি। হিন্দুস্থানি গান, দরবারি গান—তার গাম্ভীর্য এবং ব্যক্তিত্বকে বজায় রাখতে সেই ওজনের দৃঢ়তা চাই, স্থৈর্য চাই; কিন্তু বাংলা গান ঘরোয়া গান—তাকে সমস্ত স্নেহ মমতা দিয়ে প্রকাশ করতে হবে—এই মনোভাবই হয়তো এই দুই ক্ষেত্রে কার্যকর হয়েছে। তথাপি বড়ো বড়ো আসরে গাইতে বসেও অনেক ওস্তাদ, কেবলমাত্র ধ্রুপদ ধামার গেয়েই ক্ষান্ত হতেন না, দু চারটে বাংলা টপ্পা বা রঙিন গান শুনিয়ে একটা সুগভীর আত্মতৃপ্তি নিয়ে তাঁদের অনুষ্ঠান শেষ করতেন। গায়কির এই বেশ-খানিকটা প্রভেদে শ্রোতারাও খুশি হতেন, চমৎকৃত হতেন।

হিন্দুস্থানি গানের পাশাপাশি বাংলা গান এইভাবে দুই শতাব্দী ধরে নানা রূপে-রসে, নানান ধারায় বিকশিত হয়ে উঠেছিল। বিংশ শতাব্দীতে দেখা যায় বাংলা গান একটা বিশেষ শ্রেণিতে পরিণত হয়েছে। যদিচ বাংলা গানের ভিত্তি ধ্রুপদ নয়, তথাপি রাগসংগীতের এ যে একটি মনোরম লীলাভূমি সে সম্বন্ধে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই। কারা একে এত উৎকৃষ্টভাবে রূপায়িত করলেন এবং এত মনোরম করে তুললেন? এর উত্তরে বলতে হয় তাঁরাই বাংলা গানকে রমণীয় করবার ভার নিয়েছিলেন, হিন্দুস্থানি গানে যাঁদের পারদর্শিতা ছিল অতুলনীয়। নিধুবাবু ওস্তাদ হয়ে বাংলা গান রচনায় হাত দিয়েছিলেন, কালী মির্জা তো নাম-করা ওস্তাদ ছিলেন। রাধামোহন সেন গান গাইতেন না, কিন্তু তাঁর গান যাঁরা গাইতেন তাঁরা রাগসংগীতে পারদর্শী ছিলেন। শ্রীধর কথক কীরকম গাইতেন, আমরা জানি না, হয়তো তেমন ওস্তাদ ছিলেন না, কিন্তু তাঁর গানগুলিতে রাগ সংগীতের নানারকম স্টাইল দেখা যায় যা অপর অনেকের রচনায় দুর্লভ। এটা যদি আমরা বিশ্লেষণ করি, তা হলে দেখতে পাব যোগ্যতম বাঙালি গায়কেরা যোগ্যতার উত্তুঙ্গ শিখরে উঠে যে বাংলা গান রচনা করেছেন তা প্রথম থেকেই পরিপক্ক বা 'ম্যাচিওর' রচনা; তা গোড়া থেকেই এত অসাধারণ যে পাকা গাইয়ে ছাড়া এসব গান গাইবার পারদর্শিতা আর কারও থাকবার কথা নয়। পরিচিত থেকে অপরিচিত বহু কূটরাগই বাংলা গানে প্রযুক্ত হয়েছে; তালের বেলাতেও তাই— একতাল, ত্রিতাল, ঝাঁপতাল, যৎ—এসব তো আছেই, তা ছাড়া আছে আড়াঠেকা, যা আজকাল প্রায় অজানা বললে অত্যুক্তি হয় না কিন্তু তখন ছিল প্রায়শই প্রচলিত। আজকাল হলে অধিকাংশ শিল্পী তাল ছাড়াই এসব গান গাইতেন (অন্তত বেতারে তো বটেই), কিন্তু সেকালে তবলা ছাড়া গাইয়ে একান্ত উপহাসের পাত্র ছিলেন এবং এসব গানই তাঁদের বেশ দক্ষতার সঙ্গে তালে গাইতে হত। আর এসব গান তালে মজা করে গাইলে সে যে কী অপূর্ব শোনায় তা যাঁরা এসব গান সেভাবে শুনেছেন একমাত্র তাঁরাই উপলব্ধি করতে পারেন। পুরাতন বাংলা গানের একটা বৈশিষ্ট্য হচ্ছে সম। প্রতিটি গানের বাঁধুনি এত নিটোল যে গান যখনই এসে সমে পৌঁছোচ্ছে তখনই মনে হচ্ছে ঠিক এখানে এভাবে শেষ না হলে গানের রস-হানি ঘটত। আর, সবচেয়ে বিচিত্র হচ্ছে কথা বা কাব্যের দ্যোতনার সঙ্গেই এ সমের নিবিড় সম্বন্ধ ছিল; সমে পৌঁছোলেই মনে হত কাব্যের অনুপম আবেদন যেন ঠিক তার স্বাভাবিক আকুতিকে নিয়ে সবচেয়ে অনুকূল সময়ে এসে মর্মে তার আঘাত হেনে গেল। যাঁরা লালচাঁদ বড়ালের 'ধিন তা ধিনা পাকা নোনা'-জাতীয় গান শুনে বাংলার পুরাতন বাংলা গান সম্বন্ধে ধারণা করেছেন তাঁরা হয়তো ঠিক আন্দাজ করতে পারেননি, কেননা এ সব গান পুরাতন বাংলা গানের আদৌ প্রতিনিধিত্ব করে না : কিন্তু তথাপি তান-বৈচিত্রে তাঁরা মুগ্ধ হবেন নিশ্চয়। লালচাঁদ গানের সেন্টিমেন্টকে সব ক্ষেত্রে তেমনভাবে রাখতেন না, কিন্তু তান এবং গিটকারিতে তিনি অতুলনীয়। তবে, তিনি দ্রুত তানেই বেশি অভ্যস্ত ছিলেন। রাধিকাপ্রসাদ গোস্বামী যখন 'সোহাগে মৃণাল ভুজে' গাইতেন তখন ফুটে উঠত বাংলার চাল, বাংলার সেন্টিমেন্টকে তিনি বহুল পরিমাণে ফুটিয়ে তুলতে পারতেন তাঁর অপূর্ব গায়নশৈলীতে। জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ গোস্বামী এ যুগের একজন শ্রেষ্ঠ গায়ক যিনি পুরাতন বাংলা রাগসংগীতের সুষমাকে বহুধারূপে ফুটিয়ে তুলতেন তাঁর গানে। তাঁর তানকর্তব ছিল খেয়াল অঙ্গের কিন্তু বিস্তার, লালিত্য, নানারকম টেকনিক ছিল বাংলা গানের। দুই-এর একটা বিচিত্র সমন্বয় তিনি ঘটিয়েছিলেন তাঁর গানগুলিতে। কয়েক বৎসর পূর্বে কালীপদ পাঠক প্রয়াত হয়েছেন ঠিক আশি বৎসর বয়সে। তাঁর গানের স্টাইল ছিল অত্যন্ত অন্তর্গূঢ়। প্রত্যেকটি বিস্তার তিনি মনোবিশ্লেষণ করে করতেন—এই কারণে গানের

ভাবমূর্তি তাঁর গানে যেন রূপ ধরে ফুটে উঠত। করুণ শৃঙ্গার এবং ভক্তিরস— এ দুটিতেই তাঁর বৈদগ্ধ্য ছিল অসাধারণ। তাঁর সুললিত বিস্তার কখনও গানের ভারসাম্যকে অতিক্রম করত না। যাকে অ্যাকাডেমিকভাবে শেখা বলে তিনি তেমনিভাবেই বাংলা গান শিখেছেন—মায় যাত্রা, পাঁচালি পর্যন্ত। তালে ছিলেন অসাধারণ পাকা। যে-কোনো তালে অসামান্য দক্ষতার সঙ্গে গানের সমস্ত ফর্ম ও বাংলার বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ণ রেখে গেয়ে যেতেন। বহু গায়কের তথা গায়িকার গান তিনি শুনেছেন, বহু ভঙ্গির সঙ্গে পরিচিত ছিলেন। জীবনের একেবারে বাল্যকাল থেকে আশি বৎসর পর্যন্ত অপূর্ব নিষ্ঠার সঙ্গে কেবল বাংলা গানের আলোচনা, শিক্ষা ও বিশ্লেষণ নিয়ে কাটিয়ে গেলেন। সংগীতের দিক থেকে এতবড়ো দেশপ্রেমিক ক'জন মেলে?

বাংলার রাগসংগীত যা আমরা ইতিহাসের পটভূমিকায় পাচ্ছি তা রামপ্রসাদের সময় থেকে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। রামপ্রসাদ যে কেবল প্রসাদি সুরের স্রষ্টা হিসাবে বিখ্যাত ছিলেন তাই নয়, তিনি রাগসংগীতেও দক্ষ ছিলেন বলে মনে হয়। তাঁর অনেক গান তথাকথিত প্রসাদি সুরে গাওয়া হয়ে আসেনি, তাঁদের চাল সম্পূর্ণ আলাদা। 'এমন দিন কী হবে তারা' গানটি এখনও অনেকেই গেয়ে থাকেন। পুরাতন সংগীত-সংগ্রহ গ্রন্থাদিতে এর সুর 'সিন্ধু' বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এখনও এটি সিন্ধু-কাফিতেই গাওয়া হয়। টপ্পা গাইয়েরা এ গানটি টপ্পার চালেই গেয়ে আসছেন। এই সিন্ধু-কাফি সুরটি সেকালকার বাংলার একটি অতীব জনপ্রিয় সুর। কত গান যে এই সুরে আছে তা বলা যায় না। এসব সুরের একটা প্রকৃতিই হয়ে গিয়েছিল যা বাংলার নিজস্ব। অনেকে নিঃসংশয়ে শুদ্ধ গান্ধার লাগিয়ে অপূর্ব রস সৃষ্টি করতেন। শ্রীধর কথকের প্রসিদ্ধ গান 'যে যাতনা যতনে' কিংবা কালী মির্জার 'আমি ওই ভয়ে মুদি নে আঁখি', এই দুটিতে শুধু শুদ্ধ গান্ধারই নয়, শুদ্ধ নিষাদের প্রয়োগও বেশ বলিষ্ঠভাবেই দেখা যায়। সব মিলিয়ে ঢংটি ফুটে উঠত সিন্ধু-কাফির। কমলাকান্তের 'মজিল মন ভ্রমরা' (অধিকাংশ শিল্পী 'মজল আমার মন ভ্রমরা' গেয়ে থাকেন), এই গানটিও একটি প্রসিদ্ধ সিন্ধু-কাফি। এতেও একই স্টাইল দেখা যায়। এ সব গানই বাংলার সুপরিচিত শৈলীতে গাইতে হয়। হিন্দুস্থানি ঢঙে গাইতে গেলেই এর সব রস মাটি হয়ে যাবে। তবে এখানে একটি কথা বলে রাখি—অন্যান্য গানের ক্ষেত্রেও এ কথা বলা যায়। পুরাতন বাংলা গান সকলে যে সবগুলি একই সুরে গান এমন নয়, অনেক গানে অনেকে সুর পালটে নিজেদের পছন্দমতো সুর বসিয়ে নেন, কিন্তু কতকগুলি গান আছে, যাদের সুর পালটালে সেটা ঐতিহ্যের প্রতি অবমাননা বলে পরিগণিত হবে; এই প্রচেষ্টা না করাই যুক্তিযুক্ত। ধরা যাক, 'ভালোবাসিবে বলে ভালোবাসিনে' গানটি যদি কেউ চিরপ্রচলিত খাম্বাজে না গেয়ে বাগেশ্রীতে করেন, তা হলে সেটি মেনে নেওয়া কঠিন হবে, এমনটা করাই সংগত নয়। কিন্তু এমন কোনো কোনো গান আছে, যাতে সুরান্তর আছে; তবে তার গাইবার স্টাইল কিন্তু পুরাতন ঐতিহ্যকেই মেনে চলে। যদি কেউ খাম্বাজে না গেয়ে কোনো গান বেহাগে গান, তা হলে সেই বেহাগও তার পুরাতন ট্র্যাডিশনকেই মেনে চলে, অর্থাৎ পুরাতন বাংলা বেহাগের বৈশিষ্ট্যকে ক্ষুণ্ণ করে না। আবার দু একটি সিন্ধু-কাফির উল্লেখ করি যেগুলির কিছু ইতিহাস আছে বা অপর বৈশিষ্ট্য আছে। নিধুবাবুর নামে একটি গান প্রচলিত আছে, সেটি সিন্ধু-কাফিতে গাওয়া হয়, যদিও খুব কম শিল্পীই অধুনা এই গানের সঙ্গে পরিচিত। গানটি হচ্ছে—

শ্রীমতী মন মানেতে মগন
ওখানে এখনও যেয়ো না
বিষাদের বাতি জ্বেলেছেন শ্রীমতী

তাহাতে আহুতি দিও না।
নিবেদন করি ফিরে যাও হরি
দুয়ারে দাঁড়ায়ে থেকো না
কত নারীর সঙ্গ, করেছ কী রঙ্গ
শ্রীমতীর শ্রীঅঙ্গ ছুঁয়ো না।

এমন মধুর সিন্ধু-কাফি বেশি শোনা যায় না। কথিত আছে নিধুবাবুর প্রণয়িনী শ্রীমতী বহুদিন পর্যন্ত তাঁর জন্য অপেক্ষা করে ছিলেন, কিন্তু তিনি ফিরলেন বেশ-কিছুদিন কাটিয়ে। অথবা কোনো কারণে শ্রীমতী নিজেকে খণ্ডিতা মনে করেছিলেন। এইরকম কোনো-একটি ঘটনায় শ্রীমতীর অভিমানকে উপলক্ষ করে এই গানটি রচিত হয়েছিল। এইরকম আর-একটি নিধুবাবুর গান আছে—'ভাবিতেছিলাম যারে সেই আমি প্রকাশিল' (ঝিঁঝিট খাম্বাজ)। এটিও শ্রীমতীর অভিমানকে অবলম্বন করে রচিত বলে শোনা যায়। কিন্তু 'শ্রীমতীর মন মানেতে মগন' গানটি এই লেখকের কাছে নিধুবাবুর রচনা বলে মনে হয় না, কারণ নিধুবাবু ঠিক রাধাকৃষ্ণকে উপলক্ষ করে গান লেখেননি। এই গানটি অপর কারও রচনা বলেই মনে হয়। এই অংশটি রাসু-নৃসিংহের পালায় একটি বড়ো মানসম্বাদের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এখানে একটি-দুটি বাড়তি পদও আছে যা টপ্পায় গাওয়া হয় না। কিন্তু তা হলেও এটি একটি বহুকালের ট্র্যাডিশন— এর সম্বন্ধে নিঃসংশয়ে সত্য উক্তি করা কঠিন ব্যাপার। দাশু রায়ের পাঁচালিতে একটি গান আছে— 'ও গো সজনি রাই অঙ্গ সাজাব দিয়ে কী ভূষণ'। এর সুরও মোটামুটি সিন্ধু-কাফি, কিন্তু 'ও গো সজনি' এই অংশটুকু দোলায়িত টপ্পায় কোমল ধৈবত ছুঁয়ে যায়। হঠাৎ যেন পিলুতে ঠুংরির আমেজ ফুটে উঠেছে। বরাবরই এই গানটিতে একটু কোমল ধৈবতের স্পর্শ লেগে একে মনোহারিত্ব প্রদান করেছে। তবে পাঁচালি গান হওয়াতে গানটিতে বেশ-একটু অভিনয়ের ঢং আছে। সেইটি বজায় রেখেও ক্ল্যাসিকাল স্টাইলে এই গানটি বেশ ভালো করেই গাওয়া যায়। ঠুংরির উল্লেখে একটি কথা মনে পড়ে গেল। কোনো কোনো প্রাচীন গায়ককে জিজ্ঞাসা করেছিলুম টপ্পা-ঠুংরির মিশ্রণে বাংলায় কোনো গান রচিত হয়েছিল কি না। তাঁরা কেউই এ বিষয়ে তেমন উৎসাহ প্রকাশ করেননি, যেমন টপ্পায় 'সরগম' করার প্রস্তাবে তাঁদের উৎসাহ দেখিনি; তবে একটি গান শুনেছিলাম যাকে টপ্পা-ঠুংরি বলা যায়। গানটির কথা আমার মনে নেই, প্রথম লাইন—'আমি তিলেকেরি তরে তারে দেখেছি সজনি'। অমিয়নাথ সান্যাল মহাশয় এই গানটি চমৎকার গাইতেন। এটি তাঁর একটি প্রিয় গান ছিল। গানটি বোধ হয় তেমন প্রাচীন নয়, কারও গ্রামোফোনে রেকর্ড ছিল। এমন কত গানই আছে। বিনোদিনীর গাওয়া 'ধীরে ধীরে করো পার' (বেহাগ-খাম্বাজ) এইরকম একটি চমৎকার গান। এসব গানের স্টাইল পুরোনো দিনের—এই হচ্ছে তাদের বৈশিষ্ট্য।

সিন্ধু-খাম্বাজও পুরাতন বাংলা গানে অপ্রচলিত নয়। কিন্তু, এই রাগনির্দেশ নিয়ে অনেক মতভেদ হয়। অধিকাংশ গান টপ্পা হওয়াতে সুরগুলি এমনভাবে প্রযুক্ত হয়েছে যে তা মিশ্ররাগের আইনকানুনও অনেক সময় মানেনি। যেমন ভৈরবীর ক্ষেত্রে বলা যায়। বাংলায় ভৈরবীতে প্রায়শই শুদ্ধ 'রে' লাগানো হয়েছে, এমনকি শুদ্ধ 'নি'-ও যে বাদ গেছে তা নয়, তথাপি সব মিলিয়ে ভৈরবীর রূপটি পরিস্ফুট হয়েছে। বাংলায় পূরবীতে শুদ্ধ ধৈবত লাগানো একটি বিরুদ্ধ ব্যাপার ছিল না বরং সেটাই ছিল স্বাভাবিক; শুদ্ধ মধ্যমও উত্তমভাবে লেগেছে স্থানে স্থানে। কিন্তু তা সত্ত্বেও সেটি পূরবী। গৌড়ীরীতি শুদ্ধতার দিকে তেমন মনোযোগী হয়নি, কিন্তু আদলটা বজায় রেখে গেছে।

সিন্ধু-ভৈরবী বলে চিহ্নিত বহু গান প্রচলিত আছে, কিন্তু এর ঠাট সম্বন্ধে নিশ্চিত হওয়া কঠিন ব্যাপার, কেননা অনেক সময় এতে পিলুর আমেজ আসে, আবার অন্তরার দিকে কোনো কোনো গানে কালাংড়ার আভাস পাওয়া যায়। এ সব রাগ সম্পর্কে এক-এক জন এক-একরকম মত পোষণ করেন। বহু গানই কাফি বা সিন্ধুর সঙ্গে যুক্ত হয়ে নানাভাবে গাওয়া হয়ে এসেছে, যথা কী করে কলঙ্কে যদি (শ্রীধর কথক), পোড়া লোকে তারে বলে পর (শ্রীধর কথক), দে গো বৃন্দে আমায় দে নারী সাজায়ে (রসিক রায়), অন্নদার দ্বারে আজি (সাতুবাবু : আশুতোষ দেব) ইত্যাদি। শেষের গানটি অর্থাৎ 'অন্নদার দ্বারে আজি পাতকী পেতেছে পাত' গানটিকে সিন্ধু-কাফি বলাই বোধ হয় যুক্তিযুক্ত। এটি ঝাঁপতালে নিবদ্ধ। সুদক্ষ গাইয়েরা এ গানটি গাইবার সময় ঝাঁপতালেও ছোটো ছোটো বোলতান করতেন। লয় রেখে এইসব গান গাওয়া কঠিন ব্যাপার এবং সংগীতে মুনশিয়ানা না থাকলে এইসব গাইতে যাওয়াই বিড়ম্বনা। তবে, আবার বলি, সংগীত গেয়ে দেখাবার বিষয়, বলে বোঝাবার নয় এবং পুরোনো বাংলা গানে বহুক্ষেত্রেই সুরান্তর বর্তমান। সাতুবাবুর যে গানটির উল্লেখ করলুম সেটি হয়তো অনেকে ঝাঁপতালে গান না, এমনকি সিন্ধু-কাফিতেও না শিখে থাকতে পারেন—বর্তমান লেখক যেভাবে এসব গান শুনেছেন তিনি কেবল সেইভাবে বিবৃতি দিতে পারেন। কিন্তু বলার উদ্দেশ্য হচ্ছে এই যে, পুরাতন বাংলা গানে ঝাঁপতাল যথেষ্ট প্রযুক্ত হয়েছে এবং এই তালে গাইবারও কতকগুলি আর্ট ছিল যা প্রধানত বাংলা গানে দেখা যায়।

খাম্বাজের মতো এত জনপ্রিয় রাগ বোধ হয় বাংলায় কোনোটি ছিল না। একজন প্রবীণ গায়ক কথাপ্রসঙ্গে আমাকে বলেছিলেন যে সারা জীবন খাম্বাজ গেয়েও তিনি এই রাগের কত বৈচিত্র্য আছে তা নির্ধারণ করতে পারেননি। সেকালে যাঁরা বাংলা গান শিখেছেন তাঁরা তিনটি গান অবশ্যই জানতেন, একটি—ভালোবাসিবে বলে ভালোবাসিনে, দ্বিতীয়—তোমারই তুলনা তুমি প্রাণ এবং তৃতীয়—ননদিনি বোলো নগরে। তিনটি গানের গাইবার কায়দা একই রকম এবং তিনটিই টপ্পা। সাধারণত খাম্বাজের যে 'সরগম' পরিচিত বা বাজনার গত-এ যে রীতি দেখা যায়, টপ্পার রীতি সে রকমের নয়। বাংলা টপ্পায় সাধারণত খাম্বাজ গান্ধার থেকে আরম্ভ করা হয়, তার পর কিছু টপ্পার কাজ হয়ে সমের ঝোঁকটা পড়ে পঞ্চমে। তার পরে ধৈবতে আরোহণ ঘটে এবং কোমল নিষাদকে কেন্দ্র করে টপ্পার দানাগুলি লীলায়িত হয়ে মধ্যম পর্যন্ত নেমে আবার চড়ায় 'সা'-য় আরোহণ করে খাম্বাজের কায়দায় নামতে থাকে এবং পুনরায় গান্ধারে এসে কিছু জমজমার পর খাদের সা-তে প্রত্যাবর্তন ঘটে। এটি স্থানীয় বিশেষত্ব। অন্তরায় নিষাদ অত্যন্ত তীব্র এবং নিষাদ থেকে সা-তে আরোহণে অনেক কায়দাকানুন দেখা যায়। অনেকে নি-তে একটা সাসপেন্স তৈরি করেন যাতে শ্রোতা সা-তে পৌঁছোবার জন্য অধীর প্রতীক্ষা করেন। তার পর কোমল নি লাগে ভারী সুন্দরভাবে এবং সেটি লাগে বক্রভাবে। খাম্বাজের টপ্পায় ধৈবতও বেশ তীব্রভাবেই লাগে কিন্তু অব্যবহিত পরের কোমল নিষাদ বেশ মধুর এবং মোলায়েমভাবে লাগানো হয়। বাংলা টপ্পা আজকাল এত অপ্রচলিত যে তরুণ সমাজের অনেকে হয়তো এই রীতির সঙ্গে আদৌ পরিচিতই নন। বহু-সংখ্যক টপ্পার মধ্যে কয়েকটি বিখ্যাত গান মনে পড়ছে—যার বেশ-কয়েকটিতে কিছু বিশেষত্ব বর্তমান, যথা—পূজিব পিরিতি প্রেম (নিধুবাবু বা শ্রীধর কথক), বিধি দিলে যদি বিরহ যাতনা (নিধুবাবু বা শ্রীধর), সেই কালো রূপ সদা পড়ে মনে (শ্রীধর কথক), সে কেন রে করে অপ্রণয় (শ্রীধর কথক), আর মালা গাঁথ কী কারণ (গোবিন্দ অধিকারী) ইত্যাদি। এই গানগুলির মধ্যে শ্রীধর-রচিত 'সেই কালো রূপ সদা পড়ে মনে' গানটির মধ্যে একটি চমৎকার বিশেষত্বের সন্ধান পেয়েছিলুম।

সেটি হচ্ছে এই গানে একটি সঞ্চারীর অস্তিত্ব। বাংলা টপ্পায় সঞ্চারীর সন্ধান কদাচিৎ মেলে—যদিচ একাধিক অন্তরার অস্তিত্ব প্রায়ই দেখা যায়। এই সঞ্চারীটিতে ঝিঁঝিটের অঙ্গ প্রবল, অর্থাৎ এক কথায় এই গানটিকে ঝিঁঝিট খাম্বাজ বলা চলে। ঝিঁঝিটের এমন মনোহর প্রয়োগ পুরাতন বাংলা গানের বিরাট ভাণ্ডারেও দুর্লভ। ঝিঁঝিট বাংলার একটি অতি জনপ্রিয় রাগ ছিল, প্রায়ই এর নানাবিধ প্রয়োগ দেখা যেত। নিধুবাবুর 'ভাবিতেছিলাম যারে সেই আসি প্রকাশিল', শ্রীধর কথকের 'নয়নেরে দোষ কেন', 'প্রেম গেলে হাসবে লোকে' ইত্যাদি গানে ঝিঁঝিটের প্রয়োগ দেখা যায়। আমাদের প্রচলিত সপ্তকে গাইতে গেলে খাদের অংশে ঝিঁঝিটের কাজগুলি ভালো করে ফোটানো যায় না বলে অনেকে মধ্যম-কে 'সা' করে গাইতেন। এতে অনেক সময় অন্য একটি ধুনের আভাস পাওয়া যেত, কিন্তু ভালো করে শুনলে ঝিঁঝিটের বিশেষ লক্ষণটি সহজেই প্রতিভাত হত—বিশেষ করে খাদের 'সানি-ধাপা' বা কেবলমাত্র 'পাধাসা' অঙ্গে। বলা বাহুল্য, এই নিষাদটি কোমল নিষাদ। দু একটি হোলির গান আছে যেগুলিতে খাম্বাজের সঙ্গে ঈষৎ পিলুর ছোঁওয়া লেগেছে। উদাহরণস্বরূপ 'হোরি খেলিবেন আজ শ্রীহরি' (মহারাজ মহতাবচন্দ) গানটির উল্লেখ করা যায়। এক-এক সময় এই গানটিকে ঠুংরি অঙ্গের বলে মনে হয়; অন্তত ঠুংরির বেশ-কিছু কাজ করার অবকাশ এ গানটিতে আছে; তথাপি এটি টপ্পা বলেই চিহ্নিত। এই গীতিকারেরই আর-একটি এই ধরনের গান—'শ্রীহরি খেলিব হোরি আমরা গোপী সকলে'। এইসব তালই আর নেই, তার সঙ্গে নৃত্যছন্দে সেই তালের প্রয়োগও অবলুপ্ত হয়েছে। আরও একটি গান মনে পড়ছে, এঁরই লেখা—'চল সবে বৃন্দাবনে যাই'। এটি সিন্ধুড়ায় গাওয়া হত। একদা এই রাগটির প্রচলন বাংলা দেশে যথেষ্ট ছিল, এখন আর শোনাই যায় না। এর বক্রগতিতে চলন এবং মধ্যসপ্তক থেকে তারসপ্তকে সংক্রমণ গানে একটি চমৎকার মেজাজ এনে দেয়। এই গানটিতে একটা খেয়ালের ভঙ্গিমা পাওয়া যায় এবং গায়ক ইচ্ছা করলে ওই ধরনের গানকে খেয়াল করেও গাইতে পারেন। নিছক খাম্বাজের রীতিতেও যে কম পুরোনো বাংলা গান আছে এমন নয়। উদাহরণস্বরূপ দয়ালচাঁদ মিত্রের রচনা 'কী কর কী কর শ্যাম নটবর' গানটির উল্লেখ করা যেতে পারে। একতালে মধ্যলয়ে অথবা দ্রুতলয়ে পুরোপুরি খাম্বাজের ঢঙে এই গানটি গাওয়া যেতে পারে।

প্রধান রাগগুলির মধ্যে একটি রীতিতে খুব আকৃষ্ট হয়েছিলাম, এটি গৌড়মল্লারকে অবলম্বন করে রচিত। এর তালও এমনভাবে বাঁধা যে তাতেও রাগটি যেন বিচিত্রভাবে ফুটে উঠেছে। তালটি সাধারণ ত্রিতাল। কিন্তু আড়িতে চলেছে, যার ফলে একটা বিচিত্র দোলনভঙ্গির পরিচয় পাওয়া যায়। অবশ্য গৌড়মল্লার বলা হলেও মতভেদের অবকাশ আছে, কিন্তু এতে উক্ত রাগের আভাস যে বহুল পরিমাণে পরিস্ফুট এটি অস্বীকার করার উপায় নেই। এই রীতির কয়েকটি গান হচ্ছে—'কত ভালোবাসি তারে' (শ্রীধর কথক), 'মিলন না হতে সই' (শ্রীধর কথক), 'কে তোমারে শিখায়েছে এ প্রেম ছলনা' (শ্রীধর কথক)। এক রচয়িতার রচনা অথবা এক গায়কিতে প্রতিফলিত বলেই বোধ হয় তিনটি গানের চলনই এক রকমের। এই গানগুলিও হয়তো অনেকে অন্যান্য রাগে শিখে থাকবেন কিন্তু গৌড়মল্লারের এই যে ধরনটির কথা বলা হল, এটি বাংলায় একটি বিশেষ শ্রেণি বলেই প্রচলিত হয়ে গিয়েছিল। প্রেমের কতকগুলি আবেদন আছে যা মল্লার অঙ্গের গানে বিশেষভাবে ফুটিয়ে তোলা যায়, তারই প্রতিফলন ঘটেছে এইসব গানে এবং তালের প্রয়োগও এইসব অনুভূতিকে ফুটিয়ে তুলতে প্রচুর সাহায্য করেছে। পুরাতন বাংলার একটি জনপ্রিয় রাগ হচ্ছে সুরটমল্লার। এর সুর একেবারে ফর্মুলায় ফেলা, তবে কেউ কেউ দেশ-রাগের আভাস একটু

বেশি পরিমাণে আনতেন মাধুর্য বাড়াবার জন্য। নীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায়ের 'দে গো মোহন চূড়া বেঁধে' বা 'কতদিনে হবে এ প্রেম সঞ্চার' গানগুলি একসময় খুবই জনপ্রিয় ছিল। কেউ কেউ এ সব গান খুব সাধারণভাবে গেয়ে যেতেন, আবার কেউ কেউ খুব মিষ্টি করেও গাইতে পারতেন—তবে এ সব গানে তেমন তান বিস্তার করতে প্রায়ই দেখা যেত না। যাত্রা, পাঁচালির গানে সুরটমল্লার একটু বেশি দেখা যেত। দাশরথি রায়ের পাঁচালিতে একটি বিশেষত্বসম্পন্ন সুরটমল্লার ছিল—'বল দেখি রে শুকসারি তোরা তো কুঞ্জেতে ছিলি'—গানটি ঝাঁপতালে একটি কাতর আবেদন ফুটিয়ে তুলত। এই ধরনের গানের গায়কি অন্যরকম। একটি অভিনয়ের ভাব থাকার জন্য ঠিক রাগসংগীতের ভঙ্গিতে এসব গান গাওয়া হত না, কিন্তু রাগের রূপ বা রস তাতে যে ব্যাহত হত এমন নয়। পুরোনো বাংলা গানে রাগসংগীতে প্রায়ই এরকম নাটকীয় ভঙ্গি দেখা যায়, যাতে সাবজেকটিভের চেয়ে অবজেকটিক প্রকাশই অধিক পরিমাণে ঘটেছে। দাশু রায়ের পাঁচালিরই একটি বিখ্যাত গান—'ওই দেখ আসছে আয়ান বংশীবয়ান কুঞ্জ মাঝে'; গানটির মূল সুর কালেংড়া, কিন্তু গানটি যখন শ্রোতারা শোনেন তখন কালেংড়া অথবা অন্য কোনো সুরের মিশ্রণ হয়েছে সেটি জানতে ইচ্ছে করে না, কেবল গানের ভঙ্গিটি উপভোগ করতে ইচ্ছে করে। গোপাল উড়ের যাত্রায় বহুবিধ কালেংড়া সম্পর্কেও একই কথা বলা যায়।

বাংলার পুরোনো গানে পিলু এবং পিলু বারোঁয়া বেশ-কিছু পাওয়া যায়। এই সুরটি প্রধানত সেকালে সানাইওয়ালারা বাজাত বেশ মিষ্টি করে। এই ধরনের একটি সুন্দর গান শুনেছিলাম—'স্বপনে তাহার মনে হইল মিলন'। এটিকে পিলুখাম্বাজ বলাই বোধ হয় উচিত হবে। গানটি লিখেছিলেন সাতুবাবু। এঁর কয়েকটি রচনা শিল্পীমহলে যথেষ্ট জনপ্রিয় হয়েছিল। এইসব গানে বেশ-খানিকটা ঠুংরির ছায়াপাত ঘটেছে। অতুলপ্রসাদ সেনের বিখ্যাত গান 'কে আবার বাজায় বাঁশি' বা 'ও গো আমার নবীন শাখী' কিছু-সংখ্যক পুরাতন বাংলা গানের সুরের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। আমাদের প্রধান কবি-সুরকারদের মধ্যে অতুলপ্রসাদের রচনায় পুরাতন বাংলা গানের অনেক স্টাইল পাওয়া যায়। ঠিক এমনটি আর কারও গানে দেখতে পাওয়া যায় না। তাঁর 'যাব না যাব না যাব না ঘরে'— এই গানের ধরনও আমাদের প্রাচীন সংগীতে দুর্লভ নয়। একবার প্রখ্যাত টপ্পাগায়ক কালীপদ পাঠক এই লেখককে বলেছিলেন যে তিনি লখনউয়ে সেন মহাশয়কে কিছু প্রাচীন বাংলা গান শুনিয়েছিলেন। অতুলপ্রসাদ বিস্ময় প্রকাশ করে বলেছিলেন তিনি ওইসব-ধরনের পুরোনো বাংলা গান এর আগে আর শোনেননি। কিন্তু আশ্চর্য লাগে, বহুশ্রুত না হলে বাংলা গানের কতিপয় পুরাতন শৈলী তাঁর গানে এল কী করে? তবে কি এক সময় বাংলা গানে উত্তর-ভারতীয় পূর্বী ঢঙের বিচিত্র রীতিনীতির প্রভাব পড়েছিল? হয়তো হয়ে থাকবে কিন্তু কীভাবে তা সম্পাদিত হয়েছিল তা আজ আর বলা সম্ভব নয়। যাই হোক, অতুলপ্রসাদের বহু গানের সঙ্গে পুরাতন বাংলা গানের বেশ-কিছু টেকনিকের মিল আছে—এমনকি সে ক্ষেত্রে 'সফিস্টিকেশন' পর্যন্ত আছে বলে মনে হয় না। তিনি পুরোনো বাংলা গানের সঙ্গে গভীরভাবে না হলেও মোটামুটিভাবে যে পরিচিত ছিলেন, এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই বলেই ধারণা হয়।

বাংলায় ব্যবহৃত বহু রাগের মধ্যে বেহাগের প্রয়োগ অতুলনীয়। বাংলার বেহাগে কোমল নি প্রায় সব গানেই লাগতে দেখা যায় এবং খাদের দিকে তিলক কামোদের ধরনে 'পানিসারেগামা' অঙ্গটিও লাগে। একাধিক বাংলার প্রাচীন বেহাগে সঞ্চারীর প্রয়োগে বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। রমাপতি বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচিত 'সখি শ্যাম না এল' গানটিতে এর ব্যতিক্রম হয়নি। একদা এই গানটি গায়ক-

মহলে বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল। অবশ্য কেউ যদি গোঁড়া নিয়মে এ সব গান গেয়ে থাকেন তা হলে বলবার কিছু নেই, কিন্তু আগের রীতিটি ছিল সাধারণ চলন। কালী মির্জা-রচিত 'এমন নয়নবাণ কে তোমায় করেছে দান' গানটি খেয়ালের রীতিতে বেহাগে গাইতে শুনেছি। এতে কোমল নি-র প্রয়োগ ছিল না। অধুনা প্রচলিত বেহাগের ঢঙেই এই গানটি গাওয়া হত। একাধিক সংগীত-সংগ্রহ গ্রন্থে এই গানটির সুর 'সিন্ধু ভৈরবী' দেওয়া আছে। হয়তো এর সুরান্তরও ছিল। বাংলার পুরোনো বেহাগে দুই মধ্যমের ব্যবহারই দেখেছি, কেবলমাত্র শুদ্ধ মধ্যম প্রয়োগে গাইতে বড়ো একটা শুনিনি। শ্রীধর কথকের দুটি বিখ্যাত বেহাগ আছে, একটি 'সখি আমায় ধরো ধরো' অপরটি 'করি কী উপায়'। প্রথমোক্ত গানটি মেলোডির দিক থেকে চমৎকার। এতে সঞ্চারী বর্তমান। দ্বিতীয়টি এমনভাবে গাওয়া হয়েছে, যাতে স্পষ্ট বোঝা যায়, কথকতার মধ্যে একটি বিশেষ ত্রস্ত ভাব ফোটাবার জন্য এটিতে সুর প্রয়োগ করা হয়েছে। এর সঞ্চারী অংশটিও খুব মধুর লাগে। এসব গানই কিন্তু পুরোপুরি কাব্যসংগীত, এগুলিতে রাগসংগীতের রীতিতে তানবিস্তার একটু বেশি পরিমাণে করলে রসহানি ঘটবার সম্ভাবনা। সাতুবাবুর রচিত 'হেরিব না কালো বরন' গানটির মতো মনোহর বেহাগ পুরাতন বাংলা গানে খুব কমই আছে। এতে দুটি অন্তরা বর্তমান, সঞ্চারী নেই, কিন্তু ভালো করে গাইতে পারলে এতে এত অপূর্ব করুণ রসের সঞ্চার করা যায় যে শ্রোতার চোখ অশ্রুতে বিগলিত হয়ে ওঠে। বেহাগ-খাম্বাজের নিদর্শনও কম নেই এবং এই মিশ্র রাগটিও শিল্পীদের খুব প্রিয় ছিল।

ভূপালিতে কালী মির্জার একটি বিখ্যাত গান শোনা যেত—'বিপিনে বাজে বাঁশরি'। কোনো কোনো বইতে এর সুর দেওয়া আছে ভৈঁরো; কিন্তু এই সুরে এই গানটি কাউকে গাইতে শুনিনি। এটিও খেয়ালের ঢঙে বাঁধা এবং বাংলা খেয়ালের একটি প্রকৃষ্ট নিদর্শন। তবে এ গানটি শোনবার সময় এই লেখকের মনে হয়েছে এটিতে যেন বিভাসের রূপটিই বেশি করে প্রতিভাত হয়েছে। বিভাস বলে পরিচিত করলেও হয়তো এর রসহানির সম্ভাবনা নেই। বাংলার বিভাস একটি বিচিত্র রূপ। এর আরোহণ অবরোহণ অনেক সময় ঠিক ভূপালির মতোই; আবার অবরোহণে নিষাদ লাগাবার রীতিও যথেষ্ট প্রচলিত। এর একটা গায়নভঙ্গি আছে যাতে একটা লোকসংগীতের আভাস ফুটে ওঠে, যেমন নীলকণ্ঠ-রচিত—'তোমায় হেরে অঙ্গ জ্বলে' গানটি। বহু আগমনির গান বিভাসে গাওয়া হত। বাঙালি শিল্পীরা এই রাগটি এমনভাবে রূপায়িত করতেন যাতে কল্যাণ অঙ্গের ভূপালির প্রভাব এর ওপর লক্ষিত হত না এবং সান্ধ্য আভাসের বদলে একটা রোদে-ঝলমল প্রভাতের আভাসই ফুঠে উঠত। এই রাগের গায়কি আজ আর বাঙালি গায়কদের মধ্যে প্রত্যক্ষ করা যায় না বললে অত্যুক্তি হয় না। এটুকু লিখেই মনে পড়ল যাত্রাওয়ালা বদন অধিকারীর গান—'শ্যাম চরণ ছাড়িয়ে কেন দাও না'। এ গানটি যখন বিভাসে গাইতে শুনি তখন অঙ্গ রোমাঞ্চিত হয়ে উঠেছিল। এর একটি অনুপম সঞ্চারীও ছিল। যাত্রার প্রয়োজনেই গানটি রচিত হয়েছিল বোঝা যায়, কিন্তু সুরকার যে বিভাসেরও একটি প্রকৃষ্ট নিদর্শন এতে রেখে গেছেন তা হয়তো তিনি নিজেও ততটা বোঝেননি। আজ এ যুগে যখন এইসব প্রাচীন সুর বা গায়কির বিশ্লেষণ করা যায় তখন বোঝা যায় কত মানবিক আবেদনে পূর্ণ ছিল এইসব অভিনয়ে প্রযুক্ত গান। এ গানেরও সুরান্তর আছে বলে শুনেছি, কিন্তু সেটি কারও কাছে শুনিনি।

ভৈরবীর কথা বোধ করি বিশেষভাবে বলাই বাহুল্য। তাবৎ গীতিকারই বোধ হয় ভৈরবীতে কিছু-না-কিছু গান রচনা করে গেছেন। কিন্তু বাংলার ভৈরবী একেবারেই গোঁড়াভাবে চলে না,

বিশেষ করে টপ্পায়। শুদ্ধ নি যদি-বা কমই লেগেছে শুদ্ধ রে-র প্রয়োগ তো যত্রতত্র দেখা গেছে। সাতুবাবুর রচিত 'নয়নে আমায় বিধি' গানটি ভৈরবীতে শুনেছি; যাঁর কাছে শুনেছি তিনি খাদের দিকে একটি চমৎকার অলংকার সহযোগে শুদ্ধ রে-র প্রয়োগ করতেন। বাংলায় এটি একটি বিশিষ্ট গায়কি। রবীন্দ্রনাথ ভৈরবী-সিদ্ধ ছিলেন। তাঁর কত গানে কত রকমে তিনি ভৈরবীর চমকপ্রদ নিদর্শন রেখে গেছেন। যখন নিজে গাইতেন তখন ছোটো ছোটো টপ্পার দানায় ভৈরবীর অপূর্ব কাজগুলি ফুটিয়ে তুলতেন। বিশেষ করে, তাঁর মধ্যম এবং কোমল গান্ধারের আন্দোলনের সঙ্গে কোমল রেখার ছুঁয়ে সা-তে আসা—শুনলে রোমাঞ্চ জেগে উঠত। ভৈরবী ছাড়া জৌনপুরী, আশাবরি— এই দুটি রাগেও বেশ-কিছু গান একসময় রচিত হয়েছে। নিধুবাবুর একটি গান আছে— 'আমার নয়ন মানে না— বল বুঝালে কী হবে সই'-এ গান একাধিক সুরে গাওয়া হয়েছে। এই লেখক যাঁর কাছে শুনেছেন তিনি এ গানটিতে জৌনপুরিকে প্রধান রেখে ভৈরবী মিশিয়েছেন। এই মিশ্রণটি একটি অপূর্ব জৌনপুরি-ভৈরবীর নিদর্শন। গানটির আর-একটি বৈশিষ্ট্য হল টপ্পার সঙ্গে কয়েকটি অসামান্য মিড়ের কাজ। টপ্পার তান এবং মিড় ঠিক হাত-ধরাধরি করে চলে না কিন্তু এ গানে তার একটা সার্থক পরিচয় তুলে ধরা হয়েছে। এইসব বৈশিষ্ট্যই হচ্ছে বাংলা গানের বিচিত্র টাইপ। ভঁৈরো রাগে কমলাকান্তের 'জান না রে মন পরম কারণ' একটি চমকপ্রদ সৃষ্টি। প্রায় ধ্রুপদের মতো গম্ভীর চালে গানটি চলেছে তার অপূর্ব প্রশান্তি নিয়ে। এতে কোমল নি-র প্রয়োগ আছে। ভৈঁরোতে কোমল নি অনেকেই একটু-আধটু লাগিয়ে থাকেন তার আবেদনটি অক্ষুণ্ণ রেখে। ঠিক এই গানের মতো আর-একটি রচনা পুরাতন বাংলা গানে খুব অল্পই মেলে। পরবর্তীকালে কালীকীর্তনে ধ্রুপদাঙ্গ অথবা বেশ গম্ভীরী চালের গান প্রচলিত হয়েছে, কিন্তু সেগুলি বাংলার শিল্পী-মহলে তেমন প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়নি।

পুরাতন বাংলার আর-একটি বিশিষ্ট রাগ হচ্ছে ভীমপলশ্রী যাকে অনেক বইতে মূলতান বলে উল্লেখ করা হয়েছে। রসিক রায়-রচিত 'আয় মা সাধন সমরে' বা 'কী হবে কী হবে ভবরাণী ভবে' আজও অনেকে গেয়ে থাকেন। রাধামোহন সেন একটি গান লিখেছিলেন—'কেন ভুরু ধনু টান হানিবে কি বাণ'? এটিকে ভীমপলশ্রী রাগে মধ্যলয়ে খেয়ালের ঢঙে গাইতে শুনেছি, রীতিনীতি প্রায় আজকালকার মতোই, তবে গায়কিতে একটু প্রাচীনত্বের ছাপ ছিল এই যা। এই ধরনের গানগুলি কিন্তু আজও যাঁরা রাগপ্রধান গান করেন, তাঁরা অনায়াসে করতে পারেন।

আমাদের সংগীতে আজকে যেমন গানের রূপায়ণ সম্বন্ধে সচেতনতা এসেছে, এই শতাব্দীর প্রথম দিকে তা ছিল না; শিল্পীরা অনেক সময় প্রচলিত সুরের পরিবর্তন করেছেন এবং গায়কিতেও পরিবর্তন এনেছেন। এর ফলে বিকৃতি কম ঘটেনি। একাধিক গ্রন্থে প্রচুর পরিশ্রম সহকারে এইরকম সংকলনের প্রয়াস দেখা যায়। এ সম্পর্কেও অনেকের অভিযোগ—এইসব সংগ্রহ-গ্রন্থে অনেক সময় সম্পাদনার শ্রম বা ছাপার ভুলে বহু গোলমাল থেকে গেছে। অনেক সময়, এক গানের সুর তাল, আর-এক গানের মাথায় বসিয়ে দেওয়া হয়েছে। বহু গানের মূল রচয়িতা কে, এ নিয়ে প্রচুর বাদানুবাদ হয়ে এসেছে। যদি আমাদের উচ্চশিক্ষার সঙ্গে সংগীতশিক্ষার একটা সুষ্ঠু সমন্বয় সাধিত হত তা হলে কেউ কেউ হয়তো প্রাচীন বাংলা গানের বিশিষ্ট রীতিনীতি সম্বন্ধে অবহিত হয়ে আমাদের সংগীতের ক্লাসিকাল যুগ যাতে অবহেলিত না থাকে, সে সম্বন্ধে উপযুক্ত কার্যধারা অবলম্বন করতেন। সে ক্ষেত্রেই হয়তো পুরাতন গানে সেই পুরোনো স্টাইলকে আমরা কতকাংশে পেতুম, যাকে ভালগারিটি আবিল করেনি এবং যার একটা চিরন্তন বৈশিষ্ট্য ও সৌন্দর্য বর্তমান।

রবীন্দ্র-প্রবর্তিত নৃত্য

শান্তিদেব ঘোষ

ভারতীয় প্রাচীন নৃত্যশাস্ত্র গ্রন্থে নাচকে দু-ভাগে ভাগ করে, একটিকে বলা হয়েছে 'নৃত্য', অপরটিকে 'নৃত্ত'। অর্থাৎ ছন্দময় দেহভঙ্গির সুষমার সঙ্গে যখন নানা রসের গানের অভিনয় যুক্ত হত, তখন তাকে বলা হত 'নৃত্য', আর 'নৃত্ত' হল অভিনয়বিহীন ছন্দময় দেহভঙ্গি। এই দুটি ধারার নাচ ভারতের সর্বত্রই প্রচলিত। 'নৃত্য'-ধর্মী নাচের প্রকাশ আমরা দেখি কেরল প্রদেশের কথাকলি, তামিলনাড়ুর ভরতনাট্যম, অন্ধ্রপ্রদেশের কুচ্চিপুড়ি, কর্ণাটকের যক্ষগণ, উড়িষ্যার ওড়িশি, পশ্চিম ভারতের কত্থক ও মণিপুরের মহারাস নৃত্যে। এছাড়া, ভারতবর্ষের প্রায় প্রতিটি প্রদেশে, আরও যতপ্রকার প্রাচীন লোকনাট্যের প্রচলন আছে, তাতে গানের সঙ্গে অভিনয়-নৃত্যের প্রাধান্য সুবিদিত। অর্থাৎ তার নাচ 'নৃত্য'-প্রথার অন্তর্গত।

আমাদের দেশে, প্রাচীন শৈলীর যত প্রকারের পুতুলের নাটক ও ছায়ানাটক আছে তাতেও গানের সঙ্গে নাচ থাকে। তার সঙ্গে অভিনয়ের আভাসও পাওয়া যায়। ওড়িশা ও পশ্চিমবঙ্গে মুখোশ-পরা ছৌ নামক নাটক আগাগোড়া নাচের ভঙ্গিতে অভিনীত হয়, তালবাদ্যের ছন্দ সহযোগে। এই নাটকে গানের কোনো স্থান নেই। উদয়শংকর যে নাচের প্রবর্তন করেন, অভিনয়ধর্মী নাচ হলেও গানকে তিনি তাঁর নাটকের নাচে একেবারেই স্থান দেননি। তিনি নানাপ্রকার তালবাদ্য ও নানাবিধ সুরের যন্ত্রের সংগীতের ছন্দে তাঁর নাচগুলি রচনা করতেন। চলচ্চিত্রের গানে আমরা হামেশাই অভিনয়নৃত্য দেখি।

ভারতে রাজামহারাজা, নবাব, জমিদার ও ধনীদের চিত্তবিনোদনের প্রয়োজনে একসময় ছিল 'বাইজি' নাচ। পশ্চিমবঙ্গের পুরুলিয়া ও রাঢ় অঞ্চলে, অবস্থাপন্ন গ্রামবাসীরা যে 'নাচনি' ও 'খেমটা' বা 'ঝুমুর' নাচের পৃষ্ঠপোষকতা করেন, তাকেও বলব গানের সঙ্গে অভিনয়ের নাচ। এ ধরনের একক নৃত্য অন্যপ্রদেশের গ্রামাঞ্চলেও আছে, ভিন্ন নামে। অভিনয়ধর্মী নাচের যে বিবরণ দেওয়া হল, এগুলি হল, পুরোপুরি পেশাদারি নাচ। এর জন্য নানাভাবে অর্থ ব্যয়

করতে হয়। গানবাজনা ও নাচের, গুরুর সাহায্যে, অভিনয়ের শিক্ষা নিতে হয়, দর্শকসমাজের সামনে তাকে খাড়া করবার পূর্বে। এছাড়া প্রয়োজন হয়, সাজানো-গোছানো মণ্ডপ, মঞ্চপ্রাঙ্গণ, তা সে মন্দিরেই হোক, শহরেই হোক বা গ্রামেই হোক।

'নৃত্য' পর্যায়ের অভিনয় যে সর্বত্রই শাস্ত্রানুযায়ী একই রীতিতে গঠিত, তা নয়। বিচিত্র রীতির অভিনয় এতে দেখা যায়। ভরতনাট্যম, কথাকলি, কুচিপুড়িতে দেহের সব অঙ্গের সাহায্যে, শাস্ত্রীয় ধারার অনুসরণে, গানের সঙ্গে, নানা ছন্দে, যেভাবে অভিনয় করতে হয়, মণিপুরি রাসনৃত্য, কত্থক নৃত্য, ওড়িশি নাচের রীতি তা থেকে ভিন্ন। বিভিন্ন প্রদেশের লোকনাট্যের গানের সঙ্গে অভিনয় হয় সহজ সরল অঙ্গভঙ্গিতে। উচ্চাঙ্গের উপযুক্ত কটি নাটক ছাড়া অন্যান্য যাবতীয় নাটকের গানের অভিনয় সুনির্দিষ্ট নৃত্যরীতিতে গঠিত নয়।

পূর্বে বলেছি অভিনয়বিহীন ছন্দবন্ধ নাচকে নৃত্যশাস্ত্র বলেছে, 'নৃত্ত'। এ নাচের ব্যাপক পরিচয় আমরা আজও পাই ভারতের সর্বত্র গ্রামসমাজের নরনারীর মধ্যে। এই সমাজের নানা উৎসব, যথা পূজা, পার্বণ, পরব ও বিবাহাদি আনন্দানুষ্ঠানের সময়েই এসব নাচ আমরা দেখি। এতে দলবন্ধ নাচই প্রধান বা সবচেয়ে প্রচলিত। গ্রামের মেয়েরা স্বতন্ত্রভাবে দলবন্ধ হয়ে নাচে। ছেলেমেয়েরা একসঙ্গে পাশাপাশিও নাচে, আবার কেবলমাত্র ছেলেদেরও দলবন্ধ নাচ আছে। এইসব নাচকে, এ যুগে আমরা বলে থাকি 'লোকনৃত্য'। তালবাদ্যের মর্যাদা থাকলেও পুরুষ ও নারী-কণ্ঠের সমবেত গান এ নাচের প্রধান অঙ্গ। কিন্তু গানের প্রাধান্য থাকলেও তার সঙ্গে নৃত্যভঙ্গিতে কোনো-প্রকার অভিনয় করবার রীতি নেই। গান ও বাদ্যের মিলিত ছন্দের গতির সঙ্গে সংগতি রেখে সকলে একত্রে নানারূপ সহজ পদচারী ও হস্তভঙ্গিতে সানন্দে নেচে যায়। এইসব দলবন্ধ নাচের নর ও নারীদের উদ্দেশ্য হল তাদের প্রতিদিনের জীবনের নানা চিন্তাভাবনা এবং পরস্পরের মধ্যে বিরোধ-বিদ্বেষ থেকে মনকে মুক্ত করে, নির্মল আনন্দের আবেগে মেতে ওঠা। ঘণ্টার পর ঘণ্টা একই নাচ নেচে গেলেও, নাচ ও গানের ছন্দের আনন্দে, সময় ও দেহের পরিশ্রমের কথা তখন তাদের মনে জাগে না। নাচের সময় 'নৃত্ত'রত পুরুষ ও নারীগণ নিজেদের চিত্তবিনোদনের জন্যেই নাচে। দর্শকদের কথা তারা তখন মনে রাখে না।

গ্রামাঞ্চলে স্বতন্ত্রভাবে এইসব নাচ শেখাবার কোনো ব্যবস্থা নেই। উৎসবে, পরবে শিশুরা বড়োদের সঙ্গে নাচে যোগদান করে, বড়োদের নাচের অনুকরণ করতে করতে নাচ শিখে ফেলে। এবং বড়ো হয়ে বড়োদের স্থান গ্রহণ করে। সাজপোশাকে দেখি, গ্রামবাসীদের প্রতিদিনের ব্যবহৃত পরিচ্ছদেরই এক বিশেষ অলংকৃত রূপ। প্রতিদিনের ব্যবহৃত অপরিচ্ছন্ন বা জীর্ণ পরিচ্ছদে তাদের কখনও নাচতে দেখা যায় না। সম্প্রতি গ্রামের পুরুষদের মধ্যে কখনও কখনও নোংরা প্যান্ট, পাজামা ও শার্ট পরে নাচতে দেখা যায়। তা যে খুবই দৃষ্টিকটু, সে কথা বলতেই হবে।

ভারতের প্রতিটি প্রদেশের 'নৃত্য' ও 'নৃত্ত'-ধর্মী সব রকমের নাচেই দেখা যায়, আঞ্চলিক নানা আকারের তালবাদ্যের নমুনা। এই যন্ত্রগুলির গঠনবৈচিত্র্যের সীমা নেই। বাজনার তাল ও ছন্দের বৈচিত্র্যও বিস্ময়কর।

এবারে, ভারতের 'নৃত্য' ও 'নৃত্ত'-ধর্মী দুই দলের নাচের পরিপ্রেক্ষিতে গুরুদেব রবীন্দ্রনাথের নানাপ্রকার গান, নাটকের গান ও নৃত্যনাট্যের গানের সঙ্গে জড়িত নাচের রীতি বা গঠন-পদ্ধতি নিয়ে আলোচনার চেষ্টা করছি।

বিংশ শতকের প্রারম্ভে গুরুদেব শান্তিনিকেতনে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করে, অন্যান্য বিদ্যার সঙ্গে ছাত্রদের মধ্যে গানের এবং নাটক অভিনয়ের চর্চার প্রথম যখন প্রচলন করলেন, তখন গানের সঙ্গে অভিনয়কালে কখনও কখনও তিনি নাচার জন্যেও সকলকে উৎসাহিত করতেন। কিন্তু, সে নাচ কোনোপ্রকার নৃত্যশৈলীর দ্বারা বিধিবদ্ধ নাচ নয়। গানের ছন্দে মিলিয়ে হাত-পা নেড়ে যে যার মতো নেচে যেতেন। সারিবদ্ধ হয়ে শৃঙ্খলার সঙ্গে একই নিয়মে কেউই নাচতেন না। গুরুদেব নিজে এযুগে যখন *ফাল্গুনী* নাটকের অভিনয়ে বাউলের ভূমিকায় নেচেছিলেন, তখন তা ছিল গানের ছন্দে আপন আনন্দের নাচ। বাংলার বাউলদের একক নাচও ছিল এইপ্রকার। বিংশ শতকের কুড়ি দশকের প্রারম্ভে যখন বিধিবদ্ধ নাচ শেখানোর ব্যবস্থা হল শান্তিনিকেতনে, তখন থেকে ছাত্র ও ছাত্রীদের ধ্রুপদি রীতির অভিনয়নৃত্য ও দলবদ্ধ লোকনৃত্যে ধারার মিশ্রণে অভিনয়ের প্রবর্তন করা হয়। অভিনয়ধর্মী 'নৃত্য' পদ্ধতি ও অভিনয়বিহীন 'নৃত্ত' পাশাপাশি যুক্ত হয়ে পড়ে গানের সঙ্গে। কিন্তু সে যুগের এই অভিনয়-রীতিকে খুবই সহজ-সরল করে নেওয়া হয়েছিল। তাতে কোনো জটিলতা ছিল না। গানের সঙ্গে দলবদ্ধ নাচের ছন্দে গানের সামগ্রিক স্থায়ী ভাব বা রসটিকেই কেবল প্রকাশ করা হত।

প্রাচীন যুগ থেকে আজ পর্যন্ত, ভারতের উচ্চাঙ্গের অভিনয়ধর্মী নৃত্য ও লোকনৃত্যগুলি যেমন গানকে নির্ভর করে গঠিত, গুরুদেব বর্তমান শতাব্দীতে যেসব নৃত্যধারার প্রচলন করলেন তারও ভিত্তি হল একমাত্র গান। তাঁর দ্বারা রচিত নানাপ্রকার গানের উপর নির্ভর করেই শান্তিনিকেতনের নৃত্য-আন্দোলনের উৎপত্তি ও বৃদ্ধি। এ দিক থেকে তিনি ছিলেন ভারতীয় নৃত্যাদর্শের ঐকান্তিক অনুরাগী। শান্তিনিকেতনের নৃত্যে মণিপুরি রাস-নৃত্যের অনুরূপ অভিনয় প্রথম থেকে যেমন স্থান পেয়েছিল, তেমনই স্থান পেয়েছিল বাংলার ও ভারতীয় বিভিন্ন প্রকৃতির লোকনৃত্যের নানা ঢং। গানের ভাব ও রসের সঙ্গে দুই নৃত্যধারাকে সাজিয়ে, প্রয়োজনমতো এক করে নেওয়া হয়েছে। তখন, তার অভিনয় হয়েছে গানের ভাব ও ছন্দের সঙ্গে মিলিয়ে সহজ-সরল অঙ্গভঙ্গির। পরবর্তী যুগে কথাকলি নাচের শিক্ষা যখন প্রবর্তিত হল, তারও অভিনয়-রীতিকে বহু পরিমাণে পরিবর্তিত করে নেওয়া হয়েছিল। গুরুদেবের গানের সঙ্গে যখন দলবদ্ধ নাচ হয়েছে তখন তার সঙ্গে অভিনয়ের কথা না ভেবে দলবদ্ধ লোকনৃত্যের আদর্শেই তাকে কীভাবে তৈরি করা হয়েছে, তার উৎকৃষ্ট উদাহরণ হল শান্তিনিকেতনের 'বৃক্ষরোপণ' ও 'বসন্তোৎসব'-এর 'মরুবিজয়ের কেতন উড়াও' এবং 'ওরে গৃহবাসী খোল দ্বার খোল' গান দুটি। এর সঙ্গে যে নাচ প্রচলিত, সেটি অনেক ভেবেচিন্তে, ভারতের দলবদ্ধ লোকনৃত্যের আদর্শকে সামনে রেখে রচনা করা হয়েছিল। মণিপুরি রাসের তালনৃত্যের সঙ্গে অন্যান্য কয়েক প্রকার লোকনৃত্যের নৃত্যভঙ্গি এতে মিশেছে। দুটি গানের, কথা সুর ও ছন্দে, গুরুদেব উৎসবের যে আনন্দোচ্ছল ভাবটি ফুটিয়ে তুলেছিলেন, তা ছাত্রছাত্রীদের চলমান হস্তপদ ও দেহের ছন্দে মিশে, যাতে সার্থক হয়ে ওঠে, তারই চেষ্টা করা হয়েছিল। গানের সঙ্গে নাচ রচনার সময় আমরা

বহুক্ষেত্রে গানের স্থায়ীভাব বা রসকে প্রাধান্য দিয়ে, সমগ্র গানটিকে সাজাবার চেষ্টা করেছি। একটি উদাহরণ দিয়ে কথাটিকে পরিষ্কার করে বোঝাবার চেষ্টা করি।

চিত্রাঙ্গদা নৃত্যনাট্যে, চিত্রার কাছে প্রেম নিবেদন করে অর্জুন যখন বিফল হল, তখন সেই আক্ষেপে, প্রবল উত্তেজিত চিত্তে, সে গেয়ে উঠল 'অশান্তি আজ হানল এ কী দহন-জ্বালা' গানটি। গানের এই জ্বালাময়ী আবেগটির নাচ হয়েছে নানাপ্রকার হস্তপদের দ্বারা সাজানো, জোরালো নাচের ছন্দে। গানের প্রতিটি পঙ্‌ক্তি বা কলির অর্থ হস্তচালনায় ব্যক্ত হল না, প্রাচীন ধ্রুপদি নাচের ঢং-এ। এ পদ্ধতির নাচ রচনার সময় কয়েকপ্রকার ভারতীয় ধ্রুপদি ও লোকনৃত্যের উদ্দাম অঙ্গভঙ্গি ও পদচালনার সাহায্য আমাদের নিতে হয়েছিল। এই রকমের নৃত্যরচনার চিন্তা আমাদের মাথায় এসেছিল প্রথম, শ্রীমতী দেবী (ঠাকুর)-র ইউরোপীয় আদর্শের 'Modern Dance' দেখে। তিনি প্রথম যখন ১৯৩১ সালে, গুরুদেবের 'আমি পরানের সাথে খেলিব আজিকে মরণ খেলা' কবিতাটির, বৈচিত্রময় নানা আবেগের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে, পাশ্চাত্য আদর্শে, সমগ্র দেহভঙ্গির ছন্দে, অভিনয় করেছিলেন, তখন তা দেখেই আমরা নৃত্যভঙ্গিতে অভিনয় করবার নতুন এক পথের সন্ধান পাই। গুরুদেব এই কবিতাটিকে যেভাবে আবৃত্তি করেছিলেন শ্রীমতী দেবীর নৃত্যাভিনয়ে তার ব্যঞ্জনা সার্থকভাবে ফুটে উঠেছিল। কয়েক বছর পর, শ্রীমতী দেবীর অবর্তমানে, একবার গুরুদেব বর্ষা উৎসবে, এই কবিতাটি আবৃত্তি করবেন বলে স্থির করেন, আমাকে নির্দেশ দিলেন তার সঙ্গে নৃত্যাভিনয় করতে। সেবারে আমি শ্রীমতী দেবীকে অনুকরণ না করে, নানা প্রকৃতির ভারতীয় ও শ্রীলঙ্কার ক্যান্ডীয় নাচকে নানাভাবে ভেঙেচুরে কবিতাটির ভাববৈচিত্রের সঙ্গে সাজিয়ে নিয়েছিলাম। গুরুদেবের আবৃত্তির সঙ্গে আমার এবারের নৃত্যাভিনয় দর্শকদের চোখে সম্পূর্ণ ভারতীয় আঙ্গিকের নাচ বলেই মনে হয়েছিল। ইউরোপের 'Modern Dance'-এর সঙ্গে এর কোনো মিল ছিল না।

গুরুদেবের রচিত সাধারণ গান বা নৃত্যনাট্যের উত্তর-প্রত্যুত্তরমূলক গানের সঙ্গে আমরা মণিপুরি রাসনৃত্যের অভিনয়-পদ্ধতিকেই প্রথম থেকে গ্রহণ করেছিলাম। পরে তার সঙ্গে যুক্ত হয় কথাকলি নৃত্য। কিন্তু, কথাকলির মতো হুবহু মুদ্রাভিনয়কে যুক্ত করবার চেষ্টা কখনও করিনি। কথাকলির গানের নানা ছন্দের সঙ্গে পদচারী ও হস্তচালনা যেভাবে করা হয়, তাকে প্রয়োগ করবার দিকেই ছিল আমাদের ঝোঁক। তাছাড়া কথাকলি নাচের মধ্যে পৌরুষের ব্যঞ্জনার প্রতি লক্ষ রেখে, আমরা বিশেষ করে, জোরালো আবেগের গানের অভিনয়ে সেই ঢংটিকে প্রয়োগ করবার চেষ্টা করতাম। নৃত্যনাট্যের বিভিন্ন চরিত্রের গানের ভাবের প্রতি দৃষ্টি রেখে মণিপুরি ও কথাকলি ছাড়া, কত্থক ও ভরতনাট্যম নৃত্যকেও পাশাপাশি সাজিয়ে নিয়েছি। শ্রীলঙ্কার ক্যান্ডি নাচ, ইন্দোনেশিয়ার নাচ, বর্মার পোয়ে নাচ, শ্যামদেশের নাচ, জাপানি নাচ ও গুরুদেবের নানা গানে এবং *চিত্রাঙ্গদা, শ্যামা* ও *চণ্ডালিকা* নৃত্যনাট্যের অভিনয়ের সময় ভালোভাবেই ব্যবহার করতে পেরেছিলাম। এর জন্য, সময় নিয়ে, যথেষ্ট চিন্তাভাবনা ও পরীক্ষানিরীক্ষা আমাদের করতে হত। আর-একটি কথা বলে, আজকের এই আলোচনার এখানেই আমি ছেদ টানব।

নৃত্যানুরাগীরা প্রায় সকলেই জানেন যে, ভারতীয় 'নৃত্য'-ধর্মী অভিনয়-নৃত্য এবং 'নৃত্ত' দলের অভিনয়বিহীন লোকনৃত্যে গানের প্রাধান্য থাকলেও, তার প্রতি গানের মাঝে বা

শেষে প্রায়ই নানা ছন্দের তালনৃত্য থাকে। গুরুদেবের গানে বা নৃত্যনাট্যের গানের মাঝে বা শেষে এইরূপ তালনৃত্য খুব কমই যুক্ত হয়েছিল। মণিপুরি বা লোকনৃত্যের তালের নাচকে আমরা যখনই বিনা গানে রাখতে চেষ্টা করেছি, তখনই সেই তালের বিভিন্ন ছন্দের সঙ্গে মিলিয়ে গুরুদেব উপযোগী কথা বসিয়ে দিতেন। তখন তার নাচ হত অভিনয়-বিহীন তালনৃত্যের আদলে, গানটির সঙ্গে।

নৃত্যকলা হল, ইংরেজি ভাষায় যাকে বলে, 'Performing Art'। সেই কারণে, একে বিস্তারিতভাবে লিখে বোঝানো খুবই কষ্টসাধ্য। বিভিন্ন ধরনের নাচের সঙ্গে প্রত্যক্ষ পরিচয় থাকলে, লিখিত আলোচনা পাঠ করে তা বোঝা হয়তো সহজ হয়। এযুগের কোনো কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে ও নৃত্যশিক্ষায়তনে, স্বতন্ত্রভাবে 'রবীন্দ্রনৃত্য' নামে নৃত্যশিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এ যেন ধ্রুপদি নৃত্য, যথা ভরতনাট্যম, কথাকলি, মণিপুরি, ওড়িশি ও কত্থক নাচের মতো সুশৃঙ্খল নৃত্যপদ্ধতিতে গাঁথা। সেরূপ কোনো বাঁধা নিয়মে সুনির্দিষ্ট নয় শান্তিনিকেতনের নৃত্যধারা। সুতরাং একে অন্যান্য ধ্রুপদি নৃত্যশৈলীর মতো শ্রেণিবদ্ধ করা কখনোই সম্ভব নয়। গুরুদেবের গান ও নৃত্যনাট্যের গানের সঙ্গে যে আঙ্গিকে নৃত্যাভিনয় হয়েছে তা ছিল সর্বদাই পরিবর্তনশীল। কোনোপ্রকার নির্দিষ্ট নৃত্যধারা এর থেকে গড়ে ওঠেনি। প্রতিবারেই ভিন্ন ভিন্ন নৃত্যভঙ্গির সাহায্যে, পরীক্ষানিরীক্ষা করে গানের সঙ্গে উৎকৃষ্ট অভিনয়ের জন্য তাকে তৈরি করে নিতে হয়েছে। এ হল চলমান মিশ্র নৃত্যধারার দ্বারা নৃত্যাভিনয়। এইরূপ মিশ্রধারার কারণেই, সম্প্রতি প্রকাশিত শান্তিনিকেতনের নৃত্য সম্পর্কিত আমার একটি গ্রন্থে আমি একে বলেছি এ যুগের ভারতীয় আধুনিক নৃত্য। এইরূপ মিশ্রধারার নাচের প্রকৃতিকে না বুঝে, এ যুগের এক বিশ্ববিদ্যালয়ের এক বিদগ্ধ অধ্যাপক, লিখিতভাবে অভিযোগ তুলেছিলেন এই বলে যে, 'রবীন্দ্রনাথও নৃত্য বুঝতেন না।.... রবীন্দ্রনৃত্য বলতে যে জিনিসটি তিনি রেখে গিয়েছেন তা একটা অভিশাপ বিশেষ।... মণিপুরি, কত্থক, কথাকলি সব মিলিয়ে এমন একটি খিচুড়ি কেন তৈরি করলেন'।

যাত্রা হইতে নাটক

অহীন্দ্র চৌধুরী

আদি যাত্রার ইতিহাসে কোনো দেবলীলা প্রকাশক কাহিনির সাংগীতিক উপস্থাপন মাত্রই পরিদৃষ্ট হয়; চরিত্রানুগ সাজসজ্জা করে কাহিনিমধ্যস্থ প্রতিটি চরিত্রকে রূপায়িত করবার প্রচেষ্টা এইসকল যাত্রার মধ্যে লক্ষিত হয় না। যথোপযুক্ত সাজসজ্জা করে চরিত্রাভিনয়ের প্রচেষ্টা আমরা সর্বপ্রথম দেখতে পাই বাঙালির একনিষ্ঠ প্রেম-সাধন তরুর অমৃতময় ফলস্বরূপ শ্রীচৈতন্যদেবের কৃষ্ণযাত্রার অকল্পিত পূর্ব প্রয়াসে। মহাপ্রভু ছিলেন সংস্কৃত রসশাস্ত্রে সুপণ্ডিত। সংস্কৃত নাট্যশাস্ত্রের রীতিনীতি নির্দেশাদির সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান থাকা তাঁর পক্ষে খুবই স্বাভাবিক। তাই নিরবচ্ছিন্ন পালাগান রূপ যাত্রার গতানুগতিকতার মধ্যে তাঁকে আমরা নানারূপ পরিবর্তন সাধন করতে দেখি। রং মেখে, ছদ্মবেশ ধারণ করে চরিত্রানুযায়ী সাজপোশাক পরিধান করে কোনো বিষয়বস্তুর বাস্তবানুগ উপস্থাপনের পরিকল্পনা বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাসে সেই প্রথম। বঙ্গীয় নাট্যকলার ক্ষেত্রে শ্রীচৈতন্যদেবই আদিগুরু। শ্রীচৈতন্য ও তাঁর পার্ষদবৃন্দই সুশিক্ষিত ও উচ্চবর্ণের মধ্য থেকে সর্বপ্রথম অভিনয়ের জন্য এগিয়ে এসেছিলেন। ইতিপূর্বে নিম্নশ্রেণির লোকদের দ্বারাই পালাগান, যাত্রা প্রভৃতি অভিনীত হত। *চৈতন্যচরিতামৃত*, *চৈতন্যমঙ্গল*, *চৈতন্যভাগবত* প্রভৃতি গ্রন্থে শ্রীচৈতন্যের নব সংস্কারবিশিষ্ট অভিনব যাত্রাভিনয়ের উল্লেখ পাওয়া যায়। কোনো কোনো সমালোচককে বলতে শোনা যায় যে, বৈষ্ণবধর্মের প্রভাবপ্রতিপত্তির পূর্বে বাংলা দেশ প্লাবিত হয়েছিল শাক্তধর্মের বন্যাস্রোতে এবং সেই শাক্ত প্রভাবের যুগে শক্তিযাত্রার প্রচলন ছিল বলে তাঁরা দাবি করেন।*

প্রাক্-চৈতন্যযুগে শাক্তধর্মের গৌরবের যুগে কানা হরিদত্তের মনসামঙ্গল, দ্বিজ জনার্দন, মাধবাচার্য প্রভৃতির চণ্ডীমঙ্গল, কৃষ্ণরাম দাস, বলরাম চক্রবর্তী প্রভৃতির কালিকামঙ্গল ইত্যাদি শক্তির সাহায্যে বর্ণনমূলক মঙ্গলকাব্যসমূহ রচিত হয়েছিল।

সুতরাং এইসকল মঙ্গলকাব্য হতে শক্তিযাত্রার উদ্ভব খুব অস্বাভাবিক নয়। তা ছাড়া শক্তি-যাত্রার অস্তিত্ব থাকলেও তার রূপও যে আদিযাত্রার ন্যায় পালাগানের নামান্তর ব্যতীত আর কিছুই ছিল না—এ কথা নিঃসংশয়ে বলা যায়।

* Indian Stage--Hemendra Nath Dasgupta

এ ছাড়া রাসযাত্রা ছিল বলে *চৈতন্যভাগবত-এ* আমরা প্রমাণ পাই। বৃন্দাবন দাস বিরচিত *শ্রীচৈতন্য ভাগবত-এর* অষ্টাদশ অধ্যায়ে আমরা মহাপ্রভুর উক্তি থেকে তাঁর অভিনয় সম্পর্কে অনেককিছু জানতে পারি।

বৃন্দাবন দাস বলেছেন :

একদিন প্রভু বলিলেন— সভাস্থানে।
আজি নৃত্য করিবাঙ্ অঙ্কের বিধানে।।
সদাশিব-বুদ্ধিমন্ত খানেরে ডাকিয়া।
বলিলেন প্রভু, কাচ সজ্জা কর গিয়া।।
শঙ্খ, কাঁচুলি, পাট শাড়ী, অলঙ্কার।
যোগ্যযোগ করি সজ্জ কর সভাকার।।
গদাধর কাচিবেন—রুক্মিণীর কাচ।
ব্রহ্মানন্দ তাঁর বুড়ি—সখী সুপ্রভাত।।
নিত্যানন্দ হইবেন বড়াই আমার।
কোতোয়াল হরিদাস—জাগাইতে ভার।।
শ্রীবাস নারদ-কাচ, স্নাতক শ্রীরাম।

আবার অন্যত্র তিনি প্রভু হরিদাসের সাজসজ্জার বর্ণনা দেন—

প্রথমে প্রবিষ্ট হইলা প্রভু হরিদাস।
মহা দুই গোঁফ ধরি বদন-বিলাস।।
মহা পাগ শোভে শিরে, ধটী পরিধান।
দণ্ড হস্তে সভারে করায় সাবধান।।

নারদবেশী শ্রীবাসকে আবার আমরা দেখতে পাই—

মহা দীর্ঘ পাকা দাড়ি, ফোঁটা সর্বগায়।
বীণা কান্ধে, কুশ হস্তে চারিদিকে চায়।।

*

অভিন্ন-নারদ যেন শ্রীবাস পণ্ডিত—।
সে—ই রূপ, সে—ই বাক্য, সে—ই সে চরিত।।

শ্রীচৈতন্যের গোপিকাবেশে শ্রীচন্দ্রশেখরাচার্যের গৃহে নৃত্যগীতাভিনয়ের সম্পর্কে লোচনদাসের *চৈতন্যমঙ্গল-এ* বর্ণিত হয়েছে :

চন্দ্রশেখরের বাড়ি নাচিয়া গাহিয়া।
ঘরেতে আইলা প্রভু আনন্দিত হইয়া।। (চৈ. মধ্যখণ্ড)

কৃষ্ণলীলাভিনয়ে অংশগ্রহণকারী শ্রীচৈতন্যের পারিষদবর্গ অন্যান্য বৈষ্ণবগণের তৎকালিকভাব ও বেশভূষাদি এবং স্বয়ং মহাপ্রভুর সাজসজ্জার প্রসঙ্গে লোচনদাস অন্যত্র বলেছেন—

সকল বৈষ্ণব মিলি, প্রেমের পশার ডালি,
পশারিল অপরূপ হাটে।।

*

এখানে কহিব শুন, সাবধানে সবজন
গোপিকা-আবেশে-বশ প্রভু।
হৃদয়ে কাঁচলি ধরে, শঙ্খ কঙ্কণ করে,
দুটি আঁখি রসে ডুবুডুবু।।
পট্ট সে বসন পরে, নূপুর চরণে ধরে,

মুঠে পাই ক্ষীণ মাঝাখানি।
রূপে ত্রিজগৎ মোহে, উপমা দিবার কাঁহে
গোপী বেশে ঠাকুর আপনি।।

চৈতন্যচরিতামৃত রচয়িতা কৃষ্ণদাস কবিরাজের গ্রন্থে আদিলীলা অধ্যায়ে শ্রীচৈতন্যের রুক্মিণী বেশে কৃষ্ণলীলাভিনয়ের উল্লেখ পাওয়া যায়।—

তবে আচার্যের ঘরে কৈল কৃষ্ণলীলা
রুক্মিণী স্বরূপ প্রভু আপনে হইলা।।

শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাবে বাংলা দেশে যেমন বৈষ্ণবধর্মের যুগান্তকারী বিপ্লব দেখা দিয়েছিল, সেরূপ বাংলার সাংস্কৃতিক জীবনের প্রতিটি দিকে তাঁর বৈপ্লবিক শঙ্খধ্বনি নিনাদিত হয়েছিল।

রাধাভাব-দ্যুতি-সুবলিত-তনু শ্রীচৈতন্যের রাধাভাবে, বিভিন্ন স্থানে, কৃষ্ণলীলাভিনয় দেখে আপামর সাধারণে বিমোহিত হত। চৈতন্যদেবের প্রভাবে প্রাচীন যাত্রার মধ্যে বহুতর পরিবর্তন সংসাধিত হল।

যাত্রাভিনয় কালে পূর্বের ন্যায় কোনোপ্রকার মুখোশ ব্যবহার না করে চরিত্রানুযায়ী সাজসজ্জা (Make-up) করার প্রচলন তাঁর সময় হতেই শুরু হয়, এ কথা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। প্রাক্-চৈতন্যযুগের যাত্রায় কোনোরূপ অঙ্কবিভাগ থাকত না। তখন মঙ্গলকাব্যের মধ্য দিয়ে আমরা সম্পূর্ণাঙ্গ কাহিনি পেয়েছি, তাই গীতের মাধ্যমে বর্ণনা করে যাওয়া হত একাদিক্রমে, মধ্যে হয়তো সাময়িক বিরতি থাকত, কিন্তু সুনির্দিষ্ট অঙ্কবিভাগের কল্পনা তখন অশিক্ষিত গ্রাম্য যাত্রাওয়ালাদের নিকট স্বপ্নেরও অতীত। প্রেমের অবতার মহাপ্রভু অভিনয়ের মধ্যে তাঁর প্রাণের সমস্ত আবেগ, আকুতি, অন্তর্বেদনা সমস্তকিছু উজাড় করে দিতেন,— নিঃশেষে ঢেলে দিতেন তাঁর প্রাণের গভীরতম দরদ ও রসময়তা,— তাঁর অভিনীত চরিত্রটিকে প্রাণবন্ত করে তোলবার জন্য। অভিনেয় চরিত্রটিকে তিনি অভিনয় করতেন না, তার সঙ্গে নিজেকে মিশিয়ে নিতেন (identfication), তাই তাঁর অভিনয়ের মধ্যে আমরা ভাবরসাশ্রিত অপূর্ব অভিব্যক্তি প্রত্যক্ষ করি। তখন হতেই রসঘন ভাব অভিনয়ের প্রথম সূত্রপাত বাংলা দেশে পূর্বপ্রচলিত যাত্রার নিম্নস্তরের রঙ্গরস, ভাঁড়ামি, সং-এর আধিক্য তাঁর প্রভাবান্বিত যাত্রাকে স্পর্শ করতেও পারল না। এছাড়া শ্রীচৈতন্যর অপূর্ব প্রেমময় অভিনয় যখন সাধারণের সমক্ষে প্রদর্শিত হত, তখন সেই অভিনয় অবশ্যই বাংলা ভাষার মাধ্যমেই জনসাধারণের সমক্ষে উপস্থাপিত করা হত; নতুবা অন্তর দিয়ে, গভীর আগ্রহের সঙ্গে অভিনয়ের রস আস্বাদন করা সাধারণের পক্ষে সম্ভবপর হত না। ওই সময় হতেই বাস্তবিক বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের উন্নতি ও ঐশ্বর্যের যুগ এবং বাংলা ভাষায় প্রকৃত নাটক রচনার ক্ষেত্রে প্রথম অরুণোদয়।

শ্রীচৈতন্যদেবের প্রভাবে এবং প্রেরণায় এই সময় কয়েকজন ভক্ত নাট্যকার কয়েকটি উল্লেখযোগ্য সংস্কৃত নাটক রচনা করেন। শ্রীশ্রীরূপ গোস্বামীর *বিদগ্ধ-মাধব* ও *ললিত-মাধব*, পরমানন্দ সেনের *চৈতন্য-চন্দ্রোদয়*, রায় রামানন্দের *জগন্নাথ বল্লভ*, গোবিন্দ দাস কবিরাজের *সংগীত মাধব*, কবি কর্ণপুরের *চৈতন্য চন্দ্রোদয়* প্রভৃতি সংস্কৃত নাটক সেদিন বাঙালির অফুরন্ত নাট্যরসের পরিচয় বহন করে এনেছিল। এ কথা চিন্তা করলে আশ্চর্য লাগে যে, মহাপ্রভুর ভক্তবৃন্দ তদানীন্তন রীতি অনুসারে নাটক রচনা করেছিলেন সংস্কৃতে, কিন্তু মহাপ্রভু অভিনয় করেছিলেন বাংলা ভাষায়। তা সত্ত্বেও সে সময় কেন যে বাংলা ভাষায় নাটক রচনা হল না সেটা ভাববার বিষয়।

চৈতন্য-যুগে ও চৈতন্যোত্তর-যুগে কৃষ্ণযাত্রাসমূহ যথেষ্ট জনপ্রিয় হয়ে ওঠে এবং রাজপোষকতা-বিহীন মুসলমান শাসনকালে নাটকের অভাবকে বহুলাংশে মোচন করে। একদিক দিয়ে যদিও গান ও

ভক্তিরসের আধিক্য যাত্রার মধ্যে নাট্যরসকে দানা বাঁধতে দেয়নি, কিন্তু তথাপি এই যাত্রাই পরবর্তী বাংলা নাটকের সৃষ্টিক্ষেত্রে সম্ভাবনাময় আলোকবর্তিকাস্বরূপ। অনেকের মতে বাংলা নাটকের উৎপত্তি প্রাচীন যাত্রা থেকে হয়নি, হয়েছে সংস্কৃত ও ইংরেজি নাটকের প্রভাবে। এ কথা সম্পূর্ণ গ্রহণযোগ্য নয়।

সংস্কৃত নাটকের প্রভাব একদা বাংলা নাটকে বিদ্যমান ছিল এবং আধুনিক বাংলা নাটকও যে ইংরেজি প্রভাবান্বিত, এ কথা অস্বীকার করার উপায় নেই। কিন্তু সে প্রভাব ছিল আঙ্গিকে,— উপস্থাপনার পদ্ধতিতে। তার প্রাণসত্তা আলোচ্যকাল পর্যন্ত সেই প্রাচীন যাত্রার গীতিময় ভাবঘন আদর্শে পরিপূর্ণ। প্রাচীনকালে যাত্রার মধ্যেই বাঙালির মানসপ্রকৃতি তৃপ্তির সঙ্গে অবগাহন করত এবং আনন্দ আস্বাদন করে ধন্য হত। আজও তাই পৌরাণিক নাটকাদির গীতিবহুলতার মধ্যে বাঙালির প্রাণের সামগ্রী যাত্রার প্রভাব বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়।

মহাপ্রভুর আদর্শে অনুপ্রাণিত তাঁর শিষ্য প্রশিষ্যদের অনেকে বংশানুক্রমে এবং উচ্চভাবধারা-বিশিষ্ট পেশাদার যাত্রাওয়ালাদের মধ্যেও অধিকাংশই তখন সর্বসমক্ষে উপস্থাপিত করতেন প্রেম-বিগলিত কৃষ্ণলীলার ভাবাভিনয়; সাধারণের চাহিদানুযায়ী যাত্রায় অনুপ্রবিষ্ট গাজনের সং প্রভৃতি এই সকল যাত্রার একটি বিশেষ অঙ্গ হয়ে উঠতে পারেনি। মধ্যযুগের যাত্রার নব সংস্কারের অগ্রদূত রূপে শ্রীচৈতন্য সকল নাট্যরসিকের অন্তরে স্থায়ী আসন লাভ করেছিলেন; তাই চৈতন্য-বিষয়ক ভাবঘন যাত্রাও তখন অনুষ্ঠিত হত। এমনকি যে-কোনো যাত্রার পূর্বেই গৌরাঙ্গলীলা-বিষয়ক পদাবলি বা গৌরচন্দ্রিকা গীত হত। কিন্তু নিম্নস্তরের প্রতিভাসম্পন্ন যাত্রাদলের অধিকারিগণ এই ভাবাভিনয়ের মহান আদর্শকে গ্রহণ করতে সমর্থ হয়নি, তাই তাদের অভিনীত যাত্রার মধ্যে নিকৃষ্ট কদর্য রংতামাশা, শালীনতাহীন অঙ্গভঙ্গি প্রভৃতি অনেকটা স্থান অধিকার করে থাকত। এইসকল যাত্রার মধ্যে সত্যকার অভিনয়-কলা বলতে কিছুই ছিল না, কারণ যে অভিনয়ের মধ্যে সাত্ত্বিকভাব নেই অভিনয়পদবাচ্য হবার যোগ্যতাও তার থাকে না। এই প্রসঙ্গে নাট্যশাস্ত্রের এক স্থানে ভরতের একটি উক্তি উল্লেখযোগ্য :

সত্ত্বাতিরিক্তোঽভিনয়ো জ্যেষ্ঠ ইত্যভিধীয়তে।
সমসত্ত্বো ভবেন্মধ্যঃ সত্ত্বহীনোঽধর্ম স্মৃতঃ।।*

এইভাবে তদানীন্তন যাত্রার মধ্যে জোয়ারভাটার তরঙ্গবৈচিত্র,— কখনও উত্থান, কখনও পতন,— কখনও প্রগতি, কখনও-বা পশ্চাদ্‌গতি লক্ষিত হত।

বাঙালির রাজনৈতিক ও জাতীয় জীবন এই সময় এক নবতম পরিস্থিতির সম্মুখীন হল। কলকাতায় ইংরেজ শাসন প্রতিষ্ঠা, এখানে রাজধানী স্থাপন এবং এ স্থানের রাজনৈতিক ও সামাজিক বিকাশের মধ্য দিয়ে নবাগত পাশ্চাত্য নাট্যাদর্শের তরঙ্গভঙ্গ এ দেশবাসীর রুচি ও রসবোধের ক্ষেত্রে নিয়ে এল বৈপ্লবিক পরিবর্তন।

বিস্তারিত কোনো ইতিহাস বলার খুব প্রয়োজন এখানে নেই। এ কথা সকলেই জানেন, ইংরেজদের জাহাজ একবার দুর্ভিক্ষের সময় আলমগিরের শিবিরে খাদ্য সরবরাহ করায় মোগল সম্রাট ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির এজেন্ট জোব চার্নকের প্রতি ছিলেন অনুকূল ও সুপ্রসন্ন। তাই তাঁকে কলকাতায় কুঠি নির্মাণের অনুমতি প্রদান করেন। হুগলি ও তার পার্শ্ববর্তী দু-একটি অঞ্চলে কুঠি নির্মাণ প্রচেষ্টায় ব্যর্থ হবার পর, ১৬৯০ সালের ২৮ আগস্ট চার্নকসাহেব ভাগীরথীর তীরে ইংল্যান্ডের পতাকা প্রোথিত করে কলকাতা মহানগরীর ভিত্তি স্থাপন করেন। বর্তমানের প্রাসাদময়ী নগরী তখন সমাজ-সংসারহীন গোবিন্দপুর, সুতানুটি ও কলকাতার জঙ্গলাকীর্ণ জলাভূমির অস্বাস্থ্যকর, ফরাসি, পোর্তুগিজ, মগ-

* Baroda Edition, Page 150, Chap. XXII, Sloka 2

মারাঠা প্রভৃতি দস্যু-তস্করের দৌরাত্ম্যে পূর্ণ তিনটি ক্ষুদ্র পল্লিগ্রাম ব্যতীত আর কিছুই ছিল না। এই উর্বর ভূখণ্ডে চিরবসন্ত বিরাজমান থাকলেও এ স্থান তখন অন্ধকারময় কারাগার, প্রেতভূমি ও ব্যাধি-নিকেতনরূপে পরিগণিত হত। বর্তমান কলকাতার সূত্রপাত ১৭৫৭ অব্দে। পলাশির যুদ্ধের পর বাংলার মসনদে প্রতিষ্ঠিত হলেন মিরজাফর। ১৭৫৬-৫৭ সালে কলকাতা লুণ্ঠনে বণিকদের যে ক্ষতি হয়েছিল তার পরিপূরণার্থ সন্ধির নিয়মানুসারে মিরজাফর প্রচুর অর্থ প্রদান করেন। এই সময় হতেই কলকাতার শ্রীবৃদ্ধি। যে জলাময় স্থানে এক সময় ছিল গহন অরণ্য সেই স্থান বর্তমানে রাজপথশোভিত, রম্য সৌধমালায় সুসজ্জিত, প্রতিষ্ঠিত সামাজিক পরিবেশে আদর্শ নগরী।

১৬৯০ খ্রিস্টাব্দে জোব চার্নক একটি ঘোষণাপত্র প্রচার করে জাতিনির্বিশেষে সকলকেই এখানে এসে বসবাস করার জন্য আহ্বান জানান এবং সেজন্য কর অব্যাহতি প্রভৃতি নানা বিষয়ে সুযোগসুবিধা দান করার জন্য তাঁর হস্ত প্রসারিত হয়। কিন্তু চার্নক এই মৃত্তিকায় পদার্পণ করার বহু পূর্ব হতেই আর্মানিরা এখানে ব্যাবসাবাণিজ্য চালাত এবং সে সময়ে সুতানুটি পণ্যদ্রব্যের একটি প্রধান বাজার বলে বিখ্যাত ছিল। যাই হোক অনেকেই চার্নকের আমন্ত্রণ গ্রহণ করেছিলেন এবং এই উপনিবেশের উত্তর প্রান্তে এসে সমবেত হয়েছিলেন। জোব চার্নক এবং মহারাজ নবকৃষ্ণ বাহাদুরও ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণকে এবং অন্যান্য জাতীয় লোকেদের কলকাতায় বসাবার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করেন।

১৭৪২ থেকে ১৭৫২ সালের মধ্যে এই নগরীর পথঘাট, বাসগৃহ প্রভৃতি অতি দ্রুতগতিতে উন্নতি লাভ করে। মহারাজ নবকৃষ্ণ বাহাদুর, ঠাকুরগণ ও অন্যান্য প্রাচীন বংশ অরণ্য সমতুল বহু স্থানকে করে তোলেন মনুষ্য বাসোপযোগী।

পূর্বে বাণিজ্যোপলক্ষে কলকাতায় বণিকদের সমাগমই অধিক হত। বণিকেরা দস্যু-তস্করের ভয়ে দলবদ্ধভাবে আড়তপ্রভৃতিতে অল্প কয়েকদিনের জন্য অবস্থান করে পুনরায় স্ব স্ব আবাস অভিমুখে প্রস্থান করত। স্ত্রীপুত্রপরিবার নিয়ে এখানে বসবাস করা তখন মোটেই নিরাপদ ছিল না। সেজন্য এখানে সে সময় গড়ে উঠতে পারেনি কোনো সুসংবদ্ধ সামাজিক পরিবেশ বা বসতি।

রাঢ়দেশে তখন বর্গির আক্রমণ, ইংরেজ-মুসলমানের মধ্যে বিরোধ, আলিবর্দির পর থেকে ঘন ঘন রাজ-পরিবর্তন, পলাশির যুদ্ধ, ১৭৭০-এর মন্বন্তর প্রভৃতির দেশব্যাপী অরাজকতার জন্য বাংলার উৎসব, যাত্রা প্রভৃতির দীপ নির্বাপিত হল। থেমে গেল তার সংস্কৃতির আনন্দলহরি। তার পর, ১৭৭৪ সালে যখন কলকাতায় ইংরেজদের রাজধানী স্থাপিত হল, লোকের মনে ভরসা ফিরে এল এবং আবার আনন্দউৎসবও ফিরে এল সেই নিরাপদ নির্বিঘ্ন পরিস্থিতির মধ্যে। অতঃপর কলকাতায় ক্রমশ শান্তি ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সাধারণ মানুষ পরিবারবর্গ নিয়ে এসে এখানে বসতি-স্থাপনে উদ্যোগী হল। মহিলাদের আগমন ঘটায় ক্রমে ক্রমে এখানে সামাজিক নানাবিধ ক্রিয়াকর্মের প্রচলন হয় এবং একটি প্রকৃত সমাজ গড়ে ওঠার সুযোগ লাভ করে। পূজাপার্বণ, ব্রতকথা, পাঁচালি, পালাগান, কীর্তন প্রভৃতি কৃষ্টিমূলক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সমাজে ক্রমশ নূতন করে সাংস্কৃতিক জীবনের সূত্রপাত হয়। তৎকালীন কলকাতায় এবং পল্লি অঞ্চলে যাত্রাও বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল।

খ্রিস্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীতে বাংলায় যাত্রার যথেষ্ট সমাদর। বিষ্ণুপুর, বর্ধমান, বীরভূম, যশোর, নদিয়া জেলার স্থানে স্থানে এই সময় কয়েকজন শক্তিশালী যাত্রাওয়ালার আবির্ভাব ঘটেছে; কোনো একটি পালা নিয়ে রচিত হত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নাটক। এর অধিকাংশই পয়ারে রচিত। গদ্য খুবই কম। কোনো কোনো ক্ষেত্রে অভিনয়কালে অভিনেতাগণকে কথ্য ভাষাতে কিছু কিছু কথাবার্তা বলতে দেখা যেত। কিন্তু সেগুলো অভিনেতাদের প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব থেকেই উৎপন্ন হত; সংলাপ আকারে কোনো নাটকে লিখিত থাকত না, কারণ সাহিত্যক্ষেত্রে বাংলা গদ্য তখনও জন্মলাভ করেনি।

শ্রীকৃষ্ণযাত্রা বা কালীয় দমনই এই সময় একাধিপত্য করছিল বাঙালির মনোজগতে। শ্রীকৃষ্ণযাত্রার প্রাচীন অধিকারীদের মধ্যে প্রসিদ্ধপরমানন্দ অধিকারী যাত্রাভিনয় করেছিলেন অষ্টাদশ শতকের শেষভাগে। অনেকের মতে শিশুরামই ছিলেন যাত্রার পরিণত রূপসৃষ্টির জন্য গৌরব মুকুটের অধিকারী।*

এই সময়ের খ্যাতিমান যাত্রাওয়ালাদের মধ্যে শ্রীদাম, সুবল অধিকারী, লোচন অধিকারী, বদন অধিকারী, প্রেমচাঁদ অধিকারী প্রভৃতির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এইসকল যাত্রা ক্রমশ পরিবর্তিত আকার ধারণ করে নাট্য উপাদানে মণ্ডিত হতে থাকে। *কালীয়দমন*-এর ক্রমানুগত অভিনয়ের মধ্যে বৈচিত্রের স্বাদ বহন করে আনে ভারতচন্দ্রের *বিদ্যাসুন্দর*।

এদেশীয় শিক্ষিত লোকেরা ক্রিয়াকর্মে তাদের ঠাকুরদালানের উঠানে যাত্রাভিনয়ের আয়োজন করতেন। ধনী জমিদারদের গৃহেও মাঝে মাঝে অত্যন্ত সমাদরের সঙ্গে উচ্চশ্রেণির যাত্রার দলকে আমন্ত্রণ জানানো হত এবং তাদের হৃদয়গ্রাহী অভিনয় সকলকে তৃপ্তি দান করত। বারোয়ারিতেও কখনও কখনও এইসকল দলের যাত্রা অনুষ্ঠিত হত। দূরবর্তী স্থান থেকেও আগ্রহী বহু লোক এদের অভিনয় দেখবার জন্য অভিনয়স্থলে সমবেত হত।

কিন্তু নিম্নশ্রেণির রুচিবিশিষ্ট যাত্রায় প্রাচীন রীতিই প্রচলিত ছিল। গঞ্জে গঞ্জে, হাটেবাজারে, মেলায়, বারোয়ারিতলায়, বিশেষত গ্রামাঞ্চলে এইসকল যাত্রার সমধিক প্রচলন ছিল। ভালো অভিনয়ের দ্বারাও যদি যাত্রা না জমে ওঠে তখন সাধারণ দর্শকের কাছে জমাবার জন্য যাত্রাওয়ালারা সং দিত। কুরুচিপূর্ণ অঙ্গভঙ্গি, অশ্লীল রঙ্গরস, ভাঁড়ের নাচ প্রভৃতি যাত্রার মধ্যে অনেকটা স্থান অধিকার করে থাকত। এটা শালীনতাবিহীন হলেও ততটা দূষ্য ছিল না। কিন্তু অনেক সময় ব্যক্তিবিশেষের কাছ থেকে গোপনে অর্থ গ্রহণ করে যাত্রার দল যখন নিম্নস্তরের রহস্যালাপের মধ্যে দিয়ে কুশ্রী, অশ্লীলতাপূর্ণ, নৃত্যভঙ্গির মাধ্যমে বিপক্ষ ব্যক্তি বা দলকে হেয় করার জন্য কুৎসা রটনায় ব্রতী হত, তখন তারা অত্যন্ত ঘৃণ্য হয়ে উঠত। শিক্ষিত লোকেরা এই কুরুচিপূর্ণ, কুৎসিত ভাঁড়ামি ও কালুয়া ভুলুয়া সং-এর জন্যই এই শ্রেণির কদর্য যাত্রাভিনয়কে আন্তরিকভাবে বর্জন করেছিলেন।

এই সময় প্রেমচাঁদ অধিকারীর মহীরাবণ পালা, বাঁকুড়ার আনন্দ ও জয়চন্দ্র অধিকারীর রাসযাত্রা, ফরাসডাঙার গুরুপ্রসাদ বল্লভের চণ্ডীযাত্রা প্রভৃতি গতানুগতিক বিষয়বস্তু পরিত্যাগ করে বহন করে এনেছিল বৈচিত্রময় নূতনত্বের আস্বাদ।

সম্পূর্ণ বিপরীত দুই খাতে প্রবাহিত এই দুই শ্রেণির যাত্রার বহুল প্রচলনের সময়েই বাংলার নাট্য-আন্দোলনে নব যুগের সূচনা হল। ১৭৯৫ খ্রি. অব্দে রঙ্গমঞ্চে প্রথম বাংলা নাটক অভিনীত হল *ডিসগাইস্* নামক একটি ইংরেজি নাটকের বঙ্গানুবাদ *ছদ্মবেশ*। লেবেডেফ নামক একজন রুশীয় ভাগ্যান্বেষী, বাঙালি গোলকনাথ দাসের সহায়তায় ২৫নং ডোমটুলিতে এই অভিনয়-অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করলেন। এই নব প্রচেষ্টা এদেশে একান্ত অভাবনীয়। মঞ্চ নির্মাণ করে, বাঙালি পদ্ধতিতে তাকে সুসজ্জিত করে নতুন ধরনের সামাজিক লঘু প্রকৃতির বিষয়বস্তুকে বাঙালি অভিনেতা-অভিনেত্রীদের সুষ্ঠু ও স্বাভাবিক অভিনয়ের মধ্য দিয়ে ভাইসরয় স্যার জন শোরের পৃষ্ঠপোষকতায় ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বিশিষ্ট কর্মচারীবৃন্দ ও এদেশীয় সম্ভ্রান্ত দর্শকদের সম্মুখে উপস্থাপিত করার প্রচেষ্টা সে সময়ে কল্পনাতীত এবং দুঃসাহসিক অভিযানের সমতুল্য। অনেকের ধারণা যে (সমালোচককে বলতে শোনা যায়) লেবেডেফের অকস্মাৎ ইংল্যান্ড প্রস্থানের সঙ্গে সঙ্গে এই অভিনব নাট্যপ্রচেষ্টারও অবসান

---

* 'A resident of kenduli village named Shishuram Adhikary, a Brahmin by cast, secured the glorious perfection of the jatra'–The Indian Stage vol. I, page-115.

ঘটল; কারণ এদেশের মানুষের প্রবণতার সঙ্গে এর কোনো সম্পর্ক ছিল না, তাই বাংলা নাট্যজগতে এর কোনোরূপ স্থায়ী প্রভাবই পরিলক্ষিত হয় না। বাংলা নাট্য-আন্দোলনের ইতিহাসের সূচনার প্রাক্কালে এটিকে একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা ব্যতীত অন্য কিছু বলে স্বীকার করে নিতে তাঁরা রাজি নন।

কিন্তু প্রথম মঞ্চ নির্মাণ করে অভিনয়, নটনটীর একত্র সমাবেশ, পৌরাণিক দেবলীলা-বিষয়ক যাত্রার যুগে সামাজিক ও হালকা ধরনের বিষয়বস্তু গ্রহণ, আঙ্গিকের মধ্যে বৈচিত্র, বাঙালি রীতিতে মঞ্চ সজ্জা করা, এবং সর্বোপরি সেই অভিনয়ের দ্বারা সম্ভ্রান্ত দর্শকমণ্ডলীকে মুগ্ধ করতে পারার পরও এই অচিন্ত্যনীয় নাট্যপ্রচেষ্টার কোনো প্রভাবই পরবর্তী যুগে অনুভূত হল না, এ কথা চিন্তা করলে বিস্মিত না হয়ে পারা যায় না। এমন একটি অভাবনীয়, অকল্পিত পূর্ব চমকপ্রদ ব্যাপার কালের সমুদ্রতীরে প্রভাবের কোনো স্বাক্ষরই রেখে যেতে পারেনি, এ কথা কোনো যুক্তিবাদী মন মেনে নিতে প্রস্তুত নয়। পরবর্তী নাট্যপ্রচেষ্টার ক্ষেত্রে লেবেডেফের প্রভাব সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা হওয়া এবং এ বিষয়ে আলোকসম্পাতের চেষ্টা করা নাট্যামোদী মাত্রেরই অবশ্যকাম্য। তথ্যাভিজ্ঞ মহলে নাকি শোনা যায় লেবেডেফের প্রভাব সম্পর্কে তেমন কোনো Record বা সূত্র পাওয়া যায় না। কিন্তু তা যদি সত্যই হয়, তা হলেও সেজন্য কি এ বিষয়ে আমাদের গবেষণা স্তব্ধ হয়ে যাবে? তা কখনোই হতে পারে না। বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে অনুমান রীতি বা Hypothesis-এর সাহায্যে সত্যে উপনীত হওয়ার চেষ্টা করা হয় এবং এর দ্বারা অনেক সময় লক্ষ্যে পৌঁছোনো যায়। মধ্য এশিয়ার বহু স্থানের Tower-Temple (Juggernant)-এর ভগ্নাবশেষ দেখে তার আসল রূপ কী ছিল, স্থপতিগণ আজ তা অনুমান করবার চেষ্টা করেন এবং তার উপর কল্পিত নূতন স্তম্ভ, খিলান প্রভৃতি চিত্রিত করে তাকে সম্পূর্ণাঙ্গ করতেও উদ্যোগী হন— সেখানে অনুমানই তাঁদের উদ্যোগের ভিত্তিস্থল। সেইরকম লেবেডেফের পরবর্তী যুগে তাঁর প্রথম বাংলা নাটকাভিনয়ের প্রভাব কতদূর বিস্তৃত হয়েছিল সে বিষয়ে হাতের কাছে খুব বেশি তথ্য বা উপকরণ না পেলেও Hypothesis রচনা করতে দোষ কী? তার দ্বারা সত্যের সন্ধান পাওয়া হয়তো অসম্ভব হবে না। লেবেডেফের সম্বন্ধে তবু কিছুটা আমরা জানতে পারি, তিনি ছিলেন একজন রুশীয় অভিযাত্রী। তিনি একসময়ে ভারতবর্ষে আগমন করেন, গোলকনাথ দাসের সহায়তায় দুটি ইংরেজি নাটকের বঙ্গানুবাদ করেছিলেন এবং মঞ্চে *ছদ্মবেশ* নামক নাটকটি তাঁর চেষ্টায় দু-বার সাফল্যের সঙ্গে অভিনীত হয়। অতঃপর তিনি অকস্মাৎ ইংল্যান্ডে প্রস্থান করেন এবং ১৮০১ সালে *A Grammar of the pure and mixed East Indian Dialects* নামক একটি গ্রন্থ প্রকাশ করেন।

কিন্তু গোলক দাস লোকটি কে ছিলেন? তাঁর পরিচয় কী? তিনি কোথাকার লোক? লেবেডেফ চলে যাওয়ার পর তাঁর ভবিষ্যৎ-জীবনই বা কোন্ পথে পরিচালিত হয়? এসকল প্রশ্নের উত্তর কোথায়?— উত্তর কিছুই নেই। কারণ তাঁর সম্পর্কে আমরা সম্পূর্ণ অজ্ঞ। কেবলমাত্র লেবেডেফের *Grammar*-এর Introduction থেকে আমরা জানতে পারি গোলক দাস ছিলেন লেবেডেফের ভাষা-শিক্ষক এবং তাঁর শিক্ষাপদ্ধতির তিনি যথেষ্ট প্রশাংসাও করেছেন এবং স্বীকার করেছেন যে, এরূপ একজন উচ্চস্তরের শিক্ষক ব্যতীত তিনি কখনোই তাঁর অনুবাদকে এত মনোজ্ঞ করে তুলতে পারতেন না। উক্ত গ্রন্থের ভূমিকায় তিনি বলেছেন :

> I presume I do not much flatter myself, when I affirm that by this translation the spirit of both the comic and serious scenes were much hightened and which would in vain be imitated by any European, who did not possess the advantage of such an instructor as I had the extraordinary good fortune to procure.

Disguise-এর অনুবাদ শেষ হলে আমন্ত্রিত কতিপয় পণ্ডিতের সম্মুখে পঠিত হল এবং তাঁদের সংবর্ধনাও লাভ করল এই অনুবাদটি। নাটকটি তরজমা করার সময়েই গোলক দাস এই নাটকের অন্তর্নিহিত অভিনব নাট্যরস আস্বাদন করেছিলেন এবং নাটকটির ঘটনা সংস্থাপন, চরিত্র সমাবেশ, সংলাপ, আঙ্গিক প্রভৃতি তাঁকে গভীরভাবে আকৃষ্ট করেছিল। তাই তিনি লেবেতেফকে বলেছিলেন যে, লেবেতেফ যদি এই নাটকটিকে অভিনয় করতে চান তা হলে তিনি অভিনেতা-অভিনেত্রী সংগ্রহের ভার গ্রহণ করবেন। লেবেতেফের কথা থেকেও জানা যায় :

> Golaknath Dash, my linguist made me a proposal, that if I choose to present this play publicly, he would engage to supply me with actors of both sexes from among the natives.

এখানে বিশেষভাবে লক্ষ করা উচিত যে, লেবেতেফ শুধু নাটকটির তরজমা করেছিলেন, কিন্তু নাটকটি মঞ্চস্থ করার উপযোগী এবং একে যে মঞ্চস্থ করা যেতে পারে এই পরিকল্পনা সর্বপ্রথম দেখা দেয় গোলকনাথের মনে, নতুবা এই নাটকটির অভিনয় হয়তো হত না। অতএব লেবেতেফের অপেক্ষা গোলকনাথের কৃতিত্ব কম ছিল না। সুতরাং এ থেকে বোঝা যায়, তিনি নাট্যরসিক ছিলেন। নতুবা এই নাটকের অভিনয়ের সম্ভাব্যতার কথা তাঁর মনেই বা প্রথম উদয় হল কীরূপে? তিনিই অতঃপর লেবেতেফের সঙ্গে আলোচনানুযায়ী অভিনেতা-অভিনেত্রী সংগ্রহ করেন।

উক্ত অভিনয়ানুষ্ঠান সাফল্যমণ্ডিত হওয়ার ক্ষেত্রে গোলক দাসের অবদানও বড়ো কম নয়। এ থেকে এরূপ অনুমান করাও খুব অসংগত হবে না যে, গোলক দাস একজন ভালো অভিনেতা, অভিনয় পরিচালক অথবা যাত্রাদলের সহিত সংশ্লিষ্ট অভিনয় বিষয়ে একজন অভিজ্ঞ ব্যক্তি ছিলেন, নতুবা তাঁর পক্ষে এত অল্প সময়ের মধ্যে অভিনেতা-অভিনেত্রী সংগ্রহ করা সম্ভব হত না এবং তিনি সাহস করে কখনও বলতে পারতেন না যে, 'অভিনেতা-অভিনেত্রী এনে দেব যদি লেবেতেফ অভিনয়ের ব্যবস্থা করতে ইচ্ছা করেন'। অভিনেতা ও অভিনেত্রীগণের অধিকাংশই যে ইংরেজি জানতেন না এ কথা ধরে নেওয়া যায়। সুতরাং অভিনয় শিক্ষা ইত্যাদি ব্যাপারেও অবশ্যই গোলকনাথ দাসকে একটি বিশিষ্ট অংশ গ্রহণ করতে হয়েছিল। বাংলা দেশে প্রথম বাংলা নাটকের মঞ্চাভিনয়ের ক্ষেত্রে যিনি প্রথম পরিকল্পনা রচয়িতা— আদিগুরু, যাঁর অন্তরে প্রথম ধ্বনিত হয়েছিল এই নবতম প্রচেষ্টার বীজমন্ত্র— সেই গোলকনাথ দাস আজ বাংলার নাট্যরসপিপাসুদের কাছে অবহেলিত, অবজ্ঞাত— এ কথা চিন্তা করলেও সত্যিই দুঃখ হয়।

যাঁর প্রস্তরমূর্তি আজ উল্লেখযোগ্য স্থানে প্রতিষ্ঠিত করে যাঁকে যথোচিত মর্যাদায় ভূষিত করা নাট্যমোদীমাত্রেরই কর্তব্য— তাঁর সম্বন্ধে কোনো বিস্তৃত ইতিহাস অনুসন্ধানের প্রয়াস আমাদের মধ্যে বিন্দুমাত্র দেখা যায়নি এটা খুবই আশ্চর্যের বিষয়। ভাষা-শিক্ষক হিসাবে যাঁর সাহায্য না পেলে লেবেতেফের পক্ষে অনুবাদকার্য সুসম্পন্ন করা সম্ভব হত না, যাঁর চেষ্টায় অভিনেতা-অভিনেত্রীদের নাট্যশিক্ষা সুন্দর হয়েছিল, যাঁর নাট্যানুরাগ লেবেতেফকে অনুপ্রাণিত করেছিল এবং যাঁর ঐকান্তিক সহযোগিতায় উক্ত নাট্যাভিনয় প্রশংসাজনকরূপে সাফল্য লাভে সমর্থ হয়েছিল,— লেবেতেফের ইংল্যান্ড প্রস্থানের পর তাঁর সমস্ত প্রতিভা ও নাট্যক্ষুধার পরিসমাপ্তি ঘটল বলে বিশ্বাস করতে মন কিছুতেই সায় দেয় না। গোলক দাসের ন্যায় বিস্ময়কর প্রতিভার পরিণতি কী হল এ বিষয়ে তাঁর জীবনের অজ্ঞাত অধ্যায়ের ইতিহাস সংগ্রহ করার জন্য নাট্যসমালোচকদের কাছে আমার সনির্বন্ধ অনুরোধ। গোলক দাস কর্তৃক সংগৃহীত এবং উক্ত অভিনয়-অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী অভিনেতা-অভিনেত্রীদের ভাগ্যও লেবেতেফের প্রস্থানের পর কোন্ পথ গ্রহণ করল এ বিষয়ে চিন্তা করারও যথেষ্ট অবকাশ আছে।

তারা কি সকলে ক্ষণিক বুদবুদের ন্যায় উত্থিত হয়ে পুনরায় বিলীয়মান হয়ে গেল জনসমুদ্রের অন্তরালে,— না সেই নব নাট্যমন্ত্রে দীক্ষা লাভ করে অধিকতর উৎসাহ-উদ্দীপনা নিয়ে ভবিষ্যৎ নাট্য-আন্দোলনের সঙ্গে নিজেদের সংযুক্ত করেছিল? লেবেডেফের নাট্যাভিনয়ের অংশগ্রহণকারী অভিনেতা-অভিনেত্রীদের সকলেই যে নাট্যবিষয়ে অনভিজ্ঞ, একেবারে নতুন অভিনয়াকাঙ্ক্ষী মাত্র ছিল— এ কথা মনে করার পক্ষেও তেমন যুক্তি নেই। পক্ষান্তরে, অভিনয় সংক্রান্ত বিষয়ে অন্তত কিছুটা জ্ঞানসম্পন্ন ছিল বলে তাদেরকে মনে করা খুব অসংগত হবে না। কারণ তিন মাসের মধ্যে ওইরূপ অভিজাত দর্শকমণ্ডলীর সমক্ষে উচ্চাঙ্গের অভিনয় প্রদর্শন করা অভিনয়-অনভিজ্ঞ সম্পূর্ণ নূতন অভিনেতাদের কাছ থেকে আশা করা যায় না। প্রথমে নটনটী নির্বাচন, অভিনয়াংশ বিতরণ, প্রভৃতিতেই তো বেশ কিছুদিন অতিবাহিত হয়ে গিয়েছিল, তিন মাসের মধ্যে মহলা দেবার মতো সময় খুব বেশি পাওয়া সম্ভব হয়নি, কারণ এর মধ্যেই আবার মঞ্চ, দৃশ্যপট, সাজসজ্জা প্রভৃতি নির্মাণ বিষয়েও নাট্যশিক্ষক লেবেডেফ ও গোলক দাসকেও সময় দিতে হয়েছিল, তখনকার দিনে অভিনয় করতে গেলে গান, বক্তৃতা এবং প্রয়োজন হলে নৃত্য প্রভৃতিতে অভিনেতা-অভিনেত্রীদের যথেষ্ট পারদর্শী হতে হত। সুতরাং লেবেডেফের নাটক অভিনয় করার পূর্বে যদি এইসকল নটনটীর কোনো-না-কোনো যাত্রার দলে অংশ গ্রহণ করার অভিজ্ঞতা না থাকত তা হলে এত অল্পকালের মধ্যে গান, সংলাপ প্রভৃতিতে নিজেদের উপযুক্তরূপে প্রস্তুত করে তুলতে পারত না। পূর্ব হতেই ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দরের বহুল প্রচারিত গানগুলি তাদের ভালো করে জানা ছিল এবং মহলার সময় সংক্ষেপের জন্যই যে লেবেডেফ ওই গানগুলিকেউক্ত নাটকে সন্নিবেশিত করেছিলেন একথা যুক্তিসংগত।

১৭৯৫-এর ৫ নভেম্বর *Calcutta Gazette*-এ প্রকাশিত একটি বিজ্ঞাপনে আমরা দেখতে পাই—"The words of the much admired, Poet Shree Bharat Chandra Roy are set to music.'। এই বিজ্ঞাপন দেখে অনেকে অনুমান করেন যে, জনসাধারণের মধ্যে চাহিদা অনুযায়ী তাদের মনোরঞ্জনের জন্যই Lebedeff ভারতচন্দ্রের জনপ্রিয় কয়েকটি গান তাঁর *ছদ্মবেশ* নাটকে গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু এ ধারণা নিতান্ত অমূলক। Lebedeff-এর Bengali Theatre-এর প্রবেশমূল্যের উচ্চহারের বিষয় লক্ষ করলে অনায়াসেই উপলব্ধি করা যায় যে, উক্ত নাটকাভিনয়ে দর্শকদের মধ্যে সাধারণ স্তরের লোকসংখ্যা কীরূপ ছিল। *Calcutta Gezette**-এর অপর একটি বিজ্ঞাপনে পাওয়া যায়—'Tickets to be had this theatre,' Boxes and Pit...S. a. Rs. 8 Gallery,.........'4 পাণ্ডুলিপি দেখে সাজান। এবং ১৭৯৬ এর ২১ মার্চ দ্বিতীয় অভিনয়ের প্রাক্কালে Lebedeff একটি ঘোষণা জানিয়েছিলেন—

> For the better accomodation of the audience, the number of subscribers is limited to two hundred, which is nearly completed, the proposals for the subscription may be had on application to Mr. Lebedeff, by whom subscription at one Gold Mohur— a ticket will be received till the subscription is full.**

এইসকল তথ্য থেকে নিঃসন্দেহে সিদ্ধান্ত করা যায় যে, জনসাধারণকে আকৃষ্ট করার জন্যই তৎকালে অত্যন্ত আদরণীয় ভারতচন্দ্রের সংগীত এই *ছদ্মবেশ* নাটকে সন্নিবিষ্ট হয়নি, এগুলি গ্রহণ করা হয়েছিল কিছুটা সুবিধা লাভের জন্য। অভিনেতা-অভিনেত্রীদের এইসকল গানের প্রায় অনেকগুলি তৈরি করা ছিল, তাতে ওইগুলো নাটকের জন্য নির্ধারিত করায় সমস্ত নূতন গান তৈরি করা বা

---

* *Calcutta Gazette*, 26th Nov. 1795
* *Calcutta Gazette*, March 10, 1796

শেখানোর দিক দিয়ে অনেকটা সময় সংক্ষেপ করা গিয়েছিল। সুতরাং এই বিস্তৃত আলোচনার মধ্য দিয়ে এ কথা প্রতীয়মান হয় যে, অভিনেতা-অভিনেত্রীরা সংগীত অভিনয় প্রভৃতি বিষয়ে অন্তত কিছুটা পূর্ব-অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ছিল।

তবে যদি এইসকল নটনটীদের একেবারে নবাগত বলেই ধরে নিতে হয় তা হলেও বলা যায় অভিনয়ের নেশা এমনই জিনিস— একবার যদি তা জমে উঠে, তা হলে সহজে আর যেতে চায় না। এ যেন অপদেবতার স্কন্ধারোহণের মতো ব্যাপার আর কী, একবার কাঁধে চড়লে আর নামতে চায় না। অনেকেরই এ বিষয়ে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা আছে। Lebedeff বাংলার নাট্যগগনে ক্ষণকালের জন্য উদিত হয়ে অন্তর্হিত হলেন এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে তাঁর নাটকের অভিনেতা-অভিনেত্রীদের নাট্যপ্রীতি চলতি ভাষায় যাকে বলে নাটুকে বাইও শূন্যে মিলিয়ে গেল, এ কথা তাঁরা নিশ্চয়ই স্বীকার করবেন না।

লেবেডেফ সংগীতজ্ঞ ছিলেন। Cello বাজাতে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। এই কারণে ইংরেজ মহলে তাঁর যথেষ্ট প্রভাব ছিল, তিনি ইংরেজ শাসকের অনুগ্রহ লাভ করেছিলেন, গভর্নর জেনারেল স্যার জন সোরের কাছ থেকে অনুমতি পেয়েছিলেন বলেই তাঁর পক্ষে ওইরূপ আড়ম্বরপূর্ণ, সুসজ্জিত মঞ্চ নির্মাণ করে অভিনয় পরিবেশন করা সম্ভব হয়েছিল এ কথা সত্য।

গোলক দাসের ও অন্যান্যের যে সুযোগ বা সংগতি ছিল না, তাই তাঁদের পক্ষে ওইরূপ রঙ্গমঞ্চ নির্মাণ করে অভিনয় করা কল্পনাতীত ছিল, কিন্তু তাঁরা নূতন অভিনয়-আদর্শে দীক্ষিত হয়েছিলেন এবং সম্ভ্রান্ত এদেশীয় এবং উচ্চপদস্থ ইংরেজ কর্মচারীদের নিকট থেকে প্রশংসায় ধন্য হয়েছিলেন। এর পরও কি তাঁরা নীরব, নিষ্ক্রিয়ভাবে বসে থাকতে পারেন? তাঁরা অন্তত নূতন কোনো যাত্রাদল গঠন করে বা নিজদলে ফিরে গিয়ে তাকে এই নবীন ভাবধারায় প্রভাবিত করার চেষ্টা কি করেননি? কিন্তু তাঁদের কোনো অভিনয়ের ঘোষণা বা বিবরণ তৎকালীন পত্রপত্রিকায় পাওয়া যায় না। এটা খুবই সম্ভব, কারণ পূর্বেই বলেছি যে, এদের পক্ষে সংবাদপত্রের মাধ্যমে প্রচার করার মতো সংগতি ছিল না, প্রয়োজনও ছিল না।

গোলক দাস বহু পরিশ্রমে যেসকল বাঙালি অভিনেত্রী সংগ্রহ করেছিলেন— তারাই বা কোথা থেকে এল, পরে কোথায় আবার অদৃশ্য হল তাদের সম্বন্ধে অনুসন্ধানেরও যথেষ্ট অবকাশ রয়েছে।

তখনকার দিনে অভিনেত্রী বা নটী বলতেই নিম্নস্তরের নারী বা বারবনিতাদেরই বোঝাত। খিদিরপুরের ডক অঞ্চলে এদের অধিকাংশের আবাস ছিল। তারা সমাজে ছিল আপাঙ্‌ক্তেয়। কিন্তু গোলক দাস এদের মধ্যে থেকে অভিনেত্রী সংগ্রহ করেননি। তিনি অভিনেত্রী নির্বাচন করেছিলেন তাদের মধ্য থেকে— যারা তখন আসরে ঝুমুর গান গাইত, নৌকায় সারিগান, জারিগান গাইত এবং কীর্তনাদি নামগানের জীবিকা গ্রহণ করেছিল।

Lebedeff-এর নাটকীয় প্রস্থানের ফলে এদের নবজাগ্রত প্রতিভা অঙ্কুরেই বিনাশপ্রাপ্ত হল, কী পরবর্তী যুগে কোনো নূতন পথে বিকশিত হয়ে উঠেছিল— এ প্রশ্ন আজ আমাদের কাছে প্রহেলিকার মতোই রহস্যময়।

Lebedeff তাঁর রঙ্গমঞ্চকে বাঙালি রীতিতে সুসজ্জিত করেছিলেন বলে আমরা তাঁর প্রথম বিজ্ঞাপন থেকে জানতে পারি—'Mr. Lebedeff's New Theatre in the Doomtullah, decorated in the Bengali Style.'*

এই বঙ্গীয় পদ্ধতিতে মঞ্চসজ্জা করা হয়েছিল কথাটির অর্থ কী? বিজ্ঞপ্তিটির এই অংশের সম্বন্ধে চিন্তা করার যথেষ্ট অবকাশ রয়েছে। বাংলা দেশে Lebedeff-এর পূর্বে কোনো বাংলা রঙ্গমঞ্চ

---

* *Calcutta Gazette*, 5th Nov. 1795

ছিল না, সুতরাং ওই কথার মধ্যে Lebedeff কী বলতে চেয়েছেন— সেটা আবিষ্কার করাও দুরূহ ব্যাপার। তবে মনে হয়, মঞ্চের বহির্দেশ বঙ্গীয় সংস্কৃতির দ্যোতক আলপনা, মঙ্গল কলস, কলাগাছ প্রভৃতির দ্বারাই সজ্জিত হয়েছিল এবং দৃশ্যপটসমূহও বাংলা দেশের পরিবেশ অনুযায়ী অঙ্কিতহয়েছিল।

লেবেডেফের প্রথম বাংলা নাটকাভিনয়ের প্রভাব অনেক বিষয়ে আপাত-প্রতীয়মান না হলেও কয়েকটি বিষয়ে সমসাময়িক ও পরবর্তী যাত্রার উপর এর প্রভাব বেশ প্রত্যক্ষভাবেই অনুভব করা যায়। প্রাচীন যাত্রায় প্রবেশ বা প্রস্থান বলে কিছু ছিল না। অভিনেতারা দর্শকদের সঙ্গে আসরেই আসন গ্রহণ করত এবং আপন আপন অভিনয় শেষে আসর ত্যাগ না করে পূর্বের স্থানেই পুনরায় উপবিষ্ট হত। লেবেডেফের বেঙ্গলি থিয়েটারে বাংলা নাটক অভিনয় দর্শনের অভিজ্ঞতায় দেখা গেল, যে দৃশ্যে যে ক-জন অভিনেতা-অভিনেত্রীর অভিনয় থাকে, তাঁরাই কেবল রঙ্গমঞ্চের উপর উপস্থিত থেকে স্ব স্ব ভূমিকাকে রূপায়িত করার চেষ্টা করেন এবং অন্যান্য পাত্রপাত্রীরা তখন থাকেন নেপথ্যে,— লোকচক্ষুর অন্তরালে; যথাকালে তাঁরা মঞ্চে আবির্ভূত হন। মাত্র দু-চার জন অভিনেতার মঞ্চোপরি উপস্থিতিতে অভিনয় যেরূপ জমে উঠত এবং দর্শক ও শ্রোতৃমণ্ডলীর অন্তরে যেমন প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে দেখা গেল, আসরে একসাথে সকল অভিনেতার উপস্থিতিতে নাট্যরস তেমনভাবে দানা বেঁধে উঠতে পারত না।

বেঙ্গলি থিয়েটারে প্রথম বাংলা নাট্যাভিনয়ের প্রভাব প্রাচীন যাত্রার এই ত্রুটিকে অনেকাংশে মোচন করতে সক্ষম হল; প্রবেশ-প্রস্থানের অভিনব রীতি প্রচলিত হল বাংলা যাত্রার মধ্যে। সাজঘর যদি বেশ কিছুটা দূরে থাকত আসর থেকে, তা হলে অবশ্য আসরের সন্নিকটে এসে দাঁড়িয়ে থাকতে হত অভিনেতাদের।

প্রাচীন যাত্রায় কোনো অঙ্ক-বিভাগ ছিল না। মহাপ্রভুর সময় থেকেই সংস্কৃত নাটকের অনুরূপ যাত্রায় এই অঙ্ক-বিভাগের সূত্রপাত— এ-কথা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে।

লেবেডেফের যুগান্তকারী নাট্য-প্রচেষ্টার পর থেকেই যাত্রার মধ্যে দেখা গেল দৃশ্য-বিভাগ বা গর্ভাঙ্ক সৃষ্টির নবতম প্রয়াস। যাত্রার অভিনেতারা কোনো দৃশ্যপটের সহায়তা লাভ করল না বটে, কিন্তু সংস্কৃত নাটকের ন্যায় তারাও তাদের বিভিন্ন উক্তির মধ্য দিয়ে সংযোগস্থলকে ইঙ্গিতে বর্ণনা করার প্রয়াসী হল।

তৎকালে অভিনয়ের বিষয়বস্তু ছিল ভক্তিমূলক উপাখ্যান— দেবলীলা-বিষয়ক কাহিনি। সেই বিষয়বস্তুর ক্ষেত্রেও পরিবর্তন সূচিত হল। লেবেডেফই প্রথম গতানুগতিক আবহাওয়ার মধ্যে সামাজিক এবং ব্যঙ্গমূলক নাটক অভিনয়ের জন্য নির্বাচন করতে সাহসী হয়েছিলেন। লেবেডেফের নব প্রচেষ্টার প্রভাব পরবর্তী যাত্রা ও নাটক রচনার ক্ষেত্রে বিস্তারিত হল। তাই ভক্তিরসাত্মক বিষয় ব্যতীত সামাজিক, ব্যঙ্গ বা শ্লেষাত্মক হালকা বিষয়সমূহও যাত্রা বা নাট্যসৃষ্টির উপাদান রূপে গৃহীত হতে দেখা গেল। Lebedeff-এর *Disguise*-এর প্রভাব *কলিরাজার যাত্রা* নামক পরবর্তী একটি নাটকের উপর ছায়াপাত করেছিল এ কথা বলা বোধ হয় অসংগত হবে না।

১৮২১ সালে রচিত ও প্রকাশিত এই গ্রন্থটিকে অনেকে প্রথম বাংলা নাটকরূপে উল্লেখ করে থাকেন। এখানে 'যাত্রা' কথাটি প্রচলিত গীতাভিনয় অর্থে ব্যবহৃত হয়নি,— ব্যবহৃত হয়েছে 'গমন' অর্থে, কারণ এই গ্রন্থে কলিরাজাকে চট্টগ্রাম থেকে কলকাতায় গমন করতে দেখা যায়। এই কলিরাজার

* *Calcutta Review, volume XIII. 1850, page 160*
সংবাদ কৌমুদীতে প্রকাশিত সমলোচনায় ইংরাজী অনুবাদ।
ডাঃ হেমেন্দ্রনাথ দাসগুপ্তের The Indian Stage volume II-এর অষ্টম পৃষ্ঠা থেকে উদ্ধৃত।

যাত্রাকে শ্লেষাত্মক নাটকরূপে অভিহিত করা যায়। এই নাটকে— বৈষ্ণব, কলিরাজা, রাজার পাত্র, দেশান্তরীয় বেশধারী বিবিধ উপদেশকারী এক ব্যক্তি, চট্টগ্রাম থেকে আগত এক সাহেব ও বিবি এবং তাদের দাসদাসীরাই পাত্রপাত্রী। রঙ্গরস, হাস্যপরিহাস, বিবিধ বাদ্যযন্ত্র বাদন, অঙ্গভঙ্গি সহ নৃত্য, সংগীত, পারস্পরিক কথোপকথন প্রভৃতি ছিল এই নাটকের অঙ্গীভূত। ১৮২২ সালের ২৬ জানুয়ারির *সমাচার দর্পণ*-এ নূতন যাত্রা প্রসঙ্গে এই নাটকের ভূয়সী প্রশংসা করা হয়েছে। রাজা রামমোহন রায় সম্পাদিত *সংবাদ কৌমুদী* পত্রিকার ১৮২১ সালের অষ্টম সংখ্যায় 'কলিরাজার যাত্রা'টিকে কমেডি বলে অভিহিত করা হয়েছে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এটি একটি satire। এই নাটকটি মঞ্চে যে অভিনীত হয়েছিল তারও প্রমাণ পাওয়া যায়।

'A new drama Kalirajar Jatra is being performed' *

'The following is the order of their appearance on the stage...' **

যাই হোক, এসব থেকে আনায়াসে বলা যায় লেবেতেফের অনুসৃত আঙ্গিক ভবিষ্যৎ যাত্রায় ও বাংলা নাটকের ক্ষেত্রে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তারে সমর্থ হয়েছিল। লেবেতেফের এই প্রভাবের বিবরণ তৎকালীন সংবাদপত্রে কিছুই প্রায় পাওয়া যায় না এ কথা ঠিক, কিন্তু আগেই বলা হয়েছে, লেবেতেফের নাটকে অংশগ্রহণকারী অভিনেতা-অভিনেতৃবর্গ এবং গোলক দাস যদি কোনো যাত্রার দল গঠন করে, অথবা কোনো যাত্রার দলে গিয়ে অভিনয় করেও থাকেন (অভিনয় করা খুবই সম্ভব) কিংবা সে সময়কার যাত্রাগুলির মধ্যে লেবেতেফ-প্রদর্শিত আঙ্গিক গ্রহণ করে যদি কোনো যাত্রাওয়ালা অভিনয়ের ব্যবস্থাও করে থাকেন, তা হলেও সংবাদপত্রের মাধ্যমে প্রচারে ঢক্কানিনাদ করার ন্যায় অর্থানুকূল্য তাঁদের কারোরই ছিল না, আর তখন বাংলা সংবাদপত্রও প্রকাশিত হয়নি। তা ছাড়া লেবেতেফের *Disguise* অভিনয়ের সমালোচনাই বা কোন্ সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছিল? স্বীয় অর্থব্যয়ে অভিনয় সম্পর্কে বিজ্ঞপ্তি দিতে হয়েছিল লেবেতেফের মতো অর্থানুকূল্য এবং রাজানুগ্রহবিশিষ্ট ব্যক্তিকে। Lebedeff-এর নাট্যাভিনয় কীরূপ জনপ্রিয়তা ও জনসংবর্ধনা লাভ করেছিল তা আমরা জানতে পারি তাঁর বিজ্ঞপ্তি ও ঘোষণাগুলির প্রকৃতি দেখে এবং Lebedeff-এর স্বরচিত *Grammar*-এর ভূমিকা থেকে, সে সময়কার লেখক ও পত্রপত্রিকার সমালোচকদের কাছে নাট্যলোকও বাংলায় বোধ হয় খুব উল্লেখযোগ্য কিছু ছিল না। তাই প্রাচীন কলকাতার প্রায় সমস্ত ইতিহাসের মধ্যেই তৎকালীন নাট্যপ্রয়াস এমনকি বাংলা নাট্য আন্দোলনের যুগস্রষ্টা লেবেতেফের নামেরও কোনো উল্লেখ পাওয়া যায় না। এছাড়া সমালোচনা প্রকাশ করার মতো বাংলা সংবাদপত্রও উনিশ শতকের প্রথম পাদের শেষভাগের পূর্বে আত্মপ্রকাশ করেনি।

বাংলা নাট্য-অভিযানে পথপ্রদর্শক উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কস্বরূপ লেবেতেফ এবং গোলক দাসের বিষয় ও লেবেতেফ-উত্তর যুগে রঙ্গমঞ্চে তাঁর প্রথম বাংলা নাটক অভিনয়ের প্রভাব সম্পর্কে গভীরভাবে গবেষণা করার জন্য সমালোচকগণ ও তত্ত্বানুসন্ধানী ছাত্রগণের কাছে একান্ত অনুরোধ রইল,— তাঁদের সার্থক পরিশ্রমের দ্বারা এ বিষয়ে বহু অজ্ঞাত সত্যের যবনিকা উত্তোলিত হবে এবং বাংলা নাট্য-আন্দোলনের ইতিহাসও ধারাবাহিকতা লাভ করে সম্পূর্ণাঙ্গ হয়ে উঠবে।

উৎস : *বাংলা নাট্য-বিবর্ধনে গিরিশচন্দ্র* (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৯৫৭ সালের গিরিশ-বক্তৃতামালা থেকে নির্বাচিত অংশ : সম্প্রসারণ)।

বাংলা দেশের যাত্রাভিনয়

শান্তিদেব ঘোষ

ভারতবর্ষে 'যাত্রা' কথাটির ব্যবহার একমাত্র বাংলা দেশেই আজকাল প্রচলিত। বাঙালিরা 'যাত্রা' অর্থে এমন এক ধরনের নাটকের অভিনয়কে বোঝে যে, যার জন্যে শহরের মতো রঙ্গমঞ্চের দরকার হয় না। চারিদিক খোলা, বাঁশের বা কাঠের খুঁটিতে টাঙানো মাথার উপরে শামিয়ানা। জমিদারবাড়ির পুজোর দালানের সামনে কাঠের বা থামের উপর বিরাট আটচালা বা ইটের বাঁধানো থামের উপর ছাদ বসানো যে মণ্ডপ থাকে, তারই ঠিক মাঝখানে একটি অভিনয় উপযোগী গোলাকার বা চতুষ্কোণ স্থান ফাঁকা রেখে, তাকে ঘিরে বসে ঐকতান বাদক দল, প্রম্পটার ইত্যাদি সকলে।

তাদের পরেই চারিদিকে বসে যায় দর্শকের দল। সাধারণ আঙিনায় অভিনয়স্থল মাটি দিয়ে হাতখানেক উঁচু করতে দেখেছি অনেক জায়গায়। গ্রামাঞ্চলে এতদিন বিজলিবাতি ছিল না, তাই জোরালো পেট্রোমাক্স-জাতীয় বাতি ঝুলিয়ে আলোর কাজ সারা হত। আগেকার দিনে বড়ো বড়ো জমিদারদের বাড়িতে ঝাড়লণ্ঠন-জাতীয় কেরোসিন বা মোমের বাতি দেখেছি। সম্প্রতি গ্রামাঞ্চলেও বিজলিবাতি দেখা দিয়েছে। সুখের বিষয় এখনও মাইকের ব্যবহার তাদের মধ্যে শুরু হয়নি। অভিনেতারা সাধ্যমতো উঁচুসুরে গান গায়, কথা বলে। তাতেই শতশত দর্শকের কানে তারা তাদের কথা বা গান পৌঁছে দিতে পারে। দর্শকদের জন্যে চেয়ার দরকার হয় না। সকলেই বসে মাটিতে শতরঞ্চি বিছিয়ে। অভিনেতাদের অভিনয় স্থানটি শতরঞ্চিপাতা সেই মাটিরই উপরে। যুদ্ধের পর মৃত্যুর দৃশ্য সহসা আগমন অন্তর্ধান থাকলেও সেই অভিনেতাদের কিছুই আসে যায় না। দর্শকেরা দেখে, সকলের সামনে দিয়েই অভিনেতারা রঙ্গস্থলের বাইরে চলে যাচ্ছে বা বাইরে থেকে হেঁটে এসে সহসা আবির্ভাব বা অন্তর্ধানের দৃশ্যের অবতারণা করল। বড়ো বড়ো শহরের থিয়েটারবিলাসী দর্শকদের কাছে এ ধরনের দৃশ্য হাসির খোরাক জোগায়, কিন্তু গ্রামবাসীদের কাছে এটা অতি নগণ্য জিনিস। তারা মনে করে যাত্রার অভিনয়ে এটিই স্বাভাবিক। এর প্রতি তারা মোটেই কোনো গুরুত্ব আরোপ করে না। তাদের কাছে যাত্রার মূল বিষয়বস্তুই হল প্রধান।

অভিনয় সচরাচর আরম্ভ হয় রাত্রিতে খাওয়াদাওয়ার পরে। শেষ হতে রাত ভোর হয়ে যায়। অভিনেতাদের একটি সাজঘর করে নিতে হয় রঙ্গস্থলের নিকটবর্তী কোনো-এক ঘরে বা কোনো বাড়ির বারান্দাকে আড়াল করে। যেখানে কাছাকাছি বাড়িঘর নেই সেখানে তালপাতা বা খড়ের ঘর তৈরি করে; সেখান থেকে হেঁটে আসে অভিনেতারা রঙ্গস্থল পর্যন্ত, আবার সেই ভাবেই ফিরে যেতে হয় সাজঘরে। দর্শকদের মাঝখান দিয়ে একটু সরু পায়ে হাঁটার পথ থাকে এর জন্যে। প্রথমেই শুরু হয় ঐকতানে কনসার্ট সংগীত। কনসার্টের বাজনা হল আজকাল হারমোনিয়াম, ক্লারিয়োনেট, কর্নেট, ট্রাম্পেট, বেহালা, ঢোল, তবলা, বাঁয়া ও মন্দিরা। ২০—৫০ বছর আগে হারমোনিয়ামের সঙ্গে বেহালা যন্ত্রের অত্যধিক ব্যবহার ছিল। কর্নেট-ট্রাম্পেট তখন ছিল না। যাত্রার দলের প্রম্পটার-এর হাতে একটি ভারী কাঁসার ঘণ্টা থাকে, সেটির শব্দে ঠিক সময়ে অভিনেতাদের প্রবেশের ইঙ্গিত করা হয়। যাত্রার ঐকতান বাজনার সময় ঢোলের তাল বাজে কতকটা পাখোয়াজের বাজনার ঢঙে। গানের ও নাচের সময় বাজে তবলা বাঁয়া। যাত্রার সখীদের নাচের প্রাধান্য ছিল খুব। আজকাল তা ধীরে ধীরে কমে আসছে। আর থাকে দর্শকদের মনকে হালকা আমোদে খুশি করবার মতো গান ও তার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে এক রকমের হাসির নাচ। সাধারণত এ নাচে একজন পুরুষ ও একজন মেয়ে সাজে। যেমন জেলে-জেলেনি, ঘেসেড়া-ঘেসেড়ানি ইত্যাদি। কখনও একলার নাচও থাকে সং সেজে হাসির গানের সঙ্গে। এই নাচের আসল উদ্দেশ্য হল সমগ্র রাত্রিব্যাপী অভিনয়ের মাঝে মাঝে একটু হালকা রসের অবতারণা করা। যাত্রাদলের ওস্তাদ নাচিয়েরাই এই নাচ অধিক করে। সখীদের ও এদের নাচ বেশ জমে উঠলে বা দর্শকদের মনঃপূত হলে 'এনকোর-এনকোর' ধ্বনিতে যাত্রার আসর মুখরিত হয়ে উঠবে। নাচিয়েরা এই ধ্বনিতে উৎসাহিত হয়ে পুনরায় সেই নাচটি দর্শকদের দেখায়। যাত্রায় পুরুষদের স্ত্রী চরিত্রে অভিনয় করার রীতি আজও প্রচলিত। কেবল মেয়েদের দ্বারা অভিনীত যাত্রার দলের কথা কদাচিৎ শোনা যেত।

যাত্রার সাজপোশাকে উনবিংশ শতকের শেষার্ধের কলিকাতার থিয়েটারের প্রভাব খুব। রাজা, রানি, রাজপুত্র, সেনাপতি, মন্ত্রী, সেপাই, সন্ন্যাসী, গ্রামবাসী ইত্যাদি সকলকেই সাজানো হয় ওই আদর্শে। এইসব সাজের আমদানিও হয় কলকাতার দোকান থেকে।

যাত্রায় গান থাকে প্রচুর। আজকাল দেখা যাচ্ছে গানের বেশির ভাগ অভিনেতারা নিজেরাই গায়। মাঝে মাঝে 'বিবেক' নামে একটি চরিত্র রঙ্গস্থলে প্রবেশ করে অভিনয়ের মাঝখানেই গান করে যায়। এর গানের কথার সঙ্গে নাটকের বিষয়ের যোগ থাকে। অবান্তর বিষয় নিয়ে গায় না। বিবেকের গান গাওয়া ছাড়া আর কোনো কাজ নেই। এর গানের সময় অভিনেতারা চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে। এ যুগে এখনও যাত্রায় গানের প্রাচুর্য থাকলেও পূর্বের তুলনায় তা কমে গেছে। যাত্রায় গান ব্যবহারের একটা বিশেষ পদ্ধতি আছে। অভিনেতাদের মুখের কোনো কথা সাধারণ স্বরে বলার পরেও তাকে গানের ভাষায়, সুরে ও তালে আর-একবার বলানো হয় সেই ভাবটিকে দর্শকের মনে আরও গভীরভাবে বসিয়ে দেওয়ার জন্যে। তার জন্যেই যাত্রায় গানের এত আদর এবং গানগুলির এত প্রয়োজন।

বছর-চল্লিশ আগে যাত্রায় এক দল বিশেষ ধরনের গাইয়ে দেখা যেত, যাদের বলা হত 'জুড়ি' এবং 'ছোকরার দল'। এদের কাজ ছিল অভিনেতাদের হয়ে গানগুলি গেয়ে শোনানো, রঙ্গস্থলে দাঁড়িয়ে। অভিনেতারা সে যুগে কম গাইত। জুড়িরা সাধারণত হত বয়স্ক। তাদের মাথায় থাকত আগেকার দিনের উকিল-মোক্তারদের মতো কাপড়ের গোল টুপি, গায়ে কালো রঙের চোগাচাপকান। এদের গলা হত খুব মিহি এবং খুব উঁচু সুরে এরা গাইতে পারত। ছোকরার দল হত বয়সে বালক। পরত সাধারণ-ভাবে ধুতিচাদর। জুড়ি ও ছোকরারা প্রথম থেকে রঙ্গস্থলেই বসে থাকত। ঠিক গানের সময় উঠে

পড়ত। এক-একটি গান জুড়ি বা ছোকরার দলের শেষ করতে সময় লাগত অনেক। হিন্দি ওস্তাদি গানের মতো তান বিস্তার এসব গানে ছিল না। যাত্রার অধিকাংশ গানই ছিল উচ্চাঙ্গের রাগিণীসংগীত ও তার তালে বাঁধা, যাত্রায় জুড়িদের গান গাইবার একটা বিশেষ প্রথা ছিল। এই দল চার সারিতে রঙ্গ-স্থলের চারদিকে শ্রোতাদের দিকে মুখ করে গান আরম্ভ করত। একই গান অনেক বার করে গাইত। এক সারিতে গাইয়ে অপরের সঙ্গে জায়গা বদল করত পুনরুক্তির সময়। উদ্দেশ্য ছিল দর্শকেরা যাতে গাইয়েদের সকলের মুখ দেখতে পায়। এর ব্যতিক্রম হলে তারা মনে করত যাত্রার গান ঠিকভাবে হচ্ছে না।

যাত্রায় সখীদের নাচই ছিল প্রধান। কিন্তু সম্প্রতি আগের মতো নাচের বৈচিত্র্য নেই। আজকাল গ্রামাঞ্চলের যাত্রাদলের সখীর নাচ অনেক কমে এসেছে। তার একটি বড়ো কারণ হল যাত্রাপদ্ধতির নৃত্যশিক্ষকের অভাব।

সখীদের নাচ আগেকার দিনের কলিকাতার রঙ্গমঞ্চের নাচের অনুকরণেই গঠিত ছিল। নাচের কম্পোজিশন-এ ছিল পারসি থিয়েটারের প্রভাব। সাজপোশাক ছিল অবিকল সেই রকমের। বাংলার বিখ্যাত খ্যামটা নাচের অনুকরণে কোমর দোলানোর নানা ভঙ্গিই ছিল এ নৃত্যের প্রধান অঙ্গ। পারসিরা কম্পোজিশনের দিকে বিলিতি নাচের অনুকরণ যে করত তা দেখলেই বোঝা যেত। তবে আগের দিনের থিয়েটারে যে বৈচিত্র্য দেখা যেত, কম্পোজিশনে যাত্রাওয়ালারা ততটা পারেনি কোনোদিনই। আসরের চারদিকের দর্শকদের জন্যে অনেকটা সহজ করে নিয়েছে তারা।

সং-এর নাচ যাত্রার একটি বিশেষ অঙ্গ। যদিও নাটকের বিষয়ের সঙ্গে তার যোগ বড়ো থাকে না, তবু এ নাচ না থাকলে দর্শকরা খুশি হয় না। এই নাচ গানের সঙ্গেই হয়, তাই এই গানগুলিকে হাসির গানের পর্যায়ে অনায়াসে ফেলা যায়। যারা এ নাচ করে তারা সাধারণত হয় যাত্রার নাচে বিশেষ পারদর্শী। অধিকাংশ সময়ে 'ডান্সমাস্টার' অর্থাৎ যাত্রার নৃত্যশিক্ষক এ নাচ দেখায়। এদের সঙ্গে সার্কাসের ক্লাউনদের ক্ষমতার তুলনা করা যেতে পারে। এই নাচের দ্বারা শ্রোতাদের যাত্রার গম্ভীর আবহাওয়া থেকে একটু হালকা আবহাওয়ায় নিয়ে যাওয়াই হল আসল উদ্দেশ্য। কখনও কখনও যাত্রায় এক ধরনের নাচকে 'বলডান্স' বলতেও শুনেছি। এই নাচটি সং-এর নাচ নয়। একবার একটি যুবক মাথায় পরপর চারটি মাটির কলসি রেখে, হাতে না ধরে, বাজনার তালে তালে নাচতে লাগল। কখনও সেই অবস্থায় বসছে, উঠছে, নানাপ্রকার ভঙ্গি করছে হাত নেড়ে কিন্তু মাথার কোনো নড়চড় নেই। কী কারণে একে তারা 'বলডান্স' বলে তার কোনো যুক্তিপূর্ণ উত্তর পাইনি। এই নাচ উত্তর ভারত ও দক্ষিণ ভারতের গ্রামাঞ্চলে আজও দেখা যায়। এ ছাড়া একজন পুরুষ ও একজন মেয়ে পরস্পরের প্রতি গানের সুরে নানারূপ আদিরসাত্মক বাক্য হেনে যে নাচ দেখায় তাকে যাত্রায় 'ডুয়েট' বলে। এই নাচেও দর্শকরা খুব আমোদ পায়। পূর্বের ন্যায় এ নাচ এখন দেখা যায় কম। ইদানীং কলিকাতার আধুনিক নাচের প্রভাবে নতুন কয়েকপ্রকার নাচ দেখা যাচ্ছে যাকে 'ওরিয়েন্টাল ডান্স' বলছে। এই পদ্ধতির সঙ্গে পূর্বের ধারার যোগ প্রায় নেই বললেই চলে।

এখন কথা হচ্ছে এইসব নাটকের অভিনয়কে আমরা 'যাত্রা' বলি কেন? যাত্রা কথার সাধারণ অর্থের সঙ্গে এর মিল কোথায়? এর উত্তর পেতে হলে এই শব্দটির বিষয়ে একটু আলোচনা দরকার।

বাংলা দেশে 'যাত্রা' শব্দের ইতিহাস নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে বহুদিন থেকেই বহু রকমের আলোচনা হয়ে আসছে। তার থেকে তারা শেষপর্যন্ত এই সিদ্ধান্তে এসেছেন যে, প্রাচীন ভারতে কোনো দেবতার উৎসব উপলক্ষে উৎসবদিনে নৃত্যগীতপূর্ণ যে শোভাযাত্রা বের হত—তাকেই বলা হত 'যাত্রা'। এই

অর্থে যাত্রা শব্দের প্রথম প্রয়োগ পাওয়া যায় কৌটিল্যের *অর্থশাস্ত্র* অর্থাৎ খ্রিস্টপূর্ব প্রায় ৪০০ বছর আগেকার এক বইয়ে। এর পরে এই উৎসবদিনের দেবতার মাহাত্ম্য প্রচারের জন্যে যেসব নৃত্যাভিনয় হত তারও নাম হল যাত্রা। বৌদ্ধ যুগের সাহিত্যে, *রামায়ণ, মহাভারত* ইত্যাদি অনেকগুলি প্রাচীন বইয়ের বর্ণনায় দেখা যায় যে, সব রকমের উৎসবদিনের শোভাযাত্রায় নট নর্তক গায়ক বাদকেরা থাকত। এরা যে কেবল রাস্তায় সহজভাবে হেঁটেচলে যেত তা নয়; রীতিমতো উচ্চাঙ্গের নৃত্যগীতের দ্বারা সেই শোভাযাত্রাকে মাতিয়ে রাখত। উৎসবদিনের শোভাযাত্রায় এইরূপ একটি উৎকৃষ্ট নিদর্শন আজও দেখা যায় সিংহলের ক্যান্ডি শহরে। বুদ্ধের দন্ত উৎসবের দিনে হাতির পিঠে যখন দন্তটিকে শহর প্রদক্ষিণে বের করা হয় তখন তার পিছনে থাকে ক্যান্ডি প্রদেশের নৃত্যগীতের বিভিন্ন দল। সমস্ত প্রদক্ষিণপথ নৃত্য, গীত ও বাজনায় তারা মুখর করে রাখে। এই ধরনের শোভাযাত্রার নাচগানে উচ্চশ্রেণির নট নর্তকরা থাকত বলেই ক্রমে ক্রমে উন্নত ধরনের নৃত্যাভিনয় ওই দিনে সহজেই স্থান পেত। এইভাবে দেবতার নামে উৎসবদিনে দেবমাহাত্ম্য-প্রচারমূলক নৃত্যগীতাভিনয় 'যাত্রা' নামেই চলতে থাকে।

পণ্ডিতেরা বলেন, অভিনয় অর্থে যাত্রা শব্দটির ব্যবহার বাংলা দেশ আজও বাঁচিয়ে রেখেছে। শোনা যায় নেপালে নাকি নাটকের অভিনয় অর্থে 'যাত্রা' শব্দের ব্যবহার আছে। যদিও বাংলার প্রাচীন যাত্রার সঙ্গে এ যুগের যাত্রার আকাশপাতাল তফাত, তবু আজও উৎসবদিনে যাত্রাদলের অভিনয় হয়। দুর্গাপূজার ওই বিরাট উৎসবদিনের যাত্রা-অভিনয়ের কথা বাঙালিরা কে না জানে।

ইংরেজ-পূর্ব যুগে 'যাত্রা' ছিল প্রকৃতপক্ষে গীতাভিনয়। কতকটা পাঁচালিগানের মতো। মূল গায়েন বা পাত্র থাকত তিনটি। একটি নারদমুনি থাকত। তার কাজ ছিল মাঝে মাঝে হাস্যরসের অবতারণা করা। প্রথম যুগে যাত্রার বিষয় ছিল 'কৃষ্ণলীলা'। তার মধ্যে বিশেষ করে 'কালিয় দমন' পালা ছিল অতি প্রচলিত। এই 'কালিয়দমন' বিষয়ের একটি বিবরণ এখানে তুলে দিই। তাতে আছে—

> একজন বৈষ্ণব এক পুষ্করিণীর উপর কৃষ্ণযাত্রা অভিনয় করে। পুষ্করিণীটির নাম দেওয়া হইয়াছিল কালিয় হ্রদ।
>
> মধ্যস্থলে এক অজগর কালিয় সর্প, জল হইতে ফণা বিস্তার করিয়া রহিয়াছে, সেই ফণার উপর কৃষ্ণ দাঁড়াইয়া বেণু বাজাইতেছেন, আর মধ্যে মধ্যে নয়ন ঢোলাইয়া নৃত্য করিতেছেন। নৃত্যপীড়নে কালিয়ের প্রাণ ওষ্ঠাগত হইতেছে, চারি পার্শ্বে তাহার স্ত্রীগণ জল হইতে অর্ধাঙ্গ তুলিয়া জোড় করে কৃষ্ণকে মিনতি করিতেছে— কখনও তাহা কথায়, কখনও বা গীতে। নিকটে মাচার উপর মৃদঙ্গ, করতাল, খরতাল বাজিতেছে, তথায় বসিয়া যাত্রাওয়ালারা 'দোয়ার্কি' করিতেছে।

১৭৩২ খ্রিস্টাব্দের সময়ে শ্রীদাম ও সুবল নামে দুই ভাই কালিয়দমন যাত্রা করত। এরা দু-জন কৃষ্ণলীলা যাত্রাকে উন্নত ও পুষ্ট করে।

> এইজন্য আদি কৃষ্ট-যাত্রা সকলের প্রস্তাবকদ্বয়কেঅর্থাৎ জুড়িদিগকে অনেক কাল ধরিয়া ছিদাম ও সুবল নামে ডাকা হইত।
>
> যাত্রার মৌলিক আকার সংগীত মাত্র ছিল। প্রথমত মঙ্গলসংগীত অর্থাৎ উপাস্য দেবতার স্তুতিগান দ্বারা যাত্রাভিনয় আরম্ভ হইত, পরে অধিকারী বা অভিনয় রচয়িতা অথবা অভিনয় সংসৃষ্ট ব্যক্তিদ্বয় অর্থাৎ জুড়ি দ্বারা অভিনয়ঘটিত সমস্ত বৃত্তান্তের পূর্বাভাস বা প্রস্তাবনা সংগীত দ্বারা ব্যক্ত করা হইত। লব কুশ ইহার আদি প্রস্তাবক এই আখ্যা প্রদত্ত হইত। সকল কৃষ্ণযাত্রার প্রথমে একজন ব্যাসদেব সাজিয়া প্রস্তাবনা করে। সাবেক যাত্রাওয়ালারা কথাবার্তা সুরে কহিত এবং সুরের নিমিত্ত কথা একটু টানিয়া কহিত। তাহাদের লোকবিশেষের স্বর স্বতন্ত্র ছিল।

ব্যাসদেবের স্বর পিতল পাত্রের ন্যায় বাজিত। কণ্ঠস্বর সেরূপ না হইলে কেহ ব্যাসদেব সাজিতে পাইত না। বিরহিণীদের আর একপ্রকার সুর ছিল।

বসন্তে শ্রীকৃষ্ণের দোলযাত্রা শরতে রাসযাত্রা, এবং বর্ষায় রথযাত্রা, সম্বৎসরের মধ্যে এই তিন সময়ে শ্রীকৃষ্ণের তৎকালিক লীলাঘটিত বিষয়সকল ব্যতীত অন্য কোনো বিষয় পুরাকালে যাত্রাকারে অভিনীত হইত না এবং উল্লিখিত তিন সময় ব্যতীত তৎকালে যাত্রাভিনয় হইত না। পরে কৃষ্ণলীলাঘটিত সমস্ত বিষয়, অর্থাৎ মানভঞ্জন, কলঙ্কভঞ্জন, প্রভাস মিলন, মাথুর, জন্মাষ্টমী, কংসবধ প্রহ্লাদ-চরিত্র, ধ্রুব-চরিত্র প্রভৃতি অভিনয় সকলসময়ে এবং সকল প্রকার পর্বে ও উৎসবে বারোমাসই অভিনীত হইতে লাগিল।

বৈষ্ণবদের দেখাদেখি শৈব ও শাক্তরাও শিব ও শক্তি-বিষয়ক যাত্রার চলন করেন।

সেকালের কৃষ্ণযাত্রায় শ্রীকৃষ্ণ, রাধা, রাখাল বালক, গোপী, দূতী সকলেই সুরে কথা বলিত। যাত্রায় একার গান, প্রশ্ন-উত্তরের ছলে দু-জনের গান, তিন জনের ও বহু জনের কোরাস গানও ছিল। যাত্রার দলে আগে ১০ থেকে ১৪টি খোল একসঙ্গে বাজত। কারণ যাত্রার গান ছিল কীর্তনের ঢঙে ও সুরের।

যাত্রায় জয়দেবের পদাবলি আবৃত্তি, ব্যাখ্যা ও গান হত, মাঝে মাঝে কথোপকথন থাকত। প্রাচীন মহাজন পদাবলিও ওই পদ্ধতিতে যাত্রায় স্থান পেয়েছে।

পণ্ডিতদের মত যে, চৈতন্যদেবের সময় থেকে প্রায় ১৮৪২ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত কালিয়দমন বা নামের প্রাচীন পদ্ধতির যাত্রা বাংলা দেশে চালু ছিল।

১৮২০ খ্রিস্টাব্দের কাছাকাছি সময় থেকে প্রাচীন পদ্ধতির যাত্রার পরিবর্তন শুরু হয়। এই যাত্রাকে কলিকাতাবাসীরা নাম দিয়েছিল 'শখের যাত্রা' বা নতুন যাত্রা। নানাপ্রকার রাগরাগিণীযুক্ত গীত, বাদ্য, নৃত্য ও কথোপকথন ছিল এর প্রাণ। যাত্রার এই পরিবর্তনের কারণ ছিল ইংরেজি থিয়েটারের প্রভাব। এই পরিবর্তিত প্রথম যুগের যে কয়টি যাত্রার নাম পাওয়া গেছে, সে কটি হল '*কলিরাজার যাত্রা*', *নল-দময়ন্তী যাত্রা* ও *বিদ্যাসুন্দর যাত্রা*। পরে '*বিদ্যাসুন্দরযাত্রা*' দেশে বিখ্যাত হয়ে ওঠে গোপাল উড়ে নামক একজন যাত্রাওয়ালার চেষ্টায়। এ সময়ের যাত্রায় মালিনীর নাচ বিশেষ করে দেখানো হত। তাছাড়া 'কালুয়া ভুলুয়া', 'মেথর মেথরানি', 'ঘেসেড়া ঘেসেড়ানি', 'নাপিত নাপিতানি'-দের নাচ ও গানের মধ্যে ছিল প্রবলভাবে হাস্যরস বিতরণের চেষ্টা। উনবিংশ শতকের মাঝখান থেকে এই ধরনের নাচ ও গান অশ্লীলতাদোষে দুষ্ট হয়ে ওঠে। নতুন যাত্রার যুগেই প্রথম ঢোল, তবলা, বাঁয়ার সংগত ও টপ্পার সুরের গান প্রবেশ করে।

এই 'শখের যাত্রা' বা যাকে বলা হত নতুন যাত্রা, তারও পরিবর্তন ঘটল উনবিংশ শতকের শেষার্ধে, ১৮৭৬ খ্রিস্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে। তখন কলিকাতা অঞ্চলে পেশাদারি থিয়েটারের খুব প্রাধান্য। তারই দেখাদেখি যাত্রায় দেখা দিল থিয়েটারকে হুবহু অনুকরণ করার দিকে ঝোঁক। আরম্ভে যাত্রার যে বর্ণনা দিয়েছি তার সূত্রপাত এই সময় থেকে।

উনবিংশ শতকের আগের যাত্রাকে বলা চলে সম্পূর্ণরূপে গীতিনাটক। কীর্তন ও পাঁচালির প্রভাবে তা রচিত ও গীত হত। এ যুগের মতো বহু লোক সমন্বয়ে তা অভিনীত হত না। গাইবার উপযোগী লোক পেলেই তার কাজ চলে যেত। শখের যাত্রায় প্রথমে অনেক লোকের প্রয়োজন হল। থিয়েটারের যুগে যাত্রায় গান রচনা হত হিন্দি, ধ্রুপদ, ধামার, খেয়াল, টপ্পার ঢঙে। থিয়েটারি প্রথায় বহু যন্ত্র সমন্বয়ে ঐকতান বাজনা যাত্রায় দেখা দিল ওই যুগে। এখন থেকে যাত্রায় কথা হল প্রধান।

অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতকের খ্যাতনামা যাত্রাওয়ালাদের মধ্যে যাঁদের নাম আজ পর্যন্ত জানা গেছে তাঁরা হলেন—

(১) শিশুরাম (২) শ্রীদাম (৩) সুবল (৪) পরমানন্দ (৫) প্রেমচাঁদ (৬) আনন্দ (৭) জয়চাঁদ (৮) লোচন (৯) বদনচন্দ্র (১০) নীলকমল (১১) গোবিন্দ (১২) রামচন্দ্র (১৩) গোপাল উড়ে (১৪) নারায়ণ দাস। (১৫) দুগ্‌গ ঘড়িয়াল (১৬) বৈকুণ্ঠ (১৭) লোকা ধোপা (১৮) বগ্‌নেড়ে (১৯) ব্রজ রায় (২০) মতি রায় (২১) রাধাকৃষ্ণ বৈরাগী (২২) নবীন ডাক্তার (২৩) অভয় দাস (২৪) নীলকণ্ঠ মজুমদার (২৫) বউ মাস্টার (২৬) কৃষ্ণকমল গোস্বামী (২৭) রাধাকৃষ্ণ (২৮) কালী হালদার (২৯) লোকনাথ (৩০) হরিপদ চট্টোপাধ্যায় (৩১) মতিলাল ঘোষ (৩২) নীলকণ্ঠ (৩৩) মতিলাল রায় (৩৪) ধর্মদাস (৩৫) ঠাকুরদাস মুখার্জি (৩৬) রামচাঁদ মুখার্জি (৩৭) অভয় দাস (৩৮) নিমাই দাস (৩৯) নিতাই দাস (৪০) মদনমোহন মাস্টার।

যাত্রায় বিষয়বস্তুর পরিবর্তন কীভাবে ঘটে এবারে তা দেখা যাক। প্রথমদিকে যাত্রার অভিনয় হত ধর্মবিষয় অর্থাৎ কালিয়দমন নিয়ে। তার পর এল কৃষ্ণ-বিষয়ের নানা গল্প। *রামায়ণ*, *মহাভারত* ও নানাপ্রকার পৌরাণিক বিষয়ের যাত্রা দেখা দিল পরে। উনবিংশ শতকের শেষ দিকে সামাজিক ও ঐতিহাসিক বিষয়ের যাত্রা পেলাম। বিংশ শতকের আরম্ভে দেখা দিল রাজনৈতিক বিষয়ের যাত্রা। এই যাত্রার সঙ্গে স্বদেশি যুগের মুকুন্দ দাসের নাম বিশেষভাবে জড়িত হয়ে আছে।

কিছুকাল পূর্বে শিল্পগুরু অবনীন্দ্রনাথের রচনায় একপ্রকার যাত্রার কথা দেশবাসী জানতে পেরেছে। এর বিষয়বস্তু সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের। কাল্পনিক বিষয় নিয়ে এগুলি রচিত। অসংলগ্ন ঘটনার সমাবেশে এ এক রকমের হাস্যরসাত্মক যাত্রা। কতকটা সুকুমার রায়ের *আবোলতাবোল* জাতীয়। সেইরূপ নির্মল হাস্যরস তিনি যাত্রার সাহায্যে শিক্ষিত শ্রোতাদের কাছে বিতরণ করতে চেয়েছেন। এ বিষয়ে অবনীন্দ্রনাথ যে প্রথম পথ দেখালেন, তা নিঃসন্দেহে বলা চলে।

গুরুদেব রবীন্দ্রনাথের মধ্যেও যাত্রার প্রভাব খুব লক্ষ করি প্রথম *শারদোৎসব*, *ফাল্গুনী* ইত্যাদি নাটকের মধ্যে। শেষ জীবনে রচিত *তাসের দেশ* হল সম্পূর্ণরূপে এ যুগের যাত্রাপদ্ধতির গীতি-নাটক। এইসব নাটকে গান আছে। গানগুলি নাটকের কথা হিসাবে বসানো। যেখানে কথায় বলা শেষ হচ্ছে না, তাকে যেন গানে প্রকাশ করা হচ্ছে। এই নাটকগুলিতে বিষয়ের নতুনত্বও লক্ষণীয়। লিরিক-ধর্মী নাটক যাত্রার আঙ্গিকে রচিত। এগুলি ধর্মবিষয়ক নয়, ঐতিহাসিক সামাজিক নয়, যা হাস্যরসেরও নাটক নয়। গুরুদেবের নাটকে অন্যান্য যাত্রার মতো কনসার্টের ব্যবহার নেই।

যাই হোক, আসলে আমরা এ যুগে যাত্রা নামে যেসব নাটকের অভিনয় দেখি তা হল কলিকাতার থিয়েটারের একটি গ্রামীণ সংস্করণ; অর্থাৎ উনবিংশ শতকের শেষার্ধে কলিকাতার রঙ্গমঞ্চের জন্যে যে ভাবে নাটক লেখা হত, যেভাবে রঙ্গমঞ্চে তার অভিনয় হত, যেভাবে প্রতি অঙ্কের আরম্ভে যন্ত্রসংগীত ঐকতান বাজত, যেভাবে অভিনেতাদের সাজানো হত, যেভাবে সখীরা নাচত বা যে-ভাবে হাসির গান ও নাচের দ্বারা লোকরঞ্জন করার চেষ্টা হত, তার সবই যাত্রায় পাওয়া যায়। কেবল পাওয়া যায় না থিয়েটারগৃহ, রঙ্গমঞ্চ, দৃশ্যসজ্জা ও তার আলোকসম্পাতের বিচিত্র ব্যবস্থা। এ-কটি বাদে আর কোনো পার্থক্য চোখে পড়ে না।

উৎস : *গ্রামীণ নৃত্য ও নাট্য*, ১৮৮১।

বাংলার প্রথম বাঙালি প্রবর্তিত বাংলা সংবাদপত্র

অমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ

বাংলার প্রথম বাংলা সংবাদপত্র কী, তাহা লইয়া অনেক দিন ধরিয়া নানা বাদানুবাদ চলিতেছে। *সমাচার দর্পণ*-ই যে প্রথম বাংলা সংবাদপত্র ইতিপূর্বে আমি তাহাই প্রতিপাদন করিতে চেষ্টা করিয়াছিলাম। *সমাচার দর্পণ* ১৮১৮ খ্রিস্টাব্দের ২৩ মে[১] শনিবার প্রথম প্রকাশিত হয়।

কাহারও কাহারও ধারণা *বেঙ্গল গেজেট* নামক একখানি সংবাদপত্র *সমাচার দর্পণ*-এর পূর্বে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়। গঙ্গাকিশোর বা গঙ্গাধর ভট্টাচার্য তাহা বাহির করেন। পাদরি লঙ্ ১৮৫০ খ্রিস্টাব্দে *সমাচার দর্পণকে* প্রথম সংবাদপত্র বলিয়াছিলেন, কিন্তু পরে ১৮৫৫ ও ১৮৫৯ খ্রিস্টাব্দে কোনো ধাঁধায় পড়িয়া বেঙ্গল গেজেটকে প্রথম সংবাদপত্র বলিয়া বর্ণনা করেন। ইনি লেখেন যে, ১৮১৬ খ্রিস্টাব্দে *বেঙ্গল গেজেট* নামে প্রথম সংবাদপত্র বাহির হয়। গঙ্গাধর ভট্টাচার্য *বিদ্যাসুন্দর*, *বেতালপঞ্চবিংশতি* প্রভৃতি পুস্তকের সচিত্র সংস্করণ বেচিয়া বেশ দু-পয়সা করেন। তার পর এই কাগজখানি বাহির করেন। অল্পকালের মধ্যে কাগজখানি উঠিয়া যায়। সম্প্রতি *বেঙ্গল গেজেট* সম্বন্ধে পুনরালোচনা হইয়াছে।[২] সেই আলোচনার পূর্বে পূর্বে প্রকাশিত মতগুলি ছাড়া কয়েকটি নূতন মতের অস্তিত্ব জানা গিয়াছে। তবে *বেঙ্গল গেজেট-এর* ফাইলও পাওয়া যায় নাই— উহার সঠিক প্রকাশকালও জানিতে পারা যায় নাই।

পাদরি লঙ্ গঙ্গাধর ভট্টাচার্যের গ্রন্থের কথা লিখিয়াছেন। *বিদ্যাসুন্দর বেতালপঞ্চবিংশতি* বলিয়া তাঁহার কোনো গ্রন্থ ছিল না।[৩] এগুলি গঙ্গাকিশোরের। গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য ১৮১৬ খ্রিস্টাব্দের ৮ ফেব্রুয়ারি বৃহস্পতিবার *গভর্নমেন্ট গেজেট*-এ নিম্নলিখিত বিজ্ঞাপনটি প্রকাশ করেন :

> মে ফেরিস এন কোম্পানি সাহেবের
> ছাপাখানায় সিগ্র প্রকাষ হইবেক
> অন্নদামঙ্গল ও বিদ্যাসুন্দর পুস্তক
> অনেক পণ্ডিতের দ্বারা শোধিয়া শ্রীযুত

পদ্মলোচন চূড়ামণি ভট্টাচার্য্য মহাস-
য়ের দ্বারা বর্ন্ন সুধ্ধ করিয়া উত্তম বাঙ্গলা
অক্ষরে ছাপা হইতেছে পুস্তকের প্রতি
উপক্ষণে এক২ প্রতিমুর্ত্তি থাকিবেক মূল্য
৪ টাকা নিরূপণ হইল জাহার লইবার
ইচ্ছা হয় আপন নাম ছাপাখানায়
কিম্বা এই আপিসে শ্রীযুক্ত গঙ্গাকিশোর
ভট্টাচার্য্যের নিকট পাঠাইবেন ইতি—

তার পর ওই সালেই তিনি রামচাঁদ রায়ের তৈয়ারি ছয়খানি ব্লক দিয়া *অন্নদামঙ্গল* নামক গ্রন্থ ফেরিস কোম্পানির ছাপাখানা হইতে প্রকাশ করেন। ১৮২০ খ্রিস্টাব্দের ত্রৈমাসিক *ফ্রেন্ড অফ ইন্ডিয়া*-র প্রথম সংখ্যায় (পৃ. ১২২-২৩) এই গঙ্গাকিশোর সম্বন্ধে সামান্য একটু বিবরণ বাহির হয়। তাহা হইতে জানা যায়— গঙ্গাকিশোর প্রথমে শ্রীরামপুরের ছাপাখানায় কাজ করিতেন। তার পর বাংলা বই ছাপিয়া দু-পয়সা করিবার অভিপ্রায়ে ছাপাখানা করিবার কল্পনা করেন। কিন্তু আগে ছাপাখানা না করিয়া সাধারণের মন বুঝিতে চাহিলেন। যদি বইগুলির কাটতি হয় তাহা হইলে তিনি ছাপাখানা করিবেন, এই ভাবিয়া প্রথমে একেবারে নিজে প্রেস না করিয়া বুদ্ধিমানের মতো পরের প্রেসে ছাপাইতে আরম্ভ করিলেন। এক ইউরোপীয় কোম্পানির[৪] ছাপাখানায় ছাপিয়া যখন দেখিলেন বেশ বিক্রয় হইতেছে, তখন তিনি নিজে একটি আপিস ও একটি বইয়ের দোকান খুলিলেন। ছয় বৎসর ধরিয়া কলিকাতায় অনেক বই ছাপিলেন। তার পর অংশীদারের সঙ্গে বনিবনাও না হওয়ায় প্রেসটি তিনি দেশে লইয়া যান। সেখান হইতে তিনি বাংলার শহরে ও গ্রামে লোক পাঠাইয়া বই বিক্রয় করিতে লাগিলেন। এদিকে শ্রীরামপুর ছাপাখানা হইতে প্রথম সাপ্তাহিক-পত্র *সমাচার দর্পণ* প্রকাশিত হইল। ইহার দুই সপ্তাহ মধ্যে তিনি আর-একখানি সাপ্তাহিক বাহির করেন। সত্বরই তাহা উঠিয়া যায়।[৫]

লেখকের উক্তি হইতে বোঝা যায় যে, গঙ্গাকিশোর একখানি বাংলা সাপ্তাহিকের প্রথম প্রকাশক, আর তাহা *সমাচার দর্পণ* প্রকাশের এক পক্ষ মধ্যে প্রকাশিত হয়।

১৮৩১ খ্রিস্টাব্দের মে-জুন মাসে প্রথম বাংলা সংবাদপত্র সম্বন্ধে বাদানুবাদ বাহির হয়। ১৮৩১ সালের ২৮ মে তারিখের *সমাচার দর্পণ*-এ 'ধর্মদত্ত' এই উপনাম দিয়া এক ব্যক্তি লেখেন যে, *সমাচার দর্পণ*ই প্রথম বাংলা সংবাদপত্র। কিন্তু পর মাসের ৬ তারিখের *সমাচারচন্দ্রিকায়* অপর এক লেখক তাহার প্রতিবাদ করিয়া লেখেন :

> গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য যিনি প্রথম 'অন্নদামঙ্গল' পুস্তক ছবি সহিত ছাপা করেন তিনি বাঙ্গালা গেজেট নামক এক সমাচারপত্র সর্জ্জন করিয়াছিলেন তাহা নগরে প্রায় সর্বত্র গ্রাহ্য হইয়াছিল কিন্তু ঐ প্রকাশক সাংসারিক কোন বিষয়ে বাধিত হইয়া তাঁহার নিজ ধাম বহরা গ্রামে গমন করাতে সে পত্র রহিত হয় তৎপরে দর্পণাবতার ঐ লেখক মহাশয়কে দর্শন দিয়াছেন। অতএব এ পদার্থ প্রথমে ব্রাহ্মণ কর্তৃক অনেকে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।[৬]

এই বাদানুবাদের উত্তরে ডা: মার্শম্যান বলেন (*সমাচার দর্পণ*, ১১ জুন, পৃ. ১৯৮) যে, *সমাচার দর্পণ*-এ প্রথম সংখ্যা বাহির হইবার দুই সপ্তাহ পরে *বেঙ্গল গেজেট*। বাহির হয় 'কদাচ পূর্বে নহে'।[৭] ১৮৩৪ খ্রিস্টাব্দের ১৫ নভেম্বর ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় *সমাচার দর্পণ*-এ (পৃ. ১৪৪) লেখেন,—

সমাচারচন্দ্রিকা

কলিকাতাকলু টোলা৩৯ নং গৃহে চাপুকা বন্দোপাধ্যায়ক (সদাসমাচারজুষাংফলাপিকা,পদার্থচেষ্টাপরমার্থদায়িকা) এই পত্র সো

বিজৃম্ভতেসর্ব্বমনোনুরঞ্জিকাশ্রিয়াভবানীচরণস্যচন্দ্রিকা) প্রকাশ মূল্য মাসে

৫১০ সংখ্যা সোমবার ৫ জ্যৈষ্ঠ ১২৩৮ সাল ইং ১৮৩১ সাল ১৬ মে

কলিকাতার পরিশোধাক্ষম ঋণিদিগের পরিত্রাণের আদালত।

১৮৩১ সাল ৭ মে তারিখে ঐ আদালতের আজ্ঞানুসারে লিপির দ্বারা সমাচার দেওয়া যাইতেছে যে জান হন্ট সাহেব যিনি কলিকাতায় সোদাগরি কর্ম্ম করিতেন একণে বহু বৎসরাবধি বিলাতে বাস করিতেছেন ঐ স্বামি হন্ট সাহেবের বিবাহিতা বিবি জেন হন্ট যিনি কলিকাতার মুরগীহাটা ষ্ট্রীটে বাস করিতেন তিনি একণে কলিকাতার প্রধান কারাগারে কএদ আছেন তাঁহার আরজী ঐ আদালতে আগামি ২৫ জুন শনিবার বেলা দুই প্রহরের সময় শুনা যাইবেক——

এবং ঐ জেন হন্টের মহাজন লোকের নাম তাঁহার আরজীর সহিত এক কর্দ্দ ঐ আদালতের চিফ কেলার্ক আফিসে দাখিল হইয়াছে তাহাতে ঐ কর্দ্দে তাঁহার মহাজন লোকের নাম নির্দ্দিষ্ট আছে তাঁহারা চিফ কেলার্ক আফিসে যাইলে দেখিতে পাইবেন ইতি তারিখ ১২ মে ১৮৩১ সাল।

C. G. Strettell
Attorney for Jane Hunt.

কলিকাতার পরিশোধাক্ষম ঋণিদিগের পরিত্রাণের আদালত॥

১৮৩১ সাল ৭ মে তারিখে ঐ আদালতের আজ্ঞানুসারে লিপি দ্বারা সমাচার দেওয়া যাইতেছে যে কেথেরিন্ এলিজা মেডিরা পূর্ব্বে কলিকাতার মুরগীহাটা ষ্ট্রীটে বাস করিতেন—— একণে কলিকাতার প্রধান কারাগারে কয়েদ আছেন তাঁহার আরজী ঐ আদালতে আগামি ২৫ জুন শনিবার বেলা দুই প্রহরের সময় শুনা যাইবেক——

এবং ঐ কেথেরিন এলিজা মেডিরার মহাজন লোকের নাম তাঁহার আরজীর সহিত এক কর্দ্দ ঐ আদালতের চিফকেলার্ক আফিসে দাখিল হইয়াছে তাহাতে ঐ কর্দ্দে তাঁহার মহাজন লোকের নাম নির্দ্দিষ্ট আছে তাঁহারা চিফ কেলার্ক আফিসে যাইলে দেখিতে পাইবেন ইতি তারিখ ১২ মে ১৮৩১।

C. G. Strettell
Attorney for Catherine
Eliza madeira

কলিকাতার পরিশোধাক্ষম ঋণিদিগের পরিত্রাণের আদালত।

১৮৩১ সালের ২মে তারিখের ঐ আদালতের হুকুম অনুসারে লিপির দ্বারা সমাচার দেওয়া যাইতেছে যে উইলম রাম সাহেব যিনি কলিকাতার আলতলা নামক স্থানে বাস করিতেন এবং সিমেটরিরিভিপাটমেন্ট এসিষ্টেন্টছিলেন এইক্ষণে কলিকাতার কয়েদে বন্দ আছেন তাঁহার আরজী এই আদালতে আগামি শনিবার ১৩ আগষ্ট বেলা দুইপ্রহরের সময় শুনা যাইবেক——

ঐ উইলেম রামসাহেবের মহাজন লোকের নাম ঐ আরজীর সহিত

আমরা অবশ্যই স্বীকার করি সমাচার দর্পণ উপকারক কাগজ এবং এতদ্দেশীয় ভাষায় যে কএক কাগজের সৃষ্টি হইয়াছে এ সকলের অগ্রজ অনুমান হয় ইহার পূর্বে বাঙ্লা গেজেট নামক এক সমাচারপত্র সর্জন হইয়াছিল বটে কিন্তু অতি শৈশবকালে তাহার কালপ্রাপ্তি হয়। অতএব সমাচার দর্পণ প্রাচীন ও বিবিধ সংবাদপত্র।[৮]

এ পর্যন্ত গৌণ প্রমাণেই এ সম্বন্ধে আলোচনা চলিয়াছে। যখন *বেঙ্গল গেজেট* বাহির হয় তখনকার কোনো বিবরণ আজ পর্যন্ত কেহ বাহির করে নাই। ত্রৈমাসিক *ফ্রেন্ড অফ ইন্ডিয়া*-র প্রদত্ত মত সকলের চেয়ে পুরাতন। ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় সেই সময়ের লোক হইলেও ১৬।১৮ বৎসর পরে তাঁহার স্মৃতির ভুল হওয়া বিচিত্র বা অসম্ভব নয়। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত বলেন, বিদেশির প্রযত্নে বাংলা সমাচারপত্র প্রকাশিত হয় নাই।[৯] *বেঙ্গল গেজেট* বাহির হইবার সময় তাঁহার বয়স ৪ কিংবা ৬ বৎসর। বিশেষত ৩৮ বৎসর পরে তিনি যে উক্তি করিয়াছেন তাহাতে দেখা যাইতেছে তিনি প্রকাশকের নামটি পর্যন্ত ভুলিয়া গিয়াছেন। প্রকাশের বৎসর যে ভুলিতে না পারেন তাহাই বা কীরূপে বলা যাইতে পারে?

এখন এইসমস্ত মতবাদ ছাড়িয়া দিয়া আমরা অন্যদিক দিয়া *বেঙ্গল গেজেট* সম্বন্ধে কিছু বলিব। মুখ্য প্রমাণ না হইলেও তৎসদৃশ প্রমাণ বলে আমরা এই কাগজ সম্বন্ধে নূতন তথ্য দিতে চেষ্টা করিব। *বেঙ্গল গেজেট* যে বাহির হইয়াছিল সেবিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই। কিন্তু তাহা কে বাহির করিলেন? গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য না, অপর কেহ?

১৮১৮ খ্রিস্টাব্দের ২৩ মে *সমাচার দর্পণ* বাহির হয়। তাহার পর জুলাই মাসের ৯ তারিখে আর-একখানি বাংলা সাপ্তাহিকপত্র প্রকাশের সংবাদ বাহির হয়। ১৮১৮ খ্রিস্টাব্দের ৯ জুলাই তারিখে *গভর্নমেন্ট গেজেট*-এ একটি বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয়। বিজ্ঞাপনটির প্রতিলিপি নিম্নে প্রদান করিলাম :

HURROCHUNDER ROY

Having established a BENGALEE PRINTING PRESS and a WEEKLY BENGAL GAZETTE, which he publishes on Fridays, containing the Translation of Civil Appointments, Government Notifications and Regulations and such other LOCAL MATTER as are deemed interesting to the Reader, into a plain, concise and correct Bengalee language, and having spared no pains or trouble to render it as interesting as possible, earnestly hopes that in consideration of the heavy expenses which he has incurred, Gentlemen who have a knowledge and proficiency in that language, will be pleased to patronize his undertaking, by becoming subscribers to the BENGAL GAZETEE. No publication of this nature having, hitherto been before the Public, HURROCHUNDER ROY trusts that the community in general will encourage and support his exertions in the attempt which he has made, and afford him a small share of their Patronage.

Gentlemen wishing to become subscribers to this WEEKLY PUBLICATION, will be pleased to send their names to HURROCHUNDER ROY, at his Press, No. 145, Chorebagan Street, where every information will be thankfully received. The Price of subscription is 2 Rupees per month. Extras included.

Calcutta, Chorebagan Street, No. 145.

এই বিজ্ঞাপন হইতে অনেকগুলি খবর জানিতে পারা যায়। *বেঙ্গল গেজেট* যে বাহির হইয়াছিল, সেবিষয়ে কোনো সন্দেহ থাকিতে পারে না। সম্ভবত বিজ্ঞাপন বাহির হইবার এক মাসের মধ্যে *বেঙ্গল গেজেট* বাহির হইয়া থাকিবে। ১৮২০ সালের *ফ্রেন্ড অফ ইন্ডিয়া* বলিয়াছে,— *সমাচার দর্পণ*

বাহির হইবার এক বৎসরের মধ্যে এই সাপ্তাহিক বাহির হইয়াছিল। পাদরি মার্শম্যানও তাহা সমর্থন করিয়া দৃঢ়তার সহিত বলিয়াছেন, 'ইহার প্রকাশ *সমাচার দর্পণ*-এর কদাচ পূর্বে নহে'। তবে ঠিক কোন্ তারিখে বাহির হইয়াছিল তাহা বলিবার মতো উপকরণ এখনও আমাদের নাই। গঙ্গাধর বা গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য ইহার প্রকাশক ছিলেন না। পক্ষান্তরে প্রকাশক ছিলেন অপর ব্যক্তি— নাম 'হরচন্দ্র রায়'। *বেঙ্গল গেজেট* ছিল সাপ্তাহিক— প্রতি শুক্রবারে বাহির হইত। ১৪৫ নং চোরবাগান স্ট্রিটে ইহার কার্যালয় ছিল এবং এই স্থান হইতেই ইহা মুদ্রিত হইত। এই সাপ্তাহিকের ছাপাখানা হরচন্দ্র রায়ের সম্পত্তি ছিল। *বেঙ্গল গেজেট*-এ সরকারি কাজে কর্মচারী বহালের (Civil Appointment) তরজমা থাকিত। ইহাতে গভর্নমেন্টের বিজ্ঞাপন ও প্রবর্তিত আইনের সংবাদ থাকিত। আর থাকিত পাঠকদের রুচিকর স্থানীয় সংবাদ। এখানির ভাষা সরল বাংলা। মূল্য ছিল ডাকখরচ সমেত মাসিক দুই টাকা।

কাগজখানির মুদ্রণ ও প্রকাশস্থান ১৪৫ নং চোরবাগান স্ট্রিট। চোরবাগান স্ট্রিটের কোনো সন্ধান পাওয়া যায় না। এখন চোরবাগান লেন আছে। স্ট্রিট লুপ্ত। কিন্তু এ স্ট্রিট কোথায় ছিল? ১৭৯৫-৯৭ সালের আপ্‌জনের মানচিত্রে মুক্তারাম বাবু স্ট্রিট, নেত্যদালাল স্ট্রিট ও মদন দত্ত স্ট্রিট আছে। Schlach-এর মানচিত্রেও (১৮২৫ খ্রি.) মুক্তারাম বাবু স্ট্রিটের দক্ষিণে পাওয়া যায় বারাণসী ঘোষ স্ট্রিট। এই দুইটি রাস্তার মধ্যে একটা রাস্তার চিহ্ন আছে। সেখানে অনেকগুলো বাড়ির নম্বরও আছে। ১৪৫ নম্বরও আছে। যদি এইখানটা ১৪৫নং চোরবাগান স্ট্রিট হয় তাহা হইলে বাঙালির প্রথম সাপ্তাহিকের এইটিই জন্মস্থান। আর এই জায়গাটা হওয়াও সম্ভব। কেননা, আজও এই জায়গাটাকে লোকে চোরবাগান বলে। মুক্তারাম বাবু স্ট্রিটের (পশ্চিমাংশে) শেষের দিকে যেখানে ইহা চিৎপুরের সহিত মিশিয়াছে সেখানে দুটি ডাক্তারখানা আছে— নাম চোরবাগান ফার্মেসি, চোরবাগান ডিসপেনসারি। এখন এই প্রকাশক হরচন্দ্র রায় কে? কাগজপত্রে এইটুকু জানা যায় যে রামমোহন রায়ের আত্মীয়সভার সহিত তাঁহার সম্বন্ধ ছিল। তবে বহু অনুসন্ধানের পর তাঁহার সম্বন্ধে কয়েকটি সংবাদ জানিতে পারিয়াছি। প্রাচীন লোকের মুখের সংবাদ। সত্য হওয়া সম্ভব।— নাও হইতে পারে। তবে ভবিষ্যতে অনুসন্ধানের যদি কোনো সুবিধা হয় তজ্জন্য কোনো নজির না থাকিলেও যাহা শুনিয়াছি তাহা লিপিবদ্ধ করিলাম। হরচন্দ্র রায়ের বাড়ি শ্রীরামপুরে। তিনি কলিকাতায় থাকিবার সময় বহড়ার গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্যকে মধ্যে মধ্যে পুস্তক মুদ্রণের জন্য অর্থ সাহায্য করিতেন। তাঁহার কাগজ সাড়ে এগারো মাস চলিয়া বন্ধ হইয়া যায়। তাঁহার ছাপাখানার নাম ছিল বাঙ্গাল গেজেটি অফিস— প্রেসও বলিত। তখন ছাপাখানাকে অনেকে Printing offices বলিত। কাগজখানি বন্ধ হইয়া গেলে গঙ্গাকিশোর ছাপাখানাটি হরচন্দ্র রায়কে কিঞ্চিৎ রজতখণ্ড দিয়া বহড়ায় চলিয়া যান। হরচন্দ্রের পুত্রকন্যা ছিল না। তাঁহার আত্মীয় রামচাঁদ রায়ের পৌত্র শ্রীরামপুরবাসী (অধুনা নবদ্বীপবাসী) শ্রীযুক্ত হরিপ্রসাদ রায়ের নিকট এই সংবাদগুলি সংগৃহীত হইয়াছে।

পুনশ্চ।— আমার প্রবন্ধ লিখিত হইবার পর শ্রীযুত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় *বেঙ্গল গেজেট* সম্বন্ধে আমাকে জানাইয়াছেন :

> *বেঙ্গল গেজেট* সম্বন্ধে যে বিজ্ঞাপনটি প্রবন্ধে উদ্ধৃত হইয়াছে তাহা ১৮১৮ সনের ৯, ২৩ ও ৩০ জুলাই তারিখে *গবর্নমেন্ট গেজেট*-এ প্রকাশিত হয়। তখন *বেঙ্গল গেজেট* প্রকাশিত হইয়া গিয়াছে। কিন্তু কাগজখানি প্রকাশিত হইবার কয়েকদিন আগেও গবর্নমেন্ট গেজেট-এ— উহার একটি বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হইয়াছিল। বিজ্ঞাপনটি এইরূপ :
>
> HURROCHUNDER ROY begs leave to inform his friends and the public in general, that he has established a BENGALEE PRINTING PRESS, at No. 45,

Chorbagan Street, where he intends to publish a WEEKLY BENGAL GAZETTE, to comprise the Translation of Civil Appointments, Government Notifications, and such other Local Matter, as may be deemed interesting to the Reader, into a plain, concise, and correct Bengalee language, to which will be added the Almanack, for the subsequent Months, with the Hindoo Births, Marriages and Deaths.

Advertisement for insertion in this Gazettee, will be received at 2 Annas per line. English and Persian, the same Price.

Gentlemen wishing to become Subscribes to this Weekly Publication, will be pleased to send their Names to HURROCHUNDER ROY, at his PRESS, No. 45, Chorebagan Street, where every information will be thankfully received. The Price of Subscription is 2 Rupees per Month, Extras included. *Calcutta, 12th May, 1818.* (*Government Gazette,* 14 May 1818.)

এই বিজ্ঞাপনটি হইতে স্পষ্ট জানা যাইতেছে, ১৮১৮ সনের ১২ মে তারিখের অল্পদিন পরেই *বেঙ্গল গেজেট* প্রকাশিত হয়। শ্রীরামপুর হইতে *সমাচার দর্পণ*-এর প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয়— এই বৎসরের ২৩ মে তারিখে। *বেঙ্গল গেজেট সমাচার দর্পণ*-এর কয়েকদিন আগে, কী কয়েকদিন পরে প্রকাশিত হইয়াছিল তাহা এখনও জোর করিয়া বলা যাইতেছে না। তবে *বেঙ্গল গেজেট* প্রকাশিত হইয়া যাইবার পর হরচন্দ্র রায় যে বিজ্ঞাপন দেন তাহার নিম্নলিখিত পঙ্‌ক্তিটি অনুধাবনযোগ্য :

'No Publication of this nature having hitherto been before the Public...'

যাহা হউক, অনুসন্ধান যখন চলিতেছে তখন শীঘ্রই এ সম্বন্ধে চরম কথা বলা সম্ভব হইবে। উপরে গভর্নমেন্ট গেজেট-এর যে যে সংখ্যার কথা বলা হইল তাহার সকলগুলিরই ফাইল কলিকাতার ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরিতে আছে। (শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়)

টীকা ও সূত্রনির্দেশ :

১. George Smith তাঁহার *The Life of William Carey* নামক পুস্তকে (পৃ. ২৪৫) লিখিয়াছেন ৩১ মে। এটি ভুল

২. শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিত বাংলা সাময়িক পত্রের ইতিহাস— *সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা,* ৩য় সংখ্যা, ১৩৩৮, পৃ. ১৭৮-১৮২

৩. গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য প্রকাশিত সকল গ্রন্থ সন্ধান করিয়া এখনও পাই নাই। যে-কয়খানির নাম জানিতে পারিয়াছি নিম্নে লিখিত হইল— *অন্নদামঙ্গল, শ্রীভগবদগীতা, গদ্যরচিত ভাষা-অর্থ সংগ্রহ* [(২য় সংস্করণ) বাঙ্গালা যন্ত্রে মুদ্রিত, ১২৩১ বঙ্গাব্দ], *A Grammar in English and Bengalee* [Ferris & Co., ১৮১৬], *Bengalee Regulations*, Reprinted by Ganga Kissore Bhattacharjee, 1820 এ ছাড়া ১৮১৮ খ্রিস্টাব্দের পর যেসমস্ত গ্রন্থ বেঙ্গল গেজেট প্রেসে ছাপাইয়াছিলেন নিম্নলিখিত একখানি পুস্তকের নাম জানিতে পারিয়াছি— ১. শ্রীভগবদ্গীতাবৈকুণ্ঠনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় [বাঙ্গাল গেজেটি অফিসে মুদ্রিত, ১২২৬], পরে তিনি প্রেস বহড়া গ্রামে লইয়া যান। ওই প্রেস

হইতে তাঁহার মৃত্যুর পর ছাপা হইয়াছিল— ২। *ব্রহ্মবৈবর্ত্ত-পুরাণ*।। *প্রকৃতিখণ্ড*।। *তদ্ভাষা*— রামলোচন দাস কর্ত্তৃক পদ্যছন্দে বিরচিত; ('গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য্যমহাসয়স্য বাঙ্গাল গেজেটি যন্ত্রালয়ে শ্রীমহেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় দ্বারা শ্রীভবানীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়স্যা-নুমত্যানুসারে ছাপা হইল বহরা গ্রামে')

৪. Feris & Co.

৫. 'The first Hindu who established a press in Calcutta was Baboo-ram, a native of Hindustan. ...He was followed by Gunga Kishore, formerly employed in the Serampore Press, who appears to have been the first who conceived the idea of printing works in the current language as a means of acquiring wealth. To ascertain the pulse of the Hindoo public, he printed several works at the press of a European, for which having obtainted a ready sale, he established an office of his own, and opened a book-shop. For more than six years, he continued to print in Calcutta various works in the Bengalee language, he has now removed his press to his native village. He appointed agents in the chief towns and villages in Bengal, from whom his books were purchased with great avidity; and within a fort night after the publication from the Serampore Press of the Samachar Durpan, the first Native Weekly Journal printed in India, he published another, which has since, we hear, failed–' — *Friend of India*, qurterly number, No. 1, p. 122-23

৬. এই বাদানুবাদের প্রথম উল্লেখ করেন— শ্রীশিবরতন মিত্র। *সমাচারচন্দ্রিকার* উত্তরাংশ তিনিই প্রথম উদ্ধৃত করেন (*বঙ্গীয়-সাহিত্য-সেবক*, পৃ.১৫৫)। অতঃপর শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় *সমাচার দর্পণ* ও *সমাচার চন্দ্রিকা-র* সম্পূর্ণ বাদানুবাদ উদ্ধৃত করেন। মার্শম্যানের উত্তর ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রথম উদ্ধৃত। ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের উক্তিটি সর্বপ্রথম ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় উদ্ধৃত করেন

৭. ওই

৮. ওই

৯. ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত লিখিত সংবাদপত্রে ইতিবৃত্তের ইংরেজি অনুবাদ শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রথম উদ্ধার করেন। ইহা *Englishman and Military Chronicle* (8 May, 1852)- এ প্রকাশিত প্রবন্ধ। *সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা* (৩য় সংখ্যা, ১৩৩৮) পৃ. ১৭৯-৮০-দ্রষ্টব্য।

উৎস : *প্রবাসী*, পৌষ ১৩৪০।

বাংলা নাটক প্রসঙ্গে

অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

বাংলার বাইরে 'নটো-পটো' বলে বাঙালির কিছু খ্যাতি এখনও অব্যাহত আছে। 'নটো' অর্থাৎ অভিনয় এবং 'পটো' অর্থাৎ চারুশিল্পে সমগ্র ভারত বাঙালিকে ইচ্ছায় হোক আর অনিচ্ছায় হোক, কিছু শ্রদ্ধা করে থাকে। বোম্বাই-এর গ্র্যান্ট স্ট্রিটে সর্বপ্রথম মঞ্চ বেঁধে অভিনয় হয়, কলকাতার অভিনয়ের বিশ-পঁচিশ বছর আগে। কিন্তু তবু নাট্যাভিনয়ের ধারাবাহিক রীতি, স্থায়ী রঙ্গমঞ্চে নিয়মিত অভিনয়, নাটক ও অভিনয়ে নানা 'স্কুল'-এর অবলম্বিত অভিনব প্রকরণ—এসব বিচার করলে ভারতবর্ষের প্রধান প্রধান নগর নিশ্চয়ই কলকাতার কাছে ম্লান হয়ে যাবে। চারুশিল্পের কথা এই প্রসঙ্গে মনে পড়তে পারে। রাজা রবিবর্মা একদা বাস্তব ধরনের ছবি এঁকে সারা ভারতেই অদ্ভুত প্রতিষ্ঠা পেয়েছিলেন— যদিও এখন তা আমাদের শুধু হাস্যোদ্রেক করে। তাঁর *গঙ্গাবতরণ* বা *বিশ্বামিত্র-মেনকা, রাবণ-জটায়ু যুদ্ধ* এখন কেমন যেন শিশুসুলভ মনে হয়। বিশ শতকের গোড়া থেকে বাঙালি শিল্পীরা সারা ভারতকেই চারুশিল্প ও ভাস্কর্যে নতুন পথ দেখিয়েছেন। এখন বোম্বাই, মাদ্রাজ, দিল্লির চারুশিল্পীরা কলকাতাগোষ্ঠীর দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত— যদিও কেউ কেউ অধমর্ণত্ব স্বীকারে কিছু সংকোচ বোধ করে থাকেন। সে যাই হোক, সত্যের খাতিরে মানতেই হবে যে, অভিনয়, শিল্পকলা, সংগীত প্রভৃতি সূক্ষ্ম শিল্প সম্বন্ধে বাঙালির রুচি অতিশয় মার্জিত ও সাত্ত্বিক। অবশ্য আমরা গত বিশ-পঁচিশ বৎসরকে হিসেব থেকে বাদ দিচ্ছি। কারণ এখন বাঙালি অধোগতির ঢালু পথ বেয়ে নেমে চলেছে, সারা ভারতের দাক্ষিণ্যের দুয়ার অনেক আগেই তার মুখের উপর বন্ধ হয়ে গেছে। তবু নাটক রচনা ও অভিনয়ে বাঙালির বিশেষ ধরনের কৃতিত্বকে ভারতের অন্যান্য অঞ্চল পুরোপুরি অস্বীকার করতে পারছে না।

উনিশ শতকের মাঝামাঝি থেকে বাংলা নাটক রচনা শুরু হয়। তার আগে ছিল যাত্রাগান। ইংরেজের নাটমঞ্চের অনুকরণেই কলকাতায় নাটকাভিনয় শুরু হয় উনিশ শতকের তৃতীয়-চতুর্থ দশক থেকে— অবশ্য সবই ছিল ইংরেজি নাটক। পরে শিক্ষিত ব্যক্তিরা বুঝতে পারলেন, বাংলা নাটকেই বাঙালির যথার্থ আনন্দ। সেই সময় থেকে, অর্থাৎ মধুসূদনের *শর্মিষ্ঠা* অভিনয়ের পর থেকে

যথার্থ বাংলা নাটকের স্বাদ কীরকম তা বাঙালি দর্শকেরা বুঝতে পারল। তারাচরণ শিকদার (*ভদ্রার্জুন*), জি.সি. গুপ্ত (*কীর্তিবিলাস*), রামনারায়ণ তর্করত্ন (*কুলীনকুলসর্বস্ব*)— এঁরা সংলাপধর্মী কিছু কিছু রচনাকর্ম করেছিলেন বটে, কিন্তু তার অধিকাংশই নাটকত্ব লাভ করতে পারেনি। তবু এরই মধ্যে 'নাটুকে রামনারায়ণ' পুরাতন ধরনের নাটক-প্রহসন লিখে বেশ জনপ্রিয়তা লাভ করেছিলেন। তাঁদের নাটক রচনার পঞ্চাশ বছর আগে লেবেডেফ নামে এক ভাগ্যান্বেষী ভবঘুরে রুশযুবক কলকাতায় দেশি নটনটী নিয়ে বাংলা নাটক রচনা ও অভিনয় করিয়েছিলেন। একটির নাম *কাল্পনিক সংবদল*। অপরটির বাংলা নাম জানা যায়নি। দুখানাই বিদেশি নাটকের ভাবানুবাদ। *কাল্পনিক সংবদল* সম্প্রতি যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় (সম্পাদক : ড. মদনমোহন গোস্বামী) থেকে প্রকাশিত হয়েছে। এর ভাষা খঞ্জ, ভাব অস্পষ্ট, নাটকীয়তা নামমাত্র। কিন্তু লেবেডেফ স্বল্পকাল এদেশে অবস্থান করে বুঝেছিলেন যে, রংতামাশা, ভাঁড়ামি ও সংগীতবাহুল্য না থাকলে নাটকাভিনয় বাঙালির ভালো লাগে না। তিনি সম্ভবত সেকালের যাত্রাগান থেকে এই সিদ্ধান্ত করেছিলেন। কিন্তু যাত্রাগানের মূল সুর যে পৌরাণিক ও ধর্মীয় ভাবের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত— এ কথাটার গূঢ় তাৎপর্য বোধ হয় তিনি ধরতে পারেননি।

পরবর্তীকালে দেখা যাচ্ছে, পৌরাণিক নাটকের প্রাধান্য সত্ত্বেও (*ভদ্রার্জুন*, *কৌরববিয়োগ*, *শর্মিষ্ঠা*) তদানীন্তন সামাজিক সমস্যাও কোনোও কোনোও নাট্যকারকে প্রভাবিত করেছিল। রামনারায়ণের *কুলীনকুলসর্বস্ব* ও *নবনাটক*, উমেশচন্দ্র মিত্রের *বিধবা-বিবাহ* নাটক এবং দীনবন্ধু মিত্রের *নীলদর্পণ* বিশেষ ধরনের সামাজিক সমস্যার উপর ভিত্তি করে রচিত হয়েছিল এবং অভিনয়ে যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করেছিল। মধুসূদন, দীনবন্ধু, জ্যোতিরিন্দ্র, রাজকৃষ্ণ রায়, মনোমোহন বসু— এঁরা গিরিশচন্দ্রের পূর্বেই বাংলা নাটকের বিশেষ ঐতিহ্য সৃষ্টি করেছিলেন। তার পর গিরিশচন্দ্রের নেতৃত্বে এবং ন্যাশনাল থিয়েটার প্রতিষ্ঠা হওয়ার পর বাংলা নাটকের জনপ্রিয়তা অতি দ্রুত বেড়ে গেল। গিরিশচন্দ্রের শিষ্যস্থানীয় অমৃতলাল বসু শুধু কুশলী নট হিসেবেই নয়, রঙ্গনাট্য লেখক রূপে অসাধারণ খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। বিশ শতকের গোড়ার দিকে রাজনৈতিক উত্তাপ বাঙালিকে স্পর্শ করলে তার আঁচ নাটককেও প্রভাবিত করল। দ্বিজেন্দ্রলাল, ক্ষীরোদপ্রসাদ— এঁরা স্বদেশি আবেগকে ভিত্তি করে ইতিহাসের ছায়াধূসর প্রান্তে স্বচ্ছন্দ পদচারণা করেছেন।

এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের কথাও মনে আসা স্বাভাবিক। কৈশোর থেকে শুরু করে জীবনের শেষ সীমান্ত পর্যন্ত তিনি নানা ধরনের নাটক লিখেছেন, নিজে অভিনয় করেছেন, শান্তিনিকেতনের শিক্ষক, অধ্যাপক ও ছাত্রছাত্রীদেরও অভিনয়ে উৎসাহ দিয়েছেন। নাটকের কোনো কোনো শাখায় তিনি অসাধারণ এবং মৌলিক, বিশেষত কাব্যনাট্য, নাট্যকাব্য, নৃত্যনাট্য ও রূপক-সাংকেতিক নাটকে। তবে সাধারণত যাকে আমরা নাটকত্ব, অর্থাৎ ঘটনাসংঘাত বলি, তাঁর অধিকাংশ নাটকে তা যেন ইচ্ছে করেই বাদ দেওয়া হয়েছে। সাধারণ দর্শক নাটক থেকে ঘটনার ঘনঘটা, চরিত্রে চরিত্রে দ্বন্দ্ব, মানসিক দ্বৈরথ— এইসব চায়। শেকসপিয়রের নাটক আস্বাদন করে মাঝারি ধরনের শিক্ষিত বাঙালি নাটক বলতে তাই বুঝত। এমনকি, অনেক কৃতবিদ্য পণ্ডিত অধ্যাপকও রবীন্দ্র-নাটককে যথার্থ নাটক বলে মানতে চাইতেন না। একবার ইংরেজি সাহিত্যের বিখ্যাত অধ্যাপক জিতেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় (জে.এল. ব্যানার্জি) রবীন্দ্রনাথের *ফাল্গুনী* দেখবার জন্য আমন্ত্রিত হন। তিনি টমসন-সাহেবকে বলেছিলেন যে, উক্ত নাটক একপ্রকার শিল্প হলেও যথার্থ নাটক হিসেবে দুর্বল। সেকালে *রাজা* ও *রাণী* এবং *বিসর্জন* কিছু অভিনয়খ্যাতি অর্জন করেছিল, *চিরকুমার সভা*, *শেষরক্ষা*—এই

মার্জিত কৌতুকরসের নাটক বিদগ্ধমহলে সাহিত্য হিসেবে বিশেষ স্বীকৃতি পেলেও জনসাধারণ এসব উচ্চভাবের নাটক থেকে দূরে দূরেই থাকত। গিরিশচন্দ্র, অমৃতলাল, ক্ষীরোদপ্রসাদ, দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁদের নাটকে যে চড়াসুরের আমদানি করেছিলেন, নাট্যামোদী জনসাধারণের রসরুচি তারই দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়েছিল। তাঁরা নাটমঞ্চের উপরে অনুষ্ঠিত নাটকের প্রত্যক্ষ ঘটনার দিকে যতটা কৌতূহলী হয়েছিলেন নেপথ্যের ব্যঞ্জনাসঞ্চারী ইঙ্গিতের দিকে ততটা অবহিত ছিলেন না।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর অতি দ্রুত বাংলা নাটকের রূপ, রীতি ও উপাদান বদলে যাচ্ছে। সেকালে শেকসপিয়র, শিলর ও মলিয়রের নাটকই নাট্যকারদের কল্পনাকে নাট্যরসে ভরিয়ে তুলত। একালের নাট্যকারগণ রাজনীতি, সমাজনীতি, অর্থনৈতিক সমস্যা, মনস্তত্ত্বের বিকার— এইসব সাম্প্রতিক ব্যাপার, যা আমাদের চিন্তাকে সবসময়ে ভরিয়ে রাখে, তার দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়েছেন। একটা কোনো সমস্যা তা সে ব্যক্তিঘটিত হোক অথবা সমাজঘটিত হোক, আজকের নাট্যকার ও দর্শককে সমভাবে উত্তেজিত করেছে। আমেরিকান, ফরাসি, রুশ, জার্মান নাট্যান্দোলন বাংলা দেশেও এসে পৌঁছেছে,—বাংলা নাটক এবার যথার্থই বিশ্বনাট্য-আন্দোলনের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। সেকালে যেমন দ্বিজেন্দ্রলাল, গিরিশচন্দ্রের নাটক অনেক অবাঙালি নাট্যকারকে স্ব-স্ব ভাষায় নাটক রচনা করতে উদ্‌বুদ্ধ করেছিল, অত্যন্ত আনন্দের কথা— একালের তরুণ বাঙালি নাট্যকারেরাও দিল্লি, গুজরাট, মহারাষ্ট্রের নাট্যকারদের প্রভাবিত করেছেন। অবশ্য হিন্দি, গুজরাটি, মারাঠি নাট্যকারদের কয়েকটি উচ্চ নাট্যগুণসমন্বিত নাটক অনূদিত হয়ে বাঙালি দর্শকদেরও খুশি করেছে। এ যুগে দেখা যাচ্ছে, সমগ্র উত্তর ও পশ্চিম ভারতের নাট্যান্দোলন বাংলার সঙ্গে বিশেষ সংযোগ রেখে অগ্রসর হচ্ছে। কাব্য-উপন্যাসের চেয়ে নাটকের ব্যাপারেই যেন নানা প্রদেশের রসিক সামাজিক ও শিল্পী-কলাকুশলীর দল সর্বভারতীয় প্রাঙ্গণে মিলিত হয়েছেন।

তবে এই প্রসঙ্গে আমার মনে কতকগুলি সংশয় যাতায়াত করছে। নাটকাভিনয় আজ আনন্দভোগের যে একটি সর্বজনীন 'মিডিয়াম' তাতে কোনো সন্দেহ নেই। আধুনিক নাটকের জোয়ার শুধু কলকাতা, বোম্বাই, আমেদাবাদ, পাটনা, এলাহাবাদ, দিল্লিই নয়, শহরতলি ও গ্রামাঞ্চলেও প্রসারিত হয়েছে। বাংলার যাত্রা ও মহারাষ্ট্রের 'তমাশা'-র লোকাভিনয়ে এই আধুনিক বিষয় ও রূপরীতি যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করেছে। বাংলা নাটক প্রায় সওয়া শতাব্দী উত্তীর্ণ হয়েছে। কিন্তু কাব্যকবিতা, কথাসাহিত্য ও নিবন্ধসাহিত্যে বাংলা দেশে যে ধরনের প্রথম শ্রেণির প্রতিভার উদয় হয়েছে, নাটকে কি সেরকম কোনো প্রশংসনীয় দৃষ্টান্ত দেখতে পাওয়া যায়? কাব্য-কবিতায় মধুসূদন, বিহারীলাল, উনিশ শতকের গীতিকবি এবং স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ, কথাসাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্র, রমেশচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ এবং শরৎচন্দ্র-নিবন্ধসাহিত্যে বিদ্যাসাগর, দেবেন্দ্রনাথ, অক্ষয়কুমার দত্ত, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র ও তাঁর শিষ্যসম্প্রদায় যেভাবে অসাধারণ নৈপুণ্যের দ্বারা বাংলা সাহিত্যের সেবা করেছেন এবং রবীন্দ্রনাথ যেভাবে সমগ্র সাহিত্যকে ছত্রছায়াতলে ধারণ করে আছেন, বাংলা নাটকে কি সেইরকম প্রতিভার ব্যাপক উপস্থিতি লক্ষ করা যায়?

নাটক এক ধরনের মিশ্র সাহিত্য, অর্থাৎ শুধু একাকী পড়ে আস্বাদ পাওয়া বোধ হয় নাটক রচনার উদ্দেশ্য নয়। অভিনয় হওয়াই নাটকের প্রধান উদ্দেশ্য। এবং সেইজন্য রঙ্গভূমির অধ্যক্ষগণ নাটককে জনরুচির অনুকূল করে তোলবার জন্য প্রায়শই নাটকের চেয়ে অতি-নাটকের দিকে বেশি ঝুঁকে পড়েন, নাট্যকারগণও তার প্রলোভন ভুলতে পারেন না। ফলে অনেক সময়ে সস্তা হাততালির মোহে নাট্যকার সুলভ ব্যাপারের দিকে বেশি গুরুত্ব দিতে বাধ্য হন। বাংলা নাটকের গোড়ার

দিকে কিন্তু জনবল্লভতার দিকে নাট্যকার বেশি দৃষ্টি দেননি। ন্যাশনাল থিয়েটার ও অন্যান্য পেশাদারি রঙ্গমঞ্চ স্থাপনের পর রঙ্গমঞ্চের কর্তৃপক্ষ জনপ্রিয়তার দিকেই নাটকাভিনয়কে পরিচালিত করতে শুরু করলেন। অথচ উনিশ শতকের শেষ দিকে নাটমঞ্চ একটি জাতীয় ইন্সটিটিউশনে পরিণত হয়েছিল, বিশ শতকের প্রথম দুতিন দশকেও নাটকাভিনয়কে অবলম্বন করে বাংলা দেশের জ্ঞানীগুণীরা একসঙ্গে মিলিত হয়েছিলেন। বস্তুত নিজের জাতি ও সংস্কারকে চিনে নেওয়ার জন্য বাংলা নাটকের একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা সকলেই স্বীকার করবেন, কিন্তু এ কথা দুঃখের সঙ্গে বলতে হচ্ছে যে, অতিশয় জনপ্রিয়তা সত্ত্বেও বাংলা নাটক কাব্যকবিতা কথাসাহিত্যের মতো প্রথম শ্রেণিকে স্পর্শ করতে পারেনি। এর কারণ কী, তা নিয়ে নানা প্রশ্ন উঠতে পারে।

ব্যক্তিগত আবেগ, যা লিরিকের প্রাণধর্ম, তা কিন্তু নাটকের পক্ষে মারাত্মক। নাটক প্রধানত বস্তুধর্মী শিল্প, রচনাকার থাকেন নেপথ্যে। চরিত্রগুলি যদি নাট্যকারের মতামতের বাহন হয়ে ওঠে, তা হলে তার অন্যান্য নানা গুণ সত্ত্বেও নাট্যগুণ যে বিশেষভাবে খর্ব হয়ে পড়ে, তাতে সন্দেহ নেই। বাঙালির জাতিগত প্রবণতা লিরিকের দিকেই বেশি ঝুঁকে পড়েছে। আবেগ এজাতির একপ্রকার কুলধর্ম। সেই পুরতন কালের চর্যাগান, গীতগোবিন্দ থেকে শুরু করে সাম্প্রতিক বাংলা সাহিত্য আলোচনা করলে দেখা যাবে, যেখানে আবেগের অতিরেক, সেখানেই বাঙালি আত্মস্থ। এই লিরিকরসের অতিপ্রাধান্যই কি বাঙালিকে নাটক রচনার ক্ষেত্রে পুরো সাফল্য দিতে পারেনি? বোধ হয় দীনবন্ধু কিঞ্চিৎ পরিমাণে যথার্থ নাট্যরসের শরিক ছিলেন। তাঁর নাটক ও প্রহসনে অনেক ত্রুটি আছে। কিন্তু যাকে যথার্থ নাট্যবোধ বলে তা তাঁর আয়ত্ত হয়েছিল। Playwright গিরিশচন্দ্র অভিনেতা, মঞ্চ পরিচালক, অভিনয়-শিক্ষক। সাধারণ শ্রেণির দর্শকদের নাটক দেখার ভোজ্য হিসেবে তাঁকে রাতারাতি নাটক, প্রহসন ও পঞ্চরং লিখতে হয়েছে। যে রচনা মুখ্যত প্রয়োজনের তাড়নায় লেখা, তার শিল্পগুণ যে বিশেষভাবে ক্ষুণ্ণ হবে তাতে আর সন্দেহ কী? তাঁর রচিত নাটক-নাটিকা-প্রহসনের সংখ্যা শতাধিক। এই সংখ্যা বিশখানির মধ্যে সীমাবদ্ধ হলে হয়তো তাঁর রচনা যথার্থ নাটক হয়ে উঠতে পারত। তাঁর একটা ত্রুটি যেমন অতিমাত্রায় দর্শকচেতনা, তেমনই বাঙালির পৌরাণিক মানসের প্রতি অত্যধিক গুরুত্ব দেওয়াতে তাঁর বহু নাটক বিশুদ্ধ নাটক হিসেবে উত্তীর্ণ হতে পারেনি। সামাজিক ও পারিবারিক সমস্যা নিয়ে নাটক রচনার অভিজ্ঞতাও তাঁর যথেষ্ট ছিল। কিন্তু সেখানেও তিনি সুলভ আবেগ ও উচ্চকণ্ঠ নীতির ঘোষণা ভুলতে পারেননি। ঐতিহাসিক নাটকে ইতিহাসকে দুচার স্থানে রদবদল করলেও তিনি মোটামুটি ইতিহাসের ঐতিহাসিক রস ঠিক ধরেছিলেন। তবে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের পটভূমিকায় তাঁর এই নাটকগুলি রচিত বলে এতে উত্তাপ যত বেশি দীপ্তি ততটা নয়। সে যাই হোক, গিরিশচন্দ্র নটগুরু বলে নাট্যামোদীদের অসীম শ্রদ্ধা লাভ করলেও বাংলা নাটকে এমন কোনো অভিনবত্ব সঞ্চার করতে পারেননি, যাতে মনে হবে, উত্তরকালেও নিছক শিল্পগুণেই সজীব থাকবেন। দ্বিজেন্দ্রলাল ঠিক নাটমঞ্চের জঠর পূর্তির জন্য নাট্যরচনায় অবতীর্ণ হননি। শেকসপিয়র বিশেষত শিলারের চড়াসুর আমদানি করে একদা তিনি সারা বাংলা দেশ মাতিয়ে তুলেছিলেন, এমনকি ভারতের অন্যান্য প্রদেশেও তাঁর ঐতিহাসিক নাটকগুলি অনুবাদের দ্বারা বিশেষ জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল। তিনি উনিশ-বিশ শতকের ইউরোপীয় নাট্যান্দোলন সম্বন্ধে অবহিত ছিলেন কিন্তু তাঁর নাটকও কৃত্রিম চড়াসুরের জন্য ক্ষণকালীন উত্তেজনার পর ক্রমে নিষ্প্রভ হয়ে গেছে। ভাষার আলংকারিক কৃত্রিমতা তাঁর নাট্যরসকে বিশেষভাবে ক্ষুণ্ণ করেছে। তাঁর কোনো চরিত্রই যেন স্বাভাবিক সহজভাবে কথা বলতে পারে না।

শিলারে যেটা মানিয়ে গেছে, একালের নাটকে তা একেবারে খাপ খায় না। চাণক্য ও শাজাহানের সংলাপ একালের রসিক দর্শককে কতটুকু তৃপ্তি দেবে তাতে বিশেষ সন্দেহ আছে।

গিরিশচন্দ্র ও দ্বিজেন্দ্রলালের পরে পেশাদারি রঙ্গমঞ্চ ওই একই আদর্শ ধরে চলেছে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্ব পর্যন্ত। সামান্য যা-কিছু উন্নতি হয়েছে তার জন্য শিশিরকুমারের দক্ষ অভিনয়ই একমাত্র দায়ী। তা নইলে *আলমগীর-র* মতো অতি দুর্বল নাটক বহু রজনি অভিনীত হয়েছিল কীভাবে? দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর থেকেই নানা শৌখিন নাট্যগোষ্ঠী নাটকের বিষয়বস্তু, আঙ্গিক অভিনয়ের নতুন কলারীতি নিয়ে নানা পরীক্ষা চালিয়ে, বাংলা নাটককে শ্যামবাজার স্ট্রিটের কবল থেকে উদ্ধারের চেষ্টা করে চলেছে। তার সঙ্গে অবশ্য রাজনৈতিক প্রচারধর্মিতাও যথেষ্ট কার্যকর হয়েছে। তবু মুমূর্ষু নাটমঞ্চ ও স্থবির নাট্যসাহিত্যকে আবার প্রাণরসে সজীব করে তোলার জন্য একালের শৌখিন নাট্যগোষ্ঠীর দান শ্রদ্ধার সঙ্গে স্বীকৃতির যোগ্য। এই নবীন নাট্যগোষ্ঠীই রবীন্দ্রনাটকের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি করেন। এর পূর্বে, রবীন্দ্রনাটক যথেষ্ট অভিনয়যোগ্য নয়, এইরকম ধারণা মঞ্চ পরিচালকদের মাথায় স্থায়ী আসন পেতেছিল, কিন্তু দক্ষ অভিনয়ে দেখা গেল, রবীন্দ্রনাটকের সূক্ষ্ম ব্যঞ্জনা সহৃদয় দর্শকগণ স্বাভাবিক রসবোধের দ্বারাই অবধারণ করতে পারেন।

কিন্তু এ কথা নিশ্চয়ই স্বীকার করতে হবে, বাংলা নাটক যথেষ্ট অভিনয়-সাফল্য অর্জন করলেও সাহিত্যাংশে এখনও এ শাখা দুর্বল। এখন বিদেশি নাটকের বিষয়বস্তু, রচনারীতি ও আঙ্গিক সাম্প্রতিক বাংলা নাটক ও অভিনয়কে খুব প্রভাবিত করেছে, কিন্তু মৌলিক নাটক ক-খানা রচিত হয়েছে তা বোধ হয় আঙুল গুনে বলা যায়। সাম্প্রতিক তরুণ কবি ও ঔপন্যাসিকেরা অদ্ভুত প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন, কিন্তু নাটকে এখনও সার্থক নাট্যকারের পদধ্বনি শোনা যায়নি। একালের কবিরা, কেউ কেউ, কবিতার কলমে নাটক লিখে এক নতুন ধরনের কাব্যনাট্য ও নাট্যকাব্যের রীতি প্রচলন করেছেন। এগুলির শিল্পগত মূল্য এখনও পরীক্ষার স্তরে আছে।

একালের বাংলা নাটকে নানা বৈচিত্র্য লক্ষ করা গেলেও কোনো একজন নাট্যকারকে মৌলিক প্রতিভার অধিকারী বলে একবাক্যে স্বীকার করা যাচ্ছে না। হয়তো ভবিষ্যতে এমন নাট্যকারের আবির্ভাব হবে যিনি নতুন সৃষ্টির সম্ভাবনা নিয়ে অবতীর্ণ হবেন।

আধুনিক বাংলা সাহিত্য

মোহিতলাল মজুমদার

এ কথা বলিলে ভুল হইবে না যে, আধুনিক সাহিত্যেই বাঙ্গালি জাতির জীবনীশক্তি ও প্রাণশক্তির একটি সুগভীর পরিচয় ফুটিয়া উঠিয়াছে; কারণ, বাহিরের সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় প্রচেষ্টার মধ্যে এ যুগের বাঙ্গালির স্বরূপ এখনও তেমন সুস্পষ্ট হইয়া উঠে নাই— চরিত্র ও কর্মবুদ্ধির অভাবে সেখানে সে বিশেষ সাফল্য লাভ করে নাই। সে যুগে বাঙ্গালির স্বাস্থ্য অটুট ছিল, নবতি বৎসর বয়সেও দেহ-মনের সামর্থ্য একেবারে লোপ পাইত না, পুত্রপৌত্রাদিবহুল পরিবার তখনও চারি দিকে বিদ্যমান। এজন্য বিদেশি শিক্ষা ও সভ্যতার তীব্র মদিরাও বাঙ্গালির মনের পক্ষে রসায়নের কাজ করিয়াছিল, প্রাচীন সমাজের সুদৃঢ় বন্ধনের মধ্যেও তাহার প্রাণে নবীনতার আবেগ নিষ্ফল হয় নাই। যে শক্তি এতদিন সুপ্ত ছিল, তাহা বাস্তব জীবনে বাধা পাইলেও ভাবনা ধারণা ও ধ্যান-কল্পনার ক্ষেত্রে অতিশয় বলিষ্ঠভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল। সংস্কারের মোহ ও মুক্তির আকাঙ্ক্ষা, আত্মদমনের শাস্ত্রবিধি ও ইতিহাস-বিজ্ঞানের পৌরুষ-পাঞ্চজন্য, তাহার হৃদয়ে যে দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করিয়াছিল তাহাতে সে ভিতরে ভিতরে অতিশয় অধীর ও অশান্ত হইয়া উঠিতেছিল; বাহিরে যাহার সহিত সন্ধি করিতে না পারিয়া সে একটা ঘূর্ণির মধ্যে ঘুরিতেছিল, অন্তরে সে তাহার সহিত আরও স্বাধীনভাবে বোঝাপড়া করিবার সাধনা করিয়াছিল। সেই সাধনার প্রাণময়তা, সেই সংগ্রামের উল্লাস এবং আত্মচেতনার স্ফূর্তি এই সাহিত্যের মধ্যে উদ্‌বেলিত হইয়াছে। এ যুগের সাধনায় যদি জাতির সেই বিশিষ্ট চেতনা জাগিয়া না থাকিত, সে যদি ভাবের বিশ্বাকাশে আপনার মনোরথকে ছাড়িয়া না দিয়া, প্রাণরশ্মির দ্বারা তাহাকে আপনার পথে— স্বজাতি ও স্বধর্মের নিয়তিনির্দিষ্ট রথবর্ত্মে— চালাইবার শক্তি না পাইত, তবে সাহিত্যে প্রাণের সাড়া জাগিত না, ভাষা ফুটিত না, সাহিত্যেরই সৃষ্টি হইত না।

মাইকেল হইতে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত বাঙ্গালির এই সাহিত্যজীবনের ধারা এবং গতিপ্রকৃতির নানা দিক আছে ; সকল দিকগুলির সম্যক আলোচনা করিতে না পারিলে, বাঙ্গালির এই যুগের সাধনা ও সিদ্ধির একটা সুস্পষ্ট ধারণা হইবে না। বহু প্রাচীন অতীতের ইতিহাস এখনও উদ্ধার হয় নাই, কাজেই কীর্তি-পরম্পরার ভিতর দিয়া জাতির অদৃষ্টলিপি বুঝিয়া লইবার উপায় নাই। অতএব সদ্য-বিগত

কালের যে একমাত্র কীর্তির মধ্যে বাঙালির একটা পরিচয় ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহাতেই আমাদের জাতীয় জীবনের একটা আভাস পাওয়া যাইবে। এজন্য এই সাহিত্যের উৎপত্তি, তাহার প্রধান প্রবৃত্তি এবং বর্তমান পরিণতির কথা আর-এক দিক দিয়া অনুধাবন করিবার প্রয়োজন আছে।

'জাতীয়তা' ও 'সাহিত্য'— আজকালকার কালচার-বিলাসী, dilettante বাঙালির মতে— এই দুইটি শব্দ পরস্পর-বিরোধী। সাহিত্যে এখন বিশ্বজনীনতার নামে ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের ধুয়া উঠিয়াছে। কিন্তু মনস্তত্ত্ব ও সাহিত্য-ধর্মের দিক দিয়া এই ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য কী অর্থে কতখানি সত্য, সে বিচারের ক্ষমতা বা প্রয়োজন কাহারও নাই। অথচ দেখা যাইতেছে ব্যক্তির খেয়াল-খুশি বা Pseudo-Romantic ভাবতন্ত্রের তাণ্ডবলীলা এ যুগে সাহিত্যসৃষ্টির পক্ষে ব্যর্থ হইয়াছে। আজকাল ইউরোপীয় সাহিত্যে spirit-এর উপর matter জয়ী হইয়াছে; আধুনিক লেখকেরা যে স্বাধীন ভাব-কল্পনার দাবি করিয়া থাকেন, মূলে তাহা বাহিরের নিকটে অন্তরের পরাজয়, বস্তুর নিকটে আত্মসমর্পণ— সমাজের যুগ-প্রয়োজনে স্বকীয় কল্পনার পক্ষচ্ছেদ। এইসকল লেখকেরা আত্মভ্রষ্ট, বস্তু-নিগৃহীত, সামাজিক সমস্যার অন্ধ তাড়নায় সনাতন ভাব-সত্য হইতে তিরস্কৃত। ইহারা স্বাধীন নয়, ইহাদের স্বাতন্ত্র্য একটা মোহ মাত্র; ইহারা জড়জীবী, চিৎশক্তিহীন, বর্তমানের আবিল ও বিক্ষুব্ধ জলস্রোতের ক্ষণ-বুদবুদ— ইহাদের রচনা শতাব্দী পরে যুগবিশেষের দাহচিহ্ন মসীরেখার মতোই মিলাইয়া যাইবে।

ব্যক্তিতন্ত্র বা বস্তুতন্ত্র— ইহার কোনোটাই খাঁটি সাহিত্য-তন্ত্র নয়। সাহিত্য-সমালোচনায় যেসকল বাক্য বা formula ব্যবহার করা হয়, তাহার দ্বারা কাব্যসৃষ্টির প্রক্রিয়াটিকে ধরিবার চেষ্টা করা হয় মাত্র। সমালোচনা-শাস্ত্র এ পর্যন্ত এ সম্বন্ধে নানা তত্ত্ব উদ্ভাবন করিয়া হাঁপাইয়া উঠিয়াছে। আসলে যাহা সাহিত্য তাহা একই নিয়মে সৃষ্ট হইয়া থাকে, নিরবধি কাল ও বিপুলা পৃথ্বী তাহাকে একই রূপে চিনিয়া লয়; যাহা accidental তাহাই যদি essential হইয়া উঠে, তবে সে ভুল ভাঙিতে বিলম্ব হয় না। সাহিত্যে ব্যক্তিও আছে, বস্তুও আছে; কিন্তু ব্যক্তিতন্ত্র বা বস্তুতন্ত্র নাই। যাহা তর্কবিচারের অতীত তাহা লইয়া আমরা যখন বিচার করিতে বসি, তখনই এইরূপ বৈলক্ষণ্য-নির্দেশের প্রয়োজন হয়— কিন্তু যে গুণে রচনা কাব্য হইয়া উঠে তাহার মূল রহস্য একই। তথাপি এইরূপ বিচারেও ক্ষতি নাই— যদি সেই বিচার-বিতর্কের সিদ্ধান্তগুলিকে একটা গণ্ডির মধ্যে মানিয়া লওয়া হয়। কারণ, মনে রাখিতে হইবে, এই সকল সিদ্ধান্ত কাব্যসৃষ্টির রহস্য সম্বন্ধে আমাদের মনের কৌতূহল চরিতার্থ করে মাত্র— রসাস্বাদ বা রসের ধারণার ইতর-বিশেষ করিতে পারে না। কাব্যরচনায় রসের উৎপত্তি কেমন করিয়া হয়, কবির প্রাণের কোন্ নিগূঢ় নিয়মের বশে কাব্য সৃষ্টি হয়, তাহা যেমন রসের ধারণা বা রসতত্ত্ব হইতে সিদ্ধান্ত করা যায় না, তেমনই কবির যে প্রাণধর্ম কাব্য সৃষ্টি করে সেই প্রাণধর্মের লক্ষণগুলির উপরে রসতত্ত্বের প্রতিষ্ঠা হয় না। বিভিন্ন কবির বিভিন্ন emotions বিশ্লেষণ করিয়া আমরা কাব্যের উপাদান-উপকরণের বৈচিত্র দেখিয়া মুগ্ধ হই— কবিবিশেষের ব্যক্তিগত অনুভূতির প্রকারভেদ আমাদের ব্যক্তিগত রুচির অনুকূল অথবা প্রতিকূল হয়; কিন্তু emotions-এর ওই প্রকারভেদ পর্যন্তই যদি কাব্যের স্বরূপ-নির্দেশ হয়, তবে তাহা রস পর্যন্ত আর পৌঁছাইবে না— কাব্য ঐখানেই ইতি। অতি-আধুনিক সাহিত্যের গতিপ্রকৃতি এবং তাহার সম্বন্ধে রসিকের রসোচ্ছ্বাস দেখিয়া মনে হয়, ইহারা কাব্যকে হারাইয়া, সোনা ফেলিয়া আঁচলে গিরা দিতেছে। কাব্যে তাহারা কবির খেয়াল-খুশি, অথবা জীবনের যে দিকটা জড়চেতনার দিক— spirit যেখানে matter-এর দ্বারা অভিভূত— সেই বস্তুপীড়িত চেতনাকে উৎকৃষ্ট কবিপ্রেরণা বলিয়া মনে করিতেছে। ক্ষণ-পরিচ্ছিন্ন তড়িৎস্পর্শের মতো যাহা তাহাদের স্নায়ুকে মাত্র আঘাত করে তাহাই কাব্যরস। প্রকৃত জীবন-রহস্যের পরিবর্তে, পারিবারিক, সামাজিক বা রাষ্ট্রীয় জীবনযাত্রার যেসব

জমা-খরচের হিসাব মানুষের জড়চেতনাকে বিক্ষুব্ধ করিয়া তুলিয়াছে— তজ্জনিত জৃম্ভণ উদ্‌গার আর্তনাদ প্রলাপ ও দুঃস্বপ্ন যে রচনায় যত অধিক প্রকট হইয়াছে তাহাই তত উৎকৃষ্ট কাব্য। এ অবস্থায় কাব্য-সমালোচনা নিষ্ফল।

কিন্তু আমরা গত যুগের বাঙালা সাহিত্যের কথা বলিতেছি। সে সাহিত্য সম্বন্ধে আলোচনা করিতে হইলে খুব আধুনিক সাহিত্যনীতি অবলম্বন না করিলেও বোধ হয় চলিবে; আমরা সে সাহিত্যের কাব্যগুণ বিচার করিতেছি না। পূর্বেই বলিয়াছি, এই সাহিত্যের ইতিহাসে আমরা বাঙালির হৃদয়-সংগ্রাম, তাহার 'জাতীয়' আত্ম-প্রতিষ্ঠার একটা বিপুল প্রয়াস দেখিতে পাই। বাঙালি যে তখনও বাঁচিয়াছিল— আত্মরক্ষা ও আত্মপ্রসার, জীবধর্মের এই দুই শক্তির প্রমাণ তাহার এই সাহিত্যে ফুটিয়া উঠিয়াছে। এই প্রাণশক্তি ছিল বলিয়াই সে তাহার প্রাণের ভাষাকে এমন সুন্দর সুদৃঢ় ও সুপরিপুষ্টরূপে ফুটাইয়া তুলিতে পারিয়াছিল। আজও পর্যন্ত আমরা সাহিত্যের নামে যে অনাচার করিতেছি তাহা এই ভাষারই বুকে ; আজও পর্যন্ত আমরা গদ্যে ও পদ্যে যে বমন ও রোমন্থন করিতেছি তাহাও পিতৃপিতামহ-নির্মিত এই সাহিত্যের শিলা-চত্বরের উপরেই। কারণ, কী ভাষা, কী সাহিত্য, কোনো দিক দিয়াই আমরা সেই মন্দিরে একটি নূতন চূড়া তুলিতে পারি নাই, বরং তার ভিত জখম করিতেছি।

গত যুগে এই সাহিত্য ও ভাষার সৃষ্টি সম্ভব হইয়াছিল কেমন করিয়া?— যেমন করিয়া সর্বকালে ও সর্বদেশে কোনো জাতির সাহিত্য গড়িয়া ওঠে। সাহিত্যের সৃষ্টিতত্ত্ব ও সাহিত্যের রসতত্ত্ব এক নয়। সাহিত্যের সৃষ্টি-মূলে জীবনধর্ম আছে, কিন্তু রসের আস্বাদনে ব্যক্তির ব্যক্তিগত বা জাতিগত চেতনা নির্ব্যক্তিক ও সর্বজনীন হইয়া ওঠে। এই জীবনধর্ম অর্থে আধুনিক সাহিত্যের আত্মতন্ত্র বা বস্তুতন্ত্র নয়। ইহা আরও গভীর, আরও ব্যাপক। কবিও প্রকৃতিপরবশ, কিন্তু কবির অহং এই প্রকৃতির অধীন হইয়াই দেশ কাল ও জাতির বিশিষ্ট সাধন-সংস্কারের প্রভাবে যাহা সৃষ্টি করে তাহাই সাহিত্য। কারণ, ভাব যতই বিশ্বজনীন হউক, কবির প্রাণের ছাঁচে ঢালা না হইলে তাহা রূপময় হইয়া উঠে না— এই প্রাণই কবিধর্মের, তথা জীবনধর্মের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। যেখানে যাহা-কিছু সাহিত্য সৃষ্টি হইয়াছে তাহার রস যতই গভীর উদার ও সর্বজনীন হউক— যে রূপ হইতে সেই রসের উৎপত্তি হয় তাহা কবির প্রাণেরই রূপ; অর্থাৎ তাহাতে যে বর্ণ আছে তাহা ব্যক্তিবিশেষের হৃদয়-রক্তের আভা এবং তাহাতে আলোছায়ার যে রেখাপাত আছে তাহা ব্যক্তিবিশেষের আনন্দ-বেদনার অশ্রু-হাস্যে বিচিত্রিত। কবি যতই বস্তুতন্ত্র বা আত্মতন্ত্র হউন, তাঁহার এই প্রাণধর্মই কাব্যসৃষ্টির আদি প্রেরণা। এই প্রাণের স্পন্দন একটা নির্বিশেষ ভাবযন্ত্রের ক্রিয়া নয়; কবির জাতি ও বংশ, তাঁহার দেশ ও কাল এই প্রাণের প্রতিষ্ঠা করিয়াছে— ইহাকে পুষ্ট করিয়াছে। সাহিত্যের যে রূপ-রসের আধার সেই রূপটি বৃন্তহীন পুষ্পসম বিশ্বাকাশে ফুটিয়া উঠে না, তাহার মূলে এই বিশেষের মৃত্তিকা-বন্ধন আছে, না থাকিলে কোনো সাহিত্যেরই বৈশিষ্ট্য থাকিত না— সাহিত্য সাহিত্যই হইত না; কারণ তাহা হইলে ভাবের রূপসৃষ্টি অসম্ভব হইত। তাই, জগতের সাহিত্যে যে কাব্য সবচেয়ে নৈর্ব্যক্তিক সেই শেক্‌সপিরীয় নাটকের প্রেরণামূলেও এলিজাবেথীয় যুগের ইংরেজ-প্রাণ স্পন্দিত হইতেছে ; তাই গ্যেটে যে ভাষায় তাঁহার *ফাউস্ট* লিখিয়াছেন সেই ভাষাই তাহার প্রাণ— সে ভাষায় বাহিরে সে এতটুকু দাঁড়াইতে পারে না।

অতএব সাহিত্যের সঙ্গে জাতীয়তার সম্পর্ক কী এবং এই জাতীয়তারই বা অর্থ কী, তাহা বুঝিতে কষ্ট হইবে না। মনে রাখিতে হইবে, আমি এখানে সাহিত্যরসের লক্ষণ বিচার করিতেছি না। সাহিত্যসৃষ্টির মূলে কোন্ শক্তির ক্রিয়া আছে, সাহিত্যের মধ্য দিয়া জাতির জীবন— তাহার জাতীয় আত্মপ্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষা কেমন করিয়া ফুটিয়া উঠে, তাহারই কথা বলিতেছি। এই সাহিত্যের দর্পণেই

জাতি যেন আপনাকে আপনার মধ্যে অবলোকন করে— তাহার আত্মসাক্ষাৎকার হয়। যাঁহারা সাহিত্যের রসই উপভোগ করেন তাঁহাদের নিকটে এ তথ্যের কোনো মূল্য নাই ; ঋতুবিশেষে জল ও মাটির কোন্ অবস্থায় উদ্যানলতা পুষ্প প্রসব করে সে সংবাদ তাঁহাদের নিষ্প্রয়োজন; তাঁহারা কেবল সদ্য-চয়নিত পুষ্পগুচ্ছের রূপ ও সৌরভ উপভোগ করিতে পারিলেই সন্তুষ্ট। কিন্তু এই ফুল যখন ফুরাইয়া আসে তখন শুধুই বিলাসীর বিলাস-সংকট উপস্থিত হয় না, জাতির প্রাণশক্তির অভাব ধরা পড়ে এবং সে যে কত বড়ো দুর্দিন তাহা জাতির জীবনেই যাহারা জীবিত— যাহারা বিশ্বপ্রেমিক নয়, অতি অধম ও সংকীর্ণমনা, স্বজাতি-প্রেমিক— তাহারাই তাহা জানে।

আমাদিগের গত যুগের সাহিত্যে এই জাতীয়তা ও তদনুবিদ্ধ প্রাণধর্মের প্রকাশ রহিয়াছে। পশ্চিমের আকস্মিক সংঘাতে, এই জাতির বহুকাল-লুপ্ত চেতনা চমকিত হইয়া উঠিল, যে মুহূর্তে তাহার মানস-শরীরে এই বিদ্যুৎস্পর্শ সঞ্চারিত হইল সেই মুহূর্তে প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হইল! হঠাৎ জাগরণে সে দিশাহারা হইয়াছিল। গুপ্তকবি ও রঙ্গলাল দিশাহারা হন নাই, কারণ তাঁহাদের সম্যক জাগরণ হয় নাই— এক জন হাই তুলিয়া তুড়ি দিতেছিলেন, আর-এক জন জাগর-স্বপ্নের ক্ষণ-অবসরে এই রূঢ় আলোকের দ্বার রুদ্ধ করিয়া আপন গৃহকোণের স্তিমিত মৃৎপ্রদীপটি উসকাইয়া দিবার চেষ্টা করিতেছিলেন।

কিন্তু জাগরণে বিলম্ব হয় নাই। পশ্চিমের প্রবল প্রভাব— শিক্ষা দীক্ষা, রুচি ও আশা-বিশ্বাস— যাহাকে একেবারে জয় করিয়া লইয়াছিল, তাহার মধ্যেই বাঙ্গালির বাঙ্গালিতম প্রাণ, সেই পাশ্চাত্য প্রভাবের পীড়নেই ভিতরে ভিতরে গুমরিয়া উঠিল; তাহার অন্তরের অন্তঃস্থলে সুগভীর মর্মমূলে— তাহার জাগ্রত চেতনারও অন্তরালে যে হাহাকার জাগিয়াছিল, বাহিরে বিদ্রোহচ্ছলে সেই অসীম আকুতিই মহাকাব্যের গীতোচ্ছ্বাসে প্লাবিয়া উচ্ছ্বসিয়া উঠিয়াছে। *মেঘনাদবধ-কাব্য* বাঙ্গালি কি কখনও ভালো করিয়া পড়িয়াছে? কেহ কি এখনও পড়ে? এই কাব্যকাহিনির ঘনঘটার ফাঁকে ফাঁকে বাঙ্গালির কুললক্ষ্মী, মাতা ও বধূর বেশে, কবিচিত্ত মথিত করিয়া ক্রন্দন-রবে দিকদেশ বিদীর্ণ করিতেছে। সেই আলুলায়িতকুন্তলা রোদনোচ্ছুননেত্রা অপরূপ মমতাময়ী মূর্তি প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত কবির চক্ষে বিরাজ করিয়াছে। বাঙ্গালির কাব্যে সত্যকার সৌন্দর্য আর কি ফুটিতে পারে? তাহার জীবনে আর আছে কী? সর্বস্ব বিসর্জন দিয়া, মনুষ্যত্ব হারাইয়া, নারীর যে প্রেম ও স্নেহের আত্মত্যাগ সে এখনও প্রাণে-প্রাণে অনুভব করে, এবং করে বলিয়াই এখনও একেবারে বিনষ্ট হয় নাই, সেই অনুভূতি মেঘনাদবধের কবির বাঙ্গালিত্ব অটুট রাখিয়াছে; বাঙ্গালির গৃহ-সংসারের সেই পুণ্যদীপ্তি মধুসূদনের হৃদয়ে তাঁহার মায়ের সেই স্নেহ-ব্যাকুলতার অশান্ত স্মৃতি তাঁহাকে বিধর্ম হইতে রক্ষা করিল। হোমার ভার্জিল ট্যাসোর কাব্যগৌরব বিফল হইল— বীর-বিক্রমের গাথা অশ্রুধারে ভাঙিয়া পড়িল; মাতা ও বধূর ক্রন্দনরবে বিজয়ীর জয়োল্লাস ডুবিয়া গেল— বীরাঙ্গনার যুদ্ধযাত্রা, বাঙালি বধূর সহমরণ-যাত্রার করুণ দৃশ্যে, অদৃষ্টের পরম পরিহাসের মতো নিদারুণ হইয়া উঠিল। স্বর্গ নরক পৃথিবী ও সমুদ্রতল-ব্যাপী এই আয়োজন, রাজসভার ঐশ্বর্য, রণসজ্জার আড়ম্বর, অস্ত্রের ঝঞ্ঝনা এবং অযুত যোধের সিংহনাদ সত্ত্বেও, অশোককাননে বন্দিনী নারীলক্ষ্মীর মূক শোক-ঝংকারে সমস্ত আকাশ ভরিয়া উঠিয়াছে; এবং শক্তিশেল-মূর্ছিত ভ্রাতার শ্মশান-শিয়রে রামের শোকোচ্ছ্বাস, অথবা সিন্ধুতীরে পুত্র ও পুত্রবধূর চিতা-পার্শ্বে দণ্ডায়মান রাবণের সেই মর্মান্তিক উক্তিকেও প্রতিহত করিয়া যে একটি অতি কোমল ক্ষীণ কণ্ঠের বাণী, লবণাম্বুগর্ভে নির্মল উৎসবারির মতো উৎসারিত হইয়াছে—

সুখের প্রদীপ, সখি! নিবাই লো সদা
প্রবেশি যে গৃহে, হায় অমঙ্গলরূপী

আমি। পোড়া ভাগ্যে এই লিখিলা বিধাতা!
নরোত্তম পতি মম, দেখ, বনবাসী!
বনবাসী সুলক্ষণে! দেবর সুমতি
লক্ষ্মণ! ত্যজিলা প্রাণ পুত্রশোকে, সখি,
শ্বশুর। অযোধ্যাপুরী আঁধার লো এবে,
শূন্য রাজসিংহাসন! মরিলা জটায়ু,
বিকট বিপক্ষপক্ষে ভীমভুজবলে,
রক্ষিতে দাসীর মান! হ্যাদে দেখ হেথা,
মরিল বাসবজিৎ অভাগীর দোষে।

কবির কাব্যলক্ষ্মীও সেই বাণী-মন্ত্রে কবির কণ্ঠে স্বয়ম্বর-মালা অর্পণ করিয়াছেন। ইহাই হইল বাঙালির মহাকাব্য। আয়োজনের ত্রুটি ছিল না— ছন্দ, ভাষা, ঘটনাকাহিনি, হোমার-মিল্‌টনের ভঙ্গি, দান্তে-ভার্জিলের কল্পনা এবং সর্বোপরি বিদেশি কাব্যের প্রাণবস্তু— এমনকি বাক্যঝংকার পর্যন্ত আত্মসাৎ করিবার প্রতিভা সবই ছিল; কিন্তু কবি, সত্যকার কবি বলিয়া, সৃষ্টিরহস্যের অমোঘ নিয়মের বশবর্তী হইয়া যাহা রচনা করিলেন তাহা মহাকাব্যের আকারে বাঙালি জীবনের গীতিকাব্য। দূর দিগন্তের সাগরোর্মি তাঁহাকে আহ্বান করিয়াছিল, তিনি তাহারই অভিমুখে তাঁহার দেহ-মনের সকল শক্তি প্রয়োগ করিয়া কাব্যতরণি চালনা করিয়াছিলেন। সমুদ্রবক্ষে তরণি ভাসিল; ছন্দে ভাষায় ও বর্ণনা-চিত্রে নীলাম্বু-প্রসার ও জলকল্লোল জাগিয়া উঠিল— কিন্তু কবি-কর্ণধারের মনশ্চক্ষু আধ-নিমীলিত কেন? সাগরবক্ষে উত্তাল তরঙ্গরাজির মধ্যেও এ কার কুলুকুলু ধ্বনি? এ যে কপোতাক্ষ! তীরে, ভগ্নশিবমন্দিরে, সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনাইয়া উঠিতেছে, জলে 'নূতন গগন যেন নব তারাবলী', এবং গ্রাম হইতে সন্ধ্যারতির শঙ্খধ্বনি ভাসিয়া আসিতেছে। সমুদ্র গর্জন করুক, ফেনিল জলরাশি তরণি-তটে আছাড়িয়া পড়ুক,— তথাপি এ স্বপ্ন বড়ো মধুর। সমুদ্রতলে কপোতাক্ষের অন্তঃস্রোত তাঁহার কাব্যতরণির গতি নির্দেশ করিল, সমুদ্রে পাড়ি দেওয়া আর হইল না। তরি যখন তীরে আসিয়া লাগিল, তখন দেখা গেল— 'সেই ঘাটে খেয়া দেয় ঈশ্বরী পাটুনী।'

এমনই করিয়া আধুনিক বাংলা সাহিত্যের ভিতপত্তন হইয়াছিল। বাহিরের প্রচণ্ড সংঘাত ভিতরের প্রাণবস্তু আলোড়িত করিয়াছিল; এ আলোড়নের প্রয়োজন ছিল, এই সংঘাতেই তাহার প্রাণ জাগিয়াছিল। বাঙালি হঠাৎ নূতন জগতে চক্ষুরুন্মীলন করিল, তাহার সমস্ত দেহ-মন-প্রাণে সাড়া জাগিল; এই প্রাণ ছিল বলিয়াই যে প্রবল প্রতিক্রিয়া উপস্থিত হইল, তাহার ফলে এই নব-সাহিত্যের জন্ম হইয়াছিল। প্রথম দিশাহারা অবস্থায় সে একটা প্রবল আবেগ অনুভব করিয়াছিল; নব ভাব ও চিন্তার মন্থনে তাহার প্রাণের সেই অস্থিরতা সর্বত্র সাহিত্যের আকারে সুপ্রকাশিত হয় নাই। প্রকাশের বেদনা ও ব্যাকুলতা আছে, কিন্তু ভাষা নাই, ছন্দ নাই, প্রাণে যাহা জাগিয়াছে তাহার অনুভূতি স্পষ্ট হইয়া উঠে নাই, অথবা সেই অনুভূতিকে চাপিয়া রাখিয়া ইংরেজি সাহিত্য বিজ্ঞান ও ইতিহাসের ভাব ও চিন্তারাজি মনের মধ্যে গোল বাধাইতেছে। সে সকল ভাব ও চিন্তার আবেগমূলক অনুকরণে যে সকল কাব্য ও মহাকাব্য রচিত হইয়াছিল তাহাতে আমরা খাঁটি কাব্যসৃষ্টির পরিচয় পাই না বটে, কিন্তু বাঙালি কেমন করিয়া এই নব ভাবের প্লাবনের মধ্যে আপনাকে ছাড়িয়া দিয়াও নিজের জাতি-কুল আঁকড়াইয়া ধরিতেছে, আত্মপ্রতিষ্ঠ হইবার চেষ্টা করিতেছে— তাহার সম্যক পরিচয় পাই। হেমচন্দ্রের কাব্যে আমরা খাঁটি বাঙালি প্রাণের পরিচয় পাই; কিন্তু সে প্রাণ বলিষ্ঠ হইলেও অলস, তাহা গভীরভাবে আন্দোলিত হয়

নাই। যে বজ্রাগ্নির আলোকে মধুসূদনের জাগরচৈতন্য স্তম্ভিত হইয়া অন্তরের অন্তরে বাংলার কাব্যলক্ষ্মীর সঙ্গে সাক্ষাৎকার ঘটিয়াছিল, সে বজ্রাগ্নি হেমচন্দ্রের অতিশয় স্থূল আত্মতৃপ্ত বাঙালিয়ানা ভেদ করিতে পারে নাই। নবীনচন্দ্রের আবেগ ছিল, কিন্তু সে আবেগ অন্ধ; তিনি আদৌ আত্মসচেতন ছিলেন না, অতিশয় আত্মাভিমানী ছিলেন; তাই তাঁহার মনে ভাব ও কল্পনার যেমন অবাধ অধিকার ছিল, প্রবলতাও ছিল, তেমনই তাহা উপর দিয়াই বহিয়া যাইত— অন্তরের মধ্যে কাব্যসৃষ্টির গভীরতর প্রেরণা হইয়া উঠিবার অবসর পাইত না। তাই এক-একটা idea তাঁহাকে পাইয়া বসিত মাত্র; ইংরেজি শিক্ষার অভিমানই ছিল তাহার মূল— তাহার সহিত অতিশয় দেশি এবং অতি দুর্বল ভাবাতিরেক যুক্ত হইয়া যে কাব্যগুলির জন্ম হইয়াছে তাহাতে ইংরেজি ভাব ও দেশি ভাবপ্রবণতার একটি অদ্ভুত সংমিশ্রণ দেখিতে পাই— বাঙালির জাতি-ধর্ম ও ইংরেজি-শিক্ষা উভয় উভয়কে বেড়িয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া কেমন ঘূর্ণির সৃষ্টি করিয়াছে তাহাই দেখিয়া কৌতুক অনুভব করি। সুরেন্দ্রনাথের প্রকৃতি স্বতন্ত্র, সে যুগের সেই দিশেহারা অবস্থার প্রথম দিকে এই একমাত্র কবি ইংরেজি ভাব ও চিন্তার ধারাকে ধীরভাবে আত্মসাৎ করিতে চাহিয়াছিলেন; নববিজ্ঞান দর্শন ও ইতিহাসের আলোকে নিজের অন্তরের ধারণা ও ভাবনাকে যাচাই করিয়া লইতে চাহিয়াছিলেন— ভাবাতিরেক বা কবিকল্পনাকে দমন করিয়া বাস্তব-প্রত্যক্ষের সঙ্গে বোঝাপড়া করিতে চাহিয়াছিলেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর ইংরেজি সাহিত্যে যে ভাবমার্গ ও যুক্তিপন্থার প্রসার হইয়াছিল তাহাই তাঁহাকে বিশেষ করিয়া প্রভাবান্বিত করিয়াছিল; তিনি কল্পনা অপেক্ষা বুদ্ধিবৃত্তি, কাব্য অপেক্ষা বৈজ্ঞানিক তথ্য-জিজ্ঞাসার দিকে ঝুঁকিয়াছিলেন। বাস্তব ও প্রত্যক্ষ বস্তুনিচয়ের নূতন করিয়া মূল্যনির্ধারণের জন্য তিনি পাশ্চাত্য বিজ্ঞান ও দেশীয় চিন্তাপ্রণালির সমন্বয়সাধন করিতে উৎসুক হইয়াছিলেন। এই সত্যনির্ণয়ের আবেগ, যুক্তিকল্পনার আনন্দ, মনুষ্যসমাজের নূতনতর মহিমা আবিষ্কারের উৎসাহ তাঁহাকে যে কাব্যরচনায় ব্রতী করিয়াছিল, তাহাতে সম্যক রসসৃষ্টি না হইলেও একটা নূতন ভাবদৃষ্টির পরিচয় আছে; তাঁহার কাব্যে নব নব চিন্তা ও ভাবনার যেসকল চকিত চমক আছে তাহা সত্যই বিস্ময়কর। পরবর্তী কবিগণের কাব্যে এইরূপ অনেক চিন্তাবস্তু কাব্যবস্তুতে পরিণত হইয়াছে— সুরেন্দ্রনাথ সেগুলিকে যেন চিন্তার আকারেই ছড়াইয়া গিয়াছেন। এ শক্তি ঠিক কবিশক্তি না হইলেও ইহার মূলে কল্পনার আবেগ আছে; যে দৃষ্টান্ত ও উপমা-সমুচ্চয়ের দ্বারা তিনি তাঁহার বক্তব্যকে সমীচীন করিয়া তুলিতে চান, তাহার মধ্যেই তাঁহার কবিশক্তির প্রমাণ আছে। তাঁহার রচনায় এ যুগের প্রধান প্রবৃত্তি নিখুঁতভাবে ধরা পড়িয়াছে। ভাবপ্রবণ বাঙালির প্রকৃতিতে পাশ্চাত্য জ্ঞানবিজ্ঞানের যে সাড়া জাগিয়াছিল তাহার ফলে সে যে নূতন চিন্তাভিত্তির অন্বেষণ করিয়াছিল, আত্মপ্রতিষ্ঠ হইয়া আপনার প্রাণধর্মের অনুযায়ী করিয়া যে পরস্ব-গ্রহণের প্রয়োজন সে অনুভব করিয়াছিল, তাহাতে দেশি ও বিদেশি চিন্তার সমন্বয়সাধনে একটা সজ্ঞান চেষ্টাই স্বাভাবিক। এবং সে সমন্বয়সাধনে কতক পরিমাণে ভাবুকতারও প্রয়োজন— এই ভাবুকতাই সুরেন্দ্রনাথের কবিত্ব। সুরেন্দ্রনাথের মধ্যে সে যুগের এই প্রধান প্রবৃত্তির প্রথম উন্মেষ দেখিতে পাই। তাঁহার কাব্যরচনা এই হিসাবে সার্থক হইয়াছে যে, তাঁহার ভাববস্তু তাঁহার কাব্য অপেক্ষা কম বা বেশি হয় নাই— তাঁহার কথা তিনি তাঁহার মতো করিয়া বলিতে পারিয়াছেন। হেমচন্দ্রের মহাকাব্য-রচনার মতো অক্ষমের প্রয়াস-বিড়ম্বনা তাহাতে নাই; তিনি নবীনচন্দ্রের মতো মহাকাব্য-রচনার নামে ধর্ম রাজনীতি ও সমাজ-সংস্কারের বক্তৃতা অমিত্রাক্ষর ছন্দে লিপিবদ্ধ করেন নাই। তিনি তাঁহার প্রিয় কবি Pope-এর মতো কবিতায় Eassay on Woman লিখিয়াছেন, সে বিষয়ে তাঁহার কার্য ও অভিপ্রায়ের মধ্যে কোনো লুকোচুরি নাই, বরং এই গদ্যাত্মক কাব্যে কবির নির্ভীক সত্যবাদের উৎসাহ, ভাবচিন্তার অভাবনীয় চমক, ভাষার একটি নূতন ভঙ্গি এবং স্থানে

স্থানে অপ্রত্যাশিত ছন্দ ঝংকার তাঁহার 'মহিলা কাব্য'খানিকে বাংলা কাব্যসাহিত্যে বেশ-একটু স্বতন্ত্র আসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে।

এইসকল রচনা উৎকৃষ্ট সাহিত্য না হইলেও যে প্রাণ-মনের নিগূঢ় আন্দোলনে সাহিত্যসৃষ্টি সম্ভব হয়, দুই বিভিন্ন সভ্যতার সংঘর্ষে জাতিবিশেষের সুপ্ত চেতনা মন্থিত হইয়া তাহার প্রাণভাণ্ডে অমৃত-সঞ্চয় হইয়া ওঠে— সেই আন্দোলন-আলোড়নের প্রকৃষ্ট পরিচয় এইসকল রচনায় আছে। মাইকেল, বঙ্কিম, বিহারীলাল ও রবীন্দ্রনাথ— আধুনিক সাহিত্যের এই চারিটি স্তম্ভ যে ভিত্তিভূমির উপরে দাঁড়াইয়া বঙ্গভারতীর এই অভিনব মন্দিরচূড়া ধারণ করিয়া আছেন, তাহার তলদেশ কোথায় এবং কত গভীর, নির্ণয় করিতে হইলে এইসকল কবির কাব্যপ্রচেষ্টা সযত্নে পর্যালোচনা করা আবশ্যক। কোনো যুগের অন্তরতম প্রবৃত্তির সন্ধান করিতে হইলে কেবল উৎকৃষ্ট প্রতিভার প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করিলে চলিবে না; কারণ প্রতিভার যে দিকটা আমাদিগকে মুগ্ধ করে সে তার অলৌকিক কীর্তি— এই কীর্তির অন্তরালে যে স্বাভাবিক নিয়ম রহিয়াছে তাহা সহজে আমাদের দৃষ্টিগোচর হয় না। কিন্তু যাঁহারা সেরূপ প্রতিভাশালী নহেন তাঁহাদের প্রয়াস প্রচেষ্টা আরও স্বচ্ছ, তাঁহদের মধ্যে আমরা যুগধর্মকে আরও স্পষ্ট উপলব্ধি করিতে পারি। মাইকেলের *মেঘনাদবধ-কাব্য* বাঙ্গালির প্রাণ যুগধর্মবশে কী নিগূঢ় স্পন্দনে স্পন্দিত হইয়াছে, সে চিন্তা আমরা করি না— তাঁহার কাব্যরসের উৎকর্ষ-অপকর্ষ বিচার করি। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস-কাব্যগুলির মধ্যে, পাশ্চাত্যকাব্য-সাহিত্যের পূর্ণ রসস্রোত বাঙ্গালির প্রাণে কেমন করিয়া সাহিত্য-সৃষ্টির প্রেরণা দান করিয়াছে, সেইসকল কাব্যে বাঙ্গালির মনীষা ও কবিপ্রতিভা খাঁটি বিদেশি রস-রসিকতার আবেগে কী অপূর্ব ভাবজগৎ সৃষ্টি করিয়াছে— তাহা চিন্তা করিতে গেলে আমরা কেবল বিস্ময়বিমুগ্ধ হইয়া থাকি; কোথাও কোন্ দিক দিয়া কবির প্রাণে সাড়া জাগিয়াছে, এবং আমরা পাঠকেরা এই অতিশয় অপরিচিত ভাবলোকে প্রাণের কোন্ নবজাগরণে জাগিয়া উঠি, অথবা কোন্ স্বপ্নলোকে আমাদের চিরসুষুপ্ত কামনালক্ষ্মীর সন্ধান পাই— এই বিদেশি সাহিত্যকলার মোহনমুকুরে আমাদেরই প্রাণের প্রতিবিম্ব কেমন করিয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে, কেমন করিয়া তাহা সম্ভব হইল, এ চিন্তার অবকাশ থাকে না। কিন্তু এ কথা কখনও বিস্মৃত হইলে চলিবে না যে, এই সাহিত্যরস যতই উৎকৃষ্ট হউক, যদি তাহার ভাষা আমাদের হৃদয় স্পর্শ করিয়া থাকে, যদি তাহার ভাবকল্পনায় কেবল আমাদের রসপিপাসা উদ্রিক্ত না হইয়া তাহার সহিত আমাদের একটি মর্মগত আত্মীয়তা উপলব্ধি করিয়া থাকি, তবেই তাহা আমাদের সাহিত্য হইয়াছে। বিদেশি ভাবকল্পনা বিদেশি সাহিত্যেই আমরা উপভোগ করি; কিন্তু সেই ভাবকল্পনাই যদি আমাদের মনের তৃপ্তি সাধন করিত; তবে কোনো পৃথক স্বকীয় সাহিত্যের প্রয়োজন হইত না— আমার ভাষায় তাহা অনুবাদ করিলেই আমার সাহিত্য হইত। এ যুগে সেই বিদেশি ভাবকল্পনাকে যাঁহারা আত্মসাৎ করিয়াছিলেন,— অর্থাৎ তাহা হইতে প্রেরণা লাভ করিয়া একটি স্বতন্ত্র স্বকীয় ভাবজগৎ সৃষ্টি করিয়া নিজ প্রাণের স্বাধীন স্ফূর্তির বিকাশ করিয়াছিলেন— তাঁহারাই এ যুগের সাহিত্যস্রষ্টা। এই সৃষ্টিশক্তিই তাঁহাদের দিব্যশক্তি। এইখানেই সাহিত্যের সহিত জাতীয়তার সম্বন্ধ। কবির আত্মা নির্বিশেষ মানবাত্মা নয়; যে রূপ-রস-পিপাসা কবিপ্রকৃতির স্থায়ী লক্ষণ, যাহার বশে কবির ভাব রূপময় হইয়া উঠে, নির্বিশেষ বিশেষে পরিণত হয়— কবির সেই কবিধর্ম একটা বিশিষ্ট প্রাণমনের দ্বারা পরিচ্ছিন্ন— প্রাণের সেই ছাঁচটি আছে বলিয়াই ভাব রূপের আকারে আকারিত হয়; এই প্রাণ না থাকিলে সাহিত্যের প্রাণসৃষ্টি অসম্ভব। এই প্রাণের মূল জাতির বহুকাললব্ধ চেতনা, তাহার অতীত ও বর্তমান, তাহার জাগ্রত ও মগ্নচৈতন্যের মধ্যে প্রসারিত হইয়া আছে। *মেঘনাদবধ-কাব্যে*-এর মধ্যে আমরা কবির এই অন্তরতম অন্তরের পরিচয় পাইয়াছি। বঙ্কিমের কাব্যে চৈতন্য

আরও পরিস্ফুট, তাই তাঁহার মধ্যে এই দেশি ও বিদেশি ভাবের সংঘর্ষ আরও গভীর, আর বিপুল। বঙ্কিমের কাব্যসৃষ্টিতে আমরা যে প্রাণের আলোড়ন দেখিতে পাই, তাহাতে বাত্যাবিক্ষুব্ধ সমুদ্রের অধীর উচ্ছ্বাস, ফেনশীর্ষ তরঙ্গগহ্বরের অন্ধকার এবং জলতলস্থ ভীষণা শান্তির আভাস পাই। সেকালে বাঙালির প্রাণে যে বিক্ষোভ উপস্থিত হইয়াছিল— বিক্ষুব্ধ জলরাশির উপরে সর্বপ্রথম মেঘনাদ-বধের তরঙ্গচূড়া দেখা দিয়াছিল— সেই পাশ্চাত্য ঝটিকার আন্দোলনে প্রমত্ত বাঙালির প্রাণসাগর যে তুঙ্গতম তরঙ্গে উদ্‌বেল হইয়া উঠিয়াছিল তাহারই ফল— *বিষবৃক্ষ, কৃষ্ণকান্তের উইল, সীতারাম, চন্দ্রশেখর, দেবীচৌধুরাণী* ও *আনন্দমঠ*। কিন্তু এই তরঙ্গের স্রোত নির্ণয় হইবে সুরেন্দ্রনাথ হেমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্রের কাব্যে।

তথাপি এই আলোড়নের সঙ্গে সঙ্গেই প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হইয়াছে। বিদেশি সংঘাতের প্রতিঘাতে যে সাহিত্যের জন্ম হইল, যে সাহিত্যের মূল প্রেরণা ছিল— নবাবিষ্কৃত ভাব ও চিন্তার জগতে বাঙালির আত্মপ্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষা, তাহার কামনা, বাসনা ও পিপাসাকে উদ্‌বুদ্ধ করিয়া প্রত্যক্ষ বাস্তবের সহিত দ্বন্দ্বকে আরও ঘনাইয়া তোলা— সহসা সে সাহিত্যের স্রোত উলটা দিকে বহিল। এ দ্বন্দ্ব যেন তাহার বেশিক্ষণ সহ্য হইল না— প্রাণ হইতে মনে, ভাব হইতে ধ্যানে, সে বাস্তবমুক্তির জন্য লালায়িত হইল। মাইকেল হইতে বঙ্কিম— অতি অল্পকাল, এক পুরুষও নয়; বাঙালির নবজাগ্রত প্রাণচেতনা তখনও সুপরিস্ফুট হইয়া উঠে নাই, জাতির অতীত স্বপ্ন ও ভবিষ্যতের আশা তাহাকে চঞ্চল করিতেছে মাত্র— সেই কালেই সাহিত্য-প্রাঙ্গণের এক কোণে ধ্যানাসনে বসিয়া কবি বিহারীলাল *সারদামঙ্গল* গান আরম্ভ করিয়াছেন। সেকালে সে সুরে কান পাতিবার অবসর কাহারও ছিল না; কেহ জানিত না যে, অতঃপর বাঙালা কাব্যলক্ষ্মী দেশ-কাল বিস্মৃত হইয়া যে ধ্যানরসে নিমগ্ন হইবেন— সাহিত্যে জাতীয় জীবনের স্পন্দন স্তিমিত হইয়া ক্রমশ যে সূক্ষ্মতর রসবিলাস ও বিশ্বজনীন ভাবলোকের প্রতিষ্ঠা হইবে— এই ভাবোন্মত্ত, উদাসীন আত্মহারা ব্রাহ্মণ-কবি তাহারই সূচনা করিতেছেন।

বাঙালি চরিত্রে ভারতীয় প্রকৃতিসুলভ ধ্যানকল্পনার প্রভাব যে আছে এবং থাকিবেই এ কথা বলা বাহুল্য। কিন্তু বাঙালির যে বৈশিষ্ট্যের কথা আমি পুনঃপুন নির্দেশ করিতে চাই তাহাই বাঙালির বাঙালিত্বের নিদান এবং তাহারই ফলে, এত অল্প সময়ের মধ্যে বাঙালি একটা বিদেশি সাধনার সারবস্তু আত্মসাৎ করিয়া তাহার সাহিত্যে নবজন্মের পরিচয় দিয়াছে। আর কোনো ভারতীয় জাতি এমন করিয়া যুগযুগান্তরের অভ্যস্ত সংস্কার ভেদ করিয়া এত শীঘ্র এইরূপ একটি আধুনিক আদর্শকে বরণ করিয়া লইতে পারে নাই। মাইকেলের মহাকাব্যে যে বেদনা সংগীতরূপে প্রকাশ পাইল, তাহা যেন— 'Music yearning like a god in pain' তাহাতে নবজন্মের সেই প্রাণপণ প্রয়াস বা আত্মস্ফূর্তির আবেগ রহিয়াছে। অমিত্রাক্ষর ছন্দের ধ্বনিবিন্যাসের মধ্যেই প্রাণের যে লীলা, মুক্তগতির যে আনন্দ, কাব্যবস্তুর নিঃসংকোচ সংকলনে কল্পনার যে চিন্তালেশহীন স্বাধীন বিচরণ লক্ষ করা যায়, তাহাতেই এই নবসাহিত্যের প্রাণপ্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। এই আত্মস্ফূর্তির কারণ— নিজ দেহসংস্কারের দ্বারাই বহির্জগতের সহিত আত্মীয়তা উপলব্ধি করিয়া মানুষ যে সহজ রস আস্বাদন করিতে চায়, বাঙালির প্রকৃতিতে সেই অভারতীয় প্রবৃত্তি সুপ্ত আছে; ভারতীয় প্রভাবের বশে যে কল্পনা অন্তরমুখ সেই কল্পনারই তলে তলে জীবন ও জগতের প্রতি তাহার এই মমতা অন্তঃশীলা হইয়া বহিতেছে। তাই বেদান্ত ও সন্ন্যাস বাঙালির যথার্থ ধর্ম হইতে পারে নাই। দেশের জলবায়ু, কর্ম অপেক্ষা স্বপ্নের অনুকূল; ইহার উপর আর্য সাধনার অধ্যাত্মবাদ চিত্তকে অন্তরমুখী করিয়া তোলে; তথাপি বাঙালির মজ্জাগত প্রাণধর্মকে এই মনোধর্ম একেবারে নির্মূল করিতে পারে নাই; এজন্য জীবন ও জগৎ সম্বন্ধে তাহার যে স্বাস্থ্যকর

আসক্তি তাহা ভোগ হইতে উপভোগে পর্যবসিত হয়। কিন্তু পাশ্চাত্য সাহিত্যের শ্বেতভুজা বীণাপাণি বাঙালির চিত্তশতদলে যখন আসন পাতিলেন, তখন সহসা তার কল্পনায় এক মহোৎসব পড়িয়া গেল। সে সাহিত্যে জগৎ ও জীবন, প্রকৃতি ও মানবহৃদয়, প্রত্যক্ষ পরিচয়-ক্ষেত্রে পরস্পরকে যে মহিমায় মণ্ডিত করিয়াছে— মানুষের দেহই যে অপূর্ব ভঙ্গিমায় সূর্যালোকিত আকাশতলে ছায়া বিস্তার করিয়াছে, তাহাই বাঙালিকে মুগ্ধ করিল, বহিঃপ্রকৃতির সংস্পর্শে আত্মপরিচয় সাধন করিতে সেও অধীর হইয়া উঠিল। মাইকেলের কাব্যপ্রেরণায় সর্বাপেক্ষা প্রবল হইয়াছে বহির্বস্তুর বাহিরের রূপ। কেবলমাত্র বিচিত্র বস্তু সংগ্রহ করিয়া সেগুলিকে দূরে ধরিয়া অথবা নিকটে সাজাইয়া দর্শন ও স্পর্শনের আনন্দে তিনি বিভোর; ক্ষুদ্র ও বৃহৎ চিত্র-চিত্রণ এবং তক্ষণশিল্পীর মতো মূর্তি-সুষমার সন্ধানে তাঁহার কল্পনার কী উল্লাস। উপমার পর উপমায় তিনি যে রূপ ফুটাইয়া তোলেন তাহা ভাব বা চিন্তার চমক নহে— বাহিরের বস্তুবিন্যাসের সৌন্দর্য; বিষাদপ্রতিমা বন্দিনি সীতার ললাটে সিন্দূরবিন্দু— 'গোধূলিললাটে আহা তারারত্ন যথা'। তিনি বস্তুকে ভাবের দ্বারা বা ভাবকে বস্তুর দ্বারা উজ্জ্বল করিয়া তোলেন না; একই বস্তুর সৌন্দর্য ফুটাইবার জন্য বহু বস্তুর উপমা সন্নিবেশ করেন, চিত্রকে চিত্রের দ্বারাই সুন্দর করিয়া তোলেন। আলো ও ছায়া এই দুইটিমাত্র বর্ণে মর্মরমূর্তি যেমন প্রকাশ পায়, তাঁহার সৃষ্ট মানব-মানবীও তেমনই অতিশয় সরল ও সর্বজনীন সুখ-দুঃখের ছায়ালোকসম্পাতে আমাদের হৃদয়গোচর হয়। এইজন্য আকারে ও ভঙ্গিমায় মহাকবি মিলটনকে অনুসরণ করিলেও মধুসূদন মানুষের সংসার বিস্মৃত হইয়া মহাকাব্যের অত্যুচ্চ কাব্যলোকে, সীমাহীন দিগ্‌দেশে, তাঁহার কল্পনাকে প্রেরণ করিতে পারেন নাই। কিন্তু মানুষকে তিনি বড়ো করিয়া দেখিয়াছিলেন; পুরুষের পৌরুষ ও নারীর নারীত্ব তাঁহার হৃদয়ে যে মহিমাবোধ জাগ্রত করিয়াছিল তাহারই আবেগ মহাকাব্যের রূপভঙ্গিমায় ব্যক্ত হইয়াছে। মাইকেলের কাব্য পড়িয়া মনে হয়, গীতিপ্রাণ বাঙালি কবি যেন এক নূতন জগৎ আবিষ্কার করিয়াছেন; সেখানে হৃদয়-সমুদ্রের বেলা-বালুকায় ভঙ্গতরঙ্গের অলস ফেনরেখা বুদবুদমালায় মিলাইয়া যায়, কিন্তু সেই সঙ্গে দূরাগত জলোচ্ছ্বাস ও ভগ্নপোত-যাত্রীর আর্তনাদ নিভৃত নিকুঞ্জের বংশীরবকেই এক অপূর্ব বেদনায় প্রতিধ্বনিত করিয়া তোলে। কবিকল্পনার এই নূতন অভিযান নব্য সাহিত্যের গতি নির্দেশ করিয়াছিল— মনের সূক্ষ্ম লীলাবিলাস অগ্রাহ্য করিয়া মানুষকে দেহের রাজ্যে দাঁড় করাইয়া, তাহার স্বাভাবিক আকার আয়তন ও রূপভঙ্গিমা দুই চক্ষু ভরিয়া দেখিয়া লইবার আকাঙ্ক্ষা জাগিয়াছিল ; পাপ-পুণ্য-নির্বিশেষে তাহার প্রাণের স্ফূর্তি নিয়তির অমোঘ নিয়মে কেমন ভীষণ মধুর হইয়া উঠে— বাঙালি কবির চিত্তে তাহারই প্রেরণা জাগিয়াছিল।

কিন্তু মধুসূদনের যে আবেগ একটা 'great technique' ও 'prodigious art'-এর প্রেরণায় মানুষের জীবনকে কেবলমাত্র একটা বিশালতর পটভূমিকার উপরে সন্নিবেশিত করিয়া তাহার প্রাণের স্ফূর্তি ও দেহের মুক্তগতি অঙ্কিত করিয়াই চরিতার্থ হইয়াছিল, মনুষ্যজীবনের রহস্য-চিন্তার সেই আবেগ পরিপূর্ণ আকারে প্রকাশ পাইল বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস-কাব্যে। গীতিকাব্যের নিছক ভাবুকতায় এবং স্বল্প পরিসরে যে প্রেরণা স্ফূর্তি পাইতে পারে না— ভাবজগৎ হইতে বাহিরে আনিয়া মূর্তিজগতের চাক্ষুষ-আলো-অন্ধকারে হৃদয়মণির দেহ-বিচ্ছুরিত রশ্মিচ্ছটা প্রতিফলিত করিবার জন্য যে নূতন আকারে কাব্যসৃষ্টির প্রয়োজন— মহাকাব্য বা কাহিনিকাব্যে তাহার experiment শেষ হইবার পূর্বেই, সেই প্রয়োজন সাধন করিবার জন্য, আধুনিক বাংলা-সাহিত্যে অবতারকল্প প্রতিভার অভ্যুদয় হইল। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে বাঙালা গদ্যচ্ছন্দ সহসা যে বাণীরূপ ধারণ করিল তাহাকে দেহেরই রূপরাগ প্রাণের মূর্ছনায় স্পন্দিত হইয়া উঠিল। বঙ্কিমচন্দ্রের পূর্বে বা পরে আর কোনো বাঙালি কবি এমন করিয়া 'দেহের

রহস্যে বাঁধা অদ্ভুত জীবনের' গাথা গান করেন নাই; প্রকৃতির প্ররোচনায় মানুষের আত্মা এমন করিয়া দেহের দুয়ারে লুটাপুটি খায় নাই; মনুষ্য-হৃদয়ের চিরন্তন আকুতি কবিকল্পনায় মণ্ডিত হইয়া দেহধর্মের তাড়নায় এমন সুদুর্লভ দুর্ভাগ্য-মহিমা লাভ করে নাই। ইউরোপের কাব্যলক্ষ্মী তথাকার সাহিত্যে মানুষের যে পরিচয়টিকে যুগ যুগান্তর ধরিয়া দেহচেতনার মধ্য দিয়াই অনির্বচনীয় করিয়া তুলিয়াছেন— সে সাহিত্যের সেই গভীরতম প্রেরণা এমন করিয়া আর কোনো বাঙালি কবিকে আবিষ্ট করে নাই। বঙ্কিমচন্দ্রের কাব্যে কামনার সেই সোমযাগ যে বেদির উপরে অনুষ্ঠিত হইয়াছে তাহা মনুষ্যজীবনের রোমান্স; যে উপকরণসমষ্টির দ্বারা তিনি এই বেদি নির্মাণ করিয়াছেন, বাঙালির জীবনেতিহাসে তাহা নিত্যপ্রত্যক্ষ নয় বলিয়া যাঁহারা এই কাব্য অতিমাত্রায় কাল্পনিক বলিয়া মনে করেন তাঁহাদের চক্ষে মানুষের জীবনই অতিশয় ক্ষুদ্র; বঙ্কিমের কল্পনায় মানব-ভাগ্য ও মানব-চরিত্রের যে রহস্য-সন্ধান আছে তাহা যদি কাহারও পক্ষে বাস্তবাতিরিক্ত হয়, তবে তাঁহার মতে হিমালয় অপেক্ষা উই-ঢিবি সত্য, এবং পদ্ম অপেক্ষা ঝিঙাফুল অধিকতর বাস্তব।

কিন্তু বর্তমান প্রসঙ্গে সে বিচার নিষ্প্রয়োজন। আধুনিক সাহিত্যে বাঙালির নবজন্মের কথা বলিতেছিলাম। মানুষের দেহমন্দিরে যে দেবতা রহিয়াছেন তাঁহার প্রতি যে গোপন শ্রদ্ধা বাঙালির অস্থিমজ্জাগত, জগৎ ও মানবজীবন সম্বন্ধে তাহার সেই ঔৎসুক্য এই নবসাহিত্যের জন্ম-হেতু। যে কামনার নাম সৃষ্টিকল্পনা, রূপ-রস-গন্ধ-শব্দ-স্পর্শের যে মোহিনী মানুষের প্রাণে 'প্রেম' নামক মহাপিপাসার উদ্রেক করে— যাহার বশে মানুষ আপনাকে স্বতন্ত্র না ভাবিয়া, এই জগৎ-রহস্যের সঙ্গে আপনাকে একটি অপূর্ব রসচেতনায় যুক্ত করিয়া নিজেরই স্বরূপ উপলব্ধি করিয়া কৃতার্থ হয়— বাঙালি চরিত্রের সেই সুপ্ত প্রবৃত্তি ইউরোপীয় সাহিত্য হইতে প্রেরণা পাইয়া জাগিয়া উঠিয়াছিল। আধ্যাত্মিকতার প্রাণহীন জড়-সংস্কার হইতে মুক্ত হইয়া, জীবন ও জগৎ সম্বন্ধে একটা তুচ্ছ ধারণা বা ঔদাসীন্য ত্যাগ করিয়া, বহিঃপ্রকৃতির সহিত আত্মীয়তা স্থাপনের যে আকাঙ্ক্ষা, তাহারই নিদর্শন— *বিষবৃক্ষ* ও *মেঘনাদবধ*। *মেঘনাদবধ*-এর কবি নাটক রচনা করিতে চাহিয়াছিলেন; কিন্তু নাটকীয় চরিত্র-সৃষ্টিতে কবির যে আত্মবিলোপ— সর্ববস্তুর মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হইবার যে কল্পনাশক্তি— যাহার বলে কবিই আত্মচেতনার (সে যত গভীর হউক) সংকীর্ণ গণ্ডি হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া প্রকৃত মুক্তির অধিকারী হন— মধুসূদনের সে শক্তি ছিল না। তাই তাঁহার কাব্যে যখন মেঘনাদের জিহ্বাগ্রে সরস্বতী বিরাজ করেন, তখন লক্ষ্মণ কথা খুঁজিয়া পায় না— কবিহৃদয়ের লিরিক-পক্ষপাত স্পষ্ট হইয়া উঠে। তথাপি মধুসূদন সাহিত্যের এই মন্ত্রে সিদ্ধিলাভ না করিলেও, মানুষের প্রতি মানুষ হিসাবেই তাঁহার যে শ্রদ্ধা, মানুষের বাসনা-কামনা পাপ-পুণ্য পৌরুষ ও দুর্বলতার প্রতি তাঁহার যে শাস্ত্রসংস্কারমুক্ত সহজ সহানুভূতি, তাহাই এ যুগের কবিকল্পনাকে মুক্তিলাভের দুঃসাহসে দীক্ষিত করিয়াছে। অপরাপর প্রতিভাহীন কবি এই মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া, মহাকাব্য বা কাহিনিকাব্য রচনার আগ্রহ থাকিলেও, ইতোনষ্টস্ততোভ্রষ্ট হইয়া গীতিকাব্য বা কাহিনি কোনোটাই আয়ত্ত করিতে পারেন নাই। তার কারণ, এ কাব্যের উৎকৃষ্ট আর্ট বা technique তখনও বাঙালা কাব্যে সুপ্রতিষ্ঠিত হয় নাই, প্রাচীন গীতিকাব্যের কল্পনা ও রচনাভঙ্গিই তখনও ভাষাকে আচ্ছন্ন করিয়া আছে। বঙ্কিমের প্রতিভা এ সমস্যার সমাধান করিল— এ কাব্যের ছন্দ হইল গদ্য, ইহার আকার হইল উপন্যাস। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে সঙ্গেই এ কল্পনার পূর্ণ বিকাশ ও অবসান ঘটিয়াছে— বঙ্কিমের সেই নাটকীয় প্রতিভা ও সৃষ্টিশক্তি, কল্পনার সেই ঐশ্বর্য আর কাহারও মধ্যে প্রকাশ পায় নাই।

তথাপি উপন্যাস ও গল্পসাহিত্যে এই ধারা কতকটা ভিন্নমুখী হইলে আজও একেবারে লুপ্ত হয় নাই ; বাস্তবপ্রীতি বা মানুষের দেহজীবনের রহস্যবোধ উৎকৃষ্ট কল্পনাশক্তির অভাবে অতিশয় সংকীর্ণ

ক্ষেত্রে প্রবাহিত হইলেও তাহা আজ বাঙ্গালা গদ্যে বাস্তবেরই বিচিত্র ভঙ্গি বিশ্লেষণ করিতেছে। কিন্তু বাঙ্গালা কাব্যে এই বহির্মুখী কল্পনা আর আমল পাইল না। পঞ্চেন্দ্রিয়ের পঞ্চপ্রদীপ জ্বালাইয়া তাহারই আলোকে মূর্তিপূজার যে আনন্দ, বাহিরের বিপুল জনস্রোতের কলকোলাহলে মিশিয়া মিলিত কণ্ঠস্বরের যে অপূর্ব উন্মাদনা— বাংলা কাব্যে তাহার প্রতিষ্ঠা হইল না। মানুষ হইয়া মানুষের ভিড়ে আসিয়া দাঁড়াইবার সেই উৎসাহ যেমন বাঙ্গালির পক্ষেই সম্ভব, তেমনিই বৃন্দাবন-স্বপ্নও বাঙ্গালিরই; এই দুই প্রবৃত্তির বিরুদ্ধ ধারায় বাঙ্গালি আত্মহারা। তাই নব-সাহিত্যের যে প্রেরণার কথা আমরা এতক্ষণ আলোচনা করিয়াছি, যে প্রেরণার বশে বাংলা সাহিত্যে বাঙ্গালির নবজন্ম হইয়াছিল বলিয়া মনে করি, এবং যাহার সম্যক স্ফূর্তি ঘটিলে সাহিত্যে তথা জীবনে আমরা একটা নূতন অধ্যায় আরম্ভ করিতে পারিতাম, সেই প্রেরণা সহসা আর-এক পথে প্রবাহিত হইল। বাঙ্গালির কাব্য-কল্পনা প্রাণের অন্তস্তল হইতে সরস্বতীর ধ্যানমূর্তি আবিষ্কার করিল— তাহাতে বাস্তবজীবন ও বহির্জগৎকে আত্মসাৎ করিবার এক অভিনব ভাবসাধনার পদ্ধতি প্রবর্তিত হইল— বাহিরের সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচয়েব প্রয়োজন আর রহিল না। কাব্য জীবন হইতে পৃথক হইয়া পড়িল। আমি কবি বিহারীলাল ও তাঁহার *সারদামঙ্গলের* কথা বলিতেছি।

বিহারীলালের গীতিকল্পনায় আত্মভাব-সাধনার যে ভঙ্গিটি ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহা এতই নূতন যে, আমাদের দেশীয় গীতিকাব্যের ইতিহাসে কবিমানসের এতখানি স্বাতন্ত্র্য কাব্যসাধনাকেই আধ্যাত্মিক সংশয়মুক্তির উপায়রূপে বরণ করার এই আদর্শ— ইতিপূর্বে আর লক্ষিত হয় না। বৈষ্ণব কবির কাব্যসাধনায় একটা ভাবগভীর আধ্যাত্মিক প্রেরণার পরিচয় আছে— শুধু রসসৃষ্টিই নয়, প্রাণের গভীরতর পিপাসা-নিবৃত্তির সাধনা আছে। তথাপি বৈষ্ণব কবির কল্পনায় এরূপ ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য নাই, সে কল্পনা একটা বিশিষ্ট ভাবসাধনার পদ্ধতিকে, একটি সংকীর্ণ সাধন-তন্ত্রকে আশ্রয় করিয়াছে, সে সাধনার মন্ত্র কবির নিজ কবিদৃষ্টির ফল নহে। বিহারীলালের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য সম্পূর্ণ আধুনিক। সমগ্র জগৎ ও জীবনকে সম্পূর্ণ স্বাধীন স্বকীয় কল্পনার অধীন করিয়া, আত্মপ্রত্যয়ের আনন্দে আশ্বস্ত হওয়ার যে গীতিপ্রেরণা, তাহারই নাম কবির ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য। বিহারীলালের কল্পনায় এই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ও আত্মপ্রত্যয়ের আনন্দ, বাঙ্গালা কাব্যে সর্বপ্রথম ফুটিয়া উঠিয়াছে। ইহা এতই অপ্রত্যাশিত যে, সহসা ইহার উৎপত্তি নির্ণয় করা যায় না। ঊনবিংশ শতাব্দীর ইংরেজি গীতিকাব্যে কবির এই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য প্রকট হইয়াছিল; এবং Wordsworth ও Shelley-র কল্পনা হইতে বিহারীলালের কল্পনা যতই ভিন্ন হউক, উহা যে মূলে সমগোত্র সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। অতএব বিহারীলালের কাব্যসাধনায় ইংরেজি কাব্যের প্রভাব অনুমান করা অসংগত নয়। তথাপি এ সম্বন্ধে বিবেচনা করিবার আছে। প্রথমত, ইংরেজি সাহিত্য বা ভাষায় বিহারীলাল ততদূর ব্যুৎপন্ন ছিলেন বলিয়া মনে হয় না, যাহাতে ইংরাজ রোমান্টিক কবিগণের সঙ্গে তাঁহার খুব গভীর পরিচয় সম্ভব। তিনি বায়রনের কাব্য পড়িয়াছিলেন, তাঁহার নিজের কবিতায় বায়রনের ভাবানুবাদ আছে; এরূপ ইংরেজি জ্ঞান বা ভাবগ্রাহিতা খুব বিস্ময়কর নহে। কিন্তু শেলি অথবা ওয়ার্ডসওয়ার্থের ভাবকল্পনা অনুবাদ বা অনুকরণের বস্তু নয়, সেখানে কাব্যের আত্মাকে যেন আত্মসাৎ করিতে হয়, সে কাব্যে এবং সে ভাষায় বিহারীলালের ততখানি প্রবেশ ছিল কি না সন্দেহ। দ্বিতীয়ত, শেলি ওয়ার্ডসওয়ার্থ বিহারীলাল প্রভৃতির গীতিকবিতার বিশেষত্বই এই যে, শুধু তাহার ভাববস্তুই মৌলিক নয়, ভাবনার ভঙ্গিও মৌলিক তাহা না হইলে তাঁহাদের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য এমন ফুটিয়া উঠিত না। এ স্বাতন্ত্র্য যেন জন্মগত, কোনো বহির্গত প্রভাবের ফল নয়। তাই বিহারীলালের কোনো কোনো শ্লোকে শেলির কবিতাবিশেষের ছায়া লক্ষ করিলেও এরূপ ভাবসাদৃশ্য অনুকরণাত্মক হইতে পারে না। অতএব এইরূপ প্রভাবকেই বিহারীলালের কাব্যপ্রেরণার কারণ বলিয়া মনে করিলে ভুল হইবে। তথাপি, বিহারীলাল এইসকল কবিদের সঙ্গে যে একেবারে অপরিচিত

ছিলেন এমন না হইতে পারে; হয়তো ইংরেজি কাব্যে কবিমানসের এই নূতন অভিব্যক্তির কথা তিনি তদানীন্তন পণ্ডিতসমাজে আলোচনা প্রসঙ্গে জানিতে পারিয়াছিলেন, এবং তাহাতে নিজের সাধনা সম্বন্ধে আশ্বাস ও উৎসাহ বোধ করিয়াছিলেন— আচার্য কৃষ্ণকমলের মতো বন্ধুর সংসর্গ যাঁহার জীবনে ঘটিয়াছিল তাঁহার সম্বন্ধে এরূপ অনুমান মিথ্যা না হইতেও পারে।

তবে কি বাংলা কাব্যে বিহারীলালের অভ্যুদয় নিতান্তই আকস্মিক? তিনি কি সে যুগের কেহ নন?— সাহিত্যের ইতিহাসে এরূপ ঘটনা কুত্রাপি ঘটে না, আমাদের সাহিত্যেও ঘটে নাই; বিহারীলাল এই যুগেরই কবি, এবং প্রতিভা হিসাবে তিনি যেমন বঙ্কিম ও মধুসূদনের সমকক্ষ, তেমনই তাঁহার কাব্যপ্রেরণা সম্পূর্ণ বিপরীত হইলেও একই অবস্থার ফল। সে যুগের সাহিত্যে জগৎ ও জীবন সম্বন্ধে বাঙালির প্রতিভা যে নূতন সমস্যার সম্মুখীন হইয়াছিল, মধুসূদন বঙ্কিম প্রভৃতি তাহাকে বাহিরের দিক হইতে বরণ করিয়া কল্পনাকে বহির্মুখী করিয়া ইউরোপীয় আদর্শে রসসৃষ্টি করিতে চাহিয়াছিলেন।— অন্তরকে বাহিরের নিয়মাধীন করিয়া সর্ব দ্বন্দ্ব ও সংশয়কে কাব্যরসে পরিণত করিতে চাহিয়াছিলেন। বিহারীলাল এই দ্বন্দ্ব স্বীকার করেন নাই— এইখানেই তাঁহার ভারতীয় সংস্কার জয়ী হইয়াছে; কিন্তু তিনিও এ যুগের প্রভাব অস্বীকার করিতে পারেন নাই। অর্থাৎ বহির্জগৎ সম্বন্ধে যে সচেতনতা এ যুগে অবশ্যম্ভাবী হইয়াছিল, পূর্বতন কোনো যুগে যদি তাহা ঘটিত, তবে ভারতীয় কবি কাব্যসাধনার যে পন্থা অবলম্বন করিতেন ও যে মন্ত্রে সিদ্ধিলাভ করিতেন, বিহারীলাল তাহাই করিয়াছিলেন। তিনি বহির্জগৎকে কতকটা আড়ালে রাখিয়া প্রাণের মধ্যে একটা আদর্শ ভাবজগৎ সৃষ্টি করিয়া সকল সংশয়ের সমাধান করিয়া লইয়াছিলেন। প্রীতি ও সৌন্দর্য-লুব্ধ কবিপ্রাণ ধ্যানযোগে বিশ্বসৃষ্টির মধ্যে এমন একটা সত্তার সন্ধান পাইয়াছিলেন, যাহার ভাবনায় জীবধর্মের গভীরতম প্রবৃত্তিও বাস্তবজগতের কঠোর কর্কশতার উপরে একটি কোমল প্রলেপ বুলাইয়া শান্ত আনন্দরসে পরিতৃপ্ত হইতে পারে। এ সাধনা ভারতীয় প্রকৃতির অনুবন্ধী— সকল রসের উপরে শান্তরসের প্রতিষ্ঠাই ভারতীয় কবির কবিধর্ম। মানুষের বাস্তব জীবনের প্রত্যক্ষ-কঠোর নিয়তি, বাসনা-কামনার স্বর্গনরকব্যাপী আলোড়ন, সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ কীর্তি ট্র্যাজেডির অনুভাবনা, ভারতীয় কবির কল্পনাকে বিপথগামী করিতে পারে নাই। কিন্তু বিহারীলালের কাব্যসাধনায় এই মন্ত্রের প্রভাব থাকিলেও তাহা স্বতন্ত্র, তাঁহার কবিপ্রকৃতি অন্য দিকে সম্পূর্ণ আধুনিক। আলংকারিক পণ্ডিতগণ কাব্যরসকেব্রহ্মাস্বাদসহোদর বলিয়া ঘোষণা করিলেও— কাব্যকে চতুর্বর্গফলপ্রদ বলিয়া স্বীকার করিলেও— কবির কাব্যসাধনাকে আধ্যাত্মিক সাধনা বলিয়া মনে করিতেন না। কারণ, এই রসসৃষ্টিতে কাব্যের যে কলা-কৌশল নির্ধারিত হইয়াছিল সেই কলা-কৌশলের নিপুণ প্রয়োগই কবিপ্রতিভার মুখ্য কীর্তি— রস যেন তাহার গৌণ পরিণাম; কবি যেন একটি আদর্শ স্থির রাখিয়া কাব্যের উপকরণগুলি প্রয়োজনমতো ব্যবহার করিতেন; একটা বাঁধা নিয়মের অনুবর্তী হইয়া নিজ মানস বা প্রাণের প্রেরণাকে দমন করিয়া রাখিতেন। এজন্য কাব্যসাধনায় কবি-মানসের কোনো স্বাধীন বিকাশের সম্ভাবনা ছিল না। আধুনিক কালে আমরা কাব্যের মধ্যে কবি-মানসের যে আধ্যাত্মিক পরিচয় পাই— মানুষের স্বাভাবিক বোধশক্তি জগতের সঙ্গে নিবিড় সম্পর্কের ফলে যে পূর্ণ-চেতনা লাভ করে— কবি কিটস যাহাকে 'soul-making' বলিয়াছেন, এইসকল কাব্যে তাহার নিদর্শন নাই। কাব্য বাস্তব জগতের রূপরসোদ্ধৃত হইলেও তাহার লক্ষ্য যখন সেই 'রস' যাহা ব্রহ্মাস্বাদের মতো, তখন বস্তুজগতের সঙ্গে কাব্যের ঘনিষ্ঠ যোগ থাকিবার প্রয়োজন কী? কলা কৌশলে সেই অবস্থা ঘটাইতে পারিলেই যথেষ্ট। অতএব বাহিরের সঙ্গে অন্তরের কোনো বোঝাপড়া অনাবশ্যক— সে সমস্যা জ্ঞানযোগী দার্শনিকের অধিকারভুক্ত। এজন্য কবির পক্ষে একটা স্বাধীন ভাবসাধনার প্রয়োজন তখনও

অনুভূত হয় নাই। আধুনিক বাঙালি কবি বিহারীলাল এই বহিঃসৃষ্টির প্রভাবকে অন্তরে অনুভব করিয়াছেন, এবং তাহাকে নিজস্ব ভাবসাধনার মন্ত্রে জয় করিয়া লইয়াছেন। এই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের মূলে যে subjectivity আছে তাহা ভারতীয় সাধনরীতির অনুকূল; কিন্তু তাহা যে কবিধর্মকে আশ্রয় করিয়াছে তাহা সম্পূর্ণ নূতন; কারণ, এই ভাবসাধনার মূলে আছে মর্ত্যমাধুরীলুব্ধ কবিপ্রাণ, তাহা ভারতীয় অধ্যাত্মবাদের বিরোধী। কবিকল্পনার উপরে বহিঃপ্রকৃতির এই প্রভাব— যেমনভাবেই হোক মর্ত্যজীবনের মাধুরী পান করিবার এই আকাঙ্ক্ষা— যে ধরনের আধ্যাত্মিকতায় মণ্ডিত হইয়াছে তাহাই বাংলা গীতিকাব্যে আধুনিকতার লক্ষণ। ইংরেজ রোমান্টিক কবিগণের মতোই— প্রকৃতি ও মানবহৃদয়কে একত্রে গাঁথিয়া একটা বৃহত্তর আদর্শের অনুপ্রাণনা, মানুষের মনোবৃত্তি ও দেহবৃত্তিকে একই তত্ত্বের অধীন করিয়া সত্যকে সুন্দর ও সুন্দরকে সত্য বলিয়া উপলব্ধি করিবার এই চেষ্টা— মানুষের প্রাণে যে প্রেম ও সৌন্দর্যের পিপাসা রহিয়াছে, বহিঃপ্রকৃতির মধ্যে তাহার উৎসরূপিণী এক চিন্ময়ী সত্তার কল্পনা— বাঙালি কবিকেও এত শীঘ্র অভিভূত করিয়াছে, ইহাই বিস্ময়কর। কিন্তু তদপেক্ষা বিস্ময়কর তাঁহার কল্পনার মৌলিকতা। তাঁহার 'সারদা', Wordsworth-এর প্রকৃতিসর্বস্ব বিশ্বচেতনাও নয়; Shelley-রূপাতীত রূপময়ীর প্রেমসৌন্দর্যের অপরা আদর্শ-লক্ষ্মী, বিশ্বাতীত বিশ্বাত্মাও নয়। তাঁহার 'সারদা' মানুষের স্বাভাবিক প্রীতি-প্রেমের প্রবাহরূপিণী, বিশ্বব্যাপ্তসৌন্দর্য ও মানবীয় প্রেমের সমন্বয়রূপিণী, বহিরন্তরবিহারিণী, বিশ্ববিকাশিনী 'দেবী যোগেশ্বরী'— তিনি 'প্রত্যক্ষে বিরাজমান, সর্বভূতে অধিষ্ঠান' অর্থাৎ 'তুমিই বিশ্বের আলো (শুধু নয়), তুমি বিশ্বরূপিণী'—

তুমি বিশ্বময়ী কান্তি, দীপ্তি অনুপমা,
কবির যোগীর ধ্যান,
ভোলা প্রেমিকের প্রাণ—
মানব-মনের তুমি উদার সুষমা।

—'যোগীর ধ্যান' ও 'প্রেমিকের প্রাণ',— তাঁহার 'সারদা'য় এই দুয়ের কোনো বিরোধ নাই, কারণ প্রেম ও সৌন্দর্যপিপাসা তাঁহার নিকট অভিন্ন।

বাস্তবপ্রীতি বা প্রত্যক্ষের প্রতি প্রাণের আকর্ষণ যাহার নাই, তাহার সৌন্দর্য-পিপাসাও নাই। সৌন্দর্য রূপাতীত বা বাস্তবাতীত নয়, এ জন্য প্রেয়সী ও রূপসীর মধ্যে ভাবগত অসামঞ্জস্য নাই। যোগীর ধ্যানে যে সৌন্দর্যের প্রেরণা রহিয়াছে, প্রকৃত প্রেমের প্রেরণাও নাই। বিহারীলাল বিশ্বপ্রকৃতি ও মানবহৃদয়ের যোগসূত্ররূপিণী এই 'যোগেশ্বরী' সারদার কল্পনা করিয়াছেন; ইহাতে কাব্যের সহিত জীবনের একটা নিগূঢ় সম্পর্কের কথা— সকল উৎকৃষ্ট কাব্য-প্রেরণার মর্মকথা প্রকাশিত হইয়াছে। কবি কিটসের সেই 'Principle of Beauty in all things' বিহারীলালও কতকটা উপলব্ধি করিয়াছিলেন। মনে হয় কবি-প্রেরণার পরমতত্ত্বটিকে তিনি যেমন করিয়া প্রাণের মধ্যে পাইয়াছেন, তেমন করিয়া Wordsworth বা Shelleyও পান নাই। কবি কিটস যাহার সজ্ঞান চেতনায় অভিভূত হইয়াছিলেন Shakespeare অজ্ঞানে তাহারই বশবর্তী হইয়া কাব্যসৃষ্টির আনন্দে কবি-জীবনের পরমসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। বিহারীলালের ভারতীয় প্রকৃতি ধ্যানরসে পরিতৃপ্ত হইয়া নিজ অন্তরের উপলব্ধিকেই কবিপ্রাণের নিশ্চিন্ত মুক্তি মনে করিয়া কেবল মন্ত্র জপ করিয়াই ক্ষান্ত হইয়াছে।

বিহারীলালের কবিদৃষ্টি কাব্যসৃষ্টিতে সার্থক হয় নাই; তাঁহার কাব্য একরূপ তত্ত্বরসের (mysticism) আধার হইয়া আছে, — সে রসকে তিনি রূপ দিতে পারেন নাই; তিনি নিজে যাহা দেখিয়াছেন অপরকে তাহা দেখাইতে পারেন নাই। এ সম্বন্ধে একটু ভাবিয়া দেখিলে একটা কথা মনে হয়। বিহারীলালের

এই মন্ত্রদৃষ্টি যদি কাব্য সৃষ্টি করে, তবে সে কাব্য গীতিকাব্য হইতে পারে না; নাটকীয় রূপসৃষ্টি ভিন্ন আর কোনো উপায়ে ইহার পূর্ণ প্রকাশ অসম্ভব। যে কল্পনা সর্ববস্তুকে সুন্দর দেখে, যে সৌন্দর্যবোধের মূল বাস্তবপ্রীতি, সে কল্পনার পরিণাম বিশ্বাত্মীয়তা। অতএব তাহা যদি কাব্য-সৃষ্টির প্রেরণা হয় তবে তাহা কোমল কঠোর, সুন্দর-কুৎসিত, পাপপুণ্য, সুখদুঃখ— এককথায় জগৎসৃষ্টির যতকিছু বৈচিত্র্যকে একটি সমান নির্দ্বন্দ্ব রসচেতনার বশে কাব্যরূপে প্রতিফলিত করিয়াই চরিতার্থ হইতে পারে, লিরিকের আত্ম-ভাবসর্বস্বতা তাহার পক্ষে অসংগত। এইজন্যই বিহারীলালের গীতিকবিতাও সুস্পষ্ট আকার গ্রহণ করিতে পারে নাই। তাঁহার রচনায় যথার্থ কাব্যসৃষ্টির পরিবর্তে কাব্যরসরসিকের একরূপ ভাবাবস্থার পরিচয় আছে।

Keats এই ভাবকে রূপ দিবার— বহিরন্তরবিহারী এই সত্য-সুন্দরকে কাব্যের সাহায্যে দৃষ্টিগোচর করাইবার জন্য আকুল হইয়াছিলেন; অসমাপ্ত কবিজীবনে তিনি কেবল ইন্দ্রিয়গোচরকে বাক্যগোচর করিতে পারিয়াছিলেন, নিজ প্রাণের আকূতিকেও অপরের হৃদয়গোচর করিতে পারিয়াছিলেন; তাই তাঁহার অসম্পূর্ণ কবিকল্পনাও কাব্য সৃষ্টি করিয়াছে। কিন্তু তিনিও বুঝিয়াছিলেন ব্যক্তিনিরপেক্ষ (objective) রূপ-সৃষ্টি ব্যতিরেকে এ কল্পনা সার্থক হইতে পারে না। বিহারীলালের এ ভাবনা ছিল না, এ প্রেরণাই ছিল না, কেবল উৎকৃষ্ট ভাবরসে নিমগ্ন হইয়া তিনি নিজ প্রাণের আনন্দ জ্ঞাপন করিয়াছেন— কাব্য প্রেরণার যে রহস্য সেই রহস্যেরই প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন; তাই তিনি প্রকৃত কবি না হইয়া mystic হইয়াই রহিলেন। এক জন প্রসিদ্ধ কবি-সমালোচক যথার্থই বলিয়াছেন—

> The pure poet is not a mystic, contemplation of the mystery is no end in itself for him. He is a doer, a maker, a revealer, a creator.

তথাপি বিহারীলালের কাব্যসাধানায় ভারতীয় প্রভাব বিশেষভাবে থাকিলেও, তাহার একটা লক্ষণ বিস্মৃত হইলে চলিবে না— বিহারীলালের কবি-প্রকৃতিতে উৎকৃষ্ট সৌন্দর্যবোধ এবং অতিশয় বাস্তব হৃদয়বৃত্তি একসঙ্গে চরিতার্থ হইয়াছে। ইহার কারণ, তাঁহার কাব্যসাধনায় বাঙালির বৈরাগ্যবিমুখ বাস্তবরসপিপাসার সঙ্গে ভারতীয় ভাবনা যুক্ত হইয়াছে— এই দুইয়ের সম্মিলনেই এমন সত্যকার কবিদৃষ্টি সম্ভব হইয়াছে। কিন্তু ইংরেজি সাহিত্যের প্রভাবে বঙ্কিমচন্দ্রের যে বাঙালি-প্রতিভা বাস্তবজীবনের কল্পনাগৌরবে কাব্য সৃষ্টি করিয়াছে, সেই বাঙালি প্রতিভাই ইংরেজি-প্রভাববর্জিত হইয়া এবং ভারতীয় ধ্যানপ্রকৃতির বশবর্তী হইয়া কাব্যের স্রষ্টা না হইয়া মন্ত্রদ্রষ্টা হইয়াছে। এজন্য শেলি বা ওয়ার্ডসওয়ার্থের তুলনায় বিহারীলালের কবিদৃষ্টি আরও সম্যক ও সুসম্পূর্ণ হইলেও কাব্যসৃষ্টির বিষয়ে তাঁহাদের বহু নিম্নে রহিয়া গিয়াছে।

বিহারীলালের এই কবিদৃষ্টি আর-কাহাকেও অনুপ্রাণিত না করিলেও তাঁহার কাব্যরচনার ভঙ্গি এবং তাহার অন্তর্গত ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের আদর্শ পরবর্তী কবিগণের উপরে প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। ইতিমধ্যে ঊনবিংশ শতাব্দীর ইংরেজি কাব্যসাহিত্য বাঙালির সুপরিচিত হইয়া উঠিল; তাহাতে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের যে ভাবোন্মাদমাধুরী অপূর্ব সংগীতে উৎসারিত হইয়াছে, গীতিপ্রাণ বাঙালির কল্পনা তাহাতে আত্মসমর্পণ করিল; বিহারীলাল যে আত্মভাবসাধনার পথ নির্দেশ করিয়াছিলেন তাহাতে এই বিদেশি গীতিকাব্যের আদর্শ সহজেই বাংলা কাব্যে প্রবেশ করিল। কিন্তু বিহারীলাল খাঁটি বাঙালিসুলভ প্রীতিকল্পনায়, বাহিরের সহিত অন্তরকে যুক্ত করিয়া একটি পরিপূর্ণ রসসাধনার যে ইঙ্গিত করিয়াছিলেন, সে ইঙ্গিত ব্যর্থ হইল; ইংরেজি কাব্যের প্রভাবে আত্মপ্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষাই এ কাব্যের মূল প্রেরণা হইয়া দাঁড়াইল। বিহারীলালের কাব্যে আত্মভাবনিমগ্নতার লক্ষণ থাকিলেও তাহাতে সজ্ঞান আত্মপ্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষা

নাই। কিন্তু সেই আত্মনিমগ্নতার মোহই বড়াল-কবির কাব্যে আত্মপ্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষারূপে ফুটিয়া উঠিয়াছে। তাই বিহারীলালের 'সারদা'র একটি দিক— বিশ্বের অন্তঃপুরে তাঁহার সেই রহস্যময়ী মূর্তি— শেলির কাব্যরসে অভিষিক্ত হইয়া বড়াল-কবির অবাস্তব রসপিপাসার ইন্ধন জোগাইয়াছে। ব্যক্তির এই আত্মপরায়ণ কল্পনা, এই সম্পূর্ণ অসামাজিক আত্মরতির কবিতা বাংলা সাহিত্যে নূতন— কাব্যকে জীবন হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া কবিকল্পনার হা-হুতাশ বাংলা সাহিত্যে এইখান হইতেই আরম্ভ হইয়াছে। দেবেন্দ্রনাথের কবিতায় এই আত্মরতি আর-এক রূপে ফুটিয়া উঠিয়াছে; তিনি সর্ববস্তুতে যে সৌন্দর্য দেখিতেছেন তাহা বস্তুগত নয়, বাস্তবই অবাস্তব-মনোহর হইয়া উঠিয়াছে, তাঁহার প্রীতির অফুরন্ত উৎসমুখে সর্ববস্তুই সুন্দর। এ বিষয়ে তিনিও বিহারীলালের কাব্যকল্পনার একাংশমাত্রের অধিকারী। বিহারীলাল তাঁহার সারদাকে যে 'ভোলা প্রেমিকের প্রাণ' বলিয়াছেন, দেবেন্দ্রনাথের কাব্য তাহার উৎকৃষ্ট উদাহরণ বটে, কিন্তু 'কবির যোগীর ধ্যান' তাহা নহে।

তথাপি দেবেন্দ্রনাথের উচ্ছ্বাসপ্রবণ কবিপ্রতিভায় বাঙ্গালা গীতিকাব্যের যে একটি রূপ ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহাতেও যেন পলকের জন্য, অন্ধকারে বিদ্যুৎ-চমকের মতো, বাঙ্গালির সেই চিরকালের বাঙ্গালিত্ব শেষবার ধরা দিয়াছে। এ যুগের কবিগণের মধ্যে এই বাঙ্গালিসুলভ প্রীতির আবেগ আমরা বিহারীলালের কাব্যে দেখিয়াছি; মধুসূদন পাশ্চাত্য মহাকাব্যের আদর্শ গ্রহণ করিয়াও এই প্রীতির বশে abstractions লইয়া থাকিতে পারেন নাই। হেমচন্দ্র এই প্রীতির উচ্ছ্বাসে অসংখ্য কবিতা লিখিয়াছিলেন, কিন্তু প্রকৃত কবিশক্তির অভাবে তাঁহার প্রীতি ভাষায় ও ছন্দে কাব্যের অপূর্বতা লাভ করে নাই। বিহারীলাল এই প্রীতিকেই অতি উচ্চ সৌন্দর্যধ্যানে নিয়োগ করিয়াছিলেন; সেই ধ্যানের সঙ্গে এই প্রীতির বিরোধ ছিল না বলিয়াই তিনি এমন সম্যক কবিদৃষ্টির অধিকারী হইয়াছিলেন। দেবেন্দ্রনাথের কবিতায় এই প্রীতি একটি নূতন ভঙ্গিতে ফুটিয়া উঠিয়াছে— আত্মভাবমূলক আবেগের তীব্রতায় এই প্রীতি যেন কবির হৃদয়বাঁশরির একমাত্র রন্ধ্রমুখে গীতোচ্ছ্বাসে বাজিয়া উঠিয়াছে। চিন্তালেশহীন নিছক emotion-এর এই আবেগ, এই ভাববিহ্বলতা বাঙ্গালা কবিতায় যে একটি সুর যোজনা করিয়াছে, তাহা গীতিকাব্য হিসাবে অপূর্ব; নিজ প্রাণের আহ্লাদকে উপুড় করিয়া ঢালিয়া নিঃশেষ করিয়া দেওয়ার এমন ভঙ্গি বাঙ্গালি কবি ভিন্ন অপর কাহারও পক্ষে সম্ভব হইত না। প্রীতি-সৌন্দর্যের এই মিলিত আবেগ দেবেন্দ্রনাথকে বিহারীলালের যতটা সমগোত্র করিয়াছে আর কাহাকেও তেমন করে নাই; মনে হয়, যে আবেগ বিহারীলালের ধ্যান-কল্পনায় গভীর হইয়া শান্তরসে পরিণত হইয়াছে, সেই আবেগই দেবেন্দ্রনাথের সর্বেন্দ্রিয় বিবশ করিয়াছে। বিহারীলাল 'বিচিত্র এ মত্তদশা'কে 'ভাবভরে যোগে বসা' বলিয়াছেন— দেবেন্দ্রনাথের সে যোগসাধনা ছিল না; তাঁহার কল্পনা একমুখী, আত্মহারা, অপ্রকৃতিস্থ; তিনি ধ্যান-ধারণার ধার ধারিতেন না, ভাবকে ভাবিয়া দেখিবার অবসর তাঁহার ঘটিত না। সেজন্য, প্রবল হইলেও তাঁহার কল্পনা সংকীর্ণ, তাঁহার সৃষ্টিশক্তি অসমান ও বিক্ষিপ্ত।

আধুনিক সাহিত্যে বাঙ্গালির বৈশিষ্ট্যের আলোচনায় আমি যাহা বলিয়াছি তাহাতে এ যুগের সাহিত্যসৃষ্টির মূল্য নির্ধারণ করা আমার উদ্দেশ্য নয়, তথাপি কবিগণের মৌলিক প্রতিভা ও ব্যক্তিগত প্রেরণার যতটুকু আলোচনা প্রয়োজন তাহা করিয়াছি। এই আলোচনা হইতে বাঙ্গালির কবিপ্রতিভা তাহার জাতীয় প্রবৃত্তির দ্বারা কতখানি নিয়ন্ত্রিত হইয়াছে এবং এই সাহিত্যসৃষ্টিতে কী কারণে কোন্‌দিকে তাহা কতখানি সফল বা নিষ্ফল হইয়াছে তাহা অনুমান করা দুরূহ হইবে না। বাঙ্গালির স্বভাবে যে দুই প্রবল বিরুদ্ধ প্রবৃত্তির উল্লেখ করিয়াছি তাহাও বিশেষভাবে স্মরণযোগ্য, কারণ এইজন্যই এই সাহিত্যের ধারা একটা ঘূর্ণার মধ্যে পড়িয়া শেষে বিমুখবাহিনী হইয়াছে। যাহা নূতন, অথচ সত্য এবং সুন্দর,

তাহার আদর্শ বিদেশি বা বিজাতীয় হইলেও, তাহাকে আত্মসাৎ করিবার যে উদার কল্পনাশক্তি বাঙ্গালি জাতির বিশেষত্ব, তাহারই প্রভাবে এই নবসাহিত্যের জন্ম হইয়াছিল। কিন্তু জাতির প্রাণে সাড়া না জাগিলে, কেবলমাত্র অনুকরণের দ্বারা সাহিত্যসৃষ্টি হয় না। তাই, ইউরোপীয় সাহিত্যের অনুকরণে, এই নব সাহিত্যের কল্পনাভঙ্গি ও ভাবপ্রেরণায় জীবন ও জগৎ সম্বন্ধে যে কৌতূহল, মনুষ্যজীবনের বাস্তব নিয়তির ভাবনায় যে অভিনব উন্মাদনা আমরা লক্ষ করি— কল্পনাকে ভিতর হইতে বাহিরে আনিয়া বাস্তব-ক্ষেত্রে প্রসারিত করিয়া ইতিহাস বিজ্ঞান সমাজ ও মনস্তত্ত্বের উপরে প্রতিষ্ঠিত করিবার যে সফল ও নিষ্ফল সাধনার পরিচয় পাই, তাহার কারণ অনুসন্ধান করিলে দেখা যায়, বাঙ্গালির অন্তরে এই মর্ত্যজীবনের প্রতি একটি সত্যকার মমতা, দেহপ্রীতি বা বাস্তবরসবুভুক্ষা চিরদিন বিদ্যমান আছে। কিন্তু দেশের জলবায়ু, ভারতীয় কালচারের প্রভাব ও বাহিরের নানা অবস্থার গুণে, এই ভোগস্পৃহা জীবনের বাস্তব আশা-আকাঙ্ক্ষায় সত্য হইয়া উঠে নাই, অলস ভাববিলাস বা আত্মরতিকেই সে এই ক্ষুধানিবৃত্তির উপায় করিয়া লইয়াছে। তাই সাহিত্যে ও জীবনে কোনো বৃহৎ কল্পনা বা কীর্তি-কামনা তাহার নিশ্চিন্ত পল্লি-বাস-সুখ বিঘ্নিত করিতে পারে নাই। কিন্তু গতযুগের সেই বৈদেশিক ভাবপ্লাবনে সে সহসা জাগিয়া দেখিল, তাহার গ্রামপ্রান্তের সেই নিভৃত নদীটির কূল-রেখা দূরবিসর্পী মাঠ-বাট-প্রান্তর একাকার করিয়া দিগন্তসীমায় মিশিয়াছে; এবং সেইখানে উষালোকে, নানারাগরঞ্জিত মণিহর্ম্যের মতো একটি মেঘস্তম্ভ যেন সেই জলের উপরেই দাঁড়াইয়া ছায়া বিস্তার করিয়াছে! বাস্তব জগতে কল্পনার এই আচম্বিত বিস্তারে তাহার প্রাণের স্ফূর্তি হইল; যে মেঘ আকাশকে মেদুর করিয়া, গৃহকোণ অন্ধকার করিয়া, তাহার অন্তরের দীপশিখা উজ্জ্বল করিয়া তুলিত, সেই মেঘ আজ নবপ্রভাতের কিরণচ্ছটায় কী অপরূপ মায়াপুরী রচনা করিয়াছে! সেই দিগন্তবিস্তৃত জলরাশি পার হইয়া অসীম সম্পদ-শোভার রহস্য-নিকেতন অধিকার করিবার জন্য মধুসূদন তাঁহার অমিত্রাক্ষরছন্দে আহ্বান-সংগীত গাহিলেন। এই কূলভাঙা কল্পনাস্রোত, এই মুক্তির আনন্দই বাঙ্গালা-কাব্যে মধুসূদনের দান। কিন্তু মধুসূদন ইউরোপীয় আদর্শে মানুষের মনুষ্যধর্ম, পুরুষের পৌরুষকেই জয়যুক্ত করিতে চাহিলেও, মনুষ্যজীবনের তলদেশ বা ভীমকান্ত শিখর-মহিমা অপলক নেত্রে নিরীক্ষণ করিবার সাহস বা ধৈর্য সঞ্চয় করিতে পারেন নাই। বাঙ্গালিসুলভ মমতা ও প্রীতিবিহ্বলতার বশে তিনি তাঁহার অন্তরের অন্তরে ইউরোপীয় আদর্শকে পূর্ণ প্রতিষ্ঠিত করিতে পারেন নাই। বঙ্কিমচন্দ্রই সে প্রভাব পূর্ণরূপে হৃদয়ংগম করিয়াছিলেন; তাঁহার কাব্যেই মানুষের সর্বাঙ্গীণ মনুষ্যত্ব প্রকটিত হইয়াছে। কিন্তু অতঃপর বাঙ্গলা কাব্যসাহিত্যে কল্পনার এ ধারা আমূল পরিবর্তিত হইয়াছে।— জীবন-সমুদ্র মন্থন করিয়া বিষামৃতপানের সে আকাঙ্ক্ষা— দেহ মন ও হৃদয় এই তিনেরই উদ্দীপনার সে পৌরুষ আর নাই। মনে হয়, যে প্রাণবহ্নি কেবলমাত্র কবিপ্রতিভা দ্বারা এক সাহিত্য হইতে আর-এক সাহিত্যে জ্বালাইয়া লইয়া বাঙ্গালির কল্পনা বহির্মুখী হইতে চাহিয়াছিল, তাহাতে গোড়া হইতেই একটা অভাব, একটা দুর্বলতা ছিল। বাঙ্গালির মজ্জাগত গীতি-প্রবণতা বা আত্মভাববিহ্বলতাই শেষপর্যন্ত জয়ী হইয়াছে— বাস্তব-জীবন-সাধনার সেই নূতন আবেগ সাহিত্যেও সফল হয় নাই। যে প্রবৃত্তি আধুনিক সাহিত্যের প্রারম্ভকে একটি নবতম ভঙ্গিতে প্রকাশ করিয়াছিল তাহা যেন অর্ধপথেই নিঃশেষ হইয়াছে। বাঙ্গালির একমাত্র সম্বল ছিল সুলভ ভাবোচ্ছ্বাস ও সহজ প্রীতিরস-রসিকতা— তাহাই লইয়া সে মহাকাব্য ও কাহিনির দিকে ঝুঁকিয়াছিল— তাহার ফল হইয়াছিল শক্তিহীন অনুকরণ ও ভাব-কল্পনার স্বেচ্ছাচার। ইহারই প্রতিক্রিয়া আনয়ন করিলেন বিহারীলাল। তিনি একেবারে বাহির হইতে অন্তরে আশ্রয় লইলেন এবং কাব্যসাধনার ধ্যানযোগে, উৎকৃষ্ট সৌন্দর্যবোধ ও বাঙ্গালিসুলভ সহজিয়া প্রীতির যোগসাধন-প্রণালি নির্দেশ করিলেন। পাশ্চাত্য সাহিত্যের যে নব অনুপ্রেরণা বাঙ্গলা কাব্যে প্রথম

প্রথম একটা কোলাহলের সৃষ্টি করিলেও, কালে তাহা প্রাণ-মূলে রসসঞ্চার করিয়া, শুধু সাহিত্যে নয়, বাঙালির জীবনেও প্রতিষ্ঠা পাইত— বিহারীলাল সেই অনুপ্রেরণাকে আদৌ অস্বীকার করিয়া—

হা ধিক ! ফেরঙ্গ বেশে
এই বাল্মীকির দেশে
কে তোরা বেড়াস সব উঞ্ছিমুখি আয়া।

এবং

তপোবনে ধ্যানে থাকি এ নগর-কোলাহলে

— বলিয়া, জীবনের সর্বদায়িত্ব বিস্মৃত হইয়া তাঁহার সরস্বতীকে সম্বোধন করিয়া গাহিলেন—

তুমি লক্ষ্মী সরস্বতী,
আমি ব্রহ্মাণ্ডের পতি,
হোক গে এ বসুমতী যার খুশি তার।

ইহাতেই সর্বদ্বন্দ্বের মীমাংসা হইল, বাঙালি যেন মুক্তি পাইল। আত্মভাবনিমগ্ন বাঙালি-কবি কখনও অন্তরে কখনও বাহিরে স্বকীয় কল্পনা প্রসারিত করিয়া কাব্যে ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যের সাধনা আরম্ভ করিলেন। কিন্তু বিহারীলাল খাঁটি বাঙালি ছিলেন, এই আত্মভাবনিমগ্নতার মধ্যেও তিনি একটি অপূর্ব প্রীতিরসের সাধনা করিয়াছিলেন। এ প্রীতি শুধুই কাল্পনিক বিশ্বপ্রেম নয়, অথবা আর্টের সৌন্দর্য-লালসা নয় ; এ রস জীবনের প্রত্যক্ষ বাস্তব হৃদয়-সম্পর্কের রস। এই প্রীতি ও সৌন্দর্য-পিপাসা একাধারে মিলিত হইয়াই বিহারীলালের কাব্যে (আধুনিক বাঙলাকাব্যের একমাত্র সত্যকার) mysticism সঞ্চার করিয়াছে। পূর্বেই বলিয়াছি কবিজীবনের আদর্শ হিসাবে বিহারীলালের বাঙালিত্ব এই যে ভাবদৃষ্টির সন্ধান পাইয়াছিল— কাব্য-মন্ত্র ইহা অপেক্ষা বিশুদ্ধ হইতে পারে না।

আমাদের সাহিত্য

মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী

সাহিত্য মানুষকে দেয় সংস্কৃতি। আমরা যেখানে থাকি, তার চারপাশে খানিকটা আলো-হাওয়ার পরিমণ্ডল থাকা প্রয়োজন। সাহিত্য আমাদের মনের জগতের সেই আলো-হাওয়ার পরিমণ্ডল।

'সহিত' কথাটি থেকে সাহিত্য শব্দটির উৎপত্তি। এর মধ্যে মিলনের ভাবটি সুস্পষ্ট। সাহিত্য তাই, এনে দেয় সাযুজ্য, সৃষ্টি করে সংযোগ। এক মনের সহিত বহু মনের মিলনের দৌত্য এর কাজ।

আমাদের দেশেও সেই সাহিত্য চাই— যা মনের সঙ্গে মনের ঘটাবে মিলন; বিদ্বেষহীন হৃদয়-বন্ধনের মধ্য দিয়ে এনে দেবে সব মনের মুক্তি। চাই সেই সাহিত্য— যা আমাদের স্থানীয় মনকে বিশ্বমনের নিকট উপস্থিত করবে, স্থান-কালকে চিরন্তনের সঙ্গে যোগযুক্ত করবে; আর এমনই মন দেওয়া-নেওয়ার মধ্য দিয়ে যে সাহিত্য-সহৃদয়তা এবং সম্প্রীতির নূতন তোরণদ্বার উন্মোচন করবে সে সাহিত্যই সার্থক বিশ্বসাহিত্য।

স্বভাবতই প্রশ্ন ওঠে যে, সাহিত্য কি আমাদের দেশে সৃষ্টি হচ্ছে? সাহিত্যের বাজারে হট্টগোল শুনে তো মনে হয় হাট জমছে জোর। কিংবা হাট নেই, এমনি শুধু শুধু হট্টগোল? কিন্তু সাহিত্যের বাজারে হাট জমবার আগেই হট্টগোল জমে যায়, বিভিন্ন দেশের সাহিত্যের ইতিহাসে এ-ও লেখা আছে। তাই যাঁরা বলেন, কিছুই হচ্ছে না, শুধু হইচই; প্রথমেই বলে রাখি, আমি তাদের দলে নই। অন্তত কিছু যে হবার মুখে, এটা নিঃসন্দেহ। এই হট্টগোল তারই সূচনা করছে।

কাজেই, এখন পর্যন্ত বিশেষ কিছু সৃষ্টি হল না বলে ভবিষ্যতেও কিছু হবে না, এ আমি বিশ্বাস করতে পারিনে। পূর্ববঙ্গের সাহিত্য এখন তার পথ খুঁজছে। এখানে যে চলা শুরু হয়েছে, এইটেই বড়ো কথা। চলতে চলতে আমাদের সাহিত্য আপনিই তার পথ খুঁজে পাবে। প্রথম দিকে দ্বন্দ্ব ও মতবিরোধ অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু পথের নিশানা যেই মিলে

যাবে, তখন যাত্রীদল ঐক্যবন্ধ হয়ে দৃঢ় পদক্ষেপে গৌরবিত জয়যাত্রার সুনির্দিষ্ট পথে অগ্রসর হবে। পূর্ব বাংলার জাতীয় জীবনে যে নবজাগরণ এসেছে, আমাদের সাহিত্যই হবে একে এগিয়ে নিয়ে যাবার প্রধান বাহন।

আজকে আমাদের সাহিত্যের জগতে এই যে মুমুক্ষা, নিজেকে প্রকাশ করবার ঐকান্তিক আগ্রহ— এর মূল্যও আমার কাছে কম নয়। পরিমাণ দিয়ে নয়, আদর্শ দিয়ে সাহিত্যের বিচার। সাহিত্যের ধর্মই হচ্ছে— সে বিশ্বমানবের অন্তরের অভিমুখী, মানুষের মনের দুয়ারে গিয়ে করুণ নয়নে সে প্রবেশ মাগে। আমাদের সাহিত্যিকদের বাণীও কি সকল মানুষের হৃদয়ে প্রবেশের কামনা করছে না? এমনি করতে করতে একদিন সে-ও বিশ্বমানবের হৃদয়-দুয়ারে পৌঁছে যাবে। আর তার অনুরাগের স্পর্শে হয়তো একদিন সে-ও নিখিল মানব-মনকে উদ্‌বোধিত করে তুলতে পারবে।

আমাদের সাহিত্যে এখন একটা বিশেষ সন্ধিক্ষণ, সাহিত্য তাই আমাদের মোড় ফেরাবার মুখে। এ সময়ে নিজেদের মধ্যে আলাপ-আলোচনা হওয়া প্রয়োজন। এইখানেই সম্মেলন ও সমিতির সার্থকতা। এর থেকে আমরা পাই অনুপ্রেরণা আর পথনির্দেশ, সংস্কৃতিচর্চার পরিবেশ সৃষ্টি করে এজাতীয় অনুষ্ঠান সাহিত্য-কর্মকে এগিয়ে নিয়ে যায়। নইলে শুধু সভাসমিতি করে যে সাহিত্য হয় না, এ সবাই জানে।

যাই হোক, পূর্ববঙ্গের সাহিত্য-ক্ষেত্রে এই নব-উন্মেষের সন্ধিক্ষণে আমাদের সাহিত্যের নীতি ও আদর্শ সম্পর্কে আমি যা ভেবেছি, বা আমার মনে যেসব চিন্তা উপস্থিত হয়েছে, তার কিছুটা আজ এখানে নিবেদন করতে ইচ্ছে করি। আমার সঙ্গে মতের অমিল কারুরই হবে না, এ আশা করিনে, কিন্তু কারও যদি ভিন্ন মতই থাকে, তিনি আমাকে সোজাসুজি 'দুশমন' আখ্যায়িত না করে তাঁর মতটা যুক্তিপ্রমাণ-সহ উপস্থাপিত করবেন বলেই আশা করি।

অন্যত্র কোনো-এক প্রবন্ধে আমি বলেছিলাম, সংস্কৃতি দেশের মাটি থেকেই জন্ম নেয়। আমাদেরও সংস্কৃতির ভিত্তিভূমি হবে আমাদের দেশের মাটি। সাহিত্য মানুষের আবেগ ও অনুভূতির প্রকাশ। যে দেশের জলহাওয়া আমাকে প্রাণ জুগিয়েছে, যে মাটির অন্ন আমার দেহের পুষ্টি বিধান করেছে, আমার আবেগ এবং অনুভূতি সেই প্রাণ-রস-সঞ্জাত, তারই রসে রসায়িত। তাই বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষের ভাবাবেগ ও চিন্তাধারা বিভিন্নরকম হয়ে থাকে। নদীমাতৃক দেশের মানুষ এবং মরুভূমির মানুষের দৈহিক গঠন, গায়ের রং, স্বভাব-চরিত্র, চিন্তাভাবনা কোনোটাই একরকম নয়। প্রকৃতিই তার নিগূঢ় পরিচর্যায় এদের পৃথক মানুষ করে গড়ে তোলে। যে আচার-ব্যবহার, চালচলন ও কথাবার্তার মধ্যে দিয়ে তাদের নিজস্ব অঞ্চলের এই পৃথক বৈশিষ্ট্যটি প্রকাশ পায়, তাকেই আমরা বলি বা বলা যায়, সেই বিশেষ মানবগোষ্ঠীর সংস্কৃতি। কাজেই সংস্কৃতি বস্তুটাই স্থানীয়, আঞ্চলিক।

কিন্তু এতদ্‌সত্ত্বেও বিভিন্ন জাতির ও দেশের মানুষের মধ্যে অর্থাৎ সমগ্র মানবজাতির মধ্যে একটি মৌলিক ঐক্য আছে। এই ঐক্য তাদের স্নেহ-মমতা, ভালোবাসা, দয়া-ধর্মে— অর্থাৎ হৃদয়বৃত্তির ক্ষেত্রে। সেখানে সব মানুষ এক। সর্বমানবের মধ্যে এই মূলগত ঐক্য আমরা যে পরিমাণে উপলব্ধি করতে পারব, সেই পরিমাণে পূর্ণ মনুষ্যত্বের পথে অগ্রসর হতে পারব।

কিন্তু মানুষের যে বাহ্য পার্থক্য— যা তাকে দিয়েছে বিভিন্ন চেহারা, তাই মানুষের জগতে সৃষ্টি করেছে রূপের বৈচিত্র্য। বাইরের এই রূপকে বাদ দিলেও আমাদের চলে না। তাই সংস্কৃতির যেমন একটি বিশ্বজনীন রূপ আছে, তেমনই তার একটি স্থানিক এবং কালিক ভিত্তি আছে। এককথায় সংস্কৃতি বৃক্ষের মূল রয়েছে দেশের মাটিতে, এর ডালপালা ছড়িয়ে পড়েছে সমস্ত পৃথিবীর উদার আকাশের আলোহাওয়ায়। সেখান থেকে নব নব ঐশ্বর্য আহরণ করে বর্ধিত হতে এর কোনো বাধা নেই। এমনই পরস্পর আদান-প্রদানের মধ্য দিয়েই গড়ে উঠবে বিশ্বসংস্কৃতি।

আমাদের সাহিত্য এবং সংস্কৃতিও উদ্ভূত হবে আমাদের দেশের মাটি থেকে। বাংলাদেশের লোক, এর জীবন এবং পারিপার্শ্বিকতা নিয়েই গড়ে উঠবে আমাদের সাহিত্য। বাইরে থেকে ধার করে আনা জিনিস প্রাণ-রসের অভাবে দু-চার দিন পরেই শুকিয়ে যেতে বাধ্য— যেমন শুকিয়ে মরে যায় ছাদের টবে-বসানো বিদেশি কলমের চারা। যদি সে আমাদের দেশের মাটির রসকে আত্মস্থ করে নিতে পারে, তবেই সে বাঁচে— নইলে তার মরণ নিশ্চিত।

আমাদের সাহিত্যে তাই দেখতে চাই আমাদের দেশের রূপ। যে সাহিত্যে আমাদের দেশের চাষি, মজুর, মাঝি, গাড়োয়ান, মুচি, মেথর, জমিদার, মহাজনের স্থান নেই, সে আমাদের সাহিত্য নয়। রাজা-বাদশাহ, আমির-ওমরাহ্ ও হুর-পরিদের কেচ্ছা শুনতে আমাদের আপত্তি নেই; কিন্তু রূপকথা শোনার চাইতে বেশি মূল্য তাকে দিতে পারব না। জাতীয় সাহিত্যের সত্যিকার প্রাণের স্পর্শ তাতে পাওয়া যাবে না। আমরা আমাদের সাহিত্যের ভেতর দিয়ে শুনতে চাই আমাদের বাঙালির প্রাণের কথা, শুনতে চাই পূর্ব বাংলার মর্মকথা। যে আনন্দে আমার দেশের চাষি সবুজ ধান রোপে, সোনার ফসল কাটে, যে দুঃখে 'বিদেশি' মাঝি ভেসে যায় ভাটিয়ালি স্রোতে— নদীতে বান ডেকে ঘরবাড়ি, কৃষি ভাসিয়ে নিয়ে গেলে যে অসহ বেদনায় গৃহস্থ তাকিয়ে থাকে— এককথায় যে আনন্দ-বেদনা মর্মরিত, গুঞ্জরিত হয় পূর্ব বাংলার আকাশে-বাতাসে— সে আনন্দ-বেদনার প্রতিধ্বনি শুনতে চাই আমাদের কাব্যে-সাহিত্যে। এখানকার মাঠে মাঠে উদাসী হাওয়ার যে আকুলতা, আর ঘাটে ঘাটে অথই জলের যে করুণ ছলছলানি, তার সুর বেজে উঠুক আমাদের কাব্যে। বাংলার রাখালের বাঁশির মিঠে সরল সুর কেন শুনতে পাইনে আধুনিক কাব্য-গাথায়? একদিন তো আমাদের প্রাণবান লোকসাহিত্য সঞ্জীবিত হয়ে উঠেছিল বাংলার পল্লিসুরের মায়া-স্পর্শে। সে সাহিত্য কেবল গ্রাম্য-সাহিত্যই ছিল না, আজ উৎকর্ষের বিচারে বিশ্বসাহিত্যের দরবারেও তার স্থান হয়েছে। তেমনই খাঁটি বাংলার সাহিত্য সৃষ্টি হোক আবার আমাদের নবীন সাহিত্যিকদের হাত দিয়ে— আমরা এই চাই।

আগে বলেছি, বিশ্বসাহিত্য অর্থাৎ পৃথিবীর অন্যান্য সাহিত্য থেকে আলো-বাতাস আহরণ করব আমরা আমাদের সাহিত্যের পুষ্টির জন্য। দেশ-বিদেশের সাহিত্য থেকে বাংলায় অনুবাদ করে একদিকে যেমন আমাদের সাহিত্যের ভাণ্ডার বৃদ্ধি করা যায়, তেমনই সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্যের দিক-বিদিকের বিচিত্র সম্ভাবনাকে তুলে ধরা হয় আমাদের সাহিত্যিকদের সামনে। এ অনুবাদ সংস্কারমুক্ত মনে, শুধু উৎকর্ষ বা গুণের বিচার করে সব সাহিত্য থেকেই করতে হবে। ধর্মীয় বা প্রাদেশিক দৃষ্টিতে বিচার করে কোনো কোনো সাহিত্যকে

বর্জন করলে আমাদের জ্ঞানকে আবদ্ধ করে রাখা হবে মাত্র। চিনা, মার্কিন, খ্রিস্টানি, বৌদ্ধ, হিন্দুয়ানি কোনোরকম সাহিত্য থেকেই গ্রহণ করতে আপত্তি থাকা উচিত নয়। মনে করুন, আজ যদি বিদ্বেষবশত আমরা কালিদাস কী শেকসপিয়রের সাহিত্যকে বর্জন করি, তবে কি আমরা নিজেদেরই বঞ্চিত করব না?

আমাদের মধ্যে কেউ কেউ অতি উৎসাহের সঙ্গে সাহিত্যে মুসলমানি ভাবধারা এবং মুসলমানি পরিবেশ আমদানি করতে চান। তার জন্য তাঁরা তথাকথিত 'মুসলমানি' শব্দ এবং চিত্র-প্রতীক ব্যবহার করতে চান। মুসলমানি ভাবধারা আনুন ভালো কথা। ইসলামের বৈপ্লবিক ভাবধারা যদি সাহিত্যে সার্থকভাবে রূপায়িত করা যায়, তবে মহৎ সাহিত্য সৃষ্টি হবার কথা। কিন্তু তার সার্থক রূপায়ণ চাই; কতকগুলি বাঁধা বুলি বা গৎ আওড়ালেই তা সাহিত্য হয় না— তা সে বুলি যত উচ্চাঙ্গেরই হোক। আপন হৃদয়ভাব থেকে যা স্বতঃউৎসারিত, কবি-সাহিত্যিকের যে বাণী অন্তরের স্পর্শে সঞ্জীবিত, তাই শুধু সত্যিকার সাহিত্যের রূপ গ্রহণ করতে পারে; আর তেমনই সাহিত্য আপন গৌরবে আপনি প্রতিষ্ঠিত। তাকে ঢাক পিটিয়ে, লেবেল এঁটে প্রচার করতে হয় না। এমনকি তা যদি ধর্মকথা না হয়, কী ধর্মের বিরোধী কথাও হয়, তবু তা সাহিত্য হবে এবং লোকে তাকেই সাদরে গ্রহণ করবে। সাহিত্যে ধর্ম-অধর্মটা মোটেই বড়ো কথা নয়, এর মূল উদ্দেশ্য জীবনের সার্থক রূপায়ণ বা সরস সৃষ্টি। আমাদের অনেককিছুই ধর্মীয় মনোভাবের ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে— তাই সাহিত্যেও ইসলামি ভাব ও আদর্শ খুঁজি, আর-একটু অন্-ইসলামি কিছুর গন্ধ পেলেই অমনি রুখে দাঁড়াই। কিন্তু সাহিত্যের মুখ্য উদ্দেশ্য ধর্মপ্রচার নয়, এর উদ্দেশ্য মূলত আনন্দ-দান— এ কথা আমাদের স্মরণ রাখা উচিত।

তার পর মুসলমানি পরিবেশের কথা। এ কথা যাঁরা বলেন— তাঁরা যা মনে করে থাকেন, তা হচ্ছে— ইরানি বা আরবীয় সমাজের আবেষ্টনী কিংবা দিল্লি, যুক্তপ্রদেশের হালচাল। কিন্তু এসব হালচাল নিতান্তই ওই স্থান বা অঞ্চলের লৌকিক এবং স্থানীয় ব্যাপার; এর মধ্যে মুসলমানিত্ব কিছুই নেই। সেসব অঞ্চলে যারা মুসলমান নয় তারাও ওইসমস্ত হালচাল এবং পরিবেশকে অঙ্গীকার করেছে। আর মুসলমান যদি কেউ না-ও থাকত, তবু তাদের পরিবেশ এবং চালচলন ওইরকমই থাকত। আরব দেশের বা পারস্যের সমাজে যেসব বেশভূষা, হালচাল, কথাবার্তা— এককথায় কালচার দেখা যায়, ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বেও তা অনেকটা এইরকমই ছিল। বিশেষ কিছুই এদিক-ওদিক হয়নি; যেটুকু হয়েছে সে কালের বিবর্তনে। কাজেই এ নিতান্তই সামাজিক বা লৌকিক ব্যাপার— এর মধ্যে ধর্মীয় কিছুই নেই। উর্দুভাষীরা জলকে পানি বলে বলেই জিনিসটা বা শব্দটা ইসলামি হয়ে যায়নি, সেখানকার (আগ্রা, অযোধ্যা প্রভৃতি অঞ্চলের) হিন্দুরাও পানিই বলে থাকে। তেমনই আপা, বুবু, ফুফা, ফুফু, খালা প্রভৃতি শব্দগুলিও মুসলমানি বা ইসলামি নয়। এগুলি ভারতীয় হিন্দু বা রাজপুতানি শব্দ এবং ওই সমুদয় অঞ্চলে হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে সকলেই এই শব্দগুলি ব্যবহার করে থাকে। অথচ আমাদের বাঙালি মুসলমান সমাজে কোনো বিশেষ শ্রেণির প্রভাবের ফলে এগুলিই মুসলমানি 'ডাক' এবং 'বুলি' বলে চলে যাচ্ছে। এটা বাঙালি মুসলমান সমাজের আত্ম-সম্বিতের অভাব এবং এক-রকম ঐতিহাসিক বোকামির ফল। এর ফলে আমাদের (বাঙালি মুসলমানদের) সাহিত্যও নির্দিষ্ট ঘেরাটোপের মধ্যে আবদ্ধ হয়ে পর্দানশিন হয়ে গেছে।

ভবিষ্যতে এ বিষয়ে আমাদের সাহিত্যিকদের মধ্যে যেন কোনো বাড়াবাড়ি না দেখা যায়। ফারসি-উর্দু শব্দের প্রাবল্যে ভাষাকে তারা আড়ষ্ট ও অর্থহীন করে ফেলেন— এটা যেন আমরা চাইনে, তাঁরা আবার মুসলমানি (যেমন ছিল এককালে হিন্দুয়ানি) শুচিতা রক্ষা করতে গিয়ে সমাজ ও সাহিত্যকে বিশ্বপৃথিবীর সঙ্গে সংযোগবিহীন ও গতিশূন্য করে ফেলেন— এটাও পূর্ববঙ্গের সাহিত্যের উন্নতিকামী কেউ চাইতে পারেন না। কেবলই নিজেদের গুটিয়ে নিয়ে আমরা যেন হীনম্মন্যতা এবং প্রতিক্রিয়াশীলতার পরিচয় না দিই। পরন্তু নিজেদের রক্তের সঙ্গে যা ওতপ্রোতভাবে মিশ্রিত, কোনো মিথ্যা অভিমান এবং গোঁড়ামিবশত সেই সংস্কৃতিকে বিসর্জন দিলে আমরা ভয়ানক ভুল করব। নিজের জায়গায় শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে আমরা দ্বিধা ও পক্ষপাতহীন মুক্তমনে পরের কাছ থেকে গ্রহণ করব। অতীতের ধারাবাহী উৎস থেকে যোগশূন্য হয়ে কোনো সংস্কৃতির প্রবাহই জীবন্ত থাকতে পারে না। বাংলা সাহিত্যের দিকপ্লাবী অমৃতনির্ঝর আমাদের গৌরবময় ঐতিহ্য; এর থেকে নবীন প্রাণাবেগ উচ্ছ্রিত হয়ে উঠবে নবতম ধারা— পূর্ববাংলার সাহিত্য। কিন্তু যে উৎস থেকে সে উৎসারিত, তার সঙ্গে যোগ রক্ষা করতেই হবে।

উৎস : *প্রবন্ধ সংগ্রহ।*

সাহিত্যের কথা

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

সাহিত্য যদিও সর্বসাধারণের মধ্যে আন্তরিকতম মিলনের যোগসূত্রস্বরূপ এবং যদিও চারি পাশের মানুষকে বাদ দিয়ে এখানে কোনো সৃষ্টি সার্থক হওয়া দূরে থাক, প্রায় সম্ভবই নয়,— তবুও সাহিত্য-সৃষ্টি লোকালয়ের হাটের ঠিক মাঝখানে এসে দাঁড়িয়ে করবার নয়। কবি-সাহিত্যিক-আর্টিস্টদের মধ্যে এক ধরনের সহজাত নিঃসঙ্গতা থাকে। সার্থক রসসৃষ্টি, সাধারণ দৈনন্দিন-জীবনোত্তীর্ণ বৃহৎ আনন্দলোকের আবাহন,— যার জন্য প্রতি শক্তিশালী কবিমানসেই আত্মপ্রকাশের প্রেরণাময় এক ধরনের অনির্দেশ্য-ভাবাবেগ তার শ্রেষ্ঠ মুহূর্তগুলিতে সঞ্চারিত হয়, এর জন্যে আর্টিস্টের প্রয়োজন আপন 'আইডিয়া'র আবহাওয়ায় যত বেশিক্ষণ সম্ভব এবং যত গভীরতমরূপে সম্ভব বাস করা। দুঃখবেদনা, হাসি-অশ্রু, সমস্যা-বিজড়িত অপরূপ মানুষের জীবন এবং জগৎ তাঁর লেখার মাল-মশলা,— কিন্তু নিরাসক্ত আনন্দে তিনি সৃষ্টি করে চলেন। কবি-সাহিত্যিক আপনার জন্য লেখেন, সে হচ্ছে তাঁর আত্মপ্রকাশ, অস্তিত্বের সেই একমাত্র রূপের মধ্য দিয়ে তিনি আপনাকে উপলব্ধি করেন; কিন্তু একই সঙ্গে তিনি সকলেরই জন্য লেখেন। কারণ তিনি জানেন ভালোবাসার আলোকক্ষেপ ব্যতীত দৃষ্টিতে সত্যকারের বর্ণ ফোটে না, প্রেম ও এক ধরনের নৈর্ব্যক্তিক দৃষ্টি ব্যতীত বাস্তব জগৎ এবং মানব-হৃদয়ের গহনতম রহস্য উদ্‌ঘাটিত হওয়ার নয়। আপনাকে প্রতি মুহূর্তে পূর্ণ করে ও প্রতি মুহূর্তে তিনি আপনাকে অতিক্রম করে যাবেন। চারি পাশের মানব-সমাজ সম্বন্ধে তিনি শুধু চিন্তা করেন এই নয়, এর অন্তরতম হৃদয়-স্পন্দনকে তিনি একান্তভাবে অনুভবের চেষ্টা পান, — তাই তো তিনি তাঁর শ্রেষ্ঠ প্রেরণার ক্ষণে যখন কথা বলেন, তখন তাতে সব দেশ সব কালের বিশ্বমানবের কণ্ঠ বাজে, জীবনের মূলতম রহস্যের আবেগ সেখানে একান্তভাবে সঞ্চারিত হয়। সুতরাং সকলেরই সঙ্গে আপনাকে নিরন্তর যুক্ত রেখে তার সাধনা। তবুও, মনের দিক দিয়ে তাঁর পক্ষে চরম একাকিত্ব একটি প্রকাণ্ড সত্য— অপরিহার্য এবং প্রয়োজনীয়ও। 'রিয়্যালিটি'কে বুঝতে হলে, বা বুঝে তাকে যথাযথ আঁকতে হলে তাতে জড়িয়ে গিয়ে আমরা তা পারি না— কর্মকোলাহলের ঠিক মাঝখানে অথবা লোকলোচনেব অত্যন্ত স্পষ্ট পাদপ্রদীপের সামনে অনুক্ষণ থেকে আমরা তা পারি না।

সাহিত্যের কী মূল্য? ঘন এক টুকরো কবিতা, অনবদ্য একটি ছোটো গল্প, নিবিড় *রেশময়* একটি 'লিরিক', ঠাসবুনোট একখানি উপন্যাস, বিপুলতম যার ব্যঞ্জনা, সেখানে বাস্তব জীবননাট্যের বিচিত্র কলকোলাহল, উত্তেজনা ধ্বনিত হয়েছে,— আমাদের জীবনে এসবের জন্যে বিশেষ স্থান নির্দিষ্ট করে রাখা কি এতই দরকার? উত্তর হচ্ছে, দরকার,— অত্যন্ত বেশি দরকার আরও এইজন্যে যে, এইসব প্রশ্ন এখনও আদৌ ওঠে। তেল-নুন-লকড়ির কারবার করতে করতে আমাদের অনেকেরই দিন আসে মিলিয়ে। বাঁধা রাস্তায় আমরা জন্মাই এবং মরি— দু-পাশের এই দুইরকম পরিচ্ছেদের মাঝখানের রাস্তাটায় আমরা অনেকেই যেভাবে চলি, তাতে যেন আমাদের স্রষ্টাকেই ব্যঙ্গ করা হয়। সাহিত্য তাই আমাদের এই অতিঅভ্যাসে বন্ধ ঝিমিয়ে-আসা মনের পক্ষে আকাশ-স্বরূপ, দিগন্ত এখানে অত্যন্ত বিস্তৃত, আবহাওয়া সর্বদাই উজ্জ্বল, অজস্র খোলা জানলা দিয়ে অদৃশ্য কেন্দ্র থেকে প্রতিক্ষণে দিব্য যৌবনময় আলো আর চেতনা এসে ঝরে ঝরে পড়ে। এখানে জীবন অহরহ আপনাকে অত্যন্ত ঘন সুরে বিকশিত করে। জীবনের এই অতি-বিরাট পটভূমিকার জগতে এসে পাঠক এক মুহূর্তে আপনাকে বড়ো করে যায়। দৈনন্দিন জীবনে পারিপার্শ্বিকতার সহস্র ক্ষুদ্রতা ক্লেদ গ্লানি পিছনে পড়ে থাকে— মানুষ খানিকক্ষণের জন্য অন্তত খণ্ড কাল ও দেশের অতীত এক জ্যোতির্ময় চেতনান্তরের মধ্য দিয়ে অববাহিত হয়ে আসে। প্রত্যেকের আত্মসত্তার এই যে বিস্তারের সম্ভাবনা, কাব্য ও সাহিত্য, তথা আর্টের অন্যান্য বিভাগ, এতে প্রত্যেককে অত্যন্ত প্রত্যক্ষরূপে সহায়তা করে।

সাহিত্য আরও অনেক কিছু করে। প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই কম-বেশি পরিমাণে একটি মানুষ আছে— যে নাকি স্বপ্ন দেখে, যে নাকি অন্তত কোনো কোনো ক্ষণের জন্যেও আদর্শবাদের তীব্র প্রেরণা অনুভব করে, যে অতীত স্মৃতির অনুধ্যানে সহসা উন্মনা হয়, ভবিষ্যতের কল্পনায় নেশার মতন হয় আসক্ত— রসসাহিত্যের একটি প্রধানতম কাজ হচ্ছে প্রত্যেকের ভিতরকার এই স্বপ্নালু লোকটির তৃপ্তিবিধান করা। তা ছাড়া,— কথাসাহিত্যিক সমসাময়িক সমাজ বা রাষ্ট্রনৈতিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে দেশকালান্তরিত জীবনের ছবি আঁকেন। তাতে করে, আমাদের প্রত্যেকের মধ্যে যে মানুষটি তার নিজ যুগের মানুষ আর ঘটনাবলি সম্বন্ধে খুব উৎসুক, তার কৌতূহল মেটে। সাহিত্য আমাদের কল্পনা ও অনুভব-বৃত্তিকে উজ্জীবিত করে। এর মননশীল দিক প্রধানত জীবন-সংগ্রামে ও সভ্যতার সংগঠনে আমাদের শক্তি জোগায়, এবং রসসাহিত্যের সাধনা হচ্ছে অবিচ্ছিন্নভাবে সে আনন্দের রূপীকরণ ও পরিবেশন, যে মূল লীলার আনন্দের প্রেরণায় জীবনের হল উৎপত্তি,— সুখদুঃখ হর্ষবেদনা প্রেমকীর্তি ক্ষয়মৃত্যু সব ব্যেপে এবং ছাড়িয়ে যে নৈর্ব্যক্তিক আনন্দসত্তা জীবনের সঙ্গে সমান্তরালভাবে প্রতিক্ষণে আপনাকে প্রবাহিত করে চলেছেন, একটু একটু করে মেলে ধরছেন। কবি, সাহিত্যিক ও শিল্পী যত কথা বলেন তার মর্ম এই যে, আমাদের ধরণি ভারী সুন্দর— একে বিচিত্র বললেই বা এর কতটুকু বোঝানো হল, আমাদের এই দৃষ্টিটি বারেবারে ঝাপসা হয়ে আসে, প্রকৃতির বাইরেকার কাঠামোটাকে দেখে আমরা বারেবারে তাকে রিয়্যালিটি বলে ভুল করি, জীবন-নদীতে অন্ধ গতানুগতিকতার শেওলাদাম জমে, তখন আর স্রোত চলে না, তাই তো কবিকে, রসস্রষ্টাকে আমাদের বারবার দরকার— শুকনো মিথ্যা-বাস্তবের পাক থেকে আমাদের উদ্ধার করতে।

প্রসঙ্গক্রমে এখানে বলা যেতে পারে যে, সাহিত্য ও শিল্পকে সর্বসাধারণের উপযুক্ত করে দাও— এই একটি আধুনিক ধুয়ার কোনো মানে হয় না। এ কথার অর্থ তো এই যে, শ্রেষ্ঠ

সাহিত্যের রস অত্যন্ত ঘন, একে খানিকটা জোলো করে দাও— এর শিল্পের বুনোনিতে অত সূক্ষ্ম তন্তুর বদলে মোটা দড়ির ব্যবহার প্রচলিত করো। কারণ, তা হলে তখন শিক্ষা ও শক্তি নির্বিশেষে এ সাহিত্য যাবতীয় জনের হয়ে উঠবে, রসের মন্দিরে ভিড়ের আর কমতি থাকবে না। আমাদের বক্তব্য এই যে, এরকম কোনো আদেশের উপর যদি জোর দেওয়া হয় তবে সাহিত্যের সর্বনাশ করা হবে, যাদের দিকে চেয়ে সাহিত্যে এই ভুয়ো গণতন্ত্রের সুর আমদানির জন্য আমরা এ করতে যাব — তাদেরও শেষপর্যন্ত উপকার কিছু হবে না। রসসাহিত্যের উপভোগ-সামর্থ্যের দিক দিয়ে যারা 'হরিজন', সাহিত্যকেও জোর করে 'হরিজন'-মার্কা করে তাদের স্তরে না নামিয়ে উল্টরূপে তথাকথিত 'হরিজন'দের আর্ট ও সংস্কৃতিগত শিক্ষার এমন সুযোগ ও সাহায্য দিতে হবে, যাতে করে তারা মনের দিক দিয়ে ক্রমশ উঠে আসতে পারে, সূক্ষ্মতম রসের স্বাদ-গ্রহণে পারগ হয়। যেমন ধর্মের ক্ষেত্রে, তেমনই এ ক্ষেত্রেও অধিকার মানতে হয়। বাস্তবিকপক্ষেও আমরা দেখতে পাই যে, চিন্তামূলক বা সৌন্দর্যমূলক সত্য, ইন্দ্রিয়জয় অতীন্দ্রিয় রসের আবেদন, অথবা একই শ্রেষ্ঠ কাব্য উপন্যাস বা নাটক, জন্মগত ক্ষমতা তখন অনুশীলনবৃত্তির চর্চাভেদে বিভিন্ন পাঠকের মনে— প্রধানত 'ইনটেনসিটি'র দিক দিয়ে বিভিন্ন রকমের সাড়া জাগায়। সুতরাং আমাদের কর্তব্য হচ্ছে, সাহিত্যের যে একটি স্বাভাবিক আভিজাত্য আছে, এমন কিছু না করা যাতে তা একটুকু ক্ষুণ্ণ হয়, পরন্তু আমাদের সবাইকে তার উপযুক্ত হতে শিক্ষিত করা।

দু-দিন বা দশ দিন পরে কেউ আমার বই পড়বে না, এ ভয় কোনো সত্যিকার কথাসাহিত্যিক করেন না। করেন তাঁরা, যাঁরা একটা মিথ্যা ভবিষ্যতের ধূম্রলোকে নিজেদের চিরপ্রতিষ্ঠ দেখতে গিয়ে বর্তমানের দাবিকে অস্বীকার করেন। কেউ বাঁচেনি, বড়ো বড়ো নামওয়ালা কথাসাহিত্যিক তলিয়ে গিয়েছেন কালের ঘূর্ণিপাকের তলায়— সেই যুগের প্রয়োজন শেষ হয়ে গেলে পরবর্তী যুগের লোকেরা ধুলো ঝেড়ে ছেঁড়া পাতাগুলো উদ্ধার করবার কষ্টও স্বীকার করে না। দু দশ জন সাহিত্যরসিক, দু পাঁচ জন বৈদগ্ধ্যগর্বী মানুষ ছাড়া আজকালকার যুগে *কথাসরিৎসাগর* কে পড়ে, গোটা অখণ্ড *আরব্য উপন্যাস* কে পড়ে, ডন *কুইজোট* কে পড়ে? চসার, দান্তে, মিল্টন এঁদের কথা বাদ দিই— ছাত্র বা অধ্যাপক ছাড়া কেউ এঁদের পাতা ওলটায় না।— সকলে তো কাব্যপ্রিয় নয়— কিন্তু অত বড়ো যে নামজাদা ঔপন্যাসিক বালজাক, তাঁর উপন্যাসরাশির মধ্যে ক-খানা আজকাল লোকে শখ করে পড়ে? স্কট, হেনরি জেম্‌স, থ্যাকারে, ডিকেন্স সম্বন্ধেও অবিকল এই কথা খাটে। ফিলমে না উঠলে অনেকের অনেক উপন্যাস কী নিয়ে লেখা তাই লোকে জানত না। নামটাই থেকে যায় লেখকের, তাঁর রচনা আধমরা অবস্থায় থাকে, অনেক ক্ষেত্রেই মরে ভূত হয়ে যায়।

জানি, এ কথা আমাদের স্বীকার করতে মনে বড়ো বাধে। খোলাখুলিভাবে বললে আমরা এতে ঘোর আপত্তি করি— 'বিশ্ব', 'অমর', 'শাশ্বত' প্রভৃতি বড়ো বড়ো গালভরা কথা জুড়ে জুড়ে দীর্ঘ ছাঁদে সেন্টেন্স্ রচনা করে তার প্রতিবাদ করি। কিন্তু আমরা মনে মনে আসল কথাটি সকলেই জানি।

যে সাহিত্য টবের ফুল— দেশের সত্যিকার মাটিতে শিকড় চালিয়ে যা রসসঞ্চয় করছে না, দেশের লক্ষ লক্ষ মূক নরনারীর আশা-আকাঙ্ক্ষা দুঃখ-বেদনা যাতে বাণী খুঁজে পেলে না, তা হয় রক্তহীন, পাণ্ডুর, থাইসিসের রোগীর মতো জীবনের রসে বঞ্চিত, নয়তো সংসার-বিরাগী, ঊর্ধ্ববাহু, মৌনী যোগীর মতো সাধারণ সাংসারিক জীবনের বাইরে অবস্থিত। মানুষের মনের বা সমাজের চিত্র হিসেবে তা নিতান্তই মূল্যহীন।

পূর্বেই বলেছি, মিথ্যাকে আশ্রয় করেও কথাসাহিত্যিক রস সৃষ্টি করতে পারেন। কিন্তু সে রস হয় মানুষকে ক্ষণকালের জন্য ভুলিয়ে রাখবার সাহিত্য— সমাজের ও জীবনের সত্য চিত্র হিসাবে তার মূল্য কিছু থাকে না।

গভীর রহস্যময় এই মানব-জীবন। এর সকল বাস্তবতাকে এক বহুবিচিত্র সম্ভাব্যতাকে রূপ নেওয়ার ভার নিতে হবে কথাশিল্পীকে। তাকে বাস করতে হবে সেখানে, মানুষের হট্টগোল, কলকোলাহল যেখানে বেশি; মানুষের সঙ্গে মিশতে হবে; তাদের সুখ-দুঃখকে বুঝতে হবে। যে বাড়ির পাশের প্রতিবেশীর সত্যিকার জীবনচিত্র লিখেছে, সে সকল যুগের সকল মানুষের চিত্রই এঁকেছে— চাই কেবল মানুষের প্রতি সহানুভূতি, তাকে বুঝবার ধৈর্য। ফ্লবেয়ার বলেছেন, মানুষে যা-কিছু করে, যা-কিছু ভাবে, সবই সাহিত্যের উপাদান, তাই তাকে লিখতে হবে; শোভনতার খাতিরে তিনি যদি জীবনের কোনো ঘটনাকে বাদ দেন, চরিত্রের কোনো দিক ঢেকে রেখে অঙ্কিত চরিত্রকে মাধুর্যমণ্ডিত বা শ্রেষ্ঠ করবার চেষ্টা করেন— ছবি অসম্পূর্ণ থেকে যাবে।

এমা বোভারি-র স্রষ্টার উপযুক্ত কথা বটে!

কিন্তু এই বাস্তবতার কি একটা সীমা নেই? জীবনের নগ্ন চিত্র— দিগ্‌বসনা ভীমা ভয়ংকরী ভৈরবীর মতো করাল— এস চিত্র মানুষের মনে ভয় সঞ্চার করে, অবসাদ আনে, জুগুপ্সার উদ্রেক করে— সাধারণ রসবিলাসী পাঠকের সাধ্য নয় সে কঠিন নিষ্ঠুর সত্যের সম্মুখীন হওয়া। সূর্যের অনাবৃত তাপ পৃথিবীর মানুষে সহ্য করতে পারে না, তাই বহু মাইলব্যাপী বায়ুমণ্ডলের আবরণের মধ্য দিয়ে তা পরিস্রুত হয়ে, মোলায়েম হয়ে তবে আমাদের গৃহ-অঙ্গনে পতিত হয় বলে রৌদ্র আমাদের উপভোগ্য, প্রাণীকুলের উপজীব্য।

সে আবরণ দেবেন শিল্পী তাঁর রচনায়। নির্বাচনের স্বাধীনতা তিনি ব্যবহার করবেন শিল্পীর সংযম ও দৃষ্টি নিয়ে।

সাহিত্য-সংশ্লিষ্ট আর দুই একটি মাত্র কথা বলে আমি শেষ করব। সাহিত্যে প্রোপাগান্ডার স্থান সম্বন্ধে অনেকে অনেক কথা বলেছেন। আমাদের বক্তব্য এই যে, সমাজ-সংস্কারই হোক, দেশপ্রেমই হোক, অথবা অন্য কোনো সমস্যাদি সম্বন্ধে মতবাদই হোক, সবকিছুই প্রোপাগান্ডা সাহিত্যের মধ্য দিয়ে একটা বিশেষ সীমার ভেতরে থেকে করা যেতে পারে, যদি তা তার পরও সাহিত্যই থাকে, কোনো প্রচারবিভাগের বিশদ চিত্তাকর্ষক প্যাম্ফলেটের মতন না হয়ে ওঠে। সাহিত্য ও আর্টের জাত নষ্ট হয় তখনই, যখন এ অপরতর কোনো উদ্দেশ্য সাধতে গিয়ে আপনার মূল সাধনা— অর্থাৎ সমসাময়িক সমস্যারও অতীত শাশ্বত সৌন্দর্যসৃষ্টির প্রেরণা থেকে বিচ্যুত হয়। মনে রাখতে হবে স্বধর্ম ত্যাগ করা ভয়াবহ— অনেককিছুর মতো এক্ষেত্রেও। তার পর আমরা আনতে পারি— সাহিত্যের সঙ্গে নীতি ও কল্যাণবুদ্ধির সম্পর্কের কথা। সাহিত্যে সুনীতি, দুর্নীতি, শ্লীলতা, অশ্লীলতা ইত্যাদি নিয়ে প্রত্যেক দেশের সাহিত্যের ইতিহাসেই অনেক ঝড় বয়ে গিয়েছে। শ্লীলতা ও অশ্লীলতা সম্বন্ধে আমরা এই বলতে পারি যে, বাইরের পৃথিবী এবং মানুষের জটিল জীবন-কাহিনি তাদের অন্তর্নিহিত রস রূপে তখনই আমাদের অভিভূত করতে পারে, যখন আমরা এদের একই সঙ্গে ইন্দ্রিয়ের মধ্য দিয়ে এবং ইন্দ্রিয়াতীতরূপে আমাদের মানসচেতনায় পাই। এইজন্য আদিরসও যখন মধুর রসে পরিণত হয়, তখন তা হয় আর্ট। কামজ প্রেমের কথা বলতে গিয়েও কবি যখন নিরাসক্ত কুতূহলে অতীন্দ্রিয় ব্যঞ্জনার সৃষ্টি করে চলেন, তখনই তা হয় আর্ট। তখন তা শ্লীলও থাকে না, অশ্লীলও নয়। সংকীর্ণ অর্থে নৈতিকতার মানদণ্ড সাহিত্যের প্রতি প্রয়োগ করা যায় না অবশ্য, কিন্তু যে বৃহৎ কল্যাণ-বুদ্ধি আমাদের সকলের স্রষ্টার মনে তাঁর জগৎসৃষ্টির বেলায় ছিল

বলে আমরা কল্পনা করি, রসস্রষ্টাকে ধ্যাননেত্রে তাকে পেতে চেষ্টা করা প্রয়োজন। কারণ, কী জীবনে, কী সাহিত্যে— শক্তি ও প্রতিভার সঙ্গে প্রেম ও সত্যবুদ্ধি যুক্ত না হলে স্থায়ী কিছুর প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয় না। সমাজের প্রচলিত নীতি-প্রথাকে সাহিত্যিক নির্মম আঘাত করতে পারেন, কিন্তু শুধু সত্যের জন্যই পারেন, ব্যক্তিগত খেয়াল চরিতার্থ করবার জন্য নয়। সাহিত্যিক বাস্তবজগতের প্রতি বিশ্বস্ত থেকে তাঁর চিত্র আঁকবেন। কিন্তু তাঁর অন্তর্দৃষ্টি যথেষ্ট পরিষ্কার হলে তিনি দেখবেন যে বাইরের জগতে যা ঘটে, তার চেয়ে লেখকের মনের জগতে আর-এক মহত্তর ব্যঞ্জনাময় বাস্তব আছে; এবং যদিচ মানুষের জীবনও মোহনী রূপে জটিল, কারণ পাপ দুর্বলতা পদস্খলনের কাহিনি তার পক্ষে অত্যন্ত স্বাভাবিক, তবুও সে যেখানে বড়ো সেখানে তার রূপ কেবল এই-ই নয়। তা ছাড়া, বৃহত্তর অর্থে নীতিবোধ, জীবন-সমাজের মূলসত্তার সঙ্গে জড়িত; সাহিত্য থেকে তাকে কি আমরা বিচ্ছিন্ন করতে পারি।

মাঝে মাঝে একটা কথা শোনা যায় যে, আমাদের মতো পরাধীন দরিদ্র দেশের সংকীর্ণ সমাজের মধ্যে কথাসাহিত্যের উপাদান তেমন মেলে না। 'আমাদের দেশে কী আছে মশাই, যে এ নিয়ে নতুন কিছু লেখা যাবে, সেই থোড় বড়ি খাড়া খাড়া বড়ি থোড়'— এ কথা অনেক বিজ্ঞ পরামর্শদাতার মুখে শোনা যায়।

এই ধরনের উক্তির সত্যকার বিচার করতে বসলে দেখা যায়— এসব কথা মাত্র আংশিকভাবে সত্য। বাংলা দেশের সাহিত্যের উপাদান বাংলার নরনারী, তাদের দুঃখদারিদ্র্যময় জীবন, তাদের আশা-নিরাশা, হাসি-কান্না-পুলক-বহির্জগতের সঙ্গে তাদের রচিত ক্ষুদ্র জগৎগুলির ঘাত-প্রতিঘাত, বাংলার ঋতুচক্র, বাংলার সন্ধ্যা-সকাল, আকাশ-বাতাস, ফলফুল-বাঁশবনের, আমবাগানের নিভৃত ছায়ায় ঝরা সজনে ফুল বিছানো পথের ধারে যেসব জীবন অখ্যাতির আড়ালে আত্মগোপন করে আছে— তাদের কথাই বলতে হবে, তাদের সে গোপন সুখদুঃখকে রূপ দিতে হবে।

প্যারীচাঁদ : আলালের ঘরের দুলাল

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

বাংলা সাহিত্যে প্যারীচাঁদ মিত্র কীর্তিমান পুরুষ। বাঙালির সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রেও এক সময়ে তিনি অসামান্য প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিলেন। হিন্দু কলেজ থেকে কৃতিত্বের সঙ্গে ছাত্রজীবন শেষ করে কলকাতার প্রথম সর্বজনীন পাঠাগার 'দি ক্যালকাটা পাবলিক লাইব্রেরি'র সাব লাইব্রেরিয়ান নিযুক্ত হন। এই লাইব্রেরিই ছিল তাঁর জীবনের মহত্তম সাধনা। প্রধানত তাঁরই অক্লান্ত চেষ্টায় ও অর্থ সংগ্রহে ক্যালকাটা পাবলিক লাইব্রেরির নিজস্ব গৃহ মেটকাফ হল-এর নির্মিতি সম্ভব হয়। অসাধারণ যোগ্যতা এবং নিষ্ঠার ফলে প্যারীচাঁদ ক্রমশ এর লাইব্রেরিয়ান সেক্রেটারি নিযুক্ত হন— সে যুগের কোনো ভারতীয়ের পক্ষে এই সম্মান সুলভ ছিল না। ব্যবসায় ক্ষেত্রে সাফল্যলাভের ফলে পরবর্তী জীবনে প্যারীচাঁদ এই গ্রন্থালয়ের বৈতনিক পদ পরিত্যাগ করেন— কিন্তু তাঁর পরিশ্রম ও নিষ্ঠার কথা স্মরণ করে গ্রন্থাগার-কর্তৃপক্ষ মৃত্যুকাল পর্যন্ত তাঁকে 'ক্যালকাটা পাবলিক লাইব্রেরি'র কিউরেটার এবং কাউন্সিলারের মর্যাদা দিয়েছিলেন।

শুধু এই গ্রন্থাগারই নয়; দেশের প্রায় প্রত্যেকটি জনকল্যাণ সংস্থার সঙ্গেই তিনি ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিলেন। ভারতের স্বাধিকার ও স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রথম অঙ্কুর 'ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন', স্বনামধন্য সাংস্কৃতিক সভা বিটন সোসাইটি (Bethune Society), 'পশুক্লেশ নিবারণীসভা' (C.S.P.C.A.) এবং 'বঙ্গদেশীয় সমাজ বিজ্ঞান সভা'র তিনি বিশিষ্ট কর্মী ছিলেন। এ ছাড়াও তিনি 'ইন্ডিয়ান এগ্রিকালচারাল ও হর্টিকালচারাল সোসাইটি'র সদস্য ছিলেন— ভারতীয় কৃষি সম্পর্কে তিনি মূল্যবান গ্রন্থও রচনা করে গেছেন। উত্তর-জীবনে মাদাম ব্লাভাট্স্কির থিয়োসফিক্যাল সোসাইটির সঙ্গে তিনি যুক্ত হয়ে পড়েছিলেন।

রাধানাথ শিকদারের সঙ্গে তিনি মহিলাদের উপযোগী একটি মাসিকপত্র প্রকাশ করেন— *মাসিক পত্রিকা*। এই পত্রিকার পৃষ্ঠাতেই তাঁর 'আলালের ঘরের দুলাল' আত্মপ্রকাশ করে। এ ছাড়াও তৎকালীন 'ইয়ং বেঙ্গল'দের মুখপত্র *বেঙ্গাল স্পেকটেটর* ও *জ্ঞানান্বেষণ*-এর সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল।

সামাজিক জীবনেও প্যারীচাঁদ যথেষ্ট প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিলেন। মিউনিসিপ্যাল বোর্ডের অনারারি জাস্টিস, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো এবং বেঙ্গল লেজিসলেটিভ কাউন্সিলের সদস্যরূপে তিনি সম্মানিত হয়েছিলেন। এ সম্মান তাঁর প্রাপ্য ছিল।

উনিশ শতকের নবজাগরণে বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবীরূপে প্যারীচাঁদ স্থায়ী প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছেন। তাঁর বিদ্যা ও বুদ্ধিচর্চার আনুকূল্য ঘটেছিল ক্যালকাটা পাবলিক লাইব্রেরির মাধ্যমে। তার ফলে বাংলা সাহিত্যই সবচেয়ে বেশি উপকৃত হয়েছে। বাংলা সামাজিক উপন্যাসের সূচনা করে দিয়েছে তাঁর *আলালের ঘরের দুলাল* তাঁর *রামারঞ্জিকা* এক সময়ে বাঙালির পরিবারে অবশ্যপাঠ্য নীতিগ্রন্থের ভূমিকা গ্রহণ করেছিল; *অভেদীতে* ধর্মসমন্বয়গত ঔদার্যের একটি সুস্থ দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় তিনি রেখেছেন, তাঁর *মদ খাওয়া বড় দায়*— তৎকালীন মদ্যপান নিবারণী আন্দোলনে *সধবার একাদশী* বা *একেই কি বলে সভ্যতা*-র মতো বিশিষ্ট দায়িত্ব বহন করেছিল।

সমাজসেবী সাহিত্যিকরূপে কালীপ্রসন্ন সিংহের পাশাপাশি অন্যতম দীপ্ত ব্যক্তিত্ব প্যারীচাঁদ মিত্র।

২

বাংলা দেশে ইংরেজি শিক্ষা ও সংস্কৃতির বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে বাংলা সাহিত্যে সমাজ-সমালোচনার একটি ধারাও প্রবাহিত হতে থাকে। কালীপ্রসন্ন সিংহের প্রসঙ্গেই আমরা স্মরণ করেছি, এর সূচনা করেন *সমাচার চন্দ্রিকা*-র বিখ্যাত সাংবাদিক ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর *নববাবু বিলাস* এবং *কলিকাতা কমলালয়* সমসাময়িক যুগের তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গাত্মক সমালোচনা। রামমোহন রায়ের পাশ্চাত্য মনোভঙ্গি-নিয়ন্ত্রিত সংস্কার আন্দোলনের বিরুদ্ধ-ভূমিকায় দাঁড়িয়ে ভবানীচরণ সমকালীন নব্যগোষ্ঠীকে অত্যন্ত তীব্রভাবে আক্রমণ করেছিলেন। এই আক্রমণের প্রয়োজনে ভবানীচরণ তাঁর ব্যঙ্গরচনায় কিছু কিছু কাহিনির আশ্রয় নিয়েছিলেন এবং তাদের মধ্যে একটা মোটামুটি যোগসূত্রও ছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও কতকগুলি খণ্ডচিত্রের সহায়তায় সামাজিক বিকৃতি-বিভ্রান্তির উদ্‌ঘাটনই ভবানীচরণের উদ্দেশ্য ছিল, আর সেইজন্যেই তাঁর রচনায় কোনো পূর্ণাঙ্গ কাহিনি গড়ে ওঠেনি। কালীপ্রসন্নের *নকশা* সম্পর্কেও ঠিক একই সিদ্ধান্ত করা চলে।

এই সম্পূর্ণ সামাজিক কাহিনি গঠনের দায়িত্ব গ্রহণ করলেন, '*টেকচাঁদ ঠাকুর*' ছদ্মনামি প্যারীচাঁদ মিত্র তাঁর *আলালের ঘরের দুলাল*-এ। বাংলা সাহিত্যে এই বইটিই সর্বাদি সামাজিক উপন্যাস।

আলাল ও সমাজ-সমালোচনা। কিন্তু ভবানীচরণের সঙ্গে প্যারীচাঁদের দৃষ্টিভঙ্গির মৌলিক পার্থক্য আছে। কালীপ্রসন্ন সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়েই আমরা দেখেছি— ভবানীচরণ ছিলেন রক্ষণশীল দলের প্রবক্তা, আর প্যারীচাঁদ 'ইয়ং বেঙ্গল'দের একজন— রামগোপাল ঘোষ, রসিককৃষ্ণ মল্লিক, রাধানাথ শিকদার এবং দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় ইত্যাদির সমধর্মী।

কিন্তু প্যারীচাঁদকে ঠিক উগ্র 'ইয়ং বেঙ্গল'ও বলা যায় না। ডিরোজিয়োর ছাত্র হয়েও তিনি সম্পূর্ণভাবে যুগের বন্যায় ভেসে যাননি। ব্যবসায়ী জীবনে সাধু ও সতর্কবুদ্ধি প্যারীচাঁদ যে অসামান্য সাফল্যলাভ করেছিলেন, তাঁর ব্যক্তিক্ষেত্রেও আমরা সেই সংযত সতর্কতারই পরিচয় পাই। 'ইয়ং বেঙ্গল'দের প্রগতিশীল দৃষ্টিভঙ্গিকে তিনি গ্রহণ করেছিলেন— তাঁদের উদ্দামতাকে নয়; যে উগ্রতার তাড়নায় রামগোপাল ঘোষের মতো কীর্তিমান পুরুষও অনেকখানি ব্যর্থ হয়ে গিয়েছিলেন, যে অসংযমের ফলে হরিশ মুখোপাধ্যায়ের মতো প্রতিভার ওপরেও অকাল যবনিকা নেমেছিল— প্যারীচাঁদ নিজেকে সন্তর্পণে তা থেকে দূরে সরিয়ে রেখেছিলেন। তাই তাঁর ব্যক্তি ও কর্মজীবন কৃতিত্বে সমুজ্জ্বল।

প্যারীচাঁদের পক্ষে এই আত্মনিয়ন্ত্রণ সম্ভব হয়েছিল প্রধানত ব্রাহ্মসমাজের প্রভাবের ফলে। শিক্ষিত বাঙালি এবং ভট্টপল্লির উত্তর মেরু ও দক্ষিণ মেরুর মধ্যে সেদিন একমাত্র ব্রাহ্মসমাজই সংযোগ-সূত্র রচনা করতে পেরেছিল। আর শুধু সংযোগসূত্রই নয়— সেদিন যদি ব্রাহ্মসমাজ ত্রাণকর্তার ভূমিকায় অবতীর্ণ না হত— তা হলে তৎকালীন শিক্ষিত সাধারণের ভেতরে হিন্দুর অস্তিত্ব রক্ষাই বোধ হয় অসম্ভব হয়ে দাঁড়াত।

ব্রাহ্মসমাজের সংস্কার-প্রচেষ্টা মুখ্যত ছিল দ্বিমুখী। রক্ষণশীল হিন্দুসমাজের অনিবার্য অবক্ষয়কে ঔপনিষদিক ধর্মমতের ঔদার্য দিয়ে পুনর্জীবিত করবার দায়িত্ব সে গ্রহণ করেছিল, তেমনই উগ্র ইংরেজিয়ানা, দেশবিমুখতা এবং সুরাপ্রবণতার বিরুধে অস্ত্র ধারণ করে সে শান্ত, সুস্থ এবং সংস্কারমুক্ত ভারতীয়তা প্রতিষ্ঠা করবার ব্রত নিয়েছিল। নামত বিশুধ হিন্দু হয়েও বিদ্যাসাগরের কর্মপ্রয়াস এই ব্রাহ্ম ভাবধারাতেই প্রাণিত। প্যারীচাঁদের *আলালের ঘরের দুলাল, রামারঞ্জিকা* এবং *অভ্রভেদী*-ও এই ব্রাহ্ম মনোভাবেরই অভিব্যক্তি। তাঁর ব্যক্তিজীবনেও দেখা যায়— দীক্ষিত ব্রাহ্ম না হয়েও উত্তরকালে তিনি প্রচলিত লোকাচরিত হিন্দুধর্ম সম্পর্কে শ্রদ্ধাহীন হয়ে পড়েছিলেন।

ব্রাহ্মসমাজের আদর্শবাদ *আলালের ঘরের দুলাল*-এ সম্পূর্ণভাবে অভিব্যক্ত হয়েছে। সুশিক্ষা, নীতিবোধ, সুরুচি, সেবাধর্ম এবং আধ্যাত্মিকতাই (এই আধ্যাত্মিকতা পূজাপার্বণে নেই, আছে প্রার্থনা ও উপাসনায়) সমগ্র গ্রন্থটির প্রতিপাদ্য। বইটির আদর্শ চরিত্র বরদাবাবুর চিন্তা ও কর্মধারা যেন ব্রাহ্ম সুশিক্ষার দ্বারাই একান্তভাবে গঠিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়েছে— যদিও লেখক সে কথা স্পষ্টভাবে কোথাও উল্লেখ করেননি।

আর ব্রাহ্মিকতার জন্যেই বইটি অত্যন্ত সংযত এবং পরিচ্ছন্ন। কুরুচির চিহ্নমাত্র কোথাও নেই। অত্যন্ত বীভৎস দৃশ্যগুলিকেও তিনি যথাসাধ্য শালীনতা এবং সুরুচির সাহায্যে উপস্থিত করেছেন। তাই *আলাল* প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বিপুল অভিনন্দন লাভ করেছিল। এর মর্মগত সুশিক্ষার বাণী, একটি পূর্ণাঙ্গ সামাজিক আখ্যান, চরিত্রসৃষ্টিতে চমৎকার নৈপুণ্য এবং সাহিত্যে লোকায়ত ভাষার সংযত প্রয়োগ-প্রয়াস— সমস্তকিছু মিলিয়ে *আলাল* অসাধারণ সুযশের অধিকারী হয়েছিল। বঙ্কিমচন্দ্র হুতোমকে সহ্য করেননি, কিন্তু প্যারীচাঁদকে সংবর্ধনা জানিয়ে বলেছিলেন :

> তিনিই প্রথম দেখাইলেন যে, সাহিত্যের প্রকৃত উপাদান আমাদের ঘরেই আছে— তাহার জন্য ইংরাজি বা সংস্কৃতের কাছে ভিক্ষা চাহিতে হয় না। তিনিই প্রথম দেখাইলেন যে, যেমন জীবনে, তেমনই সাহিত্যে, ঘরের সামগ্রী যত সুন্দর, পরের সামগ্রী তত সুন্দর বোধ হয় না। তিনিই প্রথম দেখাইলেন যে, যদি সাহিত্যের দ্বারা বাংলা দেশকে উন্নত করিতে হয়, তবে বাংলা দেশের কথা লইয়াই সাহিত্য গড়িতে হইবে। প্রকৃতপক্ষে আমাদের জাতীয় সাহিত্যের আদি 'আলালের ঘরের দুলাল'।

এর চাইতে আর বড়ো কথা *আলাল* সম্পর্কে বলা সম্ভব নয়। সংস্কৃতগন্ধী এবং লোক-ব্যবহার্য, উভয়বিধ ভাষার মিশ্রণেই আদর্শ বাংলা ভাষার সৃষ্টি হবে— *আলাল*-এর মধ্য দিয়ে বঙ্কিম সে সম্ভাবনাও দেখতে পেয়েছিলেন। প্যারীচাঁদের ভাষা সম্পর্কে তাই তিনি বলেছিলেন :

> এই উভয় জাতীয় ভাষার উপযুক্ত সমাবেশ দ্বারা এবং বিষয়-ভেদে একের প্রবণতা ও অপরের অল্পতা দ্বারা, আদর্শ বাংলা গদ্যে উপস্থিত হওয়া যায়। প্যারীচাঁদ মিত্র, আদর্শ বাংলা গদ্যের সৃষ্টিকর্তা নহেন, কিন্তু বাংলা গদ্য যে উন্নতির পথে যাইতেছে, প্যারীচাঁদ মিত্র তাহার প্রধান ও প্রথম কারণ। ইহাই তাঁহার অক্ষয় কীর্তি।

এই কীর্তি যথাযোগ্য স্বীকৃতিই লাভ করেছিল। কেবল বাঙালিই যে বইটিকে মর্যাদা দিয়েছিল তা নয়— এর দুটি ইংরেজি অনুবাদও প্রকাশিত হয়েছিল এবং বিদেশিরা এর ভাষা ও বক্তব্যকে সাধুবাদ জ্ঞাপন করেছিলেন।

৩

নীতিহীন ধনী পরিবারের আদরের সন্তান কীভাবে কুশিক্ষা এবং প্রশ্রয়ের ফলে চূড়ান্ত অধঃপাতে যায়, গল্পের নায়ক মতিলাল তার নিখুঁত নিদর্শন; আবার অন্যদিকে সৎপ্রভাব এবং উপযুক্ত শিক্ষায় আর-একজন কেমন করে সার্থক মনুষ্যত্ব অর্জন করে, বরদাবাবু প্রভাবিত মতিলালের অনুজাত রামলাল তার প্রতীক। অসংখ্য বিচিত্র চরিত্র এবং ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতে এই বক্তব্যটিই *আলাল*-এ উপস্থিত করা হয়েছে।

কিন্তু *আলাল*-এর বৈশিষ্ট্য তার আদর্শবাদের মধ্যে নিহিত নেই, নীতিশিক্ষার দীপ্তিতেই *আলাল* মহিমান্বিত নয়। তা যদি হত, তা হলে ভার্নাকুলার লিটারেচার কমিটি প্রকাশিত স্কুল বুক সোসাইটির ছাপমারা নারীশিক্ষামূলক *সুশীলার উপাখ্যান*ও অমরত্ব লাভ করত। *সুশীলার উপাখ্যান* আজ বিস্মৃত— কিন্তু *আলাল* স্ব-গৌরবে ভাস্বর। এই গৌরবের উৎস কোথায়?

বস্তুত, বরদাবাবুর মতো মূর্তিমান নীতিপাঠ, বেণীবাবুর মতো সজ্জন অথবা আদর্শ যুবক রামলাল— এরা কেউই *আলাল*-এর মূল আকর্ষণ নয়। এদের মধ্যে সুশিক্ষা থাকতে পারে— কিন্তু উপন্যাসের যা প্রধানতম উপকরণ— জীবনের স্পর্শস্বাদ, তা এই চরিত্রগুলিতে কোথাও নেই। *আলালে*-এর অবিস্মরণীয় সাফল্য এনে দিয়েছে মতিলাল স্বয়ং এবং তার সাঙ্গোপাঙ্গ হলধর, গদাধর ইত্যাদি, ধড়িবাজ মুতসুদ্দি বাঞ্ছারাম, শিক্ষক বক্রেশ্বরবাবু ও সর্বোপরি একটি অপরূপ সৃষ্টি— ঠকচাচা। ছোটো ছোটো চরিত্রগুলিও সামান্য সামান্য ইঙ্গিতের সাহায্যে চমৎকার পরিস্ফুট হয়েছে। দীনবন্ধু মিত্রের সঙ্গে প্যারীচাঁদের সাদৃশ্য এইখানে লক্ষ করবার মতো। মহৎ, সৎ বা উন্নত আদর্শবাদী চরিত্রসৃষ্টিতে দু-জনেই যান্ত্রিক ও অসফল; কিন্তু যেখানেই ছোটো ছোটো টাইপ চরিত্রের প্রকাশ— সেখানেই দু-জনের প্রতিভার পূর্ণ বিকাশ ঘটেছে। দীনবন্ধুর তোরাপের পাশাপাশি প্যারীচাঁদের ঠকচাচা অক্ষয় খ্যাতি লাভ করেছে।

সমাজের সর্বস্তরের মানুষ সম্পর্কেই প্যারীচাঁদের তীক্ষ্ণ ও বাস্তব অভিজ্ঞতা ছিল। প্রেমনারায়ণ মজুমদার, কবিরাজ ব্রজনাথ রায়, গুরুমশাই, মউলবি, উৎকলীয় পণ্ডিত, এমনকি আদালতের ঘুষখোর পেশকার পর্যন্ত প্রত্যেকেই সেই অভিজ্ঞতার আলোকে উদ্ভাসিত হয়েছে। প্যারীচাঁদের সংযত পরিহাস-প্রবণতায় এদের রূপ আরও বেশি উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। দু-কথায় স্বার্থপর ভণ্ডশিক্ষক বক্রেশ্বরের পরিচায়িকাটি উদ্ধৃতিযোগ্য :

> তিনি যাবতীয় বড় মানুষের বাটিতে যাইতেন ও সকলকেই বলিতেন— আপনার ছেলের আমি সর্বদা তদারক করিয়া থাকি— মহাশয়ের ছেলে না হবে কেন? সে তো ছেলে নয় পরশ পাথর। স্কুলে উপর উপর ক্লাসের ছেলেমেয়েদিগকে পড়াইবার ভার ছিল, কিন্তু যাহা পড়াইতেন তাহা নিজে বুঝিতে পারিতেন কিনা সন্দেহ। একথা প্রকাশ হইলে ঘোর অপমান হইবে, এজন্য চেপে চুপে রাখিতেন। বালকদিগকে কেবল মথন পড়াইতেন। মানে জিজ্ঞাসা করিলে বলিতেন— ডিকসনেরি দেখ। ছেলেরা যাহা কিছু তরজমা করিত, তাহার কিছু না কিছু কাটাকুটি করিতে হয়, সব বজায় রাখিলে মাস্টারগিরি চলে না, কার্য শব্দ কাটিয়া কর্ম লিখিতেন।

চরিত্র হিসেবে প্যারীচাঁদের 'ঠকচাচা' তুলনারহিত। মামলাবাজ, কূটবুদ্ধি এবং বাবুরামের রন্ধ্রগত শনি, এই ব্যক্তিত্বটি সমগ্র বাংলা সাহিত্যেই অদ্বিতীয়। ঠকচাচার ফারসিমেশানো সংলাপ যেমন অনবদ্য,

তার জীবন-দর্শনও তেমনই সহজিয়া : 'দুনিয়াদারি করতে গেলে ভালাবুরা দুই চাই— দুনিয়া সাচ্চা নয়—মুই একা সাচ্চা হয়ে কি করবো?'

তখনকার দিনের সাধারণ মানুষের ওপর যে দুর্নীতির উৎপীড়ন চলেছিল— সমাজ-সচেতন প্যারীচাঁদ তা-ও নানাভাবে উদ্‌ঘাটন করে দেখিয়েছেন। অত্যন্ত সংক্ষেপে তিনি নীলকরদের অত্যাচারের একটি নিপুণ চিত্র অঙ্কন করেছেন। আদালতে বিচারের নামে যে কী মর্মঘাতী প্রহসন চলত এবং তথাকথিত ইংরেজ ম্যাজিস্ট্রেট কীভাবে মামলার নিষ্পত্তি করতেন— তার ছবি এইরকম :

> সাহেব শিস দিতে দিতে বেঞ্চের উপর বসিলেন— হুক্কাবরদার আলবলা আনিয়া দিল— তিনি মেজের উপর দুই পা তুলিয়া চৌকিতে শুইয়া পড়িয়া আলবলা টানিতেছেন ও লেবেণ্ডর ওয়াটার মাখান হাত রুমাল বাহির করিয়া মুখ পুছিতেছেন।

সেরেস্তাদার গানের সুরে তাঁর কানের কাছে মামলার বিবরণ পড়ছে আর হাকিম :

> খবরের কাগজ দেখিতেছেন ও আপনার দরকারী চিঠিও লিখিতেছেন, এক একটা মিছিল পড়া হইলেই জিজ্ঞাসা করেন— ওয়েল কেয়া হোয়া? সেরেস্তাদারের যেমন ইচ্ছা তেমনি করিয়া বুঝান ও সেরেস্তাদারের যে রায় সাহেবেরও সেই রায়।

৪

একান্তভাবে বাঙালির সমাজ ও জাতীয় জীবনের ভিত্তিতে উপন্যাস রচনার প্রচেষ্টাই প্যারীচাঁদের কৃতিত্ব। এই কৃতিত্বের জন্য তাঁর ভাষার স্বাতন্ত্র সবিশেষ মর্যাদার অধিকারী। *আলালে*-এর গদ্যের ভিত্তি সাধুভাষা। কিন্তু এই সাধুভাষায় পণ্ডিতি সংস্কৃতিয়ানার উপদ্রব নেই; সরল ও সর্বজনবোধ্য শব্দ নির্বাচনে তাঁর সজাগ দৃষ্টি ছিল। অপরদিকে, কালীপ্রসন্নের বেপরোয়া দুঃসাহসও তাঁর ছিল না, তিনি মধ্যপন্থী এবং সাবধানী। বঙ্কিমচন্দ্র তাই বলেছেন, "আলালেই, আমরা আদর্শ বাংলা উপন্যাসের ভাষার সর্বপ্রথম সন্ধান পাই।"

প্যারীচাঁদ তাঁর উপন্যাসের চরিত্রগুলির মুখে যেসমস্ত সংলাপ বসিয়েছেন— তা তাঁর অপূর্ব রসজ্ঞান ও বাস্তবতাবোধের পরিচয় বহন করে। বাবুরামের শ্রাদ্ধে নৈয়ায়িক পণ্ডিতের তর্কবিতর্ক তার অতি উপাদেয় উদাহরণ।

বাবুরামের খানসামা হরি বলছে : 'মোশায়ের যেমন কাণ্ড। ভাত খেতে বস্তেছিনু— ডাকাডাকিতে ভাত ফেলে রেখে এস্তেচি।' ঠকচাচার ভাষা আরও অপরূপ : 'মুই চুপ করে থাকবার আদমি নয়— দোশমন পেলে তেনাকে চেপ্টে কেমড়ে মেটিতে পেটিয়ে দি— সৌদাগরি কাম পেলে মুই রোস্তম জালের মাফিক চলব।'

অসংখ্য প্রবাদবাক্যের উপযুক্ত প্রয়োগে *আলালে*-এর ভাষা আরও জীবন্ত হয়ে উঠেছে। তৎকাল-প্রচলিত বাংলা প্রবাদের একটি মূল্যবান সংকলন বলা যেতে পারে এই বইখানিকে।

প্যারীচাঁদ মিত্র বিশুদ্ধ রসসাহিত্য রচনা করেননি— নীতি-প্রচারই তাঁর লক্ষ্য ছিল। কিন্তু তাঁর জীবনরসিকতা তাঁর নীতিজ্ঞানকে বারেবারে ছাপিয়ে উঠেছে। ছোটো ছোটো চরিত্র ও খণ্ড খণ্ড ঘটনা সাহিত্যিকের বঙ্কিম দৃষ্টিসম্পাতে ও কৌতুকের ছোঁওয়ায় রসনিষ্পত্তি লাভ করেছে।

'টাইপ'-চরিত্রের রচনায় প্যারীচাঁদের অসামান্য দক্ষতা। মতিলালের বিবিধ অভিযানে, বাঞ্ছারাম ও ঠকচাচার কূট চক্রান্তে, বাবুরামের নির্বুদ্ধিতায়, বটলরসাহেব ও জানসাহেবের কাহিনিতে, আদালতের বিবরণে এবং এমনকি সোনাগাজির গুরুমশায়ের পাঠশালা বর্ণনায়— সর্বত্রই 'টাইপ' রচনার অপূর্ব কৌশল সার্থকভাবে প্রকটিত। প্যারীচাঁদের *আলাল*-এই *হুতোম*-এর চিত্রশালার প্রথম দ্বারোদ্‌ঘাটন হয়েছে।

আলালের ঘরের দুলাল-এ গভীরতা নেই—অন্তর্জগতের গহনগূঢ় বার্তাও অনুপস্থিত। কিন্তু সে অভাব পূরণ করা হয়েছে বৈচিত্রে, ঘটনার বহুলতায় ও সামাজের বহুবিধ মানুষের অসংখ্য রেখাচিত্রে। প্রথম বাংলা সামাজিক উপন্যাসের পক্ষে এ সাফল্য সামান্য নয়। সে যুগের ইংরেজি উপন্যাসেও অন্তর্মুখীনতা কোথাও ছিল না।

প্যারীচাঁদের *রামারঞ্জিকা*, *অভেদী* কিংবা *মদ খাওয়া বড় দায় জাত থাকার কি উপায়* অত্যন্ত স্পষ্টভাবেই প্রচারধর্মী। ব্রাহ্মসমাজের আদর্শবাদ ঘোষণা করে এবং যুগের প্রয়োজন মিটিয়ে এরা এখন ঐতিহাসিক পঙ্ক্তিতেই একান্তভাবে আশ্রিত। কিন্তু প্রচারমূলকতা সত্ত্বেও জীবনরসের কিঞ্চিৎ অভিসেচনে *আলালের ঘরের দুলাল* কালজয়িতা অর্জন করেছে। আমাদের সাহিত্য ও সংস্কৃতির প্রতি আমরা যত বেশি অনুরক্ত হয়ে উঠব, সেই পরিমাণেই *আলালে*-এর মূল্যও দিনের পর দিন ক্রমবর্ধিত হয়ে চলবে।

সাহিত্যে ব্যঙ্গ

পরিমল গোস্বামী

সাহিত্যে ব্যঙ্গ কথাটা আধুনিক কালে যে বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত হয়, তার সূত্রপাত ইংরেজি সাহিত্যের মতো বাংলা সাহিত্যেও প্রথমে কবিতা ও প্রহসন-জাতীয় অভিনয়ের মাধ্যমে ঘটে।

আমাদের দেশে কবিতায়, আধুনিক অর্থে ব্যঙ্গ রচিত হয়নি, কিন্তু তার সমস্ত লক্ষণ দেখা দিয়েছে আজ থেকে পাঁচশো বছর আগেই। কৃত্তিবাসি *রামায়ণ-এ* এর উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত মেলে। অঙ্গদ রাবণের কাছে দৌত্য-কার্যে গিয়েছিলেন। সেসময় রাবণ তাঁকে বিভ্রান্ত করার উদ্দেশ্যে সভার যাবতীয় লোককে মায়াপ্রভাবে রাবণাকৃতি করে দিলেন। একমাত্র ইন্দ্রজিতের রূপান্তর ঘটালেন না, কেননা পুত্র হয়ে পিতার মূর্তি ধরা পাপ। অঙ্গদ তাঁকে দেখেই রাবণ-পুত্র বলে চিনতে পারলেন এবং অতগুলো রাবণের মধ্যে আসল রাবণ কে জানবার উদ্দেশ্যে এক কৌশল অবলম্বন করলেন:

অঙ্গদ বলে সত্য করে কওরে ইন্দ্রজিতা।
এই যত সব বসি আছেন সব কি তোর পিতা।।
কোন্ বাপ তোর দিগ্‌বিজয় কৈল তিন লোকে।
কোন্ বাপ তোর—ইত্যাদি ইত্যাদি।

তারপর অনুরূপ বহু প্রশ্নের পর বললেন :

একে একে কইলাম তোর সব বাপের কথা।
সবারে কাজ নাই তোর যোগী বাপটি কোথা।।

বাপ তুলে এমন অসুবিধাজনক কথা বললে কোন্ পুত্র না লজ্জা পাবে? তাই পুত্রের এই দুরবস্থা দেখে রাবণ মায়া ভঙ্গ করে আদি ও অকৃত্রিম রাবণ রূপে অঙ্গদের সঙ্গে তর্ক করতে লাগলেন। তিনি অঙ্গদকে চ্যালেঞ্জ করলেন, তুই কে? সব বল তোকে মারব না, ভয় নেই। তখন অঙ্গদ বলছেন—'তুই কোন্ ঠাকুরের পো, তোরে ভয় কী?' ইত্যাদি ইত্যাদি।

হালকা ব্যঙ্গকৌতুকের আরম্ভ এটি।

এই পাঁচশো বছরের বাংলা সাহিত্যে আমরা হাস্যকৌতুকের (ব্যঙ্গসাহিত্যের নয়) কয়েকটি বিশেষ রূপের পরিচয় পাই। বাংলার সর্বত্র কত পল্লি ছড়ায়, গানে, কাহিনিতে কতকাল ধরে কৌতুক রসের প্রচলন আছে তা আমাদের ঠিকমতো জানবার উপায় নেই। করুণ রসের সঙ্গে এইসব কৌতুকরস পাশাপাশি রচিত হয়েছে এবং প্রচারিত হয়েছে মুখে মুখে।

মঙ্গলকাব্যের যুগও পঞ্চদশ শতাব্দী থেকে শুরু। এর বিস্তার চলেছে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত। এই যুগের কাব্যগুলিতে গ্রাম্য ছড়ার যুগের মৃদু কৌতুক ও অনুবাদ যুগের অনাবিল হাস্যরস থেকে শুরু করে বুদ্ধিবৃত্ত কৌতুকহাস্য শেষপর্যন্ত কোনো কোনো ক্ষেত্রে রুচিহীনতার ধাপে গিয়ে পৌঁছেছে। মঙ্গলকাব্যসমূহে হাস্যরসের বিশেষ সন্ধান মেলে। এ সময়ের অনেক কাব্যেই নারীদের মুখে তাদের পতিনিন্দা বিশেষ কৌতুককর। মালদহের গম্ভীরা গানে ব্যঙ্গকৌতুক প্রায় সর্বত্র। শিব-বন্দনার একটি গানে দেখা যায় মালদহের ধানের ফলন দেখে বুড়ো শিব কৈলাস থেকে মালদহ এসেছেন ধান লুট করতে। তাঁকে ধনীদের ঘরে যেতে বলা হয়েছে :

যারা চাকরি বাকরি কর‍্যা
ব্যারায় দ্যাশ বিদেশে ঘুর‍্যা
তারখে ধরগা না তুই ত্যারা।
তোকে খাওয়াবে প্যাট ভোর‍্যা
তারা ম্যালাই ট্যাকা উর‍্যাছে।

ষোড়শ শতাব্দীতে রচিত কবিকঙ্কণ চণ্ডী বহুস্থানে স্নিগ্ধ হাস্যরসে উদ্ভাসিত। সিংহলের কয়েকটি দৃশ্যে, সপত্নীদের কলহে, ভাঁড়ু দত্তের কাহিনিতে। তা ভিন্ন কালকেতুর সঙ্গে পশুদের যুদ্ধ, পশুদের রোদন ইত্যাদিতে করুণতার সঙ্গে কৌতুকরস মিশিয়ে আছে। ভালুকের আবেদন:

বনে থাকি বনে খাই জাতিতে ভালুক
নেউগী চৌধুরী নই না করি তালুক।

এইজাতীয় হাস্যরস সর্বত্র। মাধবাচার্যের চণ্ডীতে ভাঁড়ু দত্ত-কাহিনি বেশ মজার।

এর পর এসেছেন ভারতচন্দ্র। বুদ্ধিবৃত্তি বেশি, হৃদয়বৃত্তি কম। অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে রচিত সহদেব চক্রবর্তীর মঙ্গলকাব্যে:

শিল নোড়াতে কোন্দল বাধিল
সরিষা ধরাধরি করে
চালের কুমড়া গড়ায়ে পড়িল
পুঁই শাক হাসিয়া মরে।

ইত্যাদি রূপ কৌতুক। এর পর এল এক বিস্ময়কর যুগ—কবিগানের যুগ। রাম বসু, হরু ঠাকুর, গোঁজলা গুঁই, ভোলা ময়রা, অ্যান্টুনি সাহেব ইত্যাদি। অসাধারণ রচনাপটুত্ব, কিন্তু অধিকাংশই কিছু নিম্ন রুচি এবং সেজন্য জনউপভোগ্য। এঁরা নিঃসন্দেহে পরবর্তী ব্যঙ্গ-যুগের পথকে প্রশস্ত করে গেছেন।

বাংলা সাহিত্যে নির্মল হাস্যকৌতুকের প্রথম আবির্ভাব ঘটেছে ইংরেজি শিক্ষা বিস্তারের পরে। পৃথক ব্যঙ্গ বা কৌতুক-সাহিত্য তার আগে রচিত হয়নি। কিন্তু ইংরেজি প্রভাবের পূর্ব মুহূর্তে ঈশ্বর গুপ্তের আবির্ভাব বিশেষভাবে স্মরণীয়।

এইবার আধুনিক ব্যঙ্গসাহিত্যের কথায় আসা যাক।

এ কথা সর্বজনস্বীকৃত যে ব্যঙ্গের মূল উদ্দেশ্য সংস্কারসাধন। সমাজে সংস্কারকের বহু রূপ। তারই একটি রূপ হচ্ছে ব্যঙ্গ স্রষ্টার।

যেসব লেখক আপন কালে ও পরিবেশে নিজেদের কোনোমতে খাপ খাওয়াতে পারেন না, যাঁরা চিন্তার দিক দিয়ে অনেক এগিয়ে আছেন বলে সমসাময়িক কালের হাতে অনেক সময় লাঞ্ছিত হন, তাঁদের মধ্য থেকেই ব্যঙ্গ রচয়িতার উদ্ভব হয়ে থাকে। তাঁরা সত্যের অগ্রিম দ্রষ্টাদের দলে। তাঁরা তাঁদের দেখা নানা অসংগতিকে হাস্যকর রূপে ফুটিয়ে তুলে সবার দৃষ্টি সেদিকে আকর্ষণ করার চেষ্টা করেন। সমাজ যেখানে আপন অসংগতির জালে জড়িয়ে এগোতে পারছে না, আপন জালে মুগ্ধ হয়ে আবিষ্ট হয়ে এগিয়ে যাওয়ার প্রয়োজনই বোধ করছে না, সেখানে তাঁরা সেই জালটাকে ব্যঙ্গের আঘাতে ছিঁড়ে দেওয়ার চেষ্টা করেন।

সংস্কারকের বহু রূপ আগেই বলেছি। এঁরা সবাই, বর্তমানের 'যা আছে সব ঠিক আছে' না মেনে, এগিয়ে যেতে চান। তাঁরা কেউ ধর্ম-সংস্কারক রূপে, কেউ সমাজ-সংস্কারক রূপে, কেউ বৈজ্ঞানিক সত্য-প্রচারক রূপে, কেউ চিত্রশিল্পী রূপে অথবা সাহিত্য-স্রষ্টা রূপে দেখা দেন। এই শেষোক্তদের একটি দল ব্যঙ্গসাহিত্যকেই তাঁদের উদ্দেশ্য-সাধনে সবচেয়ে উপযুক্ত মনে করেন। এই উদ্দেশ্য কখনও খুবই সংকীর্ণ হয়। যেমন হয় ব্যক্তিগত উদ্দেশ্যসাধনে ব্যঙ্গের প্রয়োগ করলে। কিন্তু তা উচ্চ সাহিত্য হয় না। কিংবা উচ্চ সাহিত্যের ক্ষেত্রে তা অন্ত্যজ হয়ে থাকে। উদ্দেশ্য ব্যক্তিকে ছেড়ে সমাজের বা অন্য কোনো ব্যাপক অসংগতির বিরুদ্ধে প্রযুক্ত হলে তার উচ্চ ব্যঙ্গ এবং উচ্চ সাহিত্য হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে। অবশ্য ব্যঙ্গসাহিত্য সব সময়েই তার নিজস্ব উচ্চতার দ্বারা সীমায়িত এবং তা সৃষ্টিধর্মী সাহিত্যের উচ্চতায় কদাচিৎ ওঠে।

সংস্কারকের ভূমিকায় যিনি নামেন, তিনি যে-কোনো বিভাগেরই অন্তর্ভুক্ত হতে পারেন, যদিও সবাই ব্যঙ্গস্রষ্টা হন না।

ত্রয়োদশ শতকের দার্শনিক ও বিজ্ঞানী রোজার বেকনের কথাই ধরা যাক। তিনি সেই যুগের গোঁড়ামির অন্ধকারে একটু একটু জ্ঞানের আলো আনতে গিয়ে কারাগার বরণ করেছিলেন একাধিক বার। এ ইতিহাস পরে আরও অনেকের ক্ষেত্রেই পুনরাবৃত্ত হয়েছে। রোজার বেকনের কথা থেকে জানা যায়—তাঁর সময়ের কোনো লেখকই সমসাময়িক কালকে পছন্দ করতে পারেননি। আজ থেকে সাতশো বছর আগের যুগের এক জন চিন্তাশীল ব্যক্তির কথা এটি। বলা বাহুল্য সমসাময়িক কালে অতৃপ্ত রোজার বেকনের ব্যঙ্গ রচয়িতা হওয়ার সম্ভাবনা ছিল, কেননা তার উপযুক্ত মনোভাব তাঁর ছিল।

এর দুই শতাব্দী পরে বাংলা দেশের বিশ্বম্ভর মিশ্র প্রথম বয়সে ব্যঙ্গসাহিত্য রচনায় খ্যাতিলাভের সম্ভাবনা দেখিয়েছিলেন তাঁর পাণ্ডিত্যে এবং মতিগতিতে। তাঁর পাণ্ডিত্য প্রবাদবাক্যে পরিণত হয়েছিল সেসময়। সূক্ষ্ম বুদ্ধিবৃত্তিসম্পন্ন পণ্ডিত অথচ সংস্কারকমনা

ব্যক্তি মাত্রেরই স্যাটায়ারিস্ট হবার সম্ভাবনা থাকে। বিশ্বম্ভর মিশ্রেরও ছিল। কিন্তু তিনি পরে সন্ন্যাস গ্রহণ করে সংস্কারের উদার পথ বেছে নিয়েছিলেন এবং এই পথে তিনি বড়ো সাফল্য লাভ করেছিলেন চৈতন্যদেব নামে।

কিন্তু মূল উদ্দেশ্য, অগেই বলেছি, সবার ক্ষেত্রেই এক অর্থাৎ আপন পরিবেশকে বদলে দেওয়ার চেষ্টা। সাহিত্যের ক্ষেত্রে ব্যঙ্গেরও আবার নানা ভাগ আছে। আমি উদ্দেশ্যগত ভাগের কথা আগে আলোচনা করছি। ব্যঙ্গের আক্রমণ সব সময়ে যে গোঁড়ামির বিরুদ্ধেই হয় তা নয়। গোঁড়া মনোভাবাপন্ন ব্যক্তিরা অনেক সময় বৃহত্তর সত্যকে মেনে নিতে না পেরে, সংস্কার কাজের বিরুদ্ধে ব্যঙ্গ বর্ষণ করতে থাকেন। এঁদেরই সংখ্যা সব কালে সব দেশে বেশি। আমাদের দেশে রবীন্দ্রনাথ ব্যঙ্গ রচনা করেছেন অরসিকদের বিরুদ্ধে, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে ব্যঙ্গ বর্ষণকারীদের সংখ্যা অনেক। তাঁর 'ছন্দ-জ্ঞানহীনতা'র বিরুদ্ধে, তাঁর কল্পনাশক্তির 'ত্রুটি'র বিরুদ্ধে, তাঁর 'দুর্নীতি'র বিরুদ্ধে, এবং তাঁর 'দেশদ্রোহিতা'র বিরুদ্ধে নিয়মিত আক্রমণ হয়েছে ১৯৩০-৩২ পর্যন্ত। দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ও রবীন্দ্র-বিরোধীদের দলে যোগ দিয়েছিলেন, যদিও রবীন্দ্রনাথই তাঁকে প্রথম সাহিত্যক্ষেত্রে বড়ো স্বীকৃতি দেন তাঁর কাব্যের সমালোচনা লিখে। রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে প্রবল বিদ্রুপ সম্ভবত তাঁর *ঘরে-বাইরে*-তে সন্দীপের মুখে সীতার অপমানকর উক্তি বসানো উপলক্ষে। সাময়িকভাবে শরৎচন্দ্রও রবীন্দ্র-বিরোধী দলে ভরতি হয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথের 'ছন্দ-জ্ঞানহীনতা'র বিরুদ্ধে যাঁরা লেখনী ধারণ করেছিলেন, প্রথম যুগে কবির পক্ষ নিয়ে তাঁদের বিরুদ্ধে যাঁরা লড়াই করেন, মদীয় পিতৃদেব বিহারীলাল গোস্বামী তাঁদের অন্যতম। পরে সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত প্রতিপক্ষকে চরম আক্রমণ করেন এক কবিতার সাহায্যে।

এইভাবে, ইংল্যান্ডের সাহিত্যজগতে সুইফট ড্রাইডেন পোপের যুগে রোমে পরস্পর ব্যক্তিগত ব্যঙ্গবর্ষণ আরম্ভ হয়েছিল, আমাদের দেশেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। ইউরোপে অষ্টাদশ শতকে ভোলতেয়রই সম্ভবত সবচেয়ে বেশি দুঃখ ভোগ করেছেন ব্যঙ্গ রচনার জন্য। তিনি ছিলেন উগ্রপন্থী সংস্কারক, এবং আপন ধর্ম রক্ষা করতে তিনি দু-বার বাস্তিলে নিক্ষিপ্ত হয়েছিলেন। তাঁর মতো এক জন সংস্কারপন্থী, জীবনের প্রথম থেকেই ব্যঙ্গের সাহায্যে ক্ষেত্র প্রস্তুত না করলে রুশোর সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতা নীতি দাঁড়াত কোথায়? ব্যঙ্গ-সাহিত্যের সাহায্যে এত বড়ো সাফল্য আর কোনো একক ব্যক্তি লাভ করেছেন কি না সন্দেহ। অবশ্য এই সঙ্গে আর-এক মহৎ শিল্পীর কথা মনে আসে। ইনি বিশ্বহৃদয়জয়ী চার্লি চ্যাপলিন। তাঁর ব্যঙ্গের মাধ্যম সাহিত্য নয়, অভিনয়, কিন্তু তিনি সমাজের শোষণকারীদের বিরুদ্ধে বঞ্চিত মানুষের পক্ষ নিয়ে যে ব্যঙ্গ ফুটিয়েছেন তার সমস্ত অঙ্গের পরিকল্পনা, তাঁর নিজের। শাস্তি ভোগও তিনি কিছু করেছেন এবং এ যুগে বাস করেও।

কিন্তু এ যুগেও ব্যঙ্গস্রষ্টা শাস্তি ভোগ করেন, তাতে একটা বড়ো জিনিস প্রমাণ হয় এই যে, মানুষের সমাজে ত্রুটিবিচ্যুতি প্রতি যুগেই থাকবে এবং সেই সেই যুগকে অতিক্রম করে দৃষ্টি চালনা করতে পারেন এমন নিজ-কালে অতৃপ্ত সংস্কারকের আবির্ভাবও সকল যুগেই ঘটবে। সমাজ তো কখনও স্থির হয়ে থাকতে পারে না। বিশ্ব বিধানেই সব বস্তু চলমান, পরিবর্তনশীল।

যেসব কারণে সামাজিক চলা ত্বরান্বিত হয় তার মধ্যে স্যাটায়ার বা ব্যঙ্গ একটি শক্তিশালী কারণ, এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। ব্যঙ্গস্রষ্টাকে লোকে বড়োই সমীহ করে চলে। আবার ব্যঙ্গের সাহায্যেই ব্যঙ্গ এখন সাহিত্যের ক্ষেত্রে একটি বড়ো স্থান জুড়ে বসেছে। ব্যঙ্গই নিজ পক্ষের বাধা অনেকখানি দূর করেছে, মানুষের মনকে উদার করেছে, তাই এখন আর ব্যঙ্গস্রষ্টা মাত্রকে শাস্তি ভোগ করতে হয় না আগের মতো। তাঁরা এখন নির্ভয়ে পথ চলেন। এ যুগের ব্যঙ্গস্রষ্টারা পূর্ব শতাব্দীতে জন্মালে কঠিন শাস্তিই পেতেন। তখন যেসব ব্যঙ্গ লোকে উপভোগ করেছে তাতে দেশের অধিকাংশের সমর্থন ছিল, যাঁরা ব্যঙ্গের লক্ষ্য, তাঁরা সংখ্যায় ছিলেন বড়োই অল্প। কারণ তা প্রায় সবই তখনকার নতুন-আসা ইংরেজি হাবভাব ও খ্রিস্টিয়ান ধর্ম গ্রহণকারীদের বিরুদ্ধে। তাতে দেশের জনসাধারণের সমর্থন ছিল। তাই তখনকার ব্যঙ্গ রচয়িতাদের শাস্তি পেতে হয়নি। কিন্তু যাঁরা পরে ইংরেজি শিক্ষা ও আচারব্যবহার গ্রহণ করে এবং দেশি নানা সংস্কার থেকে মুক্ত হয়ে প্রাচীনপন্থী সংখ্যাগুরুদের প্রতি বিদ্রূপ বর্ষণ করেছেন, তাঁদের প্রতি দেশ বিরূপ ছিল। স্বয়ং ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর সমাজ-সংস্কারে নেমে সমস্ত দেশের বিদ্রূপের পাত্র হয়েছিলেন। তিনি পণ্ডিতদের ভাষার আক্রমণ সহ্য করেছেন। কালীপ্রসন্ন সিংহ, প্যারীচাঁদ মিত্র, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় গল্পাকারে বা মধুসূদন দত্ত, দীনবন্ধু মিত্র নাট্যাকারে, বা ঈশ্বর গুপ্ত কাব্যে যে জাতীয় ব্যঙ্গ ফুটিয়েছেন, তার সবই জনমতের দিক দিয়ে খুব নিরাপদ ব্যঙ্গ, সবই সংখ্যালঘুদের বিরুদ্ধে বর্ষিত। কাজেই সাধারণ পাঠক তাঁদের আপন লোক বলে মনে করেছেন।

সংস্কারমুক্ত স্বামী বিবেকানন্দ অন্ধ সংস্কারের বিরুদ্ধে বিদ্রূপ বর্ষণ করেছেন, তাতে তিনি অনেকের সন্দেহভাজন ছিলেন। শুধু বেদান্ত তাঁকে আক্রমণের হাত থেকে বাঁচিয়ে রেখেছিল। কিন্তু তিনি সমাজে যে সংস্কার চেয়েছিলেন তা আজও সাধিত হয়নি। মজাটা এইখানে।

সংস্কারসাধনের দিক থেকে স্বামী বিবেকানন্দের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের অমিল নেই কিছু। গোঁড়ামির বিরুদ্ধে বিবেকানন্দ সরল ভাষায় সোজা চাবুক মেরেছেন, রবীন্দ্রনাথ মেরেছেন ব্যঙ্গের চাবুক। সামাজিক গোঁড়ামি, বিয়ের ব্যাপারে পাত্রপক্ষের বর্বরতা, নববধূর উপর শ্বশুরকুলের অত্যাচার, তাঁর নানা গল্পে কঠিন ব্যঙ্গের আকারে ফুটে উঠেছে। কৃত্রিম শিক্ষাব্যবস্থার বিরুদ্ধে তাঁর 'তোতা-কাহিনী'টি হীরকের মতো ধারালো ব্যঙ্গ। রবীন্দ্রনাথ উগ্র আধুনিকতার বিরুদ্ধেও যথেষ্ট ব্যঙ্গ নিক্ষেপ করেছেন, কিন্তু আক্রোশবশে কদাচিৎ তিনি এমনই কঠোর রুচিবান ছিলেন যে তাঁর পক্ষে আক্রোশ প্রকাশ ব্যতিক্রম মাত্র, স্বাভাবিক আদৌ নয়।

দু-দিকেই অর্থাৎ গোঁড়ামির বিরুদ্ধে ও সাহেবিয়ানার বিরুদ্ধে, সমান ব্যঙ্গ নিক্ষেপ করেছেন দ্বিজেন্দ্রলাল রায়। তাঁর *একঘরে* নামক বইতে অতি নিষ্ঠুর আক্রমণ করেছিলেন গোঁড়া সমাজকে। বিলেত থেকে এসে তাঁকে প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে এমন কথা উঠেছিল সমাজে। তিনি বলেছিলেন, প্রায়শ্চিত্ত করতে রাজি আছি, কিন্তু বিলেত গিয়েছি বলে নয়, তোমাদের সমাজে ছিলাম বলে।

কিন্তু তাঁর আসল ব্যঙ্গ তাঁর কবিতায়। তাঁর বিলাতফের্তা, Reformed Hindoos, হিন্দু, গীতার আবিষ্কার প্রভৃতি ব্যঙ্গ সমাজের সংস্কারের কাজে অনেকখানি কাজ করেছে

এ বিষয়ে সন্দেহ করবার কারণ নেই। গীতার আবিষ্কার, তা সে হবে কেন, সালসা খাও, নসীরাম পালের বক্তৃতা প্রভৃতি ব্যঙ্গ হিসেবে সফল।

আধুনিক যুগে এইসব ব্যঙ্গ রচয়িতাদের ভাগ্য অনেকটা ভালো, কারণ দেশে ইংরেজি শিক্ষার বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে পাঠকমন ক্রমশ উদার হয়েছে এবং আধুনিক শিক্ষার বা স্ত্রীশিক্ষার বিরুদ্ধে এখন আর একটি কথাও কেউ উচ্চারণ করেন না। সব দিক দিয়েই সহনশীলতা এসেছে জাতীয় চরিত্রে। তা যদি না হত, যদি ইউরোপের রোজার বেকন বা এমনকি ভোলতেয়রের যুগেও আমাদের দেশের আধুনিক ব্যঙ্গ রচয়িতারা জন্মাতেন, তা হলে সংখ্যাগুরুর সমাজব্যবস্থার বিরুদ্ধে ব্যঙ্গ বর্ষণের দরুন বাংলা দেশে প্রথম শহিদ হতেন বনবিহারী মুখোপাধ্যায়। তাঁর নরকের কীট পড়লেই বোঝা যাবে আক্রমণের কী প্রবলতা তার প্রতিটি ছত্রে। তাঁর যে উদ্দেশ্যে কলম ধরা, সে উদ্দেশ্য এখনও সময়কে অতিক্রম করে যায়নি। তাই আজও তার মূল্য অনুভূত হবে। সমাজ যখন যুক্তির পথে চলতে শিখবে (কখনও শিখবে কি?), তখনও এ লেখার সাহিত্যমূল্য কমবে না, কেননা ভাষার উপর তাঁর দখল অসামান্য তাই তাঁর রচনা প্রকৃত সাহিত্য হয়ে উঠেছে। এটি আক্রমণ, এবং অনেক স্থানে নিষ্ঠুর আক্রমণ, কিন্তু এ আক্রমণের গভীরে তাঁর অন্তরের বেদনা, তাই তো কোথায়ও ভারসাম্য হারায়নি। আর ঠিক এই কারণেই তা ব্যঙ্গসাহিত্যে স্থায়ী আসন পাবে।

এইবার ব্যঙ্গ বা স্যাটায়ারকে আরও একটু বিশ্লেষণ করা যাক।

বাংলা ভাষায় 'ব্যঙ্গগল্প', 'ব্যঙ্গরচনা', 'ব্যঙ্গকৌতুক' বা 'রঙ্গব্যঙ্গ' প্রভৃতি শব্দের ব্যবহার খুব বেশি দিনের নয়। রঙ্গ, রঙ্গরহস্য, ইয়ার্কি, ঠাট্টা, হাসিঠাট্টা, হাসিতামাশা বেশি প্রচলিত। ব্যঙ্গ নিতান্তই কেতাবি শব্দ। ইংরেজি স্যাটায়ারের প্রতিশব্দ রূপে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সম্ভবত বাংলা সাহিত্যে প্রথম ব্যঙ্গ কথাটি ব্যবহার করেছেন, যদিও স্যাটায়ার বলতে ইংরেজি সাহিত্যে যে স্বীকৃতি, বঙ্কিমচন্দ্র ব্যঙ্গ কথাটিতে পুরোপুরি সেই স্বীকৃতি দিতে চাননি মনে হয়। অবশ্য ইংরেজ সমালোচকদের মধ্যেও এ বিষয়ে যথেষ্ট মতভেদ আছে। বঙ্কিমচন্দ্রের মতে স্যাটায়ারে বিদ্বেষ থাকা বাঞ্ছনীয় নয়, তার প্রমাণ পাই তাঁর ঈশ্বর গুপ্ত-সম্পর্কীয় রচনায়। সেখানে তিনি ঈশ্বর গুপ্তকে স্যাটায়ারিস্ট রূপে স্বীকার করেছেন এই অর্থে যে ঈশ্বর গুপ্তের কোনো রচনায় বিদ্বেষ নেই। বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন:

> ব্যঙ্গ অনেক সময় বিদ্বেষপ্রসূত। ইউরোপে অনেক ব্যঙ্গকুশল লেখক জন্মিয়াছেন তাঁহাদের রচনা অনেক সময়ে হিংসা, অসূয়া, অকৌশল, নিরানন্দ এবং পরশ্রীকাতরতা পরিপূর্ণ। পড়িয়া বোধ হয় ইউরোপীয় যুদ্ধ ও ইউরোপীয় রসিকতা এক মার পেটে জন্মিয়াছে—দুয়ের কাজ মানুষকে দুঃখ দেওয়া। ইউরোপীয় অনেক কুসামগ্রী এই দেশে প্রবেশ করিতেছে—এই নরঘাতিনী রসিকতাও এদেশে প্রবেশ করিয়াছে, হুতোম প্যাঁচার নক্সা বিদ্বেষপরিপূর্ণ। ঈশ্বর গুপ্তের ব্যঙ্গে লেশমাত্র বিদ্বেষ নাই।

হুতোম প্যাঁচার নক্সা বিদ্বেষপরিপূর্ণ কি না বিষয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে এ যুগে আমাদের মতভেদ স্পষ্ট। কিন্তু 'ব্যঙ্গ অনেক সময় বিদ্বেষপ্রসূত'—এই কথাটি স্যাটায়ার সম্পর্কে ইংরেজ সমালোচকের সঙ্গে তাঁর মতভেদের দৃষ্টান্ত। কারণ স্যাটায়ারকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে তার জন্মই বিদ্বেষ থেকে। অর্থাৎ সব সময়েই তা বিদ্বেষপ্রসূত। তবে

'বিদ্বেষপরিপূর্ণ' হলে তা যে উচ্চশ্রেণির স্যাটায়ারের পথে বাধা সৃষ্টি করে, এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। কোনো উপন্যাসের প্লট যেমন উপন্যাস নয়, গানের স্বরলিপি যেমন গান নয়, তেমনই শুধু বিদ্বেষ স্যাটায়ার নয়, অর্থাৎ ব্যঙ্গ সাহিত্য নয়। স্যাটায়ারের মূলে বিদ্বেষ, কিন্তু সেই বিদ্বেষ একটা বিশেষ চেহারায় প্রকাশিত হলে তবে তা স্যাটায়ার হয়, ব্যঙ্গ হয়। অবশ্য স্যাটায়ারের শ্রেণিভেদ আছে এবং বিশুদ্ধ বিষাক্ত আক্রমণ থেকে বিশুদ্ধ হাস্যরসের আক্রমণ, সবই ব্যঙ্গের অন্তর্ভুক্ত। এর মধ্যে কোন্‌টি উচ্চস্তরের ব্যঙ্গ তার অভিধা রচনা বড়োই কঠিন। কেননা ব্যঙ্গ যদি ব্যক্তিগত বিদ্বেষ থেকে মুক্ত থাকে, তবেই তা ব্যঙ্গ হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। ব্যক্তিগত বিদ্বেষ বা অভদ্র আক্রমণ উদ্দেশ্য-সাধনে সফল হলেও তার সাহিত্যমূল্য বেশি হয় না। মাথায় ইট মারা ব্যঙ্গ হতে পারে—কিন্তু তা ব্যঙ্গসাহিত্য নয়। বিশুদ্ধ হাস্যরস উদ্দেশ্যমূলক নয়, তাই তা ব্যঙ্গ নয়। নর্মান ফার্লং তাঁর ইংলিশ স্যাটায়ারে বলেছেন—'Satire is by nature practical'.

ব্যঙ্গ সমালোচক রোনাল্ড নক্স বলেছেন, আইরনি বা ভাগ্যের পরিহাসে হাস্যরস থাকে না, কিন্তু স্যাটায়ার বা ব্যঙ্গে থাকে, 'Satire borrows its weapons from the humorists. Yet the laughter which satire provokes has malice in it always'.

এই যে ম্যালিস বা বিদ্বেষ, এ বিদ্বেষ ক্ষতিকর নয়, তা উপভোগ্য এবং কল্যাণকর। ব্যঙ্গের উৎপত্তি আক্রমণের বাসনা থেকেই, আঘাত হেনে প্রতিপক্ষকে সিধে করার বাসনা থেকেই। এই ব্যঙ্গ হচ্ছে নিজেকে নিরাপদ দূরত্বে রেখে শত্রুপুরীতে তির নিক্ষেপ করা, শুধু তিরটি যাতে বাইরের দৃষ্টিতে উপভোগ্য হয় সেদিকে লক্ষ রাখতে হয়। অর্থাৎ ব্যঙ্গ এমন একটি অস্ত্র যা পুলিশের চোখের সামনে ব্যবহার করা যায় এবং পুলিশের সমর্থনে।

এ বিষয়ে প্রশ্নটা শুধু রুচির। কেউ বলেন আক্রমণটা একটু হিংস্র হলে ভালো হয়, কেউ বলেন হিংস্র আক্রমণের চেয়ে হাসতে হাসতে মরাই ভালো। মাল্‌গ্রেভ হাসতে হাসতে মারার পক্ষে:

> In satire too the wise took different ways
>
> To each deserving its peculiar praise...
>
> ...Men aim rightest when they shoot in jest.

স্যাটায়ারের রাজা পোপ ব্যঙ্গের উদ্দেশ্য ও অমোঘ কার্যফলের প্রসঙ্গে বলেছেন:

> I must be proud to see
> Men not afraid of God, afraid of me :
> Safe from the Bar, Pulpit and the Throne.
> Yet touch'd and sham'd by Ridicule alone.

মানুষ বিধাতাকে ভয় করে না, কিন্তু ব্যঙ্গলেখককে ভয় করে। সব দিকে মানুষ নিরাপদ, কিন্তু ব্যঙ্গের আঘাতে ধরাশায়ী।

ড্রাইডেন এ কথার সমর্থন করেছেন:

> **Of the best and finest manner of Satire, 'tis the sharp, well-mannered way of laughing a folly out of countenance.**

আদর্শ স্যাটায়ার সম্পর্কে মোটামুটি একটা ধারণা হবে এই শেষোক্ত দুই ব্যঙ্গ-গুরুর উদ্ধৃতি থেকে। ড্রাইডেনের 'ওয়েল-ম্যানার্ড' কথাটি মূল্যবান অর্থাৎ আক্রমণের ভঙ্গিটি যেন ভদ্র হয়, শালীনতার সীমা না ছাড়ায়। তা হলেই, যে অন্যায় বা অসংগতির বিরুদ্ধে আক্রমণ, তা লজ্জায় মুখ ঢাকবে।

ব্যঙ্গ-রচয়িতা রবীন্দ্রনাথ তো শেষবয়সে স্পষ্টই বলে গেছেন:

তবু যেন হেসে যাই যেমন হেসেছি বারে বারে,
পণ্ডিতের মূঢ়তায় ধনীর দৈন্যের অত্যাচারে
সজ্জিতের রূপের বিদ্রূপে। মানুষের দেবতারে
ব্যঙ্গ করে যে অপদেবতা বর্বর মুখবিকারে
তারে হাস্য হেনে যাব।

মূঢ়তা মানুষের হোক বা অপদেবতার হোক, তার প্রতি হাস্য বর্ষণই শ্রেষ্ঠ ব্যঙ্গ।

আয়রনিতে হাস্যরসের স্থান স্বভাবতই নেই। আয়রনির মাধ্যমে সফল ব্যঙ্গ ফোটানো যায়। যাঁরা বলেন স্যাটায়ার হাস্যরসমণ্ডিত হওয়া আবশ্যক, তাঁরা স্যাটায়ারের এই শাখাটিকে বিশেষ আমল দেননি। আয়রনির আকারে ব্যঙ্গের শক্তি কম নয়। বনবিহারী মুখোপাধ্যায়ের 'নরকের কীট' সমাজের প্রতি অতি প্রবল আক্রমণ, নির্মম আক্রমণ, স্যাটায়ারের শ্রেণিবিভাগের একেবারে গোড়ার দিকে এর স্থান, তিক্ত বিষাক্ত আক্রমণ, কিন্তু তবু এ আক্রমণ ব্যক্তিগত নয় বলে এটি উৎকৃষ্ট ব্যঙ্গ এবং শেষ ছত্রে পৌঁছে এটি আয়রনি। আক্রমণকারী যেখানে শ্মশানঘাট বাঁধানোর এস্টিমেট চাইছেন। এঁর সম্পর্কে পৃথকভাবে বলা হয়েছে। বনফুলের 'মানুষের মন' আয়রনির একটি নিখুঁত দৃষ্টান্ত। ত্রুটিহীন সম্পূর্ণ একটি ছোটো গল্প, কিন্তু গল্পের শেষে অ্যান্টিক্লাইম্যাক্স। যে ব্যক্তি যে জিনিসকে ঘৃণা করছে সেই ব্যক্তি তারই কাছে আত্মসমর্পণ করল। যুক্তির উচ্চাসন থেকে যুক্তিবাদী ধুলোয় লুটিয়ে পড়ল, এই অবস্থাই হচ্ছে ব্যঙ্গের পক্ষে আদর্শ।

নক্স বলেছেন—'Irony is content to describe men exactly as they are, to accept them professedly, at their own valuation, and then to laugh up its sleeve. It falls outside the humorous literature altogether.'

ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের স্যাটায়ার অনেক সময় প্রসঙ্গত বা ইনসিডেন্টাল। পথ চলতে চলতে মাঝে মাঝে ব্যঙ্গ ফুটিয়ে তোলা। মাঝে মাঝে ডাইনে-বাঁয়ে খোঁচা মেরে যাওয়া। কিন্তু শেষ লক্ষ্য হচ্ছে কৌতুক-হাস্যের। তাঁর রচনা কৌতুকপ্রধান, যদিও তাঁর সমগ্র রচনা থেকে ব্যঙ্গ অংশ বেছে নিলে তাঁকে জাত-ব্যঙ্গ বলে চিনতে দেরি হবে না। কিন্তু তাঁর মনের অতিউদারতা, কোমলতা, সাধারণ মানুষের প্রতি মমত্ববোধ ও তাঁর স্বভাবজাত কৌতুকপ্রিয়তা, তাঁকে সংস্কারকের দৃঢ়তায় অটল থাকতে দেয় না।

ব্যঙ্গ সাহিত্য-অস্ত্র না হয়ে যদি বস্তু-অস্ত্র হত তা হলে বলা যেত তার এক দিকে টিয়ার-গ্যাস অন্য দিকে নাইট্রাস অক্সাইড বা লাফিং গ্যাস। দুই-ই আক্রমণে ব্যবহার্য।

এ থেকে বোঝা যায় ব্যঙ্গের লক্ষ্য মানুষ বা মানুষের সমাজ। মানুষের অসংগতিই ব্যঙ্গের বিষয়। মনুষ্যেতর প্রাণী বা অপ্রাণী ব্যঙ্গের বিষয় হয় না যদি না তারা মানুষের হয়। এই অর্থে মনুষ্যেতর শুধু নয়, মনুষ্যোত্তর প্রাণীও ব্যঙ্গের বিষয় হতে পারে।

ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের ব্যঙ্গে মনুষ্যোত্তর প্রাণী এন্তার। লুল্লু, মিত্তির জা, সাহেব ভূত, ঘ্যাঘোঁ এবং আরও অনেকে।

ইংরেজি স্যাটায়ার কথাটি এসেছে ল্যাটিন sature থেকে। একরকম নাটক অভিনীত হত তার কোনো নির্দিষ্ট প্লট ছিল না, সঙ্গে নাচগান থাকত প্রচুর। তার পর নানা ছন্দে রচা সাধারণের উপভোগ্য কতকগুলি কবিতার গুচ্ছকে বলা হত সাটুরা। এর অর্থ, 'বিবিধ'। এতে পূর্বের নাটকের চেহারাও কিছু মিশ্রিত ছিল, সংলাপে কিছু কিছু ব্যঙ্গও ছিল। অর্থাৎ মূল অর্থে স্যাটায়ার হচ্ছে পাঁচমিশেলি বা খিচুড়ি। এই খিচুড়ি দু-হাজার-আড়াই হাজার বছর ধরে পরিবর্তনের পথে বর্তমান স্যাটায়ারে এসে পৌঁছেছে। তার পর আমরা বাংলায় তার নাম দিয়েছি ব্যঙ্গ, যদিও সাধারণত আমরা ব্যঙ্গ বলতে তার সঙ্গে একটু রঙ্গও আশা করি। ইংরেজি স্যাটায়ার কাব্য এবং নাটকে বেশি সমৃদ্ধ, বাংলা স্যাটায়ারও তাই। এর কারণ সবর্ত্রই এক। গদ্যসাহিত্যের উন্মেষ হয়েছে কাব্যসাহিত্যের পরে। কিন্তু ব্যঙ্গ করা মানুষের একটি ধর্ম। অতএব গদ্যের প্রসার হেতু গদ্যে ব্যঙ্গের প্রসারও স্বভাবতই বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু ইংরেজিতে অনেক ব্যঙ্গ বা হাস্যরসাত্মক বড়ো গল্প বা উপন্যাস লেখা হলেও, বাংলায় অতি সামান্যই হয়েছে। বাংলা ভাষায় ব্যঙ্গ বা হাস্যরসাত্মক ছোটোগল্পের সংখ্যা বরঞ্চ বেশি।

রবীন্দ্রনাথের ব্যঙ্গগল্প—'তোতা-কাহিনী', সফল ব্যঙ্গ। বুদ্ধিবৃত্ত রচনা (স্যাটায়ারের এটি একটি লক্ষণ) এবং হিউমারের গা ঘেঁষে গিয়ে লক্ষ্যবস্তুকে আক্রমণ। দেখতে ছোটো কিন্তু ফলা অত্যন্ত তীক্ষ্ণ।

প্রমথ চৌধুরীর স্যাটায়ার গৌণ, মুখ্য উদ্দেশ্য পরিচ্ছন্ন ভাষায় উইট ও হিউমার রচনা। অবনীন্দ্রনাথের স্যাটায়ার স্নিগ্ধ সহৃদয় হাস্যমণ্ডিত। রাজশেখর বসুর স্যাটায়ারে আক্রমণ এবং কৌতুক অঙ্গাঙ্গি মিশেছে। তাতে ব্যঙ্গের উদ্দেশ্য সফল করেও তার উপভোগ্য অংশটি বরাবর উদবৃত্ত থেকে যায়। ব্যঙ্গের সঙ্গে রাজশেখর বসুর নাম এমন-ভাবে জড়িয়ে গেছে যে রাজশেখর বসুর এখন আর সিরিয়াস গল্প লেখবার উপায় নেই, পাঠক হতাশ হবে। প্রমথনাথ বিশী এক জন শক্তিশালী স্যাটায়ারিস্ট। তাঁর 'শিখ' গল্পটি বাঙালি চরিত্রের একটি দিকের প্রতি ব্যঙ্গ হিসেবে সার্থক। যেমন সার্থক বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের 'গ্রাম সংস্কার'। খুব জোরালো ব্যঙ্গ লিখেছেন অন্নদাশঙ্কর রায়। তাঁর গল্পের শরটি যথাস্থানে গিয়ে অবশ্য বিঁধবে। সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার জীবনে যত গল্প লিখেছেন সবই ব্যঙ্গগল্প। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, প্রেমাঙ্কুর আতর্থী, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় এঁদের কৌতুকসৃষ্টির মধ্যে অত্যন্ত মৃদু খোঁচা আছে ব্যঙ্গের। লীলা মজুমদারের সরস গল্প, যেমন সরস গল্প প্রেমেন্দ্র মিত্রের, মনোজ বসু, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের এবং দেবেশ দাশের। তবে এঁদের মধ্যে দেবেশ দাশের বিশেষ বক্রব্যঙ্গ দৃষ্টিটি লক্ষণীয়। কিন্তু জগদীশ গুপ্তের 'অন্নাভাবের দিনে' নামক ছন্দে-লেখা গল্পটি একটি বহু মূল্যবান ব্যঙ্গগল্প, মনে রাখবার মতো। শ্রেণিবিচারে প্রথম।

অচিন্ত্যকুমারের 'আর্টিস্ট' গল্পটি সফল ব্যঙ্গ।

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ও ব্যঙ্গগল্প লিখেছেন, তাঁর 'উড়ুম্বর' সার্থক ব্যঙ্গগল্প। অশোক চট্টোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ মৈত্র—দু-জনেই ব্যঙ্গে সিদ্ধহস্ত। সজনীকান্ত দাস ব্যঙ্গ-

কবিতার ক্ষেত্রে অপ্রতিদ্বন্দ্বী, তিনি কিন্তু ব্যঙ্গগল্প রচনাও করেছেন গদ্যে, কিন্তু ছন্দে তাঁর হাত খোলে ভালো। শিবরামের মানসিক গঠন আক্রমণের অন্তরায়। তিনি বিশুদ্ধ কৌতুকস্রষ্টা। তাঁর হাতে অতি অভাজনও অতি প্রীতিভাজন হয়ে ওঠে। 'পাঞ্চজন্য' গল্পে কৌতুক সজারুর কাঁটার মতো গল্পের সর্বাঙ্গে খাড়া হয়ে উঠেছে।

ভাস্করের গল্পমাত্রেই ব্যঙ্গগল্প—আক্রমণ-মাধুর্যমণ্ডিত, আক্রান্ত ও আক্রমণকারী একত্র হাসে। অকৃবের ব্যঙ্গেও মধুরতা বেশি। বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র দৈনন্দিন জীবনের খুঁটিনাটি সব ঘটনাকে একটু বাঁকা চোখে দেখেন, তাঁরও আক্রমণ অত্যন্ত কোমল এবং অসহায়ের আক্রমণ, ঘরোয়া ভাষায় লেখা, আবৃত্তি করে পড়ার উপযুক্ত।

সৈয়দ মুজতবা আলীর মানসিক গঠন স্যাটায়ারিস্টের উপযোগী নয়। তাঁর মধুর ঔদার্য সরস চিত্রধর্মী, তাঁর ব্যঙ্গের বিজলি, বাঁকা-রেখায় আকাশকে বিদীর্ণ করে না, ছড়িয়ে যাওয়া আলোয় উদ্ভাসিত করে। রাগিয়ে দিলে কী হয় জানি না, হাসিয়ে দিলে আর মারতে পারেন না।

বিনয় ঘোষ জাত ব্যঙ্গ-লেখক। তির্যক দৃষ্টি নিয়েই তিনি সাহিত্যে নেমেছিলেন, হুতোমের অনুকরণে, কালপেঁচা নাম নিয়ে। তিনি এখন পেঁচার বিজ্ঞতায় বেশি আকৃষ্ট হয়েছেন এবং ভারী ও কঠিন বই লিখছেন।

সম্বুদ্ধও জাত ব্যঙ্গ-লেখক, জ্ঞানেন্দ্রনাথ বাগচী বিশুদ্ধ ব্যঙ্গ-লেখক। ইতিমধ্যে আরও যাঁরা ব্যঙ্গগল্পে যথেষ্ট নাম করেছেন, এমন দু-জন তরুণ—গৌরকিশোর ঘোষ ও দীপ্তেন্দ্রকুমার সান্যাল।

ব্যঙ্গগল্প কথাটি লক্ষণীয়—আধুনিক অর্থে যা গল্প বা ছোটোগল্প। বাংলা সাহিত্যে ব্যঙ্গকবিতা বা নাটকের প্রাচুর্যের কথা আগেই বলেছি। এদেশে ব্যঙ্গ রচনার ইতিহাসও প্রাচীন—কিন্তু গল্প রচনা আধুনিক : এটি ইংরেজি শিক্ষার পূর্ব থেকে। এবং ব্যঙ্গগল্পের সংখ্যাও সীমাবদ্ধ কারণ ব্যঙ্গ-লেখকের সংখ্যা সীমাবদ্ধ। অবশ্য ব্যঙ্গ-মহাজাতির বহু উপজাতি আছে।

বাংলা ছোটোগল্পের উৎকর্ষ আজ পৃথিবীর যে-কোনো সাহিত্যের ছোটোগল্পের সমপর্যায়ের এবং লেখকসংখ্যাও নগণ্য নয়। এবং যেহেতু গল্প মাত্রেই জীবনের চিত্র (যদিও তা আংশিক), সেই হেতু এমন গল্পলেখক থাকতেই পারেন না যিনি জীবনকে কোনো-না-কোনো সময়ে ব্যঙ্গের দৃষ্টিতে দেখেননি বা ব্যঙ্গ লেখেননি।

ব্যঙ্গগল্প বলতে আমরা সব সময়েই তার মধ্যে একটুখানি হাস্যরসও পেতে চাই মনে মনে। কেন, জানি না, হয়তো সংস্কার, হয়তো সার্থক ব্যঙ্গরচনার ওটি একটি চিহ্ন।

উৎস : *'ব্যাঙ্গমা ব্যাঙ্গমী' পুস্তকের ভূমিকার অংশ*, জানুয়ারি ১৯৬০।

বাংলা গদ্যকবিতা

বিষ্ণু দে

কাব্যে অভ্যস্ত আমাদের পক্ষে নতুন কোনো কাব্যরূপ ভাবনার বিষয় হয়ে ওঠে। শ্রেণিবিভাগের সহজ চেষ্টায় তখন কাব্যপাঠ হয়ে ওঠে বিড়ম্বনা। বিশেষ করে বাংলা গদ্যকবিতার প্রথম সাক্ষাতে। কারণ ইংরেজি গদ্য আর পদ্যের চেয়েও বাংলা গদ্য আর পদ্যের মধ্যে বিরোধ বেশি। রবীন্দ্রনাথের কাব্যপাঠ এবং আমাদের প্রাত্যহিক আলাপ তুলনা করলে এই লজ্জাকর সত্য বুঝি। অথচ গদ্য ও পদ্য শত্রু নয়, সে কথা বুঝতে সংস্কৃত অলংকার বা অ্যারিস্টটলের কাছে যাওয়া নিষ্প্রয়োজন। এবং গদ্য ও পদ্যের এই আপাতবৈষম্য দূর করতে যিনি পুরোধা, সে মহাকবির কাছে কৃতজ্ঞ থাকাই আমাদের অভ্যাস।

সাধারণ জীবনে যদি সাহিত্যের ভিত্তি গাঁথতে হয়, তাহলে যে, বাংলা কবিতার নিতান্তই কবিজনোচিত ও উন্মার্গ শৌখিন চাল পরিত্যাজ্য, সে বিষয়ে কারও সন্দেহ নেই। এবং যতদিন না গদ্য ও পদ্যের পাশাপাশি থাকবার ব্যবস্থা বাংলা কবিতায় হচ্ছে, ততদিন সামাজিক জীবনের অলিগলিতে বাংলা কবিতার যাতায়াত রুদ্ধ। আর রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত এ বিষয়ে প্রায়ই উদাসীন, কবিতার পাঁচিল তিনিও ভাঙেন না, দরকারমতো শুধু গদ্যকে চমৎকার কাব্যমণ্ডিত করে পাঙ্‌ক্তেয় করেন। কিন্তু কায়স্থরা পইতা ধরলেই কি সমাজসংস্কার শেষ? বিকালে অ্যালবার্ট হলে বক্তৃতা দিয়ে বা চাঁদা দিয়ে ফ্রি-রিডিংরুম করে, সন্ধ্যায় ড্রয়িংরুমে নাগরজীবন যাপন করার মতোই এ সংস্কার লিবারল মাত্র। রবীন্দ্রনাথের আগেকার নানা গদ্য লেখায়, অবনী ঠাকুর, এমনকি রমেশ দত্তের জীবন-সন্ধ্যায়, স্বভাবতই এই গদ্যচর্চা ঘটেছে। তফাত শুধু এই হয়তো যে সেকালে বড়ো-বড়ো গদ্যরচনায় এই রঙিন অংশগুলি অংশমাত্র, আর একালে এগুলি সর্বস্ব করে লিখলে ও লাইন ভাগ করে ছাপলে তাদের নাম দেওয়া হয় গদ্যকবিতা।

একান্ত সুখের বিষয়, সমর সেনের কবিতায় সংস্কারের অন্যদিকে সম্ভাবনা আছে। তিনি ফর্মের দিক থেকে, আমাদের দুর্ভাগ্যত, কবিতা থেকে গদ্যে, গদ্য থেকে কবিতায় না গেলেও তাঁর ভাষাব্যবহার কবিতারই, গদ্যের নয়। ভাষা তাঁর অবশ্যই গদ্য ব্যাকরণের, কিন্তু তার প্রয়োগরীতি কবিতার মতো ঐন্দ্রজালিক, গদ্যের মতো বিতর্কবাহক নয়। প্রত্যয়প্রতিজ্ঞায় তাঁর মন চলে না, তাই তাঁর গদ্য কাব্যালংকারে মণ্ডিত হয়ে নিজেকে ও পাঠককে স্তম্ভিত করে না; তাঁর কবিতার আধার স্বকীয় জগৎ বানিয়ে প্রজ্ঞাপথে এসে সাক্ষাতে দাঁড়ায়। অর্থাৎ বিষয়-বিষয়ীর সম্পূর্ণ সাযুজ্য তাঁর কবিতায় ঘটে, ফলে হয়তো ক্রোচের মতেই, কবিতা আর তার ভাষায় আলংকারিক বুদ্ধির স্থান থাকে না। থাকে থাকে গদ্যপন্থী নির্বাহকাব্যে বাক্যবহুল তাই সমর সেনকে হতে হয় না, নাটকের পাত্রপাত্রীর মর্মোক্তির মতোই তাঁর কবিতা আমাদের সামনে একেবারে আবির্ভূত হয়। এই হিসাবেই পাউন্ড-এর গদ্যকবিতা কবিতাপন্থী আর হুইটম্যানের কবিতা গদ্যপন্থী বলতে হয়। সমর সেনের যে-সব কবিতায় বিষয়মাহাত্ম্য নেই, সেরকম একটি কবিতারই সঙ্গে, ধরা যাক *পুনশ্চ*-র কোনো কবিতা, যথা কোপাই নামে কবিতার তুলনা করলে কথাটা স্পষ্ট হবে:

ধূসর সন্ধ্যায় বাইরে আসি।
বাতাসে ফুলের গন্ধ;
বাতাসে ফুলের গন্ধ
আর কীসের হাহাকার।
ধূসর সন্ধ্যায় বাইরে আসি
নির্জন প্রান্তরের সুকঠিন নিঃসঙ্গতায়।
বাতাসে ফুলের গন্ধ,
আর কীসের হাহাকার।

ঘনায়মান অন্ধকারে
করুণ আর্তনাদে আমাকে সহসা অতিক্রম করল
দীর্ঘ দ্রুত যান—
বিদ্যুতের মতো:
কঠিন আর ভারী চাকা, আর মুখর—
অন্ধকারের মতো ভারী।
বিস্ময়-বিমুগ্ধ হয়ে দেখি;
দেখি আর শুনি
গন্ধস্নিগ্ধ হাওয়ায় কীসের হাহাকার:—
অন্ধকার ধূসর, সাপের মতো মসৃণ,
দীর্ঘ লৌহরেখার সহসা শিহরন—
আর অস্ফুট শীর্ণ বহুদূরে কীসের আর্তনাদ
কঠোর কঠিন।
বাতাসে ফুলের গন্ধ
আর কীসের হাহাকার।

এ কবিতাতে বিষয় মহৎ কিছু নয় এবং আবেগতাপও প্রবল নয়। সেই কারণেই এর কাব্যগুণ স্পষ্ট। আর এ কথা বোঝা যায় যে সমর সেনের কাব্যলোকের জলবায়ুও একান্তই কবিতার, রবীন্দ্রনাথের কবিতাগানের। রবীন্দ্রনাথের বিশেষ কোনো কবিতার নয়, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের অজস্র কবিতা ও গান এবং লিপিকা, শরৎ, আষাঢ় ইত্যাদি নানা লেখার মধ্যে দিয়ে শিক্ষিত সমাজব্যাপী যে বর্তমান আবহ, সেই জলবায়ুই তাঁর সার্থক পটভূমি। সমর সেনের কবিতা যে-কোনো লোকোত্তর শূন্যের জীব নয়, সেইটেই তাঁর কীর্তির সূচনা। তাই তাঁর কাব্যে রবীন্দ্রগানলালিত ক্লান্ত করুণ বিষাদ শালমহুয়া-বনে, কৃষ্ণচূড়ার ডালে-ডালে, চাঁদের পাণ্ডুর আলোয়, পাহাড়ের দূর নীলে, শহরের এলোমেলো গলিতে, দূর দিগন্তে স্থিতি পায়। আর সে স্থিতি স্বকীয় ভারসাম্য পায় কবির নিজের প্রথম যৌবনের স্বাভাবিক দেহবিতৃষ্ণা আর ফিলিস্টাইন শরীর-সর্বস্বতার দ্বন্দ্বে আতুর ক্লান্ত আবেশে এবং সমাজ-জীবনের মর্মান্তিক ব্যর্থতাবোধে। এই ব্যর্থতাবোধের সম্ভাবনার জন্যই সমর সেনের বর্তমানে ক্ষান্ত না হয়ে পাঠকেরা তাঁর ভবিষ্যতে আশান্বিত।

ব্যক্তিস্বরূপের কী কৈবল্য থাকলে প্রথম যৌবনের আবেশকে জগচ্চিত্র না ভেবে সেই রোমান্টিকমন্যমাত্র ভাবকে যথাস্থানে পাঠিয়ে দেওয়া যায়, তা হঠাৎ কল্পনা করা শক্ত। কিন্তু যখন এদিকে মোহিতলাল বা ওদিকে জীবনানন্দ দাশের মতো দক্ষ কবিকে এই সংগতির অভাবে পীড়িত দেখি, তখন এই নবীন কবিকে প্রশংসা করতেই হয়। এবং এতই সৎ এই কবির ব্যক্তিস্বরূপ যে তার মধ্যে এই শ্রেণিবিরোধের ব্যথা গোপনই আছে—কারণ তাঁর নিজের কবিপরিণতি, আর বাংলা কাব্যের বিকাশে এ ব্যথা এখন শিকড়ই গাঁথতে পারে, স্বভাবত বনস্পতি হয়ে উঠতে পারে না। অথচ এই বিষয়ে আত্মবঞ্চনার লোভ সমর সেনের মতো সজাগ কবির কাছে যে বেগে আসতে পারে, তা সহজেই অনুমেয়।

তাই সমরের বিষাদ যৌবনোচিত বাসনা ও ক্লান্তির নেতিতেই উৎস খোঁজে। ফলে অন্যমনস্কের কাছে কয়েকটি কবিতা একঘেয়ে লাগতে পারে। তার যথার্থ কারণও আছে। যথারীতি পদ্য এবং সংস্কৃতজ গদ্যের গম্ভীর তালমানবিলম্বিত ছন্দের সফল প্রয়োগে যে বৈচিত্র্য ও প্রচণ্ড জোর পাওয়া যায়, তা সমর সেন অবহেলা করেছেন। তাঁর নেতিবাচক ছন্দ আর ভবিষ্যতের প্রবলসম্ভাব্যঞ্জক ছন্দ একই রেশে বাজে। কয়েকটি কবিতায় তিনি ভিন্নপ্রয়োগ করতে চেয়েছেন। কিন্তু '১৯০০', 'বসন্তের গান', 'একটি প্রেমের কবিতা', 'সিনেমায়', 'মেঘদূত' ইত্যাদি কি এদিক থেকে অন্যথা নয়? অবশ্য শিথিলসমাধি সব লেখকেরই হয়। আর গদ্যকবিতায় মুশকিল হচ্ছে যে এখানে কোনো অধিদৈবত প্রমাণ বা প্রতিমাণ নেই, এমনকি কোনো কবিনিরপেক্ষ সংকেতিত মার্গও নেই। তাই কবির আবেগ এবং পাঠক এখানে মুখোমুখি বলে কোন সময়ে-সময়ে দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে বিপদে পড়ে। এবং সমর সেন যখন কাব্যের এই আর্কিটাইপ্যাল প্যাটার্ন বা কৈলাসভাবনাহীন ক্ষুরধার পথই নিয়েছেন, তখন তাঁর আরও সাবধান হওয়া উচিত। প্রথম কবিতাতেই তিনি লাইনভাগে অনবহিত হয়েছেন। সে ত্রুটি 'আমোর স্ট্যান্ডস আপন্ ইউ'-তেও দ্রষ্টব্য। 'নাগরিক' নামে উৎকৃষ্ট কবিতাতে তাই ৪২ লাইনে যে হোঁচট খেতে হয় তা কোনো নাটকীয় কারণে নয়। ২৫ পৃষ্ঠার মুক্তি-তে ডাস্টবিনের সামনে মরা না হয়ে মরে যাওয়া কুকুরের মুখের যন্ত্রণায়

সময় এখানে কাটে। মৃত্যু, পোস্টগ্র্যাজুয়েটেও ছন্দ ঢিলে হয়ে গেছে এক-আধবার। অবশ্য গদ্যকবিতার ছন্দের বাঁধুনিতেই এ অনিশ্চয়তা। আবেগেই শুধু এ ছন্দের বেগ নির্দিষ্ট করে এবং দুই ব্যক্তির আবেগের মাত্রা এক চালে না-ও চলতে পারে। যথারীতি পদ্যে এক-এক শ্লোকের বা যমকের বাঁধনের ছন্দ দানা বাঁধে, কিন্তু গদ্যকবিতার ছন্দের দম সম্পূর্ণতা পায় সমগ্র বক্তব্যের এক-এক পর্যায়ে—স্ট্রফিক্ ইউনিট-এ। সমর সেন নিশ্চয়ই স্ট্রফিক্ সম্পূর্ণতা পেয়েছেন কয়েকটি দিন কবিতার নিপুণ এই শেষ পর্যায়ে :

মড়কের কলরোল, নতুন শিশুর কান্না,
চিরকাল বেলাভূমির সমুদ্রের শেষহীন সংগম।
অতীতের শবসম্ভোগী মন
কালের স্থবিরযাত্রায় স্থির অশান্তি আনে।
আজ দুঃস্বপ্নে দেখি,
বৃদ্ধ শিশু আর বুদ্ধিহীন বৃদ্ধেব দল
স্খলিত দাঁতের ফাঁকে কাঁদে আর হাসে
ট্রামে আর বাসে;
দূরে পশ্চিমে
বিপুল আসন্ন মেঘে অন্ধকার স্তব্ধ নদী।

কিন্তু আমার গলায় স্বভাবতই এর শেষ লাইনে চমক লাগে এবং পড়তে ইচ্ছা করে—স্তব্ধ মহানদী। দু একবার বোধ হয় শব্দ বা কথা সম্বন্ধেও কবির অসতর্ক ভাব দেখা যায়—লাইনের শেষে ক্রিয়া কঠিন বা বর্ণান্তিক শব্দে, হতে শব্দটার সর্বদা ব্যবহারেও হয়তো এবং বিশেষণের দুর্বলতায়, যথা চমৎকার কবিতা এই মদনভস্মের প্রার্থনায় :

মাস্তুলের দীর্ঘরেখা দিগন্তে,
জাহাজের অদ্ভুত শব্দ,
দূর সমুদ্র থেকে ভেসে আসে
বিষণ্ন নাবিকের গান।

এরকম জায়গায় মালার্মে বা বদলেয়র কি 'অদ্ভুত' বলে স্থির থাকতেন? সমর সেনের কবিতাতে এগুলি চোখে পড়ে, তিনি তো গদ্যকবিতায় লরেন্সমার্গী নন, তিনি পাউন্ডপন্থী। ব্যুৎপত্তি বা ব্যাকরণার্থে তাঁর ছন্দ বা ভাষা-প্রয়োগ তো ঢিলে হবার কথা নয়, কারণ কবিতার উপযুক্ত তাঁর ভাষাব্যবহার ব্যঞ্জনায়, বুতার্থে গভীর, সমগ্র কাব্যের তাৎপর্যার্থে অখণ্ড।

কিন্তু ছিদ্রান্বেষীকেও থামতে হয়, এত সার্থক তাঁর অধিকাংশ রচনার আত্মস্থ শিল্পসৌন্দর্য। আর এ কবির মনই শুধু বৃহত্তর পারিপার্শ্বিক সমাজ সম্বন্ধে উগ্র নয়, দৃষ্টিও প্রখর। 'বিস্মৃতি' কবিতাতে এর ব্যতিক্রম হয়তো কেউ পাবেন, কিন্তু ক্ষণে-ক্ষণে তাঁর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞা রসঘন উপমাউপচারে অন্বিত। 'রাত্রি' বা 'বিরহ' নামে কবিতাগুলি প্রায় জাপানি কবিতার মতো সরল স্পষ্ট ব্যঞ্জনায় গভীর, তাই 'রক্তকরবী', 'মহুয়ার দেশ' ইত্যাদিতে উপমাউপচারের জটিলতার সহজ সাহস ও ব্যঞ্জনাঢ্যতা বিস্ময়কর লাগে। এবং এগুলি

কবির গভীর চৈতন্যের মননজীব বলেই দেখি এই উপমাউপচারাদি এলিয়টের মতো মধ্যে-মধ্যে হয়ে ওঠে সিমবল বা পরোক্ষ প্রতীক, যার লীলা বিশ্বজনীন। সেইজন্যেই একটু বিড়ম্বিত হতে হয় যখন একই প্রতীক কখনও পরোক্ষদীপ্ত হয়ে ওঠে আর কখনও প্রত্যক্ষেই লুপ্ত হয়।

তবু যে গদ্যছন্দ সত্ত্বেও ঝড়ের নিঃশব্দ এই নাগরিক কবিকে আশা দিয়েছে, সেই আমাদের আশা। তাঁর সম্পদ তাঁর মননে, যার সাহায্যে তাঁর আত্মজ্ঞান ব্যঙ্গে হয়ে ওঠে নবসম্ভাবনায় চঞ্চল—শেষ কবিতা একটি বেকার প্রেমিক-এ :

> চোরাবাজারে দিনের পর দিন ঘুরি
> সকালে কলতলায়
> ক্লান্ত গণিকারা কোলাহল করে
> খিদিরপুর ডকে রাত্রে জাহাজের শব্দ শুনি
> মাঝে মাঝে ক্লান্তভাবে কী যেন ভাবি—
> হে প্রেমের দেবতা, ঘুম যে আসে না, সিগারেট টানি
> আর শহরের রাস্তায় কখনো প্রাণপণে দেখি
> ফিরিঙ্গি মেয়ের উদ্ধত নরম বুক।
> আর মদির মধ্যরাত্রে মাঝে মাঝে বলি—
> মৃত্যুহীন প্রেম থেকে মুক্তি দাও
> পৃথিবীতে নতুন পৃথিবী আনো
> হানো ইস্পাতের মতো উদ্যত দিন।
> কলকাতার ক্লান্ত কোলাহলে
> সকালে ঘুম ভাঙে
> আর সমস্তক্ষণ রক্তে জ্বলে
> বণিক সভ্যতার শূন্য মরুভূমি।

উৎস : *বিষ্ণু দে, সাহিত্যের ভবিষ্যৎ এবং অন্যান্য প্রবন্ধ,* আশ্বিন, ১৩৫৯।

ঢাকার মুসলিম সাহিত্য-সমাজ

আবদুল হক

যখনই আমরা কোনো পুরনো সাহিত্য-পত্রিকা পড়ি তখনই অতীত কথা কয়ে ওঠে : কিন্তু কথা কয়ে ওঠে অতীতের ভাষায়, দূর থেকে সমস্বরে কিন্তু বিচিত্র স্বরে, সে স্বরের খানিকটা বর্তমানে এসে পৌঁছে, খানিক-বা পৌঁছে না। এর কারণ সময়ের অগ্রগতির সঙ্গে দৃষ্টিকোণ, সমস্যা, জীবনরীতি সবকিছু নিয়ে সমাজ পরিবর্তিত হয়ে যায়, এবং সে পরিবর্তন যে কতখানি তা বিশেষভাবে ধরা পড়ে পুরোনো পত্রিকা পড়লে। কেন-না সচেতনভাবে হোক বা অচেতনভাবে, প্রত্যেকটি পত্রিকাই তার সমকালের সমাজকে প্রতিফলিত করে (সাহিত্যও কি তাই করে না?) । যে-কোনো মতবাদই প্রচার করুক, যত অগ্রসর মতবাদই প্রচার করুক, পত্রিকামাত্রেরই প্রকৃতি ও কর্তব্য এই-ই। তারপর সময় তার কাজ করে যায়, পত্রিকার পাতাগুলো ক্রমে বিবর্ণ হয়ে ওঠে, এবং তার ওপর ধুলো জমতে থাকে। তারপর একদিন আশ্চর্য হতে হয়, যা এক সময় চাঞ্চল্যকররূপে নূতন মনে হত, বৈপ্লবিক মনে হত, তাও কত পুরোনো হয়ে যেতে পারে।

ঢাকার অধুনালুপ্ত 'মুসলিম সাহিত্য-সমাজে'র মুখপত্র *শিখা* এই নিয়মের ব্যতিক্রম নয়। এটি ছিল একান্তভাবে মতবাদমূলক বার্ষিক পত্রিকা; এতে গল্প-উপন্যাস-নাটক-কবিতা ছাপা হত না, 'সাহিত্য-সমাজে'র বিভিন্ন অধিবেশনে পঠিত প্রবন্ধ; অভিভাষণ এবং প্রতিষ্ঠানের কার্যবিবরণীই শুধু ছাপা হত : ক্বচিৎ প্রাপ্ত প্রবন্ধ এবং অন্যান্য রচনাও। সমালোচকমহল পত্রিকাটিকে যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়েছিলেন, এমনকি কেউ কেউ 'সাহিত্য-সমাজে'র লেখকগণকে 'শিখাপন্থী' বলেও উল্লেখ করতেন। এতে যে-সব মতামত প্রকাশ করা হত তার প্রশংসা ও নিন্দা দুই-ই করা হত, তবে প্রশংসা যতটা নয় নিন্দা বোধ হয় তার চেয়ে অনেক বেশি। প্রশংসা বা নিন্দা যে-কোন উল্লেখযোগ্য লেখক বা লেখকগোষ্ঠীরই অনিবার্য নিয়তি, কিন্তু মুসলিম সাহিত্য-সমাজের কোনো লেখকের বেলায় নিন্দা লাঞ্ছনার পর্যায়ে পৌঁছেছিল, এমনকি নির্যাতনের পর্যায়ে বলেও শোনা যায়। কিন্তু সব পুরোনো পত্রিকার মতো *শিখা*-র পৃষ্ঠাগুলো বিবর্ণ হয়ে উঠেছে এবং তার উপর ধুলো জমেছে। আজ আশ্চর্য হতে হয় কত সামান্য ব্যাপার নিয়ে সেদিন ঝড়

উঠতে পেরেছিল : সামান্য, কিন্তু কত অসামান্য মনে হয়েছিল সেদিনের কাছে। পুরোনো *শিখা* পড়লে নূতন করে প্রতীয়মান হয় যে সময় কোন সমাজে, এমনকি আমাদের সমাজেও স্থাণু হয়ে থাকে না। সময়ের হস্তাবলেপ *শিখা*-র উপরেও অভ্রান্ত; কিন্তু এতে তার অগৌরবের কিছু নেই, বরং এই-ই তার গৌরবের। কেন-না, সময়ের সচলতাই ছিল তার কাম্য।

২

বাংলা ১৩৩৩ সালে, ইংরেজি ১৯২৬ সালের জানুয়ারি মাসে ঢাকায় 'মুসলিম সাহিত্য-সমাজ' গঠিত হয়।[১] এর চিন্তার প্রধান প্রেরণা আসত কাজী আবদুল ওদুদ এবং আবুল হুসেনের কাছ থেকে। বুদ্ধির মুক্তি ছিল এই সাহিত্য-সংস্থার মূলমন্ত্র। আধুনিক জগতের চিন্তাধারার পরিপ্রেক্ষিতে এবং যুক্তিবাদের আলোকে বাঙালি-মুসলিম সমাজে তৎকালীন সমাজচিন্তা, ধর্মচিন্তা ও মূল্যবোধগুলোর বিচার করাই ছিল সাহিত্য-সমাজের লক্ষ্য। বাংলা ভাষা ও সাহিত্য এবং মুসলমানদের সাহিত্য-সমস্যা সম্বন্ধেও তাঁদের বক্তব্য ছিল।

'মুসলিম সাহিত্য-সমাজে'র লেখকদের দৃষ্টি ছিল যুক্তিবাদীর দৃষ্টি, চিন্তা-সংস্কারের দৃষ্টি, এবং সমাজ-সংস্কারের। তাঁদের দৃষ্টি ছিল রেনেসাঁর দৃষ্টি : চিন্তার গতানুগতিকতা থেকে এবং ঐতিহ্যের অন্ধ-অনুবর্তিতা থেকে তাঁরা বাঙালি মুসলিম-সমাজকে মুক্ত করতে চেয়েছিলেন, অতীতের, ইসলামের এবং বর্তমানের যা-কিছু ভালো তা আত্মসাৎ করে তাকে দাঁড় করাতে চেয়েছিলেন সংকীর্ণতামুক্ত সুস্থ-উদার বিশ্বমানবতার আকাশতলে, যেখানে বাঙালি মুসলমান বিশ্বজনীন চিন্তার অংশীদার, এবং আধুনিক জগতের প্রাগ্রসর সমাজ ও জাতিসমূহের সমপর্যায়ে

'সাহিত্য-সমাজে'র লেখকেরা বলেছিলেন বুদ্ধির মুক্তির কথা। তাঁরা আধুনিক জগতের পরিপ্রেক্ষিতে এবং যুক্তিবাদের আলোকে তৎকালীন মুসলমানদের সমাজচিন্তা, ধর্মচিন্তা এবং মূল্যবোধগুলোকে নূতন করে দেখতে চেয়েছিলেন, বলেছিলেন, বহু শতাব্দী আগে মধ্যপ্রাচ্য বা মধ্য এশিয়ার চিন্তানায়কগণ যে সব চিন্তা করে গেছেন তাতেই মুসলমানদের যাবতীয় চিন্তার ইতি হয়ে যায়নি এবং নূতন চিন্তার প্রয়োজন ফুরিয়ে যায়নি, যুগে যুগে নূতন চিন্তার প্রয়োজন ছিল এবং আজও আছে। সাহিত্য-সমাজের লেখকদের ভাষাটা ঠিক এই রকম ছিল না, কিন্তু তাঁদের চিন্তাধারা এবং বক্তব্যটি ছিল এই রকম। নূতন চিন্তার আভাস পেলে রক্ষণশীলেরা চিরদিনই শঙ্কিত হয়ে ওঠেন, সেদিনও হয়েছিলেন। তাঁরা অভিযোগ করেছিলেন 'মুসলিম সাহিত্য-সমাজের লেখকরা ইসলাম-বিরোধী।'

মুসলিম সমাজের কোনো বিশেষ সমস্যা সম্বন্ধে নয়, এই সমাজ সম্বন্ধে সর্বব্যাপী ছিল 'সাহিত্য-সমাজে'র বক্তব্য। এর অন্তর্জীবন ও বহির্জীবন, এর মনন ও আচরণ, এর কুসংস্কার,

---

১ প্রথম সংখ্যায় প্রকাশিত বার্ষিক বিবরণীতে সাহিত্য-সমাজের সম্পাদক আবুল হুসেন লিখেছেন, "শ্রীমান আবদুল কাদির প্রমুখ আমাদের কতিপয় নবীন সাহিত্য-প্রাণ বন্ধু মিলে গত বৎসর ১৯শে জানুয়ারি শ্রদ্ধাস্পদ মৌঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ সাহেবের পৌরোহিত্যে এই সাহিত্য-সমাজের ভিত্তি-প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।" মোট পাঁচজনকে নিয়ে এর কর্মী-সংসদ গঠিত হয়েছিল, তার মধ্যে একমাত্র আবুল হুসেন ছিলেন অধ্যাপক, অন্যান্যরা ছাত্র। সম্পাদক ব্যতীত, প্রতিষ্ঠানের সভাপতি বা কোনো কর্মকর্তা নির্বাচন করা হয়নি।

তৃতীয় সংখ্যা *শিখায়* প্রকাশিত তৃতীয় বার্ষিক বিবরণীতে বলা হয়েছে : "শ্রদ্ধেয় ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, অধ্যাপক কাজী আবদুল ওদুদ, তরুণ কবি আবদুল কাদির, অধ্যাপক মৌঃ আনোয়ারুল কাদির প্রভৃতি কয়েকজন উদ্যমশীল ব্যক্তি প্রথমে এই সাহিত্য-সমাজ প্রতিষ্ঠিত করেন।"

পরিবার-জীবন, সামাজিক প্রথা, গোঁড়ামি, অতীতমুখীনতা, পশ্চিমমুখীনতা, ললিতকলাবিমুখতা, শিক্ষা-সমস্যা, কোনো কিছুকেই 'সাহিত্য-সমাজ' এড়িয়ে যেতে চাননি, সব কিছু সম্বন্ধে সমকালীন চিন্তাধারার গলদ তাঁরা উন্মোচন করেছেন, এবং করেছেন বলেই তাঁরা বৃহত্তর সমাজের অপ্রীতিভাজন হয়েছেন। তাঁদের কয়েকটি বক্তব্যের (যা আজ নিতান্ত মামুলি মনে হবে, কিন্তু সেদিন মামুলি ছিল না) বিবরণ দিলে বোঝা যাবে তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গি কী ছিল, সমাজের চিন্তাধারা তখন কোন স্তরে ছিল এবং এখনই-বা কোন স্তরে পৌঁছেছে।

সাহিত্য-সমাজপন্থীরা অবরোধ-প্রথার বিরোধী ছিলেন (অবশ্য এ ব্যাপারে বেগম রোকেয়া সাখাওয়াৎ হোসেন ছিলেন তাঁদের অগ্রবর্তিনী)। অনুমান করতে কষ্ট হয় না, সাহিত্য-সমাজপন্থীরা এই প্রথার বিরুদ্ধতা করে রক্ষণশীল সমাজকে শঙ্কিত করে তুলেছিলেন। আজ যখন আমরা মুসলিম তরুণী ও মহিলাদের দেখি সাবলীল পদক্ষেপে প্রশস্ত রাজপথ দিয়ে হেঁটে যেতে, উন্মুক্ত ময়দানে ক্রীড়া-প্রতিযোগিতা করতে, বলিষ্ঠ পেশির প্রয়োগে আগ্নেয়াস্ত্রের চর্চা করতে, বিচিত্রানুষ্ঠানে ও নাট্যমঞ্চে সংগীত, নৃত্য ও অভিনয়ের শিল্প-আনন্দ বিকীর্ণ করতে, তখন আমরা কল্পনাও করতে পারি না, যে ত্রিশ বছর আগে কোনো সাহিত্য-সভায় মুসলিম মহিলার উপস্থিতি আশ্চর্যজনক ব্যাপার ছিল এবং সমাজের আপত্তিও তাতে ছিল প্রচুর। 'সাহিত্য-সমাজের' কার্যবিবরণী পড়ে আমরা আজ তাই কৌতুক বোধ করি যে, এর দ্বিতীয় বছরে দু-একটি সভায় দু-একজন মহিলা আসতে আরম্ভ করেছিলেন, এটা সেকালে একটা অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য ঘটনা বলে গণ্য হয়েছিলো।

'মুসলিম সাহিত্য-সমাজে'র আরেকটা নীতি ছিল ললিতকলার চর্চা সমর্থন। চিত্রকলা, সংগীত নৃত্য ও নাট্যাভিনয়ের চর্চা মুসলমানদেরও করা উচিত এই তাঁরা বলতেন এবং এ-ব্যাপারে মোল্লাদের বিরোধিতার সমালোচনা করতেন। ললিতকলা আজ মুসলিম সমাজে অজ্ঞাত নয়, এমনকি বেশ-কিছুটা বিকাশলাভ করেছে, আর্ট ইনস্টিটিউট, বুলবুল একাডেমী এবং এদের চিত্র-প্রদর্শনী ও বিচিত্রানুষ্ঠানগুলি আজ ঢাকার সাংস্কৃতিক জীবনের অপরিহার্য অঙ্গ, কিন্তু ললিতকলা যে মুসলমানদের আদৌ চর্চা করা উচিত এবং এতে দোষের কিছু নেই, একথা সেদিন 'সাহিত্য-সমাজ'কে বার বার বলতে হয়েছিল। 'সাহিত্য-সমাজে'র প্রথম বার্ষিক সম্মেলনে পঠিত 'নাট্যাভিনয় ও মুসলমান সমাজ' শীর্ষক এক প্রবন্ধের আলোচনার বিবরণ দিতে গিয়ে সম্পাদক লিখেছিলেন :

> প্রবন্ধ শুনে কেউ বিশেষ চটেছেন বলে মনে হয় না— তবে কেউ কেউ বলেছেন, "তাও কি সম্ভব? মেয়ে সেজে রঙ্গ-মঞ্চে নাচাকুঁদা কি জায়েজ? একেবারে হারাম, নাউজ্‌বিল্লাহ্‌"
>
> [*শিখা*: ১ম বর্ষ ১৩৩৪]

'সাহিত্য-সমাজের' দ্বিতীয় বছরের দু-একটি সাহিত্য-সভায় দু-একজন মুসলিম গায়ক গান গেয়েছিলেন, এ একটা উল্লেখযোগ্য প্রগতি বলে সে বছরের কার্যবিবরণীতে বর্ণিত হয়েছিল।

'সাহিত্য-সমাজের' মুখপত্র *শিখা* পড়ে আরও একটা ব্যাপারে আমাদের আশ্চর্য হতে হয়। স্বাধীনতার যুগে ঐতিহাসিক রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের ফলে পাকিস্তানে বাংলা অন্যতম রাষ্ট্রভাষারূপে স্বীকৃতি লাভ করেছে, কিন্তু 'সাহিত্য-সমাজে'র লেখকগণকে এর চেয়েও

একটা মৌলিক প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করতে হয়েছিল। সেই সময়ে বাংলার মুসলিম অভিজাত বংশীয় কোনো কোনো নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি উর্দুকে বাঙালি মুসলমানের শিক্ষা ও সাহিত্যর ভাষা হিসাবে চালু করার চেষ্টা করেছিলেন। 'সাহিত্য-সমাজে'র প্রথম বর্ষের কার্যবিবরণী দিতে গিয়ে সম্পাদক আবুল হুসেন লিখেছিলেন ঃ

> (কাজী ইমদাদুল হকের মৃত্যুতে অনুষ্ঠিত) এই শোক-সভার শেষভাগে 'বাংলা বাঙালি মুসলমানের শিক্ষার বাহন হওয়া উচিত' এই কথা আলোচনা শুরু হয়। মৌঃ মুঃ শহীদুল্লাহ সাহেব একথা বিশদভাবে বুঝিয়ে দিলে মৌঃ খোন্দকার ফয়জুদ্দিন সাহেব উহা সমর্থন করতে গিয়ে নাতিদীর্ঘ একটি সন্দর্ভ পড়েন। তারপর স্যার আবদুর রহিমের উক্তির বিরুধে মত প্রকাশের ভয়েই হোক বা তাঁর উক্তির প্রতি শ্রদ্ধা করেই হোক সমবেত ভদ্রমণ্ডলীর মধ্যে এ-সম্বন্ধে একটা চাঞ্চল্য দেখা যায়। তখন অগত্যা সভা-ভেঙ্গে দেওয়া হয়।
>
> [*শিখা* ঃ ১ম বর্ষ]

সাহিত্য-সমাজের প্রথম বার্ষিক সম্মেলনের সভাপতির অভিভাষণ দিতে গিয়ে খান বাহাদুর তসদ্দক আহমদ বলেছিলেন ঃ

> এই বাংলাদেশে এমন অনেক মুসলিম আছেন যাঁহারা বাঙ্গালা ভাষাকে তাঁহাদের মাতৃভাষা বলিয়া স্বীকার করিতে লজ্জা বা অপমান বোধ করেন।
>
> [*শিখা* ঃ ১ম বর্ষ]

একই সম্মেলনে অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতির অভিভাষণ দিতে গিয়ে বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ স্যার এ. এফ. রহমান বলেছিলেন ঃ

> আমারই জীবনে এমন একটা সময় দেখেছি যখন নিজের ভাষাটা না জানাই সভ্যতার চিহ্ন বলে ধরা হত। [*শিখা* ঃ ১ম বর্ষ]

'সাহিত্য-সমাজে'র দ্বিতীয় বার্ষিক সম্মেলনেও একই প্রসঙ্গের উল্লেখ করা হয়েছিল। এই সম্মেলনে অভ্যর্থনা-সমিতির অভিভাষণ দিতে গিয়ে ঢাকা মুসলিম হলের তৎকালীন প্রভোস্ট এবং বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ডঃ মাহমুদ হাসান নিজে অবাঙালি হওয়া সত্ত্বেও বলেছিলেন ঃ

> বাংলাদেশে জোর করে উর্দুকে মাতৃভাষা করতে চাওয়ার মত আহাম্মকি আর নাই। ....বাংলার মুসলমান এতদিন অনর্থক উর্দুর পিছু পিছু ছুটে মারাত্মক ভুল করেছে। তাই আজ তারা অন্যান্য প্রদেশের মুসলমানদের চেয়ে অনুন্নত। [*শিখা* ঃ ২য় বর্ষ ১৩৩৫]

আমাদের সমাজ সমগ্রভাবে না হলেও বহুলাংশে বাংলা ভাষা সম্বন্ধে কীরূপ মনোভাব পোষণ করতেন তা এইসব উদ্ধৃতিতে সুস্পষ্ট। বাংলা ভাষার প্রতি বাঙালি মুসলমানের প্রীতির প্রবাহ আজ বিশালকায় ও দুকূলপ্লাবী, কিন্তু এর উৎস-ধারার পুষ্টি-সাধন ও এতে বেগ-সঞ্চারের কৃতিত্ব সাহিত্য সমাজের কম নয়।

মুসলমানদের শিক্ষাকে আরবি-ফারসি-সর্বস্ব করায় 'সাহিত্য-সমাজ পন্থী'দের আপত্তি ছিল। *শিখা-র* প্রথম সংখ্যায় প্রকাশিত 'বাঙালি মুসলমানের শিক্ষা-সমস্যা' শীর্ষক প্রবন্ধে

আবুল হুসেন বলেছেন, 'যুগবিশেষের মন্ত্র ও শাস্ত্র কণ্ঠস্থ করাই শিক্ষার চরম পদ্ধতি বলে গণ্য হলে সে শিক্ষা জীবনকে সংযত-সুন্দর করতে পারে না।' প্রবন্ধের উপসংহারে তিনি বলেছেন, 'আজ আমাদের সকল দুর্গতির কারণ হচ্ছে, আমাদের আড়ষ্ট বুদ্ধি— অন্ধবিশ্বাস, বর্তমান জীবন সম্বন্ধে ঔদাসীন্য, এবং বর্তমান জগতের জ্ঞানের সঙ্গে আমাদের সম্পর্কহীনতা। তার জন্য মাদ্রাসা-শিক্ষা-পদ্ধতি অনেকখানি দায়ী।' সাহিত্য-সমাজের চতুর্থ বার্ষিক সম্মেলনের সভাপতি খান বাহাদুর নাসিরুদ্দীন তার অভিভাষণে বলেছিলেন, মাদ্রাসা শিক্ষার প্রতি আমাদের মুসলমানদের অতিরিক্ত নজর থাকাতে শিক্ষা-বিষয়ে তথা আর্থিক অবস্থা প্রভৃতি অন্যান্য বিষয়েও প্রতিবেশী হিন্দুদের চাইতে অনেক পিছনে পড়ে যাচ্ছি।' 'সাহিত্য-সমাজী'রা যখন এসব কথা বলেছিলেন তখন তাঁরা যুগের প্রয়োজনেরই প্রতিধ্বনি করেছিলেন।

'সাহিত্য-সমাজী'রা সাম্প্রদায়িকতার বিরোধী ছিলেন। এখানে সাম্প্রদায়িকতা অর্থে মুসলিম সাম্প্রদায়িকতা যেমন, তেমনি হিন্দু সাম্প্রদায়িকতাও। তাঁরা ছিলেন জাতীয়তাবাদী। Be rational and national এই ছিল তাদের মূলমন্ত্র— বুদ্ধির মুক্তিরই যা সম্প্রসারিত বিবৃতি— কিন্তু মনে রাখতে হবে, তাঁরা রাজনীতিক ছিলেন না, সাহিত্য ও সমাজচিন্তাই ছিল তাঁদের লক্ষ্য।

কিন্তু অন্য অর্থে— রাজনৈতিক অর্থে নয়, দৈশিক অর্থে তাঁরা মুসলমানদের মনে জাতীয়তাবোধের উদ্বোধন করতে চেয়েছিলেন। দৈশিক জাতীয়তাবোধ বাঙালি মুসলমানের মধ্যে চিরকালই ক্ষীণ; আজও, এই স্বাধীনতা লাভের পরেও পূর্ব পাকিস্তানির সে বোধ, যে-মাটি থেকে সে জীবন রস আহরণ করে সে-মাটির প্রতি তার প্রেম ও প্রীতি খুব সুস্পষ্ট ও সরল নয়। দৈশিক জাতীয়তাবোধের এই ক্ষীণতার সুন্দর বিশ্লেষণ করেছিলেন 'সাহিত্য-সমাজে'র চতুর্থ বার্ষিক সম্মেলনের সভাপতি খান বাহাদুর নাসিরুদ্দীন আহমদ:

> .....মুসলমানদের যে চেহারাটা মনে জাগে সেটা এই যে তারা যেন 'না ঘাটকা না ঘরকা।' শত শত বৎসর তারা এদেশে আছে অথচ তাদের দৃষ্টি যেন আরবের খর্জুর বন ও পারস্যের দ্রাক্ষাকুঞ্জে নিবদ্ধ। ফলে, ভারতীয় বলে তারা নিজেদের ভাবতে পারছে না অথচ আরব-পারসিকও হতে পারছে না।
>
> ......মুসলমানেরা এমনভাবে চলে যেন তারা এখানকার মুসাফির। এ হতভাগ্য 'কওম' কি এখনও ভাববে না যে বাংলা যদি তার দেশ নয়— আরব-পারস্য-আফগানিস্তান যদি তার দেশ নয়— তবে কি সে শূন্যে বাসা নির্মাণ করবে?
>
> [*শিখা*: ৪র্থ বর্ষ ১৩৩৭]

'সাহিত্য-সমাজপন্থী'দের উল্লিখিত মতামতগুলো ত্রিশ বছর আগের রক্ষণশীল সমাজকে ক্ষুব্ধ ও বিচলিত করার পক্ষে যথেষ্ট ছিল। পর্দার বিলোপ দাবি, সুদের সমর্থন, বাংলা-ভাষা-প্রীতি, চিত্রশিল্প-সংগীত-নৃত্য-নাট্যাভিনয় সমর্থন, মাদ্রাসা-শিক্ষার সমালোচনা, সাম্প্রদায়িকতার বিরোধিতা, কোনোটাই প্রচলিত ধ্যান-ধারণার পরিপোষক ছিল না, এবং প্রচলিত ধ্যান-ধারণার পোষকতা যা করে না তাকে প্রতিকূলতার সম্মুখীন হতে হবে এটাই স্বাভাবিক। সেদিনের এই সমস্যাগুলো আজ নেই, এসব ক্ষেত্রে 'সাহিত্য-সমাজ'পন্থীদের ভূমিকা একদিন কেউ না কেউ পালন করতই, কিন্তু সারা দুনিয়ার সমাজ বদলে যাচ্ছে এই সম্বন্ধে তাঁরা যে সচেতন ছিলেন, এবং নিতান্ত বাঁচবার তাগিদে এই সামাজিক বিবর্তনে তাঁদেরও ভূমিকা রয়েছে এটা যে তাঁরা উপলব্ধি করেছিলেন, এখানেই, 'সাহিত্য-সমাজে'র তাৎপর্য এবং ঐতিহাসিক গুরুত্ব।

'সাহিত্য-সমাজে'র motto ছিল 'জ্ঞান যেখানে সীমাবদ্ধ, বুদ্ধি সেখানে আড়ষ্ট, মুক্তি সেখানে অসম্ভব।' *শিখা*-র প্রত্যেকটি সংখ্যার প্রথমেই এই কথাগুলো ছাপা হত। এই বুদ্ধির মুক্তির তাৎপর্য কেউ কেউ ব্যাখ্যা করেছিলেন : এই তাৎপর্যের ইঙ্গিত ওদুদ সাহেব থেকে নেওয়া উদ্ধৃতিতেও রয়েছে। 'বাঙালি মুসলমানের শিক্ষা-সমস্যা' শীর্ষক প্রবন্ধে হাবুল হুসেন বলেছিলেন :

> হযরত বলেছেন, — 'তাখাল্লাকু বি আখলাকিল্লাহ' (খোদার গুণাবলী লাভ করতে চেষ্টা কর)। মানুষের চরম বিকাশের প্রথম পথ হচ্ছে মুক্ত বুদ্ধি— যাতে জগতের প্রয়োজন অনুসারে যুগধর্মের ইঙ্গিত অনুসারে স্বীয় জীবন নিয়ন্ত্রিত করা সহজ হয়। অতীতের কোন যুগ-বিশেষের প্রতিষ্ঠিত বিশ্বাসের বশবর্তী হয়ে যারা বর্তমানকে অস্বীকার করে তাদের বুদ্ধি মুক্ত নয়।
> [*শিখা* : ১ম বর্ষ]

কাজী আনোয়ারুল কাদির প্রথম বার্ষিক সম্মেলনে পঠিত তাঁর 'বাঙালি মুসলমানের সামাজিক গলদ' প্রবন্ধে বলেছিলেন :

> বুদ্ধির মুক্তি না হলে ধর্মশিক্ষা হতে পারে না। ধর্মের আদেশ ও নিষেধ পালন করার জন্য বুদ্ধির দরকার। বুদ্ধির অভাবে আজকাল আমাদের ভিতর প্রকৃত ধর্মভাব লোপ পেয়েছে। এখন গোঁড়ামিই আমাদের ধর্ম হয়ে দাঁড়িয়েছে।
>
> [*শিখা* : ১ম বর্ষ]

একই প্রবন্ধে কাজী আনোয়ারুল কাদির বোধহীন ও হৃদয়ের সঙ্গে সম্পর্কশূন্য অন্ধ ধর্মাচরণকে একই ধরনের পৌত্তলিকতা বলে অভিহিত করেছিলেন।[১] সাহিত্য-সমাজের উদ্দেশ্য বর্ণনা করতে গিয়ে ডঃ কাজী মোতাহর হোসেন বলেছিলেন :

> আমরা চক্ষু বুঁজিয়া পরের কথা শুনিতে চাই না বা শুনিয়াই মানিয়া লইতে চাই না,—আমরা চাই চোখ মেলিয়া দেখিতে, সত্যকে জীবনে প্রকৃতভাবে অনুভব করিতে। আমরা কল্পনা ও ভক্তির মোহ-আবরণে সত্যকে ঢাকিয়া রাখিতে চাই না। আমরা চাই জ্ঞান-শিখা দ্বারা অসার সংস্কারকে ভস্মীভূত করিতে এবং সনাতন সত্যকে কুহেলিকা-মুক্ত করিয়া ভাস্বর ও দীপ্তিমান করিতে। আমরা ইসলামের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিতে চাই না—আমরা চাই বর্তমান মুসলিম সমাজের বদ্ধ-কুসংস্কার এবং বহুকাল সঞ্চিত আবর্জনা দূর করিতে। [*শিখা* : ২য় বর্ষ ১৩৩৫]

বুদ্ধির মুক্তির তাৎপর্য আরও কিছুটা পরিষ্কার হয় জনাব আবুল ফজলের 'তরুণ আন্দোলনের গতি' শীর্ষক প্রবন্ধে। তিনি লিখেছিলেন :

> যাঁহাদের মস্তিষ্ক সজীব, তাঁহারা নিত্য-নূতন পথের আবিষ্কার করিবেন, ইহাতে যদি অতীতের বিরুদ্ধতা হয়, তাহাতে কিছু আসিয়া-যায় না। অতীতের

১ এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে, নিছক বাহ্যিক আচরণ মানেই ধর্ম নয় এই মত সাহিত্য-সমাজপন্থীরা পোষণ করতেন এবং এই কারণেই তাঁদের কেউ কেউ জনসাধারণের অবোধ্য আরবি ভাষায় খোৎবা-পাঠ অর্থহীন বলে সমালোচনা করেছিলেন। কিন্তু এই প্রসঙ্গটি কখনো তাঁদের প্রধান বক্তব্যে পরিণত হয়নি।

বিবুদ্ধতা মুসলমানের জন্য বড় ক্ষতির নয়। কিন্তু অতীতকে আঁকড়িয়া ধরিয়া তাহার জীবনে চলার পথে একটা ফুলস্টপ দেওয়াই তাহার পক্ষে মারাত্মক। অতীতকে অস্বীকার করিতে আমি বলি না। কিন্তু অতীতের দিকে ফিরিয়া যাওয়াতেই আমার আপত্তি। অতীতের কাছে যতখানি আলো পাওয়া যায় তাহা আমি হৃদয় ভরিয়া গ্রহণ করিতে প্রস্তুত। কিন্তু পুরাতনের গৌরব দিয়া তাহার অন্ধকারকে নিতে আমি রাজি নই।

[*শিখা*ঃ ৩য় বর্ষ ১৩৩৬]

অত্যন্ত পরিষ্কার ভাষায় বুদ্ধির মুক্তির তাৎপর্য এসব উদ্ধৃতিতে প্রকাশ করা হয়েছে। 'সাহিত্য-সমাজে'র লেখকদের প্রিয় ছিল রবীন্দ্রনাথের এই বাণী 'যা শাস্ত্র তাই বিশ্বাস্য নয়, যা বিশ্বাস্য তাই শাস্ত্র।' এ প্রসঙ্গে কাজী আবদুল ওদুদ থেকে আর-একটি উদ্ধৃতি দেওয়া যেতে পারে। ওদুদ সাহেব ১৩৩৩ সালে 'সাহিত্য-সমাজে'র প্রথম বছরের এক সাহিত্য-সভায় তাঁর বিখ্যাত 'সম্মোহিত মুসলমান' প্রবন্ধে বলেছিলেনঃ

আমাদের চিত্তে বল সঞ্চার করুক এই নব বিশ্বাস যে, মানুষের চলার জন্য বাস্তবিকই কোনো বাঁধানো রাজপথ নেই,— জগৎ যেমন এক স্থানে বসে নেই, মানুষও তেমনি তার পরিবর্তনশীল পরিবেষ্টনের এক স্থানে স্থির হয়ে নেই—আর এই পরিবর্তনশীল পরিবেষ্টনের ভিতর দিয়ে পথ করে যাওয়ার জন্য প্রয়োজন অন্ধ অনুবর্তিতার নয়, সদা-জাগ্রতচিত্ততার।

[*শাশ্বত বঙ্গ*]

এর কয়েক বছর পরে 'শিক্ষা-সংকট' শীর্ষক প্রবন্ধে তিনি বলেছিলেনঃ

একদিনের খাওয়ায় যেমন অন্য দিনের চলতে চায় না, এক যুগের চিন্তায়ও তেমনি অন্য যুগের চলে না। [*শাশ্বত বঙ্গ*]

শিখা পত্রিকায় মুসলিম-সমাজের ধর্মচিন্তাকে সরাসরিভাবে বিশ্লেষণ না করে, ধর্ম প্রসঙ্গে সাধারণভাবে যাঁরা এ সম্বন্ধে অভিমত প্রকাশ করেছেন অথবা এর পাশ ঘেঁষে গেছেন তাঁদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য কাজী মোতাহার হোসেন এবং কবি আবদুল কাদির। কাজী মোতাহার হোসেন 'ধর্ম ও শিক্ষা' শীর্ষক প্রবন্ধে বলেছেনঃ

সংস্কৃত স্তোত্র পাঠ করা আর আরবিতে নামাজ পড়াই নিয়ম। যার অর্থবোধ হয় না, যে কথার সহিত প্রাণের যোগ নাই, সেইসব কথায় ভগবানের নিকট প্রার্থনা করায় কতটা হৃদয়-মনের তৃপ্তি হয়, তা বুঝে ওঠা কঠিন।

[*শিখা* ঃ ৪র্থ বর্ষ]

এর আগের বছরে আবুল ফজল এ দেশে আরবিতে খোৎবা-পাঠের সমালোচনা করেছিলেন (*শিখা* ঃ ৩য় বর্ষ)।

ধর্মের জন্য মানুষ নয়, মানুষ্যের জন্যে ধর্ম, এই মর্মে কাজী মোতাহার হোসেন অভিমত প্রকাশ করেছেন 'ধর্ম ও শিক্ষা' প্রবন্ধের আরেক স্থানেঃ

সব সময় মনে রাখতে হবে, লোকহিতই ধর্মের উদ্দেশ্য; ধর্মকে অক্ষরে অক্ষরে পালন করতে গিয়ে যদি দেখা যায় অকল্যাণ হচ্ছে, তবে বুঝতে হবে, কোথাও একটা গোলমাল আছে। হয় ধর্মের প্রকৃত মর্ম উপলব্ধ হয়

নাই, নয়ত ধর্মের যে অংশের উপকারিতা ও প্রয়োজনীয়তা না থাকায় বর্তমান অবস্থায় তা অপ্রযোজ্য হয়ে পড়েছে।

'নাস্তিকের ধর্ম' (*শিখা* : ৫ম বর্ষ) প্রবন্ধের শিরোনাম যে সম্ভাবনারই ইঙ্গিত বহন করুক, এতে বিভিন্ন প্রকারের ও স্তরের আস্তিক্যবাদের কথাই বেশি। এবং প্রকৃতিবাদের আবরণে তিনি এরূপ সন্তর্পণে নাস্তিক্যবাদের নৈতিক চিন্তামূলক দিকের অবতারণা করেছেন যে এই দুইপ্রকার চিন্তার মধ্যে যে কোনো বিরোধ আছে তা বোঝাই যায় না।

'সাহিত্য-সমাজ'-এর সুপরিচিত কোনো অভিমতকে প্রধান বিষয় করে লিখিত কবি আবদুল কাদিরের কোনো প্রবন্ধ *শিখা*-য় প্রকাশিত হয়নি। এতে তাঁর প্রকাশিত একমাত্র প্রবন্ধ 'লোক-সংগীত'। এর এক স্থানে তিনি লিখেছেন :

> বাংলাদেশে সাধারণ ইসলাম যেভাবে প্রচারিত হয়, তাহা জনসমাজ সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করিতে পারে নাই। আলেমদের দেওয়া ইসলাম বাঙালি চাষির জীবনে অনেকাংশে আশ্চর্য রকমে বিফলিত হইয়া গিয়াছে—শরিয়তের হুবহু প্রচলন বাংলার মাটি সহিতে পারে নাই, তাই মুসলমান চাষি সংগীতাদি সম্পর্কে শরিয়তী নিষেধকে উপেক্ষা করিয়া বৈষ্ণবীয় লীলাবাদের ছায়ায় আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। [*শিখা* প্রথম বর্ষ]

বাংলার লোক-সংগীতের আলোচনাকালে প্রসঙ্গক্রমে ব্যক্ত এই অভিমত লেখকের ধর্ম-সংক্রান্ত মতামতের কোনো বিস্তারিত পরিচয় পাওয়া যায় না, দৃষ্টিকোণের পরিচয় পাওয়া যায় মাত্র।

বুদ্ধির মুক্তি প্রসঙ্গে উদ্ধৃতির পরিমাণ একটু বেশি দেওয়া হল দুটি কারণে : প্রথমত, এই বিতর্কমূলক বিষয়ে 'সাহিত্য-সমাজ'পন্থীদের বক্তব্যের সঙ্গে তাঁদেরই ভাষায় পাঠকদের পরিচয় হওয়া উচিত, এবং দ্বিতীয়ত, তাঁদের মুখপত্র *'শিখা'* বা তাঁদের অধিকাংশেরই প্রবন্ধের বই অধুনা একান্তই দুর্লভ।

বুদ্ধির মুক্তির তাৎপর্য, আশা করি, এইসব উদ্ধৃতিতে পরিষ্কার হয়েছে। তাঁদের চিন্তাধারার মধ্যে এমন একটা দুঃসাহসিকতা ও মৌলিকতা ছিল, এবং তাঁদের বক্তব্যের মধ্যে এমন একটা আন্তরিকতা ছিল যা সে সময়ের বুদ্ধিজীবী মহলের একটা বিরাট অংশকে স্পর্শ ও উদ্দীপিত করেছিল। তাঁদের সমর্থকদের মধ্যে ছিলেন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ এ. এফ. রহমান, ডঃ মাহমুদ হাসান এবং ডঃ মাহমুদ হোসেন। ডঃ মাহমুদ হোসেন সাম্প্রতিককালে এক প্রবন্ধে 'মুসলিম সাহিত্য-সমাজ' স্থাপনের ইতিহাস বর্ণনা করে বলেছেন :

> ...Kazi Abdul Wadud had a daringly original mode of thinking..Mr. Abul Husain..was a man of will and action. The man of thought and the man of action combined in 1927 to found Dacca Muslim Sahitya Samaj, which came to be regarded as a new school of thought. I was also one of them..We preached through our writings the ideal of emancipation of intellect.
>
> It must be admitted that some young men in their enthusiasm lost balance and aroused the antagonism of the conservative. But it is also a fact that the purging flame of truth did help to destroy a number of social evils. Prejudice against music and over-adherence to the Purdah are cases

in point. There were also some economic and political questions regarding interest, special concessions etc. As a matter of fact a revaluation and a better appreciation of the meaning of revelation and religion were aimed at—not their repudiation. These fundamental questions are by no means new to the world, nor even to the Muslim world. But this was the first time such questions were openly and, perhaps unbiasedly sought to be thrashed out in the Bengali language in the teeth of opposition from the orthodox,—[২]

রেনেসাঁর কয়েকটি বড় লক্ষণ 'সাহিত্য-সমাজে'র মধ্যে বর্তমান ছিল। অন্ধ-অনুবর্তিতা বর্জন, জ্ঞান-পিপাসা, যুক্তিবাদিতা, পৃথিবীর মানস-সম্পদ আহরণ করে জাতির জীবনকে সমৃদ্ধ করা, ললিতকলার চর্চা করে জীবনকে সুন্দর করা, এসবেরই প্রেরণা দেখতে পাই তাঁদের মধ্যে। এই প্রেরণায় তাঁরা অনেক দুঃসাহসিক উক্তি করেছিলেন। চতুর্থ বর্ষের *'শিখা'*য় 'সম্পাদকের কথা' শীর্ষক আলোচনায় সম্পাদক বলেছিলেন ঃ

চিন্তা-রাজ্যের কাপুরুষতা সমাজে যত শীঘ্র দূর হয় এই 'সাহিত্য-সমাজী'গণ তাহাই কামনা করেন। এই সমাজের সভ্যগণ ইহা লইয়া যেন গৌরব করিতে পারেন যে, সস্তায় লোকবরেণ্য হইবার আকাঙ্ক্ষা ইঁহাদের কাহারও নাই।

সে গৌরব 'সাহিত্য-সমাজীরা' করতে পারেন। সাধারণ গতানুগতিক চিন্তাধারায়ই বাঙালি মুসলিম সমাজ চিরদিন অভ্যস্ত। এই অভ্যাসের বদ্ধ জলাভূমিতে 'সাহিত্য-সমাজ' ছিল উদ্দাম ঝঞ্ঝাঃ অতএব, তরঙ্গ সেদিন অনিবার্যভাবেই জেগেছিল। এককভাবে দু-একটি দুঃসাহসিক উক্তি এ শতাব্দীতে আরও মুসলিম লেখক করেছেন, কিন্তু সমাজ ও জীবন সম্বন্ধে কতকগুলি সুস্পষ্ট সুনির্দিষ্ট ধারণা নিয়ে সংঘবদ্ধভাবে নিষ্ঠার সঙ্গে দুঃসাহসিক চিন্তা সাহিত্য-সমাজের লেখকেরাই করেছেন। এই কারণে বাঙালি মুসলমানের চিন্তাধারার ইতিহাসে তাঁদের জন্য একটা বিশেষ স্থান নির্দিষ্ট হয়ে থাকবে।

[সংক্ষেপিত]

২ The Cultural Life of old Dacca : *Pakistan Quarterly*, Vol. VII, No. 1, Spring 1957.

উৎস : আবদুল হক *প্রবন্ধ সংগ্রহ*, ঢাকা।

কল্লোলের কাল

প্রেমেন্দ্র মিত্র

এখন মনে হয় ঘরটার কেউ যদি ছবি তুলে রাখত!

তোলা যেত কি?

তা যেত। দু-দিকের দরজা থেকে দুটো ছবি তুলে অবশ্য সে দুটো জুড়ে মেলাতে হত।

তাতেও ঘরটার সঠিক চেহারা পাওয়া কঠিন ছিল। চেহারা যদি-বা হয় চরিত্র নিশ্চয়ই নয়।

মেপে কখনও দেখিনি। তবে রাস্তা থেকে ক-ধাপ সিঁড়ি দিয়ে উঠে ছোটো সরু রকটার পর যে মাঝারি মাপের বাইরের দরজা তা দিয়ে ঢুকে যে ঘরটা পাওয়া যেত তা লম্বায় হাত-আষ্টেক আর চওড়ায় হাত-পাঁচেকের বেশি নিশ্চয়ই হবে না। বাইরের দরজা দিয়ে ঢুকলে বাঁয়ে দেখা যেত একটা শতরঞ্চ ঢাকা চৌকি আর ডাইনে পুব-দক্ষিণ কোণে একটা ছোটো পুরানো সেক্রেটারিয়েট টেবিল। আসবাবপত্রের মধ্যে এই দুটি ছাড়া সেক্রেটারিয়েট টেবিলের ওধারে একটা বই-এর তাকই প্রধান। এছাড়া চেয়ার টুল ইত্যাদি ওই জায়গায় যেমন কুলোয়। বাইরের দরজার সামনাসামনি ভিতরে যাবার দরজা। তাতে একটা সাধারণ পর্দা টাঙানো।

ফটো তুলে এই ঘরটুকুর আসল পরিচয় কিছুই পাওয়া যেত না ঠিক, তবু আমাদের স্মৃতিকে সাহায্য করবার জন্যে সেরকম ছবির অভাব মাঝে মাঝে খুবই অনুভব করি।

ঘরবাড়ি আসবাবপত্র তো জড় পদার্থ, কাগজও তাই। কিন্তু এই ঘরটুকু আর সেখান থেকে বার করা একটি পত্রিকা বাংলা সাহিত্যের একটি অধ্যায় যে বিশেষভাবে অধিকার করে আছে শত্রু মিত্র কেউ বোধ হয় তা অস্বীকার করবেন না।

কল্পনাটা হঠাৎ মাথায় এসেছিল।

বন্ধুবর কবি অজিত দত্ত তখন প্রতি বছর *দিগন্ত* নামে একটি বার্ষিকী বের করতেন। সে বার্ষিকীতে সাধারণ গল্প উপন্যাস ছাড়া আর বিশেষ কী দেওয়া যায় আলোচনা করতে করতে একদিন হঠাৎ কথাটা মাথায় এল।

সেই কল্লোলের সময়ের কথা লিখলে কেমন হয়?— বললাম অজিতকে— সেই সময়কার স্মৃতি ধরে রাখার একটা দরকারও আছে।

দু-জনের আলোচনায় *কল্লোল* কাগজটি ঘিরে সেই সময়কার একটা স্মৃতিকথা লেখার কথা ঠিক হল। সময় যা বয়ে চলে যায় তা আর ফেরে না, কিন্তু তার স্মৃতি চিরকালের মতো অক্ষরবন্দি করে ধরে রাখা যায়। বিদেশে এই ধরনের বহু স্মৃতিকথা সাহিত্য শুধু নয়, জনজীবনের ইতিহাসেরও অমূল্য উপাদান হয়ে আছে।

পরিকল্পনাটা ভালো। কিন্তু লিখবে কে? তুমিই লেখো।— বললে অজিত।

নিজেকে চিনি বলে সায় দিতে পারলাম না তার প্রস্তাবে। বললাম— আমার লেখার জন্য অপেক্ষা করতে হলে তোমার *দিগন্ত* আরও দূর হয় যাবে। এবারের শারদীয়া হয়ে আর বার হবে না।

দু-জনে মিলে শেষপর্যন্ত অত্যন্ত যোগ্য লেখকই খুঁজে পেলাম। ভূপতি চৌধুরী। পেশায় এখন দেশের স্বনামধন্য ইঞ্জিনিয়ার, কিন্তু ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে পড়ার সময় থেকেই *কল্লোল*-এর দলের দলি। বিশ্বকর্মার শাগরেদি যেমন করেছে তেমনই করেছে সরস্বতীর পুজো। ওদিকে ছবি তোলার হাতও চমৎকার।

সেই ভূপতি চৌধুরীই সানন্দে ভার নিলে লেখার। *দিগন্ত* শারদীয়াতে সে লেখা বের হল। নাম '*কল্লোল যুগ*'।

লেখাটা চারদিক থেকেই সমাদৃত হল, দৃষ্টি আকর্ষণ করল অনেকেরই। কিন্তু একটু শুধু আপশোশ! লেখাটা যদি এত ছোটো না হত। কল্লোল যুগ সম্বন্ধে ওইটুকু লেখায় আশ মেটে।

সেই আশই মেটালে অচিন্ত্য। গভীর নিষ্ঠা আর ভালোবাসা দিয়ে কল্লোলের কথা লিখল। তার বই-এর নামও *কল্লোল যুগ*।

কল্লোলের সঙ্গে আমার যোগাযোগের মূল এই অচিন্ত্য। আমার স্কুলের সহপাঠী। কিছু কিছু বিষয়ে আমাদের মিল আর অনেককিছুতে গরমিল। আলসেমি করা, পারলে আজকের কাজ কালকের জন্যে ঠেলে রাখা আমার মজ্জাগত। অচিন্ত্য ঠিক তার উলটো। সে হিসেব করে গুনে গুনে পা ফেলে হাঁটে না, ভিতরে বেগ এলে উত্তাল হতেও জানে, কিন্তু জীবনে তার একটা শাসনশৃঙ্খলার ধারা বজায় থাকে। কিছু অনুরূপ আর কিছু বিপরীত এইসব চরিত্রলক্ষণের জন্যেই আমাদের ছেলেবেলা থেকে বন্ধুত্ব নিজেদের অজান্তেই পাকা হয়ে গেছে।

আমাদের প্রথম প্রকাশিত বইটির কথাই বলি। তখনও ম্যাট্রিকের গন্ডি পার হইনি। দু-জনে মিলে পরামর্শ করে একটা উপন্যাস লিখেছিলাম। এক চ্যাপটার আমি আর-এক চ্যাপটার অচিন্ত্য এইভাবে বইটা শেষ করা।

আমি তো একবার লিখেই খালাস। অচিন্ত্য বইটা কপিই করেছিল অন্তত তিনবার।

কল্লোলের সঙ্গে প্রথম যোগাযোগ কল্লোল অফিসে গিয়ে হয়নি। মধ্য কলকাতার সে আঁকাবাঁকা এবং তখন নিতান্ত অখ্যাত গলির একটি ছোটো দোতলা বাড়ির ঠিকানার পৌঁছোবার আগে আমাদের এই ভবানীপুরের রাস্তাতেই *কল্লোল*কে পেয়েছি। আর সেই দিনই সচেতনভাবে না হোক মনের আগোচরে বুঝেছি যে *কল্লোল* একটি বিশেষ ঠিকানার ছোটো একটা ঘর কী একটা ছাপানো মাসিকপত্র মাত্র নয়, সত্যিকার একটা উত্তাল ঢেউ যা সেদিনকার বাংলার যৌবনের বুকের তলা থেকে উথলে উঠে আরও অনেককিছুর মতো সাহিত্যের জগৎও তোলপাড় করে তুলছে।

কেমন করে সে পথের যোগাযোগ হয়েছিল অচিন্ত্য তার অননুকরণীয় ভঙ্গিতে সে কাহিনি লিখেছে। সে বর্ণনায় নতুন কিছু যোগ করার নেই শুধু একটা কথা আমার নিজের দিক দিয়ে বলবার।

এ পর্যন্ত সাহিত্যের সঙ্গে যা-কিছু সংযোগ আর পরিচয় তা শুধু ছাপানো অক্ষরেরই মাধ্যমে। দু এক জন তখনকার নামি সাহিত্যিককে সভায় সমিতিতে কখনও সখনও দেখেছি বটে কিন্তু সত্যিকার সাক্ষাৎ পরিচয় কারুর সঙ্গেই হয়নি।

ছাপানো হরফের ওপারে সাহিত্যের মানুষও যে কী আশ্চর্য অপরূপ হতে পারে তা আবিষ্কারের বিস্ময় সেই দিন থেকেই শুরু।

সেদিন যে দুটি মানুষকে আবিষ্কার করেছিলাম তাদের এক জন গোকুল নাগ আর-এক জন শৈলজানন্দ। ভিতরে ভিতরে দুজনে এক সুরে বাঁধা একই জাতের মানুষ, কিন্তু বাইরে চেহারায় চরিত্রে একেবারে বিপরীত। গোকুল নাগ চেহারায় যেমন শুষ্ক রুক্ষ কথায় বার্তায় ব্যবহারেও তেমনই নীরস কঠিন একটু উন্নাসিক মনে হয়েছিল। সত্যি কথা বলতে গেলে সেই বয়সে ভ্রান্ত বিচারে প্রথমে গোকুল নাগের প্রতি খুব আকৃষ্ট বোধ করিনি। কিন্তু মুগ্ধ হয়েছি শৈলজানন্দের সঙ্গে পরিচয়ে। চেহারায় সত্যিকার সুপুরুষ যাকে বলে তাই। চোখ মুখ নাক নায়কোচিত তার ওপর আবার মাথায় একরাশ বাবরি চুল, তখনকার রেওয়াজ হিসাবে সেই ছাপটা আরও স্পষ্ট করেছে।

শৈলজানন্দের হৃদয়ের দরজা যেন গোড়া থেকেই খোলা। প্রথম পরিচয়ের পরই একেবারে অন্তরে গিয়ে ঠাঁই পেয়েছি। অন্তরে যেমন, তার তখনকার মেসের বাসাতেও তেমনই। শাঁখারিপাড়া রোডের সে মেসবাড়িও সাহিত্যের ভূগোল ইতিহাসে অবিস্মরণীয় হয়ে থাকা উচিত। সাহিত্যের আধুনিক যুগ যেসব সৃষ্টি দিয়ে শুরু হয়েছে তার মধ্যে প্রধান একটি গল্পের সেইটিই সূতিকাগার।

গল্পটির নাম 'ধ্বংসপথের যাত্রী এরা'। *প্রবাসী*-র পাতায় যেদিন বার হয় সেদিন শৈলজানন্দও যেন তাঁর সাহিত্যসৃষ্টির নতুন এক দিগন্ত উন্মোচন করেছিলেন। তার আগে শৈলজানন্দের কলম থেকে কয়লা কুঠি নিয়ে মধুর সব গল্প বেরিয়েছে। রাঢ়ের আঞ্চলিক চরিত্র ও ভাষা তিনিই প্রথম বাংলা সাহিত্যে আমদানি করে তারাশঙ্করের জন্যে পথ কেটে দিয়েছিলেন, সেসব গল্প মনোরম হলেও এক হিসাবে রোমান্টিক কল্পনারই যেন সাঁওতালি সংস্করণ।

'ধ্বংসপথের যাত্রী এরা'-তে শৈলজানন্দ তাঁর চারি পাশের ব্যর্থ হতাশ দীনদরিদ্র অথচ বিচিত্র চরিত্রের অতি সাধারণ মানুষকে অকৃত্রিম চেহারায় প্রথম সাহিত্যে আমদানি করলেন।

শৈলজানন্দের মেসের বাসা তখন আমাদের নিত্যকার আস্তানা হয়ে উঠেছে। সকালে যদি না হয় তো বিকালে সেখানে মিলবই। সেখানে শৈলজানন্দের সঙ্গে সেই জরাজীর্ণ বাড়িটিতে যাঁরা বাস করেন, তাঁদের সকলের সঙ্গেই অল্পবিস্তর অন্তত মুখের চেনা তখন হয়েছে। শৈলজানন্দের কাছে তাঁদের দু চার জনের বিবরণও যা শুনছি তা এখনও কিছুটা মনে আছে। কিন্তু *প্রবাসী*-র পাতায় শৈলজানন্দের গল্পে যখন তাঁদের আবার দেখলাম তখন মুগ্ধ বিস্ময়ে বুঝলাম নিজেদের চোখে দেখেও তাদের কাউকে ঠিক চিনতেই পারিনি।

চিনলাম শৈলজানন্দের গল্পে অবাক হয়ে। শৈলজানন্দ তাদের ওপর এতটুকু উপরি রং ফলাননি, কিন্তু যার চেয়ে কঠিন আর কিছু নেই সেই অসাধ্য সাধন করেছেন তাঁর গল্পে অতি সাধারণ বলে যাদের জানি তাদের যথার্থ চেহারার অন্তহীন অনাবিষ্কৃত রহস্য উদ্‌ঘাটিত করে।

নির্ভেজাল বাস্তববাদ *কল্লোল*-র অবশ্য কোনোদিনই ছিল না। কিন্তু সাহিত্যে যাদের কোনোদিন দেখা যায়নি, এ রাজ্যে নেহাত সুলভ ভাবালুতার প্রশ্রয়ে ছাড়া যাদের প্রবেশ নিষেধ ছিল, তাদের নির্ভয়ে আমন্ত্রণ করে আনার সাহস ও উৎসাহ *কল্লোল*-এই প্রথম দেখা গিয়েছে। প্রথম বিদ্রোহের উন্মাদনায় মাত্রাবোধ হয়তো লঙ্ঘিত হয়েছে বহু জায়গায়, তবু তার ভিতর দিয়ে দৃষ্টিভঙ্গির যে আমূল পরিবর্তনের সূচনা দেখা গেছে সেটার মধ্যে কোনো ফাঁকি ছিল না।

শৈলজানন্দ যে সময়ে ধ্বংসপথের যাত্রীদের সাহিত্যের রাজ্য ঘুরিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন তার অনেক আগে থেকেই গোকুল নাগ আর-এক দলের সঙ্গে সাহিত্যলোকের পদযাত্রায় বেরিয়েছেন ওই *কল্লোল*-এই। তাঁর 'পথিক' উপন্যাস শুরু হয়েছে *কল্লোল*-এর প্রথম সংখ্যা থেকেই। সে পথিক-দলে যারা আছে তাদের নামধাম আমাদের কাছে নতুন কিছু নয়। তারা আমাদের চেনাজানা মহলেরই মানুষ, কিন্তু তবু সম্পূর্ণ অপরিচিত। নামেধামে যত মিলই থাক মন ও হৃদয়ের জটিলতার পরিচয়ে তাদের মতো মানুষকে সাহিত্যের অভিযানে আগে কখনও দেখা যায়নি।

লেখক ও বন্ধু হিসেবে শৈলজানন্দ যেমন পরিচয়ের সঙ্গেই মন জয় করে নিয়েছিলেন গোকুল নাগকে আবিষ্কার ও উপলব্ধি করতে তেমনই একটু বিলম্ব হয়েছিল তার জন্য যেতে হয়েছিল সেই পটুয়াটোলা লেনের ছোটো দোতালা বাড়িটার নেহাত সংকীর্ণ ঘরটায়। সেখানে ছোটো পুরানো রংচটা সেক্রেটারিয়েট টেবিলটার ওপারে পালিশ-ওঠা টেবিলের কাঠের মতোই যে শুকনো বিবর্ণ মুখের হাড় বের করা মানুষটাকে দ্বিতীয়বার দেখেছিলাম তাকে তখনই পুরোপুরি চিনতে না পারলেও মনে করে রাখবার মতো কিছু বৈশিষ্ট্যের পরিচয় সেদিনই পেয়েছিলাম।

অত্যন্ত কম কথার মানুষ। কিন্তু কথা যা বলেন তার মধ্যে প্রাণের স্নিগ্ধ উত্তাপটুকু অনুভব করতে দেরি হয় না। তাঁর একটি মজার সম্পাদকি চাল সেদিন বেশ উপভোগ করেছিলাম।

নামটি ঠিক মনে নেই। আমাদের মতোই কে এক জন নবীন লেখক কী একটা গল্প আগের দিন বোধ হয় কল্লোলে দিয়ে গিয়েছিলেন। আমরা যখন উপস্থিত সেই সময়েই সে এসেছিল গল্পের পরিণামটা জানতে।

একেবারে নতুন লেখক সে নয়। ইতিপূর্বে তার গল্প *কল্লোল*-এ ছাপা হয়েছে বলেই মনে হয়। অন্য নানা আলাপের মাঝখানে সে গোকুল নাগকে জিজ্ঞাসা করেছিল,— পড়েছেন গল্পটা?

পড়েছি।— বলেছিলেন গোকুল নাগ, তার পর সে গল্প সম্বন্ধে আর কোনো মন্তব্য না করে উপস্থিত সবাইকে উদ্দেশ করে হঠাৎ বলেছিলেন— একটা গল্প শোনো।

টেবিলের ড্রয়ার খুলে একটা চটি পাণ্ডুলিপির গুচ্ছ বের করে এনে তার পর সত্যিই সবটা আমাদের পড়ে শুনিয়েছিলেন গোকুল নাগ।

গল্পটি বেশ ছোটো, পড়তে বেশিক্ষণ লাগেনি, কিন্তু— সত্যিই উপাদেয়। গোকুল নাগ পড়া শেষ করে গল্পটি আবার টেবিলের ড্রয়ারে রেখে দিয়েছিলেন।

উপস্থিত কেউই কোনো মন্তব্য তখন পর্যন্ত করেনি। আগের দিন যে গল্প রেখে গিয়েছিল শুধু সেই লেখকই বলেছিল— আমার গল্পটি নিয়ে যাব গোকুলদা। ওটা এখানে আছে?

আছে— বলে গোকুলদা ড্রয়ার থেকে গল্পটি বের করে প্রসন্ন মুখেই লেখককে ফেরত দিয়ে শুধু বলেছিলেন— আর-একটা এনেছ নাকি?

না আনিনি, আনব।— বলেছিল লেখক স্বাচ্ছন্দ্যের সঙ্গে।

আড্ডা তার পর সহজভাবেই জমেছিল। কোথাও চিড় খায়নি। বড়ো অদ্ভুত লেগেছিল সেদিন গোকুল নাগের এই সহৃদয় সম্পাদনার ধরনটি।

কল্লোল এক সময় আন্তর্জাতিক লেখকসমাজের কল্পনায় দেশবিদেশের তখনকার সমস্ত অসামান্য সাহিত্যিকদের সঙ্গে যোগাযোগ করেছিল। এ শতাব্দীর তৃতীয় দশকের পরাধীন ভারতবর্ষে বাংলা ভাষায় একটি ছোটো দরিদ্র নিঃসম্বল পত্রিকার পক্ষে সেটা দারুণ দুঃসাহস। এ দুঃসাহসের মূলে ছিল সাহিত্যের সর্বজনীনতায় একটা গভীর আস্থা। আর যেখানেই থাক, সাহিত্যে দেশ কাল বা জাতিভেদ

বলে কিছু থাকতে পারে না এই বিশ্বাসেই *কল্লোল* সেদিন বার্নার্ড শ'রম্যা রোলাঁ থেকে হামসুন, গর্কিদের কাছে ভিক্ষুকের মতো নয়, সমকক্ষের মতো প্রীতি বিনিময়ের পত্রালাপ করেছিল। সাড়াও তাতে পেয়েছিল অভূতপূর্ব।

অভূতপূর্ব আর প্রত্যাশা ছাড়ানো সে সাড়া পাওয়ায় একটা কথা আমার অন্তত তখনই মনে হয়েছিল। মনে হয়েছিল বেশ কিছুকাল আগে পড়া রবীন্দ্রনাথের সেই প্রথম ইউরোপ ভ্রমণের বিবরণের একটি বিশেষ অংশের কথা। রবীন্দ্রনাথ সেখানে এক জন সাধারণ দরিদ্র ইংরেজ শিক্ষকের কথা লিখেছেন যাঁর একটা অদ্ভুত মতবাদ ছিল। মতবাদটা এই যে, পৃথিবীর ইতিহাস দেখে মনে হয়, শুধু দেশ-বিশেষের নয়, কাল-বিশেষেরও যেন একটা নিজস্ব ফসল আছে। একই সময়ে কোনোরকম বাইরের যোগাযোগ ছাড়াই পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় মৌলিক চিন্তাভাবনার ক্ষেত্রে একটা আলোড়ন ওঠে নতুন যুগের সূচনার। খ্রিস্টপূর্ব যষ্ঠ শতাব্দীর দৃষ্টান্ত দিতেন সেই শিক্ষক। পৃথিবীর সে একটা উর্বর সময়। কোনোরকম সংযোগ ছাড়াই চিনে কনফুশিয়স, লাওৎসে, ভারতে গৌতম বুদ্ধও গ্রিসে পিথাগোরাস তখন মানুষের সভ্যতা-সংস্কৃতিতে যুগান্তর এনেছিলেন। যুগান্তর আনুক বা না আনুক *কল্লোল*-এর আবির্ভাবের সময়কার একটি ঘটনা এখন লক্ষ করবার মতো। কলকাতার একটা অখ্যাত গলি থেকে অখ্যাত একটি কাগজ বের করে গোকুল নাগ যখন 'পথিক' লিখতে শুরু করেছেন, তখন তাঁর তো বটেই বিদেশি সাহিত্যজগতের সম্পূর্ণ অজ্ঞাত আর-এক জন লেখক প্যারিসের এক গরিব-পাড়ার ঠান্ডা চিলেকোঠায় বসে 'ফিয়েস্তা' বা 'দ্য স্যন অলসো রাইজেস্' লিখছেন। গোকুল নাগ আর হেমিংওয়ে-তে, 'পথিক' আর 'ফিয়েস্তা'য় কোনো মিল নেই। মিল আছে শুধু সময়ের এক আলোড়নের দিক দিয়ে যা নিঃসম্পর্ক হয়েও পূর্ব ও পশ্চিমকে একসঙ্গে সংস্কার-মুক্তির দোলা দিয়েছে। *কল্লোল*-এর মতো অতি সামান্য প্রায় অজানা একটি বিদেশি ভাষার কাগজকে সেদিনকার সাহিত্য-বিশ্ব যে অত সহজে অকুণ্ঠ প্রীতির হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল, সমসাময়িকতার সেই দুর্জ্ঞেয় রহস্যই বোধ হয় তার মূলে ছিল।

কল্লোল-এর সম্পাদক কিন্তু একলা গোকুল নাগ তো নন। আর-এক জনও আছেন। নেপথ্যে নীরব কেউ নয়, সম্পূর্ণ সরব ও সুপ্রকাশ। চেহারায় চরিত্রে গোকুল নাগের সঙ্গে তাঁর বুঝি আগাগোড়াই গরমিল কিন্তু তবু কিছুটা ঘনিষ্ঠতা হবার পরই বুঝেছিলাম যে *কল্লোল*-এর যা-কিছু বেগ ও বল তা গোকুল নাগের সঙ্গে প্রায় তাঁর বিপরীত এই দ্বিতীয় সম্পাদকের সংযোগে।

এই দ্বিতীয় সম্পাদক হলেন দীনেশ দাস। প্রসন্ন মধুর ব্যক্তিত্ব। চেহারায় যেমন সুদর্শন, বেশবাসে তেমনই পরিপাটি। পটুয়াটোলা লেনের ওই ছোটো ঘরে অল্পবিত্তর অদ্যভক্ষ আখখুটে সাহিত্য - পথিকদের দলের চেয়ে তখনকার শৌখিন সমাজেই তাঁকে বুঝি বেশি মানাত।

সত্যি কথা যদি বলতে হয়, তা হলে লেখক হিসাবে দীনেশ দাস এমন কিছু মৌলিকতার পরিচয় কখনও দেননি, গোকুল নাগের মতো সাহিত্যের পথিকৃৎ তাঁকে কোনো দিক দিয়েই বলা যায় না, তবু *কল্লোল*-এর পক্ষে তিনি ছিলেন অপরিহার্য।

গোকুল নাগ *কল্লোল*-এর মূল প্রেরণা জোগাবার জন্য প্রত্যক্ষভাবে বেশিদিন তিনি *কল্লোল*-এ উপস্থিত থাকতে পারেননি। যতদিন তা পেরেছেন সেই সময়েও তাঁর কাছে গিয়ে সবাই পৌঁছোয়নি। যারা পৌঁছোয়নি তারাও কিন্তু *কল্লোল*-এর সঙ্গে একাত্ম হয়েছে। তার কারণ গোকুল নাগ যেখানে প্রেরণা, দীনেশ দাস সেখানে উদার আশ্রয় ও আমন্ত্রণ। *কল্লোল* তো তার লেখকদের অর্থ দিতে পারেনি, এমনকি মানমর্যাদাও নয়, কারণ পরে যাই হোক সেই প্রথম কয়েক বছর *কল্লোল*-এর সঙ্গে সম্পর্কটা তখনকার সভ্য পাড়ায় সুনজরে দেখা হত না।

এসব দিক দিয়ে প্রাপ্তিযোগ কিছু না থাকা সত্ত্বেও *কল্লোল*-এর কেন্দ্রে অচ্ছেদ্য বন্ধনে বাঁধা ছোটো হলেও অবিভাজ্য একটি অন্তরতম দল যে গড়ে উঠেছিল তা শুধু দীনেশ দাসের প্রসন্ন ব্যক্তিত্বের চৌম্বক শক্তিতে।

কল্লোল-এর পরমায়ু সাত বছরের কিছু কম। এই নিতান্ত সংক্ষিপ্ত জীবনে তার লেখকসংখ্যা কিন্তু বড়ো কম নয়। সেখানে রবীন্দ্রনাথ প্রমথ চৌধুরীর লেখা আছে, বিপিন পাল জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা বেরিয়েছে, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরও তাতে লিখেছেন, জগদীশচন্দ্র বসু, অতুলচন্দ্র গুপ্ত, মোহিতলাল মজুমদার, যতীন্দ্র সেনগুপ্তের নামও সে লেখকতালিকায় পাওয়া যাবে। এইসব চিরন্তন জ্যোতিষ্ক বাদে আরও অগণন যাঁদের লেখা *কল্লোল*-এ বেরিয়েছে তাঁরা সবাই নগণ্য অবশ্যই নয়। নজরুল ইসলাম বা শৈলজানন্দের মতো কেউ কেউ তখনই যথেষ্ট বিখ্যাত। বাকিদের অনেকেই সত্যকার প্রতিভার দীপ্তিতে আজ সাহিত্যের আকাশে ভাস্বর হয়ে আছেন।

সূচিপত্রের লেখকসংখ্যা বহু হলেও *কল্লোল*-এর অন্তরতম দলটি কিন্তু খুব ভারী ছিল না। প্রায় গোনাগুনতি কয়েকজনকে নিয়েই তা সম্পূর্ণ ছিল। অন্তরতম দল বলতে একই শপথ নেওয়া, গোপন খাতায় এক সঙ্গে নাম লেখানো কয়েকজন অবশ্যই নয়। এই অন্তরতমদের *কল্লোল*-এর সঙ্গে সম্বন্ধও একই সময়ে হয়নি। কেউ আগে থাকতে ছিলেন কেউ এসেছেন পরে। তাঁদের সকলের মধ্যে নিয়মিত দেখাশোনাও হত এমন নয়। কাউকে প্রায় নিত্যই দেখা যেত *কল্লোল*-এর ঘরটিতে, কেউ আসতেন কালেভদ্রে। কেউ থাকতেন কলকাতায় কেউ-বা সেই পদ্মাপারের ঢাকায়।

সবাই তাঁরা মার্কামারা সাহিত্যিকও নন। *কল্লোল*-এর সূচিপত্রে একবার কী দু-বারের বেশি নাম ছাপা হয়নি, এমন মানুষও তার মধ্যে ছিলেন ও আছেন, আর আছেন এমন কয়েকজন যাঁরা সাহিত্যের সার্থক কলম হাতে নিয়েও শেষপর্যন্ত অন্য পেশায় চলে গেছেন।

সম্পর্ক শুধু লেখার হোক বা না হোক, তেমন কোনো উপলক্ষ হলে সবার আগে যেন অদৃশ্য অশ্রুত সংকেতে সেই অন্তরতম দলের কাছেই ডাক পৌঁছোত। নেহাত অসাধ্য না হলে উপস্থিত তাঁরা হতেন-ই।

এমনই অন্তরতমদের সমাবেশ দেখেছি কাজী নজরুলের হুগলির বাড়িতে তার প্রথম সন্তানের অন্নপ্রাশন উপলক্ষে। *কল্লোল*-এর তখন দ্বিতীয় বছর চলছে। লেখকসূচিতে নামের তালিকা খুব কম দীর্ঘ নয়। কিন্তু নজরুলের নিমন্ত্রণে তার সেই একতলার সেকেলে ধরনের বাড়িতে দুপুর থেকে সারারাত যারা আনন্দের হাট বসিয়েছিল তাদের সংখ্যা কিন্তু বেশি নয়। সম্পাদক দীনেশ দাস ও গোকুল নাগের সঙ্গে পবিত্র গাঙ্গুলী, নৃপেন চট্টোপাধ্যায়, ভূপতি চৌধুরী তো ছিলই। তারা *কল্লোল*-এর জন্মসাথি। শৈলজানন্দও এক হিসেবে তাই। *কল্লোল*-এর প্রথম সংখ্যা থেকে শুধু লিখছে না, এই পত্রিকার সঙ্গে নিজের নিয়তি মিশিয়েছে। এ ছাড়া ছিলেন মুরলীধর বসু আর সুবোধ রায়। সম্পূর্ণ নতুনদের মধ্যে অচিন্ত্য, সুকুমার ভাদুড়ি আর আমি ছাড়া আর কেউ সে দলে ছিল না।

জোড়াসাঁকোর বাড়িতে আধুনিক সাহিত্যের বিচারসভা যেদিন বসেছিল, যতদূর মনে পড়ছে তার দু এক দিন বাদেই সকালবেলা ওই বাড়িতেই *কল্লোল*-এর ডাক পড়েছিল। *কল্লোলে*-এর কাছে সেটা আশাতীত সৌভাগ্য। মনে পড়ে দোতলার পুবদিকের একটি ছোটোখাটো সরু লম্বা ঘরে আমরা ক'জন নিচু ক-টি আসনে এক সারি হয়ে পশ্চিমমুখো হয়ে বসেছিলাম। গরদের ধুতি চাদরে রবীন্দ্রনাথ এসে আমাদের সামনের একটি নিচু আসনে পূর্বমুখো হয়ে বসেছিলেন। সে আসরে শিশিরকুমার ভাদুড়িও একটু পরে এসে উপস্থিত হয়েছিলেন। বসেছিলেন রবীন্দ্রনাথের বাঁ দিকের একটি আসনে দক্ষিণমুখো হয়ে।

রবীন্দ্রনাথের অত কাছে থেকে অতক্ষণ ধরে তাঁকে দেখার সৌভাগ্য তার আগে কখনও হয়নি।

প্রশ্নোত্তরে আলাপের বৈঠক সেটা ছিল না। মনে আছে মুগ্ধ বিহ্বলতায় রবীন্দ্রনাথকে শুধু দেখেছিলাম আর তাঁর কথা শুনেছিলাম। এক নাগাড়ে প্রায় এক ঘণ্টা তিনি সাহিত্য আর তার সাধনার বিষয়ে বলে গিয়েছিলেন। বেশির ভাগ সময়ে তাঁর চক্ষুদুটি মুদ্রিতই ছিল কথা বলার সময়ে। যা বলেছিলেন তা কিন্তু এর আগেকার সাহিত্যসভার ভাষণের জের নয়। ব্যক্তিগতভাবে সকলের পরিচয় তিনি নেননি, কিন্তু *কল্লোল*-কে ধন্য করেছিলেন তাকে সাহিত্যের অভিযানে সহযাত্রীর মর্যাদা দিয়ে।

তাঁর সেদিনের একটি কথা বিশেষভাবে মনে আছে। কথায় কথায় তাঁর নিজের লেখার হাত পাকা করবার কথা বলেছিলেন। ছাপার অক্ষরে প্রকাশের আগে স্লেটে কত কবিতা যে লিখেছেন আর মুছেছেন সে কথা জানিয়ে বলেছিলেন যে, সার্থক কোনো সৃষ্টির পিছনে নিরলস দীর্ঘ সাধনা না থেকে পারে না। হঠাৎ ভুঁইফোঁড় কারুর অসামান্য স্রষ্টা হয়ে ওঠার দৃষ্টান্ত তাই নেই বললেই হয়। সামনে প্রকাশ পাক বা না পাক নীরব নেপথ্য সাধনা সব সাফল্যের পিছনেই থাকে।

সেদিন যাদের কাছে রবীন্দ্রনাথ এসব কথা বলেছিলেন তারা এইটুকু বুঝে কৃতার্থ হয়েছিল যে, তিনি তাদের তখনকার বাজার-দর দিয়ে দাম কষেননি, নিভৃতে সাহিত্যের কথা শোনাবার উপযুক্ত মনে করে ডেকে স্বজাতি বলে বোঝাবার সবচেয়ে বড়ো স্বীকৃতি দিয়েছেন।

স্মৃতির কৌতুক বড়ো অদ্ভুত। কী যে সে ধরে রাখবে আর কী দেবে মুছে তার কোনো ঠিক নেই। রবীন্দ্রনাথের সেদিনকার অনেক দামি দামি কথা মন থেকে হারিয়ে ফেলেছি। কিংবা হয়তো হারায়নি ঠিক। সেসব কথা তাঁর অন্য বহু লেখায় পরে পেয়েছি বলে আলাদা করে আর মনে নেই। কিন্তু একটি অদ্ভুত ব্যাপার আর একটি মজার মন্তব্য মনে এখনও যেন গাঁথা হয়ে আছে।

অদ্ভুত ব্যাপারটা রবীন্দ্রনাথের একটি প্রায় অবিশ্বাস্য বৈশিষ্ট্য। রবীন্দ্রনাথ আমাদের সামনে এসে বসার পর থেকে চোখ কান দুই আমাদের অতিরিক্তভাবে সজাগ। কান যেমন একাগ্র হয়ে শুনছে চোখও দেখছে প্রায় অনিমেষ হয়ে। বিস্ময়কর বৈশিষ্ট্যটি সম্বন্ধে সচেতন হয়েছিলাম বেশ কিছুক্ষণ অর্থাৎ প্রায় ঘণ্টাখানেক কাটবার পর।

হঠাৎ মনে হয়েছিল রবীন্দ্রনাথের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ কি অসাড়? তিনি কি পাথরের মূর্তি যে এতক্ষণের মধ্যে একবারের জন্যেও পা দুটো নাড়াচাড়া করেননি। কথা বলছে তাঁর মুখ, চোখ বেশির ভাগ মুদ্রিত থাকলেও মাঝে মাঝে উন্মীলিত হয়ে এদিকে ওদিকে ফিরছে, কিন্তু শরীরের যে কোনো নড়নচড়ন নেই। প্রায় প্রতি মুহূর্তে শরীরের কিছু না কিছু প্রত্যঙ্গ না নেড়ে যে স্থির থাকতে পারে না, সেই আমার মত চঞ্চল মানুষকে রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিত্বের অতুলনীয় দীপ্তির সঙ্গে এই আশ্চর্য শারীর-সংযমও গভীরভাবে বিস্মিত বিহ্বল করেছিল।

মজার মন্তব্য হিসাবে যা মনে আছে, রবীন্দ্রনাথ সেটি করেছিলেন শিশির ভাদুড়িকে উদ্দেশ করে। বাংলার সিনেমা-শিল্পের তখন শৈশব আর কী। শৌখিন কী পেশাদার কোনো রঙ্গমঞ্চেই সভ্য শিক্ষিত মেয়েদের অভিনয় করাটা প্রায় কল্পনাতীত। তখন যাঁরা নারী-চরিত্রে অভিনয় করতেন তাঁদের অনেকের অভিনয়-ক্ষমতার অভাব অবশ্যই ছিল না কিন্তু ভূমিকানুযায়ী চেহারা ও চালচলনের অসংগতিটা চোখে পড়ত বড়ো বেশি। সেই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ হঠাৎ বলেছিলেন—শেকসপিয়রের আমলে যেমন হত তেমনই ছেলেদের দিয়ে তরুণী চরিত্রের অভিনয়ও তো করাতে পারা যায়।

ভাষাটা অবশ্যই যেমন লিখলাম তা ছিল না, কিন্তু বক্তব্যটা ছিল ওই।

আলোচনাটা তার পর প্রসঙ্গান্তরে চলে গিয়েছিল, শিশির ভাদুড়িও ফিরে গিয়ে নতুন নায়িকা নির্বাচন রীতি প্রবর্তনে অগ্রণী হননি। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে ছেলেদের মেয়েদের ভূমিকার প্রস্তাবটায় শুধু কৌতুকের নয় বিস্ময়ের চমকও লেগেছিল। তখন ঠিক বিশ্লেষণ করে দেখিনি কিন্তু পরে মনে হয়েছে যে রবীন্দ্রনাথের ওই মন্তব্যটুকুতে শিল্প-সাহিত্যের ব্যাপারে তাঁর সংস্কারমুক্তির আভাসটুকুই নিজের অগোচরে সেদিন বোধ হয় চমৎকৃত করে থাকবে।

রবীন্দ্রনাথের কাছে একলা কেউ আমরা সেদিন যাইনি, গিয়েছিল *কল্লোল*। সমবেতভাবে *কল্লোল*-ই ফিরে এসেছিল সঞ্জীবিত হয়ে।

তার মানে কি এই যে *কল্লোল*-এর সমবেত সত্তা ছাড়া আর কিছু ছিল না? কল্লোল বলতে বুঝতে হবে, এক মন এক প্রাণ এক শিল্প-লক্ষ্যের ক'টি মাপাজোখা ছাঁচে ঢালা তরুণ সাহিত্যব্রতী?

মোটেই তা নয়। বরং সম্পূর্ণ তার বিপরীত বলা যায়। এমনকি *কল্লোল*-এর অন্তরতম যাদের বলছি তাদের মধ্যে মিলের চেয়ে গরমিলই বেশি। মিল তাদের মধ্যে শুধু পরস্পরের প্রতি একটা স্বতঃস্ফূর্ত বন্ধুত্বের টানে। ব্যাপারটা বোঝাতে রসায়নের জগৎ থেকেই উপমা টানতে হয়, তাদের প্রত্যেকের মধ্যে কোথায় যেন একটা সহজাত স্বাভাবিক যোজ্যতা মানে 'ভ্যালেন্সি' আছে যা পরস্পরের সান্নিধ্যে এলেই জোট বাঁধিয়ে তাদের এক করে দেয়। কিন্তু যোজ্যতার ধর্মে এক হয়ে মিললেও চেহারায় চরিত্রে শিল্পী-প্রকৃতিতে তারা যে যার নিজস্ব স্বাতন্ত্র্যে একক।

সেদিন রবীন্দ্রনাথের কাছে যারা যৌগ সত্তায় 'কল্লোল' হয়ে গিয়েছিল তাদের কথাই ধরি। যতদূর মনে পড়ছে দীনেশদা অচিন্ত্য নৃপেন শৈলজানন্দ ভূপতি চৌধুরী আর বুদ্ধদেবও সেদিন ওই দলে ছিল। মিল তাদের শুধু কল্লোলপ্রাণতায় আর সবকিছুতে প্রত্যেকের সঙ্গে প্রত্যেকে পৃথক। অচিন্ত্যর সঙ্গে শৈলজানন্দের কী নৃপেনের সঙ্গে বুদ্ধদেবের না মেলে চেহারায় না চরিত্রে, যেমন আলাদা তাদের জীবনধারা তেমন সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র শিল্পীসত্তা। অচিন্ত্য যা লেখে তাকে শৈলজানন্দের বলে ভুল করবার কোনো উপায় নেই। শৈলজানন্দের লেখার ভাষা উপাদান থেকে রচনাশৈলী এমনকি জীবনবোধ, বুদ্ধদেবের থেকে একেবারে ভিন্ন।

তবু তারা সবাই *কল্লোল*-এর। আলাদা হবার জন্যে তারা এক। স্বাতন্ত্র্যের স্ফুরণের প্রেরণাই *কল্লোল*-এর যৌথ সত্তার মিলনগ্রন্থি।

সমবেত হয়ে স্বাতন্ত্র্যের সাধনা করতে চেয়েছে *কল্লোল*। *কল্লোল* বলতে তার চেয়ে স্বল্পায়ু সঙ্গী *কালি-কলম*-কেও একত্র করে বুঝতে হয়। ভিন্ন উৎস কিন্তু শেষপর্যন্ত দুইয়েরই এক মিলিত ধারা। এ দুটি কাগজের সঙ্গে আমরা যারা যুক্ত ছিলাম তারা যেন জ্যোতির্বিদের আকুল দুরাশা নিয়ে প্রতি মাসে পত্রিকাদুটির পাতা উলটেছি। কে জানে— আমাদেরই কার কী আশ্চর্য নতুন লেখা হঠাৎ সেখানে খুঁজে পাব, আবিষ্কার করব অজানা তারকার মতো কোনো নতুন শক্তিধর লেখককে।

এ প্রত্যাশা আমাদের কোনো দিক দিয়েই অপূর্ণ থাকেনি। নিজেদের পরিচিতদেরই নতুন লেখা আশাতীত বৈশিষ্ট্যে উৎকর্ষে কতবার মুগ্ধ বিস্মিত করে দিয়েছে। এমন নতুন লেখকও প্রথম হঠাৎ আবিষ্কার করেছি, বাংলা সাহিত্যে যাদের আসন চিরন্তন। জীবনানন্দ এমনই আবিষ্কার, সরোজকুমার রায়চৌধুরীও তাই।

সকলের সব লেখা যে *কল্লোল কালি-কলম*-এই বেরিয়েছে তা নয়। কিন্তু যেখানেই বের হোক, আমাদের তাতে সমান উৎসাহ উল্লাস। কোথায় বের হচ্ছে তা নিয়ে আমাদের সংকীর্ণতা নেই। লেখক শুধু আমাদের নিজেদের কেউ হলেই হল।

শৈলজানন্দের লেখার সঙ্গে প্রথমে অবশ্য *প্রবাসী*-র পাতায় তার কয়লাকুঠির গল্পমালাতেই পরিচিত হই, কিন্তু তাতেই সব পরিচয় শেষ নয়। শৈলজানন্দ বিস্ময়ের পর বিস্ময় জাগিয়েছে নতুন নতুন লেখায়। কয়লাকুঠির সাঁওতালি কুলিধাওড়ার গল্পে যে পাঠকসমাজকে মুগ্ধ বিস্মিত করেছিল 'ধ্বংসপথের যাত্রী এরা'তে তার কলম সাহিত্যের নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেছে। সেই কলম থেকেই আবার বেরিয়েছে সমাপ্তির মতো তুলনাহীন গল্প 'ষোলো আনা', *মহাযুদ্ধের ইতিহাস*-এর মতো উপন্যাস।

শুধু শৈলজানন্দই নয় সেদিনকার সাহিত্যের আকাশ ঔৎসুক্যে উত্তেজনায় স্পন্দমান রেখেছে আরও অনেকেই। বই কাগজের জগৎটা এখনকার তুলনায় অনেক ছোটো ছিল বলেই হয়তো নতুন কিছুর জন্যে ঔৎসুক্য আর তা হঠাৎ পাওয়ার উত্তেজনা ছিল অত তীব্র। এত কাগজ, এত প্রকাশক, এত তাদের প্রচার আর কথায় কথায় পূজা নববর্ষ সংখ্যার এত ছড়াছড়ি তখন তো ছিল না। তেমন আশ্চর্য কিছু নতুন কিছু বের হলে যথাস্থানে অচিরাৎ সাড়া তুলত।

সেই সাড়া তোলবার স্মৃতি এখনও ম্লান হয়নি। মনে পড়ছে অচিন্ত্যর 'দুইবার রাজা' গল্পটির কথা। সেদিনকার বাসে ট্রামে বাদুড়ঝোলা ভিড় না থাকলেও তরুণদের মধ্যে এ গল্প নিয়ে উত্তেজিত আলোচনা শুনেছি। তার পর তার 'অমাবস্যা'র সেই অবিস্মরণীয় কবিতাগুলি। মনে আছে 'যুবনাশ্ব' ছদ্মনামে মণীশ ঘটকের গল্প 'মৃত্যুঞ্জয়'। প্রথম প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই যা সচকিত করে তুলেছিল। বুদ্ধদেব বসুর প্রথম গল্প *কল্লোল*-এ ছাপা হয়ে একদিকে বিস্মিত কৌতূহলের সঙ্গে অন্য দিকে বিরূপ সমালোচনার ঝড় তুলেছিল। কিন্তু সজাগ পাঠক *কল্লোল*-এর পাতায় তার আগেই বুদ্ধদেবকে আর-একটি লেখায় অন্যভাবে আবিষ্কার করেছে। গল্প কবিতা নয় বুদ্ধদেবের লেখা সেটি প্রবন্ধ। প্রবন্ধ সুকুমার রায়-এর ওপর। সত্যি কথা বলতে গেলে সুকুমার রায়কে অনাদর অবহেলার চোরকুঠুরি থেকে উদ্ধার করে তাঁকে যথোচিত মর্যাদায় সাহিত্যে প্রতিষ্ঠিত করার ব্যাপারে বুদ্ধদেবের সেই প্রবন্ধটিই পথ দেখিয়েছে বলে স্মরণীয়। বুদ্ধদেবের 'বন্দীর বন্দনা'র কবিতা তার পর থেকেই বের হতে থাকে, আর তার কিছু পরে তার 'রেখাচিত্র'-এর গল্পগুলি। শিবরাম চক্রবর্তীর 'চাকার নিচে' আর 'যখন তারা কথা বলবে' নাটিকাদুটি সেই সময়েরই যুগান্তসূচক বিস্ময়। বিস্ময় উত্তেজনার খোরাক যা থেকে মিলেছে তার কতকগুলির বেলায় লেখার নয় লেখকের নামই মনে আছে। সেসব লেখক সবাই যে ভবিষ্যতে স্বনামধন্য হয়েছেন এমন নয়, কেউ যথেষ্ট শক্তির পরিচয় দিয়েও সাহিত্যে একনিষ্ঠ থাকতে পারেননি, কাউকে বা জীবন থেকেই অকালে বিদায় নিয়ে যেতে হয়েছে। কারুর কারুর বেলা সাহিত্য-বোধের ত্রুটিতেই আমরা অত্যন্ত লজ্জাকরভাবে উদাসীন।

এঁদের মধ্যে হেম বাগচির কথা মনে পড়ছে। তাঁর কবিতার মৃদু রেশটি এখনও যেন কানে লেগে আছে। মনে পড়ছে সুধীরকুমার চৌধুরীর নাম— পরের যুগের কবিতার প্রথম পদপাত যার মধ্যে দেখা গিয়েছিল বলে আমার ধারণা। সুধীরকুমার চৌধুরী আর হেম বাগচি তবু পরিচিত নাম, কিন্তু ক'জন মনে রেখেছে বর্তমানে স্বনামধন্য ইঞ্জিনিয়ার ভূপতি চৌধুরীর অন্তরালে *কল্লোল*-এর সে যুগের সম্ভাবনাময় লেখককে। অজিত দত্তের মতো অনন্য কবি কল্লোলে প্রথম প্রকাশের সময়

থেকে আজ অবধি সমান দীপ্ত, কিন্তু সুকুমার সরকার আমাদের কয়েকজনের স্মৃতিতে ছাড়া কোথাও একটু চিহ্নও বুঝি রেখে যেতে পারেনি।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় সাহিত্যের যে পাড়াতে গিয়েই বাসা বেঁধে থাকুক, *কল্লোল*-ই প্রথম একটি গল্পের স্ফুলিঙ্গে তার মধ্যে ভবিষ্যতের বিরাট সম্ভাবনা দেখেছিল। সাহিত্যে প্রথম স্বাগত সম্ভাষণ সে পেয়েছিল *কল্লোল* থেকেই। ওই মতই উজ্জ্বল সম্ভাবনার প্রমাণ দেখালেও সুকুমার ভাদুড়ি আর বিজয় সেনগুপ্তের জীবনের দীপই অকালে নিভে গিয়েছে। *কল্লোল*-এ গোড়া থেকে যাঁরা লিখতেন তাঁদের মধ্যে শ্রীপ্রবোধকুমার সান্যালের কেদার-বদরি ভ্রমণের একটি কাহিনি পরে বিশেষ জনপ্রিয় হয়েছিল।

নাম শুধু ওই কটিই নয় আরও আছে। *কল্লোল কালি-কলম*-এর লেখক-সূচিতে যাদের নাম পাওয়া যাবে তারা সকলেই সাহিত্যের এক-একটি যুগান্তকারী প্রতিভার স্ফুলিঙ্গ অবশ্যই নয়। সব-কিছুতে যেমন সেখানেও তেমনই আসলের সঙ্গে নকল, খাঁটির সঙ্গে ভেজালও কিছু ছিল। কিন্তু *কল্লোল*-এর কিংবদন্তি যা থেকে গড়ে উঠেছে সেই অলক্ষ্য প্রবাহে খ্যাতিমানদের সঙ্গে প্রায় অজ্ঞাত, ভাস্বরদের সঙ্গে ক্ষণেকের জন্যে ঝিলিক দেওয়া একান্ত নশ্বরদের দান কিছু কম ছিল না। ভাস্বর নশ্বর মিলিয়ে *কল্লোল*-এর স্মৃতিতে গভীরভাবে যা দাগ কেটে গেছে এমন কত নামই মনে পড়ছে। পরিমল গোস্বামী, বিষ্ণু দে, নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়, অমরেন্দ্র ঘোষ, অমলেন্দু বসু, কিরণকুমার রায়, জগদীশ গুপ্ত, জসিমউদ্দিন, পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়, বিশ্বপতি চৌধুরী, ভবানী মুখোপাধ্যায়, মুরলীধর বসু, সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, সুবোধ রায়, হেমেন্দ্রলাল ও হেমেন্দ্রকুমার রায়, এইসব ভাস্বরদের পাশে, শশাঙ্ক চৌধুরী, নীলিমা দেবী, লীলারাণী গঙ্গোপাধ্যায়, জগৎবন্ধু মিত্র, পাঁচুগোপাল মুখোপাধ্যায়, পান্নালাল অধিকারী, অবনীনাথ রায়, ফণীন্দ্র পাল, সুনীল ধর এইসব নশ্বর বা নাতিভাস্বরদের ভোলবার নয়।

কিন্তু *কল্লোল* শুধু তো লেখকদের সৃষ্টি নয়। কোনোদিন *কল্লোল কালি-কলম*-এ দু-কলম লিখুক বা না লিখুক, কল্লোল প্রবাহের প্রাণবেগ যারা জুগিয়ে গেছে তাদের কথাও মনে রাখবার। *কল্লোল*-এর কথা অসম্পূর্ণই থাকবে, যদি সতীপ্রসাদ সেন অর্থাৎ গোরা, হরিহর চন্দ্র, সোমনাথ সাহা, বিভাস রায়চৌধুরী, সুধীন্দ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো মানুষদের কথা ভুলে যাই। গোরা সেনের কোনো লেখা *কল্লোল*-এ বেরিয়েছে কি না মনে করতে পারছি না, কিন্তু সোমনাথ সাহা, হরিহর চন্দ্র তো বটেই সুধীন্দ্রিয়ও *কল্লোল*-এর পাতায় তার স্বাক্ষর রেখেছে। কিন্তু সে লেখার দাম ছাড়িয়ে *কল্লোল*-এর কাছে তাদের অহৈতুক অকৃত্রিম প্রীতিই ছিল অমূল্য।

অহৈতুক প্রীতি যেমন, অকারণ হিংসা বিদ্বেষও *কল্লোল*-কে সহ্য করতে হয়নি এমন নয়। সব বিরূপতাই অকারণও হয়তো ছিল না। *কল্লোল* যাদের প্রাণ ছিল তারাও আজ এমন কথা বোধ হয় ভাবে না বা বলবে না যে *কল্লোল কালি-কলম* বলতে অসামান্য অতুলনীয় আদর্শ পত্রিকা বুঝতে হবে।

আদর্শ নয়, অসামান্য নয়, কী ছিল তবে *কল্লোল?*

ছিল, প্রথম মহাযুদ্ধের পর বস্তু ও ভাবজগতের বিশ্বব্যাপী এক ক্ষুব্ধ শূন্যতা থেকে উথলে ওঠা একটা বিদ্রোহী তরঙ্গ, জীবন ও সভ্যতার সবকিছুর জড়ত্ব আর জীর্ণতা যা পরীক্ষা করার জন্যে দুর্বার।

সাহিত্যে বাংলা ভাষায় সে ঢেউ-এর নাম হয়েছিল *কল্লোল*। *কল্লোল* না হয়ে অন্য নামও তার হতে পারত। নামের অভাবে তা নীরব নিস্পন্দ হয়ে থাকত না।

অনুকূল সমর্থন থাকলেও প্রায় সব সময়েই অত্যন্ত প্রতিকূল পরিবেশের বিরুদ্ধে যে বিশ্বাস ও বোধ নিয়ে *কল্লোল* অগ্রসর হয়েছিল, কৃত্তিবাস ভদ্রের নামাঙ্কিত একটি রচনায় তা এইভাবে পাই— নতুন লেখকেরা নাকি অশ্লীল।

পৃথিবীতে বুদ্ধ খ্রীষ্ট ও চৈতন্যেরা গা ঘেঁষাঘেঁষি করে রাস্তায় চলেন এ কথা তারা না হয় নাইই মানল, মিথ্যা ও পাপকে ধামাচাপা দিলে যে মারা যায় এ কথাও নাকি তারা মানে না!

তাদের পটে নাকি সাধুর মস্তক ঘিরে জ্যোতির্মণ্ডল দেখা যায় না, পাষণ্ডকেও সে পটে নাকি মানুষ বলে ভ্রম হয়! ন্যায়ের অমোঘ দণ্ড নাকি সেখানে আগাগোড়া সমস্ত পরিচ্ছেদ সন্ধান করে শেষ পরিচ্ছেদে অভ্রান্ত ভাবে পাপীর মস্তকে পতিত হয় না।

'নৌকাডুবি'-র লেখক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মতো কমলাকে রমেশের প্রতি স্বাভাবিক স্বতঃস্ফূর্ত প্রেম থেকে অর্থহীন কারণে বিচ্ছিন্ন করে অপরিচিত স্বামীর উদ্দেশ্যে অসম্ভব অভিসারে প্রেরণ না করে 'পথনির্দেশে'র রচয়িতা শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের মত দুটি মিলন ব্যাকুল পরস্পরের সান্নিধ্যে সার্থক হৃদয়কে অপরূপ পথ নির্দেশ না করে তারা নাকি ঋষি রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে নিখিলেশের বিমলাকে আত্মোপলব্ধির স্বাধীনতা দেওয়ার পরম অশ্লীলতাকে সমর্থন করে, সত্যদ্রষ্টা নির্ভীক শরৎচন্দ্রের সঙ্গে অভয়ার জ্যোতির্ময় নারীত্বকে নমস্কার জানায়।

সব চেয়ে তাদের বড় অপরাধ, তারা নাকি সাহিত্যে আভিজাত্য মানে না। মুটে মজুর কুলি খালাসি, দারিদ্র্য বস্তি ইত্যাদি যে সব অস্বস্তিকর সত্যকে সর্দি বাত স্থূলতা ইত্যাদির মতন অনাবশ্যক অথচ আপাত অপরিহার্য বলে জীবনেই কোন রকমে ক্ষমা করা যায়— এবং বড় জোর কবিতায় আলগোছে হা-হুতাশ করে ফেলে নিশ্চিন্ত হওয়া যায়, সাহিত্যের স্বপ্নবিলাসের মধ্যেও এই আধুনিকেরা নাকি তাকে টেনে আনতে চায়।

শুধু তাই! বস্তির অন্তরের জীবনধারাকে তারা প্রায় প্রাসাদের অন্তরালের জীবন ধারার মত সমান পঙ্কিল মনে করে। এমন কি তারা মানে যে প্রাসাদপুষ্ট জীবনের বৈচিত্র্য ও মাধুর্য সময়ে সময়ে বস্তির জীবনকে ছুঁইছুঁই করে।

তারা নাকি আবিষ্কার করেছে যে, পাপী পাপ করে না পাপ করে মানুষ, বা আরো স্পষ্ট করে বললে মানুষের ভগ্নাংশ। মানুষের মনুষ্যত্ব দুনিয়ার সব পাপের পাওনা অনায়াসে চুকিয়েও দেউলে হয় না।

এ আবিষ্কারের দায়িত্বটুকুও নিজেদের ঘাড়ে না নিয়ে তারা নাকি বলে বেড়ায় যে বুদ্ধ খ্রিস্ট শ্রীচৈতন্যের কাছ থেকে তারা এ সব বেমালুম চুরি করেছে মাত্র।

মানুষের একটা দেহ আছে, এই অশ্লীল কিংবদন্তীতে তারা নাকি বিশ্বাস করে এবং তাদের ধারণা নাকি এই যে, এই পরম রহস্যময় অপরূপ দেহে অশ্লীল যদি কিছু থাকে তা তাকে অতিরিক্ত আবরণে অস্বাভাবিক প্রাধান্য দেবার প্রবৃত্তি।—ইতি।

কিন্তু অভিজাত নিষ্কর্মা মানবহিতৈষী সমাজরক্ষক আর্টত্রাতারা থাকতে ইতি হবার জো নেই।

এই সব সুস্থ নীতি-বলে বলীয়ান মানবজাতির স্বনিযুক্ত ত্রাতা ও স্বেচ্ছাসেবকদের সাধু ও ঐকান্তিক অধ্যবসায়ে আমাদের ঘোরতর আস্থা আছে।

মানুষের এই সামান্য তিন-চার হাজার বছরের ইতিহাসেই তাঁদের হিতৈষী হাতের চিহ্ন বহু জায়গায় সুস্পষ্ট।

'কল্লোল ও কালি-কলম' দু'টি ক্ষীণপ্রাণ কাগজের কণ্ঠদলন ত সামান্য কথা। কালে হয়ত পৃথিবীর সমস্ত বিরোধী ও বেসুরো কণ্ঠকেই একেবারে স্তব্ধ করে ধরণীকে শ্লীলতা ও ভব্যতার এমন স্বর্গ তাঁরা করে তুলতে পারেন যে অতি বড় নিন্দুকেরও সাধ্য হবে না রামের জ্যামিতিক জীবন থেকে শ্যামের জ্যামিতিক জীবন বিন্দুমাত্র তফাৎ বলে প্রমাণ করতে এবং মাতা ধরিত্রী এতগুলি ছাঁচে ঢালা সুসন্তান ধারণ করবার পরম আনন্দে রোমাঞ্চিত হয়ে সূর্যের অগ্নি জঠরে পুনঃপ্রবেশ করতে চাইবেন।

তবু মানুষ আসলে সমস্ত শ্লীলতার চেয়ে পবিত্র ও সমস্ত ভব্যতার চেয়ে মহৎ এই যা ভরসা! আজকের দিনেও এ বক্তব্য বাতিল হয়ে গেছে বলে তো মনে হয় না।

বাংলা বিজ্ঞানসাহিত্যের সূচনা— প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের বিভিন্ন দিক

বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য

এদেশে পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা শুরু হবার পূর্বে বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানালোচনা শুরু হয়নি। ১৮১৩ খ্রিস্টাব্দে ব্রিটিশ পার্লামেন্ট এদেশে শিক্ষাপ্রচারের উদ্দেশে বছরে এক লক্ষ টাকা মঞ্জুর করলেন। পার্লামেন্টের উদ্দেশ্য ছিল, সাহিত্যে ও পাশ্চাত্য বিজ্ঞান-শিক্ষায় উৎসাহ দান। কিন্তু হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠিত হবার পূর্বে গভর্নমেন্টের এই উদ্দেশ্য ফলপ্রসূ হয়নি। হিন্দু কলেজে পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা শুরু হবার পর থেকে বাংলা বিজ্ঞানসাহিত্যেরও সূচনা হল। বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে বিজ্ঞানগ্রন্থ রচনার সূত্রপাত হয়েছিল প্রধানত তিনটি প্রতিষ্ঠানকে কেন্দ্র করে। প্রতিষ্ঠান তিনটির নাম শ্রীরামপুর মিশন, হিন্দু কলেজ ও কলিকাতা স্কুল বুক সোসাইটি। বাংলা বিজ্ঞানসাহিত্যে শ্রীরামপুর মিশনের উল্লেখযোগ্য অবদান *দিগদর্শন* (এপ্রিল, ১৮১৮) পত্রিকা প্রকাশ। বঙ্গভাষায় মুদ্রিত এই প্রথম সাময়িকপত্রে বৈজ্ঞানিক নিবন্ধ নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হত। এ ছাড়া শ্রীরামপুরের মিশনারিরা বিভিন্ন বিজ্ঞানগ্রন্থের রচনা, প্রকাশন ও ছাপার কাজে নানাভাবে সাহায্য করেছেন। তবে এদেশে পাশ্চাত্য জ্ঞানবিজ্ঞানের চর্চা শুরু হবার পর থেকেই বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান আলোচনার সূত্রপাত হয়েছিল। পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা সুপরিকল্পিতভাবে প্রথম আরম্ভ হয় হিন্দু কলেজে। ১৮১৭ খ্রিস্টাব্দের ২০ জানুয়ারি প্রধানত ডেভিড হেয়ারের উদ্যোগে হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। এই প্রতিষ্ঠানে বিজ্ঞান শিক্ষাদানের পরিকল্পনা প্রতিষ্ঠানের উদ্যোক্তাদের মনে গোড়া থেকেই ছিল। হিন্দু কলেজ স্থাপনের অন্যতম উদ্যোক্তা ছিলেন সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি স্যার এডওয়ার্ড হাইড ইস্ট (Sir Edward Hyde East)। তিনি ১৮১৬ খ্রিস্টাব্দের মে মাসে জে. এইচ. হ্যারিংটনের কাছে লিখিত এক চিঠিতে হিন্দু কলেজে যেসকল বিষয় শিক্ষা দেওয়া হবে তার এক পরিকল্পনা পেশ করেছিলেন। ওই পরিকল্পনায় বিজ্ঞানের উল্লেখযোগ্য স্থান ছিল। ওই চিঠিতে তিনি লিখেছিলেন, হিন্দু কলেজে বাংলা, ইংরেজি, হিন্দুস্থানি, পারসি ইত্যাদি ভাষার সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষা দেওয়া হবে ...'arithmetic (this is one of the Hindu Virtues), history, geography, astronomy, mathematics ;' ইত্যাদি। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য, হিন্দু কলেজের নিয়মকানুন প্রণয়নের জন্যে একটি

সাবকমিটি গঠিত হয়েছিল ১৮১৬ খ্রিস্টাব্দে। ওই বৎসরের আগস্ট মাসে প্রদত্ত তাঁদের রিপোর্টের প্রথম নিয়মটিই ছিল, 'The primary object of this Institution is the tuition of the sons of respectable Hindoos, in the English and Indian languages and in the literature and Science of Europe and Asia.'। স্থাপিত হবার অল্পদিনের মধ্যেই এই প্রতিষ্ঠানে নিয়মিতভাবে বিজ্ঞানচর্চা শুরু হল। কয়েক বৎসরের মধ্যে বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার উপযোগী যন্ত্রপাতি আনাবারও ব্যবস্থা করা হল। যন্ত্রপাতি পাঠিয়েছিলেন লন্ডনের ব্রিটিশ ইন্ডিয়া সোসাইটি। এই সোসাইটির প্রেরিত জ্যোতির্বিজ্ঞান, দৃষ্টিবিজ্ঞান, রসায়নবিজ্ঞান ও যন্ত্রবিজ্ঞান-বিষয়ক যন্ত্রপাতি ১৮২৩ খ্রিস্টাব্দের এপ্রিল মাসে কলিকাতায় পৌঁছেছিল। কলিকাতা স্কুল বুক সোসাইটিকে অনুরোধ করা হয়েছিল, এসকল যন্ত্রপাতির সঙ্গে সংগতি রেখে বিজ্ঞান-বিষয়ক বই সরবরাহ করবার জন্যে। এ ব্যাপারে কলিকাতা স্কুল বুক সোসাইটি হিন্দু কলেজকে বরাবরই সাহায্য করেছে। অবশ্য এই বিদ্যায়তনে বিজ্ঞান-শিক্ষাদানের মাধ্যম ছিল ইংরেজি ভাষা। ১৮১৭ থেকে ১৮৩৩ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে এই প্রতিষ্ঠানে সাহিত্য ও গণিত পড়াতেন সুপণ্ডিত টাইটলার, রসায়নবিজ্ঞান পড়াতেন রসসাহেব, আর ডিরোজিয়ো ছিলেন মনস্তত্ত্ব ও ইংরেজি সাহিত্যের অধ্যাপক। পাশ্চাত্য পদ্ধতিতে ইংরেজির মাধ্যমে ইউক্লিডের জ্যামিতি ও বীজগণিত পড়ানো শুরু হয়েছিল ১৮২৮ খ্রিস্টাব্দ থেকে। ইংরেজির মাধ্যমে শিক্ষাদান চললেও পাশ্চাত্য জ্ঞানবিজ্ঞান চর্চার মধ্য দিয়ে এদেশীয় জনসাধারণ ইউরোপীয় জ্ঞানবিজ্ঞানের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে উঠল। মাতৃভাষার মাধ্যমে পাশ্চাত্য জ্ঞানবিজ্ঞান চর্চার স্পৃহাও শিক্ষিত জনগণের মধ্যে বাড়তে লাগল। বঙ্গসাহিত্যে বিজ্ঞান আলোচনায় হিন্দু কলেজের সবচেয়ে বড়ো অবদান এখানেই।

পাশ্চাত্য জ্ঞানবিজ্ঞান পড়াবার ব্যবস্থা করবার জন্যে এদেশীয়দের মধ্যে সর্বপ্রথম উদ্যোগী হয়েছিলেন রাজা রামমোহন রায়। ইংরেজি শিক্ষার সমর্থন জানিয়ে পাশ্চাত্য জ্ঞানবিজ্ঞান আলোচনা শুরু করবার উদ্দেশ্যে ১৮২৩ খ্রিস্টাব্দের শেষভাগে গভর্নর-জেনারেল লর্ড আমহার্স্টের কাছে তিনি যে পত্র লিখেছিলেন তার এক জায়গায় ছিল :

> I beg your Lordship will be pleased to compare the state of science and literature in Europe before the time of Lord Bacon with the progress of knowledge made since he wrote. It will consequently promote a more liberal and enlightened system of instruction embracing Mathematics, Natural Philosophy, Chemistry, Anatomy with other useful sciences which may be accomplished **** by employing a few gentlemen of talent and learning, educated in Europe and providing colleges furnished with necessary books, instruments and other apparatus **** to instruct in those useful sciences in which the natives of Europe have carried to a degree of perfection that has raised them above inhabitants of other parts of the world.

হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠিত হবার অল্পকালের মধ্যেই কলিকাতা ও মফস্সলে কয়েকটি ইংরেজি স্কুল স্থাপিত হয়েছিল। বিভিন্ন স্কুলে উপযুক্ত পাঠ্যপুস্তক সরবরাহ করবার জন্যে প্রতিষ্ঠিত হল কলিকাতা স্কুল বুক সোসাইটি (১৮১৭ খ্রি., ৮ জুলাই)। এই সোসাইটির উদ্যোগে জ্ঞানবিজ্ঞান-বিষয়ক বই নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হতে লাগল। এইভাবে উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকের শেষভাগে এবং তৃতীয় দশকে বাংলা বিজ্ঞানসাহিত্যের ভিত্তি স্থাপিত হল। বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানগ্রন্থ প্রকাশে সর্বপ্রথম উদ্যোগী হলেন কলিকাতা স্কুল বুক সোসাইটি।

১

বাংলা ভাষায় পাশ্চাত্য পদ্ধতিতে লেখা প্রথম অঙ্কবই *মে-গণিত* কলিকাতা স্কুল বুক সোসাইটির উদ্যোগে ১৮১৭ খ্রিস্টাব্দে প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল। গ্রন্থটির লেখক রবার্ট মে ছিলেন চুঁচুড়া অঞ্চলের গভর্নমেন্ট স্কুলসমূহের প্রধান পরিদর্শক। ১৭৮৯ খ্রিস্টাব্দে ইংল্যান্ডের উড্‌ব্রিজ নামক স্থানে মে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা ছিলেন একজন জেলে। মাত্র তিন বৎসর বয়সে রবার্ট মে-র মাতার মৃত্যু হলে তাঁর পিতা পুনরায় বিবাহ করেন। পিতার অবহেলা ও বিমাতার নিষ্ঠুর ব্যবহারে মে-র জীবনে দুঃখ ঘনিয়ে ওঠে। স্কুল-জীবনে দারিদ্র্যের সঙ্গে কঠোর সংগ্রাম করে নিজের অন্নসংস্থান ও পড়ার ব্যবস্থা মে নিজেই করেছিলেন। এদেশে এসে (১৮১২) মে কিছুকাল কলিকাতায় ছিলেন। এর পরে কিছুদিন ধরে তিনি ছোটোদের কাছে ধর্ম ও শিক্ষা প্রচার করলেন। এদেশে সর্বপ্রথম ইংরেজি স্কুল স্থাপনের কৃতিত্ব রবার্ট মে-র। ১৮১৪ খ্রিস্টাব্দে চুঁচুড়ায় ওই স্কুল স্থাপিত হয়েছিল। ১৮১৮ খ্রিস্টাব্দে কলিকাতায় রবার্ট মে-র মৃত্যু হয়।

মে-গণিত-এর বাংলা নাম *অঙ্কপুস্তকং*। মে এদেশীয় স্কুলে প্রবর্তিত অঙ্ক থেকে গ্রন্থটির উপকরণ সংগ্রহ করেন। গ্রন্থরচনার কাজে তাঁকে নানাভাবে সাহায্য করেছিলেন হিন্দু কলেজের ইংরেজি স্কুলের প্রধান শিক্ষক জে. জে. ডি আন্সেল্‌মে (J. J. D Anslme)। *মে-গণিত* জনপ্রিয়তা অর্জন করে। গ্রন্থটির প্রথম সংস্করণ অল্পদিনের মধ্যেই নিঃশেষিত হয়েছিল। সংশোধিত ও পরিবর্ধিত আকারে দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছিল ১৮১৯ খ্রিস্টাব্দে। *মে-গণিত*-এ কয়েকটি ধাঁধা ছাড়া উল্লেখযোগ্য তেমন-কিছু ছিল না। 'পরিভাষা'য় ধাঁধায় ব্যবহৃত সাংকেতিক নামগুলোর অর্থ বলে দেওয়া হয়েছে। অধিকাংশ ধাঁধাই কৌতূহলোদ্দীপক। দু-একটি বেশ দুরূহ। যেমন :

মহীতে বসেছে পক্ষ আহারের তরে।
শঙ্কর কহিল ভুজ যোড় করি শিরে।
বসুর কাছে বাণ বসেছে কৃষ্ণ বড় সুখী।
ঘোড়ার উপর রাম বসেছে বেদে সমুদ্র দেখি।
রসের কাছে পাখি বসেছে খাবে হেন বাসি।
তার কাছে পঞ্চানন কোলে করি শশী।
অনুপচন্দ্র ভট্ট কহেন শূন কায়স্থের বালা।
সকল চাঁদের মধ্যে রন্ধ্র তবে গাঁথিবে মালা॥

কবিতার মাধ্যমে গণিতকে আকর্ষণীয় করবার চেষ্টা হার্লের *গণিতাঙ্ক* আরও সুস্পষ্ট। *গণিতাঙ্ক* কলিকাতা স্কুল বুক সোসাইটি কর্তৃক ১৮১৯ খ্রিস্টাব্দে প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল। জন হার্লে ১৮১৬ খ্রিস্টাব্দে চুঁচুড়ায় ধর্মযাজকের কাজ শুরু করেছিলেন। প্রথমে লন্ডন মিশনারি সোসাইটির সঙ্গে তিনি সংশ্লিষ্ট ছিলেন। ১৮২১ খ্রিস্টাব্দে হার্লে লন্ডন মিশন ত্যাগ করেন। এদেশীয় লোকদের সম্পর্কে তাঁর ছিল প্রচুর অভিজ্ঞতা। সেই অভিজ্ঞতার নিদর্শন তাঁর গ্রন্থেও সুস্পষ্ট। শুভংকরের আর্যা থেকে শুরু করে এদেশীয় হিসাব-পদ্ধতির অনেক-কিছুই তাঁর গ্রন্থে স্থান পেয়েছে। তবে *গণিতাঙ্ক*-এর সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য বিষয় হল, জায়গায় জায়গায় কবিতার মাধ্যমে গাণিতিক সমস্যার অবতারণা এবং কবিতাতেই সেই সমস্যার সমাধান। একটি সমস্যা ও তার সমাধানের নমুনা :

রাজা বলে শুন পাত্র আমার উত্তর,
স্বর্ণ কিনি চারি ভরি আনহ সত্বর;

পাইয়া রাজার আজ্ঞা স্বর্ণ আনি দিল,
চারি দরে চারি ভরি খরিদ করিল;
পঞ্চদশ চতুর্দ্দশ ত্রয়োদশ দরে,
কিনিলেক তিন ভরি করিয়া সাদরে;
শেষে এক ভরি স্বর্ণ আনি যোগাইল,
দ্বাদশ মুদ্রায় তাহা খরিদ করিল;
শুনিয়া স্বর্ণের দর নৃপতি বুঝিল,
হাপর করিয়া স্বর্ণ জ্বালে চড়াইল;
চারি ভরি স্বর্ণ গলি মিশ্রিত হইল,
ওজন করিয়া দেখে দুআনা কমিল;
কোন স্বর্ণের কত গেল লেখা করি আন,
রাজা বলে পাত্র তুমি যদি লেখা জান।

পাত্র কহে শুন নৃপ মোর নিবেদন,
ষোল তঙ্কা দর ভরি জানে জগজ্জন;
পঞ্চদশের এক মুদ্রা ধরিতে হইবে,
চতুর্দ্দশের দুই মুদ্রা তাহাতে মিশাবে;
ত্রয়োদশের নেত্র মুদ্রা তাহে যুক্ত করি,
দ্বাদশের চতুর্থ মুদ্রা লইবেক ধরি;
একুন করিয়া বুঝ দিক মুদ্রা হবে,
দুই আনা কমি স্বর্ণ তাহাতে হরিবে;
টাকা প্রতি যত পড়ে হরিয়া বুঝিবে,
প্রথম ভরির কমি সেই সে জানিবে;
এই নিয়মানুসারে বুঝহ রাজন,
পরম্ পণ্ডিত তুমি সুবুদ্ধি রতন।

এদেশীয়দের মধ্যে গণিত রচনায় সর্বপ্রথম উদ্যোগী হলেন হলধর সেন। তাঁর *বাংলা অঙ্কপুস্তক*-এর (প্র.প্র. ১২৪৬ বঙ্গাব্দ) বিষয়বস্তু বিভিন্ন ইংরেজি গ্রন্থ থেকে সংগৃহীত হয়েছিল। গ্রন্থটি বিদ্যালয়ের ইংরেজি ভাষায় অনভিজ্ঞ ছাত্রদের জন্যে এবং সওদাগরদের কাজকর্মের সুবিধার জন্যে রচিত হয়। ইংল্যান্ডীয় মুদ্রা ও ওজনের সঙ্গে এদেশীয় মুদ্রা ও ওজনের কী সম্বন্ধ এই গ্রন্থে তা দেখানো হয়েছে। আলোচনার ভঙ্গি অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত প্রকৃতির।

এই সময়েই হিন্দু কলেজ থেকে প্রকাশিত হয়েছিল *শিশুসেবধি-গণিতাঙ্ক*— ১ম ভাগ (প্র. প্র. ১২৪৬ বঙ্গাব্দ)। গ্রন্থটির বিষয়বস্তু হার্লে, মে প্রভৃতির অঙ্কবই থেকে সংগৃহীত হয়েছিল। তবে উপরোক্ত গ্রন্থগুলোর তুলনায় *শিশুসেবধি*-র বিষয়বস্তু একেবারেই প্রাথমিক প্রকৃতির।

এই যুগের একটি জনপ্রিয় গ্রন্থ উইলিয়ম ইয়েট্স্-অনুবাদিত ফার্গুসনের *জ্যোতির্বিদ্যা (An easy introduction to Astronomy for young persons)*। বাংলা সাহিত্যে পাশ্চাত্য পদ্ধতিতে

জ্যোতির্বিজ্ঞানের বিস্তৃত আলোচনা এই গ্রন্থেই প্রথম পাওয়া গেল। জন ক্লার্ক মার্শম্যানের *জ্যোতিষ ও গোলাধ্যায়* (২য় সংস্করণ— ১৮১৯ খ্রি.) এবং পিয়ার্সনের ভূগোল ও জ্যোতিষ ইত্যাদি বিষয়ক কথোপকথনে (প্র.প্র. ১৮২৪ খ্রি.) জ্যোতির্বিজ্ঞান-বিষয়ক আলোচনা নগণ্য। জ্যোতির্বিদ্যা কলিকাতা স্কুল বুক সোসাইটি থেকে ১৮৩৩ খ্রিস্টাব্দে প্রথম প্রকাশিত হয়। গ্রন্থটির বিষয়বস্তু সংকলন করেছিলেন জেম্স্ ফার্গুসন; সংশোধন করেছিলেন ডেভিড ব্রুস্টার। জ্যোতির্বিদ্যার সংকলক এবং অনুবাদক ইউরোপীয়। তবে অনুবাদের পরিকল্পনা প্রথমে এদেশীয়রাই করেছিলেন। সমগ্র গ্রন্থটি বাংলায় অনুবাদের একটি ইতিহাস আছে। প্রথমে ফার্গুসনের *'ইনট্রোডাক্শান টু অ্যাস্ট্রোনমি'* বইটি বাংলায় অনুবাদ করতে শুরু করেন বীর্যমোহন দত্ত, মহেশচন্দ্র পালিত ও হরচন্দ্র পালিত। এই কাজে স্কুল বুক সোসাইটির সহযোগিতা প্রার্থনা করে সোসাইটির ভারতীয় সম্পাদক তারিণীচরণ মিত্রের কাছে এঁরা এক পত্র লেখেন। পত্রের সঙ্গে অনুবাদের খানিকটা অংশও পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল। স্কুল বুক সোসাইটি উপরোক্ত লেখকত্রয়ের অনুবাদ ছাপবার মনস্থ করেন। ছাপার কাজও অচিরেই শুরু হয় (১৮১৯ খ্রি.)। কিন্তু কতকগুলি সাংকেতিক নামের সংশোধন আবশ্যক মনে করে এবং অনুবাদের কিছু অংশ ত্রুটিপূর্ণ বিবেচিত হওয়ায় ১৮২০ খ্রিস্টাব্দে ছাপার কাজ হঠাৎ বন্ধ হয়ে যায়। রামমোহন রায় এবং স্কুল বুক সোসাইটির সভ্য মি. গর্ডন অনুবাদটি সংশোধনের দায়িত্ব নিয়েছিলেন। কিছুকাল পরে ডা. ব্রুস্টার সংশোধনের কাজে হাত দিলেন। রাধাকান্ত দেব এবং উইলিয়ম ইয়েট্স অনুবাদের কাজে সাহায্য করলেন। অনুবাদের দায়িত্ব শেষপর্যন্ত নিলেন উইলিয়ম ইয়েট্স্। অবশেষে ইয়েট্স কর্তৃক অনুবাদিত হয়ে ফার্গুসনের *জ্যোতির্বিদ্যা* ১৮৩৩ খ্রিস্টাব্দে প্রথম প্রকাশিত হল। যেসকল ইউরোপীয় লেখক বাংলায় বিজ্ঞানগ্রন্থ রচনা করেছেন, তাঁদের মধ্যে ইয়েট্স-এর ভাষাই সবচেয়ে বেশি প্রাঞ্জল ও ঝরঝরে। এই লেখকের আর-একটি বিজ্ঞানগ্রন্থ *পদার্থবিদ্যাসার* (প্র.প্র. ১৮২৪ খ্রি.) তৎকালীন যুগে জনপ্রিয়তা অর্জন করে। বস্তুত, বাংলা বিজ্ঞানসাহিত্যের গোড়াপত্তন করেছিলেন যাঁরা তাদের মধ্যে ইয়েট্স অন্যতম।

১৭৯২ খ্রিস্টাব্দে ইংল্যান্ডের লিসেস্টারশায়ারে ইয়েট্স-এর জন্ম হয়। বাল্যকালে তিনি স্থানীয় স্কুলে শিক্ষা লাভ করেছিলেন। ১৮১২ খ্রিস্টাব্দে তিনি ব্রিস্টল কলেজে অধ্যয়ন শুরু করেন। ইয়েট্স কলিকাতায় এলেন ১৮১৫ খ্রিস্টাব্দে। কলিকাতায় এসে তিনি লোসন, পিয়ার্স প্রভৃতিকে সহকর্মী হিসাবে পেলেন। ইয়েট্স ১৮১৯ খ্রিস্টাব্দে কলিকাতা স্কুল বুক সোসাইটির সম্পাদক এবং ১৮২৩ খ্রিস্টাব্দে হিন্দু কলেজের পরিদর্শক নিযুক্ত হয়েছিলেন। ১৮২৭ খ্রিস্টাব্দে তিনি আমেরিকা যাত্রা করেন। সেখান থেকে ইংল্যান্ড হয়ে এদেশে ফিরে আসেন ১৮২৯ খ্রিস্টাব্দে। ফিরে আসবার পর তিনি ফার্গুসনের *অ্যাস্ট্রোনমি*-এর বঙ্গানুবাদের কাজ আরম্ভ করে আট মাসের মধ্যে তা শেষ করেন। কিছুকাল পর প্রথমা পত্নী ক্যাথেরিনের মৃত্যু হলে তিনি মিসেস পিয়ার্সের সঙ্গে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হন (১৮৪১ খ্রি.)। স্বদেশে যাবার সময় জাহাজে ইয়েট্স-এর মৃত্যু হয় (১৮৪৫ খ্রি.)। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স ৫২ বৎসর হয়েছিল।

ইয়েটস্-অনুবাদিত জ্যোতির্বিদ্যায় বক্তব্য বিষয় গুরু ও শিষ্যের আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে বর্ণিত। নাম জ্যোতির্বিদ্যা হলেও গ্রন্থটির অর্ধাংশ জুড়ে প্রাকৃতিক ভূগোল। আলোচ্য গ্রন্থে গুরু ও শিষ্যের কথোপকথনের ভাষা অন্যান্য বিদেশি লেখকদের তুলনায় অনেক প্রাঞ্জল। গ্রন্থটি মোট দশ অধ্যায়ে বিভক্ত। দশটি কথোপকথন দশ অধ্যায়ে বিবৃত। বিভিন্ন কথোপকথনে শিষ্য প্রশ্নকর্তা এবং গুরু উত্তরদাতা। প্রথম কথোপকথনে পৃথিবীর আহ্নিক ও বার্ষিক গতি এবং আকার ও পরিমাণের

কথা সংক্ষেপে আলোচিত হয়েছে। দ্বিতীয় কথোপকথনে আকর্ষণ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা। এই অধ্যায়ে গ্রহ, ধূমকেতু ও সূর্য সম্বন্ধে আলোচনা জায়গায় জায়গায় অবশ্য অসম্পূর্ণ; অন্যান্য গ্রহেও লোক আছে, এরূপ ইঙ্গিতও করা হয়েছে। কিন্তু এজন্যে তথ্যপ্রমাণের অবতারণা করা হয়নি। বিভিন্ন গ্রহের দূরত্ব বর্ণনায় কেপলারকে অনুসরণ করা হয়েছে। পরবর্তী অধ্যায়গুলিতে গ্রহদের দূরত্ব ও দীপ্তি, সূর্য থেকে বিভিন্ন গ্রহের দূরত্ব নির্ণয়ের বিবরণ, বিষুবরেখা, দিবা-রাত্রির হ্রাসবৃদ্ধি, ঋতুর পরিবর্তন, জোয়ারভাঁটা, ধ্রুবতারা এবং গ্রহণ নির্ণয়ের উপায় আলোচিত হয়েছে। গ্রন্থটির ভাষা প্রাঞ্জল। মাঝে মাঝে ছোটো ছোটো কাহিনির অবতারণা করায় আলোচ্য বিষয়ের দুরূহতা খানিকটা লাঘব হয়েছে। নানাপ্রকার উপমা দিয়ে বক্তব্য বিষয়কে সহজবোধ্য করার প্রচেষ্টা দেখা যায়। অনুবাদক খ্রিস্টান ধর্মপ্রচারক। ঈশ্বরের প্রতি তাঁর প্রগাঢ় বিশ্বাসের পরিচয় গ্রন্থটির অনেক জায়গাতেই রয়েছে। এই বিশ্বাস কয়েকটি ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক যুক্তিকে আচ্ছন্ন করেছে। তবে জায়গায় জায়গায় আলোচনা বেশ কৌতূহলোদ্দীপক ও তথ্যপূর্ণ। কৌতূহল উদ্রিক্ত করার চেষ্টা করা হয়েছে শিষ্যের প্রশ্নের মধ্য দিয়ে। রচনার নিদর্শন :

শিষ্য। আমি শ্রবণ করিয়াছি যে, পৃথিবীর সমস্ত পার্শ্বেই লোক বসতি করে, অথচ স্ব ২ স্থান হইতে কেহই পড়ে না; ইহা আমি আশ্চর্য জ্ঞান করি। এবং ইহাও শুনিয়াছি, যেখানে নগরপত্তন হয় না সেখানে জাহাজ যাইতে পারে; তবে গুরুত্বপ্রযুক্ত কেন অধোভাগের সমুদ্র হইতে জাহাজ নীচে না পড়ে, বরং জাহাজ ও সমুদ্রের জল এই উভই কেন না পড়ে?

গুরু। যাহাকে আমরা ভার বলি তাহা আকর্ষণশক্তির দ্বারা হয়। পৃথিবী আপন মধ্যভাগে চতুর্দ্দিগস্থ সকল বস্তুর পরমাণুকে সমান রূপে আকর্ষণ করে; অতএব যে বস্তুর মধ্যে বহুতর পরমাণু আছে আকর্ষণশক্তিদ্বারা তাহা গুরুতর ও দৃঢ়তর হয়। এই কারণ তাহারা অতিভারী আমরা বলি। পৃথিবীকে লৌহচূর্ণমধ্যে লুণ্ঠিত এক বৃহত্ গোলাকৃতি চুম্বক প্রস্তরের ন্যায় তুলনা দেওয়া যায়, কেননা চুম্বকপ্রস্তর সকল লৌহচূর্ণকে চারিদিগে সমভাবে এইরূপে আকর্ষণ করে যে, নীচ ভাগ হইতে কিছুই খসিয়া পড়িতে পারে না; বরং সমান স্থান হইতে নিকটস্থ লৌহচূর্ণকে বিশেষ আকর্ষণ করে।

২

পাশ্চাত্য পদ্ধতিতে *বাংলা ভূগোলগ্রন্থ* রচনার সূত্রপাত করেন জন ক্লার্ক মার্শম্যান ও উইলিয়ম হপ্‌কিন্স পিয়ার্স। জন ক্লার্ক মার্শম্যানের জ্যোতিষ ও গোলাধ্যায় শ্রীরামপুর থেকে প্রকাশিত হয়েছিল। গোলাধ্যায়ের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৮১৯ খ্রিস্টাব্দে। আলোচ্য গ্রন্থের লেখক জন ক্লার্ক মার্শম্যান ১৭৯৪ খ্রিস্টাব্দে ইংল্যান্ডে জন্মগ্রহণ করেন। বাংলা বিজ্ঞানসাহিত্যে তাঁর দান উপেক্ষণীয় নয়। পিতা ডা. জশুয়া মার্শম্যানের ন্যায় তিনিও ছিলেন সাহিত্যসেবক। জন ক্লার্ক মার্শম্যান *দিগদর্শন* পত্রিকা প্রকাশ করেন। তা ছাড়া তিনি বেঙ্গল গভর্নমেন্ট গেজেটের সম্পাদক ছিলেন। কেরির মৃত্যুর পর তিনি *সমাচার-দর্পণ* পরিচালনা করেছিলেন। ১৮৭৭ খ্রিস্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হয়।

মার্শম্যানের গ্রন্থে প্রাকৃতিক ভূগোল ও জ্যোতির্বিজ্ঞান সম্বন্ধে আলোচনা অতি সামান্যই আছে। প্রথম দিকের কিছু অংশ ছাড়া সমগ্র গ্রন্থ জুড়ে আছে বিভিন্ন মহাদেশের রাজনৈতিক ভূগোল সম্বন্ধে আলোচনা। এই গ্রন্থের প্রাকৃতিক ভূগোল সম্বন্ধে আলোচনা প্রাথমিক প্রকৃতির। মার্শম্যানের ভাষা নীরস; রচনাভঙ্গি কৃত্রিম। তবে গ্রন্থটিকে তিনি দেশীয় ছাঁচে ঢালবার চেষ্টা করেছেন। সময়

বোঝাতে দণ্ড এবং দূরত্ব বোঝাতে ক্রোশ শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। প্রাচীন জ্যোতিষ গ্রন্থাদির সঙ্গে লেখকের পরিচয় ছিল বলে মনে হয়। গ্রন্থটির নামকরণও করা হয়েছে প্রাচীন গ্রন্থাদির নামের সঙ্গে সংগতি রেখে। প্রাচীন গ্রন্থের মতামতও দু-এক জায়গায় ব্যক্ত করা হয়েছে। যেমন—

পৃথিবীর আকার

> কেহ বলেন যে পৃথিবী চতুষ্কোণা ও কেহ বলেন ত্রিকোণা কিন্তু সূর্য্যসিদ্ধান্ত ও সিদ্ধান্তশিরোমণি প্রভৃতি গ্রন্থেতে কহেন যে পৃথিবী কদম্বপুষ্পর মত গোলাকৃতি। এই প্রকার জ্যোতির্ব্বেত্তাদের কথা আমাদের কথার সহিত মিলে ও প্রমাণসিদ্ধও বটে।

মার্শম্যানের পর বাংলা ভাষায় ভূগোল রচনায় উদ্যোগী হলেন উইলিয়ম হপ্‌কিন্স পিয়ার্স। পিয়ার্সের '*ভূগোলবৃত্তান্ত*' কলিকাতা স্কুল বুক সোসাইটি কর্তৃক ১৮১৯ খ্রিস্টাব্দে প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল। যে কয়েকজন ইউরোপীয়কে কেন্দ্র করে বঙ্গসাহিত্যে বিজ্ঞানালোচনার সূত্রপাত হয়েছিল, তাদের মধ্যে পিয়ার্সের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ১৭৯৪ খ্রিস্টাব্দে ইংল্যান্ডের বার্মিংহামে পিয়ার্সের জন্ম হয়। ইংল্যান্ডে শিক্ষালাভ সমাপ্ত করে ১৮১৭ খ্রিস্টাব্দের ৮ মে শ্রীরামপুর মিশনে যোগ দেবার উদ্দেশ্যে তিনি স্বদেশ ত্যাগ করেন। ভারতবর্ষে পৌঁছেই পিয়ার্স শ্রীরামপুরের ছাপাখানায় মি. ওয়ার্ডের সহকারী হিসাবে কাজে যোগদান করেন। *Calcutta Christian Observer*-এর তিনি ছিলেন অন্যতম সম্পাদক। এই পত্রিকায় তিনি লিখতেনও। এ ছাড়া কলিকাতা স্কুল বুক সোসাইটির সঙ্গে দীর্ঘকাল ধরে তাঁর ছিল নিবিড় সংযোগ। ১৮১৮ খ্রিস্টাব্দে সোসাইটির কিছু সংখ্যক বই মুদ্রণে পিয়ার্স সাহায্য করেন। ইয়েট্‌স্ ইংল্যান্ড গেলে (১৮২৮—১৮২৯) তিনি সোসাইটির সম্পাদক নিযুক্ত হয়েছিলেন। ১৮৩০ খ্রিস্টাব্দে তিনি সোসাইটির অর্থনৈতিক সম্পাদকের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। সুদীর্ঘ ২৩ বৎসর ধরে এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ছিল। কলিকাতা স্কুল বুক সোসাইটির কাজে তাঁর একনিষ্ঠতা সম্বন্ধে সমিতির দ্বাদশ অধিবেশনের সভাপতি স্যার এড্‌ওয়ার্ড রিয়ান (Sir E. Ryan) মন্তব্য করেছিলেন, 'Not one moment did he deviate from the rules of the institution; devoutly pious as he was, he never swerved from them, and always opposed any violation of them.' ১৮৪০ খ্রিস্টাব্দে কলেরা রোগে কলিকাতায় পিয়ার্সের মৃত্যু হয়। মৃত্যুকাল পর্যন্ত তিনি কলিকাতা স্কুল বুক সোসাইটির অর্থনৈতিক সম্পাদক ছিলেন। *ভূগোলবৃত্তান্ত* ছাড়াও বাংলা বিজ্ঞানসাহিত্যে পিয়ার্সের আর-একটি স্মরণীয় অবদান *পশ্বাবলী*— ১ম পর্যায়ের বিভিন্ন সংখ্যাগুলোর বঙ্গানুবাদ। এ ছাড়া বিজ্ঞান-বিষয়ক বই (*Scientific Copy-books*) নকল করিয়ে তিনি বিজ্ঞানের প্রতি এদেশীয় ছাত্রদের অনুরাগ সৃষ্টির চেষ্টা করেছিলেন। *ভূগোলবৃত্তান্ত*-তে অধিকাংশ অংশই এ ধরনের শিক্ষামূলক কপি-বইয়ের আকারে বেরিয়েছিল।

ভূগোলবৃত্তান্ত মোট ছয় ভাগে বিভক্ত। এক থেকে পাঁচ পর্যন্ত প্রতিটি ভাগ বারোটি করে অধ্যায় বা পাঠে বিভক্ত। ষষ্ঠ ভাগের পাঠসংখ্যা পনেরো। প্রতিটি পাঠে তিনটি করে অংশ। প্রথমে বলা হয়েছে মূল বক্তব্য। এর পর 'বালক শিক্ষার্থে প্রশ্নোত্তর' এই শিরোনামা দিয়ে মূল বক্তব্যকে প্রশ্ন ও উত্তরের মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়েছে। সর্বশেষে কঠিন শব্দগুলির অর্থ দেওয়া আছে। *ভূগোলবৃত্তান্ত*-তে জোর দেওয়া হয়েছে রাজনৈতিক ভূগোলের ওপরেই। তবে প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগে প্রাকৃতিক ভূগোল সম্বন্ধে আলোচনা মোটামুটি তথ্যপূর্ণ ও বিস্তারিত। এখানে পৃথিবীর গোলত্ব, পরিমাণ, গতি, মহাদ্বীপ, দ্বীপ, মহাসাগর, হ্রদ ইত্যাদি সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে।

তৃতীয়, পঞ্চম ও ষষ্ঠ ভাগের আলোচ্য বিষয় প্রধানত রাজনৈতিক ভূগোল। চতুর্থ ভাগে মুখ্যত ইতিহাস। *ভূগোলবৃত্তান্ত* অবশ্য উচ্চাঙ্গের গ্রন্থ নয়। গ্রন্থটির ভাষায়ও কৃত্রিমতা রয়েছে।

এই যুগের আর-একটি জনপ্রিয় বিজ্ঞানগ্রন্থ পিয়ার্সনের '*ভূগোল ও জ্যোতিষ ইত্যাদি বিষয়ক কথোপকথন*'। গ্রন্থটি কলিকাতা স্কুল বুক সোসাইটি কর্তৃক ১৮২৪ খ্রিস্টাব্দে প্রথম প্রকাশিত হয়। দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছিল ১৮২৭ খ্রিস্টাব্দে। মার্শম্যানের *গোলাধ্যায়* এবং পিয়ার্সের *ভূগোল* থেকে বিষয়বস্তু নিয়ে এ বইটি রচিত হয়। তবে এ বইয়ের নূতনত্ব হল এই যে, এখানে কথোপকথনের মাধ্যমে বক্তব্য-বিষয়বস্তুর বর্ণনা দেওয়া হয়েছে।

গ্রন্থটির লেখক জন পিয়ার্সন ১৭৯০ খ্রিস্টাব্দে ইংল্যান্ডে জন্মগ্রহণ করেন। লন্ডন মিশনারিতে যোগ দেবার পর তাঁর এ দেশে আসা স্থির হয়। চুঁচুড়া অঞ্চলের স্কুলসমূহে মি. মে-র কাজে সাহায্য করবার জন্যে পিয়ার্সন ১৮১৭ খ্রিস্টাব্দে কলিকাতায় এলেন। তাঁর কর্মস্থল ছিল চুঁচুড়া। সুদীর্ঘ বৎসর ধরে তিনি ওই অঞ্চলে শিক্ষা দান ও ধর্ম প্রচার করেন। ১৮৩১ খ্রিস্টাব্দ থেকে তাঁর স্বাস্থ্য খারাপ হতে থাকে। ওই বৎসরের ৮ নভেম্বর কলিকাতায় পিয়ার্সনের মৃত্যু হয়।

পিয়ার্সনের গ্রন্থে প্রাকৃতিক ভূগোল সম্বন্ধে আলোচনা অতি সামান্যই আছে। বস্তুত লেখক রাজনৈতিক ভূগোলের ওপরেই বেশি জোর দিয়েছেন। সমগ্র গ্রন্থটি মোট ছয় ভাগে বিভক্ত। প্রথম ভাগে পৃথিবীর আকার ও আয়তন এবং জল-স্থল সম্বন্ধে আলোচনা। দ্বিতীয়, তৃতীয় ও পঞ্চম ভাগে রাজনৈতিক ভূগোল। চতুর্থ ভাগে ইতিহাস। ষষ্ঠ ভাগের আলোচ্য বিষয় প্রধানত জ্যোতির্বিজ্ঞান। এই ভাগে সৌরজগৎ, ধূমকেতু, গ্রহণ, তারা, জোয়ারভাটা, উল্কা ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা। এই আলোচনা সংক্ষিপ্ত প্রকৃতির হলেও তথ্যপূর্ণ।

পিয়ার্সনের রচনাভঙ্গি পরিচ্ছন্ন। ভাষা প্রাঞ্জল। ঈশ্বরের প্রতি প্রগাঢ় বিশ্বাসের পরিচয় গ্রন্থটির অনেক জায়গাতেই সুস্পষ্ট। জায়গায় জায়গায় সুন্দর উদাহরণ গ্রন্থটির আর-একটি বৈশিষ্ট্য। রচনার নিদর্শন :

নিত্যানন্দ। ভাল; একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, সাগরের জল যে লোণা ইহাতে কি উপকার হয়?

পরমানন্দ। ইহাতে অনেক ২ উপকার দর্শে, যদি সাগরের জল এমন লোণা না হইত তবে অন্ধ পুষ্করিণীর জলের মত সকল জলই পচিয়া দুর্গন্ধ হইত, আর জলের যত মৎস্য তাহা অতি শীঘ্র মরিয়া যাইত। আর লোণা জলে অধিক ভার সহে; অর্থাৎ লোণা জলেতে একখানি নৌকার ডালি সমান বোঝাই দিলে সে নৌকা স্বচ্ছন্দে চলিতে পারে, কিন্তু মিঠানি জলে তেমন করিয়া লইয়া যাইতে হইলে দশ হাত না যাইতে ২ অমনি হঠাৎ ডুবিয়া পড়ে; কেননা মিঠানি জল তরল এ জন্যে বড় ভার সহিতে পারে না; ইহার এই একটা প্রত্যক্ষ প্রমাণ বলি শুন, যে মিঠানি জলে কোন একটা পক্ষীর ডিম্ব ফেলিয়া দেখ, অমনি শীঘ্র ডুবিয়া যাইবে, আর সেই জলেতে খানিক লবণ মিশাইয়া সেই ডিম্ব ফেলিয়া দেখ, কখন ডুবিবে না, ভাসিবে।

নিত্যানন্দ। ভাল, পৃথিবী মণ্ডলের যে এত ভাগ জল ইহাতেই বা কি উপকার? তাহা আমাকে বুঝাইয়া দেও।

পরমানন্দ। ইহাতে উপকার এই, তাহারি কতক জল সূর্য্যতেজে ঊর্দ্ধে আকৃষ্ট হইয়া মেঘের সৃষ্টি হয়, সেই মেঘ বায়ুতে চালন করিয়া নিয়া নানা স্থানে ফেলে, তাহাতে

সর্ব্ব দেশে বৃষ্টি হয়। আর যখন বাতাসে মেঘ উড়াইয়া লইয়া যায়, তখন পর্ব্বত সকল উচ্চ এই জন্যে মেঘ গিয়া তাহাতে বদ্ধ হয়; সেই নিমিত্তে পর্ব্বতে বৃষ্টি অধিক হয়, ও অধিক শিশির পড়ে। সেই বৃষ্টির জলেতে পর্ব্বত হইতে নদী বাহির হয়, ক্রমেতে নদী সকলের বৃদ্ধি হওয়াতে খাল সকল পূরিয়া উঠে, তাহাতে জীব সকলের উপকারের সীমা নাই। আরও দেখ, সাগরের উপর দিয়া যাতায়াত থাকাতে অশেষ বিশেষে সকল দেশের বৃত্তান্ত জানা যায়, ও তাহাতে নানা বাণিজ্য চলে। এরূপ অনেক প্রকারে লোকদের অনেক ২ উপকার হয়।

পিয়ার্স ও পিয়ার্সনের গ্রন্থদ্বয়ের পরিকল্পনায় সাদৃশ্য রয়েছে। উভয় গ্রন্থকারই প্রাকৃতিক ভূগোল অপেক্ষা রাজনৈতিক ভূগোলের আলোচনার ওপর বেশি জোর দিয়েছেন। তবে পিয়ার্সের গ্রন্থে প্রাকৃতিক ভূগোল সম্বন্ধে আলোচনা অপেক্ষাকৃত বিস্তারিত।

এই যুগে হিন্দু কলেজের উদ্যোগেও ভূগোল রচিত হয়েছিল। *শিশুসেবধি— ভূগোলসূত্র* হিন্দু কলেজের অধ্যক্ষদের আদেশে পাঠশালার ছাত্রদের জন্যে রচিত হয়। *শিশুসেবধি* প্রথম প্রকাশিত হয় ১২৪৭ বঙ্গাব্দে (১৮৪০ খ্রি.)। সংক্ষিপ্ত হলেও এই গ্রন্থে পৃথিবীর প্রাকৃতিক ও রাজনৈতিক ভূগোল সম্বন্ধে একটি সামগ্রিক পরিচয় দেবার চেষ্টা করা হয়েছে। *শিশুসেবধি*-র ভাবা বেশ সরল; তথ্যসমাবেশ একেবারেই প্রাথমিক প্রকৃতির। এ ছাড়া ক্ষেত্রমোহন দত্ত হিন্দু কলেজ পাঠশালার জন্যে একটি ভূগোল (১৮৪০ খ্রি.) লিখেছিলেন।

প্রাকৃতিক ভূগোল বা ভূবিদ্যাকে বিষয়বস্তু করে পূর্ণাঙ্গ বিজ্ঞানগ্রন্থ এই যুগে রচিত হয়নি। কোনো কোনো ভূগোলে জ্যোতির্বিজ্ঞান-বিষয়ক দু-একটি প্রসঙ্গও রয়েছে। তবে এই যুগের সবগুলো ভূগোল-গ্রন্থেই আলোচিত হয়েছে মুখ্যত রাজনৈতিক ভূগোল। এইভাবে রাজনৈতিক ভূগোল আলোচনার সঙ্গে সঙ্গে বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে প্রাকৃতিক ভূগোল ও ভূবিদ্যা-বিষয়ক আলোচনার ভিত্তি স্থাপিত হয়।

৩

বাংলা ভাষায় পাশ্চাত্য পদ্ধতিতে পূর্ণাঙ্গ বিজ্ঞানগ্রন্থ রচনার প্রথম কৃতিত্ব উইলিয়ম কেরির পুত্র ফেলিক্স্ কেরির। ১৭৮৬ খ্রিস্টাব্দে ইংল্যান্ডে ফেলিক্স্ কেরির জন্ম হয়। মাত্র সাত বৎসর বয়সে তিনি পিতার সঙ্গে কলিকাতা এসেছিলেন। এদেশে আসবার কিছুকাল পর থেকে ফেলিক্স্ কেরি বাংলা শিখতে লাগলেন রামরাম বসুর কাছে। ১৮০০ খ্রিস্টাব্দে শ্রীরামপুরের ছাপাখানায় তিনি ওয়ার্ডের সহকারী হিসাবে কাজে যোগদান করেন। ওই বৎসরেই উইলিয়ম কেরি তাঁকে খ্রিস্টধর্মে দীক্ষিত করেন। কিন্তু ধর্মপ্রচারে কোনোদিনই ফেলিক্স্-এর মন বসেনি। ১৮০৭ খ্রিস্টাব্দে ধর্মপ্রচার উপলক্ষ করে তিনি রেঙ্গুন যাত্রা করলেন। বর্মায় গিয়ে ফেলিক্স্ কেরি প্রধানত ভাষা ও সাহিত্য-চর্চায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন। কিছুকাল পর বর্মার রাজা কর্তৃক তিনি রাজদূত নিযুক্ত হন। কিন্তু অল্প কিছুদিনের মধ্যেই বর্মার রাজার সঙ্গে তাঁর বিরোধ উপস্থিত হয়। এজন্যে ফেলিক্স্-এর খামখেয়ালিপনা ও অমিতব্যয়িতাই দায়ী। বর্মা ত্যাগ করে তিনি কিছুকাল ধরে ভারতবর্ষের পূর্ব অঞ্চলের অরণ্যবাসীদের মধ্যে যাযাবরের ন্যায় জীবন যাপন করেন। অবশেষে ওয়ার্ডের চেষ্টায় তিনি শ্রীরামপুরে ফিরে এলেন। এবার তিনি পুরোপুরিভাবে সাহিত্য-চর্চায় আত্মনিয়োগ করলেন। ১৮২২ খ্রিস্টাব্দে শ্রীরামপুরে তাঁর মৃত্যু হয়। ফেলিক্স্ কেরির মৃত্যুর পর ১৮২২ খ্রিস্টাব্দের

ডিসেম্বর সংখ্যা *ফ্রেন্ড অব ইন্ডিয়া*-য় মন্তব্য করা হয়েছিল, 'The death of this individual will be considered as a great loss by those who are labouring in the intellectual and moral cultivation of India.' উপন্যাসের নায়কচরিত্রের মতো বৈচিত্র্যময় জীবনের অধীশ্বর ফেলিক্স্ কেরি। তাঁর জীবন ছিল গতিময়; চিন্তাধারা ছিল চঞ্চল। এই চাঞ্চল্যই তাঁর জীবনকে এক একবার উদ্দাম করে তুলেছে। কখনও তিনি রাজদূত; আবার কখনও তিনি ধর্মযাজক। কখনও তিনি নিবিষ্টচিত্ত সাহিত্যসেবী; আবার কখনও তিনি গহন অরণ্যচারী চঞ্চল যাযাবর। তাঁর জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতাগুলো এজন্যে কিছুটা দায়ী। প্রথমা স্ত্রী মার্গারেটের মৃত্যু, শিশুপুত্র ও কন্যা-সহ নদীগর্ভে দ্বিতীয়া স্ত্রীর সলিলসমাধি এবং বর্মার রাজার সঙ্গে বিরোধ এজন্যে কতক পরিমাণে দায়ী হলেও দুঃসাহসের বীজ ছিল তাঁর রক্তের মধ্যে। *বিদ্যাহারাবলী* রচনার মধ্যেও সেই দুঃসাহসের প্রয়াসই নিহিত। তখনকার যুগে এরূপ এক বিরাট গ্রন্থ রচনায় হাত দিয়ে তিনি যে সাহস ও শক্তিমত্তার পরিচয় দিয়েছিলেন তা ভাবতে গেলে বিস্মিত হতে হয়। গ্রন্থটি কলিকাতা স্কুল বুক সোসাইটি থেকে ১৮২০ খ্রিস্টাব্দে (১২২৭ সাল) প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল। *বিদ্যাহারাবলী*-র বিভিন্ন খণ্ড প্রথমে আলাদাভাবে প্রকাশিত হয়। প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয়েছিল ১৮১৯ খ্রিস্টাব্দের অক্টোবর মাসে। পরে বিভিন্ন খণ্ড (১৬ সংখ্যা) একত্র করে প্রকাশ করা হয়।

বাংলা ভাষায় বিশ্বকোষ বা এন্সাইক্লোপিডিয়া লিখবার পরিকল্পনা নিয়েই ফেলিক্স্ কেরি *বিদ্যাহারাবলী* রচনায় হাত দিয়েছিলেন। সংজ্ঞা ও পরিভাষা ব্যবহারের অসুবিধার জন্যে প্রথমে ব্যবচ্ছেদবিদ্যা (Anatomy) রচিত হয়েছিল। আলোচ্য গ্রন্থটি *বিদ্যাহারাবলী*-র পর্যায়ের প্রথম গ্রন্থ। *বিদ্যাহারাবলী*-ব্যবচ্ছেদবিদ্যার বিষয়বস্তু ফেলিক্স্ কেরি কর্তৃক পঞ্চম সংস্করণ *এন্সাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা* থেকে বাংলায় অনুবাদিত হয়েছিল। অনুবাদে সাহায্য করেছিলেন উইলিয়ম কেরি। পরিভাষার ব্যবহারে ও গ্রন্থরচনায় সাহায্য করেছিলেন যথাক্রমে শ্রীকান্ত বিদ্যালংকার ও কবিচন্দ্র তর্কশিরোমণি। গ্রন্থটি ছাপা হয়েছিল শ্রীরামপুর মিশন প্রেসে। ফেলিক্স্ কেরির ইচ্ছে ছিল, জনসাধারণের সাহায্য ও সহযোগিতা পেলে রসায়নবিদ্যা, ঔষধচিকিৎসাবিদ্যা, অস্ত্রচিকিৎসাবিদ্যা ইত্যাদি সম্বন্ধে ক্রমশ গ্রন্থ প্রকাশ করবার। *বিদ্যাহারাবলী*-র শেষদিকে পাঠকদের উদ্দেশে ফেলিক্স্ কেরির একটি পত্র আছে। ওই পত্রে গ্রন্থরচনার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে তিনি লিখেছেন,

> যাঁহারা বিদ্যাভ্যাসে নূতন প্রবৃত্ত হইয়াছেন তাঁহারা ঐ সাহেবানেরদের এবং এতদ্দেশীয় অন্য ২ ভাগ্যবান এবং বিশিষ্ট লোকেরদিগের আয়োজনদ্বারা এবং গ্রন্থদ্বারা নানা বিদ্যার আদি প্রকরণ জ্ঞাত হইতে পারেন এবং তদ্বিষয়ক জ্ঞানেতে পণ্ডিত হইলে অবশ্য তদ্গ্রন্থের সমস্ত মূলগ্রন্থ জ্ঞানেচ্ছুক হইবেন অতএব তাঁহারদিগের জ্ঞান অধিকরূপে বর্দ্ধিত হয় এতৎপ্রযুক্ত ইউরোপীয় সর্ব্বগ্রাহ্যতাবদায়ুর্ব্বেদশিল্পবিদ্যাদি গ্রন্থাবলী ছাপারম্ভ হইয়াছে। কিন্তু অধিকন্তু যাঁহারা বহুকালাবধি ইউরোপজাতিরদিগের নানা জ্ঞান এবং বিদ্যা দেখিয়া অতি চমৎকৃত হইয়া সে সকল জ্ঞান এবং সে সকল বিদ্যা কিরূপে এবং কিপ্রকার প্রথমতঃ উৎপন্ন হইয়াছে তাহার কিছু নির্ণয় করিতে পারেন নাই অথচ স্বদেশীয় সর্ব্বশাস্ত্রেতে বিজ্ঞ হওনান্তর অন্য ২ ইউরোপজাতীয় বিদ্যাভ্যাসেচ্ছুক হইয়াছেন তাঁহারদিগের জ্ঞানবর্দ্ধনার্থে এবং অঙ্গবঙ্গ কলিঙ্গা-দিদেশেতে ইউরোপীয় তাবদায়ুর্ব্বেদশিল্পবিদ্যাদিবর্দ্ধনার্থে এবং তাবদ্বিষয়ের আদ্যোপান্তকারণজ্ঞাপনার্থে এই বিদ্যাগ্রন্থ সমস্ত ক্রমেতে তর্জ্জমা হইয়া ছাপা হইবে।

বিদ্যাহারাবলী-ব্যবচ্ছেদবিদ্যা-র বিষয়বস্তু দুই অংশে বিভক্ত। এক-একটি অংশের নাম কাণ্ড। প্রথম কাণ্ডের আলোচ্য বিষয় ব্যবচ্ছেদবিদ্যা। দ্বিতীয় কাণ্ডে বিভিন্ন জন্তুর শারীরবিজ্ঞান ও ব্যবচ্ছেদ-প্রক্রিয়া সম্বন্ধে তুলনামূলক আলোচনা। এক-একটি কাণ্ড কয়েকটি করে খণ্ডে বিভক্ত। প্রতি খণ্ডে অধ্যায় বিভাগ রয়েছে। বিভিন্ন অধ্যায় আবার কয়েকটি করে প্রকরণে বিভক্ত। প্রথম কাণ্ডের প্রথম খণ্ডে অস্থিবিদ্যা সম্পর্কে আলোচনা তথ্যবহুল। দ্বিতীয় খণ্ডে চর্ম, নখ ও কেশের বর্ণনার পর শরীরের বিভিন্ন মাংসপেশি সম্বন্ধে আলোচনা। প্রথম কাণ্ডের পরবর্তী খণ্ডগুলিতে উদর, প্লীহা, ফুসফুস, নিশ্বাস-প্রশ্বাস, হৃৎপিণ্ড, মস্তিষ্ক ও বিভিন্ন ইন্দ্রিয় সম্বন্ধে সারগর্ভ ও বিস্তৃত আলোচনা। দ্বিতীয় কাণ্ডের আলোচ্য বিষয় তুলনামূলক ব্যবচ্ছেদবিদ্যা। এই কাণ্ডের ভূমিকায় বিভিন্ন জীবের মধ্যে তুলনা করে ব্যবচ্ছেদবিদ্যা শিক্ষার উপযোগিতা বর্ণিত হয়েছে। পৃথক পৃথক বর্গের জন্তুদের ব্যবচ্ছেদবিদ্যা সম্পর্কে আলোচনা তথ্যপূর্ণ। এই কাণ্ডের বিভিন্ন খণ্ডে জীবের গঠনবৈচিত্র ও স্বভাবের তুলনামূলক আলোচনায় এবং জীবের বর্গবিভাগ সম্বন্ধীয় আলোচনায় সুপরিকল্পনার পরিচয় পাওয়া যায়। কয়েকটি খণ্ডে বিভিন্ন জীবের ব্যবচ্ছেদ-পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা রয়েছে।

বিদ্যাহারাবলী-তে ব্যবহৃত পরিভাষা ও সংজ্ঞায় সংস্কৃতের প্রভাব অত্যন্ত বেশি। অস্থি ও শারীরবিজ্ঞান-বিষয়ক অধিকাংশ শব্দই বিভিন্ন সংস্কৃত কোশগ্রন্থ থেকে সংগৃহীত। সংজ্ঞার গঠনেও অনেক ক্ষেত্রে সরাসরি সংস্কৃতের সাহায্য নেওয়া হয়েছে। সংস্কৃত-প্রভাবিত সংজ্ঞার নমুনা : উদরের সংজ্ঞা— 'ব্যবচ্ছেদকেরা বক্ষোস্থ্যগ্রাবধি গাত্রাংশাধঃ পর্য্যন্ত স্থানের উদর অর্থাৎ অধউদর সংজ্ঞা করিয়াছেন'।

ফেলিক্‌স্‌ কেরির রচনা তথ্যবহুল। অস্থি ও শারীরবিজ্ঞানে লেখকের পাণ্ডিত্যের পরিচয় গ্রন্থের সর্বত্রই সুপরিস্ফুট। কিন্তু ফেলিক্‌স্‌-এর ভাষা দুরূহ ও দুর্বোধ্য। রচনায় তথ্যাদির অভাব নেই। কিন্তু সেই রচনা কোথাও চিত্তাকর্ষক হয়ে ওঠেনি। সন্ধি ও সমাসবহুল ভাষা এবং জটিল প্রকাশভঙ্গি তাঁর রচনাকে দুর্বোধ্য করে তুলেছে। রচনার নিদর্শনস্বরূপ নাড়ি সম্পর্কে আলোচনার একটি অংশ :

> প্রত্যেক রক্তপ্রবাহক নাড়ীর গাত্রাংশ সমান হওন পূর্ব্ব স্থানে শলাকাকার অর্থাৎ তদ্গাত্রাংশের তাবদ্দ্রাঘিমাতে সমমান জানিবেন তদ্ব্যবস্থানুসারে রক্তপ্রবাহক নাড়ীর তাবচ্ছাখা এবং উপশাখা ব্যবস্থিতা। কিন্তু সে যাহা হউক ইহা অনুমান হয় যে রক্তপ্রবাহক নাড়ীর প্রত্যেক গাত্রাংশ তত্তগ্গাত্রাংশ হইতে নির্গত পৃথক ২ সম্মিলিত শাখা হইতে ন্যূন রক্ত ধারণ করে এবং সে সমস্ত শাখা তত্তদুপশাখা হইতে নির্গতা অন্য ক্ষুদ্র ২ শাখা হইতেও ন্যূন রক্ত ধারণ করে। রক্তাবাহক নাড়ীরও ঐ ব্যবস্থা জানিবেন যেহেতুক ঐ রক্তাবাহক নাড়ীর শাখা এবং উপশাখা একত্র করিয়া মাপিলে তত্তদগাত্রাংশ হইতে অতিবৃহৎ হয়।

এই যুগে প্রাণীবিজ্ঞান সম্বন্ধে প্রাথমিক প্রকৃতির আলোচনা পাওয়া যায় লোসন-সংকলিত ও পিয়ার্স-অনুবাদিত *পশ্বাবলী*-তে। গ্রন্থটি কলিকাতা স্কুল বুক সোসাইটি কর্তৃক ১৮২৮ খ্রিস্টাব্দে প্রথম প্রকাশিত হয়। *পশ্বাবলী*-র প্রথম ছয়টি সংখ্যার সংকলন হল এই গ্রন্থটি। সংখ্যাগুলি ইতিপূর্বে মাসিক গ্রন্থ হিসাবে প্রকাশিত হয়েছিল। *পশ্বাবলী*-র সংকলক জন লোসন ১৭৮৭ খ্রিস্টাব্দে ইংল্যান্ডে জন্মগ্রহণ করেন। ১৮১২ খ্রিস্টাব্দে তিনি কলিকাতায় পদার্পণ করেন। এদেশে এসে কিছুকাল নানাবিধ অশান্তিতে কাটাবার পর অবশেষে তিনি ধর্মযাজকের কাজে আত্মনিয়োগ করলেন। তাঁর অবসর সময়ের অনেকটাই শিক্ষাদানে ও বিজ্ঞানচর্চায় ব্যয়িত হত। প্রাকৃতিক ইতিহাস

(Natural History) ছাড়াও ভূতত্ত্ব এবং উদ্ভিদবিজ্ঞানে তাঁর পাণ্ডিত্য ছিল। উদ্ভিদবিজ্ঞানে তিনি মৌলিক গবেষণা করেছিলেন। এ ছাড়া তিনি ছিলেন একজন সুদক্ষ আর্টিস্ট ও সংগীতজ্ঞ। লোসন কিছু-সংখ্যক ইংরেজি কবিতাও লিখেছিলেন। ১৮২৫ খ্রিস্টাব্দের ২২ অক্টোবর মাত্র ৩৮ বৎসর বয়সে তাঁর মৃত্যু হয়।

পশ্বাবলী— ১ম খণ্ড কয়েকটি সংখ্যা বা ভাগে বিভক্ত। প্রতিটি বিভাগ কয়েকটি করে অধ্যায়ের সমষ্টি। প্রথম সংখ্যার আলোচ্য বিষয় 'সিংহের বিবরণ ও শৃগালের বৃত্তান্ত'। প্রথম সংখ্যা— প্রথম অধ্যায়ে সিংহের আকারাদি আলোচনা প্রসঙ্গে সিংহের জন্মস্থান ও বাসস্থান সম্বন্ধেও কিছু কিছু আলোচনা করা হয়েছে। দ্বিতীয় ও তৃতীয় অধ্যায়ে সিংহের শক্তি ও কৃতজ্ঞতার কথা কয়েকটি কাহিনির মাধ্যমে বর্ণিত; কাহিনিগুলির বর্ণনাভঙ্গি সরল। চতুর্থ অধ্যায়ে সিংহের প্রকৃতি আলোচনা প্রসঙ্গেও কাহিনির অবতারণা করা হয়েছে। পঞ্চম অধ্যায়ে সিংহ সম্পর্কে নীতিকথামূলক দুটি উপাখ্যান রয়েছে। প্রতিটি অধ্যায়ের শেষে আছে উপদেশ। শৃগালের বৃত্তান্ত কবিতা দিয়ে শুরু :

প্রতারণাকারী সেই সর্ব্বদা সত্বর।
ইহাতে বঞ্চক নাম বলে কবিবর।।

ভালুকের বিবরণ দুভাগে বিভক্ত। নীললোহিত ও কৃষ্ণবর্ণ আর শুক্লবর্ণ। উপাখ্যান ও উপদেশ এখানেও রয়েছে। তা ছাড়া রয়েছে সত্য ঘটনাশ্রিত কয়েকটি কাহিনি। কাহিনিগুলি গল্পের মতো সুখপাঠ্য। পরবর্তী বিভাগগুলিতে হাতি, গণ্ডার ও জলহস্তী এবং বাঘ ও বিড়াল সম্বন্ধে আলোচনা। এখানেও আলোচনার প্রাণকেন্দ্র গল্পরস। বস্তুত সমগ্র গ্রন্থ জুড়েই গল্পরসের প্রাধান্য। সেই তুলনায় বৈজ্ঞানিক তথ্যের একান্ত অভাব। তবে গ্রন্থটির ভাষা আগাগোড়াই প্রাঞ্জল। ১৮৫২ খ্রিস্টাব্দের জুন মাসে *পশ্বাবলী*-র দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়। পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর গ্রন্থটির তত্ত্বাবধান করেন এবং পণ্ডিত তারাশংকর (তর্করত্ন) বইটি নতুন করে লেখেন।

৪

গণিত, জ্যোতির্বিজ্ঞান, ভূগোল ও জীববিজ্ঞান-বিষয়ক গ্রন্থাদি ছাড়া এ যুগের দু একটি গ্রন্থে প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা পাওয়া গেল। প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের একাধিক দিক নিয়ে আলোচনার সূত্রপাত হয়েছিল জন ক্লার্ক মার্শম্যানের *জ্যোতিষ ও গোলাধ্যায়* নামক গ্রন্থে এবং পিয়ার্সনের *ভূগোল-এ জ্যোতিষ ইত্যাদি বিষয়ক কথোপকথন*-এ। কিন্তু এই প্রয়াস ইয়েট্স্-এর *পদার্থবিদ্যাসার*-এ আরও বিস্তৃত ও সুপরিকল্পিত। তা ছাড়া এই যুগের দু একটি শিশুপাঠ্য গ্রন্থে অপরাপর প্রসঙ্গের সঙ্গে বৈজ্ঞানিক প্রসঙ্গের আলোচনাও পাওয়া যায়।

রাধাকান্ত দেবের *বাঙ্গালা শিক্ষাগ্রন্থ* ১৮২১ খ্রিস্টাব্দে প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল। এই শিশুপাঠ্য গ্রন্থে অন্যান্য প্রসঙ্গের সঙ্গে গণিত ও ভূগোল-বিষয়ক আলোচনাও কিছু কিছু রয়েছে। গণিতের প্রসঙ্গ অকিঞ্চিৎকর। ভূগোল নিয়ে আলোচনাও যৎসামান্য এবং তা পুরাণ-নির্ভর। এই আলোচনায় রয়েছে রাধাকান্তের জীবন-সংস্কৃতিরই ছাপ। ভূগোলের আলোচনায় বৈজ্ঞানিক তথ্যাদির একান্ত অভাব। রাধাকান্তের গদ্যে ছেদচিহ্নের ব্যবহার যথাযথ নয়; কমার ব্যবহার একেবারেই নেই। রাধাকান্তের রচনারীতিও প্রাঞ্জল নয়। ১৮২৭ খ্রিস্টাব্দে এই গ্রন্থটির একটি সংক্ষিপ্ত সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছিল।

বাংলা বিজ্ঞানসাহিত্যে রাধাকান্তের অবদান প্রধানত কলিকাতা স্কুল বুক সোসাইটিকে কেন্দ্র করে। তিনি ছিলেন স্কুল বুক সোসাইটির সভ্য; তা ছাড়া নানাভাবে সোসাইটির সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ছিল। স্কুল বুক সোসাইটি থেকে প্রকাশিত কয়েকটি বই তিনি অনুবাদ এবং সংশোধন করেছিলেন। *Easy Introduction to Astronomy*-বইটির বঙ্গানুবাদ তিনি সংশোধন করেন। স্কুল বুক সোসাইটির বইগুলি এক সময়ে তাঁর বাড়ি থেকেই বিলি করা হত। সোসাইটির বইগুলি জনসাধারণ ও শিক্ষকদের মধ্যে যথোপযুক্তভাবে বিলির ব্যবস্থাও তিনি করেছিলেন।

প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের বিভিন্ন দিক নিয়ে প্রাঞ্জল ও সর্বজনবোধ্য আলোচনা পাওয়া গেল উইলিয়ম ইয়েট্স্-এর *পদার্থবিদ্যাসার*-এ (প্র.প্র. ১৮২৪ খ্রি.)। 'পদার্থবিদ্যাসার, অর্থাৎ বালকদিগের জন্য পদার্থবিদ্যাবিষয়ক কথোপকথন Elements of Natural Philosophy and Natural History.'। গ্রন্থটির প্রকাশক কলিকাতা স্কুল বুক সোসাইটি। *পদার্থবিদ্যাসার*-এর দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছিল ১৮৩৪ খ্রিস্টাব্দে। নাম *পদার্থবিদ্যাসার* হলেও একে পদার্থবিজ্ঞানের অন্তর্গত করা যায় না। কারণ, এই গ্রন্থের আলোচ্য বিষয়বস্তুর মধ্যে রয়েছে প্রধানত জ্যোতির্বিজ্ঞান, ভূগোল ও ভূবিজ্ঞান এবং জীব শারীর ও উদ্ভিদবিজ্ঞান-বিষয়ক প্রসঙ্গ। বরং আজকের দিনে পদার্থবিজ্ঞান বলতে যা বুঝায়, অর্থাৎ জড়ের বিভিন্ন ধর্ম বা তাপ, আলো, শব্দ, বিদ্যুৎ ও তড়িতের প্রসঙ্গ, তা নিয়ে আলোচনা এই গ্রন্থে প্রায় নেই বললেই হয়। সমগ্র গ্রন্থটি গুরু ও শিষ্যের কথোপকথনের মাধ্যমে রচিত। মোট চোদ্দটি কথোপকথন এতে আছে। বিভিন্ন কথোপকথনের আলোচ্য বিষয় গ্রহ, বায়ু, বাষ্প, বৃষ্টি, পৃথিবী, মানুষ, পশুপক্ষী, পতঙ্গ, কৃমি, বৃক্ষ ও পুষ্প, খনিজদ্রব্য ও বিভিন্ন দেশের উৎপন্ন দ্রব্য। দু একটি কথোপকথনে শ্রেণিবিভাগ রয়েছে। যেমন, ৫ম কথোপকথন ; এতে তিনটি ভাগ। প্রথম ভাগে মানবশরীরের বহিরঙ্গ নিয়ে আলোচনা, দ্বিতীয় ভাগে শরীরের অভ্যন্তরস্থ যন্ত্রাদি। তৃতীয় ভাগের আলোচ্য বিষয় দর্শন (আত্মা)। এই শ্রেণিবিভাগে একটি পরিকল্পনার ইঙ্গিত রয়েছে। তা হল এই যে, লেখক দৃশ্য থেকে ধীরে ধীরে অদৃশ্য জগতের আলোচনায় এগিয়েছেন। জীববিজ্ঞান(৫ম—১০ম কথোপকথন)-বিষয়ক আলোচনায়ও সুপরিকল্পনার পরিচয় পাওয়া যায়। শ্রেষ্ঠ প্রাণী মানুষ নিয়ে এই আলোচনা শুরু ; আর নিকৃষ্ট প্রাণী কৃমি নিয়ে এই আলোচনার সমাপ্তি। গ্রন্থটিতে তথ্যসমাবেশ উচ্চাঙ্গের নয়। আবার তৎকালীন যুগের বাংলা বিজ্ঞানসাহিত্য এবং বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার ও অগ্রগতির দিক থেকে বিচার করলে একেবারে প্রাথমিক প্রকৃতির পর্যায়েও একে ফেলা যায় না। ইয়েট্স্-এর রচনায় ভগবৎবিশ্বাস বৈজ্ঞানিক যুক্তিকে দু এক জায়গায় আচ্ছন্ন করেছে। তথ্যসমাবেশেও জায়গায় জায়গায় ভুলভ্রান্তি এসে গেছে। ইয়েট্স্ বিজ্ঞান-বিষয়ক বিদেশি শব্দগুলি বাংলায় অনুবাদ করেছেন। তা ছাড়া দূরত্ব, সময় ইত্যাদি বোঝানো হয়েছে এদেশীয় রীতিতে (ক্রোশ, দণ্ড)। গ্রন্থটির ভাষা প্রাঞ্জল ও জড়ত্বহীন। রচনার নিদর্শন : পৃথিবী সম্বন্ধে আলোচনা—

শিষ্য। পৃথিবীর সৃষ্টি হইল কেন?

গুরু। প্রাণিবর্গের বসতির নিমিত্তে। পৃথিবীর অন্তরে ও উপরে লক্ষ ২ প্রাণী বসতি করিয়া সুখী হইবে এই জন্যে পৃথিবীর সৃষ্টি হইল।

শিষ্য। পৃথিবী কিসের উপরে স্থাপিত আছে?

গুরু। কোন বস্তুর উপরে পৃথিবী স্থাপিত নয়, কেননা তাহা হইলে পৃথিবীর গমন কি প্রকারে সম্ভব হইতে পারে? এই জন্যে প্রাচীন লোকেরা বলিয়াছেন যে, পরমেশ্বর পৃথিবীকে শূন্যভাগে রাখিয়াছেন।

শিষ্য। তবে আমাদের বসতিস্থান যে পৃথিবী সে কি শূন্যে ভ্রমণ করে?

গুরু। হাঁ, কেবল পৃথিবী নয়, গ্রহগণও শূন্যে ভ্রমণ করে।

শিষ্য। আঃ মহাশয়, যে শক্তিদ্বারা এই সমস্ত সৃষ্ট হইয়া প্রথমাবধি প্রচলিত হইয়া এই কাল পর্য্যন্ত স্ব ২ পথে রক্ষিত আছে সে শক্তি কি আশ্চর্য্য।

গুরু। পরমেশ্বর নিজশক্তিদ্বারা পৃথিবীর সৃষ্টি করিয়া আপন বুদ্ধির কৌশলে আকাশ বিস্তার করিয়া তন্মধ্যে তাহাকে স্থাপিত করিলেন।

শিষ্য। এই পৃথিবীর কত ভাগ আছে?

গুরু। জলময় ও ভূমিময় এই দুই ভাগ আছে।

শিষ্য। ভাল মহাশয়, এই পৃথিবী পর্ব্বত উপপর্ব্বতাদিবিহীন হইয়া যদি বিস্তারিত হইত তবে কি দেখিতে অধিক সুন্দর হইত না? এখন এই সমস্ত পর্ব্বতাদিদ্বারা তাহার কি সৌন্দর্য্যের অল্পতা হয় নাই?

গুরু। না, কেননা কৃত্রিমভূগোলের উপর যেমন ধূলিকণিকা থাকে, কিম্বা নারঙ্গ লেবুর উপরে যেমন উচুনীচু স্থান থাকে, তদ্রূপ পৃথিবীর উপরে ঐ পর্ব্বতাদি আছে। অতএব এই সমস্ত ক্ষুদ্রবস্তুদ্বারা কি পৃথিবীর সৌন্দর্য্যের হানি হইতে পারে? তোমরা এমন জ্ঞান কর? পর্ব্বত না থাকিলে উনুই বা নদনদী হইত না, কেননা বাষ্প ও বৃষ্টি ও বরফ ইত্যাদি পর্ব্বতের মধ্যে প্রবেশ করাতে নদনদী জন্মে; এবং পর্ব্বত হইতে সর্ব্বধাতু ও শ্বেতপ্রস্তর ও মণিমাণিক্যাদি জন্মে; বিশেষতঃ পর্ব্বতের এমন গুণ আছে, যে মেঘসমস্তকে আকর্ষণ করে, এবং নিকটস্থ নিম্নভূমি সমস্তকে হিমবাতাস হইতে রক্ষা করে।

শিষ্য। বালুকাময় পর্ব্বতে কোন বস্তুই জন্মে না তবে তাহাতে ফল কি?

গুরু। ফল আছে, তাহাদ্বারা সমুদ্রের ঢেউ নিম্নভূমিতে উঠিতে পারে না। একথা আমাদের বিবেচনার যোগ্য বটে, কেননা দেখ যে বালুকা ফুৎকারদ্বারা উড়িয়া যায় এমন ক্ষুদ্র বস্তু একত্র হইয়া এমত দৃঢ় পর্ব্বত হয় যে তাহাতে সমুদ্রের ঢেউ বেগে লাগিলেও তাহার কিছু হানি হয় না, এবং সমুদ্র উথলিলেও তাহা লঙ্ঘন করিয়া জল যাইতে পারে না।

শিষ্য। পৃথিবীর মধ্যভাগ ও অন্তভাগ দুই কি এক প্রকার?

গুরু। না, একপ্রকার নয়, কেননা পৃথিবীর মধ্যে সুবর্ণ, রজত, তাম্র, দস্তা, সীসক, লৌহ প্রভৃতি অনেক ধাতু আছে।

শিষ্য। ধাতু সমস্ত মৃত্তিকার মধ্যে থাকে কেন?

গুরু। তাহা হইতে যেন কৃষিকর্ম্মের কোন বাধা না জন্মে এই জন্যে মৃত্তিকা মধ্যে থাকে।

শিষ্য। ধাতু ব্যতিরেক আর কোন বহুমূল্য বস্তু পৃথিবীতে আছে কি না?

গুরু। হাঁ, পারা, ও খড়ি, ও গন্ধক, ও চূর্ণ, ও লবণ, ও ইট, ও কাচমৃত্তিকা, ইত্যাদি বস্তু তদ্ভিন্ন প্রস্তর ও শ্বেত প্রস্তর, ও স্ফটিক, ও হীরক, এবং যাহা দ্বারা সমুদ্রগমনের পরম উপকার হয় এমন চুম্বক প্রস্তর ইত্যাদি আছে।

৫

গণিত, জ্যোতির্বিজ্ঞান, প্রাণীবিজ্ঞান ইত্যাদির ন্যায় বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে প্রথম রসায়নবিজ্ঞান রচনার কৃতিত্বও ইউরোপীয়দের প্রাপ্য। বাংলায় রসায়নবিজ্ঞানের প্রথম বই জন ম্যাকের

Principles of Chemistry বা *কিমিয়াবিদ্যার সার* ১৮৩৪ খ্রিস্টাব্দে প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল। গ্রন্থটি ছাপা হয়েছিল শ্রীরামপুর প্রেসে। গ্রন্থকার জন ম্যাক শ্রীরামপুর কলেজের অধ্যাপক ছিলেন।

১৭৯৭ খ্রিস্টাব্দের ১২ মার্চ স্কটল্যান্ডে জন ম্যাকের জন্ম হয়। শৈশবেই তিনি পিতাকে হারান। তাঁর মায়ের ইচ্ছে ছিল, পুত্রকে ধর্মযাজক করবার। কৈশোরের পাঠ শেষ করে ম্যাক এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভরতি হলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠ করবার সময়েই তাঁর মনে স্বাধীন ও বলিষ্ঠ চিন্তাধারার উদয় হয়েছিল। ১৮২১ খ্রিস্টাব্দে মি. ওয়ার্ড শ্রীরামপুর কলেজের জন্যে একজন সুযোগ্য অধ্যাপকের সন্ধানে ইংল্যান্ড গেলেন। মি. ম্যাককে এই পদের জন্যে মনোনীত করা হল। ম্যাক ১৮২১ খ্রিস্টাব্দের নভেম্বর মাসে ভারতবর্ষে এলেন। এদেশে এসেই তিনি শ্রীরামপুর কলেজে অধ্যাপনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। পরম নিষ্ঠাসহকারে সুদীর্ঘ চৌদ্দ বৎসর ধরে তিনি এই দায়িত্বভার পালন করেছিলেন। ভারতবর্ষে পদার্পণের অল্পকালের মধ্যেই ডা. কেরি ও তাঁর অনুচরদের সঙ্গে ম্যাকের হৃদ্যতা গড়ে ওঠে। নানা বিষয়ে কেরি ও তাঁর অনুচরদের তিনি সাহায্য করেছেন। ম্যাকের বিদ্যাবত্তা সম্বন্ধে মন্তব্য করতে গিয়ে উইলিয়ম কেরি লিখেছেন, 'He was a well read classic, and an able mathematician, and there were few branches of natural science in which he was not at home, and in which he did not succeed in keeping himself up to the level of modern discoveries.' ডা. কেরি রসায়নবিদ্যায় জন ম্যাকের বিশেষ পাণ্ডিত্যের কথা বলেছেন, 'He was especially attached to the sciences of Chemistry, which he had cultivated with success under the most eminent professors in London.' ধর্মপুস্তক পাঠে এবং ধর্ম প্রচারে তাঁর নিষ্ঠা ছিল অসাধারণ। তাঁর অবসর-সময়ের অধিকাংশই ধর্মচিন্তায় অতিবাহিত হত। ১৮৩৫ খ্রিস্টাব্দে শ্রীরামপুর থেকে *ফ্রেন্ড অব ইন্ডিয়া* সাপ্তাহিকপত্র হিসেবে প্রকাশিত হতে থাকে। ম্যাক এই পত্রিকার সম্পাদনায় যথেষ্ট সাহায্য করেছিলেন। ১৮৪৫ খ্রিস্টাব্দের ৩০ এপ্রিল শ্রীরামপুরে কলেরা রোগে তাঁর মৃত্যু হয়।

কিমিয়াবিদ্যার সার ছাড়া ম্যাক আর কোনো গ্রন্থ রচনা করেননি। এ গ্রন্থটি রচনার সংক্ষিপ্ত একটি ইতিহাস আছে। মি. মার্শম্যান ভারতীয় যুবকদের জন্যে কতকগুলি ইতিহাস ও বিজ্ঞান-বিষয়ক বই রচনার প্রস্তাব করেছিলেন। এই প্রস্তাব অনুযায়ী জন ম্যাকের *কিমিয়াবিদ্যার সার, ১ম খণ্ড* প্রকাশিত হয়। এ বইটি হল ম্যাকের কতকগুলি রসায়নবিজ্ঞান-বিষয়ক বক্তৃতার পরিশোধিত সংকলন। ম্যাক এই বক্তৃতাগুলি বাংলা এবং ইংরেজিতে শ্রীরামপুর কলেজ ও কলিকাতায় দিয়েছিলেন।

কিমিয়াবিদ্যার সার ইংরেজি ও বাংলায় লেখা। বাঁ পৃষ্ঠায় ইংরেজি, ডান পৃষ্ঠায় বাংলা। এই গ্রন্থের অনুবাদক সম্বন্ধে মতভেদ আছে। *বেঙ্গল ওবিচুয়ারি (Bengal Obituary)* গ্রন্থে উল্লিখিত আছে, ইংরেজিতে জন ম্যাকের রচনা ফেলিক্স্ কেরি (Felix Carey) বাংলায় অনুবাদ করেন। কিন্তু এই মত নির্ভরযোগ্য বলে মনে হয় না। তার কারণ, গ্রন্থের ভূমিকায় জন ম্যাক স্পষ্টই বলেছেন, 'In composing this volume, my primary object has been to introduce Chemistry into the range of Bengali literature, and domesticate its terms and ideas in this language.' তা ছাড়া উইলিয়ম কেরির *ওরিয়েন্টাল ক্রিশ্চিয়ান বায়োগ্রাফি*-তে (*Oriental Christian Biography*) উল্লিখিত আছে, 'Soon after his arrival in India, he gave a series of chemical lectures in Calcutta, the first ever delivered in the city; and at a later period, prepared an elementary treatise on this science, and translated it into the Bengalee language

for the use of native pupils.'। অতএব জন ম্যাক যে তাঁর ইংরেজি বক্তৃতা বাংলায় অনুবাদ করেছিলেন তাতে সন্দেহ নেই।

কিন্তু বাংলায় রসায়নশাস্ত্র লিখতে গিয়ে লেখককে এক বিরাট সমস্যার সম্মুখীন হতে হল। রসায়নশাস্ত্রের অধিকাংশ বস্তুর নামই ছিল বাংলা সাহিত্যে একেবারে নবাগত। এই বস্তুগুলোর ইউরোপীয় নামকরণ ব্যবহার করবেন, না তাদের সংস্কৃতে অনুবাদ করবেন, এই নিয়ে লেখককে এক সমস্যায় পড়তে হল। জন ম্যাক শেষপর্যন্ত প্রথমোক্ত ধারাই অনুসরণ করলেন; অর্থাৎ ইউরোপীয় নামগুলোকে বাংলায় লিখলেন। শুধুমাত্র নামগুলোর আদিতে এবং তাদের পরিভাষায় কিছুটা পরিবর্তন করা হল। এই সম্বন্ধে জন ম্যাক দুটি কারণ দেখিয়ে ভূমিকায় বলেছেন,

> First, that our European terms have been taken from our ancient languages for the very purpose of preventing the confusion which must arise from as many different names being applied to the same thing as there are languages in which it is spoken of; secondly, that it is a mistake to suppose, that any good will be done by accurate translations of scientific names, since so many of them, as far as their derivative import is concerned, are totally misapplied, and the translation of them therefore would only be giving currency to error.

এর পর বলেছেন,

> I have preferred, therefore, expressing the European terms in Bengalee characters, and merely changing the prefixes and terminology so as decently to incorporate the new words into the language.

ইউরোপীয় শব্দগুলোকে যথাসম্ভব অবিকৃত অবস্থায় বাংলা ভাষায় ব্যবহার করবার জন্যে লেখকের যে ইচ্ছে ছিল, তার প্রমাণ বইটির সর্বত্রই পরিদৃষ্ট হয়। যেমন, Oxygen বাংলা করা হয়েছে অক্সিজান, Fluorine-এর বাংলা ফ্লুওরিণ এবং Chlorine-এর স্থলে লেখা হয়েছে ক্লোরিণ, Iodine-এর স্থলে ঐয়োদিন, Nitrogen-এর বাংলা নৈত্রজান, Hydrogen-এর হৈদ্রজান। যৌগিক পদার্থের নামগুলো বাংলায় ব্যবহার করবার সময় যাতে এই নামগুলো বাংলা ভাষার সঙ্গে খাপ খায়, সেদিকে লেখক লক্ষ রেখেছেন। এরূপ করার ফলে যৌগিক পদার্থের অধিকাংশ নাম অর্ধেক অনুবাদিত হয়েছে। যেমন, Hydro-bromic acid-এর বাংলা করা হয়েছে হৈদ্র-ব্রোমিকাম্ল, Nitric Acid-এর বাংলা নৈত্রিকাম্ল, Sulphuric Acid-এর গান্ধকিকাম্ল। কতকগুলো যৌগিক পদার্থের নামে পরিবর্তন প্রায় নেই; যেমন Nitrate of Ammonia-র স্থলে লেখা হয়েছে আম্মোনিয়ার নৈত্রায়িত। আবার কয়েকটি স্থলে অনুবাদের প্রচেষ্টা পরিলক্ষিত হয়; যেমন, Muriate of Ammonia-র স্থলে লেখা হয়েছে আম্মোনিয়ার সমুদ্রায়িত লবণ।

গ্রন্থটি দু'ভাগে বিভক্ত। প্রথম ভাগে আলোচনা করা হয়েছে 'Chemical forces' বা 'কিমিয়া প্রভাব' সম্বন্ধে। দ্বিতীয় ভাগের আলোচ্য বিষয় 'Chemical Substances' বা 'কিমিয়া বস্তু'। প্রথম ভাগ চারিটি অধ্যায়ে বিভক্ত। বিভিন্ন অধ্যায়ে আকর্ষণ, তাপ, আলো ও বিদ্যুৎ সম্বন্ধে আলোচনা। দ্বিতীয় ভাগে দুটি অধ্যায়। প্রথম অধ্যায়ের আলোচ্য বিষয় 'Electro-negative Substances' বা 'বিদ্যুৎসম্পর্কীয় অভাবরূপ বস্তু'। দ্বিতীয় অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে 'Unmetallic electro-positive Substances' বা 'ধাতুভিন্ন বিদ্যুৎসম্পর্কীয় স্বভাবরূপ বস্তু' সম্বন্ধে। প্রায় প্রতিটি অধ্যায়

আবার কয়েকটি পরিচ্ছেদে বিভক্ত। ১ম ভাগে রসায়নবিজ্ঞানের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট পদার্থবিজ্ঞান বিষয়ক আলোচনা উচ্চাঙ্গের না হলেও এখানে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য বিষয় হল, লেখক এই আলোচনা করেছেন রসায়নবিজ্ঞানের প্রয়োজনের দিকে লক্ষ রেখে। অপ্রাসঙ্গিক বিষয়ের অবতারণা একেবারেই করেননি। দ্বিতীয় ভাগে non-metals নিয়ে আলোচনা। লেখক বিদ্যুতের প্রতি বিভিন্ন পদার্থের ব্যবহার অনুযায়ী অধ্যায় বিভাগ করেছেন। দ্বিতীয় ভাগে বিভিন্ন পদার্থের প্রস্তুতপ্রণালি সম্বন্ধে আলোচনা সংক্ষিপ্ত। আলোচ্য পদার্থগুলোর যৌগিক পদার্থ নিয়ে আলোচনাও সংক্ষেপে করা হয়েছে। বিভিন্ন পদার্থের আপেক্ষিক গুরুত্ব ও আণবিক ওজনও (Atomic weight) দেওয়া হয়েছে। পরিশিষ্ট বা ক্রোড়পত্রে 'বাষ্পীয় কল' শীর্ষক যে আলোচনাটি রয়েছে তা ১৮৩২ খ্রিস্টাব্দের ২৫ এপ্রিল তারিখের *সমাচার দর্পণ*-এ প্রকাশিত হয়েছিল।

গ্রন্থটি তথ্যবহুল; কিন্তু টেকনিকাল নয়। প্রস্তুতপ্রণালি বোঝাতে গিয়ে কোথাও ফর্মুলার অবতারণা করা হয়নি। তবে স্বল্পপরিসরের মধ্যে অধিক তথ্যের সমাবেশের ফলে বিষয়বস্তু অনেকক্ষেত্রেই দুর্বোধ্য হয়ে পড়েছে। যেমন, অক্সিজেনের প্রস্তুতপ্রণালির কয়েকটি পদ্ধতি, যা বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা উচিত ছিল তা শুধুমাত্র এক প্যারাগ্রাফের কয়েক লাইনে সারা হয়েছে :

> সামান্য কার্য্যের নিমিত্ত অক্সিজান এই ২ রূপে প্রাপ্ত হওয়া যায়। বিশেষতঃ লৌহ কিম্বা মৃত্তিকার রিটোর্টের মধ্যে মাঙ্গানেসের কালা অক্সিদ অগ্নিময় করণেতে কিম্বা কাঁচের রিটোর্টের মধ্যে সেই অক্সিদের অর্দ্ধ পরিমিত শক্ত গান্ধকিকাম্ল তাহাতে দিয়া বাটীর উপর তাহা উত্তপ্ত করণেতে কিম্বা লোহা বা মৃত্তিকার রিটোর্টের মধ্যে সোরা লবণ অগ্নিময় করণেতে। কিন্তু অতি নির্ভাজ অক্সিজান যদি চাহা যায় তবে কাঁচের রিটোর্টের মধ্যে পতাষের ক্লোরায়িত উত্তপ্ত করণেতে তাহা প্রাপ্ত হওয়া যায়। এবং সেই কার্য্যেতে পতাষ এবং ক্লোরিক অম্লের মধ্যে যত অক্সিজান লীন হইয়া থাকে তাহা সকল পৃথক হইয়া রিটোর্টের মধ্যে কেবল পতাষিয়মের ক্লোরিদ অবশিষ্ট থাকে।

গ্রন্থটি রচনায় মুরে (Murray), হেনরি (Henry), ব্র্যান্ডে (Brande), উর (Ure), এবং টারনারের (Turner), বই থেকে সাহায্য নেওয়া হয়েছে। ম্যাকের ইচ্ছে ছিল, দ্বিতীয় খণ্ডে ধাতু ও জৈব রসায়নবিজ্ঞান (Metals and Organic chemistry) সম্বন্ধে আলোচনা করবার। একটি জ্যোতির্বিজ্ঞান ও একটি মেকানিক্স্ বই লিখবার ইচ্ছেও লেখকের ছিল। কিন্তু দ্বিতীয় খণ্ড কিমিয়াবিদ্যা এবং জ্যোতির্বিজ্ঞান ও মেকানিক্স্ প্রকাশিত হয়নি।

কিমিয়াবিদ্যার সার-এ ছেদচিহ্নের ব্যবহার যথাযথ নয়। কমার ব্যবহার একেবারেই নেই। রচনা দুরূহ ও দুর্বোধ্য প্রকৃতির। ভাষায় অনেক জায়গাতেই ইউরোপীয় উচ্চারণের ছাপ রয়েছে। যেমন, তের্মোমেতের, বারোমেতের, সোদা ইত্যাদি। বাক্য অযথা দীর্ঘ; তা ছাড়া প্রকাশভঙ্গিতে রয়েছে জড়তা। ভাষায় বিদেশি হাতের ছাপ সর্বত্রই রয়েছে। জায়গায় জায়গায় অযথা ক্রিয়ার ব্যবহার; যেমন, 'অক্সিজান সামান্য আকাশ হইতে ভারী আছে'।

এইরূপে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে প্রধানত ইউরোপীয় লেখকদের প্রচেষ্টায় বাংলা বিজ্ঞানসাহিত্যের ভিত্তি স্থাপিত হয়েছিল।

থিয়েটারে মেয়েরা

তৃপ্তি মিত্র

মেয়েদের থিয়েটারে আসা নিয়ে আমাকে অনেক প্রশ্ন করা হয়। আমাদের দেশে মেয়েদের অবস্থা আঠারো-উনিশ শতকে এমনকি বিশ শতকের গোড়া পর্যন্ত এমনই ছিল যে তারা অন্তঃপুরিকা এবং অন্তঃপুরের যাবতীয় কাজ ছাড়া তাদের আর অন্য পরিচয় নেই। তাই আমরা দেখতে পাই মেয়েরা যখন প্রথম লেখাপড়া শিখতে স্কুলে আসতে লাগল তখন থেকেই তাদের নানারকম ব্যঙ্গবিদ্রুপ সহ্য করতে হয়েছে— এবং যাঁরা এসবের প্রবক্তা— বিদ্যাসাগর প্রমুখ মানুষদেরও কম বিদ্রূপ সহ্য করতে হয়নি, তাঁদের অপদস্থ করার চেষ্টাও তো কম হয়নি! আর যখন মেয়েরা ইংরেজি শিখতে শুরু করল তখন ঈশ্বর গুপ্ত, নাট্যকার অমৃতলাল বসু প্রমুখ বিদগ্ধ ব্যক্তিরাও ঠাট্টাবিদ্রূপ করতে কসুর করেননি। ইংরেজি শিখলেই যেন মেয়েরা খারাপ হয়ে গেল।

মাইকেল মধুসূদন যখন পুরুষ অভিনেতার বদলে মেয়েদের দিয়ে অভিনয় করাবার প্রস্তাব করেন তখনও সেটা সকলে ভালো মনে মেনে নিতে পারেননি। আমি যখন নাটকের জগতে আসি ১৯৪৩ সালে, তখন আমার মতো যারা মধ্যবিত্ত পরিবার থেকে এসেছিল— হয়তো সকলকেই অনেক বাধা কাটিয়েই আসতে হয়েছিল। আমার একটা সুবিধে ছিল আমার মামা সত্যেন্দ্র মজুমদার এবং আমার দিদি, জামাইবাবু শান্তি মিত্র এবং অরুণ মিত্র— এঁরা অন্য ধরনের মানুষ ছিলেন। আমার মা, বা অন্য কোনো বোনেদেরও এসব নিয়ে কোনো আপত্তি ছিল না। আর দূরের আত্মীয়রা কে কী বলল না বলল তাতে কিছু এসে যায়নি। পরবর্তীকালে শ্বশুর-শাশুড়ি ছিল না, কোনো অসুবিধে হয়নি। আর আমার নাটকের জগতে আসাটা তো আকস্মিক। যদিও তখন অনেক মধ্যবিত্ত বা বিত্তবান ঘরের মেয়েরা নাটক নয় ফিল্ম করতে শুরু করে দিয়েছিলেন গ্ল্যামার এবং পয়সার মোহে। বিজন ভট্টাচার্যের *আগুন* নাটকে বাধ্য হয়ে একটি ভূমিকায় অভিনয় করি, উনি আমার আত্মীয় ছিলেন তাই। তখন অন্যরকম থিয়েটার করতে হবে এই প্রবণতা প্রবলভাবেই বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে সংক্রমিত হয়। তখন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ— রাস্তায় বাংলার চাষিদের ফ্যান দাও চিৎকার করতে করতে মৃত্যুবরণ যে একটা সাধারণ ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছিল— ব্ল্যাক আউট, ব্ল্যাক মার্কেট, হোর্ডিং,

এ. আর. পি., সাইরেন কত নতুন শব্দের আমদানি। তখন কলকাতার মঞ্চে যেসব নাটক হচ্ছিল— সে সবই পুরোনো নাটক, ঐতিহাসিক পৌরাণিক বা সামাজিক, নেহাতই সব সেন্টিমেন্টাল নাটক, ফিল্ম যেসব তৈরি হচ্ছিল সেসমস্তই ওই আর কী। ফর্মুলায় ফেলা গল্পের চিত্রায়ণ। সেসব দেখে মনে হত না যে বাংলার বুকে— কলকাতার বুকে এত বড়ো নিষ্ঠুর বাস্তব একটা ঘটনা ঘটে চলেছিল। তাই হয়তো বাংলার আকাশ বাতাসই চাইছিল— 'অন্য কিছু'। ফ্যাসি-বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘ অন্য-রকম নাটক লেখা— গান বাঁধার তাগিদ অনুভব করেছিল। বিয়াল্লিশের আন্দোলন এবং মেদিনীপুরের ভয়াবহ বন্যা হয়ে গেছে— মাতঙ্গিনী হাজরা প্রাণ দিয়েছেন। মেদিনীপুর ক-সপ্তাহের জন্য স্বাধীন হয়েছে। দেশের নেতারা জেলে। কলকাতার আকাশে জাপানি প্লেন, বোমা, সাইরেন মাটিতে ট্রেঞ্চ— ব্যাফেল ওয়াল। এরই মধ্যে *জবানবন্দী নবান্ন* লেখা হল। ততদিনে ফ্যাসি-বিরোধী সংঘ ছেড়ে, ভারতীয় গণনাট্য সংঘ তৈরি হয়েছে। মাঝখানে আমি কিছুদিন এসব ছেড়েও দিয়েছিলাম, কারণ ওই যে বলেছি নাটক করব বা অভিনয় করব এরকম কোনো 'প্যাশন' আমার ছিল না। কিন্তু শেষপর্যন্ত *নবান্ন*-তে অভিনয় করতে এলাম। টাকা তুলে দুর্ভিক্ষপীড়িতদের দেওয়া হচ্ছে এতে একটা অদ্ভুত উত্তেজনা অনুভব করতাম। তবে একটা ঘটনায় একবার মনে খুব ঘা খেয়েছিলাম। তখন আমরা ঢাকা নারায়ণগঞ্জে *জবানবন্দী* অভিনয় করতে গেছি। তখনও আমি তৃপ্তি ভাদুড়ী। নারায়ণগঞ্জে অভিনয় হবে, একটা গুদামঘর মতো জায়গায় স্টেজ বানিয়ে আমি আর ললিতাদি (ললিতা বিশ্বাস— দেবব্রত বিশ্বাসের বোন) বসে আছি। আমাদের খুব জল-তেষ্টা পেয়েছে। জলের ব্যবস্থা নেই। কিছু দূরে গাছগাছালির আড়ালে, খড়ের চালের বেশ-কয়েকটা বাড়ি দেখা যাচ্ছে। আমি আর ললিতাদি চললাম সেদিকে, ওখানে জল পাওয়া যাবে। একটু ডাকাডাকি করতে বাড়ি থেকে দু তিন জন বিভিন্ন বয়সের মহিলা বেরিয়ে এলেন, সম্পন্ন কৃষক এঁরা মনে হল। আমরা জল চাইলাম— এর মধ্যে আমরা কে, কেন এখানে এসেছি সেটা জানা হয়ে গেছে। একটি বউ হাসিমুখ করে কাঁসার গ্লাসে জল নিয়ে আসছিল— ঘরের ভিতর থেকে এক প্রৌঢ় পুরুষকণ্ঠ চিৎকার করে উঠল, 'নটীদের গেলাসে জল দিচ্ছ কেন, ঘটি করে হাতে ঢেলে দাও, ওই বাইর বাড়ির থেকেই বিদায় করো'। ললিতাদি একটি প্রৌঢ়াকে বোঝাবার চেষ্টা করল, 'আমরা দেশের কাজের জন্য' ইত্যাদি। মনে নেই জল খেয়েছিলাম কি না খাইনি বোধ হয়। ফিরে এসে সেই গুদামঘরের এক পাশে বসে প্রচণ্ড কেঁদেছিলাম। আমরা যে একটা ভালো কাজ করছি— আমরা সৎ, এই ধারণাটা এতই বদ্ধমূল ছিল যে, এরকম বিপরীত কথা যে কেউ বলতে পারে সে-ধারণা ছিল না, আর ওই বয়সে।

যাক, বুঝলাম পথটা খুবই শক্ত। এরকম আরও ঘটনা কলকাতার আশেপাশেও ঘটেছিল। তবে কাজটার পরিপ্রেক্ষিতে এসব কিছুই নয় বলে এখন মনে হয়। তার পর যখন আমার বিয়ে হয়ে গেল, তখন আর কোনো কথা নয়। একলা এই কাজটা যদি করতে থাকতাম কী হত জানি না। কিন্তু আমরা, স্বামীর সঙ্গে একটা কোনো ভালো কাজ করলে বড়ো নিশ্চিন্ত হই। 'যাক। ও স্বামীর সঙ্গে কাজ করছে। তাকে সাহায্য করবার জন্যেই তো? অথচ দেখ ঘরের কাজেও কোনো অবহেলা নেই' ইত্যাদি। বড়ো স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বাঁচেন আশেপাশের লোকেরা। তাই নাটক করতে বড়ো বাধা কিছু আসেনি। তবে ঘর বার মিলিয়ে খাটতে হয়েছে প্রচণ্ড, এ-প্রসঙ্গে হয়তো পরে আবার আসা যাবে। হ্যাঁ, আই. পি. টি. এ.-এর জোয়ারের কথা বলছিলাম। এরকম একটা প্রতিষ্ঠান হয় না যার শাখা ছিল সমস্ত ভারত জুড়ে। কোনো মোটামুটি বড়ো স্টেশনে নামলে, আগে

খবর দেওয়া থাকলে কোনো অসুবিধাও নেই, সেখানকার ইপটার (আই. পি. টি. এ.-এর সংক্ষেপ) — কোনো লোক থাকবেই স্টেশনে। তবে কলকাতা আর বম্বেতে যত বিকশিত হয়েছিল অন্য কোথাও বোধ হয় ততটা হয়নি। বম্বেতে 'স্পিরিট অফ ইন্ডিয়া', আর 'ইন্ডিয়া-ইম্‌মরটাল' বলে যে-ব্যালেদুটো তৈরি হল, যার কর্ণধারেরা ছিলেন শান্তি বর্ধন এবং রবিশংকর। আজও, যাঁরা সে- অনুষ্ঠান দেখেছিলেন ভুলতে পারেননি। আর কলকাতায় *নবান্ন* যে-সাড়া জাগিয়েছিল, তা যে তুলনাহীন সেটা বোঝা যায়, আজও থিয়েটার সম্পর্কে যে-কেউই কোনো লেখা লিখুক না কেন, *নবান্ন*-র উল্লেখ না করে তার উপায় নেই। এই 'ইপটা'-র পিছনে অবশ্যই তৎকালীন কমিউনিস্ট পার্টি ছিল। তাই হয়তো অমন একটা সুন্দর ডিসিপ্লিন ছিল। কিন্তু এর এমন একটা ক্যাথিলিসিটি ছিল যে এর সঙ্গে ভুলাভাই দেশাই, বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত, সরোজিনী নাইডু, এরকম বহু খ্যাতনামা ব্যক্তি জড়িত ছিলেন।

তার পর একসময় সংকীর্ণতা প্রবেশ করল। রাজনীতির চাপ আসতে লাগল। নাটকে অবশ্যই রাজনীতি থাকতে পারে— দরকার হলে থাকবেও। কিন্তু ওপর থেকে সেটাকে চাপিয়ে দিলে শিল্প মার খায়। তাই একসময় দেখি মহর্ষি মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, গঙ্গাপদ বসু, শম্ভু মিত্র, বিজন ভট্টাচার্য ও বহু বড়ো বড়ো শিল্পী ইপটা ছাড়লেন— আমিও আর বম্বেতে প্রতিভাবান শিল্পীরা পুরোপুরি সময় দিতে লাগলেন কমার্শিয়াল ফিল্‌মে। মরন্ত দশা হল ইপটার। ঠিক যেমন কলকাতাতেও 'উত্তর সারথি'র— *নতুন ইহুদী* নাটকের শিল্পী পরিচালকেরা বাংলা ফিল্‌মের সঙ্গে জড়িয়ে গেলেন।

সে যাক, এইবার সমস্যা হল আমরা কী করব? তখন সৃষ্টি হল 'বহুরূপী'র— মহর্ষি মনোরঞ্জন ভট্টাচার্যকে সভাপতি করে। আর হাল ধরলেন শম্ভু মিত্র। তার পর অনাহারে-অর্ধাহারে চলতে লাগল। হ্যাঁ, আমার এবং শম্ভু মিত্রের ক্ষেত্রে কথাটা একশো ভাগই সত্যি। পরপর নাটক হয়ে চলল, *পথিক, ছেঁড়া তার, উলুখাগড়া, চার অধ্যায়, দশচক্র*। ১৯৪৮ থেকে ১৯৫২ সাল পর্যন্ত। এলেন তুলসী লাহিড়ী, কালী সরকার, কানু বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি খ্যাতনামা শিল্পীরা এবং নতুনদের মধ্যে সবিতাব্রত, অমর কুমার, আরতি মৈত্র, জাকারিয়া, খালেদ চৌধুরী, তাপস সেন। মহর্ষি মারা গেলেন ১৯৫৪-র জানুয়ারিতে। ১৯৫৪-র মে মাসে প্রস্তুত হল *রক্তকরবী*, শম্ভু মিত্রের নির্দেশনায়, যা নাকি আবার একটা দিকচিহ্ন বলে স্বীকৃত। কিন্তু কী *নবান্ন* কী *চার অধ্যায়, রক্তকরবী* এ সব নাটককে অনেকেই সহজে স্বীকৃতি দিতে চাননি। তখনকার দিনের নাট্যমঞ্চের অনেক দিকপাল বলেছিলেন, 'ও চাষাভুষো নিয়ে নাটক আমাদের পাবলিক নেবে না— ওটা ক-দিনের!' আবার এঁরাই দর্শক আগমন দেখে মঞ্চ ভাড়া দিতে অস্বীকার করেন। *চার অধ্যায়* করবার সময় শুনতে হল যাঁরা করছেন তাঁরা প্রতিক্রিয়াশীল। সেই সঙ্গে রবীন্দ্রনাথকেও কম গাল খেতে হয়নি। আবার *রক্তকরবী*-র সময় শুনতে হল জোর করে রবীন্দ্রনাথকে 'লাল' করে দেওয়া হচ্ছে। কোনো-একটা দায়িত্বপূর্ণ কাজ করতে গেলে এরকম কত শত উলটোপালটা কথা যে হয়! কাজেই এই 'অন্য থিয়েটার', যাঁরা হিসেবগন্ড বুঝে নিয়ে কাজটা করতেন না— বা 'আমার বাজার দর কত?' তা নিয়ে মাথা ঘামাতেন না, তাঁদের পক্ষে পথটা কণ্টকাকীর্ণই ছিল। হ্যাঁ, আর-একটা কথা ইপটা ছেড়েছি বলে একদল গাল দিচ্ছে— পয়সার লোভে এসব করছি, আবার ঠিক তখুনি অন্য একদল অত্যন্ত সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে লক্ষ করছে এরা ইপটা ছাড়ল কিন্তু বদলটা কোন্‌খানে হল? কেবল বক্স অফিস-এর দিকে তাকিয়েই তো এরা সবকিছু করছে না— এদের মতলবটা কী? আর এর-ই মধ্যে আমরা দাঁতে দাঁত চেপে কাজ করে চলেছি। ভালো নাটক ভালো অভিনয় হলে— ভালো প্রযোজনা হলে— তার একটা দাম থাকেই, তাই সেদিন পর্যন্ত *চার অধ্যায়* বা *দশচক্র* দেখতে সাধারণ মানুষ উত্তেজনা অনুভব করে।

মাঝের অনেক দিনের কথা নাই বলা হল। হল *রক্তকরবী, ডাকঘর, পুতুল খেলা,* মাঝখানে অনেক একাঙ্ক হয়ে গেছে। মোট কথা, নিরলস কাজ হয়ে চলেছে। ফাঁক নেই, ফাঁকি নেই বহুরূপীতে। ৬২ সাল আন্দাজ 'নান্দীকার'-এর গ্রুপ হিসেবে প্রকাশ ঘটল। তার আগে 'লিটল থিয়েটার গ্রুপ' খুবই নাম করেছে। তার পর একে একে কত দল।

গণসংস্কৃতি, লোকসংস্কৃতি, ঐতিহ্য— কত কথা। এক এক জন এক একরকম করে তার মানে করে। একসময় একটা রেওয়াজই হয়ে গেল— এখনও খানিকটা আছে ডায়ালেক্টে কৃষক বা শ্রমিক জীবন নিয়ে, বা বিদেশি কোনো নাটককে ডায়ালেক্টে ফেলে কিছু 'গরম-গরম' কথা শাসক বা ধনী শ্রেণির বিরুদ্ধে মঞ্চে দাঁড়িয়ে বললে তবেই সেটা গণসংস্কৃতি হবে। নাটক-সংলাপ কাঁচা হওয়া সত্ত্বেও।

রবীন্দ্রনাথ কবিতা নাটক গান প্রবন্ধ ইত্যাদির মধ্য দিয়ে যে-লক্ষ লক্ষ মানুষের চেতনার জমি তৈরি করে গেছেন, যে-ফসল ফলেছে তাতে, যে-সংস্কৃতি আপামর বাঙালির জীবনে রেখে গেছেন সেটা কী তা হলে? তাকে আমরা গণসংস্কৃতি বলব না? এই আশির দশকে আর তা বলা চলে না যে উনি কেবল কিছু অতি-শিক্ষিত লোকের জন্যেই সাহিত্য সৃষ্টি করে গেছেন। তবে গণসংস্কৃতি বলতে যদি মাত্র একটা খণ্ডিত দৃষ্টিতেই তাকে ধরতে হবে বলে অবধারিত হয়ে থাকে তবে রবীন্দ্রনাথকে সে জায়গায় না নিয়ে যাওয়াই ভালো। হ্যাঁ 'বহুরূপী'— বড়ো কষ্টের, জেদের এবং নাট্য-মাধ্যমে মহৎ শিল্পচেষ্টার তাগিদেই সৃষ্টি হয়েছিল। তবে তখন কি আর 'মহৎ শিল্প' 'মহৎ শিল্প' বলে মনে মনে আউড়েছি? না। একটা ভালো-কিছু যা মানুষের হৃদয় এবং বুদ্ধিকে একই সঙ্গে নাড়া দিয়ে পরিতৃপ্ত করবে, উদ্‌বেল করবে, অস্থির করবে, ভাবাবে, কেবল এনটারটেইনমেন্ট নয়, স্লোগান নয়। মানবিক, মানে তখন এসব আলোচনাই হত। তার পর বহু বৎসর এই সংগ্রামের (যদিও সংগ্রাম কথাটা— বহু ব্যবহারে এর ধার কমে গেছে) মধ্যে দিয়েই 'বহুরূপী' তার বনেদ শক্ত করতে পেরেছিল।

'গ্রুপ থিয়েটার'ই বলুন বা 'অন্য থিয়েটার' বলুন সবাই 'বহুরূপী'র 'সেই সংগ্রাম'-এর ফল ভোগ করেছে এবং করছে। তবে এ-কথা আজ সত্য বলেই প্রমাণিত যে এই 'অন্য থিয়েটার' অনেক ক্ষেত্রে লক্ষ্যভ্রষ্ট আর অনেক ক্ষেত্রে স্তিমিত, বলা যায় তার বীর্য হারিয়েছে। এর প্রধান দায়িত্ব অবশ্যই এইসব থিয়েটার কর্ণধারদের। তবু এরই মধ্যে আমরা তো দেখতে পাই কিছু সৎ চেষ্টা, ওই আর কী, কিছু ফুলকি। তাদের সামর্থ্য বড়োই কম।

'অন্য থিয়েটার'-এর মানুষদেরও আমার একটা কথা বলতে ইচ্ছে হয়, বলেওছি অন্য অনেক ক্ষেত্রে, 'অন্য থিয়েটার' বা 'গ্রুপ থিয়েটার' এই নামটাই কোনো শ্লাঘার বস্তু হতে পারে না যদি নিষ্ঠায় ফাঁকি থাকে। সাম্প্রতিক নাটক দেখে আমার এই ধারণা হয়েছে যে অনেকেই ভাবের ঘরে চুরি করে চলেছেন। যথেষ্ট অনুশীলন নেই, কিন্তু যথেষ্ট ভাঁড়ামো আছে (অনেক ক্ষেত্রে) সেই কবে *নবান্ন* হয়ে গেছে এখনও সেই ডায়লেক্ট দিয়ে 'জোর প্রতিরোধ' (*নবান্ন*-এর শেষ সংলাপ)-জাতীয় কথা বলে একটা জোরদার প্রতিক্রিয়ার আশা করে। আর সেটা না পেলে দর্শকদের দোষ দেওয়া। আবারও বলছি ব্যতিক্রম অবশ্যই আছে। না হলে প্রদীপ নিভে যেত। জীবনের লক্ষণ থাকত না।

অনেকে 'প্রগতিবাদী' হবার জন্য বহুদিন থেকেই শ্রমিক এবং কিছু চরিত্রের মুখে অশ্লীল-অশালীন কথা দেবার প্রচলন করেছিলেন এখন অনেকে সেটা পুনঃপ্রতিষ্ঠার কাজে লেগেছেন। এ-লক্ষণটা ভালো না। অনেক ভাঁড়ামো অশ্লীল কথা দর্শকদের দেখিয়ে শুনিয়ে হঠাৎ শেষকালে একটা বড়ো 'ভালো ভালো' কথার বক্তৃতা শুনিয়ে কি দর্শকদের মন জয় করা যায়? যখন প্রায়শই অতগুলো 'দামি' কথাকে 'দাম' দিয়ে 'দম' রেখে বলবার শক্তি সেই অভিনেতার থাকে না?

হ্যাঁ, কী নিয়ে যেন শুরু করেছিলাম? প্রশ্নটা আমাকে করা হয়েছিল আমার সময় থেকে এ পর্যন্ত মেয়েদের থিয়েটারে আসা নিয়ে। মেয়েদের থিয়েটারে আসাটা এখন কোনো সমস্যাই নয়— জল-ভাত হয়ে গেছে। সেটাই উচিত ছিল। কিন্তু যাই বলা হোক অধিকাংশ মেয়েকে অনেক সমস্যার, বাধার মধ্যে দিয়েই সোপানের পর সোপান অতিক্রম করতে হয়— বুদ্ধিমতীকে অনেক সময় বুদ্ধি চেপে অনেক কাজ করতে হয়— আর যে তা না পারে, অর্ধেক সিঁড়িতে উঠে তার বিশ্রাম। তবে অনেক সৌভাগ্যবতী নিজের তেজে বা অবকথার অনুকূলে এসব পার হয়ে যান। অবশ্য অনেক সময় উচ্চাশার আকাঙ্ক্ষায় বা অনেককিছুর তাড়নায় যে মেয়েরাও সাংঘাতিক ভুল করে বসে না তা বলছি না, তখন তার নিজের এবং সেই দলের খুবই ক্ষতি হয়। তবে কত মহিলা শিল্পীর প্রতিভা সংসার চালানোর তাগিদে, এখানে ওখানে, অফিস ক্লাবে পয়সার বিনিময়ে যে-কোনো নাটকে, যে-কোনো ভূমিকায় যে-কোনো অযোগ্য পরিচালকের অধীনে কাজ করতে গিয়ে যে নষ্ট হয় তার হিসেবই বা কে রাখে? সমাজ বদলেছে কিন্তু মেয়েদের সম্পর্কে মানসিকতা কতটা বদলেছে? বাইরে অনেকটা, কিন্তু....।

শ্রীমতী বিনোদিনী দাসী যদি তাঁর সামান্য আত্মজীবনী লিখে না যেতেন তবে থিয়েটারের জন্যে তাঁর অসামান্য ত্যাগের কথা আমরা জানতেই পারতাম না, আরও অনেকের কথা যেমন হয়তো জানি না। তবে বিনোদিনী নিঃসন্দেহে অন্য জাতের শিল্পী ছিলেন। কত বঞ্চনাই না তাঁকে সহ্য করতে হয়েছিল। এ-গল্প তো সকলেরই জানা যে তাঁরই টাকায় থিয়েটারবাড়ি তৈরি হল। তাঁকে বলা হল, তোমার নামেই থিয়েটারের নাম হবে 'বি-থিয়েটার'। আর তিনি যখন অধীর আগ্রহে প্রতীক্ষা করছেন রেজিস্ট্রেশন হয়ে আসবে 'বি-থিয়েটার'-এর, তখনই খ্যাতনামা নাট্যকার-নট, ম্যানেজার সবাই এসে ঘোষণা করলেন, রেজিস্ট্রেশন হয়ে গেছে। আগ্রহান্বিতা বিনোদিনী শুনলেন, থিয়েটারের নাম হয়েছে 'স্টার-থিয়েটার'। তাঁরই বিশ্বাসভাজন দাদা ভাই বন্ধুরা এ-কথা উচ্চারণ করতে কুণ্ঠা বোধ করেননি। এমনকি তাঁকে অজ্ঞাত কারণে সেই থিয়েটারে দু-মাস কাজ করতেও দেওয়া হয়নি। হয়তো কোনোদিন দেওয়া হতও না, যদি না তাঁর আশ্রয়দাতা বেঁকে বসতেন এবং তাঁর গুরু মধ্যস্থতা করে তাঁকে নিয়ে যেতেন।

এখনও বেশ-কিছু নাটকসমর্পিতা মেয়ে, অনেককিছু খরচ করে কি বিস্মৃতির অতলে চলে যাচ্ছে না? বিনোদিনীর পর অনেক যুগ কেটে গেছে। মেয়েদের অবকথা বলতে গেলে সামান্যই বদলেছে। তবে মেয়েদের অভিনয়বৃত্তিকে এখন আর অপাঙ্‌ক্তেয় মনে করা হয় না এটাই যা প্রগতির লক্ষণ। দিন গেলে সমাজ পালটাবার সঙ্গে সঙ্গে হয়তো এসব কেটে যাবে, যদি বেঁচে থাকি দেখে আনন্দ করব।

বাংলা ভাষার প্রসারচিন্তা

যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি

এককালে আশা ছিল, বাংলা ভাষা ভারতরাষ্ট্র-ভাষা হইতে পারিবে। ক্রমশ সে আশা নির্মূল হইয়াছে। বাঙালি উদাসীন না হইলে হিন্দির বিরুধে লড়িতে পারিত। হিন্দি-ভাষীর সংখ্যাধিক্য, এই একটি গুণ ছিল। বাংলাভাষী দ্বিতীয় স্থান পাইত। আর, বাংলার রাষ্ট্রভাষা হইবার বহু যোগ্যতা ছিল। ইহার সোজা ব্যাকরণ, ইহার প্রচুর সংস্কৃতসম শব্দ, ইহার বিপুল সমৃধ সাহিত্য হিন্দিভাষার নাই। অনেক বাংলা পুস্তক হিন্দি ভাষান্তরিত হইয়াছে। কিন্তু হিন্দির তুলসীদাসি *রামায়ণ* ব্যতীত আর কোনো পুস্তক বাংলা ভাষান্তরিত হয় নাই।

বাংলা অক্ষরশিক্ষা কঠিন না হইলে ভালো ভালো বাংলা বই অন্য প্রদেশে প্রচারিত হইতে পারিত। শুনিতেছি, 'বিশ্বভারতী' রবীন্দ্রনাথের পুস্তক নাগরাক্ষরে প্রচার করিতে উদ্‌যোগী হইয়াছে। ইহা উত্তম কল্পনা। যদি কোনো বঙ্গভাষা-হিতৈষী গ্রন্থপ্রকাশক বাংলা উত্তম সাহিত্যের অন্যান্য বই নাগরাক্ষরে মুদ্রিত করেন, বাংলা ভাষার প্রসার হইতে পারিবে। যেমন, বঙ্কিমচন্দ্রের *আনন্দমঠ* ও *বিষবৃক্ষ*, মধুসূদন দত্তের *মেঘনাদবধকাব্য*, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের *সীতার বনবাস*, স্বামী বিবেকানন্দের *যোগ* ও বক্তৃতা, শরৎচন্দ্রের দুই-একখানা বই নাগরাক্ষরে প্রচার করিতে পারিলে ভারতের অন্য প্রদেশবাসীর পড়িবার সুবিধা হইবে। এইসকল বই সংক্ষেপ করিয়া লইতে হইবে এবং আবশ্যক স্থলে বাংলা শব্দের অর্থ লিখিয়া দিতে হইবে। বাংলা ভাষা শিক্ষার উপযুক্ত পুস্তক আছে কি না জানি না। পাঠশালার নিমিত্ত পুস্তক চলিবে না। যিনি সংস্কৃত, হিন্দি, মারাঠি, তামিল, তেলুগু, কিংবা ইংরেজি জানেন তিনি বই পড়িয়া যাহাতে নিজে নিজে বাংলা শিখিতে পারেন, সেই অভিপ্রায়ে বই লিখিতে হইবে। বাংলা অক্ষর পরিচয়, বাংলা পাঠ ও বাংলা ব্যাকরণের শব্দরূপ ও ধাতুরূপ, এই কয়েকটি বিষয় লইয়া একখানি বই, আর সংস্কৃত শব্দ না দিয়া কেবল বাংলা শব্দের একখানি ছোটো কোশ চাই। আমি জানি, বর্তমানে এইরূপ পুস্তক না থাকিলেও অন্য প্রদেশবাসী বাংলা শিখিয়া বাংলা বই পড়িয়া থাকেন। প্রবাসী বাঙালির পক্ষেও এইরূপ পুস্তকের প্রয়োজন আছে। দুঃখের বিষয়, বাংলা মুদ্রাকরেরা এখনও সেই পুরাতন যুক্তব্যঞ্জনাক্ষর চালাইতেছেন। কলিকাতায় বাংলা-প্রসার-

সমিতি আছেন। তাঁহারা সচেষ্ট হইলে বাংলা ভাষা-প্রচার কঠিন হইবে না। অন্য প্রদেশবাসী দেখিলে বাঙালি হিন্দিতে কথা কহিতে চেষ্টা করেন। এই ব্যবহারের দোষ আছে। ইহা দ্বারা বাংলা-প্রচার ব্যাহত হইতেছে। অন্য প্রদেশবাসীর সহিত বাংলায় কথা কহা উচিত।

বাংলা ভাষার স্বরূপ রক্ষা

ইহার পর অন্য কর্তব্য আছে। যে যে গুণ হেতু ভারতে বাংলা ভাষার আদর হইয়াছে, যাহাতে সে সে গুণ অক্ষুণ্ণ থাকে, যাহাতে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের শ্রী বৃদ্ধি হয়, সে বিষয়ে বাংলা লেখকদিগের দৃষ্টি রাখা কর্তব্য। যাহাতে বাংলা ভাষার স্বরূপ পরিবর্তিত না হয়, সে বিষয়ে বাংলা লেখকদিগের সর্বদা অবহিত থাকা উচিত। এক্ষণে বাঙালি দুর্বল, ভিন্নপ্রদেশে নগণ্য। একমাত্র বাংলা ভাষা ও সাহিত্য দ্বারা বাঙালির পূর্বগৌরব রক্ষিত হইতে পারিবে।

বর্ষে বর্ষে নানাবিধ বাংলা পুস্তক মুদ্রিত হইতেছে। দৈনিক ও সাপ্তাহিক সংবাদপত্র, বারোমাসিক পুস্তক (Magazine) ও সামিতিক পুস্তক, এই ত্রিবিধ পত্র ও পুস্তক বর্তমানে ৩৬৯ খানি প্রচারিত হইতেছে। ভারত-পরিষদের এক প্রশ্নের উত্তর হইতে এই সংখ্যা জানিতেছি। বোধ হয় বর্তমানে বাংলা-লেখক দেড় হাজার, দুই হাজার হইবেন। সমিতি-বিশেষ দ্বারা প্রচারিত পুস্তক অতি অল্প। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, বিজ্ঞান-পরিষদ কর্তৃক প্রকাশিত *জ্ঞান ও বিজ্ঞান* নামক পুস্তক ও এইরূপ অন্যান্য পুস্তককে আমি সামিতিক পুস্তক বলিতেছি। ইহাদের পাঠকসংখ্যা অল্প। সংবাদপত্র অবশ্য পত্র, বাঁধা পুস্তক নয়। বারোমাসিক পুস্তক (সংবাদ = সমূহ; সমূহের নিমিত্ত মাসিক পুস্তক) বদ্ধপত্র। এই কারণে আমি ইহাকে পুস্তক বলিতেছি। সংবাদপত্র ও বারোমাসিক পুস্তক দ্বারা বাংলা ভাষা ও সাহিত্য প্রচারিত হইতেছে। এমন বিষয় নাই যাহা বাংলা ভাষার দ্বারা জনসাধারণের নিকট প্রচারিত হয় না। বাংলা গল্পের বই অগণ্য। প্রতি বৎসর নূতন নূতন গল্পের বই ছাপা হইতেছে।

বর্তমান লেখকেরা ইংরেজি-শিক্ষিত। কেহ কেহ ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্যে প্রবীণ; কেহ-বা সর্বদা ইংরেজি সাহিত্য, সংবাদপত্র, বারোমাসিক ইত্যাদি পড়িয়া থাকেন। ইঁহাদের বাংলা শিক্ষার অবসর হয় না। কেহ-বা বাল্যকালে সংস্কৃত ভাষা অল্প শিখিয়াছিলেন, এখন ভুলিয়া গিয়াছেন। কেহ-বা বাংলা ব্যাকরণ শিক্ষার প্রয়োজন ভাবেন নাই। এইরূপ স্থলে তাঁহাদের রচনায় ইংরেজির অনুকরণ আসা বিচিত্র নয়। শব্দ বাংলা, কিন্তু প্রকাশ বাংলা নয়। উদাহরণ দিতেছি।

ভদ্রতা শিক্ষার উপর 'নির্ভর করে'। পরিশ্রমের উপর সাফল্য 'নির্ভর করে'।

আপনার উপস্থিতি 'প্রার্থনীয়'।

বৌদ্ধ যুগে নারীর 'স্থান'। শিশুশিক্ষায় শিল্পের 'স্থান'। এম. এ. পরীক্ষায় প্রথম 'স্থান' অধিকার করিয়াছে।

হিন্দুধর্মে বৌদ্ধধর্মের 'দান'। বাংলা সাহিত্যে ইসলাম সংস্কৃতির 'দান'।

সভার কার্য 'সাফল্যমণ্ডিত করিবেন'।

'ভাষার কার্য হইতেছে মনের ভাব প্রকাশ করা'।

আচার্য যদুনাথ সরকারের বয়স ৭৮ বৎসর 'পূর্ণ হওয়ায়' বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের 'পক্ষ হইতে' তাঁহাকে সংবর্ধনা করা হইয়াছে। 'এই উপলক্ষে' আমরা তাহার প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিতেছি।

শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি আমরা 'সমবেদনা জানাইতেছি'।

মাতৃভাষার 'মাধ্যমে' শিক্ষাদান।

'দৃষ্টিকোণ' পরিবর্তন করিতে হইবে। মাতৃভাষা শিক্ষার 'বাহন'।

'কাজে যোগদান, গানে যোগদান, প্রার্থনায় যোগদান' ইত্যাদি।

মনে মনে এইসকল বাক্যের ইংরেজি অনুবাদ না করিলে অর্থবোধ হয় না। এইসকল উদাহরণের বাক্যের ভাব বাংলা ভাষায় অক্লেশে প্রকাশ করিতে পারা যায়। এইরূপ বাক্য বাংলা ভাষার প্রকৃতির সহিত মিশিতে পারে না।

কেহ কেহ ঋজু পথে চলিতে পারেন না। ঋজু ভাষায় ভাব প্রকাশ করিতে পারেন না। তাঁহাদের ভাষা জটিল হইয়া পড়ে। কেহ-বা বাগ্‌ভঙ্গি না করিয়া, কেহ-বা একই বিষয় ঘুরাইয়া পাঠককে অকারণ কষ্ট না দিয়া লিখিতে পারেন না। ইংরেজি সংবাদপত্রের ভাষা ফাঁপা। বাংলা সংবাদপত্রেও তাহার অনুকরণ ঘটিতেছে; কিন্তু যিনি যাহাই লিখুন রচনায় প্রসাদগুণ ও মাধুর্য না থাকিলে পাঠক পড়িতে ইচ্ছা করেন না।

সেই ঘাটে খেয়া দেয় ঈশ্বরী পাটনী।
ত্বরায় আনিলা নৌকা বামাস্বর শুনি।।

বাংলা ভাষার প্রকৃত রূপ এখানে স্পষ্ট হইয়াছে। কবিকঙ্কণ চণ্ডীতেও এইরূপ। আরও পুরাতন বড়ুচণ্ডীদাসের কৃষ্ণকীর্তনের ভাষা যেমন প্রাঞ্জল, তেমন মধুর। ইংরেজি আমলেও প্রথম প্রথম বাংলা ভাষার প্রকৃতি অক্ষুণ্ণ ছিল। কেবল পদ্যের ভাষা নয়, গদ্যের ভাষাও বাংলা ছিল। সেকালের সংবাদপত্রের ও পত্রপ্রেরকদিগের ভাষা দেখিলেই বুঝিতে পারা যাইবে। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ও বঙ্কিমচন্দ্রের রচনায় বাংলা ভাষার স্বরূপ রক্ষিত হইয়াছে। বিদ্যাসাগর মহাশয় কেবল *সীতার বনবাস* লেখেন নাই। *কথামালা* লিখিয়াছিলেন। বাল-পাঠ্যপুস্তকে *কথামালা-র* ভাষার লালিত্য কদাচিৎ লক্ষিত হয়। বাংলা ভাষায় নানাবিধ ইতিহাস লিখিত হইয়াছে, কিন্তু কয়খানি ইতিহাসের ভাষায় মাধুর্য আছে? কালী সিংহের *মহাভারত* পড়ুন, তাঁহার ভাষার বৈশিষ্ট্য ও লালিত্য কয়খানা বাংলা ইতিহাসের বইতে আছে?

কেহ কেহ মনে করেন, রচনায় মৌখিক ভাষার সংক্ষিপ্ত ক্রিয়াপদ ব্যবহার করিলে বর্ণনার বিষয় অতিশয় সুবোধ্য হয়। ইহা এক বিষম ভ্রম। হইতেছে স্থানে হচ্ছে, করিতেছে স্থানে কচ্ছে, দেখিয়াছিলাম স্থানে দেখেছিলাম লিখিলে বাক্য সুগম হয় না। বাক্য ছোটো ছোটো হইলে কচ্ছে হচ্ছে কটু শোনায়, পড়িতে ইচ্ছা হয় না। 'মহান প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে হবে'— এখানে 'গড়ে' পীড়িত করিতেছে। তদুপরি 'মহান' প্রতিষ্ঠান শুনিলে হতাশ হইতে হয়। কেহ কেহ 'বলে চলে গেল' লিখিয়া মনে করেন ভারী সোজা ভাষা লিখিলেন। কিন্তু এই ভাষা পড়িয়া বুঝিতে হইলে অন্তত দুইবার পড়িতে হয়। কেহ কেহ 'ব'লে চ'লে গেল' লিখিয়া পাঠককে সাবধান করিয়া দেন, 'বলে চলে' নয়, 'বলিয়া চলিয়া' বুঝিতে হইবে। ব ও চ-এর পরে উৎকলা (') লেখার কোনো যুক্তি নাই। হইত স্থানে হ'ত, হইল স্থানে হ'ল; উৎকলা হ-এর পরে ঠিক বসিয়াছে। তদ্দ্বারা বুঝিতে হয়, একটি ই লুপ্ত বা গ্রস্ত। সেই নিয়মে 'চ'লে ব'লে' পড়িতে হয় 'চইলে বইলে'। ইহা কি পূর্ববঙ্গের অশিক্ষিতের 'চইল্যা বইল্যা'? করিয়া, সংক্ষেপে আমরা বলি করো, 'কইরো' বলি না। এখানে 'করে' লিখিলে বুঝি য-ফলা গ্রস্ত হইয়াছে। কবিকঙ্কণে 'র‍্যান্ধা বাড়্যা' আছে। তখনকার উচ্চারণে ঠিক বানান হইয়াছে। এখন আমরা বলি, 'রেঁধে বেড়ে'। উচ্চারণ অনুযায়ী ঠিক বানান করি।

সেদিন 'পশ্চিমবঙ্গ সরকারের স্বরাষ্ট্র (প্রচার) বিভাগ কর্তৃক বিতরিত' একখানা *কথাবার্তা* নামক পত্রে 'খাদ্য পরিস্থিতি' পড়িতেছিলাম (১৯ জানুয়ারি)। 'অসামরিক সরবরাহ সচিব প্রদেশের খাদ্যাকথা সম্বন্ধে আলোচনা করে বলেন, মাথা পিছু দু'সের চালের বরাদ্দ যদি চালিয়ে যেতে হয় তবে সরকার এ-বৎসর যে পরিমাণ চাউল সংগ্রহ করতে মনস্থ করেছেন তাহলেও পঞ্চাশ হাজার টন চাল ও গম ঘাটতি পড়বে।' আর-একখানি *কথাবার্তা*-য় (১৬ ফেব্রুয়ারি) পড়িলাম, 'সৌন্দর্য জিনিসটা স্বাস্থ্যের ওপরই বেশি নির্ভর করে। আয়ত টানা টানা দুটি চোখ, সুঠাম টিকোলো একটি নাক এবং ফ্যাকাশে রকমের ফরসা রঙের অধিকারী মানুষটিকেও ঠিক সুন্দর বলা চলবে না— জ্যোতিহীন চোখের গড়ন যত ভালোই হোক সে চোখ, স্বাস্থ্যের লক্ষণযুক্ত উজ্জ্বল চোখের তুলনায় কম সুন্দর' ইত্যাদি। এইরূপ ইংরেজি-বাংলো ভাষার পাঠক সহজে পাওয়া যাইবে না। মুসলিম-লিগ-মন্ত্রিত্বকালে *জানবার কথা* নামে একখানা পত্র বিতরিত হইত। তাহার ভাষা মন্দ ছিল না; পড়িতে ও বুঝিতে পারা যাইত। তাহাতে চিত্রে একজন গ্রামবাসী স্বাস্থ্যতত্ত্ব, প্রসূতিতত্ত্ব, কৃষিতত্ত্ব ইত্যাদি নানা জ্ঞাতব্য বিষয় জানাইত। কিন্তু লোকটিকে ম্যালেরিয়া-ভোগী, প্লীহারোগী দেখাইত। *কথাবার্তা*-য় একখানি চিত্র আছে; সে চিত্রের মর্ম কিছুমাত্র বুঝিতে পারিলাম না। এক ঘরের উঠানে এক বৈঠক হইয়াছে। এক কথক এক মুসলমানকে কী বলিতেছে। একজন উদ্‌গ্রীব হইয়া শুনিতেছে। একজন উর্ধ্বজানু হইয়া বসিয়াছে। আর, দুইজন মারোয়াড়ির একজন গা ভাঙিতেছে, আর-একজন বোধ হয় তাহার নিজের ধান্ধা ভাবিতেছে। এক দ্বারপিণ্ডে দণ্ডায়মানা নারীও শুনিতেছে। এইরূপ পরিস্থিতিতে কথাবার্তার শ্রোতা পাওয়া যাইবে কি? এমন অশিষ্ট বাঙালি আছে কি যে এক ভদ্রলোকের পাশে উর্ধ্বজানু হইয়া বসে? এখানে ভাষা দেখিতেছি, সৌন্দর্য-বিশ্লেষণ ছাড়িয়া দিলাম।

অনেকদিন পূর্বে গুপ্তপ্রেস পঞ্জিকায় এক বিজ্ঞাপনের সঙ্গে এক গল্প পড়িয়াছিলাম। বাস্তবিক গল্প নয়। গভর্নমেন্টের এক বিষয়ে কত খরচ হইয়াছে, কেন তত খরচ হইয়াছে, তাহার যুক্তি দেখানো হইয়াছে। প্রচারক ঠিকই বুঝিয়াছেন, গল্প না হইলে কেহ পড়িবে না। ঔষধ তিক্ত, মধুমিশ্রিত না হইলে কেহ সেবন করিবে না। কিন্তু ব্যাপারটি হাস্যকর হইয়া উঠিয়াছে। এই গল্পের পরে স্বাস্থ্য-বিভাগের এক বিজ্ঞাপন আছে। অনাড়ম্বর বিজ্ঞাপন, কিন্তু কাজের হইয়াছে। 'স্বাস্থ্যরক্ষা বিষয়ে কাহারও কিছু জিজ্ঞাস্য থাকিলে অমুক ঠিকানায় পত্র লিখিবেন।' কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, বেঙ্গল গভর্নমেন্টের নামগন্ধও নাই।

দুরূহ বিষয়ে প্রবন্ধ লিখুন, জ্ঞান প্রচার করুন, কিন্তু জ্যাঠামি করিবেন না। কেহ কাহারও জ্যাঠামি সহিতে পারে না। দীর্ঘ গৌরচন্দ্রিকা, ভাবার ভঙ্গিমা, গল্পের ছলনা পাঠকের বিরক্তি সঞ্চার করে। পাঠককে মূর্খ, নির্বোধ না ভাবিলে কেহ জ্যাঠামি করে না।

এতদিন বাংলা ভাষার বাগ্‌রীতি প্রসন্না ছিল। যথা— একদা এক বাঘের গলায় হাড় ফুটিয়াছিল। কিছুকাল হইতে আর দুই রীতি আবির্ভূত হইয়াছে। (১) প্রচণ্ডা। যেমন জ্বর-বিকারে রোগীর হাত-পায়ের আক্ষেপ হয়, ইহা সেইরূপ। যথা— ফুটেছিল হাড় একদা এক বাঘের গলায়। (২) প্রলীনা। যেমন অবসন্ন দেহে ক্লান্তি আসে, দেহ সোজা থাকে না, এলাইয়া পড়ে, ইহা সেইরূপ। যথা— এক বাঘের গলায় হাড় ফুটিয়াছিল, একদা।

প্রচণ্ডা ও প্রলীনা রীতির প্রয়োজন আছে, কিন্তু যেখানে সেখানে প্রচণ্ডা রীতি দেখিলে রঙ্গ-মঞ্চে ভীমসেনের গর্জন মনে হয়। কেহ কেহ প্রলীনা রীতিতে কবিত্ব দেখিতে পান। বাস্তবিক,

কবিত্ব নয়, জ্যাঠামি। যথাস্থানে যথাযোগ্য শব্দবিন্যাস দ্বারা চিন্তা ও মনের ভাব সম্যকরূপে প্রকাশ করিতে না পারিলে রচনা সার্থক হয় না। বাংলা দেশকে গল্পরূপ ভূত পাইয়া বসিয়াছে। গল্প নয়, কিন্তু বহির নাম গল্প রাখা হইতেছে। গীতার গল্প, চণ্ডীর গল্প, রামায়ণের গল্প, কালিদাসের গল্প, শরীরের গল্প ইত্যাদি নাম হইতে বিষয় বুঝিতে পারা যায় না। বাঙালি পাঠক গল্প পড়িয়া পড়িয়া তরলমতি হইয়া পড়িতেছে। যে রচনা বুঝিতে হইলে ধীরে ধীরে পড়িতে হয়, প্রত্যেক শব্দ বুঝিয়া যাইতে হয়, তাহা পাঠকের প্রীতিকর হয় না। প্রত্যহ লঘু আহার করিলে দেহের পরিপাক-শক্তির হ্রাস হয়, গল্প পড়িয়া পড়িয়া পাঠকের চিত্তও তরল হয়। পরে গল্প পড়িতেও তাহার ধৈর্য থাকে না। গল্প-লেখক কত স্থানে কত অলংকার আনিয়াছেন, মনোবৃত্তির বিশ্লেষণ করিয়াছেন, ভাষার বৈচিত্র্য দেখাইয়াছেন। কিন্তু পাঠক এসকল বিষয় লক্ষ করেন না। তিনি গল্পের বহির পাতা উলটাইতে থাকেন, আর তার পর কী, তার পর কী, খুঁজিতে থাকেন। এক বিশেষ কারণে আমাকে এক গল্পের বই পড়িতে হইয়াছিল। লেখক মহাশয় ভাষাচাতুর্যে ও ইতিহাসজ্ঞানে নৈপুণ্য দেখাইয়াছেন। ৪/৫ টি গল্পের সমষ্টি পড়িতে দুই দিনে চারি ঘণ্টা লাগিয়াছিল। সেই বই এক বি. এ. পাস তরুণ দুই ঘণ্টায় শেষ করিয়াছিল। গল্পের এই পরিণাম লেখক মহাশয়েরা অবগত আছেন কি না জানি না।

বিষয় যাহাই হউক, ভাষা ভুল থাকিলে পাঠক বিরক্ত হন। ভুল অনেকপ্রকার হইতে পারে। শব্দের বানান ভুল, প্রয়োগ ভুল, অর্থ ভুল, এবং বাক্যের ব্যাকরণ ভুল বারোমাসিক পুস্তকে প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায়। বোধ হয় সেরকম ভুল লেখকের পুস্তকেও ঘটে। দুই-এক খানা বারোমাসিকের পাতা উলটাইতে উলটাইতে কতকগুলি ভুল দেখিয়াছি। উদাহরণ দিতেছি।

সংবাদপত্র-প্রচার ও শিক্ষা-বিস্তার দ্বারা বঙ্গের সর্বত্র লৈখিক ভাষার সমতা আসিয়াছে। শব্দের বানান দ্বারা শব্দের রূপ স্থির থাকে। উচ্চারণ সর্বত্র সমান নয়, হইতে পারে না। কোথাও অনুনাসিক চন্দ্রবিন্দু-উচ্চারণ প্রচুর, কোথাও নাই। কোথাও ড় ঢ় অক্লেশে উচ্চারিত হয়, কোথাও হয় না। সামাজিক ব্যবস্থা সর্বদা পরিবর্তনশীল হইলে সমাজের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়। ভাষা এক সামাজিক উপায়। ইহার একরূপতা রক্ষা না হইলে ইহার উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়। কালান্তরে অল্পে অল্পে পরিবর্তন হইলে সামাজিক অপর ব্যবস্থার তুল্য ভাষাব্যবস্থাও সমাজের হিতকর হয়। শব্দের বানান হঠাৎ পরিবর্তন করিলে কিংবা কোনো ব্যক্তির বা গোষ্ঠীর বা গণের উচ্চারণ অনুসারে শব্দের বানান পরিবর্তন করিলে ভাষাবিপ্লব ঘটে। যেমন জীবজাতির পরিণাম শ্রেয়স্কর কারণ তদ্দ্বারা সে দেশ ও কালের পরিবর্তনের সহিত সামঞ্জস্য করিয়া আপনাকে রক্ষা করিতে সমর্থ হয়, তেমন ভাষার হয়, ভাষার যাবতীয় অঙ্গেরও হয়। ব্যাকরণ ভাষার পরিণাম স্বীকার করিবেন, কিন্তু বিবর্তন স্বীকার করিবেন না। ব্যাকরণ পরিণামের সূত্র রচনা করিবেন, ভাষার রূপ বাঁধিয়া দিবেন, কোশে সে সূত্র অনুযায়ী শব্দের বানান, অর্থ, প্রয়োগ পাওয়া যাইবে। কদাচিৎ বহুল প্রয়োগ রক্ষা করিয়া এই তিনেরই ব্যতিক্রম ঘটে। কিন্তু সাধারণত ভাষাকে রক্ষণশীল হইতেই হইবে।

এতকাল জানিতাম, ক বর্গের অনুনাসিক ঙ, চ বর্গের ঞ, ট বর্গের ণ, ত বর্গের ন, প বর্গের ম, এবং য র ল ব শ ষ স হ, এই আট অবর্গ বর্ণের অনুনাসিক ং (অনুস্বার)। এখন দেখিতেছি অনুনাসিক ঙ স্থানে ং লেখা হইতেছে। পূর্বে সম্ উপসর্গের ম্ স্থানে কোনো কোনো শব্দে ং লেখা হইত। প্রায় ষাট বৎসর পূর্বে আমি একখানা বইতে 'সংখ্যক' লিখিয়াছিলাম। মুদ্রাকর আমার বানান কাটিয়া 'সঙ্খ্যক' করিয়াছিলেন। তৎকালে সংখ্যা, সংগ্রাম, সংগ্রহ, সংক্ষেপ বা সংক্রান্তি, ইত্যাদি মাত্র

কয়েকটি শব্দ ং দেখা যাইত। সংস্কৃত পুস্তকে ক বর্গের পূর্বে একটা শব্দেও থাকিত না। এখনও থাকে না। পাঁচ-সাত বৎসর হইতে নব্য লেখকেরা অনুনাসিক ঙ বর্জন করিয়া সকল শব্দেই ং লিখিতেছেন। শংকা, কলংক, মংগল, সংগীত, সংঘ ইত্যাদি শব্দের বহু প্রচলিত ঙ স্থানচ্যুত হইতেছে। ইহার একটি কারণ, ক-এর মস্তকে শয়ান ঙ অক্ষর স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায় না এবং সকলে লিখিতেও পারেন না। গ অক্ষরের মস্তকে ঙ পরস্পর যুক্ত হইয়া গিয়াছে। সকলে 'ঙ্গ' লিখিতেও পারেন না। তাঁহারা স্পষ্ট ঙ লিখিয়া পাশে ক কিংবা গ স্বচ্ছন্দে লিখিতে পারেন। ঙ্খ, ঙ্ঘ, সেইরূপই লেখা হইয়া থাকে। দিঙ্‌নির্ণয়, দিঙ্‌মুখ শব্দেও ঙ স্পষ্ট। এইরূপ ঙ্ক, ঙ্গ লিখিলে ং লিখিবার কোনো হেতু থাকে না। সংস্কৃত ব্যাকরণে কিংবা বাংলা ব্যাকরণে ঙ স্থানে ং, এই বিকল্প বিধি নাই। বিকল্প বিধির দোষ এই, লেখককে অকারণ ভাবনায় পড়িতে হয়। কেহ দিল্লি যাইতেছেন; কিছুদূর গিয়া দেখিলেন, দিল্লি যাইবার আর-এক পথ আছে। তখন তাঁহাকে ভাবিতে হয়, তিনি কোন্ পথে যাইবেন। বুদ্ধিমান হইলে 'মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ' অর্থাৎ বহুজন যে পথে গিয়াছে সেই পথই ধরিবেন। 'বাংলা', এই বানান ঠিক, কিন্তু বাংলা লিখিবার কী যুক্তি আছে? বঙ্গ হইতে বঙ্গাল, বঙ্গালা, বাঙ্গালি। অপর প্রদেশে আমরা বঙ্গালি নামে পরিচিত। তাঁহারা বাঙাল জানেন না। প্রায় সাত কোটি বাংলাভাষীর কয় জন 'বাংলা বাঙালি' উচ্চারণ করিতে পারেন? সত্য কথা বলিতে কী, 'বাঙালি' দেখিলে আমি 'বাওঁআলী' পড়ি। কারণ, বাঙন (বামন), শাঙন (শ্রাবণ), কুঙার (কুমার), কাঙর (কামরূপ), 'পাখীজাতি যদি হঙ, পিয়াপাশে উড়ি যাঙ', 'ধামসা ধাঙ ধাঙ' ইত্যাদি উদাহরণে ঙ অক্ষরের উচ্চারণ স্পষ্ট হইয়াছে। সুখের বিষয়, সকলে 'বাঙলা বাঙালী' লেখেন না।

সংস্কৃত যেসকল শব্দে অনুনাসিক আছে, বাংলা রূপান্তরে সেসকল শব্দে চন্দ্রবিন্দু লেখাই বিধি। যেমন, দন্ত দাঁত, অঙ্ক আঁক। দুই-একটা ব্যতিক্রম আছে। যেমন, লম্ফ লাঁফ নয়, লাফ। কিন্তু দেখি, বিমান 'ঘাঁটি'। ঘট্ট হইতে ঘাট, ঘাটি, ঘাটিয়াল বা ঘেটেল, ঘাটোয়াল শব্দ আসিয়াছে; একটাতেও চন্দ্রবিন্দু নাই। নূতন কলসিতে জল চুইয়া পড়ে, 'চুঁইয়া' পড়ে না। ভাত চুঁইয়া যাইতে পারে। জোয়ার-'ভাঁটা' নয় 'জোয়ার-ভাটা'। সংস্কৃত খুজ ধাতু হইতে বাংলা খুজ ধাতু। পশ্চিমবঙ্গের অসংখ্য লোক 'খুজি, খোজাখুজি' বলে, 'খুঁজি, খোঁজাখুঁজি' বলে না। বোঝার উপর শাকের আঁটি হইবে 'বোঝার উপর শাগের আটি' (বাংলা শাগ ও সংস্কৃত শাক এক দ্রব্য নয়)। কিন্তু, আমের আঁঠি, পায়ের আঁঠু।

অন্তঃস্থ-ব (ব) পরে থাকিলে সম্ উপসর্গের ম্ স্থানে অনুস্বার হয়। হয় কারণ ং অবর্গবর্ণের অনুনাসিক। এইরূপে সংস্কৃতে 'কিংবা', 'বশংবদ', 'সংবাদ' লিখিত হয়। কিন্তু বাংলায় অন্তঃস্থ-ব উচ্চারিত হয় না। আমরা বর্গীয়-ব জানি। ম ইহার অনুনাসিক। সেই হেতু লিখি, সম্বৎসর, সম্বরণ, সম্বলিত, সম্বাদী, সম্বর্ধনা। পূর্বে 'সংবাদ' ছিল না, সম্বাদ ছিল। কিংবা, বশম্বদ এখনও আছে। কিংবা, বশংবদ লেখা পাণ্ডিত্যমাত্র।

ইংরেজি and-এর নানারকম বাংলা বানান দেখিতে পাই। এন্ড বানান প্রচলিত ছিল। কিন্তু atom শব্দের বাংলা বানান য়্যাটম, অ্যাটম, এ্যাটম, এইরূপ দেখি। আমি এ্যাটম লেখা সংগত মনে করি। কিছুদিন হইতে 'মাস্টার', 'স্টেশন' দেখিতেছি। কিন্তু আমরা বলি, মাষ্টার, এষ্টেশন, ষ্ট্রিট; এই বানানই ঠিক। ইংরেজি কী অপর ভাষার শব্দের উচ্চারণ আমরা সে সে ভাষা অনুযায়ী করি না। আমরা ইস্তেহার, গোমস্তা, খোশামোদ, তমসুক, নোটিশ, পুলিশ ইত্যাদি বলি ও লিখি। এ পর্যন্ত কেহ আমাদের উচ্চারণ-দোষ ধরেন নাই।

সেদিন দেখিতেছিলাম, কেহ লিখিয়াছেন, 'তাদেরকে পাঁচ টাকা দিও'। 'তাদেরকে' 'আমাদেরকে' ইত্যাদি স্থানবিশেষের গ্রাম্য প্রয়োগ শুদ্ধ ভাষায় চলিতে পারে না। 'তাদের বলে ধরে এনো'। এই বাক্যের কী অর্থ হইবে কে জানে? সে বল্লো, আমি যাবো, দেখবো; সে যেতো, দেখতো; দেখলো, হলো ইত্যাদি বারোমাসিকের পৃষ্ঠায় দেখিয়াছি। 'মশারা জলে ডিম পাড়ে', 'গাছেরা রোদে পাতা মেলিয়া দেয়', এইরূপ ভাষা দেখিলে মনে হয় বাংলা প্রেসে প্রুফ-রিডার অর্থাৎ প্রুফ-শোধকও নাই। থাকিলে, সাধু ভাষার ওপর, ভেতর, বের ইত্যাদি স্থানবিশেষের ভাষা দেখিতাম না। 'তাদের ভেতর কেহ সাহসী ছিল না', 'দশদিনের ভিতর দেখা করিবে', 'ছোট বেলায় দেখিয়াছি', 'অনেকগুলি বই পড়িতে হয়', 'সব কিছু বাকি আছে', 'অনেক কিছু করিবার আছে', 'তাদেরকে ডাক' ইত্যাদি প্রয়োগ স্থানবিশেষের ভাষা, বাংলা নয়, "একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিলেন", 'একটা ভয় বোধ করিলেন' ইত্যাদি প্রয়োগ ইংরেজি না বাংলা, বুঝিতে পারা যায় না। হাজার হাজার ছাত্র পরীক্ষা 'দিতেছে'। কেহ পাস 'করে', কেহ ফেল 'করে'। কেহ ট্রেন মিস 'করে', কাহারও হার্ট ফেল 'করে'। এইরূপ ভাষা শুদ্ধ কী অশুদ্ধ, লেখকেরা চিন্তা করেন না। ছাত্রেরা পরীক্ষা 'দেয়' না নেয়? ছাত্রেরা আপনাদিকে পাস করে ফেল করে, না, পরীক্ষক করেন? বাংলা ভাষায় ইংরেজি ক্রিয়াপদ বিশেষণরূপে ব্যবহৃত হয়। হার্ট ফেল হয়, ট্রেন মিস হয়, কেহ পাস হয়, কেহ ফেল হয় ইত্যাদি। পরীক্ষকেরা পরীক্ষা দেন, ছাত্রেরা তাহা গ্রহণ করে।

আমরা বাংলা ভাষার গৌরব করি। যাহাতে সে ভাষা স্বকীয় রূপ পরিত্যাগ না করে, লেখক মাত্রেরই দৃষ্টি রাখা কর্তব্য। নূতন শব্দ আসুক, দেশিবিদেশি শব্দ ও ভাব আসুক, তদ্দ্বারা বাংলাসাহিত্য পুষ্ট হইবে। কিন্তু দেখিতে হইবে, বাংলা ভাষার ধাতুর সহিত, বাংলা ভাষার ঐতিহ্যের সহিত মিশিতেছে। নচেৎ অন্য প্রদেশের পাঠকের নিকট বাংলা ভাষা অপাঠ্য হইয়া থাকিবে।

ইংরেজির বাংলা

বঙ্গের দৈনিক সংবাদপত্রে বিস্ময়কর ক্ষমতা জন্মিয়াছে। কেহ সন্ধ্যাবেলায় ইংরেজিতে বক্তৃতা করিলেন; পরদিন সকালবেলায় দেখি দৈনিক সংবাদপত্রে তাহার বাংলা ভাষান্তর বাহির হইয়াছে। বক্তৃতার পরেই বাংলা অনুবাদ হইয়াছে; রাত্রে ছাপা হইয়া গিয়াছে। সেইরূপ, কেহ সন্ধ্যাবেলা বাংলায় বক্তৃতা করিলেন, পরদিন প্রাতে সে বক্তৃতা ইংরেজিতে পড়িতেছি। ইংরেজি যেমন তেমন ভাষা নয়, আর বক্তৃতাও এক বিষয়ে নয়। অনুবাদ কোথাও কোথাও ভুল থাকিতে পারে। কিন্তু তদ্দ্বারা অনুবাদকের ক্ষমতার লঘুতা হয় না।

দৈনিক পত্রের সম্পাদক ও বাংলা অনুবাদক ভাবিবার সময় পান না। অনেকে ইংরেজি শব্দ বাংলা অক্ষরে লিখিতেছেন। অনেকে ইংরেজি শব্দের বাংলা অনুবাদ করিতেছেন, ক্রমে ক্রমে সংস্কৃত শব্দের অর্থান্তর ঘটাইতেছেন। দেখি, গণপরিষদ, গণতন্ত্র, গণশিক্ষা, গণসমিতি। 'গণ' শব্দ সংস্কৃত এবং ইহার সংস্কৃত অর্থ বাংলা ভাষায় বহু প্রচলিত আছে। যেমন, বালকগণ, অর্থাৎ বালক নামে যে গণ (group বা genus) আছে তাহাকে বুঝায়। অতএব 'জন' শব্দের পরিবর্তে 'গণ' বলিতে পারি না। লৈখিক ভাষায় ভ্রম একবার প্রবেশ করিলে তাহার সংশোধন অতিশয় দুঃসাধ্য হয়। যাঁহারা পুস্তক রচনা করেন ও বারোমাসিক পুস্তকে প্রবন্ধ লেখেন তাঁহারা ভাবিয়াচিন্তিয়া লিখিবার অবকাশ পান। তাঁহাদের ভুল নিন্দনীয়, স্বীকার করিতে হইবে।

ইংরেজি ভাষা অতিশয় সমৃদ্ধ। তাহার তুলনায় বাংলা কিছুই নয়। দ্রব্যের বৈজ্ঞানিক নাম ও পরিভাষা ছাড়িয়া দিলেও সামান্য সংসারযাত্রা নির্বাহের নিমিত্ত প্রয়োজনীয় দ্রব্যের নাম এবং দ্রব্যের গুণ ও ক্রিয়ার ভেদবাচক শব্দ এত আছে যে, বাংলা ও সংস্কৃত ভাষায় তাহার শতাংশও নাই। Plan, Scheme, Design, Project শব্দগুলির অর্থ এক নয়। কিন্তু বাংলায় এক 'পরিকল্পনা' আশ্রয় লইয়াছে। সভ্যতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজি ভাষার শব্দ অল্পে অল্পে বাড়িয়া উঠিয়াছে। আমরা সে সুযোগ পাইতেছি না। হঠাৎ নদীর বন্যার মতো নানাজাতীয় ভাব ও ক্রিয়া বাচক শব্দ আসিয়া পড়িয়াছে। বাংলা ভাষার প্রসার করিতে হইলে নূতন নূতন শব্দ সংকলন ও রচনা করিতে হইবে। কয়েকজন বিজ্ঞ এই কর্মে রত থাকিলে অল্পে অল্পে বাংলা ভাষার বর্তমান দৈন্য দূরীভূত হইতে পারিবে। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ বাংলা ভাষার পুষ্টিসাধনে ব্রতী হইতে পারেন।

ইংরেজি শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ দুই প্রকারে রচনা করিতে পারা যায়। (১) শব্দান্তর; (২) শব্দের ভাবানুবাদ। যে শব্দ দ্বারা ইংরেজি শব্দের ভাব রক্ষিত হয় সেই শব্দই শুদ্ধ। ইংরেজি Use শব্দের বহু অর্থ আছে। বাংলায় সর্বত্র 'ব্যবহার' লিখিলে বাংলা ভাষার স্বরূপ রক্ষিত হয় না। আমরা ভাত খাই, কাপড় ও জুতা পরি; চশমা পরি, গাড়িতে চড়ি ইত্যাদি স্থলে 'ব্যবহার' লিখিলে বাংলা হয় না। এইরূপ প্রত্যেক শব্দের ভাবানুবাদ করিয়া লইতে হয়। এখানে কয়েকটা ইংরেজি শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ বিচার করিতেছি।

Situation— পরিস্থিতি শব্দটি মন্দ নয়, কিন্তু অনাবশ্যক। অবস্থা শব্দ বহু প্রচলিত। Food Situation— খাদ্য পরিস্থিতি। অর্থাৎ বলিতেছি, খাদ্যের অবস্থা। কিন্তু বলিতে চাই, অন্নকষ্ট।

Damodar Valley Project— দামোদর বাঁধ পরিকল্পনা। ইহা অপেক্ষা 'দামোদরের আড়বাঁধ প্রযুক্তি' ভালো মনে হয়।

Plan— উপায়-কল্পনা, উপায়-সন্ধান।

Ten Year Plan— দশ বৎসরের উপায় নির্দেশ।

Scheme— আমি প্রকল্প করিয়াছি।

Inflation— মুদ্রাস্ফীতি। মুদ্রা স্ফীত হইবে কেমন করিয়া? মুদ্রা শূন্যগর্ভ হইলে স্ফীত হইতে পারিত। Inflation মুদ্রাবাহুল্য। কলিকাতায় হিন্দিভাষী বাংলা ভাষার রূপান্তর ঘটাইতেছেন। কাপড় ধোলাই, মদ চোলাই, কাগজওয়ালা, মিঠাইওয়ালা, পাহারাওয়ালা ইত্যাদি বাংলা শব্দ নয়। 'চাহিদা' কোথা হইতে আসিল? শব্দটির বাংলা রূপ দিলে চাহ (প্রার্থনা) + তি = চাহতি, বা চাহতা হইতে পারে। Demand and Supply, চাহতি ও যোগানি, চলিতে পারে।

Vitamin— খাদ্যপ্রাণ। ইহা এক অদ্ভুত আবিষ্কার। খাদ্যের প্রাণ, না খাদ্যরূপ প্রাণ, না আর কিছু? আশ্চর্যের বিষয়, বালকের পাঠ্যপুস্তকেও বহুকাল হইতে 'খাদ্যপ্রাণ' চলিয়াছে। কে এই শব্দের জনক জানি না। নিশ্চয়ই তিনি ডাক্তার নহেন। তিনি জানেন, প্রাণ সুলভ নয়, দুই-এক আনায় কিনিতে পাওয়া যায় না। বহুকাল পূর্বে আমি পাললীয় (পলল হইতে পালো, Carbohydrate), পলীয় (পল মাংস, protein), স্নেহ (fat) পার্থিব (mineral), এই নাম চতুষ্টয় প্রস্তাব করিয়াছিলাম। এইরূপ শব্দের সহিত সংগতি রাখিয়া ভাইটামিন শব্দের 'পোষ', এই নাম রাখা যাইতে পারে।

Basic Education— বুনিয়াদি শিক্ষা। ইহা আর-এক আশ্চর্য শব্দ। বনিয়াদি ঘর জানি, বুনিয়াদি ঠাট জানি। বনিয়াদি (বাংলায় বুনিয়াদি নয়) সুপ্রতিষ্ঠিত। কিন্তু Basic Education সুপ্রতিষ্ঠিত শিক্ষা নয়। বনিয়াদি শিক্ষা বলিলে বুঝি, যে শিক্ষার বনিয়াদ বা মূল আছে। কিন্তু Basic

Education তাহা নহে। যে শিক্ষা প্রথম বা আদ্য, যাহার পরে অন্য শিক্ষা আসে, সেই শিক্ষা বুঝায়। অতএব Basic Education প্রাথমিক শিক্ষা বা আদ্যশিক্ষা। এই শিক্ষার রূপ কী হইবে, বিদ্যাশ্রয়ী অথবা কলাশ্রয়ী হইবে, সে কথা ভিন্ন। গান্ধিজির শিক্ষাপ্রকল্পে এই প্রশ্নের একটা উত্তর ছিল। তিনি চাহিতেন, শিশুকে আমাদের প্রয়োজনীয় দ্রব্য নির্মাণ শিক্ষা দিতে হইবে এবং তাহাকে আধার করিয়া শিশুকে সুশীল ও জ্ঞানবান করিতে হইবে। শিশু বুঝিবে, সে এমন দ্রব্য নির্মাণ করিতেছে যাহা লোকে চায় ও কেনে। অর্থাৎ, তাহার মনে এমন ভাব জাগাইতে হইবে যে সে মানুষ হইয়াছে। সে চরকায় সূতা কাটিবে কী শাগপালা বুইবে তাহা শিক্ষক বিবেচনা করিবেন। ছাত্রছাত্রীদের নির্মিত দ্রব্য বিক্রয় দ্বারা বিদ্যালয়ের আংশিক ব্যয় নির্বাহ হইতে পারিবে। তাঁহার প্রকল্পে ইহাও উদ্দেশ্য ছিল।

Scheduled Caste— তপশিলি জাতি। 'অনুন্নত জাতি' এই সংজ্ঞায় উদ্দিষ্ট জাতি বুঝিতে অসুবিধা হইত না। ব্রিটিশরাজ Scheduled Caste বলিয়া এই নূতন জাতির সৃষ্টি করিয়াছে। 'অনুন্নত' সংজ্ঞা অপেক্ষা 'তপশিলি' আরও অবজ্ঞাজনক। এই নামে বুঝায়, এই জাতি হিন্দুসমাজের বহির্ভূত। মহাত্মা গান্ধির 'হরিজন' সংজ্ঞা করুণা প্রকাশ করে। বঙ্গদেশে ইহা অগ্রাহ্য হইয়াছে। মহানির্বাণ তন্ত্রে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র ও সামান্য, এই পাঁচ জাতিতে হিন্দুসমাজ বিভক্ত। 'সামান্য জাতি' Common People ; এই সংজ্ঞা নির্দোষ মনে হয়।

Chief guest of a meeting— সভার প্রধান অতিথি। দশ-বারো বৎসর হইতে সভায় বক্তৃতা করিবার নিমিত্ত chief guest বা guest-in-chief নামক এক নূতন পদের আবির্ভাব হইয়াছে। সভা করিতে গেলে একজন উদ্‌বোধক চাই। তিনি সভাপতি নহেন। আর-একজন Guest চাই, তিনি সভার উদ্দেশ্যের ও কৃতকার্যের প্রশংসা করিবেন। বোধ হয় পূর্বকালে মাগধ সূত বা ভাটেরা এই কর্ম করিতেন। তাঁহারা বৃত্তিভোগী ছিলেন। Chief guest বৃত্তিভোগী নহেন; তিনি ভাটক পান না, তিনি অবৈতনিক বক্তা। তিনি যাহাই হউন, অতিথি নহেন। যতদিন বঙ্গদেশে অতিথিশালা, অতিথিসেবার নিমিত্ত ভূমি আছে, ততদিন সভার প্রধান বক্তা অতিথি হইতে পারেন না। আমি জানি, পূর্ববঙ্গে গৃহে অভ্যাগত, আগন্তুক, নিমন্ত্রিত, কুটুম্ব, বন্ধু ইত্যাদি সকলকেই অতিথি বলা হয়। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে ইঁহাদিগকে অতিথি বলিলে ইঁহারা ক্ষিপ্তপ্রায় হইবেন। Chief guest আমন্ত্রিত।

Pre-Historic— প্রাগৈতিহাসিক। পণ্ডিত শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্তী *প্রবাসীতে* এই প্রাক্ শব্দের অপপ্রয়োগ দেখাইয়াছিলেন। তিনি আরও কতকগুলি শব্দের ভুল ধরিয়াছিলেন। যেমন, অর্ধবাৎসরিক। কিন্তু কার কথা কে শুনে? ইতিহাসের পূর্ব যুগে, চৈতন্যদেবের পূর্বে, লেখাই ঠিক।

গঠনমূলক কর্ম, বাধ্যতামূলক শিক্ষা, ইত্যাদির 'মূলক' বর্জন করিলে বাংলা পুষ্ট হয় না। গঠনমূলক কর্ম, গঠন কর্ম ভিন্ন আর কী? বাধ্যতামূলক শিক্ষা, Compulsory Education, আমার মতে আবশ্যক শিক্ষা বলা ভালো।

বস্তুতান্ত্রিক, এই নবনির্মিত শব্দটির অর্থ বুঝিতে পারি নাই। রাজতন্ত্র প্রজাতন্ত্র বুঝি। চরক আয়ুর্বেদতন্ত্র, আর্যভট্ট জ্যোতিষতন্ত্র রচনা করিয়াছিলেন। শাক্ততন্ত্র প্রসিদ্ধ। তন্ত্র শব্দের প্রথম অর্থ তাঁতের টানা। তাঁতে যেমন টানা পড়িয়ান দিয়া বস্ত্র নির্মিত হয়, সেইরূপ, যে শাস্ত্রে সূত্রের পরস্পর যোগ দ্বারা কোনো বিদ্যা সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় সে শাস্ত্রের নাম তন্ত্র। তন্ত্র Systematic Knowledge, System না থাকিলে তন্ত্র বলা চলে না। এই মূল অর্থ হইতে তন্ত্র শব্দের বহুবিধ অর্থ আসিয়াছিল। সেখানেও System অন্তর্নিহিত আছে। বস্তুতন্ত্র বলিলে কী অর্থ দাঁড়ায়, বুঝিতে পারি না।

এইরূপ নূতন নূতন অসংখ্য শব্দ রচিত হইতেছে। ইংরেজি শব্দের ভাবার্থ লক্ষ রাখিয়া নূতন শব্দ সংকলন করিতে হইবে। শব্দান্তররীতি গ্রহণ করিলে বহু শব্দ বাংলা ভাষায় প্রবিষ্ট হইতে পারিবে না। ইংরেজিতে অনুবাদ না করিয়া যে নবরচিত শব্দ বুঝিতে পারা যায় সেই শব্দই টিকিবে। যেমন প্রতিক্রিয়াশীল যে অর্থে প্রযুক্ত হইতেছে শব্দ হইতে সে অর্থ আসে না। নৈতিক জীবন, সাহিত্যিক জীবন, পাঠ্যজীবন, কর্মজীবন, কবিজীবন, জাতীয় জীবন ইত্যাদি এক জীবনে কত অতিদেশ করা যাইবে? অনুকরণ দ্বারা কোনো ভাষা শক্তিশালী হইতে পারে না।

সরকারি কার্যে ব্যবহার্য পরিভাষা

ভারত স্বাধীন হইবার পর পশ্চিমবঙ্গরাজ ঘোষণা করিয়াছিলেন, অতঃপর বাংলা ভাষায় রাজকার্য পরিচালনা করিতে হইবে। কিন্তু এই আদেশ পালন করা সোজা নয়। অসংখ্য রাজকর্মচারী, অসংখ্য পদ, এযাবৎ আমরা ইংরেজিতে শুনিয়া আসিতেছি। এখন হঠাৎ বাংলা শব্দ কোথায় পাওয়া যাইবে? এক পরিভাষা সংসদ আবশ্যক পরিভাষা নির্মাণ করিয়াছেন। তাহার প্রথম স্তবক দেড় বৎসর পূর্বে প্রকাশিত হইয়াছিল। অধিকাংশ শব্দ উত্তম হইয়াছে। সংসদের বিদ্যাবত্তা, ধৈর্য ও বিচক্ষণতা প্রশংসনীয়।

এই স্তবকে প্রায় আট শত শব্দ আছে। তন্মধ্যে প্রায় চল্লিশটি ফারসি ও চল্লিশটি ইংরেজি। অর্থাৎ সাত শতের অধিক শব্দ সংস্কৃত। পরিভাষা যে সংস্কৃত হইবে, ইহাতে নূতন কিছুই নাই। বাংলা ভাষাই তো সংস্কৃত ভাষার এক প্রাকৃত রূপ। কিন্তু প্রথম চিন্তা আসিতেছে, এত যত্নের পরিভাষা টিকিতে পারিবে কি? দেখিতেছি, ভারতরাষ্ট্রভাষা হিন্দুস্থানি অথবা উর্দু-হিন্দি হইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা হইয়াছে। তখন মন্ত্রী মহাশয় উজির হইবেন কী আর কিছু হইবেন, গভর্নর থাকিবেন কী সুবেদার হইবেন, কিছুই জানিতে পারিতেছি না। দ্বিতীয়ত সকল প্রদেশে Judge, Magistrate, Commissioner, Superintendent of Police ইত্যাদি অসংখ্য পদ থাকিবে। উচ্চ পদের একই নাম না থাকিলে এক প্রদেশের বার্তা অন্য প্রদেশে বুঝিতে পারা যাইবে না। কথাটা দাঁড়াইতেছে, পদের নামের অথবা অধিকৃতের নামের সমতা কে রক্ষা করিবে? এই ক্ষমতা ভারতরাষ্ট্রের আছে, রাষ্ট্রের অধীন রাজ্যের নাই। সংস্কৃত রাষ্ট্রভাষা হইলে পরিভাষার যে আকার হইত, হিন্দুস্থানি বা উর্দু-হিন্দি হইলে সে আকার থাকিবে না। তৃতীয়ত, ইংরেজ রাজত্ব গিয়াছে বটে, কিন্তু তাহার প্রভাব ও লক্ষণ আমাদের অন্তরে-বাহিরে পুঞ্জীভূত হইয়া আছে। উচ্চশিক্ষিতেরা আধা-ইংরেজ, বাংলায় ভাবিতে পারেন না। বাংলায় কিছু লিখিতে হইলে প্রথমে ইংরেজিতে লেখেন। শিক্ষিত মহিলা ইংরেজি শব্দ অন্তঃপুরে লইয়া গিয়াছেন। তাঁহার বেশে তাঁহার ভূষণে ইংরেজের প্রভুত্ব প্রকটিত আছে। ফলে কী দাঁড়াইবে, বুঝিতে পারা যাইতেছে না। তথাপি সংসদ-কৃত পরিভাষা সম্বন্ধে দুই-পাঁচটা টিপ্পনী করিতেছি।

সপ্তশতাধিক সংস্কৃত শব্দের মধ্যে 'সরকার' শব্দ 'হংসমধ্যে কাকো যথা' হইয়াছে। বহুকাল হইতে 'সরকারি' শুনিয়া আসিতেছি, যেমন, সরকারি রাস্তা, সরকারি উকিল, সরকারি ডাক্তার ইত্যাদি। কিন্তু সরকার যে কে, তাহা অব্যক্ত থাকিত। গ্রামে পাঠশালার গুরুমশায় সরকার, কলিকাতায় বাজার সরকার, শিপ সরকার ইত্যাদি আছে। পরিভাষা সংসদ রোক সরকার, আদায় সরকার করিয়াছেন। ইহাদের সহিত পশ্চিমবঙ্গ সরকার কীরূপ মানাইবে?

অনেক কাল পূর্বে অসহযোগ আন্দোলনের সময় অনেক ভদ্রলোকের ছেলে কারারুদ্ধ হইয়াছিল। কারার এক বিধি ছিল, কর্তাকে দেখিলে কয়েদিকে দাঁড়াইয়া 'সরকার সেলাম' বলিতে হইত। ছেলেরা বিদ্রোহী হইয়াছিল। এখানে 'সরকার' অর্থে প্রভু এবং তাহাই সরকার শব্দের মূল অর্থ। আর-এক অর্থ প্রদেশ; যেমন, ভারতের উত্তর সরকার। গ্রামবাসী গভর্নমেন্ট জানে বুঝে, কিন্তু সরকার অদ্যাপি শুনে নাই। কোনো কোনো সংবাদপত্রে সরকার শব্দ দেখিয়াছি, এই পরিভাষা প্রকাশের পর হইতে এই ব্যবহার দেখিতেছি। পূর্বে গভর্নমেন্ট (গবর্নমেন্ট নয়) লেখাই রীতি ছিল। সরকার শব্দে আর-এক গুরুতর আপত্তি আছে। এই শব্দের সহিত Govern, Governor, Governing body ইত্যাদির কোনো সংশ্রব নাই। রাজকার্যে সরকার শব্দ একক থাকিবে, অন্য শব্দের সহিত যুক্ত হইতে পারিবে না।

মহামহিম (His Excellency) গভর্নরকে 'দেশপাল' বলিলে তাঁহাকে অপর নানাবিধ 'পাল'-এর এক পাল, অর্থাৎ রক্ষক মনে হয়। কোট্টপাল (কোতোয়াল), দিকপাল (দিগার, বর্তমান চৌকিদার), ঘট্টপাল (ঘটোয়াল) ইত্যাদি শব্দের অর্থে রক্ষক। আর পরিভাষা সংসদ অনেকপ্রকার 'পাল' আনিয়াছেন। পরিষৎপাল Speaker of an Assembly, নগরপাল Commissioner of Police, বনপাল Conservator of Forests ইত্যাদি। ভূপাল নৃপাল শব্দে রাজা বুঝি, কিন্তু নামে তাঁহারা একটা ক্ষুদ্র রাজ্যের রাজা নহেন। গভর্নরকে রাজা না বলিলে কাহার মন্ত্রী, কাহার রাজস্ব, রাজপুরুষ, রাজকর্মচারী, রাজভৃত্য, রাজমার্গ, রাজকোশ ইত্যাদি? স্বরাজ, রামরাজ, ব্রিটিশরাজ, রাজনীতি, রাজভাষা ইত্যাদি শব্দ কোথায় পাই? রাজা বলিতে না পারিলে দেশপালক বা রাজ্যপালক বলা যাইতে পারে। কলিকাতা কি পশ্চিমবঙ্গের রাজধানী নয়? নগর অনেক আছে, কলিকাতাকে শুধু নগর বলিলে চলিবে না। Police Commissioner নগরপাল, না রাজধানীপাল? Government রাজ স্বচ্ছন্দে বলিতে পারি। রাজকার্য, রাজকীয় কার্য, Official business, Non-official business লৌকিক কার্য। সরকারি শব্দ প্রচলিত আছে বটে, কিন্তু অন্য অপ্রচলিত সংস্কৃত শব্দের বিশেষণ রূপে ব্যবহার ক্রমশ হ্রাস হইবে।

Minister মন্ত্রী, ঠিক। কিন্তু Secretary সচিব না হইয়া 'কর্মসচিব' কেন হইল, তাহা বুঝিতে পারি না। সচিব সহায়, তিনি নিশ্চয়ই কোনো কর্মের নিমিত্ত নিযুক্ত। কেহ অকর্মসচিব থাকিলে অন্যকে কর্মসচিব বলিতে পারা যাইত। বাংলা ভাষায় সাচিব্য শব্দও গ্রামে প্রচলিত আছে। সেখানে অর্থ, ক্রেতার সাহায্য। যেমন, গুড় সাচিব্য হইয়াছে। অর্থাৎ গুড়ের দাম কমিয়াছে।

Home Department— স্বরাষ্ট্র বিভাগ। কীরূপে হইল? রাষ্ট্র বলিলে ভারতরাষ্ট্রই বুঝিতেছি। যেমন রাষ্ট্রভাষা। পশ্চিমবঙ্গ কি একটি রাষ্ট্র, না রাজ্য? Home Minister কী করেন জানি না, বোধ হয় দেশশাসন তাঁহার মুখ্য কর্ম। অতএব Home Department শাসনবিভাগ বলা সংগত।

Engineer—(Civil and Irrigation) বাস্তুকার। ইহা চলিতে পারে না, ভুলও হইয়াছে। বাস্তুশাস্ত্রে সূত্রগ্রাহী Engineer তিনি 'সর্বকর্মবিশারদ, সূত্রদণ্ডপ্রপাতজ্ঞ, মানোখানপ্রমাণবিৎ' ইত্যাদি। যাহাতে লোকে বাস করে তাহা বস্তু বা বাস্তু। যে ভূমিখণ্ডে বাস করে তাহা বাস্তু। তদুপরি নির্মিত যাহা-কিছু, সেসব বস্তু, Structures, এইরূপে কৌটিল্য তাঁহার অর্থশাস্ত্রে বাস্তু শব্দের অর্থ গৃহ, ক্ষেত্র, আরাম, সেতুবন্ধ, তড়াগ ও আধার করিয়াছেন। এইসকলের নির্মাণের নাম শিল্প ছিল। তদনুসারে শ্রীসুকুমার *শিল্পরত্ন* নামক গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন। যাহারা নির্মাণ করে তাহারা শিল্পী। শিল্পী চতুর্বিধ— *স্থপতি*, সূত্রগ্রাহী, তক্ষক ও বর্ধকী। প্রতিমা-নির্মাণ ও চিত্রকলাও শিল্প। *শুক্রনীতিসার*-এও

সেই অর্থ। যথা— 'প্রাসাদ প্রতিমারামগৃহবাপ্যাদি সংকৃতিঃ', যে শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে তাহার নাম শিল্পশাস্ত্র। কিন্তু লৌকিক সংস্কৃতে যেমন বঙ্গদেশীয় ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে, শিল্পজীবী নয় জন— কর্মকার, স্বর্ণকার, কাংস্যকার, চিত্রকার ইত্যাদি। উত্তর-ভারতে, যেমন আলমোড়ায়, শিল্পকার শব্দ প্রচলিত আছে। যেখানে শিল্পকার অর্থে বঙ্গদেশের ছুতোর। অতএব Engineer শিল্পবিৎ বা শিল্পজ্ঞ। Engineer নানাপ্রকার আছেন। Mechanical Engineer, Chemical Engineer, Electrical Engineer ইত্যাদি সকল Engineerই শিল্পবিৎ বা শিল্পজ্ঞ। বাস্তুকার নামে আর-এক আপত্তি আছে। বাস্তু শব্দের প্রচলিত অর্থ, গৃহনির্মাণযোগ্য ভূমি। এই অর্থ *অমরকোশে* আছে, অন্য অর্থ নাই। বাস্তুকার বলিলে বুঝাইবে, যিনি গৃহনির্মাণযোগ্য ভূমি প্রস্তুত করেন।

এই সঙ্গে Industry শব্দেরও একটা প্রতিশব্দ চাই। Industry কেবল শিল্প নহে। Agricultural Industry, Fishing Industry, Mining Industry প্রভৃতিকে শিল্প বলিতে পারি না। শিল্প বস্তুনির্মাণে। কিন্তু কৃষিকর্মে শিল্প কোথায়? Industry কেবল manufacture নয়, occupation, business বা tradeও বুঝায়। সংস্কৃতে অবিকল 'ব্যবসায়'। ব্যবসায় কেবল বাণিজ্য নয়। আমরা Trade অর্থে ব্যাবসা বা ব্যবসায় বলি বটে, কিন্তু manufactureও বুঝি। Manufacture অর্থে কলা পদ প্রচলিত ছিল। প্রকৃতিদত্ত পদার্থের রূপান্তরকরণের নাম কলা। *শুক্রনীতিসা*-এর কলা শব্দের অর্থ ব্যাখ্যাত হইয়াছে। কলা অসংখ্য। যেমন, কাচকলা glass manufacture, বস্ত্রবয়ন কলা Textile Industry ইত্যাদি। Cottage Industry শব্দের সংস্কৃত নাম কৌটকলা। পাণিনিতে কৌট শব্দ আছে। কৌটতক্ষ স্বাধীন ছুতার। কলা art, Manufacture মাত্রেই art। সমুদ্র-জল শুকাইয়া লবণ পৃথক করা একটা art, শিল্প নয়। নৃত্য-গীত-বাদ্য শিল্প নয়, কলা। Fine art ললিতকলা না বলিয়া কান্তকলা বলিলে ভালো হয়।

Labour— শ্রম। এখানে Labour শব্দ দ্বারা নিশ্চয়ই Labourer বা Labouring class উদ্দিষ্ট হইয়াছে। আমরা সকলেই শ্রম করি, আমরা সকলেই শ্রমিক, কিন্তু Labourer নই। বাংলায় বেরুনিয়া শব্দ প্রচলিত ছিল। কবিকঙ্কণ চণ্ডীতে আছে, অদ্যাপি বাঁকুড়ায় আছে। ভরণীয় শব্দ হইতে বেরুনিয়া; wages ভরণ। কাজেই যে ভরণ করে সে ভর্তা, employer ধনিক ও ভৃতিক, দুইটি শব্দ একত্র না পাইলে, ভৃতিক যে labourer, তাহা বুঝিতে পারা যায় না। ভৃতি, ভাতা Pension, allowance ইত্যাদি। ভূমি, ভর্তা, ভৃতিক বা ভরণীয়, এই তিন ভ-কার পণ্য-উৎপাদনের ত্রিপাদ। ইহাদের সহিত সামাযোগ (organization) পাইলেই পণ্য-উৎপাদন চলিতে থাকে। কিন্তু বাংলায় ভর্তা শব্দ চলিবে না। অতএব ধনিক ও ভৃতিক, অথবা ধনিক ও শ্রমিক, রাখাই ঠিক হইবে। কর্মী worker, কার্মিক workman, কারু artisan.

Librarian— গ্রন্থাগারিক। গ্রন্থপাল বলা ভালো।

৬০/৭০ বৎসর পূর্বে রসায়ন, পদার্থবিদ্যা, জীবাণু ইত্যাদি নাম চলিতে পারিত। কিন্তু বিজ্ঞান দ্রুত বাড়িতেছে। এখন এসকল শব্দ আমাদের জ্ঞানের অনুগামী হইতেছে না। রাজাজ্ঞা দ্বারা এইরূপ নাম বাঁধিয়া রাখা কর্তব্য হইবে না। Chemist প্রাণরসায়নী পড়িলে প্রাণরসায়নী বটিকা মনে আসিবে। শ্রুতিরসায়নী ভাষা, নেত্ররসায়নী শোভা বলা অপ্রচলিত নয়। শুধু রসায়ন বলিলে আয়ুর্বেদের রসায়ন মনে হয়। রসায়নবিদ্যা বলিলে রস (পারদ) হইতে কোনোরকমে টানিয়া Chemistry বুঝাইতেছে। তেমনই পদার্থবিদ্যা না বলিয়া শুধু পদার্থ বলিলে অন্য অর্থ হইয়া যায়। Physicist অর্থে পদার্থী বলাও চলে না। প্রাণ কি কোনো বস্তু যে তাহার রসায়ন থাকিবে?

Pathology— বিকারতত্ত্ব। ঠিক মনে হইতেছে না কীসের বিকার? বোধ হয় রোগতত্ত্ব। Pathogenic রোগজনক।

Professor— অধ্যাপক। অধ্যাপক টোলের। তাঁহারা ধনবানের শ্রাদ্ধাদিতে নিমন্ত্রিত হন। তাঁহাদের এই সামান্য সম্মান ক্ষুণ্ণ করা উচিত হইবে না। এতকাল Professor শব্দে অধ্যাপক চলিতেছিল বটে কিন্তু এক্ষণে রাজানুমোদিত হইয়া উপাধিস্বরূপ হইতেছে। অমুক কলেজের অধ্যাপক বলা যে কথা, অধ্যাপক অমুক বলা সে কথা নয়। Professor অধিশিক্ষক।

Lecturer— উপাধ্যায়। উপাধ্যায় বৃত্তিভোগী ছিলেন, কিন্তু তিনি শাস্ত্রব্যবসায়ী ছিলেন। মুখোপাধ্যায়, চট্টোপাধ্যায় ইত্যাদি ম্লেচ্ছভাষা শিখাইতেন না। Lecturer বরং অন্ত্যশিক্ষক, Secondary School Teacher মধ্যশিক্ষক, Primary School Teacher আদ্যশিক্ষক।

Post and Telegraph প্রৈষ ও তার, Postmaster General মহাপ্রৈষাধিকারিক; বড়ো ডাক কর্তা—প্রৈষ শব্দ চলিবে না, ঠিকও হয় নাই। ডাক শব্দ রাখিতেই হইবে। কিন্তু Post Office, Postmaster কই? Post Office ডাকঘর; Postmaster ডাক কর্তা; Post Master General ডাকের অধিকর্তা।

দেখিতেছি কয়েকটা সামান্য শব্দও পারিভাবিক হইয়াছে। যেমন, Bearer বাহক, বেহারা। Bearer বাহক বটে কিন্তু বেয়ারা নয়, বেহারা। Peon পিয়োন, চাপরাশি। সকল পিয়োন চাপরাশ রাখে না। যাহারা চাপরাশ রাখে, তাহারাও পিয়োন নামে তুষ্ট হয়। Bottle washer বোতল ধাবক; কুপী ধাবক। এই শব্দে সংস্কৃত প্রীতির আতিশয্য হইয়াছে। আমি বলি বোতল-ধুইয়ে। Telegraphic—তারিক। এখানে বাংলা শব্দে সংস্কৃত ইক প্রত্যয় হইয়াছে। যদি এইরূপ শব্দ চলিতে বাধা না হয়, তবে Constable পাহারাওয়ালা না হইয়া পাহারি (প্রহরী) হইতে পারে। Gasman গ্যাসি। যেমন, দপ্তরি, কাগজি ইত্যাদি।

Officer আধিকারিক। কিন্তু office কই? বোধ হয় এই শব্দের প্রতিশব্দ অধিকার। যদি তাহাই হয়, তবে officer অধিকারী করিলে দোষ কী? কিন্তু অধিকার শব্দ এত অধিক প্রচলিত যে তদ্দ্বারা office বুঝাইবে না। Government Office রাজকার্য, রাজকার্যালয়। Officer কার্যচারী কর্মচারী শব্দ বহু প্রচলিত। Clerk করণিক না করিয়া করণী করিলে ভালো হয়। সংস্কৃত করণ = কায়স্থ = Clerk আছে।

এইরূপে তালিকার শব্দ বিচার করিবার অবসর নাই, স্থানও নাই। সামন্তরাজ্যে অনুসন্ধান করিলে অনেক রাজকর্মচারীর নাম পাওয়া যাইবে। উড়িষ্যায় দেখিয়াছি রাজার ব্যবহর্তা, চলিত ভাষায় বেঅর্তা, আছেন। তিনি রাজার Secretary, ছামুকরণ অর্থাৎ সম্মুখকরণ রাজার জমাখরচ লেখেন। গঁতাঘর Treasure house, সংস্কৃত গ্রন্থধন শব্দ হইতে গঁতা। বাঁকুড়ায় গঁতাইত রাজার Storekeeper ইত্যাদি।

পরিভাষা সংসদ সংস্কৃত শব্দ বাছিয়া মনে মনে আশা করিয়াছেন, ভারতরাষ্ট্রভাষা সংস্কৃত হইবে। কিন্তু বহু প্রচলিত কোনো কোনো ইংরেজি নাম রাখিতেই হইবে। বিশেষত যেসকল সংস্কৃত শব্দ হ্রস্ব নয়, সুখোচ্চার্য নয়, সুবোধ্য নয়, সেসকল শব্দ চলিবে না।

উৎস : *প্রবাসী*, আষাঢ় ১৩৫৬।

পুরানো সেই দিনের কথা

বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র

যতদূর খবর পাই, বেতার চালু করা নিয়ে এদেশে প্রথম মাথা ঘামানো হয় ১৯২৪ সালে। মাদ্রাজে একটা বেতার ক্লাব গড়ে তুলে কয়েকজন উৎসাহী বিজ্ঞানী পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু করেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সায়েন্স কলেজও পিছিয়ে থাকেন না। সেখানেও কয়েকজন গবেষক বিজ্ঞানী মিলে ব্যাপারটা নিয়ে অল্পস্বল্প তোড়জোড় করতে থাকেন। বেতারের মাধ্যমে নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা আলাপ-আলোচনা ইত্যাদি নিয়েই তাঁরা ব্যস্ত থাকতেন। অর্থাৎ তাঁদের আয়াস উদ্‌যোগ কলেজের আঙিনাতেই আবদ্ধ ছিল।

বেতারের সঙ্গে সাধারণ মানুষের সরাসরি যোগ ঘটাবার উদ্দেশ্য নিয়ে প্রথম এগিয়ে এলেন মার্কনি কোম্পানি। ১৯২৬ সালের কোনো এক সময় কলকাতা হাইকোর্টের উলটো দিকে টেম্পল চেম্বার্সের সবচেয়ে উঁচু তলায় তাঁরা একটা স্টুডিয়ো বানিয়ে অনুষ্ঠান প্রচার করতে লাগলেন। ভারতীয় শ্রোতাদের জন্যে প্রতি সন্ধেয় এক ঘণ্টা আর ইউরোপীয় শ্রোতাদের জন্যে দু-ঘণ্টা তদারকি করতেন কোম্পানির প্রধান চাকুরে ও হর্তাকর্তা জে. আর. স্টেপলটন। অনুষ্ঠান বলতে কেবলই গানবাজনা, তাও রেকর্ডের। দু চার জন গাইয়ে-বাজিয়ে যাঁরা যোগ দিতেন তাঁরা প্রায় সকলেই ছিলেন অপেশাদার। তবু ব্যাপারটা একেবারে অভিনব বলে কিছু কিছু শহুরে লোক বেতারযন্ত্র কিনতে লাগলেন। মার্কনি কোম্পানিরও মূল উদ্দেশ্য ছিল ব্যাবসা বাড়ানো। তবে যতটা আশা করেছিলেন ততটা হল না।

তখনকার বেতারযন্ত্র ছিল অদ্ভুত ধরনের। তাকে বলা হত ক্রিস্ট্যাল সেট। বেতারযন্ত্রের সঙ্গে হেডফোন জুড়ে কানে তা লাগিয়ে শুনতে হত। অর্থাৎ এক জন কী দু জনের বেশি শোনা সম্ভব ছিল না। পরে শুঁড়াকার চোঙা বা লাউডস্পিকারের আমদানি হতে একসঙ্গে বহুজন মিলে শোনার ব্যবস্থা হল।

যাই হোক আশানুরূপ ব্যাবসায়িক সাফল্য না হতে মার্কনি কোম্পানি বছর-খানেক বাদেই বেতারের প্রচার নিয়ে তাঁদের প্রচেষ্টার ইতি করে দিলেন। তখন বোম্বাইয়ের এক বিখ্যাত ব্যাবসায়ী

সুলতান চিনয় তাঁর কয়েকজন বন্ধুবান্ধব নিয়ে ইন্ডিয়ান ব্রডকাস্টিং কোম্পানি বলে একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তুললেন। তাঁদেরও উদ্দেশ্য ছিল প্রধানত ব্যবসায়িক। কিন্তু ভারতবর্ষের মতো বিরাট বিচিত্র দেশে বেতারের ভূমিকা যে ব্যাপক ও গম্ভীর হতে পারে সে সম্পর্কে তাঁরা অনবহিত ছিলেন না। চিনয়ের কোম্পানি ১৯২৭ সালের ২৩ জুন বোম্বাইয়ে প্রথম একটি বেতারকেন্দ্র খুললেন। মাসখানেক বাদে ২৬ আগস্ট তারিখে কলকাতায় তাঁদের দ্বিতীয় কেন্দ্রের উদ্‌বোধন করেছিলেন তৎকালীন গভর্নর বা লাটসাহেব স্যার স্ট্যানলি জ্যাকসন।

উদ্‌বোধন অনুষ্ঠানে যেসব শিল্পী গান গেয়েছিলেন বা বাজনা শুনিয়েছিলেন তাঁদের কয়েকজন হলেন জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ গোস্বামী, কৃষ্ণচন্দ্র দে, দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর, আঙুরবালা, প্রফুল্লবালা, সিতাংশুজ্যোতি মজুমদার (বকুবাবু) আর নৃপেন্দ্রনাথ মজুমদার। খেয়াল, ভজন, ঠুংরি, রবীন্দ্রসংগীত, রাগসংগীত, থিয়েটারের গান, হাসির গান ক্ল্যারিয়োনেট বাজনা সবই হল। সুসাহিত্যিক মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় একটি স্বরচিত গল্প পাঠ করেন আর ছেলেদের জন্যে গল্প শোনান যোগেশ বসু— গল্পদাদু। অনুষ্ঠানের সূচনা হয়েছিল সানাই দিয়ে। কে বাজিয়েছিলেন মনে পড়ছে না। সব শেষে সংবাদ পাঠ।

ডালহাউসি স্কোয়ারের ১ নং গার্স্টিন প্লেসে সেকেলে একটি বাড়ির ওপরকার দুটি তলা নিয়ে কাজ শুরু হল। নীচের তলায় ছিল ফিপসনের মদের আড়ত। স্টুডিয়োর সংখ্যা সাকুল্যে দুই। বলা বাহুল্য সেই অপরিসর স্টুডিয়ো দুখানির সাজসরঞ্জামও ছিল হাস্যকররকম স্বল্প ও আধুনিক।

কলকাতা বেতারকেন্দ্রের প্রথম স্টেশন ডিরেক্টর বা প্রধান অধিকর্তা হলেন সি. ডবলিউ ওয়ালিক। চিনয় তাঁকে বি. বি. সি. থেকে আনিয়েছিলেন। ওয়ালিক স্টেশন ডিরেক্টর হলেও কেবল পাশ্চাত্য অনুষ্ঠান বা ওয়েস্টার্ন প্রোগ্রামের দেখাশোনার ভার নিলেন। ভারতীয় অনুষ্ঠান পরিচালনার জন্যে তিনি বিখ্যাত ক্ল্যারিয়োনেট বাদক নৃপেন্দ্রনাথ মজুমদারকে সর্বময় কর্তৃত্ব দিলেন। নৃপেন্দ্রনাথকে তাঁর পছন্দমতো লোক নির্বাচনের স্বাধীনতাও দেওয়া হল। অনুষ্ঠানের ব্যাপারে সাহায্য করার জন্যে ডেকে আনলেন নামজাদা ফুটবল খেলোয়াড় রাজেন সেনকে। ১৯১১ সালে মোহনবাগানের শিল্ড বিজয়ী দলের এক জন হলেন রাজেন সেন। কিছুদিন বাদে আরও এক জন যোগ দিলেন। বেহালার বিশিষ্ট ধনী পরিবারের ছেলে বীরেন রায়। উনি শখ করে বেতারে এসেছিলেন। আবার পরে পাইলট হয়েছিলেন। পরবর্তীকালে রাজনীতির দিকে ঝোঁক হতে পার্লামেন্টের সদস্য পর্যন্ত হয়েছিলেন। তবে বেতারে যতদিন ছিলেন ততদিন রাজেনদা আর উনি মিলে হেন কাজ নেই যা করতেন না— অনুষ্ঠান ঘোষণা থেকে শুরু করে খবর পড়া, নানা বিষয়ের ভাষান্তরকরণ কিছুই বাদ যেত না।

নৃপেনদার দল ও জোর দুই-ই বাড়ল রাইচাঁদ বড়াল আসার পর। রাইকে উনি ভারতীয় অনুষ্ঠানের সহকারী অধিকর্তার পদে বহাল করলেন। রাইকে নিতে জোর বাড়ার কারণ হল তাঁর সঙ্গে নামী নামী গাইয়ে-বাজিয়ের ব্যক্তিগত ঘনিষ্ঠতা। রাই নিজে সংগীতজ্ঞ, নামী তবলিয়া— তা ছাড়া ওঁদের অভিজাত পরিবারে গানবাজনার চল ছিল খুব। তখনকার দিনের তামাম ভারতবর্ষের গাইয়ে-বাজিয়েদের প্রায় সকলেই ওঁদের কলকাতার বাড়িতে একবার না একবার আসর জমিয়ে গেছেন। নৃপেনদা জানতেন রাই পাশে থাকলে বেতার অনুষ্ঠানের জন্যে নামজাদা শিল্পীদের কম পয়সায় পাওয়া যাবে। বেশি পয়সা দিয়ে গুণী শিল্পীকে আনার মতো অকথা ছিল না কোম্পানির।

তবে এত শত অভাব আর দীনতা সত্ত্বেও কলকাতা বেতারকেন্দ্র ক্রমেই জনপ্রিয় হয়ে উঠতে লাগল। একদিকে শ্রোতারা যেমন খুশি হয়ে উঠতে লাগলেন অন্যদিকে তেমন বেতার অনুষ্ঠানে যোগ

দেবার লোভে উৎসাহী তরুণের সংখ্যাও বাড়তে লাগল। বলা নিষ্প্রয়োজন সে দলে আমিও ছিলাম। অন্যান্য যাঁরা ছিলেন তাঁদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখ্য নলিনীকান্ত সরকার, হীরেন বসু, যোগেশ বসু, বাণী কুমার, পঙ্কজকুমার মল্লিক, বিজন বসু আর মনোমোহন ঘোষ (চিত্রগুপ্ত)। এঁরা সকলেই যে বেতারকেন্দ্রে চাকরি নিয়েছিলেন তা নয়। তবে প্রথম থেকেই কোনো-না-কোনো ভাবে যোগাযোগ রেখেছিলেন। প্রথমে আমিও পাকাপাকি কোনো চাকরি নিইনি। নিলাম ১৯২৮ সালের শেষ দিকে।

আমাকেও নৃপেনদা রাইয়ের মতো সহকারী করে নিলেন। তবে আমি হলাম জুনিয়র। গান-বাজনার ব্যাপারটা রাই দেখাশোনা করত।

মাইনে বাড়ানোর দাবিতে হঠাৎ ওয়ালিক কাজ ছেড়ে চলে যেতে ডিরেক্টর হয়ে এলেন স্টেপলটন সাহেব। অদ্ভুত মানুষ ছিলেন স্টেপলটন। মোটাসোটা মানুষটি যখন জ্বলন্ত চুরুট মুখে ঘুরে বেড়াতেন তখন তাঁকে তখনকার দিনের ইংরেজি ছায়াছবির ওয়ালেস বেরির মতো দেখাত। স্টেপলটনের মেজাজ ছিল তিরিক্ষি। কথায় কথায় চটে যেতেন আর আমাদের অপদার্থ বলে গালমন্দ করতেন। তবে বাইরেটা গনগনে হলেও ভেতরটা ছিল ঠান্ডা, কোমল, স্নিগ্ধ। নিজে আমাদের যাচ্ছেতাই করলেও আমাদের কারুর বিরুদ্ধে বাইরের কোনো লোকের কোনো অভিযোগ বরদাস্ত করতেন না। সামনাসামনি কেউ বলতে গেলে খেদিয়ে দিতেন। স্টেপলটন যে কেমন অদ্ভুত মানুষ ছিলেন তার একটা নমুনা মনে পড়ছে। এক দিন বিকেলে এসেই আমার সঙ্গে কোনো একটি অনুষ্ঠানের ব্যাপারে খিটিমিটি শুরু করে দিলেন। যখন দেখলাম আমার কোনো যুক্তিতর্কই উনি গ্রাহ্য করছেন না, তখন বিরক্ত হয়ে আমি তাঁর ঘর ছেড়ে চলে এলাম। বেরোবার মুখে কানে এল গলা উচ্চগ্রামে তুলে তিনি আমায় অপদার্থ বলে গাল দিচ্ছেন। সেদিনই রাতে ফিরে স্টুডিয়োয় বসে আছি। হঠাৎ টের পেলাম পিছন থেকে আমার বগলের নীচে কে কাতুকুতু দিচ্ছে। ঘুরে দাঁড়াতেই দেখি স্টেপলটন। তিনি তখন দুষ্টু ছেলের মতো খিলখিল করে হাসছেন। তাঁর মনটি এমনই অনাবিল আর সরল ছিল। তাঁর মতো কর্মক্ষম, উৎসাহী মানুষও খুব কম দেখেছি। কোনো পরিকল্পনার যাথার্থ্য বা সারবত্তা সম্পর্কে একবার তাঁকে বোঝানো গেলে আর কোনো ভাবনা থাকত না। উঠে পড়ে লেগে তিনি টাকাপয়সা এবং অন্যান্য যাবতীয় প্রয়োজন জোগাড় করে আনতেন।

এবার বেতার নাটক প্রসঙ্গের আদি কথাটি সেরে নিই। এ বিষয়ে পথিকৃৎ হলেন নৃপেনদা। বাইরে থেকে বেশি টাকা দিয়ে পেশাদার নটনটী নিয়ে নাটক করা সামর্থ্যের বাইরে বলে নৃপেনদা নিজেই কয়েকজন গাইয়ে-বাজিয়ে নিয়ে একটা দল গড়ে ফেললেন। তাঁর বন্ধু এবং আমাদের সকলের শুভানুধ্যায়ী ও সেকালের বিশিষ্ট বেতারযন্ত্র ব্যবসায়ী আশুতোষ দে তার নামকরণ করলেন *বেতার নাটুকে দল*। নৃপেনদা এবার নিজেই বেতারে প্রচারের উপযোগী করে অসমঞ্জ মুখোপাধ্যায়ের *জমা খরচ* কৌতুকগল্পটির নাট্যরূপ দিলেন। এমনকি নিজে প্রধান চরিত্রে অভিনয়ও করলেন। পরিচালনার ভার পেলেন সিতাংশুজ্যোতি মজুমদার। আধ ঘণ্টা কী পঁয়তাল্লিশ মিনিটের নাটক খুব জমে গেল। এর পর উৎসাহিত হয়ে নাটুকে দল জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের *অলীক বাবু* নিয়ে নেমে পড়ল। এবারও মূল চরিত্রে নৃপেনদা। এটিও দারুণ উতরে গেল।

এদিকে বেতার নাটক নিয়ে শ্রোতাদের আগ্রহ উত্তরোত্তর বাড়তে থাকায় নাটুকে দলের পক্ষে তাল রাখা শক্ত হয়ে পড়ল। তখন নৃপেনদা শিশিরকুমার ভাদুড়ীর সঙ্গে একটা চুক্তি করলেন। ঠিক হল যে শিশিরকুমারের নাটক *সীতা* নাট্যমন্দির থেকে সরাসরি রিলে করে শোনানো হবে।

ধারাবাহিকভাবে নাটকটির এক-একটি অঙ্ক প্রতি শনিবার, রবিবার মঞ্চ থেকে প্রচার করা হতে লাগল। ব্যবস্থাটায় অজস্র ত্রুটি ছিল। কারণ, শুধুমাত্র নাটকের চরিত্রগুলির সংলাপ ছেঁকে নিয়ে রিলে করা সম্ভব ছিল না। সংলাপের সঙ্গে সঙ্গে প্রম্পটারদের পাঠ, শিফটারের ফিশফিশানি, এমনকি দর্শকের গুলতানিও গাঁজলা হয়ে মিশে যেত। সুখের বিষয়, তখনকার বেতার শ্রোতারা ছিলেন পরমসহিষ্ণু। তাছাড়া বেতার নিয়ে তাঁদের বিস্ময়ের ঘোর তখনও কাটেনি। আকাশপথ বেয়ে একটা বাক্সোর মধ্যে দিয়ে যা-হোক একটা শব্দ গমগম করে বেরিয়ে এলেই তাঁরা একেবারে অভিভূত হয়ে পড়তেন। একটা মজার দৃষ্টান্ত দিই। একবার কোনো একটি অনুষ্ঠানের প্রাক্কালে ঘোষক দমকা কাশির বেগে হঠাৎ কেশে ফেলেন। দু চার দিন বাদে ওই ঘটনাটির উল্লেখ করে কর্তৃপক্ষের কাছে জনৈক শ্রোতা একটি চিঠি পাঠালেন। তাতে লিখলেন : আপনাদের ঘোষকের কাশিটি বড়ো মিষ্টি লেগেছিল। আমার বুড়ি পিসিমাকেও শোনাবার ইচ্ছে হয়েছিল। কিন্তু আমার হেডফোনটি খুলে তাঁকে যখন পরিয়ে দিলাম তখন কাশি থেমে গেছে। ফলে তাঁর আর শোনা হল না। আপনাদের ঘোষককে কোনো এক দিন আবার যদি অমন কাশি কাশতে বলেন তা হলে আমার বেচারি পিসিমাও আবার শুনতে পান। দয়া করে তারিখ ও সময়টা জানাবেন।

এই যখন অবস্থা তখন মঞ্চের থিয়েটার নির্ভেজাল শুনতে না পেলেও খেদ হবার কথা নয়। ইতিমধ্যে অবশ্য নৃপেনদা আর-একটা ব্যবস্থা করলেন। কিছু কিছু যাত্রাদল আর শৌখিন সংস্থাকে বেতারে নাটক করার আমন্ত্রণ জানালেন। চিত্রা সংসদ নামে আমাদের যে শৌখিন দল ছিল তারা আহ্লাদে ডগমগ হয়ে পরশুরামের *চিকিৎসা সংকট* নিয়ে নেমে পড়ল, নাটক শুনে নৃপেনদা খুব খুশি। তাই কিছুদিনের মধ্যে আমাদের আবার একখানি নাটক করতে হল। এবার জ্যোতিরিন্দ্রনাথের *দায়ে পড়ে দারগ্রহ*।

বেতারে পুরোপুরি তিন ঘণ্টার নাটক চালু হল ১৯২৯ সালে। বলতে গেলে, আমিই তখন নাট্যবিভাগের সর্বময় কর্তা। এক দিন নৃপেনদাকে গিয়ে বললাম, পেশাদার মঞ্চ থেকে নাটক রিলে করে শোনাবার ব্যবস্থা আমার খুব মনঃপূত হচ্ছে না। নাটুকে দল নিয়ে আমি নিয়মিত বড়ো গোছের নাটক করব মতলব নিয়েছি। এমনকি পেশাদার মঞ্চের নাটক প্রচার করার ব্যবস্থাটি একেবারে বাতিল করে দিতে বললাম, আমার কথায় সায় দিলেন ব্যারিস্টার শ্রীশচন্দ্র বসু। নৃপেনদা প্রথমটায় দ্বিধা করেও শেষে রাজি হয়ে গেলেন। আমিও নাটুকে দল নিয়ে গাছকোমর বেঁধে লেগে পড়লাম। প্রযোজনা, পরিচালনা, অভিনয়, সবের দায় নিজের ঘাড়ে নিলাম। নাটক ঠিক হল শ্রীশদার লেখা *সন্দিগ্ধা*। সেই যে শুরু হল তার পর থেকে প্রতি শুক্রবার সন্ধেয় তিন ঘণ্টা করে নাটক প্রচারে আর ছেদ পড়ল না।

সেসময় নাটক প্রযোজনা করা কত কঠিন ছিল আজ তা অনুমান করাও সহজ নয়। টেপ-রেকর্ডার নেই অথচ প্রতিটি অনুষ্ঠানই একেবারে টাটকা, সরাসরি অর্থাৎ লাইভ ব্রডকাস্টিং হলে ভুল সংশোধনের আর রাস্তা কোথায়। বড়োজোর পরে প্রায়শ্চিত্ত করা যেত। নাটকীয় কোনো মুহূর্তের সঙ্গে শব্দ ক্ষেপণের সংগতিসাধন নিয়ে সবচেয়ে সতর্ক থাকতে হত। ধরুন, গুলি খেয়ে কোনো-এক জন পড়লেন এবং আর্তনাদ করতে করতে মারা গেলেন অথচ গুলির শব্দ হল সেকেন্ড-কয়েক পরে যখন তাঁর অন্ত্যেষ্টির সময়। তারকনাথ দে তাঁর দলবল নিয়ে খুব সজাগ থাকতেন বলে শব্দ ক্ষেপণে এমন ভুলচুক কদাচিৎ হত। এর ওপর আবার সমস্যা ছিল মাইক্রোফোন নিয়ে। মাইক্রোফোনের সামনে সজোরে চিৎকার করে বসলে অনেক সময় তা একেবারে অভিমানে চুপ করে যেত।

আদিযুগে কলকাতা কেন্দ্রের হাল কত দূর শোচনীয় ছিল তার ভূরিভূরি প্রমাণ দেওয়া যেতে পারে। যেমন ধরুন, সময় সংকেত জানাবার জন্যে স্টুডিয়োর নিজস্ব একটা ঘড়ি পর্যন্ত ছিল না। একটা কাঁসর-জাতীয় ঘণ্টা বাজিয়ে প্রতি অধিবেশনের আগে সময়-সংকেত দেওয়া হত। বাজাবার ভার ছিল রাজেনদার ওপর।

পরে গির্জার ঘড়ি থেকে সরাসরি সময়সংকেত রিলে করা হত। আরও পরে স্টেপলটন সাহেব কলকাতা কর্পোরেশনের লিন্ডসে স্ট্রিটের ক্লক-টাওয়ার ব্যবহারের ব্যবস্থা করলেন।

মেয়েদের জন্যে অনুষ্ঠান ইন্ডিয়ান লেডিজ আওয়ার আর বাচ্ছাদের চিলড্রেনস কর্নার প্রায় একই সঙ্গে চালু করা হয়। শিশুদের অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করতেন যোগেশ বসু। যোগেশদা কলকাতা হাইকোর্টের নামকরা অ্যাডভোকেট ছিলেন। কিন্তু আইনের শুষ্ক রুক্ষ জটাজালে তাঁর সরস সতেজ মনটি কখনও বাঁধা পড়েনি। শিশুমহলের পরিচালক হিসেবে তাঁর অসামান্য সাফল্যই তার প্রমাণ। তাঁর নেওয়া ছদ্মনাম 'গল্পদাদু' এক দিন প্রতিটি বাঙালি ঘরের ছেলে-বুড়ো সকলের কাছে সমান প্রিয় ছিল।

মহিলাদের অনুষ্ঠান আমি প্রথম কিছুদিন মেঘদূত ছদ্মনামে পরিচালনা করি। পরে নাম বদলে রাখি বিষ্ণুশর্মা। কত বিষয়ে যে আলোচনা করতাম তার আর ইয়ত্তা নেই। ধর্মকর্ম থেকে বিমানের ক্রমোন্নতি কিছুই বাদ পড়ত না। এছাড়া, মেয়েদের লেখা গল্প-কবিতা ইত্যাদি পাঠ, চিঠিপত্রের উত্তর দেওয়া সবই ছিল। অপটু হাতে দু চারবার পিয়ানো বাজিয়েও শুনিয়েছি। বাইরে থেকে জ্ঞানীগুণী শিল্পী এনে গানবাজনা, কথিকা ইত্যাদি শোনাবার ব্যবস্থা ছিল বটে, তবে সংখ্যায় তাঁরা এতই নগণ্য ছিলেন যে আমাকেই সর্বেশ্বর হয়ে হাঁড়ি ঠেলতে হত। হায় রে, সেকালে ক-জন মহিলাই বা বিদূষী ছিলেন। ক-জনাই বা শিল্পকলার চর্চা করতেন।

এদিকে দিন যত যেতে লাগল, কলকাতা বেতারকেন্দ্রের লোকসংখ্যাও বাড়তে লাগল। বাণীকুমার, বিজন বসু, মনোমোহন ঘোষ বেতারের সঙ্গে আগে থেকেই সম্পর্ক রেখে চলছিলেন। ক্রমে ক্রমে একেবারে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে পড়লেন। পঙ্কজ মল্লিকও ঘনিষ্ঠতর হলেন।

পঙ্কজ আর রাইকে নিয়ে বাণী তাঁর *সংগীত বিচিত্রা* শুরু করে দিলেন। গানগুলি বাণী নিজেই লিখতেন। তাঁর লেখা গান অনেক সুরকার, যেমন হরিশ বালী, অনিল বাগচী ব্যবহার করতেন। গীতিকার হিসেবে খ্যাতি হওয়ায় বাণী দু একটা নাটিকা এবং আলেখ্যও লিখে ফেলেন। সেগুলি নিজেই প্রযোজনা করতেন।

পঙ্কজ তাঁর স্বমহিমায় প্রকাশিত হলেন সংগীত শিক্ষার আসরে। তাঁর আগেও দু একবার এজাতীয় আসর চালাবার চেষ্টা করা হয়েছিল। তবে তা জমেনি। পঙ্কজ আসতে একেবারে রমরম করে উঠল। বাণীর লেখা গানে সুর দিয়ে পঙ্কজ আসর শুরু করলেও অচিরে রবীন্দ্রসংগীতে বাঁক নিলেন। গায়ক ও শিক্ষক উভয় ভূমিকায় পঙ্কজের সার্থকতা সন্দেহাতীত। কিন্তু তাঁর সবচেয়ে বড়ো বাহাদুরি রবীন্দ্রসংগীতকে জনপ্রিয় করে তোলা। একদা রবীন্দ্রনাথের গান যখন শান্তিনিকেতন আর বাংলা দেশের অতি সংস্কৃতিবান পরিবারের বেড়া ডিঙিয়ে বাইরে আসেনি, তখন তাঁকে সাদরে সযত্নে সমাজের বৃহত্তর অংশে পৌঁছে দেওয়া এবং প্রতিষ্ঠিত করার অনেকখানি কৃতিত্ব পঙ্কজের প্রাপ্য।

পঙ্কজ, বাণীর মতো মনোমোহনেরও বরাদ্দ সাপ্তাহিক অনুষ্ঠান ছিল। লাইমলাইট নামের অনুষ্ঠানে তিনি সিনেমা, থিয়েটারের সমালোচনা করতেন। অন্য আর-এক অনুষ্ঠানে শোনাতেন তামাম দুনিয়ার যত আজগুবি সংবাদ। মনোমোহন দুটি কাজেরই একেবারে যোগ্য লোক। কারণ

তাবৎ বস্তুর আদ্যোপান্ত খুঁটিয়ে দেখতে ও তলিয়ে ভাবতে তাঁর জুড়ি পাওয়া ভার। ফলে, বিদগ্ধ সমাজে মনোমোহনের ছায়াছবি-নাটকের সমালোচনা খুব তারিফ পেতে থাকে। আর প্রকাশভঙ্গির সরসতার গুণে তাঁর বিচিত্র সংবাদও সাধারণের কাছে খুবই আদর পায়। পরে মনোমোহনের দায়িত্ব আরও বাড়ে। বাংলা ও ইংরেজি বক্তৃতা সম্পর্কিত সবকিছু বিষয় তাঁরই ওপর চাপিয়ে দেওয়া হয়। মনোমোহন নামকরা সাহিত্যিকদের দিয়ে লিখিয়ে নিয়ে মাঝে মাঝে নাট্য প্রযোজনাও করতেন।

বিজনকে খুব একটা হুজ্জত পোহাতে হত না। তাঁর কাজ ছিল প্রধানত দুটি অনুষ্ঠান ঘোষণা আর খবর পড়া। কিন্তু তাঁর সংবাদপাঠের ভঙ্গিটি ছিল এমনই স্বকীয় এবং আকর্ষণীয় যে উত্তরকালে বহুজনেই তাঁকে নকল করতে থাকেন।

সকলে মিলে হইহুল্লোড় করে দিবারাত খেটেখুটে রেডিয়ো নিয়ে তো পড়ে থাকতাম। কেবলই এটা করি, সেটা করি— মাথায় মতলব আর ফন্দি। অর্থ আছে কি নেই, সামর্থ্য হবে কি না হবে সেদিকে কোনো হুঁশ নেই। কেবলই খেয়ালিপনা। এমন খেয়ালেই এক দিন ঠিক হল আমাদের নিজস্ব একটা পত্রিকা বার করতে হবে। খ্যাতনামা সাহিত্যিক প্রেমাঙ্কুর আতর্থী (মহাস্থবির) অর্থাৎ আমাদের বুড়োদা তখন বড়ো দুঃসময়ে দিন কাটাচ্ছিলেন। তাঁকে নৃপেনদা ডেকে এনে সম্পাদনার ভার নিতে বললেন। *বেতার জগৎ* বেরোল ১৯২৯-এর সেপ্টেম্বর মাসে, দাম এক আনা। প্রতি পনেরো দিন অন্তর বেরোত। এখানে বলা দরকার *বেতার জগৎ* নামটি দিয়েছিলেন বাণী রায়। ১৯৩১ সাল পর্যন্ত সম্পাদনার কাজ বুড়োদাই চালালেন। পরে তিনি চলচ্চিত্র জগতে যোগ দেওয়ায় নলিনীকান্ত সরকার সম্পাদনার ভার নিলেন। যৌবনে হাসির গান গেয়ে গেয়ে নলিনীদা বাংলা দেশ মাতিয়ে রেখেছিলেন। সম্পাদনা আর সাংবাদিকতার কাজেও তাঁর কম খ্যাতি ছিল না। উত্তরকালে এই সদাব্যস্ত রসিক মানুষটি আবার সব ছেড়েছুড়ে পণ্ডিচেরি আশ্রমে ভিন্ন কোনো অন্বেষায় ব্যাপৃত হলেন। অষ্টআশি বছর বয়স হয়েছে তাঁর। তবু জীবন সম্পর্কে তাঁর কৌতূহল আজও হয়তো থামেনি।

ইন্ডিয়ান ব্রডকাস্টিং কোম্পানি প্রথম থেকেই লোকসানে চলছিল। কোম্পানির আয় বলতে ছিল শুধুই বেতারযন্ত্র ব্যবহার বাবদ প্রাপ্য লাইসেন্স ফি। করের হার বছরে দশ টাকা। কিন্তু তাও অধিকাংশ লোকেই ফাঁকি দিতে লাগলেন। ক্রমান্বয়ে লোকসান খেতে খেতে ১৯৩০-এর মার্চ মাসে কোম্পানি তাঁদের বোম্বাই ও কলকাতা দুটি কেন্দ্রই তুলে দিতে মনস্থ করলেন। আমাদের তখন সঙ্গিন অবস্থা! সাধারণ মানুষ, খবরের কাগজ, বেতারযন্ত্র ব্যবসায়ী আমাদের খবর জানতে পেরে বেতার বাঁচাবার জন্যে সরকার বাহাদুরের কাছে আবেদন-নিবেদন করতে লাগলেন। নৃপেনদা স্যার ভূপেন্দ্রনাথ মিত্রের সঙ্গে দেখা করলেন। ভূপেন্দ্রনাথ তৎকালীন ভাইসরয়ের কর্মনির্বাহ সমিতির সদস্য ছিলেন। নৃপেনদার আর্জি শুনে সরকারের তরফ থেকে তিনি ভার নিতে রাজি হলেন। কিন্তু এক বছরের মধ্যে বেতার থেকে আয়ের ব্যাপারে অবস্থার এতটুকু উন্নতি ঘটল না। এদিকে তখন স্যার ভূপেনের জায়গায় এসেছেন স্যার জোসেফ ভোর। স্যার জোসেফ ছিলেন জেদি। তাঁর বিষয়বুদ্ধি ছিল পাকা। যে প্রতিষ্ঠান রেখে ক্রমান্বয়ে লোকসান তেমন হতভাগ্য প্রতিষ্ঠান জিইয়ে রাখার দরকারটা কী! স্টেপলটন নিজে দিল্লিতে ছুটলেন। কিন্তু ব্যর্থমনোরথ হয়ে তাঁকে ফিরে আসতে হল। এগিয়ে এলেন তুষারকান্তি ঘোষ। নৃপেনদাকে নিয়ে তিনি দিল্লি গেলেন। স্যার জোসেফের সঙ্গে তর্কবিতর্ক করে যখন কিছুতেই তাঁরা তাঁকে বাগে আনতে পারলেন না তখন তাঁরা সরাসরি প্রশ্ন করলেন : যুদ্ধ লাগলে কী কোনো সাংঘাতিক প্রাকৃতিক বিপর্যয় ঘটলে

দেশবাসীর কাছে অবিলম্বে সরকার কোনো কথা বলতে চাইলে বেতারের চেয়ে ভালো মাধ্যম আর কী হতে পারে? কথাটা, বিশেষত যুদ্ধের প্রসঙ্গটি স্যার জোসেফের মনে ধরল। মুহূর্তে তিনি তাঁর মত বদলে বেতারকে জিইয়ে রাখার সিদ্ধান্ত নিলেন।

আমাদের সংকটমুক্তির কাল অর্থাৎ ১৯৩১ সাল কলকাতা বেতারকেন্দ্রের জীবনেতিহাসে বিশেষভাবে তাৎপর্যময়। কারণ, ওই বছরেই আমরা আমাদের উত্তরকালের সবচেয়ে জনপ্রিয় ও মর্যাদাসম্পন্ন অনুষ্ঠান 'মহিষাসুরমর্দিনী'র সূচনা করি। পুজোর সময়ে বাঙালি শ্রোতাদের জন্যে বিশেষ কিছু একটা করা দরকার এ কথা মাথায় ঢুকতেই বাণী কাজে নেবে পড়লেন। পণ্ডিত অশোকনাথ শাস্ত্রীর সাহায্য নিয়ে বাণী তড়িঘড়ি একটা আলেখ্য রচনা করে হাজির হয়ে গেলেন। পঙ্কজও তাতে সুর দিয়ে গান জুড়ে দিতে তৈরি। সমস্যা হল সংস্কৃত শ্লোক আর গুরুগম্ভীর বাংলা মেশানো রচনাটি পড়বে কে? আমি সাহস করে এগিয়ে গেলাম।

অতীতের বাংলা ছবি

সত্যজিৎ রায়

জনি ওয়াইসমুলারের প্রথম ছবি *টারজান দি এপ ম্যান* দেখতে গিয়ে টিকিট না পেয়ে আমার প্রথম বাংলা ছবি দেখা হয়ে যায়। *টারজান* হচ্ছিল গ্লোবে— সবাক যুগের প্রথম টারজান ছবির প্রথম শো—আর তার কাছেই অলবিয়ন সিনেমায় (এখনকার রিগ্যাল) হচ্ছিল *কাল পরিণয়*। আমার এক মামার সঙ্গে গিয়েছিলাম ছবি দেখতে। বছরে খান-দুয়েকের বেশি ছবি দেখার সুযোগ আসে না, কাজেই বিফল মনোরথ হয়ে ফিরে আসতে হবে ভাবতেই মনটা ভারী হয়ে গেল। আমার বিমর্ষ ভাব দেখেই বোধ হয় মামা নিয়ে গেলেন অলবিয়নে। হলিউডের ছবিতে ১৯২৭-এ সাউন্ড এসে গেলেও বাংলা ছবি ছিল তখনও নির্বাক। এখনও মনে আছে বিয়ের রাতের অভিনব প্রেমের দৃশ্যে স্বামী-স্ত্রীর পরস্পরের পা ঘষাঘষির ক্লোজ-আপ। আর সেই সঙ্গে মামার উশখুশুনি— নিঃসন্দেহে ভাবছেন কী কুক্ষণেই এমন ছবি দেখাতে আনলাম এই বালককে।

বাংলা ছবির সঙ্গে এই প্রথম পরিচয় স্বভাবতই প্রীতিকর হয়নি। হয়তো সেই কারণেই বাংলা ছবি দেখার খুব একটা আগ্রহ তখন বোধ করেছি বলে মনে পড়ে না। তাছাড়া ছোটোদের উপযোগী বাংলা ছবি তখন হত কি? বোধ হয় না।

সবাক যুগে নিউ থিয়েটার্সের হাতি-মার্কা ছবির যখন বেশ নামডাক, আমার দুই কাকা নীতিন ও মুকুল বোস যখন পরিচালক, ক্যামেরাম্যান ও শব্দযন্ত্রী হিসাবে সুপ্রতিষ্ঠিত, তখন থেকে মাঝে মাঝে আমার বাংলা ছবি দেখা শুরু। হলিউডের তখন স্বর্ণযুগ চলেছে। কলকাতায় ১৯৩৫-এ মেট্রো আর তার এক বছর পরে লাইটহাউস চিত্রগৃহ দ্বারোদ্‌ঘাটন করে চিত্রমোদীদের মধ্যে বিশেষ চাঞ্চল্য জাগিয়ে তুলেছে। দুটি হাউসেই হলিউডের সব টাটকা নতুন ছবি দেখানো হচ্ছে। সেইসব ছবির তারকাদের জৌলুস, হলিউডের বিজ্ঞাপনের চটক, হলিউডের জাঁকজমক শিল্পচাতুরী কলাকৌশল— এসবের কাছে বাংলা ছবি দাঁড়াবে কী করে? স্বভাবতই হলিউডের তুলনায় আমাদের ছবিকে নিষ্প্রভ বলে মনে হত, মনে হত আমাদের এখনও অনেক কিছু শেখার আছে। এমনও মনে হত যে শিল্প সাহিত্য সংগীতে অগ্রসর বাঙালি হয়তো পশ্চিমের অবদান এই যান্ত্রিক

শিল্পটিকে রপ্ত করতে পারছে না এবং ভবিষ্যতেও পারবে না, কারণ এ জিনিসটা তাদের রক্তে নেই। সত্যি বলতে কী, বাংলা ছবি তখন দেখতে হত অন্য মন নিয়ে। আর তার বিচারে যে মানদণ্ড ব্যবহার করা হত সেটাও ছিল বিদেশি ছবি থেকে ভিন্ন।

তখনকার দিনে (আমি বিশেষ করে সবাক যুগের প্রথম দুই দশকের কথা বলছি) যেমন হলিউডে তেমনই বাংলাতে প্রায় সব পরিচালকই মেনে নিতেন যে ছবি হল সকলের দেখার জন্য, সব স্তরের দর্শকের মন খুশি করার জন্য। চলচ্চিত্র যে একটা সিরিয়াস আর্ট হতে পারে, গভীর তথ্য, সূক্ষ্ম মনস্তত্ত্ব, দোষেগুণে মেশানো জটিল চরিত্র— বাংলার সার্থক উপন্যাসে যার সাক্ষাৎ মেলে--এসব যে চলচ্চিত্রে স্থান পেতে পারে এটা কেউ মানতেন না। হলিউডের মতো বাংলাতেও তখন বেশ কয়েকজন খ্যাতনামা সাহিত্যিক কাহিনিকার— চিত্রনাট্যকার হিসাবে চলচ্চিত্রের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। প্রথম যুগে প্রেমাঙ্কুর আতর্থী ও শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম মনে পড়ে। আরও পরে যোগ দিয়েছিলেন প্রেমেন্দ্র মিত্র ও শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়। ত্রিশ দশকেই চলচ্চিত্র সম্পর্কে বাংলায় প্রথম প্রামাণ্য বই লিখেছিলেন সাহিত্যিক নরেন্দ্র দেব। কিন্তু এইসব সাহিত্যিকের সান্নিধ্যও বাংলা ছবিকে শিল্পের মর্যাদা দিতে পারেনি। তার সহজ কারণ এই যে এঁরাও চলচ্চিত্রকে জাত শিল্প হিসাবে মনে করতেন না। বাংলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সিনেমার জন্য লেখা উপন্যাস *দম্পতি* যাঁরা পড়েছেন তাঁরা আমার কথা সত্য বলে মানবেন। বাংলা ছবির উপাদান কী হওয়া উচিত সে সম্বন্ধে তখনকার সাহিত্যিকদের ধারণার স্পষ্ট ইঙ্গিত এই উপন্যাসে পাওয়া যায়। এখানে আমার একটি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা বলি। একবার এক প্রথম শ্রেণির সাহিত্যিকের কাছে আমি তাঁর একটি গল্প নিয়ে ছবি করার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলাম। তিনি অত্যন্ত বিস্মিত হয়ে বললেন, 'আমার এ গল্প তো সাহিত্যের গল্প মশাই; গল্প থেকে ছবি হবে কী করে?' আসলে চলচ্চিত্রকে তখন পপুলার আর্ট হিসাবেই দেখা হত। এবং পপুলার আর্ট সৃষ্টি করার জন্য যেসব মালমশলা দরকার সেগুলো ছবিতে প্রয়োগ করার দিকে দৃষ্টি রাখতেন পরিচালক।

এটাও মনে রাখা দরকার যে সেকালে বাংলা দেশে ছবি ও প্রেক্ষাগৃহের সংখ্যা ছিল অনেক কম। আর দর্শকের চাহিদাটাও ছিল একটু অন্য ধরনের। হিন্দি ছবির নাচ-গান-অ্যাকশন-মেলোড্রামার ফর্মুলা তখনও উদ্ভব হয়নি। সামাজিক ছবি, পৌরাণিক ছবি ও ধর্মমূলক ছবি—এই তিন শ্রেণিতেই ভাগ করা যেত তখনকার বাঙলা ছবিকে। অবিশ্যি আজও যে এই নিয়ম বাতিল হয়ে গেছে তা বলা যায় না, আর গত কয়েক বছরে যা দেখা গেছে তাতে মনে হয় সাধারণ দর্শকের চাহিদারও খুব বেশি রূপান্তর ঘটেনি। কিন্তু সম্প্রতি বাজারে ও টেলিভিশনে ত্রিশ দশকের কিছু বাংলা ছবি নতুন করে দেখে আমার এই ধারণাই হয়েছে যে উপরোক্ত তিন শ্রেণিভুক্ত আজকের বাংলা ছবি আগের তুলনায় অনেক নিম্নস্তরের। সবাক যুগের গোড়ার দিকেই বাংলার, বিশেষত নিউ থিয়েটার্সের—কলাকুশলীরা ছবির যান্ত্রিক দিকটা যে পরিমাণ আয়ত্ত করেছিলেন, ক্যামেরা সাউন্ড ও সম্পাদনার কাজে যে অনুশীলনের পরিচয় দিতেন, ল্যাবরেটরির কাজে যে পারিপাট্য লক্ষ করা যেত, সেরকম আজকের প্রায় কোনো ছবিতেই দেখা যায় না। এইসব গুণের বিচারে তখনকার বাংলা ছবিকে বেশ অগ্রসর বলেই মনে হত।

এখানে মনে রাখতে হবে যে সে যুগটা রিয়ালিজম-এর যুগ ছিল না। কৃত্রিম উপায়ে পরিবেশ রচনায় হলিউড তখন সিদ্ধহস্ত। বেশির ভাগ কাজই হত স্টুডিয়োতে। আর্ক লাইট তখন সূর্যের আলোর স্থান নিত। রাস্তাঘাট ঘরবাড়ি বনবনানী সবই তৈরি হত স্টুডিয়োর চত্বরে। এতে কাজের

সুবিধে ছিল, আর দর্শকও ছিল এই কনভেনশনে অভ্যস্ত। মঞ্চের দর্শক যেমন ছাদবিহীন তিন দেয়াল-বিশিষ্ট বাসস্থানকে মেনে নেয়, তেমনই সিনেমার দর্শক মেনে নিত এই কৃত্রিম পরিবেশকে। অবিশ্যি হলিউডে মাঝে মাঝে এর ব্যতিক্রম দেখা যেত— যেমন 'ওয়েস্টার্ন' পর্যায়ভুক্ত ছবিতে। ওয়েস্টার্নের উন্মুক্ত প্রান্তর—যেখানে ঘোড়া ছুটতে পারে অবাধে— এ জিনিস স্টুডিয়োতে তৈরি করা হলিউডেরও অসাধ্য ছিল। এই কৃত্রিম পরিবেশ সত্ত্বেও চিত্রনাট্য, অভিনয় ও পরিচালনার গুণে হলিউডের সেরা ছবিগুলি রীতিমতো বিশ্বাসযোগ্য ও উপভোগ্য হয়ে উঠত।

দুঃখের বিষয় এই তিনটি গুণ যথেষ্ট পরিমাণে না থাকায় বাংলা ছবি সেকালে হলিউডের স্তরে পৌঁছোতে পারেনি অথচ অনেক ব্যাপারে সরাসরি হলিউডের অনুকরণ করা হত বাংলা ছবিতে। পশ্চাৎপট যেখানে আধুনিক ও বিষয়বস্তু সামাজিক, সেখানেই এই অনুকরণ সবচেয়ে বেশি চোখে পড়ত। পরনে সুট হ্যাট বা ড্রেসিংগাউন, হালফ্যাশনের আসবাবে ভরা ঘরের ভিতর দিয়ে উঠে যাওয়া ঘোরানো সিঁড়ি, দেয়ালের রং সাদা না হয়ে ধূসর (অথবা ক্ষেত্রবিশেষে ফুলকারি করা ওয়াল পেপার), উচ্চ মধ্যবিত্তের বৈঠকখানায় গ্র্যান্ডপিয়ানো এবং সেই পিয়ানো বাজিয়ে নায়ক-নায়িকার গান— এ সবই হলিউডের অনুকরণ। *দিদি, জীবনমরণ, প্রতিশ্রুতি, মুক্তি, রজতজয়ন্তী, ডাক্তার, নার্স সিসি* ইত্যাদি তখনকার দিনের বহু প্রশংসিত জনপ্রিয় ছবির সবকটিতেই এই অনুকরণ লক্ষণীয়। আসলে বাঙালি জীবনের স্বাভাবিক চেহারাটায় একটা বিলিতি পালিশ না দিয়ে দর্শকের সামনে তুলে ধরার সাহস তখন খুব কম পরিচালকেরই ছিল, অথচ ইঙ্গবঙ্গ জীবনের বাস্তব চেহারাটা ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা কোনো পরিচালক করেছেন বলে মনে পড়ে না।

এখানে একটি ব্যতিক্রমের কথা উল্লেখ করা দরকার। সবাক যুগের গোড়ার দিকে তোলা চারু রায়ের *বাঙালী* ছবিটি আমি প্রথম দেখি বছর-দশেক আগে। এ ছবিতে মধ্যবিত্ত জীবনের যে ডিটেল-সংবলিত চেহারাটা পরিচালক ফুটিয়ে তুলেছিলেন তেমন আর তখনকার কোনো ছবিতে দেখেছি বলে মনে পড়ে না। দুঃখের বিষয়, চারু রায়ের অন্য কোনো ছবি দেখার সুযোগ আমার হয়নি যদিও সেসব ছবির কিছু স্থিরচিত্র দেখে আমার মনে হয়েছে যে চারু রায় হলিউডের প্রভাব এড়াতে পেরেছিলেন।

হলিউডের ছাপ অপেক্ষাকৃত কম দেখা যেত দুই শ্রেণির ছবিতে। এক হল ধর্মমূলক ছবি—যেমন দেবকী বসুর *বিদ্যাপতি* বা *চণ্ডীদাস*, আর-এক হল খাঁটি বাংলা উপন্যাসের ভিত্তিতে তোলা কিছু ছবি—যেমন *কাশীনাথ, পল্লীসমাজ, গোরা, চোখের বালি*—যেখানে উপন্যাসের প্রতি আনুগত্যই হলিউডকে বেশি কাছে আসতে দেয়নি। কিন্তু এইসব ছবির বাঙালিত্ব কেবলমাত্র বিষয়বস্তুতেই নিবদ্ধ। এর চিত্রভাষায় এমন কোনো সজীব জাতীয় বৈশিষ্ট্য নেই যাতে মনে হতে পারে এই ভাষার শিকড় রয়েছে বাংলার মাটিতে। আসলে এর উৎস হল বাংলার থিয়েটার।

এই থিয়েটারের পথ ধরেই বাংলা ছবিতে গানের প্রবেশ। বাংলা ছবির পরিণতির পথে যে যত্রতত্র গানের ব্যবহার একটা প্রধান প্রতিবন্ধকের কাজ করেছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। *চণ্ডীদাস* বা *বিদ্যাপতি*-তে গানের ব্যবহার হয়তো ততটা অসংগত নয়, কিন্তু যে-কোনো পরিচালকের যে-কোনো ছবিতেই যদি গান এসে পড়ে, তা হলে সেটাকে একটা জাতীয় বাতিকের পর্যায়ে ফেলা ছাড়া আর কোনো উপায় থাকে না। এই বাতিকই কুন্দনলাল সায়গলকে তার আড়ষ্ট বাংলা সত্ত্বেও নায়কের আসনে বসিয়েছিল এবং নিউ থিয়েটার্সের একাধিক ছবির আর্থিক সাফল্যের পথ সহজ

করে দিয়েছিল। আসলে বাঙালি দর্শক ছবিতে গান ভালোবাসে এবং মনের মতো গান পেলে পরিচালকের সাত খুন মাফ করে।

ত্রিশ দশকের বেশির ভাগ ছবিই বাস্তবতার অভাব, চিত্রনাট্যের শৈথিল্য এবং সংলাপের আড়ষ্টতা হেতু আজকের দিনে আর মনে দাগ কাটে না। কয়েকটি ব্যতিক্রম ছাড়া উপরোক্ত কারণেই হয়তো এসব ছবির অভিনয়ও হয় আড়ষ্ট না হয় মঞ্চঘেঁষা বলে মনে হয়। তখনকার দিনে প্রমথেশ বড়ুয়ার খ্যাতি ছিল সংযমী অভিনেতা হিসাবে। তাঁর অভিনয় মঞ্চের প্রভাবমুক্ত ছিল এ কথা আজকের দিনেও বলা হয়। মঞ্চাভিনয়ের অভ্যাস না থাকলে এবং সেই সঙ্গে বাংলা ভাষার উপর যোলো আনা দখল না থাকলে, অভিনয়ে মঞ্চের ছাপ না থাকাটাই স্বাভাবিক। কাজেই প্রমথেশ বড়ুয়া হয়তো চেষ্টা করেও মঞ্চসুলভ অতি-অভিনয় করতে পারতেন না। আবার এমনও হতে পারে যে বিদেশের তালিম তাঁকে বাংলা ছবির অভিনয়ের মুদ্রাদোষগুলি এড়িয়ে চলতে সাহায্য করেছিল। স্টুডিয়োতে আলো ও ক্যামেরার ব্যবহারে বিদেশের শিক্ষার ফলে প্রমথেশ বড়ুয়া বাংলা ছবিতে কোনো চমকপ্রদ বিশেষত্ব আরোপ করতে পেরেছিলেন কি না, অথবা পেরে থাকলেও তার ফলে বাংলা ছবির মান উন্নত হয়েছিল কি না, সেটা আজকের দিনে বলা শক্ত। এটুকু বলতে পারি যে *মুক্তি, শেষ উত্তর, শাপমুক্তি* ইত্যাদি ছবিতে যান্ত্রিক কলাকৌশলের দিকটা আজ আর চোখে পড়ে না, যেটা পড়ে সেটা হল ছবিগুলির সামগ্রিক দোআঁশলা ভাবটা।

চল্লিশ দশকেই প্রথম বাংলা ছবিতে একটা নতুন দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় পাওয়া যায়। সেই সময়ের সবচেয়ে সাড়া জাগানো ছবি *উদয়ের পথে*-ই যে দর্শকের মনে এই দৃষ্টিভঙ্গির স্বাদ এনে দিয়েছিল তাতে কোনো সন্দেহ নেই। এই ছবির বিষয়বস্তুতে যে সমাজচেতনার পরিচয় আছে তার জন্য দায়ী অবিশ্যি কাহিনিকার জ্যোতির্ময় রায়। কিন্তু এ ছাড়াও ছবিতে অন্যান্য বৈশিষ্ট্য আছে যার জন্য প্রশংসা পরিচালক বিমল রায়েরই প্রাপ্য। বিমল রায়ই প্রথম তারকাপ্রথা অগ্রাহ্য করে আনকোরা নতুন অভিনেতা ও অভিনেত্রীকে নায়ক-নায়িকার ভূমিকায় ব্যবহার করার সাহস দেখিয়েছিলেন। ছবির পরিবেশও ছিল তখনকার অন্যান্য ছবির তুলনায় অনেক বেশি বাস্তবানুগ। চিত্রনাট্য ছিল সুসংবদ্ধ এবং অভিনয় ও কাহিনিবিন্যাসের ঢং ছিল চলচ্চিত্রের উপযোগী। কিন্তু সম্প্রতি নতুন করে দেখে মনে হয়েছে, *উদয়ের পথে*-ও ধোপে টেকেনি। তার জন্য দায়ী চরিত্র ও বিষয়বস্তুর অতিরিক্ত সরলীকরণ এবং এক ধরনের সংলাপ যার সম্বন্ধে শানিত বিশেষণটি প্রয়োগ করা হয়, কিন্তু যার সঙ্গে রক্তমাংসের মানুষের সাধারণ সংলাপের কোনো সাদৃশ্য নেই।

বিমল রায় তাঁর শ্রেষ্ঠ ছবি *দো বিঘা জমিন* রচনা করেন হিন্দিতে, বোম্বাই যাওয়ার পরে। বোম্বাই গিয়ে ভালো ছবি—এবং বাংলা ছবি করার দাবি যিনি করতে পারেন তিনি হলেন নীতীন বোস। *রজনী* বা *নৌকাডুবি* ছবিতে নিউ থিয়েটার্সে তোলা ছবির চেয়ে অনেক বেশি কৃতিত্ব দেখিয়েছিলেন নীতীন বোস। *উদয়ের পথে*-র কাহিনিকার জ্যোতির্ময় রায় বেশ কিছুকাল চলচ্চিত্রের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, প্রথমে চিত্রনাট্যকার এবং পরে সেই সঙ্গে পরিচালক হিসাবে। বাঙালি নাগরিক জীবনের যে সংবেদনশীল চেহারাটা *উদয়ের পথে*-তে পাওয়া গিয়েছিল, সেটা জ্যোতির্ময় রায় রচিত *অভিযাত্রী, দিনের পর দিন* ও *শঙ্খবাণী* ছবিতেও পাওয়া যায়। দুঃখের বিষয় এসব ছবিগুলি নতুন করে যাচাই করার সুযোগ আসেনি।

কলকাতায় থেকে এই সময়ই যাঁরা উল্লেখযোগ্য বাংলা ছবি করেছেন তাঁদের মধ্যে তিনজনের নাম করা চলে—হেমেন গুপ্ত, সত্যেন বসু ও নির্মল দে। সত্যেন বসু-র *বরযাত্রী* ছবি

সম্প্রতি আবার দেখে টেকনিকের দিক দিয়ে অপরিণত মনে হলেও, এর ষোলো আনা বাঙালি মেজাজ এবং আশ্চর্য স্বাভাবিক ও রসালো সংলাপ (এখানে বসু মহাশয় কাহিনিকার বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের মূল সংলাপ প্রায় অবিকৃত রেখে সুবিবেচনার পরিচয় দিয়েছিলেন), এর সাবলীল অভিনয় (এ ছবিতে স্টার ছিল না) ও অজস্র হাস্যোদ্দীপক ঘটনাবলির আবেদন আজও ম্লান হয়নি।

হেমেন গুপ্ত-র *ভুলি নাই* ও *'৪২*-এর সবচেয়ে বড়ো গুণ হল পরিচালকের আন্তরিকতা। তাছাড়া বিষয়বস্তুর দিক দিয়েও ছবিদুটি তখনকার দিনে মৌলিকত্বের দাবি করতে পারে। দেশাত্মবোধের যে সুরটি এ দুটি ছবিতে ধরা পড়েছে সেটা যে পরিচালকেরই নিজস্ব সুর, ধার করা নয়, সেটা আর বলে দিতে হয় না, এবং এই সুরই শেষপর্যন্ত ছবির নানা যান্ত্রিক ত্রুটি সত্ত্বেও দর্শকের মনকে স্পর্শ করে।

আমার মতে নির্মল দে-র তিনটি ছবি—*বসু পরিবার, সাড়ে চুয়াত্তর* ও *চাঁপাডাঙার বউ*—সবাক যুগের প্রথম দুই দশকের ছবির মধ্যে চিত্রোপযোগী গুণে সবচেয়ে সমৃদ্ধ। অবিশ্যি এখানেও উচ্চশ্রেণির আর্ট বা গভীর তথ্যের প্রশ্ন আসে না। তখনকার হলিউডের বেশির ভাগ পরিচালকের মতোই নির্মল দে-রও প্রধান লক্ষ্য ছিল নানান শ্রেণির দর্শকের মনোরঞ্জন। কিন্তু এ কাজটা তিনি যেমন সুষ্ঠু ও রুচিসম্পন্নভাবে করেছিলেন তেমন আর বিশেষ কেউ করেননি। আজকের দিনে বাংলা ছবিকে যদি হিন্দির সঙ্গে সংগ্রাম করে বেঁচে থাকতে হয় তাহলে এই জাতের অনেক ছবি হওয়া দরকার। শুধু আর্ট করে ইন্ডাস্ট্রি বাঁচবে না, আর বোম্বাই-এর অনুকরণ করতে গেলে বাংলা ছবি হবে না-এদিক না-ওদিক। অবিশ্যি নির্মল দে-র মতো কাজ জানা লোক আজ আর ক'-জন আছে সেটাও একটা প্রশ্ন বটে। চিত্রোপযোগী কাহিনি বা ভালো চিত্রনাট্যকারের অভাব এদেশে চিরকালই। তার উপর এখন যেটার প্রধান অভাব দেখা যাচ্ছে সেটা হল চলচ্চিত্রের সব-দিক-জানা দায়িত্বজ্ঞানসম্পন্ন পরিচালকের। এ অভাব কী করে মিটবে জানি না, অথচ না মিটলে সমূহ সংকট। কেবলমাত্র সরকারের অর্থানুকূল্যে এ সংকট দূর হবার কি না সে বিষয়ে আমার যথেষ্ট সন্দেহ আছে।

বাংলা চলচ্চিত্রের আর্টের দিক

সত্যজিৎ রায়

চলচ্চিত্রের আর্টের দিক নিয়ে আলোচনা করতে গেলে তার ব্যাবসার দিকটাও স্বভাবতই এসে পড়ে। গোড়াতেই টাকা-আনা-পাই-এর প্রসঙ্গ তুলতে আমি লজ্জা বোধ করছি। কিন্তু কথাটা সত্যি যে ওই তিনটি বস্তুর অভাবে চলচ্চিত্রের এগোবার পথ নেই। যন্ত্রযুগের অবদান এই যান্ত্রিক শিল্পটি সিনেমা ব্যাবসার আওতায় এমন অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছে যে প্রচুর অর্থব্যয় না করে ছবি করা একেবারে অসম্ভব। ছবি করতে গেলে তার প্রাথমিক উপকরণ অর্থাৎ ক্যামেরা এবং ফিল্ম্-এরই মূল্য অনেক। তার উপর অভিনেতা-অভিনেত্রী আছেন, কলাকুশলীদের পারিশ্রমিক আছে, স্টুডিয়ো ভাড়া আছে, পোশাক-আশাক, সাজসরঞ্জাম ইত্যাদি যাবতীয় খরচ আছে। ছবি শেষ হলেও রেহাই নেই। কারণ বিজ্ঞাপনের খরচ আছে। সব মিলিয়ে একটা সহজ অনাড়ম্বর ছবির খরচের অঙ্কও লাখের কোঠা পেরিয়ে যায়, তেমন জাঁকালো ছবি হলে তো কথাই নেই। এই ব্যয়সাপেক্ষতা সিনেমা ব্যাবসাকে ব্যবসায়ীর সঙ্গে হাত মেলাতে বাধ্য করেছে।

শিল্পী জানেন তাঁর পরিকল্পনাকে রূপ দিতে হলে তাঁর অর্থের প্রয়োজন। আর ব্যবসায়ী জানেন যে চিত্র নির্মাণ তাঁর নিজের কর্ম নয়— সে কাজ শিল্পীর। দু-জনের এই পারস্পরিক নির্ভরতা দু-জনই স্বীকার করে নিয়েছেন। ব্যবসায়ী অর্থাৎ প্রযোজক অর্থের সংস্থান করেন, শিল্পী অর্থাৎ পরিচালক সেই অর্থের সাহায্যে ছবি তৈরি করে প্রযোজকের হাতে তুলে দেন। প্রযোজক সেই তৈরি ছবি প্রেক্ষাগৃহ মারফত জনসাধারণের সামনে উপস্থিত করেন। জনসাধারণ যদি সে ছবি সাদরে গ্রহণ করেন অর্থাৎ যথেষ্ট সংখ্যায় টিকিট কিনে সে ছবি দেখেন, তবেই তার আর্থিক সাফল্য। যদি ব্যাবসায়িক সাফল্যের সঙ্গে শিল্পগত সাফল্যের সমন্বয় ঘটে, তবে তো সোনায় সোহাগা। কিন্তু এক হলে আর-এক হবে এমন কোনো কথা নেই। অনেক ভালো ছবি জনপ্রিয় ছবি নয়; আর জনপ্রিয়তা শিল্পে উৎকর্ষের সংজ্ঞাও নয়। যদি তাই হত, তবে রবীন্দ্রনাথের অনেক রচনাই সাহিত্য হিসাবে বাতিল করে দিতে হত। যে দেশে শিক্ষার প্রসার এতই সীমাবদ্ধ, সে দেশে শিল্পের সমঝদার যে সংখ্যায় কম হবে— তাতে আর আশ্চর্যের কী? অতএব ভালো ছবি যদি পয়সা না

দেয় তাতে শিল্পী হিসেবে পরিচালকের ব্যর্থতা বোধ করার কোনো কারণ নেই। কিন্তু এতে ব্যবসায়ী হিসেবে প্রযোজকের আশঙ্কার কারণ ঘটতে পারে। প্রযোজকের দৃষ্টিতে ছবির সার্থকতা তাঁর আর্থিক সাফল্যে। ছবি শিল্পসম্মত হল-কী-না-হল তাতে তাঁর একটা-বড়ো এসে যায় না। ছবিতে, পয়সা হল-কী-না-হল সেটাই তাঁর প্রথম ও প্রধান লক্ষ্য। এই ব্যবসায়ীর উপরেই যখন পরিচালকের নির্ভর, তখন তাঁর দিকটা সে অগ্রাহ্য করবে কোন্ সাহসে? কেবলমাত্র আপন খেয়ালখুশিকে চরিতার্থ করবার জন্য শিল্প সৃষ্টি— এ সুযোগ কবির আছে; সংগীতকার বা যন্ত্রশিল্পীর আছে; কিন্তু চলচ্চিত্র পরিচালকের নেই। তাঁকে যেমন দেখতে হবে শিল্পের দিক, তেমনই দেখতে হবে ব্যাবসার প্রয়োজনটা, জনসাধারণের চাহিদাটা। এই চাহিদাটা মেটাতে গিয়ে যদি আর্টকে বিসর্জন দিতে হয়, তা হলে অবশ্য আক্ষেপের কারণ ঘটে। কিন্তু চলচ্চিত্রের ইতিহাসে এমন অনেক দৃষ্টান্ত আছে, যেখানে শিল্পের সঙ্গে জনপ্রিয়তার একটা চমৎকার সমন্বয় ঘটেছে। উদাহরণস্বরূপ চার্লি চ্যাপলিনের ছবির কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। অবশ্য এই সমন্বয় সহজ নয় এবং এর কোনো ফর্মুলাও নেই। কিন্তু অতীতে দৃষ্টান্ত আছে বলেই ভবিষ্যতে সম্ভাবনাও আছে।

যাঁরা এই ব্যাবসার গণ্ডির মধ্যে শিল্পসম্মত ছবি করার প্রয়াস করেন, এই অন্তর্নিহিত সম্ভাবনাই তাঁদের প্রেরণা জোগায়। চলচ্চিত্রের যেগুলি শ্রেষ্ঠ নিদর্শন, তার সবই এই গণ্ডির মধ্যেই সৃষ্টি হয়েছে। অবশ্য এক শ্রেণির চলচ্চিত্র-রচয়িতা আছেন, যাঁদের প্রথম ও প্রধান উদ্দেশ্য হল জীবিকার্জন। এই উদ্দেশ্য অসাধু এমন কথা আমি কী করে বলব! কিন্তু চলচ্চিত্র শিল্পের আলোচনায় এ-জাতীয় পরিচালকের কোনো স্থান নেই। কারণ শিল্প-রচনা এদের উদ্দেশ্যই নয়।

এবারে আসল কথায় আসা যাক।

ভালো ছবি কাকে বলে? ভালো গল্প মানেই কি ভালো ছবি? অনেককেই এমন কথা বলতে শুনেছি। কিন্তু তাই যদি হবে, তা হলে বাংলা দেশের ছবির ইতিহাসে ভালো ছবির এত অভাব হল কেন? বাল্মীকি বেদব্যাস থেকে শুরু করে আধুনিক যুগের সেরা সাহিত্যিকদের কত ভালো গল্পই তো ছবি হয়ে দেখা দিয়েছে! কাহিনির দৈন্য তো সেখানে ছিল না! তবে কীসের দৈন্য, কীসের অভাব তাঁদের শিল্প-সাফল্য থেকে বঞ্চিত করল? আসলে কাহিনি মাত্রেরই দুই দিক আছে— এক হল তার বক্তব্য, আর-এক হল তার ভাষা। এই দুয়ে মিলে গল্প। গল্পের আর্ট এই বলার ভঙ্গিতে। ভালো গল্প বলার দোষে নষ্ট হয়ে যায়, সামান্য কাহিনি বলার গুণে শিল্পমণ্ডিত হয়ে ওঠে। চলচ্চিত্র-শিল্পও তার ভাষায়, তার বিন্যাসকৌশলে। যেখানে ভাষা দুর্বল, সেখানে গল্প ভালো হলেও ছবি শিল্প-সাফল্য লাভ করতে অক্ষম। চলচ্চিত্রের এই ভাষা ছবির ভাষা। পরিচালককে এই ভাষা জানতে হবে, এর ব্যাকরণ তাঁকে আয়ত্ত করতে হবে। কিন্তু ভাষা আয়ত্ত হলেও তাকে রূপ দেওয়া ও ব্যক্ত করা পরিচালকের একার কর্ম নয়। ছবি যাঁরা নিয়মিতভাবে দেখেন, তাঁরা লক্ষ করে থাকবেন পর্দায় কাহিনি শুরু হওয়ার আগে কলাকুশলীদের একটা বিস্তৃত পরিচয়লিপি দেওয়া হয়। এ থেকে বুঝতে অসুবিধে হয় না যে চলচ্চিত্র একটা যৌথশিল্প। অনেকের সমবেত প্রচেষ্টায় একটা ছবি তৈরি হয়। এই কলাকুশলীদের কেউ শিল্পী, কেউ কারিগর, আবার কেউ-বা একাধারে শিল্পী ও কারিগর। এদের দুটো সহজ ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। এক হল— যাঁরা থাকেন ক্যামেরার সামনে অর্থাৎ যাঁরা অভিনয়ে অংশগ্রহণ করেন; আর-এক হল— যাঁরা থাকেন ক্যামেরার পিছনে, যাঁরা নেপথ্য কর্মী— চিত্রনাট্যকার, পরিচালক, ক্যামেরাশিল্পী, শব্দযন্ত্রী, শিল্প-নির্দেশক, সংগীত পরিচালক ও সম্পাদক। এঁরা হলেন দ্বিতীয় পর্যায়ের কর্মী। কাহিনি নির্বাচনের প্রথম কাজ হল চিত্রনাট্য-রচয়িতার,

ইনি কাহিনিকে চলচ্চিত্রের ছাঁচে ঢেলে সাজান। এ কাজটা লেখার কাজ। কিন্তু এই লেখার কোনো সাহিত্যিক মূল্য নেই, বা না থাকলেও কিছু এসে যায় না। চিত্রনাট্যের ভাষা হল ছবির ভাষায় লিখিত ইঙ্গিত মাত্র। এর মূল কাঠামো বা 'স্কেলিটন' হিসেবে। মঞ্চের নাটকের মতো এখানেও কাহিনিকে অঙ্কে ও দৃশ্যে ভাগ করতে হয়। কিন্তু দৃশ্যের মধ্যেও দৃষ্টিকোণ পরিবর্তনের বা শট পরিবর্তনের রীতি আছে। তার সঙ্গে নাটকের কোনো মিল নেই। এ একেবারে সিনেমার নিজস্ব রীতি। সিনেমার ব্যাকরণ অধ্যয়ন না করলে এই রীতি আয়ত্ত করা সম্ভব নয়।

প্রকৃতপক্ষে চিত্রনাট্যের কাজটা পরিচালকের পক্ষেই করা স্বাভাবিক ও বাঞ্ছনীয়। কিন্তু অনেক সময় চরিত্রানুযায়ী সংলাপ রচনার অক্ষমতা হেতু পরিচালককে সাহিত্যিকের শরণাপন্ন হতে হয়। ছবির যে ভাষার ইঙ্গিত চিত্রনাট্যে দেওয়া হল, তাকে ব্যক্ত করতে হবে ক্যামেরার মাধ্যমে। ক্যামেরায় তোলা ছবির পর ছবি জুড়ে চলচ্চিত্রে কাহিনির সামগ্রিক চেহারাটা ফুটে উঠবে। কাহিনির যা-কিছু বর্ণনা— নায়িকার রূপ, নায়কের পৌরুষ, পল্লির শ্যামলতা, বস্তির বদ্ধতা, ঘরবাড়ি, রাস্তাঘাট, যুদ্ধবিগ্রহ— এ সবই ক্যামেরার দৃষ্টি দিয়ে দেখতে হবে। মানুষের চোখ যা দেখে, ক্যামেরার চোখ তার চেয়ে বেশি বই কম দেখে না। প্রয়োজনে ছোটোকে বড়ো, দূরকে নিকট, অসুন্দরকে সুন্দর— এমনকি দিনকে রাত পর্যন্ত দেখানো ক্যামেরার সামর্থ্যের ভিতর। ক্যামেরা তাই পরিচালকের হাতের প্রথম ও প্রধান হাতিয়ার। এই যে ক্যামেরার দৃষ্টিভঙ্গি— এরও ঠিক-বেঠিক আছে, সংগতি-অসংগতি আছে।

কাহিনির ভাবকে ফুটিয়ে তুলতে যা সাহায্য করবে, বক্তব্যকে যা পরিস্ফুট করবে— তাই ঠিক, তাই শিল্পসম্মত। কাহিনির প্রয়োজনের বাইরে যা-কিছু ক্যামেরার কারসাজি, ছবির সামগ্রিক বিচারে তার কোনো মূল্য নেই। ক্যামেরাচালকের যদি শিল্পবোধ বা নাট্যবোধের অভাব হয়, তা হলে তাঁর পক্ষে পরিচালকের প্রয়োজন মেটানো সম্ভব হয় না। তাঁর কাজ তখন কারিগরিতেই সীমাবদ্ধ থাকে, তাঁর অক্ষমতার অনুপাতে ছবির ভাষাও দুর্বল হয়ে পড়ে। শব্দযন্ত্রী, শিল্প-নির্দেশক, সম্পাদক, সংগীত-পরিচালক— এঁদের সকলকে পরিচালকের প্রয়োজন বুঝে নিয়ে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে কাহিনির উৎকর্ষের দিকে দৃষ্টি দিয়ে কাজ করতে হয়। এঁদের সাফল্যে ছবির সাফল্য। উদাহরণস্বরূপ শিল্প-নির্দেশককে ধরা যাক। নায়কের বাসস্থান হিসেবে ইনি যে ঘরটি তৈরি করবেন, সেই ঘরের আকৃতি, আয়তন, তার আসবাব, তার দেয়ালের ছবি, তার পারিপাট্য বা অপারিপাট্য, অর্থাৎ ঘরের সামগ্রিক চেহারা যদি এই বিশেষ কাহিনির এই বিশেষ চরিত্রের সঙ্গে সংগতি রক্ষা না করে, তবে সেই ঘর যতই সুদৃশ্য বা সুনির্মিত হোক, শিল্প হিসেবে তার কোনো মূল্য নেই। অভিনয়ের বেলাতেও ওই একই কথা। বাংলা দেশে অভিনয়ের একটা ঐতিহ্য আছে, সে হল মঞ্চ-ঐতিহ্য। মঞ্চের অভিনয় চলচ্চিত্রে কেবল দৃষ্টিকটুই নয়, তা শিল্প-বিরুদ্ধ। মঞ্চের পরিবেশ তো বাস্তব পরিবেশ নয়। মঞ্চের তিন দেয়ালের ঘরকে কেউ বাস্তব ঘর বলে মেনে নেন না। মঞ্চের অভিনয়, চালচলনও তেমনই বাস্তব জীবনের চালচলনও হতে পারে না। এটা কেউ আশাও করে না। কিন্তু সিনেমার বাস্তব পরিবেশে এই অতি অভিনয় অতি পীড়াদায়ক। এর জন্য অবশ্য অভিনেতাকে দায়ী করা অন্যায়। কোন্ গল্পের কোন্ চরিত্রের অভিনয় কোন্ সুরে বাঁধতে হবে সে বোধ পরিচালকের থাকা চাই। শুধু তাই নয়, অভিনেতার মধ্যেও সেই বোধ সঞ্চারিত করবার ক্ষমতা থাকা চাই। তাঁর প্রয়োজনানুযায়ী অভিনয় তাঁকে আদায় করে নিতে হবে। ছবির দোষ বা গুণ, শিল্প হিসেবে ব্যর্থতা এবং সাফল্য দুয়ের অধিকাংশের জন্য দায়ী পরিচালক। দর্শক ও সমালোচকদের এ কথাটা মনে রাখতে হবে যখন তাঁরা ছবির গুণাগুণ বিচার করবেন। ছবির গল্প ভালো নয় বলে কাহিনিকারকে

দোষ দিলে চলবে না। সে গল্প পরিচালক নির্বাচন করলেন কেন? অভিনয়ে যদি ত্রুটি থাকে, তবে সে ত্রুটি পরিচালকের দৃষ্টি এড়াল কেন? গাঁথুনির দুর্বলতা কি সম্পাদকের, না চিত্রনাট্যের গাঁথুনিতেই গলদ আছে? অবশ্য গলদ কোথায় সঠিক বুঝতে হলে চলচ্চিত্রের রীতিনীতি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হতে হবে। শুধু তাই নয়, বাংলা ছবির সমালোচনা করতে গেলে কী অবস্থায় সে ছবি তৈরি হয়, তা জানতে হবে। খারাপের অনুপাতে ভালো ছবির সংখ্যা কম, এ নিয়ে আক্ষেপ করে লাভ নেই। পৃথিবীর যে-কোনো দেশে যে-কোনো শিল্পসৃষ্টি সম্পর্কে এ কথা খাটে; চলচ্চিত্র সম্বন্ধে তো বটেই। আসলে শিল্পীর অবর্তমানে শিল্পসৃষ্টি আশা করাই ভুল।

প্রতিভা সর্বকালে সর্বদেশে বিরল। তবে বিদেশে শিল্পশিক্ষার সুযোগ আছে; চলচ্চিত্রের বিদ্যালয় আছে। অভিনয়, পরিচালনা, ক্যামেরার কাজ— এ সবই শেখার ব্যবস্থা আছে। ভালো ছবি দেখে তার ব্যাকরণ, তার ভাষা, তার রীতিনীতি বিশ্লেষণ করবার সুযোগ আছে। দুর্ভাগ্যক্রমে বাংলা দেশে এসব কোনো সুযোগই নেই, শিক্ষার কোনো ব্যবস্থাই নেই। তা সত্ত্বেও বাংলা ছবির সাফল্য তার অভিনয়ের মান, তার কলাকুশলীদের কৃতিত্ব— এ নিয়ে গর্ব না করে থাকা যায় না। এ অবস্থায় আর কোনো দেশে এত দূর সম্ভব হত কি না সে বিষয়ে আমি অন্তত সন্দেহ পোষণ করি।

বাংলা ভাষার গতি

রাজশেখর বসু

বাংলা ভাষার বয়স অনেক, কিন্তু তার যৌবনারম্ভ হয়েছিল মোটে দেড়শো বৎসর আগে, গদ্য-রচনার প্রবর্তনকালে। তার পূর্বে বাংলা সাহিত্য ছিল পদ্যময়, তাতে নবরসের প্রকাশ হতে পারলেও সকল প্রয়োজন সিদ্ধ হত না। গদ্য বিনা পূর্ণাঙ্গ সাহিত্যের প্রতিষ্ঠা হতে পারে না।

বিলাতি ইতিহাসে যেমন এলিজাবেথীয় ভিকটোরীয় ইত্যাদি যুগ, সেইরকম বাংলা সাহিত্যিক ইতিহাসের কালবিভাগের জন্য বলা হয় ভারতচন্দ্র, রামমোহন, বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র আর রবীন্দ্রনাথের যুগ। রবীন্দ্রনাথের পরে কোনো প্রবল লেখকের আবির্ভাব হয়নি, তাই ধরা হয় এখনও রবীন্দ্রযুগ চলছে। কথাটা পুরোপুরি ঠিক নয়। যুগপ্রবর্তকের শাসন অর্থাৎ প্রত্যক্ষ প্রভাব যত দিন বলবৎ থাকে তত দিনই তাঁর যুগ। বঙ্কিমচন্দ্র একচ্ছত্র সাহিত্য-শাসক ছিলেন, তাঁর আমলে লেখকরা মুষ্টিমেয় ছিলেন, সেজন্য তৎকালীন সাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্রের অত্যধিক প্রভাব দেখা যায়। রবীন্দ্রনাথের রচনা ও সংসর্গ অগণিত লেখককে প্রভাবিত করেছে, কিন্তু তাঁর উদার শাসনে কোনো রচয়িতার ব্যক্তিত্ব বিকাশের হানি হয়নি। তাঁর তিরোধানের পর বাংলা সাহিত্যে ভাবগত ও ভাষাগত নানা পরিবর্তন স্পষ্টতর হয়ে দেখা দিয়েছে। এই পরিবর্তনের যে অংশ বহিরঙ্গ বা ভাষার আকৃতিগত তারই কিছু আলোচনা করছি।

চলিতভাষার প্রসার

চলিতভাষায় লিখিত প্রথম গ্রন্থ বোধ হয়, *হুতোম পেঁচার নক্শা*। অনেকে বলেন, *আলালের ঘরের দুলালও* চলিতভাষায় লেখা। কথা ঠিক নয়, কারণ এই বইয়ে প্রচুর গ্রাম্য আর ফারসি শব্দ থাকলেও সর্বনাম আর ক্রিয়াপদের সাধুরূপই দেখা যায়। রেনল্ডস-এর গল্প অবলম্বনে লিখিত *হরিদাসের গুপ্তকথা* নামক একটি বই পঞ্চাশ-ষাট বৎসর আগে খুব চলত। এই বই চলিতভাষায় লেখা কিন্তু তাতে সাধুর মিশ্রণ ছিল। বঙ্কিমযুগের গল্পের নরনারী সাধুভাষায় কথা বলত। তার পর রবীন্দ্রনাথ, প্রভাত মুখোপাধ্যায়, শরৎচন্দ্র প্রভৃতি বহু লেখক তাঁদের পাত্রপাত্রীদের মুখে চলিতভাষা

দিতে আরম্ভ করেন, কিন্তু তাঁরা নিজের বক্তব্য সাধুভাষাতেই লিখতেন। আরও পরে প্রমথ চৌধুরীর প্রেরণায় রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রায় সমস্ত গদ্যরচনা চলিতভাষাতেই লিখতে লাগলেন। রবীন্দ্রনাথ আর প্রমথ চৌধুরী যে রীতির প্রবর্তন করেছেন তাই এখন চলিতভাষার প্রামাণিক বা স্ট্যান্ডার্ড রীতি রূপে গণ্য হয়।

আজকাল বাংলায় যা-কিছু লেখা হয় তার বোধ হয় অর্ধেক চলিতভাষায়। সাধুভাষা এখন প্রধানত খবরের কাগজে, সরকারি বিজ্ঞাপনে, দলিলে আর স্কুলপাঠ্য পুস্তকে দেখা যায়। অধিকাংশ গল্প এখন চলিতভাষাতেই লেখা হয়। কিন্তু সকলে এ ভাষা পুরোপুরি আয়ত্ত করতে পারেননি, তার ফলে উচ্ছৃঙ্খলতা দেখা দিয়াছে। সাধুভাষা এখনও টিকে আছে, তার কারণ চলিতভাষায় যথেচ্ছাচার দেখে বহু লেখক তা পরিহার করে চলেন। 'বল্ল, দিলো, কোর্চ্ছে' প্রভৃতি অদ্ভুত বানান এবং 'কাবুরকে, তাদেরকে, ঘরের থেকে' প্রভৃতি গ্রাম্য প্রয়োগ বর্জন না করলে চলিতভাষা সাধুর সমান দৃঢ়তা ও স্থিরতা পাবে না। লেখকদের মনে রাখা আবশ্যক যে চলিতভাষা কলকাতা বা অন্য কোনো অঞ্চলের মৌখিক ভাষা নয়, সাহিত্যের প্রয়োজনে উদ্ভূত ব্যবহারসিদ্ধ বা conventional ভাষা। এই ভাষা সুপ্রতিষ্ঠিত করতে হলে নির্দিষ্ট ধাতুরূপ ও শব্দরূপ মানতে হবে এবং সাধুভাষার সঙ্গে বিস্তর রফা করতে হবে।

বানানের অসাম্য

বাংলা বানানের উচ্ছৃঙ্খলতা সম্বন্ধে বিস্তর অভিযোগ পত্রিকাদিতে ছাপা হয়েছে। সকলেই বলেন, নিয়মবন্ধন দরকার। ঠিক কথা, কিন্তু কে নিয়মবন্ধন করলে লেখকরা তা মেনে নেবেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়? বিশ্বভারতী? বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ? প্রায় ষোলো বৎসর পূর্বে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কতকগুলি নিয়ম রচনা করেছিলেন, রবীন্দ্রনাথ আর শরৎচন্দ্র সেই নিয়মাবলিতে স্বাক্ষর করে তাঁদের সম্মতি জানিয়েছিলেন। তার পর থেকে রবীন্দ্ররচনাবলি মোটামুটি সেই বানানে ছাপা হচ্ছে, অনেক লেখকও তার কিছু কিছু অনুসরণ করে থাকেন; কিন্তু অধিকাংশ লেখক এই নিয়মগুলির কোনো খবরই রাখেন না, রাখলেও তাঁরা চিরকালের অভ্যাস বদলাতে চান না। আসল কথা, নিয়ম রচনা যিনিই করুন, সকলের তা পছন্দ হবে না, লেখকরা নিজের মতেই চলবেন। বাঙালির নিয়মনিষ্ঠার অভাব আছে। রাজনীতিক নেতা বা ধর্মগুরুর আজ্ঞা বাঙালি ভাবের আবেগে সংঘবদ্ধ হয়ে অন্ধভাবে পালন করতে পারে, কিন্তু কোনো যুক্তিসিদ্ধ বিধান সে মেনে নিতে চায় না।

বাংলা বানানে সামঞ্জস্য শীঘ্র দেখা দেবে এমন সম্ভাবনা নেই। অ্যা, য়্যা, এ্যা প্রভৃতি বিচিত্র বানান চলতে থাকবে, যাঁরা নূতনত্ব চান তাঁরা 'বংগ, আকাংখা, উচিৎ, কোরিলো, বিশেষতো' লিখবেন এবং দেদার ও-কার হস্‌-চিহ্ন অনর্থক যোগ করবেন। হিন্দিভাষী সোজাসুজি বানান করে লখনউ, কিন্তু বাঙালি তাতে তুষ্ট নয়, লেখে লক্ষ্ণৌ। অকারণ য-ফলা দিয়ে লেখে স্যার, অকারণ ও-কার দিয়ে লেখে পেলো। নিয়মবন্ধনে ফল হবে না। যতরকম বানান এখন চলেছে তার কতকগুলি কালক্রমে বহুসম্মত ও প্রামাণিক গণ্য হয়ে স্থায়িত্ব পাবে, বাকিগুলি লোপ পাবে।

পূর্ববঙ্গের প্রভাব

সেকালে যখন সাধুভাষাই সাহিত্যের একমাত্র বাহন ছিল তখন সুপ্রতিষ্ঠ লেখকদের রচনা পড়ে বোঝা যেত না তাঁরা কোন্ জেলার লোক। কলকাতার রমেশচন্দ্র দত্ত, ঢাকার কালীপ্রসন্ন ঘোষ, চাটগাঁয়ের নবীনচন্দ্র সেন, মহারাষ্ট্রের সখারাম গণেশ দেউস্কর একই ভাষায় লিখেছেন। তাঁদের

রচনায় গ্রাম্য বা প্রাদেশিক শব্দ না থাকায় ভাষার ভেদ হত না। কিন্তু আজকাল চলিতভাষায় যা লেখা হয় তা পড়লে প্রায় বোঝা যায় লেখক পূর্ববঙ্গীয় কিংবা পশ্চিমবঙ্গীয়। 'আপ্রাণ, সাথে, কিছুটা, কেমন জানি (কেমন যেন), সুন্দর মতো' ইত্যাদি পশ্চিমবঙ্গে চলে না। কিন্তু এসব প্রয়োগ অশুদ্ধ নয়, অতএব বর্জনীয় বলা যায় না। পূর্ববঙ্গবাসী অতিরিক্ত গুলি আর টা প্রয়োগ করেন, অকারণে 'নাকি' লেখেন, অচেতন পদার্থেও মাঝে মাঝে -রা যোগ করেন। ('আকাশ হতে জলেরা ঝড়ে পড়ছে'), কর্মকারকে অনেক সময় অনর্থক-কে বিভক্তি লাগান ('বইগুলিকে গুছিয়ে রাখো')। তাঁরা নিজের উচ্চারণ অনুসারে 'দেওয়া নেওয়া সওয়া' (১$\frac{১}{৪}$) স্থানে 'দেয়া নেয়া সোয়া' লেখেন, মোমবাতি অর্থে 'মোম', টেলিগ্রাম অর্থে 'টেলি' লেখেন। এইসব প্রয়োগও নিষিদ্ধ করা যাবে না। বিলাত আর মার্কিন দেশের ভাষা ইংরেজি কিন্তু অনেক নামজাদা লেখকের রচনায় ওয়েল্স স্কচ বা আইরিশ ভাষার ছাপ দেখা যায়, মার্কিন ইংরেজি অনেক সময় খাস ইংরেজের অবোধ্য ঠেকে। পূর্ববঙ্গীয় অনেক বৈশিষ্ট্য সাহিত্যিক বাংলা ভাষার অঙ্গীভূত হয়ে যাচ্ছে, তাতে আপত্তি করলে চলবে না।

তথাপি মানতে হবে যে পশ্চিমবঙ্গের মৌখিক ভাষার সঙ্গেই সাহিত্যিক চলিতভাষার সাদৃশ্য বেশি। সকল লেখকই তাঁদের প্রাদেশিক সংস্কার পরিহার করে পশ্চিমবঙ্গীয় রীতি অনুসরণের চেষ্টা করেন। এতে কোনো জেলার গৌরব বা হীনতার প্রশ্ন ওঠে না, বিশেষত দৈববিপাকে ক্ষুদ্র পশ্চিমবঙ্গ যখন সমস্ত বাঙালি হিন্দুর আশ্রয় হয়ে পড়েছে। কিন্তু অনেক সময় অজ্ঞতার ফলে পূর্ববঙ্গবাসীর (এবং পশ্চিমবঙ্গেরও কয়েকটি জেলাবাসীর) লেখায় অপ্রামাণিক বানান এসে পড়ে, যেমন অস্থানে চন্দ্রবিন্দু বা যথাস্থানে চন্দ্রবিন্দুর অভাব, ড় আর র-এর বিপর্যয়। যোগেশচন্দ্র বিদ্যানিধি মহাশয়ের মুখে শুনেছি, তাঁর এক বন্ধু তাঁকে লিখেছিলেন— ঘাঁড়ে ফোঁড়া হওয়ায় বড় কষ্ট পাইতেছি। যোগেশচন্দ্র উত্তরে লেখেন— 'আপনার ঘাড় আর ফোড়ার চন্দ্রবিন্দু দেখিয়া আমি আরও কষ্ট পাইলাম।' অনেকে 'চেইন, ট্রেইন, মেরেইজ (marriage)' লেখেন। এঁদের একজনের কাছে শুনেছি, 'চেন' লিখলে 'চ্যান' পড়বার আশঙ্কা আছে, তার প্রতিষেধের জন্য ই দেওয়া দরকার। আরও কয়েকজন যুক্তি দিয়েছেন, খাস ইংরেজের উচ্চারণে ই-ধ্বনি আছে। এক ভাষার উচ্চারণ অন্য ভাষার বানানে সকল ক্ষেত্রে যথাযথ প্রকাশ করা যায় না, অতএব কাছাকাছি বানানেই কাজ চালাতে হবে। 'চেইন' লিখলে সাধারণ পাঠকের মুখে ই-কার অত্যধিক প্রকট হয়ে পড়ে, সেজন্য 'চেন' লেখাই উচিত। লেখকের মুখের ভাষায় প্রাদেশিক টান থাকলে ক্ষতি হয় না, কিন্তু লেখবার সময় সকলেরই সতর্ক হয়ে প্রামাণিক বানান অনুসরণ করা উচিত।

শব্দ ও অর্থের শুদ্ধি

ত্রিশ-চল্লিশ বৎসর আগের তুলনায় এখনকার লেখকরা বেশি ভুল করেন, যাঁরা বাংলায় এম. এ. পাস করেছেন তাঁরাও বাদ যান না। সেকালে লেখকের সংখ্যা অল্প ছিল, তাদের মধ্যে যাঁরা শীর্ষস্থানীয় তাঁরা ভাষার উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখতেন এবং অন্য লেখকদের নিয়ন্ত্রিত করতেন। একালে লেখকদের সংখ্যাবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অসতর্কতাও বেড়েছে। অশুদ্ধির একটি প্রধান কারণ শিক্ষিত লোকের মধ্যে সংস্কৃতচর্চা পূর্বের তুলনায় খুব কমে গেছে।

অনেকে বলে থাকেন, ভাষা ব্যাকরণের অধীন নয়, বাংলা ভাষায় সংস্কৃত নিয়ম চালাবার দরকার নাই। এ কথা সত্য যে জীবিত ভাষা কোনো নির্দিষ্ট ব্যাকরণের শাসন পুরোপুরি মানে না,

স্বাধীনভাবে এগিয়ে চলে, সেজন্য কালে তার ব্যাকরণ বদলাতে হয়। শুধু ব্যাকরণ নয়, শব্দাবলি শব্দার্থ আর বাক্যরচনার রীতিও বদলায়। কিন্তু সংস্কৃতের সঙ্গে বাংলার যে সম্বন্ধ আছে তা অস্বীকার করা চলে না। ল্যাটিন গ্রিক যে অর্থে মৃতভাষা সংস্কৃত সে অর্থে মৃত নয়। অসংখ্য সংস্কৃত শব্দ বাংলা ভাষার অন্তর্ভুক্ত হয়ে আছে, প্রয়োজন হলে সংস্কৃত সাহিত্য থেকে আরও শব্দ নেওয়া হয় এবং ব্যাকরণের বিধি অনুসারে নূতন শব্দ তৈরি করা হয়। শুধু বাংলা ভাষা নয়, অসমিয়া ওড়িয়া হিন্দি মারাঠি গুজরাটি ভাষাও সংস্কৃত থেকে শব্দ নেয়। সংস্কৃতের বিপুল শব্দভাণ্ডার এবং শব্দরচনার চিরাগত সুপ্রতিষ্ঠিত পদ্ধতি অবহেলা করলে বাংলা ভাষার অপূরণীয় ক্ষতি হবে। অধিকাংশ ভারতীয় ভাষার যোগসূত্র সংস্কৃত শব্দাবলি, শব্দের বানান আর অর্থ বিকৃত করলে সেই যোগসূত্র ছিন্ন হবে, অন্য প্রদেশবাসীর পক্ষে বাংলা ভাষা দুর্বোধ হবে।

সজ্ঞানে শব্দের অপপ্রয়োগ করতে কেউ চায় না, কিন্তু মহামহা-পণ্ডিতেরও ভুল হতে পারে। প্রখ্যাতনামা নমস্য লেখকের ভুল হলে খাতির করে বলা হয় আর্ষ-প্রয়োগ, কিন্তু সেই প্রয়োগ প্রামাণিক বলে গণ্য হয় না। ভুল জানতে পারলে অনেকে তা শুধরে নেন, কিন্তু যাঁর অভ্যাস দাঁড়িয়ে গেছে তিনি ছাড়তে চান না। ভুল প্রয়োগের সমর্থনে অনেক সময় কুযুক্তি শোনা যায়। বাংলা 'চলন্ত' আর 'পাহারা' আছে, কিন্তু অনেকে তাতে তুষ্ট নন, সংস্কৃত মনে করে 'চলমান' আর 'প্রহরা' লেখেন। যখন শোনেন যে সংস্কৃত নয় তখন বলেন, বাংলা স্বাধীন ভাষা, সংস্কৃতের দাসী নয়; চলমান আর প্রহরা শ্রুতিমধুর, অতএব চলবে। 'কার্যকরী' স্ত্রীলিঙ্গ, কিন্তু বোধ হয় সুমিষ্টি, তাই 'কার্যকরী উপায়, কার্যকরী প্রস্তাব' ইত্যাদি অপপ্রয়োগ আজকাল খবরের কাগজে খুব দেখা যায়।

'কর্মসূত্রে' স্থানে 'কর্মব্যপদেশে', 'ধূমজাল' স্থানে 'ধূম্রজাল', 'শয়িত' বা শয়ান স্থানে 'শায়িত', 'প্রসার' স্থানে 'প্রসারতা', 'কৌশল' বা পদ্ধতি অর্থে 'আঙ্গিক', 'প্রামাণিক' অর্থে 'প্রামাণ্য', 'ক্ষীণ' বা মিটমিটে অর্থে 'স্তিমিত' ইত্যাদি অশুদ্ধ প্রয়োগ আধুনিক রচনায় প্রচুর দেখা যায়। এইসব শব্দের বদলে শুদ্ধ শব্দ লিখলে রচনার মিষ্টত্বের লেশমাত্র হানি হয় না। ভাষার শুদ্ধিরক্ষার জন্য সতর্কতা আবশ্যক— এ কথা শুনলে নিরঙ্কুশ লেখকেরা খুশি হন না। তাঁদের মনোভাব বোধ হয় এই— যা আমার অভ্যাস হয়ে গেছে এবং আর পাঁচজনেও যা লিখছে তা অশুদ্ধ হলেও মেনে নিতে হবে। আমি যদি গলা-ধাক্কা অর্থে গলাধঃকরণ লিখে ফেলি এবং আমার দেখাদেখি অন্যেও তা লিখতে আরম্ভ করে তবে সেই নূতন অর্থই মানতে হবে।

ইংরেজির প্রভাব

ইংরেজি অতি সমৃদ্ধ ভাষা। মাতৃভাষার অভাব পূরণের জন্য সাবধানে ইংরেজি থেকে শব্দ আর ভাব আহরণ করলে কোনো অনিষ্ট হবে না। কিন্তু যা আমাদের আছে তাকে অবহেলা করে যদি বিদেশি শব্দ বা বাক্যের নকল চালানো হয়, তবে অনর্থক দৈন্য প্রকাশ পাবে এবং মাতৃভাষা বিকৃত হবে। medium -এর প্রতিশব্দ 'মাধ্যম'-এর প্রয়োজন আছে, যথাস্থানে তার প্রয়োগ সার্থক। কিন্তু ইংরেজি বাক্যরীতির অনুকরণে লেখা হয়— 'বাংলা ভাষার মাধ্যমে বিজ্ঞানশিক্ষা'। 'বাংলায় বিজ্ঞানশিক্ষা' লিখলে হানি কী? সম্প্রতি দেখেছি— 'এই সভায় অনেক ব্যক্তিত্বের সমাগম হয়েছিল'। ইংরেজি Personality-এর আক্ষরিক অনুবাদ না করে 'বিশিষ্ট ব্যক্তির সমাগম' লিখলে কি চলত না? Promise আর Signature-এর বিশেষ অর্থে 'প্রতিশ্রুতি' আর 'স্বাক্ষর'-এর অপপ্রয়োগ আজকাল

খুব দেখা যায়। 'নারীমাত্রেই মাতৃত্বের প্রতিশ্রুতি সম্পন্ন'। 'এই গ্রন্থে তাঁর প্রতিভার স্বাক্ষর রেখে গেছেন'। একজনের লেখায় দেখেছি—'সে এই অপমানের বিজ্ঞপ্তি নিল না' (অর্থাৎ took no notice)। এইরকম অন্ধ অনুকরণ যদি চলতে থাকে তবে বাংলা শীঘ্রই একটা উৎকট ভাষায় পরিণত হবে।

উচ্ছ্বাস ও আড়ম্বর

নীরদ চৌধুরীর বহু বিতর্কিত ইংরেজি বই-এ এইরকম একটা কথা আছে— বাঙালি বিনা আড়ম্বরে কিছু লিখতে পারে না। যুদ্ধ বেধেছে, এই সোজা কথার বদলে লিখবে— রুদ্র তাঁর প্রলয়নাচন নাচতে আরম্ভ করেছেন। চৌধুরী মহাশয় কিছু অত্যুক্তি করেছেন, কিন্তু তাঁর অভিযোগ একেবারে ভিত্তিহীন নয়। বাংলা কাগজে আগুন লাগা বা অগ্নিকাণ্ডের খবর লেখা হয়— বৈশ্বানরের তাণ্ডবলীলা। জলে ডুবি বা জলমজ্জনকে বলা হয় সলিল সমাধি। 'ব্যর্থ হইল' লিখলে যথেষ্ট হয় না, লেখা হয়— 'ব্যর্থতায় পর্যবসিত হইল'। বাংলাভাষী স্থানে লেখা হয় 'বাংলা-ভাষাভাষী'। সরল ভাষায় বক্তব্য প্রকাশ করতে অনেকে পারেন না।

বিজ্ঞানদর্শনাদির আলোচনায় উচ্ছ্বসিত ভাষা অনর্থকর। বক্তব্য সহজে বোঝা যাবে মনে করে অনেকে অতিরিক্ত রূপক বা কাব্যিক ভাষা প্রয়োগ করেন— 'কোষ্ঠকাঠিন্য জীবাণুর পক্ষে বন্ধুর কাজ করে'। 'যে অণুর মধ্যে যত প্রকারের স্বাভাবিক কাঁপন, ততরকম ভাবে এক একটা আলো কণার থেকে কাঁপন চুরি যেতে পারে'। যাঁরা বাংলায় বিজ্ঞান লিখবেন তাঁদের বাগাড়ম্বর পরিহার করে স্পষ্টতা আর শৃঙ্খলিত যুক্তির তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখতে হবে। বিজ্ঞান-দর্শনের প্রসঙ্গে কবিত্বের ঈষৎ স্পর্শ একমাত্র রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর রচনায় সার্থক হয়েছে। যাঁরা স্কুলকলেজের জন্য বিজ্ঞানের বই লিখবেন তাঁদের সেরকম চেষ্টা না করাই ভালো।

ক খ গ ঘ ঙ চ ছ জ ঝ
ঞ ট ঠ ড ঢ ণ ত থ
দ ধ ন প ফ ব ভ ম
য র ল ব শ ষ স হ ক্ষ

আমাদের ভাষা-সংকট

প্রমথ চৌধুরী

শ্রীযুক্ত বারীন্দ্রকুমার ঘোষ সম্প্রতি আবিষ্কার করেছেন যে, আমার ভাষা সংকর; অর্থাৎ আমার বাংলার ভিতর থেকে ইংরেজি শব্দ স্ব-রূপে মাঝে মাঝে দেখা দেয়। এ অপবাদ সত্য। তবে বাংলার ভিতর ইংরেজি ঢুকলে ভাষা যদি সংকর হয়, তা হলে শুধু আমার নয়, দেশসুদ্ধ লোকের ভাষা সংকর হয়ে গেছে।

বাংলার ইংরেজি-শিক্ষিত সম্প্রদায়ের কথোপকথনের দিকে কান দিলেই টের পাবেন যে, তাদের মৌখিক ভাষার বিশেষ্য বিশেষণ সব বেশির ভাগ ইংরেজি; তার ক্রিয়াপদ ও সর্বনামই শুধু বাংলা। তার পর জনগণের মুখেও যে কত ইংরেজি কথা তদ্ভব আকারে নিত্য চলেছে তা সে শ্রেণির বাঙালির সঙ্গে কার্যগতিকে যাঁর নিত্য কথাবার্তা কইতে হয় তিনিই জানেন। রাজমিস্ত্রি-ছুতোরমিস্ত্রিদের অধিকাংশ যন্ত্রপাতির নামের যে বিলেতে জন্ম তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই; কেননা মিস্ত্রি কথাটাই বিলেতি। 'বিলেতি' শব্দের অর্থ বিদেশি; আমি তাই ও শব্দটি 'ইউরোপীয়' এই অর্থেই এ পত্রে ব্যবহার করছি, ইংরেজির প্রতিশব্দ হিসেবে নয়।

ইংরেজি কথা যেমন হালে আমাদের ভাষার ভিতর প্রবেশ করেছে, ইংরেজ রাজা হবার পূর্বে অপর নানাজাতীয় বিলেতি কথা তেমনি আমাদের পূর্বপুরুষদের ভাষার ভিতর অবলীলাক্রমে ঢুকে গেছে, আর বাংলা ভাষার অঙ্গে সেসব এমনি বেমালুমভাবে বসে গিয়েছে যে, সেগুলি যে আসলে বিলেতি তাও আমরা ভুলে গিয়েছি। পশ্চিম ইউরোপের ভাষাগুলিকে মোটামুটি দুই শ্রেণিতে বিভক্ত করা হয়, প্রথম Romance language, দ্বিতীয় Germanic। এখন দেখা যাক এ দুয়ের ভিতর কোন্ ভাষার কাছে আমাদের মুখের ভাষা বেশি ঋণী।

নবাবি আমলে কবি ভারতচন্দ্রের মুখে শুনতে পাই যে তাঁর কালে বাংলায় এইসব বিলেতি জাতি বাস করত, যথা ১. ফিরিঙ্গি, ২. ফরাসি, ৩. আলেমান, ৪. ওলন্দাজ, ৫. দিনেমার,৬. ইংরেজ। ফরাসি অবশ্য French, আলেমান German, ওলন্দাজ Dutch, দিনেমার Dane, আর ইংরেজ English, তা হলে ফিরিঙ্গি হচ্ছে নিশ্চয়ই পোর্তুগিজ; French ফিরিঙ্গি

না হয়ে পোর্তুগিজ যে কেন তা হল, সে রহস্যের সন্ধান আমি জানিনে। শব্দের রূপান্তরের আইনকানুন আমি জানিনে।

ভারতচন্দ্রের সঙ্গে সব জাতের চাক্ষুষ পরিচয় ছিল; তিনি বহুকাল ফরাসডাঙায় বাস করেছিলেন, আর পোর্তুগিজদের আড্ডা ছিল হুগলি, ওলন্দাজদের চুঁচুড়া, দিনেমারদের শ্রীরামপুর, সব-শেষ ইংরেজদের কলকাতা। মধ্য থেকে আলেমান কোত্থেকে এসে জুটল আর তাদের বসতিই বা ছিল কোথায়, তা আমার অবিদিত। ফরাসডাঙায় যে জার্মানরা ছিল না, সেটা নিশ্চিত; আর কলকাতায় যে ছিল সে বিষয়েও সন্দেহ আছে। তবে সেকালে কোনো জাতের সঙ্গে অপরকার যে *entente cordiale* ছিল সে কথা আমি বলতে পারিনে; যেহেতু আমি ঐতিহাসিক নই। আমার বিশ্বাস আলেমানরা তখন আশমানে বাস করত, অর্থাৎ তারা সর্বত্রই ছিল।

উল্লিখিত ছটি জাতের মধ্যে প্রথম দুটির ভাষা Romance, বাকি চারটির Germanic। এই Romance ভাষার দেদার কথা বাঙালির অজ্ঞাতসারে বাংলা ভাষার অন্তর্ভূত হয়ে গেছে। বহুকাল পূর্বে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় বাংলার অঙ্গীভূত পোর্তুগিজ শব্দাবলির একটি ফর্দ দেখে আমার চক্ষু স্থির হয়ে যায়, কেননা সে ফর্দ ছিল দশ পাতা লম্বা। তার পর আমাদের ভাষায় ফরাসি শব্দও বড়ো কম নেই। তাসখেলার 'জুয়ো' থেকে আরম্ভ করে প্রমারার 'দুস' 'ত্রেস' 'তেরাস্তা' 'কোরেস্তা' 'মাছ' 'কাতুর' পর্যন্ত প্রায় সকল কথাই ফরাসি। ওই সূত্রে দেখতে পাই জার্মানিক ভাষারও দু চার কথা আমাদের ভাষায় ঢুকে গিয়েছে। শুনতে পাই 'হরতন' 'রুইতন' হচ্ছে খাস ওলন্দাজি। এ থেকে দেখা যাচ্ছে যে, নবাবের আমলে দু-হাতে বিলেতি কথা আত্মসাৎ করে বাংলা ভাষা তার দেহ পুষ্ট করেছে। এতে আশ্চর্য হওয়ার কিছুই নেই, বিদেশি শব্দকে স্বদেশি করা হচ্ছে আমাদের ভাষার চিরকেলে ধর্ম।

মুসলমান যুগে কত ফারসি ও আরবি শব্দ যে বাংলা হয়ে গেছে তা কি আর বলা প্রয়োজন? আমরা হচ্ছি কৃষিজীবী জাত, অথচ 'জমি' থেকে 'ফসল' পর্যন্ত কৃষি-সংক্রান্ত প্রায় সকল কথাই হয় ফারসি নয় আরবি। আর জমিদারি-সংক্রান্ত সকল কথাই ওই আরবি-ফারসির দান; ও ভাষার ভিতর সংস্কৃতের লেশমাত্র নেই। আমাদের কর্মজীবনের যা ভিত্তি, অর্থাৎ দেশের মাটি, তারও নাম জমি। বাংলার মতো মিশ্রভাষা এক উর্দু বাদ দিলে ভারতবর্ষে বোধ হয় আর দ্বিতীয় নেই। তার পর আমাদের কর্মজীবনের যা চূড়া, অর্থাৎ আইন-আদালত, তার ভাষাও আগাগোড়া আরবি-ফারসি! আর্জি থেকে রায় ফয়সালা পর্যন্ত মামলার আদ্যোপান্ত সকল কথাই বাংলা ভাষাকে মুসলমানের দান। ইংরেজরা আজকাল ডিক্রি দেন বটে কিন্তু তা 'জারি' করতে হলেই ইংরেজি ছেড়ে ফারসির শরণাপন্ন হতে হয়। এ কথা যে সত্য, তা যে-কোনো মোক্তারি সেরেস্তার আমলা হলপ করে বলবে।

পরের ধনে পোদ্দারি করা হচ্ছে যখন বাংলা ভাষার চিরকেলে বদ অভ্যাস, তখন এ যুগে যে তা অসংখ্য ইংরেজি শব্দ শুধু মুখস্থ নয় উদরস্থও করবে সে তো ধরা কথা। এতে বাংলা তো তার স্বধর্মই পালন করে চলেছে। তবে আমাদের ভাষায় পরকে আপন করার স্বভাবের বিরুদ্ধে আজ কেন আপত্তি উঠেছে? এর একটি কারণ, পূর্বে বাংলা ভাষা বিদেশি শব্দ বেমালুম আত্মসাৎ করেছে; অপর পক্ষে আজ তার এই চুরিবিদ্যেটা এক ক্ষেত্রে সহজেই ধরা পড়ে। সেকালে বাংলা মুসলমানদের কাছ থেকে কর্মের ভাষা নিয়েছিল, পোর্তুগিজ-ফরাসিদের কাছ থেকে নিয়েছিল শুধু জিনিসের নাম, আর আজ আমরা ইংরেজি থেকে ও দুইজাতীয় কথা তো নিচ্ছিই, উপরন্তু তার জ্ঞানের ভাষাও আত্মসাৎ করছি। প্রথম দুইটির ব্যবহার হচ্ছে লৌকিক, আর শেষটির সাহিত্যিক; লৌকিক কথার চুরিকে চুরি

বলে ধরা যায় না, কেননা তার ভিতর অসংখ্য লোকের হাত আছে, ও হচ্ছে সামাজিক আত্মার কাজ, ওর জন্য ব্যক্তিবিশেষকে দায়ী করা চলে না। অপর পক্ষে সাহিত্যিক চৌর্য ব্যক্তিবিশেষের কাজ, অতএব সেটা ধরাও যায়, ও সে কথা-চোরকে শাসন করাও যায়।

কিন্তু একটু ভেবে দেখলেই দেখতে পাবেন যে, উক্ত লৌকিক ও সাহিত্যিক চুরি, উভয় ব্যাপারেরই মূলে আছে একই গরজ।

মুসলমানরা আমাদের দেশে যেসব নতুন কছমের আদালত-কাছারি-আইন-কানুন এনেছে তাদের সঙ্গে তাদের বিদেশি নামও এসেছে। এবং সেই আইন-আদালত যেমন সমাজের উপর চেপে বসেছে, তাদের নামও তেমনি ভাষার ভিতর ঢুকে বসেছে।

ফিরিঙ্গিরা যেসব নতুন জিনিস এ দেশে নিয়ে এসেছে আর আমাদের ঘরে ঘরে যার স্থান হয়েছে, তাদের নামও আমাদের মুখে মুখে চলেছে। তাস হিন্দুরা খেলত না, তারা খেলত পাশা; মুসলমানরাও খেলত না, তারা খেলত হয় সতরঞ্চ নয় গঞ্জিফা। ফিরিঙ্গিরা যখন দেশে তাস আনলে তখন শুধু বিন্তি নয় প্রমরা খেলতেও আমরা শিখলুম, ফলে ফরাসি কথা জুয়ো বাংলা হয়ে গেল, আর সেই সঙ্গে জুয়ো-খেলিয়ে বাঙালিরা ফরাসিতে যাকে বলে জুয়াড়ি তাই হয়ে উঠল।

এ যুগে ইংরেজরা আমাদের অনেক জিনিস দিয়েছে, যা আমাদের ভাষায় স্বনামে ও আমাদের ঘরে স্বরূপে আছে ও থেকেও যাবে। একটা সর্বলোকবিদিত উদাহরণ দেওয়া যাক। বোতল গেলাস বাংলা ভাষা থেকে কখনও বেরিয়ে যাবে না, কেননা ও দুই চিজও বাংলা দেশ থেকে কখন ও বেরিয়ে যাবে না। বাংলা যদি একদম বেসুরা হয়ে যায়, তা হলেও বাঙালিরা ওষুধ খাবে, আর মাথা ঠান্ডা করবার জন্য তেল মাখবে। অতএব আমাদের কাচের পাত্র চাই। তার পর ইংরেজ-প্রবর্তিত নূতন কর্মজীবনও তৎসম অবস্থায় না হোক তদ্ভব অবস্থায় থেকে যাবে। আর সে কারণ বাংলা ভাষায় সে জীবনের বিলেতি নাম সব, তৎসম-রূপে না হোক তদ্‌ভব-রূপে বজায় থাকবে।

এর থেকেই বোঝা যাচ্ছে, ইংরেজি জ্ঞানের ভাষাও কতক পরিমাণে বাংলা ভাষার অন্তরঙ্গ হয়ে থাকবে। ইংরেজি শিক্ষার প্রসাদে অনেক নূতন জ্ঞান, অনেক নূতন ভাব আমাদের মনের ভিতর ঢুকে গিয়েছে, তাই তাদের বিলেতি নামও আমাদের মুখে মুখে চলেছে। যেহেতু দেশের জনগণ ইংরেজি-শিক্ষিত নয়, সে কারণ ওইসব ইংরেজি কথা স্বল্পসংখ্যক লোকের মুখেই শোনা যায়; আর তাদের বিদেশি ধ্বনি আমাদের কানে সহজেই ধরা পড়ে। আর সেই কারণেই বাংলা ভাষা থেকে অনেকে চান 'আইডিয়া'কে গলাধাক্কা দিয়ে বার করে দিতে।

বাঙালির মুখ থেকে বিলেতি কথা কেউ খসাতে পারবেন না, অতএব সে চেষ্টা কেউ করেনও না। আমরা চাই শুধু লিখিত ভাষায় বিদেশি শব্দ বয়কট করতে। কিন্তু আমাদের এই সাতশো বছরের বর্ণসংকর ভাষাকে যদি আবার আর্য করতে হয়, তা হলে ভাষার আর্যসমাজিদের আগে সে ভাষাকে শুদ্ধ করতে হবে, তার পরে তার পইতে দিতে হবে।

এ চেষ্টা বাংলায় ইতিপূর্বে একবার মহাবাক্যাড়ম্বরের সঙ্গে হয়ে গেছে। ফোর্ট উইলিয়মের পণ্ডিত মহাশয়েরা যে গদ্য রচনা করে গিয়েছেন তাতে ফারসি-আরবির স্পর্শমাত্র নেই। তাঁদের ওই তিরস্করণী বুদ্ধির প্রতাপে বাংলা ভাষা থেকে শুধু যে আরবি-ফারসি বেরিয়ে গেল তাই নয়, সঙ্গে সঙ্গে অসংখ্য তদ্ভব কথাও সাহিত্য হতে বহিষ্কৃত হল। কিছুকাল পূর্বে বাংলা সাহিত্যে কারও বিয়ে করবার সাধ্য ছিল না, সকলেই বিবাহ করতে বাধ্য হত। আর বিবাহ করেও কারও নিস্তার ছিল না, কেননা ও সাহিত্যে স্ত্রীকে কেউ ভালোবাসতে পারত না, সকলকে তার সঙ্গে প্রণয় করতে

হত। শুধু অসংখ্য কথা যে বেরিয়ে গেল তাই নয়, ভাষার কলকব্জাও সব বদলে গেল। দ্বারা সহিত কর্তৃক পরন্তু অপিচ যদ্যপিস্যাৎ প্রভৃতির সাহায্য ব্যতীত উক্ত সাধুভাষায় পদ আর বাক্য হতে পারত না। ফলে বাঙালির মুখে যা ছিল active, বাঙালির লেখায় তা passive হয়ে পড়ল। বাংলা ভাষার উপর এই আর্য অত্যাচার বাঙালি যে বেশিদিন সহ্য করতে পারেনি, তার সাক্ষাৎ প্রমাণস্বরূপ ষাট বৎসর আগে বাঙালির ওড়ানো বিদ্রোহের দুটি লাল পতাকা আজও আমাদের সাহিত্যগগনে জ্বলজ্বল করছে। *আলালের ঘরের দুলাল* আর *হুতোম প্যাঁচার নক্শা* যে বাংলা সাহিত্যে যুগান্তর এনেছিল তার সাক্ষী স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্র।

পণ্ডিত মহাশয়েরা যখন বাংলা ভাষার যবন-দোষ ঘোচাতে পারেননি তখন আমরাও তা পারব না, কেননা আমাদের আধুনিক সাহিত্যের সংস্কৃত বেশধারী বহু শব্দকে আঁচড়ালেই তার ভিতর থেকে আহেল বিলেতি ভাব বেরিয়ে পড়ে। 'আইডিয়া' বাদ দিয়ে বাংলা আজ আমরা কেউ লিখতে পারি নে। অতএব আমার নিবেদন এই যে, কোনো নতুন বিদেশি কথাকে বয়কট করা কিংবা পুরানো বিদেশি শব্দকে বাংলা ভাষা থেকে বহিষ্কৃত করবার চেষ্টা করা, শুধু বৃথা সময় নষ্ট করা। আমাদের ভাষায় অনেক নতুন কথা আপনা হতেই ঢুকবে, আর অনেক পুরানো কথা আপনা হতেই বেরিয়ে যাবে, আর তা হবে তাদের জাতিবর্ণনির্বিচারে।

এ পত্রের যবনিকাপতনের পূর্বে আর-একটি কথা বলব। সত্যটা এখন ধরা পড়েছে যে, বাংলা ভাষা বাঙালির ভাষা নয়। বংশে বাঙালি হচ্ছে মঙ্গল-দ্রাবিড়, আর তার ভাষা হচ্ছে সংস্কৃতের প্রপৌত্রী। 'বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায় নবানি গৃহ্নাতি নরোহ'পরাণি' বাংলার আদিম অধিবাসীরা তথা স্বভাষা ত্যাগ করে মাগধী প্রাকৃত গ্রহণ করেছিল। সেই দিন থেকে এ দেশের লোকের মনেরও পুনর্জন্ম হয়েছে, কেননা মন আর ভাষা একই জিনিস। আমরা যদি এখন বিশুদ্ধ বাংলা ভাষায় ফিরে যেতে চাই তা হলে আমাদের ফিরতে হবে আদি-দ্রাবিড় + আদি-মঙ্গল ভাষায়; কিন্তু সে ভাষাও হবে সংকর।

বাঙালি যে দেহে সংকর, মনে সংকর, ভাষায় সংকর— এর জন্য দোষী আমরা নই, কেননা বাঙালি জাতি আমাদের সৃষ্টি করেছে, আমরা বাঙালি জাতিকে সৃষ্টি করিনি।

এই জাতিভেদের দেশে বাস করে শুধু দেহ নয় মনেও ছুতমার্গী হওয়া আমাদের পক্ষে স্বাভাবিক; তবে এই মিশ্রণের জন্য দুঃখ করা বৃথা, কেননা ও পাপ নিজের দেহ-মন থেকে দূর করা আমাদের পক্ষে অসম্ভব। এ অবস্থায়, বাইরের জিনিসকে আত্মসাৎ করা যে প্রাণের লক্ষণ, নব-আয়ুর্বেদের এই মতকে মেনে নিয়ে নিশ্চিন্ত থাকাই ভালো।

উৎস : *প্রবন্ধ সংগ্রহ*। বিশ্বভারতী, ৭ আগস্ট, ১৯৫২।

বাংলা ভাষা : সংকট ও সম্ভাবনা

আবদুল হক চৌধুরী

বাংলাদেশের সংবিধান কার্যকর হল ষোলোই ডিসেম্বরে, বাংলাদেশের ইতিহাসের সবচাইতে বিখ্যাত এবং উজ্জ্বল ওই দিবসে, এই ব্যাপারটি আর-একটি অনন্য ঘটনার উজ্জ্বলতাকে অন্তত আংশিকভাবে ম্লান করে দিল, সেটি হচ্ছে ইতিহাসে এই প্রথম বাংলা ভাষায় একটি রাষ্ট্রের সংবিধান রচনা। যে-কোনো নবজাত রাষ্ট্রের সংবিধান রচনাই একটি খুব বড়ো ঘটনা, কিন্তু বাংলাদেশের সংবিধান রচনার বিশেষ একটা গুরুত্ব এই যে, ইতিহাসে এই প্রথম বাংলা ভাষায় একটি রাষ্ট্রের সংবিধান রচিত হল। রাজনৈতিক সংগ্রাম ছাড়াও এ সংবিধানের অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক ভাষা-আন্দোলনের সঙ্গে। আর এই কারণে শুধু রাজনৈতিক সংগ্রামের নয়, ভাষা-আন্দোলনেরও শ্রেষ্ঠতম বিজয়স্তম্ভ বাংলাদেশের সংবিধান। বিজয় দিবস, সংবিধান দিবস এবং ভাষা-আন্দোলনের একটা বিশেষ পরিণতি লাভ একসঙ্গে মিশে গেল।

বাংলা ভাষার এবং ব্যাপকতম অর্থে বাংলা সাহিত্যের অগ্রগতির দিক দিয়ে দেখতে গেলে এই সংবিধান রচনার একটা তাৎপর্য হচ্ছে এ ভাষার বিশেষ এক মৌলিক গুণগত পরিণতি লাভ, অথবা অন্তত এরূপ পরিণতির কাছাকাছি পৌঁছোনো। সংবিধানের কাজ রাষ্ট্রীয় আদর্শ ও কাঠামোকে ধরে রাখা, এমন ভাষায় যার মধ্যে ভাবাবেগ, অস্পষ্টতা, দ্ব্যর্থতা, বাহুল্য অথবা অন্য কোনোপ্রকার ত্রুটি এবং শৈথিল্যের অবকাশ নেই। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের সংবিধান যৌথ রাষ্ট্রচিন্তাকে রূপ দান করে, যাঁরা সংবিধান রচনায় ব্যাপৃত থাকেন শুধু তাঁদের চিন্তা নয়, সমগ্র জাতির চিন্তাও। সেই সঙ্গে কয়েক শতাব্দীর আন্তর্জাতিক চিন্তা এবং অভিজ্ঞতাও এর উপর ছায়াপাত করে। যাঁরা সংবিধানের প্রকৃত রচয়িতা এবং জনসমাজের রাজনৈতিক প্রতিনিধি তাঁরা বাংলা ভাষাবিদগণেরও সহায়তা নিয়েছেন।

সম্মিলিতভাবে তাঁদের মনে রাখতে হয়েছে আদালতে এবং ময়দানে সম্ভাব্য চ্যালেঞ্জের কথা। প্রতিটি বাক্য এবং শব্দকে সোনার মতো সূক্ষ্মভাবে ওজন ও যাচাই করে দেখতে

হয়েছে, সেই সঙ্গে দেখতে হয়েছে যেন সংবিধানের ভাষা বাংলা হয়, শুদ্ধ বাংলা হয় এবং পাঠযোগ্য বাংলা হয়।

জাতীয় সংসদে, নিশ্চিতভাবে ধরা যায়, এখন থেকে বাংলা ভাষাতেই আইন প্রণীত হবে। প্রধানমন্ত্রী বিচারপতিদের অনুরোধ করেছেন বাংলায় মামলার রায় লিখতে। দু-একটি রাষ্ট্রের সঙ্গে চুক্তি হয়েছে বাংলা ভাষায়। এইসবই বাংলার জন্য নতুন কাজ। একেবারে আনকোরা কাজ বোধ হয় বলা চলে না, তবে এসব ক্ষেত্রে এমন সর্বাত্মক আত্মনিয়োগের দায়িত্ব আর কখনও তার উপর এসে পড়েনি। এসব কাজে আবেগে, বাহুল্যে, শৈথিল্যে, অস্পষ্টতার ভারে তার নুয়ে পড়ার অবকাশ নেই, নিটোলদেহ কর্মীর মতো তাকে ফিটফাট হয়ে উঠতে হবে। কোনোরকম সাহিত্য সৃষ্টি নয়, বাস্তব কর্মনিপুণতাই হবে তার যোগ্যতার মাপকাঠি।

আরও দুটি ক্ষেত্রে বাক্য ও শব্দকে সব সময় ঠিক ওইরকম সোনার মতো ওজন করার দরকার হবে না, তবু অনেক সময় দরকার হবে এবং বাংলা ভাষাকে কর্মনিপুণ হতে হবে। সেই দুটি ক্ষেত্র হচ্ছে প্রশাসন ও উচ্চশিক্ষা। প্রশাসনের ভাষা এবং উচ্চশিক্ষার মাধ্যম, সঠিকভাবে বলতে গেলে প্রধান মাধ্যম হবে বাংলা। সব রকমের জ্ঞান ধরে রাখতে হবে এবং ছাত্রদের কাছে পরিবেশন করতে হবে বাংলা ভাষায়, যেসব দুরূহ বিষয়ে বাংলা ভাষায় কখনও কিছু লেখা হয়নি সেসব বিষয়েও। বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষণীয় কতকগুলো বিষয়ের মাধ্যম হবে বাংলা এবং অন্য কতকগুলো বিষয়ের হবে না, ওসব বিষয় খুব কঠিন এবং বাংলা ভাষায় প্রকাশের উপযোগী পারিভাষিক শব্দ নেই বলে, এটা সম্ভব নয়। শিক্ষণীয় সব বিষয়েরই মাধ্যম হবে বাংলা, যদিও বিশেষজ্ঞ খ্যাতনামা বিদেশি পণ্ডিতদের লেখা বই চিরদিন ইংরেজি ভাষায় পড়তে হবে শিক্ষার এবং জ্ঞানের পূর্ণতার জন্য। শুধু ইংরেজি ভাষায় কেন, সকল উন্নত ভাষায়। দুরূহ বিষয়কে প্রকাশ করার ক্ষমতা বাংলা ভাষায় আছে, এ পরিচয় উনিশ শতক থেকেই কমবেশি পাওয়া যাচ্ছে, এ শতাব্দীতে ক্রমবর্ধমান পরিমাণে। পশ্চিমবঙ্গের এবং বিশেষ করে বাংলাদেশে অধুনালুপ্ত বাংলা উন্নয়ন-বোর্ডের এবং বর্তমান বাংলা একাডেমীর অনেক প্রকাশনায় তার পরিচয় আছে।

সংবিধান, আইন এবং মামলার রায়, প্রশাসনিক চিঠিপত্র এবং বৃহৎ সরকারি আধা-সরকারি সংস্থাসমূহের ব্যবস্থাপনা ও প্রতিবেদন, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষণীয় বিচিত্র প্রকার বিজ্ঞান ও অন্যান্য বিষয় সংক্রান্ত গ্রন্থ, যন্ত্রবিদ্যা এবং অন্যান্য বাস্তব কাজের বিষয় সংক্রান্ত প্রকাশনা নিজেরাই সাহিত্য নয়, কিন্তু এরা সকলে মিলে ভাষায় প্রকাশ ক্ষমতাকে সম্প্রসারিত করে এবং সাহিত্য ও সংস্কৃতির বিস্তৃততর পটভূমি রচনা করে। পশ্চিমবঙ্গ অপেক্ষা বাংলাদেশেই এর সম্ভাবনা অধিকতর প্রশস্ত, কেননা এ দেশে সকল ক্ষেত্রেই বাংলা ভাষা অপ্রতিদ্বন্দ্বী। জ্ঞান ও সংস্কৃতি এবং আন্তর্জাতিক সম্পর্কের জন্য যতখানি ইংরেজির প্রয়োজন তার অতিরিক্ত সবকিছু ধারণ ও প্রকাশের দায়িত্ব নিতে হবে বাংলা ভাষাকে। পক্ষান্তরে পশ্চিমবঙ্গে অনেকগুলি ক্ষেত্র থেকে শুধু সর্বভারতীয় প্রয়োজনে ইংরেজিকে সরানো যাবে না এবং অনেক ক্ষেত্রে একই প্রয়োজনে হিন্দিকে জায়গা দিতে হবে, জ্ঞান ও সংস্কৃতির নিজস্ব প্রয়োজনে নয়। এই কারণে পশ্চিমবঙ্গ

অপেক্ষা বাংলাদেশেই বাংলা ভাষার ভবিষ্যৎ অধিকতর উজ্জ্বল। অধিকন্তু ঔপনিবেশিক শাসন থেকে মুক্তির জন্য সংগ্রাম এবং বিশেষ করে সশস্ত্র সংগ্রামের যে বিপুল অভিজ্ঞতা বাঙালির হয়েছে তাও একটা মহৎ সাহিত্যের রূপ পাওয়ার জন্য প্রতীক্ষা করছে। অপ্রতিরোধ্য প্রয়োজনের চাপেই বাংলা ভাষা ও সাহিত্যকে বাংলাদেশে সমৃদ্ধ হতে হবে, হওয়ার সম্ভাবনা অপরিসীম।

কিন্তু সম্ভাবনা এক কথা, এবং প্রকৃত সমৃদ্ধ হওয়া অন্য কথা। ভাষা ও সাহিত্যের সমৃদ্ধি নির্ভর করে একদিকে সংশ্লিষ্ট সমাজের সামগ্রিক পরিস্থিতির উপর— ব্যাপক অর্থে সাংস্কৃতিক পরিবেশও তার অন্তর্গত— এবং অন্য দিকে উৎসর্গিতপ্রাণ ব্যক্তিদের উপর। এঁদের মধ্যে আছেন লেখক, পণ্ডিত ব্যক্তি এবং শিক্ষক : এঁরা অধিকাংশ ক্ষেত্রে স্বতন্ত্র ব্যক্তি, তবে অনেক সময়েই এঁদের দু-জন এমনকি তিন জনই একই ব্যক্তির মধ্যে সংমিশ্রিত। শিক্ষার্থী শুদ্ধ বাংলার এবং জ্ঞানের প্রথম পাঠ পেয়ে থাকেন শিক্ষকের কাছ থেকে, সাহিত্যের প্রথম স্বাদ ও বিচিত্র রূপলীলার মোহনস্পর্শ সাহিত্যের কাছে। শিক্ষক অর্থে প্রধানত শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক, তবে শিক্ষার্থী এমন ব্যক্তির কাছে এই পাঠ নিতে পারেন— এবং বস্তুত সব সৎ-পাঠককেই আজীবন নিতে হয়— যাঁকে তাঁরা কখনও দেখেননি এবং যাঁর রচনাবলি পাঠের সুযোগ পান মাত্র। পণ্ডিত ব্যক্তি ভাষার বিশুদ্ধতার উপর নজর রাখেন। প্রতিভাবান সাহিত্যিক নূতন শব্দ উদ্ভাবন করেন এবং পুরাতন শব্দকে নূতন ব্যঞ্জনা দেন, কিন্তু জ্ঞান ও ব্যাবহারিক বিষয় সংক্রান্ত নূতন শব্দ সৃষ্টি এবং বিদেশি পরিভাষার স্থলে বাংলা প্রতিশব্দ উদ্ভাবন সাধারণত পণ্ডিত ব্যক্তির পক্ষেই সম্ভব।

বাংলাদেশে ভাষা ও সাহিত্যের সমৃদ্ধির এইসব শর্ত বর্তমান, এমন কথা বলা কঠিন। শিক্ষার মানের সঙ্গে ভাষা সাহিত্য ও সংস্কৃতির মানের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক, কিন্তু এ দেশে শিক্ষার মান ছিল সব সময়েই নীচু এবং এখন ইতিহাসের সর্বনিম্ন পর্যায়ে। শিক্ষক তাঁর দায়িত্ব পালন করছেন না অথবা অবস্থাবিপাকে করতে পারছেন না; অধিকাংশ ছাত্র পাস করতে এবং ডিভিশন অথবা ক্লাস পেতে চায় কিন্তু পড়তে চায় না। বহু ছাত্র পরীক্ষা দিতে চায় না, দিলেও অসদুপায় অবলম্বন করে। অনেকরকম ক্ষেত্রেই এর ফলাফল দেখা যাচ্ছে। একুশে ফেব্রুয়ারি উপলক্ষে অসংখ্য সংকলন প্রকাশনা উৎসাহজনক উদ্যম, কেননা এই উপলক্ষে তরুণ-সমাজ ব্যাপকভাবে ভাষা ও সাহিত্যের এবং সেই সঙ্গে তাদের প্রকাশ-ক্ষমতার চর্চা করে থাকে। কিন্তু যেহেতু শিক্ষার মান উঁচু নয় এই কারণে বহু ক্ষেত্রেই তাদের লেখার মান এবং সম্পাদনার মান উঁচু হতে পারছে না, সংকলনগুলিতে অনেক দুঃখজনক স্খলন এবং ভুলভ্রান্তি নজরে পড়ে। বহু সরকারি আধা-সরকারি অফিস ও ব্যাবসা-প্রতিষ্ঠানের সাইনবোর্ডে ও নামফলকে এবং এমনকি সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগে প্রকাশিত পাঠ্যপুস্তকেও অগুণতি বানান ভুল এবং অনেকরকম বিচ্যুতি। এসবের বাইরেও পুস্তকপুস্তিকায় এবং পত্রপত্রিকায় অর্থাৎ ব্যাপক অর্থে সমগ্র সাহিত্যকর্মে, সম্মানজনক ব্যতিক্রম বাদে, বাংলা ভাষার মান বেশ খানিকটা নীচে নেমে গেছে, সাতচল্লিশের পর থেকেই। এইসব প্রকাশনার মারফত ভাষাগত নানারূপ ভ্রান্তি এবং স্খলন তরুণ-মানসে মুদ্রিত হয়ে যাচ্ছে।

শিক্ষা, সংস্কৃতি, জ্ঞানচর্চা এবং জীবনের আরও অনেক মূল্যবান বিষয়কে হালকাভাবে গ্রহণ করার প্রবণতা আমাদের সমাজে বরাবরই ছিল, সম্প্রতি আরও বৃদ্ধি পেয়েছে, অন্তত আজকের তরুণ-সমাজের দিকে তাকিয়ে তাই মনে হয়। এই কারণে বস্তুগত বিবেচনায় বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের সম্ভাবনা বাংলাদেশে ততটা উজ্জ্বল বলা কঠিন যতটা সম্ভাবনা ও সুযোগ ইতিহাসে এদেশের সামনে নিক্ষেপ করেছে। অবশ্যই এসব ব্যাপারে চূড়ান্ত কথা বলা সাধারণত সম্ভব নয়। তথাপি ইতিহাসের স্তূপীকৃত উদাহরণ থেকে এই কথাই বলা যায় যে, শিক্ষা ও সংস্কৃতির বর্তমান পরিস্থিতির এবং সমাজের বর্তমান মানসিকতার পরিবর্তন না ঘটলে ওইসব সম্ভাবনা সম্ভাবনাই থেকে যাবে।

উৎস : *'সাহিত্য ও স্বাধীনতা'*।

বাংলা গদ্যরীতি

মুনীর চৌধুরী

১.১ বাংলা গদ্যের জন্ম উনবিংশ শতাব্দীতে। এই সময়ের পূর্বেকার দলিল দস্তাবেজ ও চিঠিপত্রে ব্যবহৃত যে গদ্যের নমুনা আমাদের হস্তগত হয়েছে তার রূপ ও প্রকৃতি অনির্দিষ্ট এবং অপরিস্ফুট, বিচ্ছিন্ন এবং খণ্ডিত। কোনো গদ্যনিবন্ধ বা গ্রন্থের পরিপূর্ণ আকারে তা রূপায়িত বা প্রচারিত হয়নি। তার সাহিত্যিক মূল্য অকিঞ্চিৎকর এবং পরবর্তীকালের বাংলা ভাষার ক্রমবিকাশের ধারার সঙ্গে এর যোগসূত্র সুরক্ষিত নয়।

১.২ উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দুই দশকেও বাংলা গদ্য শব্দ চয়নে, পদ গঠনে বা বাক্য সংগঠনে কোনো স্থির সুনির্দিষ্ট আদর্শের অনুসারী ছিল না। সবই ছিল পরীক্ষানিরীক্ষা-মূলক। লেখকগণ সচেতনভাবে চেষ্টা করেছেন বাংলা ভাষার আন্তর-প্রকৃতিকে আবিষ্কার করতে। তৃতীয়-চতুর্থ দশকে বাংলা গদ্য বহুল পরিমাণে স্বাভাবিকতা ও প্রাঞ্জলতা অর্জন করেছিল সত্য কিন্তু এ গদ্যও কোনো বিশিষ্ট শিল্পগুণসম্পন্ন ছিল না। যে প্রতিভা বাংলা গদ্যকে প্রথম এই ঐশ্বর্যে পরিমণ্ডিত করেন তাঁর নাম ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, যে গ্রন্থ দ্বারা এই কীর্তি সম্পাদিত হয় তার নাম *বেতালপঞ্চবিংশতি*, রচনাকাল ১৮৪৭। বিদ্যাসাগর প্রবর্তিত গদ্যই পরবর্তীকালের বাংলা ভাষার বহুমুখী বিকাশের রীতিগত ভিত্তিভূমি।

১.৩. পৃথিবীর অন্যান্য ভাষার মতো বাংলা ভাষার ক্রমবিকাশ পরীক্ষা করলেও যে সত্যটি উপলব্ধি করা যায় তা হল এই যে, ভাষা পরিবর্তনশীল এবং বৈচিত্র্যের অনুসন্ধানী। সমাজ-সংগঠনের রূপান্তর, চিন্তার বিবর্তন, রসপিপাসার নব নব রূপায়ণ যুগে যুগে নতুন প্রতিভার আবির্ভাবের উপযোগী পরিবেশ রচনা করে। কালক্রমে শিল্পীর প্রতিভা ভাষায় নতুন সুর ও শক্তি সংযোজিত করে, নতুন আঙ্গিক ও রসের জন্ম দেয়।

১.৪. বাংলা গদ্যের উন্মেষ-পর্বেও রীতি-বৈচিত্র্যের আভাস লক্ষণীয়। কেরির *কথোপকথন*-এ ইতরজনের মৌখিক বুলির অসংস্কৃত প্রয়োগ, রামরাম বসুর *প্রতাপাদিত্য চরিত্র*-তে আরবি-ফারসি শব্দের বিষয়োপযোগী ব্যবহার, মৃত্যুঞ্জয়ের *বত্রিশ সিংহাসন*-এ সংস্কৃত পদগঠন

ও বাক্যগঠন-রীতির অত্যধিক অনুসরণ পরবর্তীকালের বাংলা গদ্যরীতির তিনটি স্বতন্ত্র বিকাশ-ধারার সংকেত বহন করে। সমকালীন জীবনের আলেখ্য রচনায় কথ্যবুলির কৌশলময় ব্যবহার টেকচাঁদের *আলালের ঘরের দুলাল*-কে স্মরণীয় সরসতা ও প্রাণবন্ততা দান করেছে। দীনবন্ধুর প্রহসনে এই ভাষাতেই চূড়ান্ত নাটকীয় উৎকর্ষ লাভ করেছে। রামরাম বসুর আরবি-ফারসি শব্দসম্ভারের প্রতি পক্ষপাতিত্ব বিংশ শতাব্দীর একাধিক মুসলমান লেখকের রচনায় বিস্তৃততর অভিব্যক্তি লাভ করেছে। মৃত্যুঞ্জয়ের অতিপণ্ডিতি-রীতির শিল্পগুণমণ্ডিত সার্থক রূপায়ণ আছে বিদ্যাসাগরের কোনো কোনো রচনায়। বঙ্কিম, টেকচাঁদ ও বিদ্যাসাগর উভয়ের রচনার দুই বিশিষ্ট প্রকৃতির শক্তির সমন্বয় সাধন করে প্রতিষ্ঠিত করেন তাঁর নিজস্ব গদ্যের এক হৃদয়গ্রাহী আদর্শ রূপকে। এই ভাষাতেই নিজের অনন্যসাধারণ ভাবকল্পনার উপযোগী বাহনরূপে পুনর্গঠিত করেন রবীন্দ্রনাথ; ভাষাকে করে তোলেন সূক্ষ্ম ও প্রগাঢ়, সংকেতময় এবং সংগীতময়, বহু বর্ণশোভিত ও কারুকার্যমণ্ডিত। কিন্তু রাবীন্দ্রিক গদ্যরীতিও প্রমথ চৌধুরীর পুরোপুরি মনঃপূত হয়নি। বিদগ্ধজনের কথ্য বুলির আদলে তিনি সৃষ্টি করলেন নতুন এক প্রখর ও শানিত গদ্যের ধারা। পরিবর্তনের জোয়ার যে এখানে এসেই থেমে গেছে তা নয়। শরৎচন্দ্র কী সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, মুজতবা আলী কী অন্নদাশংকর রায় প্রত্যেকেই নিজ নিজ ব্যক্তিমানসের বিশিষ্ট প্রতিভা, প্রয়োজন ও প্রবণতা অনুযায়ী বাংলা গদ্যরীতিকে যথার্থ বহুমাত্রিকতা দান করেছেন। দেড়শত বৎসরের বাংলা গদ্যের বিচিত্র ঐশ্বর্যে এই ঐতিহ্যকে সম্পূর্ণরূপে শোষণ করে নিয়েই প্রতিভাবান পূর্ব-পাকিস্তানি সাহিত্যকর্মী আজ বাংলা ভাষার প্রকাশক্ষমতার নব নব দিগন্ত উন্মোচনে ব্যাপৃত।

১.৫. বলা বাহুল্য, বাংলা গদ্যের ক্রমবিকাশের উপরোক্ত বর্ণনা নিতান্তই সংক্ষিপ্ত এবং সামান্য। বিদ্যাসাগরি গদ্য, আলালি গদ্য, বঙ্কিমি গদ্য প্রভৃতি নামাঙ্কন মোটামুটিভাবে কয়েকটি স্বতন্ত্র গদ্যরীতির সাধারণ বৈশিষ্ট্যবোধক হলেও প্রকৃতপক্ষে এঁরা কেউ কোনো একক প্রণালীর গদ্য রচনা করেই ক্ষান্ত হননি। প্রত্যেকেই তাঁদের সাহিত্য-জীবনের বিভিন্ন পর্বে বিভিন্ন ধরনের গদ্যরীতির উদ্ভাবন ও অনুশীলন করেছেন। বিদ্যাসাগরের সর্বশেষ রচনাসমূহের ভাষা মৌখিক বুলির মতোই সরল ও অনর্গল এবং তাতে আরবি-ফারসি শব্দের প্রয়োগও প্রচুর। অপরপক্ষে টেকচাঁদের অনেক রচনারই বিষয়বস্তু আধ্যাত্মিক। ভাষা সাধু এবং সংস্কৃতানুসারী। বঙ্কিমের *দুর্গেশনন্দিনী* (১৮৬৫)-র ভাষা ঝংকারময় এবং পাণ্ডিত্যপূর্ণ, *বিষবৃক্ষ* (১৮৭৩)-এর ভাষা বলিষ্ঠ হয়েও নমনীয়, আড়ম্বরহীন হয়েও ক্রীড়াশীল। এসব কথা যদিও পুরাতন এবং বিদিত তবু যাঁরা জবরদস্তি ইতিহাস উপেক্ষা করে অগ্রসর হতে উদ্যোগী তাঁদের কথা স্মরণ করে পুনরুক্তি আবশ্যক বিবেচনা করেছি।

২.০. পূর্ব-পাকিস্তানে বাংলা গদ্যের রূপায়ণ ও অনুশীলনের বর্ণনাকে দুই ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। একদিকে রয়েছে পূর্ব-পাকিস্তানি গদ্যের আদর্শ স্বরূপ সম্পর্কে নানাবিধ সোপারেশ, ভবিষ্যদ্বাণী ও তত্ত্বালোচনা; অন্যদিকে হল সৃষ্টির ক্ষেত্রে সাহিত্যিকদের বিভিন্নমুখী প্রয়াসের প্রত্যক্ষ ফসল। আমরা প্রথমে পণ্ডিত সংস্কারক-গবেষকদের চিন্তা ও বাসনার শ্রেণি প্রকৃতি বিশ্লেষণ করতে চেষ্টা করব, পরে প্রকৃত সাহিত্যকর্মে যে ভাবাদর্শের প্রতিফলন ঘটেছে তার বৈশিষ্ট্য নির্দেশে উদ্যোগী হব।

২.১. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের ভূতপূর্ব অধ্যাপক এবং আমার শিক্ষক পরলোকগত মোহিতলাল মজুমদার তৎকালীন বাংলা ভাষার গতি পরিবর্তনের চিহ্নসমূহ লক্ষ করে একটি সরস মন্তব্য প্রকাশ করেন :

> ভাষার আদর্শ ক্ষুণ্ণ করার প্রয়োজন দুই কারণে হইতে পারে— প্রথম, ভাষার আদর্শ সম্বন্ধে অজ্ঞতা, বিশুদ্ধ বাক্যরচনার অক্ষমতা; দ্বিতীয়, ভাষাকে সম্পূর্ণ আয়ত্ত করিয়াও লেখকের নিজের খেয়াল-খুশি চরিতার্থ করিবার আগ্রহ...কিন্তু অজ্ঞতা ও অক্ষমতার প্রমাণ এতই স্পষ্ট যে, দ্বিতীয় কারণটির উল্লেখ বা আলোচনা অনাবশ্যক মনে হইতে পারে।

দুঃখজনক হলেও স্বীকার না করে উপায় নেই যে পূর্ব-পাকিস্তানি গদ্যের উৎসাহী সংস্কারকদের অনেকেই প্রথমোক্ত দলের। দীর্ঘকাল ধরে ব্যবহারের ফলে বাংলা গদ্যরীতির যেসকল আদর্শ সাহিত্যিক মর্যাদায় ভূষিত, বানান ও উচ্চারণের যেসকল নিয়ম শিষ্ট ও শুদ্ধ বলে সম্মানিত, এঁরা অনেকেই সেগুলো শ্রম ও সাধনার দ্বারা আয়ত্ত করার সুযোগ-সুবিধা বা উৎসাহ-অনুপ্রেরণা লাভ করেননি। ফলে এই শ্রেণির ভাষা-বিপ্লবীগণ যে পর্যায়ের সংস্কারের ফরমান জারি করেন তা বাংলা ভাষার মূলগত বুনিয়াদের সচেতনতা থেকে উদ্ভূত নয়। নিজেদের ব্যক্তিগত অনভ্যাস বা অপারগতাকে মাত্রাতিরিক্ত রকম আদর্শায়িত করে স্বকপোলকল্পিত তামদ্দুনিক স্বাধিকার প্রতিষ্ঠা বা জনকল্যাণ সাধনের মহৎ অভিপ্রায় ব্যক্ত করেন। প্রচলিত বর্ণমালা এঁদের চক্ষুশূল; এরাই বানানে ণত্বষত্ব-বিধি নস্যাৎ করতে চান এবং পদগঠনে অভিনব নিয়ম প্রবর্তনে উদ্যোগী হন। বাংলা গ্রন্থ বিক্রয়ের বাজার যত সম্প্রসারিত হচ্ছে এঁদের তৎপরতাও সেই পরিমাণে বৃদ্ধি পাচ্ছে। ভাষাবিজ্ঞানী ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌র কোনো কোনো মত আপাতদৃষ্টিতে উপরোক্ত মন্ত্রণার পরিপোষকতা করে বলে মনে হলেও প্রকৃতপক্ষে তাঁর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির। ভাষার চূড়ান্ত সরলীকরণের ফলে গণশিক্ষা ত্বরান্বিত হবে এই প্রত্যাশাই তাঁর সংস্কারমূলক প্রয়াসের অনুপ্রেরণা স্বরূপ। তাঁর প্রস্তাবিত সরলায়িত বুনিয়াদি বাংলা প্রাপ্তবয়স্কদের প্রাথমিক শিক্ষাদানের সীমায়িত এলাকায় বিচক্ষণতার সঙ্গে ব্যবহৃত হলে সুফল লাভের সম্ভাবনা আছে বলে আমরাও স্বীকার করি।

২.২. দ্বিতীয় এক পক্ষ আছেন যাঁদের উপাস্য আদর্শ পূর্ববঙ্গীয় আঞ্চলিক বুলি। চলিত বাংলার শিষ্ট রূপকে তাঁরা পশ্চিমবঙ্গীয় অর্থাৎ বিজাতীয় বলে মনে করেন। শব্দচয়নে, ক্রিয়াপদের রূপায়ণে, বাক্যাংশের নির্মাণে তাঁরা পূর্ব-পাকিস্তানের আঞ্চলিক উপভাষার একচ্ছত্র আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করতে চান। এই তত্ত্বের প্রধান প্রচারকগণের অধিকাংশই পূর্ব-পাকিস্তানের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলের প্রতিপত্তিশালী নাগরিক। যশোর-খুলনা-কুষ্টিয়া-পাবনা-রাজশাহি-বগুড়ার উত্তর-দেশীয় আঞ্চলিক বুলি যে চলিত বাংলার শিষ্ট রূপের নিকট-আত্মীয় এ সত্যকে তাঁরা অগ্রাহ্য করতে বদ্ধপরিকর। তাঁরা এ কথাও অস্বীকার করতে চান যে সমার্থক শব্দ মাত্রেই সম-ভাবনার অনুষঙ্গী নয়। প্রতি শব্দের স্বতন্ত্র অর্থ আছে, সেই অর্থের স্বতন্ত্র ভাবানুষঙ্গও তার অন্তরে নিহিত থাকে। সাহিত্যে তার দীর্ঘকালীন পৌনঃপুনিক প্রয়োগই সেই অনুষঙ্গের পরিমণ্ডল গড়ে তোলে। খেয়াল-খুশিমতো তার আবেদনের ভোল পালটানো যায় না। 'ডর সান্ধাইয়াছে' এই বাক্যাংশ কোনোক্রমেই 'আতঙ্ক সঞ্চারের' সমভাবনাত্মক বলে বিবেচিত হতে পারে না। নিরক্ষর কৃষকের শ্রমের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়ার অর্থ এই নয় যে তাঁর মুখের বুলিকেও মার্জিত ও সাহিত্যিক

গুণসম্পন্ন বলে সর্বত্র গ্রহণ করব। গণ-সাহিত্য সৃষ্টির অর্থ জনগণের জীবন-সমস্যাকে সাহিত্যিক রূপ দান করা, তার জীবনসংগ্রামকে জয়যুক্ত করার পথনির্দেশ দান করা, তার চিৎপ্রকর্ষের সুপ্ত আকাঙ্ক্ষাকে জাগরিত করে তোলা। আঞ্চলিক বুলির মহিমা কীর্তনের সঙ্গে এই শিল্পগত মহৎ প্রয়াসের কোনো আত্যন্তিক যোগাযোগ নেই। যাঁরা আঞ্চলিক উপভাষাকেই প্রকৃত মাতৃভাষা বলে অভিহিত করতে চান তাঁদের মাতৃভক্তি যথার্থ স্থলে নিবেদিত হয় না। কারণ মাতৃভূমির প্রকৃত অর্থ যেমন মামার বাড়ি নয় তেমনই মাতৃভাষা বলতেও আক্ষরিক অর্থে মায়ের বুলি বা গাঁয়ের বুলিকে বোঝায় না। মাতৃভূমি স্বদেশের প্রতিশব্দ, মাতৃভাষার অর্থ স্বদেশের ভাষা।

২.৩. তৃতীয় এক পক্ষ রয়েছেন যাঁরা ভাষার ধর্মীয় প্রকৃতিতে আস্থাবান। তাঁদের মতে বাংলা ভাষার মূলগত প্রকাশরীতি বহুলাংশে হিন্দু-চিন্তাধারার বাহক ও ধারক। সংস্কৃতের সঙ্গে বাংলা ভাষার দীর্ঘকালীন ঘনিষ্ঠতা তাঁদের নিকট পরম অনুশোচনার বিষয়। তাঁদের বিবেচনায় বাংলা ভাষার সঙ্গে আরবি-ফারসির সংযোগই একমাত্র সত্য, বাদবাকি সবই কৃত্রিম উপায়ে আরোপিত, মিথ্যা এবং পরিত্যাজ্য। তাঁরা আশঙ্কা করেন যে বাংলা ভাষার কাঠামো থেকে সংস্কৃতের যাবতীয় প্রভাব চিরতরে নিশ্চিহ্ন করে ফেলতে না পারলে এই ভাষা আমাদের তামদ্দুনিক বৈশিষ্ট্যের বাহনে পরিণত হতে পারবে না। অনেক সময় মনে হয় যেন, বাংলা কেন ষোলো আনা আরবি, ফারসি বা উর্দু হয়ে উঠল না, বাংলাই রয়ে গেল, আক্ষেপটা সেইজন্যই।

২.৪. আমার বর্তমান প্রয়োজন ও ইচ্ছানুযায়ী অতীতের ঐতিহাসিক ঘটনাক্রম, সংস্কৃতির সংমিশ্রণ ও ভাষার বিবর্তন সংগঠিত হয়নি কেন সেজন্য উত্তেজনা প্রকাশ করা নিরর্থক। বাংলা ভাষাকে যে রূপে লাভ করেছি সেটাই বাংলা ভাষা। তার গঠনপ্রকৃতির মজ্জাগত বৈশিষ্ট্যসমূহ সম্পর্কে নীতিমূলক বিচারে প্রবৃত্ত হওয়া আমাদের দায়িত্ব-বহির্ভূত। আমাদের মতে, পূর্ব-পাকিস্তানি বাংলা ভাষায় হিন্দু-মুসলমান দৈনন্দিন জীবনে যেসকল আরবি-ফারসি শব্দ ব্যবহার করে অভ্যস্ত, বাংলা ভাষা থেকে সেগুলো নির্বিচারে পরিহার করবার জন্য যিনি পরামর্শ দেন তিনি হয় অজ্ঞানী নয় বিকারগ্রস্ত। তৎসম ও তদ্ভব শব্দই যে বাংলা শব্দভাণ্ডারের বৃহত্তম অংশ, বহুস্থলে সংস্কৃত থেকে ঋণ গ্রহণ করা যে বাংলা ভাষার পদগঠন রীতি অনুযায়ী অধিক সংগত ও স্বাভাবিক—এসকল কথা যিনি অস্বীকার করেন তিনিও তাই।

৩.০. আমাদের সৌভাগ্যবশত পূর্ব-পাকিস্তানি প্রবন্ধকার, নাট্যকার ও কথাসাহিত্যিকদের মধ্যে যাঁরা আধুনিক চিন্তাধারার শিল্পকলার অনুশীলনকারী, সমকালীন পূর্ব-পাকিস্তানি জীবনের যথার্থ রূপকার, বিদগ্ধ এবং মননশীল তাঁরা কেউ পূর্ব-বর্ণিত অর্থে ভাষা-সংস্কারক নন। তাঁরা শিল্পী। অদ্যাবধি বাংলা ভাষায় রূপ ও রসে মূল্যবান যা-কিছু সৃষ্টি হয়েছে সবই তাঁদের শিল্পচেতনার অবিচ্ছেদ্য অংশ, তাদের সাহিত্যিক ঐতিহ্যবোধের বুনিয়াদ। সেই সঙ্গে যুক্ত হয়েছে তাঁদের বিশিষ্ট পূর্বপাকিস্তানি জীবনোৎকণ্ঠা, যুক্ত হয়েছে পাশ্চাত্য সাহিত্যরসের আস্বাদন শক্তি। উপভাষিক শব্দ, আরবি-ফারসি শব্দ, তৎসম শব্দ, সমাসবদ্ধ পদ, জটিল বাক্য — কোনোকিছুই তাঁদের কাছে আত্যন্তিকভাবে ঘৃণ্য বা পূজ্য নয়। নির্বাচিত জীবনাংশের মর্মবাণী উন্মোচনের জন্য, স্বকীয় জীবনোপলব্ধির স্বাতন্ত্র্য সংরক্ষণের জন্য প্রত্যেক কথাশিল্পীই

ভাষায় নানারকম কারিগরি প্রদর্শন করেন। এক অর্থে, সরল ও সাধু ব্যক্তিগণ যে ভাষা প্রত্যহ ব্যবহার করে সন্তুষ্ট শিল্পীর প্রাথমিক দায়িত্ব হল সেই অভ্যাসের দাসত্ব থেকে নিজেকে মুক্ত করা। এই প্রয়োজনে কেউ আঞ্চলিক বুলি সেঁচে, কেউ অভিধান ঘেঁটে, কেউ আরবি-ফারসি ঢুঁড়ে সেই শব্দটি বার করেন যা অমোঘরূপে বর্ণনীয় বিষয়ের বৈশিষ্ট্যজ্ঞাপক, বাক্যগঠনে এমন স্বকীয় ভঙ্গি আরোপ করেন যার নতুনত্ব অমনোযোগী পাঠককেও সচকিত করে তোলে।

৩.১. আমাদের আধুনিক লেখকগণ গ্রামজীবনের কাহিনিতে অনেক গ্রামের কথা ব্যবহার করেন। সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ নোয়াখালির, শামসুদ্দীন আবুল কালাম বরিশালের, শাহেদ আলী সিলেটের, আবু ইসহাক বিক্রমপুরের, আলাউদ্দিন আল আজাদ চট্টগ্রামের এবং হাসান আজিজুল হক কুষ্টিয়ার আঞ্চলিক ভাষা বা ডায়ালেক্ট প্রচুর পরিমাণে তাঁদের রচনায় গ্রহণ করেছেন। তবে অধিকাংশ স্থলেই পূর্ববঙ্গীয় উপভাষা কেবল সংলাপে বাস্তবতা সম্পাদনের জন্য গৃহীত হয়। এই রীতি বাংলা ভাষায় শতবর্ষ পুরাতন। তবে এর মধ্যে যা নতুন তা হল এই যে কেউ কেউ, অজ্ঞতা বা স্বভাববশত নয়, স্বেচ্ছায় ও সচেতনভাবে, কেবল সংলাপে নয় কাহিনি বর্ণনার কালেও স্থলবিশেষে পূর্বাঞ্চলিক শব্দ বা শব্দসমষ্টি বা বাক্‌ভঙ্গি চমৎকার বিশিষ্টার্থে প্রয়োগ করেছেন। সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র *চাঁদের অমাবস্যা* (১৯৬৪) *দুই তীর* (১৯৬৫), আলাউদ্দিন আল-আজাদের *কর্ণফুলী* (১৯৬০) ও *ক্ষুধা ও আশা* (১৯৬৪), শাহেদ আলীর *একই সমতলে* (১৯৬৩) এবং শহীদুল্লা কায়সারের *সারেং বৌ* (১৯৬৩) গ্রন্থাদিতে আমাদের গদ্যরীতির এই প্রবণতার উৎকৃষ্ট পরিচয় পাওয়া যাবে। তবে আঞ্চলিকতা এঁদের রচনার মুখ্য আকর্ষণ নয়, গ্রাম্যতাও এঁদের স্বভাবের মুখ্য বৈশিষ্ট্য নয়। সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র পত্নী ফরাসি দেশীয়, তিনি নিজেও দীর্ঘকাল যাবৎ ইউরোপে বসবাস করেছেন। শামসুদ্দীন আবুল কালাম বর্তমানে সম্ভবত ইতালির নাগরিক। শওকত ওসমান ও আলাউদ্দিন আল আজাদ উভয়ের পেশাই অধ্যাপনা এবং উভয়ের চিন্তাধারাই আধুনিক বিশ্বভাবনার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। শাহেদ আলীও বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতম ডিগ্রির অধিকারী, অধ্যাপনাও করেছেন, সম্পাদক ও গবেষকও বটে। সাংবাদিক শহীদুল্লা বস্তুবাদী সমাজতান্ত্রিক চিন্তাধারার অনুশীলন করেছেন এবং সাংবাদিক হিসাবে বহু দেশ পর্যটন করেছেন। এইসব আধুনিক শিল্পীদের মানবপ্রকৃতি সৃষ্টিধর্মী প্রতিভার সঙ্গে মননশীল নাগরিকতার সমন্বয়ে গঠিত। এ-কথা না বুঝলে এঁদের রচনারীতির মূলসূত্রসমূহ শনাক্ত করা সম্ভব হবে না।

৩.২. পূর্ব-পাকিস্তানি বাংলা গদ্যে বহুল পরিমাণে আরবি-ফারসি শব্দ ব্যবহৃত হয়। এই রীতিও নবোদ্ভাবিত নয়। রামরাম বসু এর প্রবর্তক, আর এর সরসতার দিকটি উন্মোচিত করেন টেকচাঁদ ঠাকুর। কিন্তু বাংলা গদ্যে আরবি-ফারসি শব্দের কৌশলময় প্রয়োগ ব্যঙ্গবিদ্রূপাত্মক রচনাকে কত প্রাণবন্ত ও মর্মভেদী করে তুলতে পারে তার পথ প্রদর্শন করেন পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। বিদ্যাসাগর প্রবর্তিত এই রীতিই বাংলায় আরবি-ফারসিজাত শব্দ ব্যবহারের সর্বজনঅনুসৃত রেওয়াজে পরিণত হয়। আবুল মনসুর আহমদের *আয়না* ও মরহুম হাবীবুল্লাহ বাহারের *হিং ও হালিম* শীর্ষক রচনাদি এই গদ্যরীতিরই চূড়ান্ত প্রকাশ। আধুনিক পূর্ব-পাকিস্তানি গদ্যে আরবি-ফারসি শব্দ প্রয়োগের

এক রূপদক্ষ কারিগর হলেন কথাসাহিত্যিক শওকত ওসমান। কেবল ঠাট্টা-মশকরার জন্য নয়, প্রণয়লীলা, কাব্যসাধনা, রাজকার্য পরিচালনা ইত্যাকার বিচিত্র বিষয়ের উপযোগী লঘু-গুরু ঘটনাবহ সৃষ্টির জন্যও তিনি অনর্গল আরবি-ফারসি থেকে ঋণ গ্রহণ করতে সিদ্ধহস্ত। *ক্রীতদাসের হাসি* (১৯৬২)-ই তাঁর এই শ্রেণির গদ্যরীতির শ্রেষ্ঠ নিদর্শন।

৩.৩. অত্যাধুনিক পূর্ব-পাকিস্তানি গদ্যলেখকগণ পূর্ববর্তী লেখকগণের চেয়ে অনেক বেশি বিশ্বনাগরিকতাপ্রাপ্ত এবং স্বাতন্ত্র্যাভিলাষী। এঁরা বয়সে তরুণ এবং স্বভাবে অনাস্থাবাদী। চতুষ্পার্শে দেশভক্তির নামে গ্রাম্যতা, ধার্মিকতার নামে কূপমণ্ডূকতা এবং নীতিপরায়ণতার নামে অমানবিকতার প্রতাপ প্রত্যক্ষ করে এঁরা কুপিত। এঁরা সাহিত্যে সর্বপ্রকার মধ্যযুগীয়তার বিরোধী, লোকসংস্কৃতির স্থূল সরলতার পরিপন্থী। গল্পে-প্রবন্ধে এঁরা যে ভাষা ব্যবহার করেন তা অনভ্যস্ত ও অনাধুনিক পাঠকের কাছে সম্পূর্ণরূপে অবোধ্য। তরুণতম লেখকগোষ্ঠীর সাধনাই এই গদ্যকে আয়ত্ত করা, যার শব্দ অভিধান মন্থন করে আহৃত, পদ ব্যাকরণের কঠিন নিয়মে গঠিত, বাক্য জটিল দীর্ঘসূত্রতায় আবদ্ধ। যাঁদের সঙ্গে এঁদের আত্মার আত্মীয়তা আছে তাঁরা এই গদ্যের মর্ম অনায়াসে গ্রহণ করেন, যাঁরা অনাত্মীয় তাঁদের সংসর্গ এঁরা কামনা করেন না। শওকত ওসমানের সাহিত্যতত্ত্ব-বিষয়ক প্রবন্ধের ভাষায় পূর্ব-পাকিস্তানি গদ্যের এই প্রখর আত্মস্বাতন্ত্র্যমণ্ডিত দুরূহ কলারীতির সূত্রপাত, 'কণ্ঠস্বর' গোষ্ঠীর নবীনদের রচনায় এর ব্যাপকতম পরিণতি।

উৎস : *বাংলা গদ্যরীতি।*

আধুনিক বাংলা ছন্দ

প্রবোধচন্দ্র সেন

আধুনিক বাংলা ছন্দ সম্বন্ধে কিছু লিখতে অনুরুদ্ধ হয়েছি। কাজটা প্রথমে যতটা সহজসাধ্য মনে হয়েছিল এখন কার্যত দেখছি মোটেই তা নয়। আধুনিক বাংলা ছন্দ বলতে কী বোঝায় প্রথমেই তা নির্ণয় করা প্রয়োজন। 'আধুনিক বাংলা কবিতা' কথাটি সাধারণত যে পরিভাষিক অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে আমরা সে অর্থ গ্রহণ করব না; বর্তমান প্রবন্ধে 'আধুনিক' কথাটিকে তার আভিধানিক অর্থেই স্বীকার করব। বর্তমান সময়ে বাংলা কবিতায় ছন্দের যেসব বৈশিষ্ট্য ও প্রবণতা দেখা যায় তাই আমাদের আলোচ্য বিষয় এবং যে সময় থেকে ওসব বৈশিষ্ট্যের সূচনা তাকেই আধুনিক ছন্দের কালগত সীমা বলে গণ্য করব।

আধুনিক বাংলা কবিতার ছন্দ আলোচনায় অগ্রসর হলে সহসা মনে হয় 'Othello's occupation is gone'— ছান্দসিকের কাজ বুঝি ফুরিয়েছে : মনে হয় আধুনিক বাংলা কবিতায় ছন্দের বালাই প্রায় কিছুই নেই, যা আছে তাও এমন কিছু নয় যা নিয়ে একটা বৃহৎ প্রবন্ধ ফাঁদা যেতে পারে। কিন্তু একটু তলিয়ে লক্ষ করলেই বেশ বোঝা যায় আধুনিক বাংলা ছন্দের বৈচিত্রও নেহাৎ কম নয় এবং তার সম্ভাব্যতার ক্ষেত্রও স্বল্পপরিসর নয়। বস্তুত একটিমাত্র প্রবন্ধে আধুনিক বাংলা ছন্দের সমস্ত দিক নিয়ে পূর্ণাঙ্গ আলোচনা করা সম্ভবপর নয়। আমরা উক্ত ছন্দের কয়েকটিমাত্র বিশিষ্টতা এবং কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে তার পরিণতি লাভের পথ খোলা আছে সে বিষয়ে কিঞ্চিৎ আলোচনা করেই নিরস্ত হব।

মূল বিষয় অবতারণা করার পূর্বে আধুনিক বাংলা কবিতার গঠনগত প্রধান কয়েকটি লক্ষণ সম্বন্ধে কিছু বলা প্রয়োজন। প্রথমেই নজরে পড়ে সুপরিমিত ও সুনিয়মিত ছন্দের অভাব অথবা পদ্যরীতির পরিবর্তে গদ্যরীতির প্রভাব। ইংরেজি সাহিত্যের আদর্শানুসরণের ফলেই হোক বা অন্য যে-কোনো কারণেই হোক আজকাল বাংলায় গদ্যকবিতা রচনার দিকে খুব একটা ঝোঁক পড়েছে। বোধ করি রবীন্দ্রনাথের *লিপিকা* (১৯২২) গ্রন্থের 'কথিকা'গুলিতেই গদ্যকবিতা রচনার প্রথম সূচনা দেখা দেয়। বাংলা কবিতায় গদ্যরীতির অন্যতম প্রবর্তক হিসাবে প্রেমেন্দ্র মিত্রের নামও এস্থলে

উল্লেখযোগ্য। কিন্তু আমাদের সাহিত্যে গদ্যকবিতা রচনার রীতি সুপ্রচলিত হয়েছে রবীন্দ্রনাথের *পুনশ্চ* (১৯৩২) কাব্যের পর থেকে। গদ্যরীতি আশ্রয়ের প্রেরণা কবির মনে কীভাবে দেখা দিয়েছিল সে ইতিহাসটুকু পাওয়া যাবে উক্ত কাব্যের ভূমিকায়; এস্থলে পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। গদ্যকবিতা রচনার কলাকৌশল আমাদের আলোচ্য বিষয় না হলেও ও সম্বন্ধে দু একটি কথা বলা প্রয়োজন। বলা বাহুল্য সাধারণ গদ্যসাহিত্যের রচনাভঙ্গি ও গদ্যকবিতার রচনাভঙ্গি ঠিক এক জাতের নয়। গদ্যকবিতার ভাষায় এমন একটা ধ্বনিগত তরঙ্গভঙ্গি বা স্পন্দনময়তা থাকা চাই যা পাঠকের মনকে বিচিত্রভাবে দুলিয়ে দেয়; ফলে ওরকম গদ্যরচনাতে পদ্যের আভাস অর্থাৎ ছন্দময়তার অনুভূতি জেগে ওঠে। প্রকারান্তরে পাঠকের মনে ছন্দের আস্বাদ জাগিয়ে তোলাই গদ্যকবিতার অন্যতম প্রধান লক্ষ্য, ওই অনুভূতিটুকুই হচ্ছে গদ্যকবিতার বিশিষ্ট কাব্যরস পরিবেশনের প্রধান আধার। সুতরাং গদ্যকবিতার ভাষাকে বলা যায় 'স্পন্দমান (Rhythmic) গদ্য'; আর সাধারণ গদ্য হচ্ছে নিস্পন্দ গদ্য। অবশ্য কোনো গদ্যই একেবারে স্পন্দনহীন নয়, তবে স্পন্দনপরায়ণতা সাধারণ গদ্যের বৈশিষ্ট্য নয় বলেই তাকে নিস্পন্দ বলা যায়। যেমন জগতের কোনো বস্তুই একেবারে তাপহীন নয়, তথাপি যেসব বস্তুর তাপ আমাদের অনুভূতিতে ধরা পড়ে না সেগুলিকে আমরা তাপহীন বলেই গণ্য করি। কবিতার গদ্যরীতি সম্বন্ধে অন্যত্র বিস্তৃত আলোচনা করেছি (*ছন্দগুরু রবীন্দ্রনাথ* নামক অচিরপ্রকাশিতব্য গ্রন্থের শেষ অধ্যায় দ্রষ্টব্য)। সুতরাং এখানে অধিক বিশ্লেষণে অগ্রসর না হয়ে শুধু এইটুকু বলাই যথেষ্ট যে, স্পন্দমান গদ্যরচনা আপাতদৃষ্টিতে যতটা সহজ মনে হয় আসলে তত সহজ নয়। আমার বিশ্বাস ছন্দবন্ধ পদ্যরচনায় যথোচিতভাবে হাত না পাকালে স্পন্দমান গদ্যরচনায় যথার্থ অধিকার জন্মে না। এজন্যেই হোক বা অন্য যে-কোনো কারণেই হোক আধুনিক গদ্যকবিতায় অনেক স্থলে স্পন্দমানতা অনুভূত হয় না। বোধ করি কেউ কেউ গদ্যকবিতার ভাষা স্পন্দমান করে তোলা নিষ্প্রয়োজন মনে করেন। তাই গদ্যকবিতায় সাধারণত বাক্‌পর্ববিন্যাসের যে রীতি দেখা যায়, কোনো কোনো আধুনিক রচনায় তারও একান্ত অভাব দেখা যায়। একটা দৃষ্টান্ত দিলেই কথাটা স্পষ্ট হবে। যথা :

> আশা ও আকাঙ্ক্ষা দিয়ে স্টেজ বেঁধে নানা
> কাহিনির অভিনয় তো চলে আসছে কতকাল।
> হাসি আনন্দ গানের যত নাটকীয়তা সবই
> তো চোখের জলে নোনতা হয়ে যাচ্ছে।
> সে নোনামির শেষ তো এই তেরোশো পঞ্চাশ
> বছর পরেও ঘুচল না।
>
> —শৈলেন ঘোষ : কালপুরুষ, *নিরুক্ত*, ১৩৫১, আষাঢ়

বলা বাহুল্য এই কবিতাংশটিতে গদ্যের স্পন্দনশীলতা সুস্পষ্ট নয় এবং এটিতে বাক্‌পর্বগুলিকে স্তরে স্তরে সাজিয়ে দেখানো হয়নি।

মনে হয় গদ্যকবিতা রচনার যে ঝোঁক প্রথমে এসেছিল এখনই তার প্রবণতা কতকটা কমে এসেছে। রবীন্দ্রসাহিত্যেও এই প্রবণতার আভাস পাওয়া যায়। ১৯৩২ সাল থেকে ১৯৩৬ সালের মধ্যে তিনি চারখানি গদ্যকবিতার বই (*পুনশ্চ, শেষ সপ্তক, পত্রপুট, শ্যামলী*) প্রকাশ করেন। কিন্তু তার পরে তিনি আর গদ্যকবিতা লেখেননি বললেই হয়; অথচ ১৯৩৬ সালের পরে রচিত পদ্যকবিতার ধারা বেশ প্রশস্ত ও গভীর। এই গীতিকবিতার দেশে গদ্যকাব্য যদি কালক্রমে

মধুসূদনের অমিত্রাক্ষর ছন্দের মতো বাংলা সাহিত্যের একটি সংকীর্ণ কোণে স্থান পায়, তবে সেটা বিস্ময়ের বিষয় হবে না। *তিলোত্তমাসম্ভব* ও *মেঘনাদবধকাব্য* প্রকাশের পরে এক যুগে অমিত্রাক্ষর ছন্দ তথা মহাকাব্য রচনার ধুম পড়ে গিয়েছিল। আজও দুই বস্তুই বাংলা সাহিত্য থেকে একেবারে নির্বাসিত না হলেও দুয়োরানির অবস্থা প্রাপ্ত হয়েছে। গদ্যকবিতার দশা যদি সেরকম নাও হয়, তবু তার বর্তমান প্রাধান্য অক্ষুণ্ণ থাকবে না বলেই মনে হয়।

এই প্রসঙ্গে বাংলা free verse সম্বন্ধে দু একটি কথা বলা প্রয়োজন। এক হিসাবে ফ্রি ভার্সকে গদ্য ও পদ্যের মধ্যবর্তী অবস্থা বলে বর্ণনা করা যায়। এইজাতীয় রচনাকে সাধারণ গদ্য বলে তো মানা যায়ই না, স্পন্দমান গদ্য বলেও গণ্য করা যায় না; কেননা এরকম রচনাতে পদ্যের রীতি ও ভঙ্গি সুস্পষ্ট, কেবল তাতে কোনো বিশেষ ছন্দের আদর্শ সর্বত্র সমভাবে বজায় থাকে না— কবি তার প্রয়োজন-অনুসারে স্বাধীনভাবে ছন্দের আদর্শ পরিবর্তন করেন। এরকম স্বচ্ছন্দবিহারী রচনাকেই বলা যায় ফ্রি ভার্স। এর বাংলা প্রতিশব্দ কী হতে পারে জানি না। আধুনিককালে ফরাসি সাহিত্যে এই স্বচ্ছন্দ পদ্য (vers libre) রচনার রীতি দেখা দেয়। ইংরেজিতেও ফ্রি ভার্স-এর যথেষ্ট নিদর্শন আছে। ইদানীং কেউ কেউ বাংলাতেও স্বচ্ছন্দ পদ্যরচনায় প্রয়াসী হয়েছেন। রবীন্দ্রসাহিত্যে এই স্বৈর ছন্দের দৃষ্টান্ত নেই। মনে পড়ে বুদ্ধদেব বসুর কোনো কোনো রচনায় স্বৈর ছন্দের ব্যবহার দেখেছি। হাতের কাছে না থাকাতে দৃষ্টান্ত দেওয়া গেল না। অমিয় চক্রবর্তীর অনেক রচনাকে এই পর্যায়ভুক্ত বলে গণ্য করা যায়। দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক :

হায় রে, নেমন্তন্ন।
সাগরপারের লোক, দেখে যাও
অন্য দেশের শিশু,
ডাকছে চোখ খুশিতে উজল
চল রে, নেমন্তন্ন।
ভাঙা ভাণ্ডের তলানিতে
এই হল তার প্রাণের নিমন্ত্রণ;
কাঙাল-সারি বসেছে পথে, উপরে ওড়ে কাক,
সেখানে ছুটে-আসা।—
যে-শিশুরা আলোয় নামে, একটু পেয়েই হাসে
তাদের জন্য এই আয়োজন।
কেমন প্রজা, কেমন রাজা, কেমন সোনার দেশ;
ভারতমায়ের শিশুকে দেখে যাও।

বলা বাহুল্য এ রচনাটি গদ্য নয়, ছন্দের ভঙ্গি এতে সুস্পষ্ট। অথচ কোনো বিশেষ ছন্দনীতিতে একে ধরা যায় না, পদে পদেই ছন্দের আদর্শ বদলে যাচ্ছে। এইজন্য এ ছন্দকে 'স্বৈর ছন্দ' বলে অভিহিত করেছি। ছন্দগত কোনো নির্দিষ্ট মাপকাঠি দিয়ে এর পরিমাপ করা যায় না; অতএব এটিকে 'অমেয় ছন্দ' নামও দেওয়া চলে।

পূর্বে বলেছি এই অমেয় ছন্দের রচনায় ছন্দের মাপকাঠি বা আদর্শের ঘন ঘন বদল ঘটে। একটি রচনার সর্বত্র ছন্দের একই আদর্শের অনুসরণ করা সাধারণ রীতি; সহসা আদর্শ বদল হলে আবৃত্তিকালে পাঠক অপ্রত্যাশিতভাবে হোঁচট খায় এবং বলে ওখানে ছন্দপতন ঘটেছে। পক্ষান্তরে

ঘন ঘন আদর্শ-বদল ও তজ্জাত ছন্দপতন ঘটানোই উক্ত স্বৈর ছন্দের বৈশিষ্ট্য। মসৃণ পথের পরিবর্তে বন্ধুর পথে ঢেলা ভেঙে ভেঙে চলাতে একপ্রকার আনন্দ আছে সন্দেহ নেই। কিছুদিন অভ্যাসের ফলে অভিনবতার মোহ কেটে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সে আনন্দ উবে যায়। সুতরাং বাংলা সাহিত্যে এই স্বৈর ছন্দের প্রচলন বেশিদিন চলবে কি না সন্দেহ।

এই স্বৈর ছন্দের সঙ্গে ছড়ার ছন্দের একটু তুলনা করা অসংগত হবে না। ছড়ার ছন্দেও ঘন ঘন আদর্শের বদল ঘটে। যেমন :

যমুনাবতী সরস্বতী কাল যমুনার বিয়ে,
যমুনা যাবেন শ্বশুরবাড়ি কাজিতলা দিয়ে।
কাজিফুল কুড়োতে পেয়ে গেলুম মালা,
হাত ঝুমঝুম পা ঝুমঝুম সীতারামের খেলা।।

এই ছড়ার ছন্দের সঙ্গে আলোচ্যমান স্বৈর ছন্দের পার্থক্য কোথায়? প্রধান পার্থক্য এই যে, ছড়ার ছন্দের যা-কিছু অসমতা সবই আবৃত্তির ঝোঁকে সমান করে নেওয়া হয়, অর্থাৎ আবৃত্তিকালে যে সুরের টান (drawl) ছড়ার পক্ষে স্বাভাবিক সেই টানে তার সব অসমতাই ঘুচে যায়। কিন্তু স্বৈর ছন্দের অসমতা স্বেচ্ছাকৃত এবং সে অসমতা দূর করার কোনো স্বভাবিক ব্যবস্থাও নেই। তা ছাড়া, স্বৈর ছন্দের স্বেচ্ছাকৃত বৈচিত্রও ছড়ার ছন্দের চেয়ে বেশি। এই বৈচিত্রের আর-একটি দৃষ্টান্ত দিয়ে এই প্রসঙ্গ সমাপ্ত করছি :

মহাত্মাজী যদি মারা যান
আকাশ হবে না খান খান
                    পৃথিবী ঘুরবে
কঠিন প্রাণ নেবে জিনে
মাঠে অগণ্য চাষী
          জলে রোদে দিনে দিনে।
ধনিক বণিক আর বহু বেতনিক
                    দুমুঠো পুরবে;
                         উপবাসী
               তিনি চলে গেলে।

আধুনিক বাংলা কবিতার দ্বিতীয় বিশিষ্ট লক্ষণ হচ্ছে মিলের অভাব। আজকাল বহু বিভিন্ন ধরনের কবিতাতেই মিল দেওয়া হয় না। বলা বাহুল্য, আধুনিক অমিল ছন্দ আর মধুসূদন-প্রবর্তিত 'অমিত্রাক্ষর' ছন্দ একজাতীয় বস্তু নয়। মধুসূদন প্রবহমান পয়ার ছন্দকেই অমিল রূপ দিয়েছিলেন এবং অমিল প্রবহমান পয়ারকেই 'অমিত্রাক্ষর' নামে অভিহিত করেছিলেন। কিন্তু আজকাল প্রবহমান পয়ার ছাড়া আরও বহুরকম ছন্দবন্ধেই মিল না দেওয়ার রীতি দেখা দিয়েছে। এসব ছন্দ অমিল হলেও এগুলিকে 'অমিত্রাক্ষর' বলা চলে না। যথাস্থানে আধুনিক অমিল ছন্দের দৃষ্টান্ত দেওয়া যাবে। এখনকার বাংলা কবিতার তৃতীয় ও চতুর্থ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যথাক্রমে পঙ্‌ক্তিদৈর্ঘ্যের অসমতা এবং ত্রিপদী চৌপদী কিংবা নির্দিষ্ট আকৃতির শ্লোকস্তবক (stanza) গঠনের প্রতি সজ্ঞান ও সচেষ্ট ঔদাসীন্য। শিশুসাহিত্য ছাড়া আজকাল অধিকাংশ স্থলেই ছন্দপঙ্‌ক্তির দৈর্ঘ্যগত সমতা দেখা যায় না এবং সুনিয়মিত ত্রিপদী চৌপদী কিংবা নির্দিষ্ট আকৃতির স্তবক রচনা সেকেলে রীতি বলে অবজ্ঞাত ও উপেক্ষিতই হয়ে থাকে।

গদ্যরীতি বা স্বৈর ছন্দের প্রচলন, মিলহীনতা, পঙ্‌ক্তিদৈর্ঘ্যের অসমতা এবং নির্দিষ্ট আকৃতির স্তবকের অভাব, এগুলিকেই আধুনিক যুগের কবিতার সাধারণ অথচ বিশিষ্ট লক্ষণ বলে গণ্য করা যেতে পারে। এগুলি সম্বন্ধে যথাযথ আলোচনায় অগ্রসর হওয়ার পূর্বে এই অভাবাত্মক লক্ষণগুলি উদ্ভূত হওয়ার কারণ কী সে বিষয়ে একটু আলোচনা করা প্রয়োজন।

আমার মনে হয় এই অভাবাত্মক লক্ষণগুলির একটি প্রধান কারণ হচ্ছে পূর্ববর্তী যুগের ছন্দবিলাসের স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া। মধুসূদন অমিত্রাক্ষর ছন্দ ও সনেট রচনার রীতি প্রবর্তন করেন এবং তখন থেকেই বাংলা ছন্দ নিয়ে নানারকম পরীক্ষা চলতে থাকে। কিন্তু দীর্ঘকাল পর্যন্ত এ পরীক্ষা সার্থকতার সন্ধান পায়নি। অবশেষে যেদিন রবীন্দ্রনাথের *মানসী* কাব্য (১৮৯০) প্রকাশিত হল সেদিন থেকে বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে ছন্দের শতমুখী ধারা প্রবলবেগে প্রবাহিত হয়ে চলল। বাংলা ছন্দের ইতিহাসে *মানসী* কাব্যের আবির্ভাব বিশেষভাবে স্মরণীয়; বস্তুত এ কাব্যখানিকে একটি নবযুগ-নির্দেশক বলে গণ্য করা যায়। যা হোক, সে যুগ থেকে রবীন্দ্রনাথের প্রবর্তনায় নিত্যনূতন ছন্দ উদ্ভাবিত হয়ে বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করতে লাগল। রবীন্দ্রনাথের মতো ছন্দবিলাসী কবি পৃথিবীর ইতিহাসেই বিরল; আর কোনো দেশে কোনো কবি একা এত ছন্দ উদ্ভাবন করেছেন কি না সন্দেহ। একা রবীন্দ্রনাথই যে বাংলা ছন্দভাণ্ডারকে পূর্ণ করে তুলতে লাগলেন তা নয়। তাঁর প্রেরণায় উদ্‌বুদ্ধ হয়ে যতীন্দ্রমোহন বাগচি, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, কালিদাস রায়, কুমুদরঞ্জন মল্লিক, করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ বহু কবি অজস্র ছন্দের বিচিত্র লীলায় বাংলা সাহিত্যকে লীলায়িত করে তুলতে লাগলেন। এই রবিমণ্ডলের মধ্যে সত্যেন্দ্রনাথ ছিলেন বৃহস্পতি স্থানীয়। সত্যেন্দ্রনাথের অসাধারণ ছন্দ-প্রতিভার কথা সর্বজনবিদিত। রবীন্দ্রনাথের উদ্ভাবিত ছন্দসমূহের বহুল প্রয়োগ তো তিনি করেছেনই, অধিকন্তু তিনি নিজেও বহু ছন্দের উদ্ভাবন ও প্রবর্তন করেছেন। রবীন্দ্রযুগে আবির্ভূত হয়েও যে তিনি ছন্দসৃষ্টির প্রতিভার জ্যোতি বিকিরণ করতে পেরেছিলেন সেটা তাঁর পক্ষে কম কৃতিত্বের কথা নয়। নব নব ছন্দ রচনার দিক থেকে *মানসী* রচনার সময় থেকে *পুনশ্চ* কাব্যের সময় অর্থাৎ ১৮৮৭ থেকে ১৯৩২, এই পঁয়তাল্লিশ বছরকে বিশেষভাবে রবীন্দ্রনাথের ছন্দসৃষ্টির যুগ বলে অভিহিত করা যায় (*মানসী*-র পূর্ববর্তী তেরো-চোদ্দো বছরকে বলা যায় উন্মেষের যুগ এবং *পুনশ্চ*-র পরবর্তী নয় বছর হচ্ছে অবসানের যুগ)। এই পঁয়তাল্লিশ বছর ধরে রবীন্দ্রনাথ অশ্রান্তভাবে যে অজস্র ছন্দ রচনা করেছেন বোধ করি কোনো দেশের কোনো কবিই একা এত ছন্দ সৃষ্টি করেননি। যা হোক, উক্ত পঁয়তাল্লিশ বছরের মধ্যেই আবার মোটামুটি ১৯১২ থেকে ১৯২২ এই দশ বছরকে বিশেষভাবে সত্যেন্দ্রনাথের যুগ বলে অভিহিত করা যায়। এই দশ বছরে সত্যেন্দ্রনাথ বাংলা সাহিত্যে ছন্দের যে ভেলকিবাজি দেখিয়েছেন তা সত্যিই বিস্ময়কর। এইজন্যেই তাঁকে 'ছন্দের জাদুকর' নাম দেওয়া হয়েছে। যা হোক, এমন একটা সময় এসেছিল যখন সত্যেন্দ্রনাথ ছন্দরচনার নেশায় মেতে গিয়েছিলেন বললেই হয়, কাব্যরসের চেয়ে ছন্দরস সৃষ্টিকেই যেন তিনি প্রাধান্য দিয়েছিলেন। নব নব ছন্দরচনার এই যে মত্ততা বা উত্তেজনা, তখনকার দিনে এটা অনেকের মধ্যেই সংক্রামিত হয়েছিল। যাঁরা তৎকালে এই নবছন্দরচনার আন্দোলনে অগ্রবর্তিতা করেছিলেন তাঁদের মধ্যে যতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য, মোহিতলাল মজুমদার ও কাজি নজরুল ইসলামের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সত্যেন্দ্রমণ্ডলীর কবিরা ছন্দের যে অতিপ্রাধান্য সৃষ্টি করলেন সাহিত্যের পক্ষে সেটা স্বাভাবিক বা কল্যাণকর বলে স্বীকৃত হতে পারে না। বস্তুত সত্যেন্দ্রনাথ প্রমুখ কবিদের ছন্দ-পরীক্ষণের মূল্য যতই হোক না কেন, অনেক স্থলে যে

ছন্দের অতিপ্রাধান্য সাহিত্যকে খর্ব করেছে সে বিষয়ে সন্দেহ করা চলে না। সুতরাং পরবর্তীকালে এর বিরুদ্ধে যে প্রবল প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে, এটা অস্বাভাবিক বা বিস্ময়ের বিষয় নয়। সে প্রতিক্রিয়া আজও চলেছে, যদিও তার বেগ ক্রমেই কমে আসছে বলে আমার বিশ্বাস। আধুনিক কালের বাংলা কবিতায় যে অনেক সময় ছন্দ সম্বন্ধে অত্যুগ্র বিরুদ্ধ ভাব দেখা যায় তার অন্যতম প্রধান কারণ হচ্ছে ওই প্রতিক্রিয়া। বুদ্ধদেব প্রমুখ অনেক আধুনিক কবিই যে সত্যেন্দ্রনাথ ও তাঁর ছন্দ সম্বন্ধে কঠোর মনোভাব পোষণ করেন তার মূলেও (অন্তত আংশিকভাবে) রয়েছে ওই প্রতিক্রিয়া। এইজন্যই আজকালকার সাহিত্যে গদ্যকবিতার এত প্রাবল্য। রবীন্দ্রনাথ অবশ্য গদ্যকবিতা-রচনার রীতিকে অনেকখানি উৎসাহ দিয়ে গিয়েছেন। কিন্তু মনে রাখতে হবে রবীন্দ্রনাথ দীর্ঘকাল অতিনিরূপিত ছন্দরচনার সাধনায় সিদ্ধি লাভ করে তবে স্পন্দনময় গদ্যকবিতা রচনার কৌশল আয়ত্ত করেছিলেন। কিন্তু আজকাল অনেক নবীন কবি ছন্দবন্ধ রচনায় ভালো করে হাত না পাকিয়েই গদ্যকবিতা রচনায় অগ্রসর হন। তার ফলটা যে সব সময়েই শুভ হয় এমন কথা বলতে পারি না। অবশ্য অনেক ছন্দনিপুণ কবিও স্বেচ্ছায় গদ্যরীতিকে আশ্রয় করে থাকেন; তাঁদের বিরুদ্ধে বলবার কিছুই নেই। কিন্তু অনেক দুর্বল কবি যে নিজেদের ছন্দ-রচনার অক্ষমতাকে গদ্যরীতির আড়ালে ঢাকা দেবার চেষ্টা করে থাকেন তাতেও সন্দেহ নেই।

আধুনিক ছন্দবিমুখতার অন্যতম কারণ হয়তো বিদেশি সাহিত্যের আদর্শানুসরণ, এ কথা পূর্বেই বলেছি। তা ছাড়া এটা নবতর ছন্দরীতি উদ্ভাবনের পূর্বাভাসও হতে পারে। নতুন সৃষ্টির পূর্বে পুরাতনকে ভাঙবার যুগ প্রায়শই দেখা যায়। ব্যক্তিগতভাবে রবীন্দ্রনাথের জীবনে এমন একটা সন্ধিপর্ব এসেছিল 'সন্ধ্যাসংগীত' রচনার সময়ে। বর্তমান বাংলা সাহিত্যেও এমনই একটা সন্ধিপর্ব বা পরীক্ষণের যুগ চলছে বলেই আমি মনে করি। এখনকার দিনের ছন্দগত অনিশ্চয়তাটা স্থায়ী হওয়ার কোনো লক্ষণ দেখছি না; বরং এর মধ্যে একটা নতুন রচনারীতি উদ্ভাবনের প্রয়াসই প্রচ্ছন্ন রয়েছে বলে আমার বিশ্বাস।

আধুনিক বাংলা কবিতায় যে এত বেশি মিলের অভাব দেখা যায় তার মূলেও অনুরূপ কারণই রয়েছে। সুনির্দিষ্ট ছন্দের বন্ধনকে মেনে কবিতা রচনা করতে হলে কবির স্বাধীনতা ও কাব্যের স্বচ্ছন্দ গতি যে অনেক ক্ষেত্রে ব্যাহত হয় তাতে সন্দেহ নেই। সুতরাং স্থলবিশেষে কবির পক্ষে সুনির্দিষ্ট ছন্দবন্ধনের বাধা থেকে মুক্তি পাওয়া প্রয়োজন এ কথাও স্বীকার্য। মিল সম্বন্ধেও এই কথা খাটে। মিল জিনিসটাও অনেক ক্ষেত্রে ভাবপ্রকাশের অন্তরায় হয়েই দাঁড়ায়। তা ছাড়া মিল ছন্দের অত্যাজ্য অঙ্গও নয়। বস্তুত মিল ছন্দের অলংকরণ মাত্র। সুতরাং যেসব স্থলে নিরলংকার পৌরুষশক্তির দৃঢ়তা প্রকাশের প্রয়োজন সেসব ক্ষেত্রে মিল না দিলে কাব্যের গৌরব বৃদ্ধি হয়। এটাও আধুনিক কবিতায় অমিল ছন্দের বহুলতার অন্যতম কারণ। এজন্যই অজিত দত্ত, বুদ্ধদেব বসু প্রমুখ অনেকে বাংলা মিলের চিরাচরিত রীতির বিরুদ্ধে অভিমত প্রকাশ করেছেন। এ বিষয়ে ইংরেজি সাহিত্যের আদর্শও তাঁদের আনুকূল্য করেছে।

কিন্তু বিগত যুগের মিলগত অতিলালিত্যের প্রতিক্রিয়াই আধুনিক মিলবিমুখতার প্রধান কারণ বলে মনে হয়। রবীন্দ্রনাথের :

আসে গুটি গুটি বৈয়াকরণ
ধূলিমাখা দুটি লইয়া চরণ;

নজরুল ইসলামের, 'শেফালিকাতলে কে বালিকা চলে' কিংবা 'অলস বৈশাখে কলস কৈ কাঁখে' এবং যতীন্দ্রমোহন বাগচির :

স্বর্ণ উষার কর্ণভূষার বর্ণতুষার দুল,
চন্দ্রধবল সরসকান্তি
চন্দনজল-পরশশান্তি
মন্দমারুত বন্দনারত গন্ধ তব অতুল।
সন্ধ্যামুখের সৌরভী ভাষা,
বন্ধ্যাবুকের গৌরবী আশা,
গুপ্ত প্রেমের সুপ্ত পিয়াসা বিরহের বুলবুল।

কিংবা

রজনীগন্ধা বাস বিলালো—
সজনী, সন্ধ্যা,— আস্‌বি না লো?
বিদায়-মায়া বিছায় ছায়া,
ধরণীকায়া করুণ কালো!

ইত্যাদি রচনা থেকেই বোঝা যায়, এক সময়ে বাংলা কাব্যে মিলের আতিশয্য কতখানি অগ্রসর হয়েছিল। এই বাড়াবাড়ির বিরুদ্ধে যদি আজ প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়ে থাকে, তাহলে সেটাকে নিশ্চয় অস্বাভাবিক বলা যায় না। কিন্তু এ কথা মনে রাখা প্রয়োজন যে, আজকাল অমিল ছন্দ রচনার ঝোঁকটা খুব প্রবল হলেও এটার উৎপত্তিও যে আজকালই হয়েছে তা নয়। মধুসূদন-প্রবর্তিত অমিত্রাক্ষর ছন্দ ও তার অনুকৃতির কথা বলা নিষ্প্রয়োজন। রবীন্দ্রনাথের প্রথম প্রকাশিত কবিতা 'অভিলাষ' এবং তৎকালীন অনেক রচনাতেই মিল দেখা যায় না (*বিশ্বভারতী পত্রিকা,* ১৩৫০, বৈশাখ : 'রবীন্দ্রনাথের বাল্যরচনা', পৃ. ৬৫১-৫৫ দ্রষ্টব্য)। রবীন্দ্রনাথের এই অমিল-প্রীতির অন্যতম কারণ বোধ করি তৎকাল-প্রচলিত অমিত্রাক্ষর ছন্দ রচনার প্রভাব। সুতরাং এসব দৃষ্টান্তকে আমরা গণনায় আনব না। কিন্তু *মানসী* কাব্যের 'নিষ্ফল কামনা' কবিতাটির (১৮৮৭) মিলের অভাব বিশেষভাবে লক্ষ করার যোগ্য। একটু উদ্ধৃত করছি :

অন্ধকার সন্ধ্যার আকাশে
বিজন তারার মাঝে কাঁপিছে যেমন
স্বর্গের আলোকময় রহস্য অসীম,
ওই নয়নের
নিবিড় তিমিরতলে কাঁপিছে তেমনি
আত্মার রহস্যশিখা।

শুধু মিলের অভাব নয়; অন্যান্য বহু বিষয়েই এই কবিতাটিকে আধুনিক ছন্দের অগ্রদূত বলে গণ্য করা যায়। বলাকা কাব্য যে ছন্দবিশিষ্টতার জন্য খ্যাতি অর্জন করেছে সে বিশিষ্টতা এই কবিতাটিতে সুস্পষ্ট। শুধু এইজাতীয় ছন্দে নয়, অন্যরকম ছন্দেও মিল না দেওয়ার দৃষ্টান্ত আছে। যথা :

গোলমাল দিনরাত,
কেমনে বা শুনিবে?
নানা দলে কলহের
চীৎকার তুলিছে;—

ভিক্ষুক ক্ষুধিত,
খনিজীবী খুশি নয়,
'শ্রম' নামে রাক্ষস
বন্ধনে অস্থির।
তব কবি-কর্ম-
কারেদের নেহায়ে
পড়িতেছে হাতুড়ি,—
গড়িতেছে ছন্দ।

—সত্যেন্দ্রনাথ : তীর্থরেণু, সংগীতমিস্ত্রির নিবেদন

এই অমিল ছন্দের কবিতাটিকে অনেকাংশে আধুনিক অমিল রচনার পূর্বরূপ বলে মনে করা যায়। লক্ষ করা প্রয়োজন, এটিতে মিল না থাকলেও ছন্দের সুনির্দিষ্ট বন্ধন বজায় আছে। আধুনিককালে নানা বিচিত্র ছন্দের রচনায় অনেক সময় মিলও থাকে না এবং পঙ্ক্তিবিন্যাসের সুনির্দিষ্ট ব্যবস্থাও থাকে না। উপরের দৃষ্টান্তটি চতুর্মাত্রপর্বিক। অন্যরকম দৃষ্টান্ত দিচ্ছি :

বুঝেছি কাঁদা হেথায় বৃথা, তাই
কাছেই পথে জলের কলে, সখা,
কলসী কাঁখে চলছি মৃদু চালে
গলির মোড়ে বেলা যে পড়ে এলো।

—সুভাষ মুখোপাধ্যায় : *পদাতিক*, বধূ

এর প্রতি পর্বে পাঁচ মাত্রা। ষণ্মাত্রপর্বিক অমিল ছন্দের দৃষ্টান্ত দিচ্ছি :

কখনো বাইরে দাঁড়ায়েছো এসে ঘুমের চোখে নরম ভোরে?
দ্যাখোনি আকাশ বোবা হয়ে আছে শেখেনি ভাষা
আলো এসে গেছে আসেনি আভা!
ঘুমিয়ে রয়েছে, কতবার এলো এমন ভোর এমন আলো!
পরীরা যখন দল বেঁধে নামে স্বপ্ন ছেড়ে
বনের ফটিক ঝর্নাতলে,
আফ্রোদিতির লঘু আনাগোনা বনের ধারে শোননি বুঝি ?

—সঞ্জয় ভট্টাচার্য : *সংকলিতা*, ভোর

এর শুধু অমিলটাই নয়, এর ছন্দগত বিশিষ্ট দোলাটিও লক্ষণীয়।

আধুনিককালে মিল যে শুধু অবজ্ঞাতই হয়েছে তা নয়। মিলের খেলাও যথেষ্টই দেখা যায়। শিশুসাহিত্যে যে মিলের প্রাচুর্য দেখা যায়, এটা খুবই স্বাভাবিক। অন্যত্রও মিলের বৈচিত্র্য উপেক্ষিত নয়। দৃষ্টান্ত দিচ্ছি :

জৈন বৌদ্ধ খ্রিস্টিয়ান,
শুভবুদ্ধির বৃষ্টি আন্।
বৃষ্টি যে এলো রাজপুতানার প্রান্তরে।
আজমীর ডোবে
বাংলাও শোবে,

উৎকল ক্ষোভে ক্ষুব্ধ।
মিত্রশক্তি টাকডুমাডুম জয়যাত্রার গান ধরে।।

—হরপ্রসাদ মিত্র : *ভ্রমণ, খণ্ডকাব্য*

দৃষ্টান্ত বাড়িয়ে লাভ নেই। এই প্রসঙ্গে অমিয় চক্রবর্তীর মিল দেওয়ার অভিনব রীতির কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। দৃষ্টান্ত দিলেই আমার বক্তব্যটা স্পষ্ট হবে :

কচি কুঁকড়ানো চায়ের পাতায় সুরভি রোদের
সোনালি বোধের
ভাবটা খুঁজব বাগানে জাভার।
বিদেশী হাওয়া
সিনকোনা ক্ষেতে সবুপথে যেতে
চমকাবে চাওয়া
শ্যামল আভার।
দার্জিলিঙের মেঘলায়-মেশা
সরে-
যাওয়া
ছবি
ভোরে-পাওয়া রবি-নেশা,
মেটাবো অচেনা পাহাড়ি
দ্বীপের
ঘন সারি সারি
পত্রে নীপের
বনে,
ঠাণ্ডা সবুজ যেখানে কুয়াশা।

—অভিজ্ঞান-বসন্ত, *শৌখীন ভ্রমণ*

এখানে প্রতি পঙ্‌ক্তির গাঁটে গাঁটে মিল কেমন এলোমেলোভাবে ছড়ানো রয়েছে, সেইটেই লক্ষণীয়। এটা ছয় মাত্রার ছন্দ এবং এতে লাইন ভেঙে ভেঙে মিলগুলি দেখিয়ে দেওয়া হয়েছে। অন্য ছন্দের আর-একটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি, তাতে মিলগুলি পঙ্‌ক্তির মধ্যে প্রচ্ছন্ন আছে :

মন্ত্রবীচি,
তারি টীকা অরণ্যানী
মৃন্ময় শ্যামল দোলে
স্বর্ণচক্রে পূরবী প্রতীচী, দোলে
মুগ্ধবাণী, পল্লবে কল্লোলে, বৃক্ষলোকে
মর্মরিত শ্লোকে, মম
বীজমন্ত্র জপি।

—অভিজ্ঞান-বসন্ত, বীজমন্ত্র

এই দুটি অংশে যে ধরনের মিলের দৃষ্টান্ত দেওয়া হল তা এখনও পরীক্ষণের প্রথম অবস্থাতেই আছে। সুতরাং এ বিষয়ে মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু এটুকু বোধ করি বলা যায় যে, মিলকে প্রকট

করার জন্যেই হোক বা প্রচ্ছন্ন করার উদ্দেশ্যেই হোক ছন্দের লাইনকে কখনও এমনভাবে ভেঙে সাজানো ঠিক নয় যাতে তার যতিগত স্বাভাবিক বিভাগগুলি অস্পষ্ট হয়ে যায়।

প্রবন্ধ বড়ো হয়ে যাচ্ছে, এবার বক্তব্য সংক্ষেপ করা প্রয়োজন। সুতরাং আধুনিক ছন্দের প্রকৃতি সম্বন্ধে আর দু একটি মাত্র কথা বলেই প্রবন্ধ সমাপ্ত করব। এ কথা বললে বোধ করি অন্যায় হবে না যে, আধুনিক কবিরা কোনো নূতন ছন্দ উদ্ভাবন করেননি, তাঁরা যেসব ছন্দ ব্যবহার করে থাকেন সে সবই পুরাতন, তাঁদের রচনার বৈশিষ্ট্য ও নূতনত্ব হচ্ছে প্রধানত ভঙ্গিগত। ভঙ্গির বৈচিত্র্যসৃষ্টির প্রতিই তাঁদের লক্ষ্য সবচেয়ে বেশি। এই ভঙ্গিবৈচিত্র্য আধুনিক বাংলা ছন্দের একটি বিশিষ্ট লক্ষণ। এই বৈচিত্র আজকাল অজস্র রূপ ধারণ করেছে; বস্তুত এ বিষয়ে প্রায় প্রত্যেক কবিরই কিছু না কিছু স্বকীয় দান আছে। অল্প পরিসরের মধ্যে তার একাংশেরও পরিচয় দেওয়া সম্ভবপর নয়। তবে এ বিষয়ের দু একটি সাধারণ লক্ষণের কথা বলছি।

মাত্রিক, লৌকিক ও যৌগিক এই ত্রিবিধ ছন্দের মধ্যে প্রথম দুই রীতির ছন্দের প্রচলনই অপেক্ষাকৃত বেশি। মাত্রিক রীতিতে চতুর্মাত্রপর্বিক ছন্দের অধিকতর প্রচলন একটি লক্ষণীয় বিষয়। রবীন্দ্রনাথ যদিও এ ছন্দের উদ্ভাবয়িতা (*মানসী*-তে), তথাপি সত্যেন্দ্রনাথের হাতেই এর পরিণতি ও জনপ্রিয়তা ঘটেছে। আধুনিক কালেও অনেকেই এ ছন্দের বহুল ব্যবহার করে থাকেন। বোধ করি, জগদীশ ভট্টাচার্যের হাতেই এ ছন্দ পরিসরে ও শক্তিতে সবচেয়ে বেশি পরিণতি লাভ করেছে। একটু দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক :

হাত ধরে চল সখি, শুরু হল জীবনের যাত্রা;
নিসঙ্গ সংসার, যেতে হবে প্রান্তর পারায়ে।
এ পথে দোসর নেই, দুঃখেরও নাই কোনো মাত্রা;
পথেরও চিহ্ন নাই, অদূরে রেখাটি গেছে হারায়ে।
সম্মুখে অমানিশি, আসে কালবৈশাখী রাত্রি,
ঝঞ্ঝা গর্জে ওঠে, বিদ্রোহী মোরা দুই যাত্রী;
ঘুরিছে শীর্ষদেশে বিষ্ণু-সুদর্শন-চক্র—
খণ্ড খণ্ড হবে যৌবন-উন্মাদ স্বপ্ন;
শাসনের বক্ষেতে জ্বালিয়াছি বহ্নি উদগ্র,
নির্বাত নীড়ে তাই শ্মশানের ধ্বংস আসন্ন॥

—ক্ষণশাশ্বতী, উৎসর্গ

যৌগিক ছন্দকে সচেতনভাবে অক্ষরসংখ্যার গণ্ডি থেকে মুক্ত করে ধ্বনিমাত্রার ভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠা দানের প্রয়াস আধুনিক কালের আর-একটি লক্ষণীয় বিষয়। যথা :

'গোলদীঘি'র গর্তে চাঁদ ধরা পড়ে গেছে
বসন্ত সত্যিই 'আসবে'? কি 'দরকার' এসে?

—সুভাষ মুখোপাধ্যায় : *পদাতিক*, আলাপ

মাথায় শোলার টুপি, কালো 'চশমা' চোখে;
ক্যামেরা ঝুলছে কাঁধে, ব্যাগে আছে
কাগজ-'পেনসিল'।

—বুদ্ধদেব বসু : *বিদেশিনী*

'গোলদীঘি', 'আসবে' প্রভৃতি পাঁচ জায়গায় অক্ষরসংখ্যাকে অগ্রাহ্য করে উচ্চারিত ধ্বনিপরিমাণের

উপরে ছন্দ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, এটাই লক্ষণীয়। রবীন্দ্রসাহিত্যেই এর সূচনা হয়েছে। তার পরে অন্য কবিদের রচনায় এ রীতির ব্যাপকতর প্রয়োগ ঘটেছে।

মাত্রিক ও যৌগিক, এই উভয় রীতির ছন্দকেই রবীন্দ্রনাথ সাধুভাষার ছন্দ বলে গণ্য করতেন এবং ও দুই রীতির ছন্দে তিনি সাধুভাষা অর্থাৎ করিল, করিবে, করিতে প্রভৃতি সাধু ক্রিয়াপদই ব্যবহার করতেন। কিন্তু একেবারে শেষ বয়সে তিনি ও দুই রীতির ছন্দেও হসন্তমধ্য চলতি ক্রিয়াপদ ব্যবহার করেছেন। যথা :

বিধাতা তোমাকে সৃষ্টি 'করতে' এসে
আনমনা হয়ে শেষে
কেবল তোমার ছায়া
রচে দিয়ে ভুলে ফেলে গিয়েছেন,
শুরু করেন নি কায়া।
যত রাজ্যের যত কবি তাকে
ছন্দের ঘের দিয়ে
আপন বুলিটি শিখিয়ে 'করত'
কাব্যের পোষা টিয়ে।

—*সানাই*, সম্পূর্ণ

শুকনো কাশে আগুনের মতো
ছড়িয়ে 'পড়ল' খ্যাতি নিমেষে নিমেষে।

—*পরিশেষ*, খ্যাতি

এস্থলে *পরিশেষ* কাব্যটি (১৯৩২) সম্বন্ধে দু একটি কথা বলা প্রয়োজন। ছন্দের দিক থেকে শুধু রবীন্দ্রসাহিত্যে নয়, পরন্তু সমস্ত বাংলা সাহিত্যেই এই কাব্যখানি একটি বিশেষ স্থান পাবার যোগ্য। ছন্দ এবং রচনারীতির অনেক বৈশিষ্ট্য আছে এই কাব্যখানিতে। যাঁরা কবিতা রচনার বৈচিত্র্য বিষয়ে উৎসুক, এই বইখানির প্রতি তাঁদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা প্রয়োজন। যৌগিক ছন্দে অমিল রচনারীতি এবং চলতি বাংলা, বিশেষত হসন্তমধ্য ক্রিয়াপদের প্রয়োগ এই কাব্যখানির অন্যতম প্রধান বিশেষত্ব। শুধু তাই নয়, ছন্দের বন্ধনের মধ্যেও এটিতে যে বলিষ্ঠ ও অসংকুচিত গদ্যের ভঙ্গি রক্ষা করা হয়েছে তাতে এটির মর্যাদা অনেকখানি বৃদ্ধি পেয়েছে। তা ছাড়া, এটিতে যে গদ্যের ভঙ্গি আনা হয়েছে তাও পোশাকি গদ্য নয়, একেবারে আটপউরে চলতি গদ্য। ইতিমধ্যেই বুদ্ধদেব বসু প্রমুখ কোনো কোনো কবি ক্ষেত্রবিশেষে *পরিশেষ*-এর রচনাদর্শকে স্বীকার করে নিয়েছেন। *পরিশেষ*-এর কতকগুলি কবিতা পরে এই গ্রন্থে বর্জিত এবং *পুনশ্চ* কাব্যে গৃহীত হয়েছে, এটুকু মনে রাখা প্রয়োজন।

যা হোক, আমার বক্তব্য এই যে, চলতি ভাষা মায় হসন্তমধ্য ক্রিয়াপদ এবং আটপউরে গদ্যরীতির অসংকুচিত ও বহুল প্রয়োগ হচ্ছে আধুনিক বাংলা কবিতার অন্যতম প্রধান লক্ষণ। তা ছাড়া এই আটপউরে চলতি গদ্যরীতি প্রয়োগের ক্ষেত্রও *পরিশেষ* কাব্যের চেয়ে অনেক বেশি। *পরিশেষ* কাব্যের এই বিশেষ লক্ষণটি শুধু যৌগিক ছন্দের কোনো কোনো ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ। কিন্তু আধুনিক কবিরা মাত্রিক ও যৌগিক এই উভয় রীতির ছন্দের সকল বিভাগেই উক্তপ্রকার গদ্যরীতি ও চলতি ভাষার ব্যবহার করে থাকেন। দৃষ্টান্ত দিয়ে প্রবন্ধের আয়তন বাড়াতে চাইনে।

কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, আধুনিক কবিরা চলতি রীতির এতখানি অনুরাগী হওয়া সত্ত্বেও তাঁদের হাতে চলতি বাংলার বিশিষ্ট ছন্দটি, যাকে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন 'প্রাকৃত বাংলা ছন্দ' এবং যাকে আমি বলি 'লৌকিক ছন্দ' সেটিই যথোচিত মর্যাদা লাভ করেনি। অথচ রবীন্দ্রনাথ ও সত্যেন্দ্রনাথের হাতে বাংলা ছন্দের এই শাখাটি যেমন সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে তাতে এর ভবিষ্যৎ পরিণতির ক্ষেত্র যে খুবই প্রশস্ত তাতে কোনোই সন্দেহ নেই। কী কী উপায়ে এই ছন্দরীতিটিকে আরও সমৃদ্ধ এবং আধুনিক কাব্যের উপযুক্ত বাহন করে তোলা যায়, সে প্রসঙ্গ তুলব না। *ক্ষণিকা, উৎসর্গ, খেয়া, পলাতকা* এবং *পরিশেষ*— এই কাব্যগুলিতে লৌকিক ছন্দ যেভাবে ক্রমবিকাশ লাভ করেছে, সে আলোচনাও করব না। কিন্তু *পুনশ্চ* (১৯৩২) কাব্যের শেষ তিনটি কবিতা (ছুটি, গানের বাসা, পয়লা আশ্বিন) এবং *সানাই* (১৯৪০) কাব্যের দুটি কবিতা (বাসাবদল, পরিচয়), এই পাঁচটি রচনায় অমিল লৌকিক ছন্দ আটপউরে গদ্যের ভঙ্গিতে যে বলিষ্ঠ স্বাভাবিকতার অধিকারী হয়েছে তাতে এটিকে বাংলা সাহিত্যে একটা নূতন পথের ইঙ্গিত বলে গণ্য করা যায়। অন্য কোনো আধুনিক কবির লেখায় এই অভিনব অথচ সম্পূর্ণ স্বাভাবিক ছন্দভঙ্গিটির সাক্ষাৎ পাইনি, অথচ এটি যে আধুনিক বাংলা কবিতার একটি যোগ্যতম বাহন বলে গণ্য হতে পারে তাতে সন্দেহ নেই। এ স্থলে দৃষ্টান্তস্বরূপ একটু অংশ উদ্ধৃত করেই প্রবন্ধ সমাপ্ত করছি :

এমন সময় বেড়াজালের ফাঁকে
পড়ল এসে মায়াবিনী,
রণিতা তার নাম।
এ কথাটা হয়তো জানো
মেয়েতে মেয়েতে আছে বাজিরাখার পণ
ভিতরে ভিতরে।
কটাক্ষে সে চাইল আমায়, তারে চাইলুম আমি,
পাশা ফেলল নিপুণ হাতের ঘুরুনিতে,
এক দানেতেই হল তারি জিত।
জিত? কে জানে তাও সত্য কিনা।
কে জানে তা নয় কি তারি
দারুণ হারের পালা।

—*সানাই*, পরিচয়

এই আটপউরে চলতি গদ্যভঙ্গির ছন্দটি হচ্ছে বাংলা ভাষার পক্ষে স্বাভাবিকতম। অথচ এটির যথেষ্ট ব্যবহার হয়নি। আমার বিশ্বাস, যথোচিত ব্যবহারের দ্বারা এ ছন্দের উপযোগিতা বহুল পরিমাণে বাড়ানো যেতে পারে।

উৎস : *দেশ*, বর্ষ ১২ সংখ্যা ২২ অগ্রহায়ণ ১৩৫১, ১৮ নভেম্বর, ১৯৪৪।

ঊনবিংশ শতকে জাতিভেদবিরোধী আন্দোলন

অমিতাভ মুখোপাধ্যায়

ঊনবিংশ শতাব্দীতে জাতিভেদ প্রথা ধীরে ধীরে বাংলা দেশের হিন্দুসমাজে ভেঙে পড়তে আরম্ভ করে। জাতিভেদ প্রথার সঙ্গে বংশানুক্রমিক বৃত্তি অনুসরণের যে রীতি জড়িত ছিল, ব্রিটিশ রাজত্ব প্রতিষ্ঠার আগেই উচ্চ জাতিগুলির মধ্যে তা কিছুটা শিথিল হয়ে যায়, এবং ব্রিটিশ রাজত্বকালে ধনতান্ত্রিক অর্থনীতির প্রভাবে স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রামীণ সমাজব্যবস্থা ধীরে ধীরে ভেঙে পড়ায় নিম্ন জাতির লোকেদের মধ্যেও ব্যক্তিগত রুচি, সামর্থ্য এবং শিক্ষাদীক্ষা অনুসারে স্ব স্ব বৃত্তি গ্রহণের প্রবণতা দেখা যায়। কিন্তু যে শিল্পায়নের দিকে বিনিময়-প্রধান অর্থনীতির (Exchange Economy) স্বাভাবিক গতি থাকে, ভারতে সেই শিল্পায়নের পথে সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ শাসকেরা আপন স্বার্থেই নানা বাধাবিঘ্নের সৃষ্টি করে। ফলে আমাদের দেশে কলকারখানা-নির্ভর শিল্প এবং নাগর সভ্যতার প্রসার দুই-ই ব্যাহত হয় এবং জাতিভেদ প্রথার অর্থনৈতিক ভিত্তির ক্ষয় বিলম্বিত হয়।

জাতিভেদ ব্যবস্থার সঙ্গে যেসকল সামাজিক কুপ্রথা দীর্ঘকাল জড়িত ছিল, ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাংলা দেশে ইংরেজি শিক্ষা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে দেশবাসীর একাংশ সে সম্বন্ধে সচেতন হন। ইংরেজি শিক্ষার প্রসারের ফলে আমাদের দেশে যে ধর্ম ও সমাজ-সংস্কারমূলক আন্দোলনগুলি দেখা দেয় সেগুলির অধিকাংশই স্বল্প বা অধিকমাত্রায় জাতিভেদবিরোধী ছিল, এ কথা নিঃসংশয়ে বলা চলে। রাজা রামমোহন রায় জাতিভেদ প্রথাকে আমাদের ঐহিক সুখের পরিপন্থী ও জাতীয় ঐক্য বিনাশকারী বলে বর্ণনা করেন। ১৮১৬ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত তাঁর *ঈশোপনিষৎ*-এর ইংরেজি অনুবাদের ভূমিকায় রামমোহন এই বলে দুঃখ প্রকাশ করেন যে পানাহারের ব্যাপারে প্রচলিত বিধিনিষেধের সামান্যতম লঙ্ঘন করলেও লোকের জাতিনাশ হয়, কিন্তু মিথ্যাভাষণ, মিথ্যা সাক্ষ্যদান, চুরি, এমনকি নরহত্যা করলেও কেউ জাতিচ্যুত বা সমাজে কলঙ্কিত হয় না। ১৮২১ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত *The Brahmunical Magazine* বইটির প্রথম সংস্করণের ভূমিকায় রামমোহন লিখেছেন যে জাতিভেদ প্রথাই আমাদের সমস্ত অনৈক্যের মূল। এর দুই বৎসর পর তাঁর *কেনোপনিষৎ*-এর ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশিত হয় এবং সেই বইয়ের ভূমিকাতেও রামমোহন মন্তব্য করেন যে, জাতিভেদ প্রথার সামাজিক নিয়মগুলি কঠোরভাবে বলবৎ

করা হলে হিন্দুদের দৈনন্দিন জীবনের সাধারণ স্বাচ্ছন্দ্যগুলিও বিনষ্ট হবে। রামমোহনের প্রতিষ্ঠিত আত্মীয়সভার অধিবেশনগুলিতেও ১৮১৯ খ্রিস্টাব্দেই জাতিভেদ প্রথার নিরর্থক ও অযৌক্তিক বিধিনিষেধগুলির কঠোর প্রতিকূল সমালোচনা করা হত বলে জানা যায়। ১৮২৭ খ্রিস্টাব্দে রামমোহন মৃত্যুঞ্জয়াচার্যের লেখা জাতিভেদ প্রথার বিরোধী *বজ্রসূচী উপনিষৎ*-এর বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করেন। ১৮২৮ খ্রিস্টাব্দের ১৮ জানুয়ারি তারিখে লেখা একটি চিঠিতেও রামমোহন বলেছেন যে, জাতিভেদ প্রথা হিন্দুসমাজকে অসংখ্য ভাগে খণ্ডিত করে তাদের দেশপ্রেমের ভাব থেকে বঞ্চিত করেছে। ১৮৩০ খ্রিস্টাব্দে রামমোহনের সমুদ্রযাত্রা যে সে যুগের জাতিভেদ প্রথার রীতি-বিরোধী ছিল, তা বলাই বাহুল্য। রামমোহনের অনুচর ও বন্ধু দ্বারকানাথ ঠাকুর (১৭৯৪—১৮৪৬) শুধু 'কালাপানি'ই পার হননি, স্বদেশে ও বিদেশে ইউরোপীয়দের সঙ্গে খানাপিনা করে এবং তার জন্য কোনোরকম প্রায়শ্চিত্ত করতে অস্বীকার করে সে যুগের রক্ষণশীল হিন্দুসমাজের, এমনকি তাঁর অনেক নিকট আত্মীয়স্বজনের, মনোবেদনার কারণ হন। ১৮৪৪ খ্রিস্টাব্দে আপন ব্যয়ে তিনি কলকাতা মেডিক্যাল কলেজের দুটি ছাত্রকে উচ্চতর শিক্ষার জন্য ইংলন্ডে নিয়ে যান।

রামমোহনের পরবর্তী যুগে হিন্দু কলেজের অধ্যাপক যুক্তিবাদী ডিরোজিয়ো (১৮০৯-৩১)-র অনুবর্তী 'ইয়ং বেঙ্গল' দল জাতিভেদ ব্যবস্থাকে ঘৃণা করতেন। এঁদের প্রভাবে পড়ে কোনো কোনো ব্রাহ্মণ-সন্তান সে যুগে উপবীত ত্যাগ করেন। হিন্দু কলেজের 'প্রগতিশীল' ছাত্রদের অনেকের মধ্যেই ১৬/১৭ বৎসর বয়সে সুরাপান ও গোমাংস ভোজনে বিশেষ আসক্তি দেখা গিয়েছিল। এঁদের মধ্যে যাঁরা ব্রাহ্মণ-বংশে ছিলেন, তাঁরা সন্ধ্যাহ্নিক পরিত্যাগ করতে দৃঢ়সংকল্প ছিলেন। প্যারীচাঁদ মিত্রের রচনা থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে শিবনাথ শাস্ত্রী তাঁর *রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গ সমাজ* বইয়ে (১৯০৩) লিখেছেন,— "তাহাদিগকে (অর্থাৎ, এই ছাত্রদের) বলপূর্বক ঠাকুর ঘরে প্রবিষ্ট করিয়া দিলে তাহারা বসিয়া সন্ধ্যা-আহ্নিকের পরিবর্তে হোমরের 'ইলিয়ড' গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত অংশ সকল আবৃত্তি করিত।" কেহ কেহ 'রাজপথে যাইবার সময় মুণ্ডিত-মস্তক ফোঁটাধারী ব্রাহ্মণ পণ্ডিত দেখিলেই' 'আমরা গোরু খাই গো' বলিয়া চিৎকার করিয়া তাঁহাদিগকে বিরক্ত করিত। ডিরোজিয়োর এক শিষ্য রসিক কৃষ্ণ মল্লিক প্রকাশ্য আদালতে প্রচলিত রীতি অনুযায়ী তামা-তুলসী-গঙ্গাজল স্পর্শ করে সাক্ষ্য দিতে অসম্মত হন, কারণ গঙ্গাজলের পবিত্রতায় তিনি বিশ্বাস করতেন না। ডিরোজিয়োর অপর এক খ্যাতনামা শিষ্য দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় (১৮২২-৮৭) বর্ধমানের বিধবা মহারানি বসন্তকুমারীকে বর্ধমান থেকে কলকাতায় নিয়ে এসে কলকাতা পুলিশ ম্যাজিস্ট্রেট বার্চ সাহেবের সামনে তাঁকে 'সিভিল ম্যারেজ' পদ্ধতিতে বিবাহ করেন। এই বিবাহ ছিল সে যুগে একাধারে বিধবা বিবাহ, অসবর্ণ বিবাহ এবং অশাস্ত্রীয় পদ্ধতিতে বিবাহের নিদর্শন।

ব্রাহ্মসমাজের নেতৃবৃন্দ, বিশেষত কেশবচন্দ্র সেন (১৮৩৮-৮৪)-এর যুগ হতে, তাঁদের সমাজ-সংস্কারের কর্মসূচির মধ্যে জাতিভেদ প্রথার উচ্ছেদকে একটি প্রধান স্থান দিয়েছিলেন। ব্রাহ্মসমাজের বেদি হতে ব্রাহ্মণ আচার্যকে অপসারণ, উপবীত ত্যাগ ও অসবর্ণ বিবাহের প্রচলন, এই তিনটি বিষয়ে নবীন ব্রাহ্ম নেতারা— কেশবচন্দ্র সেন, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী এবং শিবনাথ শাস্ত্রী— বিশেষ সচেষ্ট হন। কেশবের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ নিজের উপবীত ত্যাগ করেন, এবং তাঁর বাড়িতে দুর্গোৎসব-সহ সমস্ত পৌত্তলিক ক্রিয়াকলাপ বন্ধ করে দেন (১৮৫৯)। ১৮৬২ খ্রিস্টাব্দের আগস্ট মাসে ব্রাহ্মদের মধ্যে গোপনে প্রথম অসবর্ণ-বিবাহ অনুষ্ঠিত হয় এবং এর দুই বৎসর পরে, ১৮৬৪ খ্রিস্টাব্দে, কেশবের অনুগামী ব্রাহ্মেরা তাঁদের প্রথম অসবর্ণ এবং বিধবা বিবাহের প্রকাশ্য আয়োজন

করেন। ১৮৬৩ খ্রিস্টাব্দে রাজনারায়ণ বসুকে লেখা একটি চিঠিতে দেবেন্দ্রনাথ ব্রাহ্মদের মধ্যে অসবর্ণ বিবাহের প্রবর্তনকে সমর্থন করেন। কিন্তু শেষপর্যন্ত ব্রাহ্মসমাজের বেদিতে, উপাসনার সময় উপবীত-ধারী ব্রাহ্মণ আচার্য বা উপাচার্য কখনোই বসতে পারবেন না, কেশব সেনের অনুগামীদের এই দাবি মহর্ষি গ্রহণ করতে পারেননি এবং তারই ফলে ১৮৬৬ খ্রিস্টাব্দে কেশব সেনের অনুগামীরা দেবেন্দ্রনাথের নেতৃত্বে পরিচালিত ব্রাহ্মসমাজ ত্যাগ করে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন করেন। ব্রাহ্মসমাজে এর পর বহু অসবর্ণ বিবাহ অনুষ্ঠিত হয়।

আনুষ্ঠানিক ব্রাহ্ম না হয়েও রামতনু লাহিড়ী (১৮১৩-৯৮)-র মতো আদর্শবাদী শিক্ষক ও সংস্কারক জাতিভেদ প্রথার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানানোর জন্য প্রকাশ্যে তাঁর পিতৃদত্ত উপবীত ত্যাগ করেন (১৮৫৬) এবং এর জন্য বহু সামাজিক উৎপীড়নও সহ্য করেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর পঞ্চাশের দশকে বিদ্যাসাগরের বিধবা-বিবাহ আন্দোলন এবং সত্তরের দশকে তাঁর কৌলীন্য ও বহুবিবাহ প্রথার বিরুদ্ধে আন্দোলন দুটিই মূলত জাতিভেদ প্রথার বিরোধী ছিল। যে রাঢ়ি ব্রাহ্মণেরা এক কালে বাঙালি হিন্দুসমাজের সবচেয়ে রক্ষণশীল অংশ ছিলেন, বিদ্যাসাগর সেই সম্প্রদায়েরই একজন হয়ে যেন তাঁদেরই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। অবশ্য অপর এক রাঢ়ি ব্রাহ্মণ রামমোহন রায় ছিলেন তাঁর পথ-প্রদর্শক। বিদ্যাসাগরের প্রথম আন্দোলনটি আইনের সমর্থন লাভে সফল হয়, দ্বিতীয়টি হয়নি, কিন্তু দুটিই সে যুগের শিক্ষিত বাঙালি হিন্দুসমাজকে বিশেষভাবে নাড়া দিয়ে যায়। বিদ্যাসাগরের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে রাসবিহারী মুখোপাধ্যায় নামে এক কুলীন ও বহুপত্নীক ব্রাহ্মণ পূর্ববঙ্গের তারপাশা অঞ্চলে গ্রামে গ্রামে স্বরচিত গান গেয়ে ও বই লিখে কৌলীন্য প্রথার বিরুদ্ধে প্রচারকার্য চালাতে আরম্ভ করেন।

বাংলা দেশে ধর্মপ্রচাররত খ্রিস্টান মিশনারি সম্প্রদায়গুলিও জাতিভেদ প্রথার বিরুদ্ধে চিরকাল সোচ্চার ছিলেন এবং ধর্মান্তরিত হিন্দুদের মধ্যে তাঁরা বিবাহ বা আহারাদির ব্যাপারে কোনো জাতিভেদ স্বীকার করতেন না, যদিও শ্রীরামপুরের ব্যাপটিস্ট মিশনের পাদরি কেরি ও ওয়ার্ড সাহেব তাঁদের প্রথম ধর্মান্তরিত ব্রাহ্মণ কৃষ্ণপ্রসাদকে উপবীত ত্যাগে বাধ্য করেননি (১৮০২)। ব্রাহ্মণের উপবীতকে তাঁরা সামাজিক আভিজাত্যের চিহ্ন বলেই গ্রহণ করেছিলেন, এর কোনো আধ্যাত্মিক বা ধর্মীয় মূল্য তাঁরা দেননি। তবে ধর্মান্তরিত ব্রাহ্মণ কৃষ্ণপ্রসাদ অল্প দিন পরেই ধর্মান্তরিত সূত্রধর কৃষ্ণপালের কন্যাকে বিবাহ করে (১৮০৩) জাতিগত ব্যাপারে তাঁর ঔদার্যের পরিচয় দেন। স্কটিশ প্রেসবিট্যারিয়ান চার্চের পাদরি আলেকজান্ডার ডাফও জাতিভেদ প্রথার সম্বন্ধে অত্যন্ত কঠোর মনোভাব গ্রহণ করেন এবং একে মূর্তিপূজা ও অন্যান্য হিন্দু ধর্মীয় কুসংস্কারের প্রধান ধারক বলে বর্ণনা করেন। তিনি তাঁর *India and India Missions* বইয়ে লিখেছেন, 'Idolatry and the superstitions are like the stones and bricks of a huge fabric, and caste is the cement which pervades and closely binds the whole' এই প্রসঙ্গে স্মরণ করা যেতে পারে যে দক্ষিণ ভারতের রোম্যান ক্যাথোলিক মিশনারিরা এবং ট্র্যাঙ্কেবার (Tranquebar)-এর দিনেমার প্রোটেস্টান্ট মিশনের কর্তারা কিন্তু তাঁদের নিজ নিজ এলাকায় ধর্মান্তরিত হিন্দুদের মধ্যে জাতিভেদ প্রথাকে একটি অনিবার্য সামাজিক কুসংস্কার বলেই মেনে নিয়েছিলেন। ধর্মান্তরিত হওয়ার পরেও তাঁরা বিবাহ ও পানাহারের ব্যাপারে জাতিভেদ ব্যবস্থা মেনে চলতেন। শূদ্র খ্রিস্টান ও 'পারিয়া' (অস্পৃশ্য) খ্রিস্টানের মধ্যে সেখানে কোনো সামাজিক যোগাযোগ ছিল না।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে নব্য হিন্দুবাদের প্রধান উদ্‌গাতা স্বামী বিবেকানন্দও (১৮৬৩-১৯০২) জাতিভেদ প্রথার অর্থহীন বিধিনিষেধের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন। বহু অব্রাহ্মণ, এমনকি অহিন্দু শিষ্যকে তিনি প্রণবযুক্ত মন্ত্রে (বা গায়ত্রী মন্ত্রে) দীক্ষা দেন। বাল্যবন্ধু প্রিয়নাথ সিংহকে

তিনি একবার বলেছিলেন, 'ব্রাহ্মণের ছেলেই যে ব্রাহ্মণ হয় তার মানে নেই, হবার খুব সম্ভাবনা, কিন্তু না হতেও পারে'। আমেরিকায় যাঁদের তিনি মন্ত্রশিষ্য করেছিলেন তাঁদের সকলকেই তিনি গুণে ব্রাহ্মণ বলে মনে করতেন। ব্রাহ্মণেরা বহুকাল ধরে দেশের তথাকথিত নীচ জাতিদের ঘৃণা করার ফলেই যে বর্তমান কালে জগতের ঘৃণাভাজন হয়ে পড়েছে, এ কথাও তিনি বলেছেন। উত্তরপাড়ার জমিদার রাজা প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায়কে লেখা একটি চিঠিতে (১৮৯৪) তিনি মন্তব্য করেছেন, 'ভারতের পতন ও অবনতির এক প্রধান কারণ— জাতির চারিদিকে এইরূপ আচারের বেড়া দেওয়া।... ইহার ভিত্তি— অপরের প্রতি ঘৃণা। প্রাচীন বা আধুনিক তার্কিকগণ মিথ্যা যুক্তিজাল বিস্তার করিয়া যতই ইহা ঢাকিবার চেষ্টা করুন না কেন, অপরকে ঘৃণা করিতে থাকিলে কেহই নিজে অবনত না হইয়া থাকিতে পারে না।' আর-একজন ভক্তকে (সুরেন্দ্রনাথ সেন) তিনি বলেন, 'ভারতবর্ষে inter-marriage-টা হওয়া দরকার, তা না হওয়ায় জাতটার শারীরিক দুর্বলতা এসেছে।' অস্পৃশ্যতার নিন্দাতেও বিবেকানন্দ চিরদিন মুখর ছিলেন। 'ছুতমার্গ হিন্দু ধর্ম নয়, শাস্ত্র বহির্ভূত প্রাচীন আচার মাত্র', এ কথা তিনি নানাস্থানে বলেছেন। মাদ্রাজে এক বক্তৃতা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'যদি আমি অতি নীচ চণ্ডাল হইতাম, তাহা হইলে আমার আরও অধিক আনন্দ হইত, কারণ আমি যাঁহার শিষ্য, তিনি অতি শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ হইলেও এক অস্পৃশ্য মেথরের গৃহ পরিষ্কার করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন।' অতিরিক্ত মাত্রায় খাদ্যাখাদ্যের শুদ্ধি বিচারকেও বিবেকানন্দ অন্তরের সঙ্গেই ঘৃণা করতেন। মনমাদুরা অভিনন্দনের উত্তরে তিনি বলেন, "আমরা এখন বৈদান্তিকও নই পৌরাণিকও নই, তান্ত্রিকও নই, আমরা এখন কেবল 'ছুতমার্গী', আমাদের ধর্ম এখন রান্নাঘরে। ভাতের হাঁড়ি আমাদের ঈশ্বর..., যদি আমাদের দেশে আর এক শতাব্দী ধরিয়া এইভাবে চলে, তবে আমাদের প্রত্যেককেই পাগলা গারদে যাইতে হইবে।' দুর্ভাগ্যের বিষয়, তৎকালীন হিন্দুসমাজের অধিকাংশই বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা থেকে আত্মসমালোচনার এই অংশটুকু বাদ দিয়ে শুধু হিন্দুধর্মের গৌরবের কথা গ্রহণ করে বৃথা আত্মশ্লাঘা অনুভব করেছিলেন। বিবেকানন্দের আদর্শকে পুরোপুরি গ্রহণ করবার মতো উদারতা বা সাহস তাঁদের ছিল না। স্বল্পায়ু বিবেকানন্দও তাঁর সন্ন্যাসজীবনে কোনো সামাজিক আন্দোলন পরিচালনা করার সুযোগ পাননি। বিলাত-প্রত্যাগত স্বামীজির স্থাপিত মঠে হিন্দু আচারনিষ্ঠা সর্বথা পালিত হয় না, এরকম সমালোচনাও সে যুগের বহু রক্ষণশীল হিন্দু করতেন, কিন্তু স্বামীজি তাতে কর্ণপাত করেননি।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে ভারতে ইংরেজ সরকারের প্রণীত কয়েকটি আইন ও জাতিভেদ প্রথার কঠোরতা হ্রাস করতে সাহায্য করে। এই আইনগুলির মধ্যে প্রথমেই ১৮৫০ খ্রিস্টাব্দের Lex Loci Act বা Castes Disabilities Removal Act উল্লেখযোগ্য, স্বধর্ম ত্যাগের ফলে জাতিচ্যুত হলেও কোনো হিন্দু পিতৃধনের অধিকার থেকে বঞ্চিত হবেন না, এটাই ছিল এই আইনের নির্দেশ। এই ধরনের একটি আইনের জন্য শ্রীরামপুরের ব্যাপটিস্ট মিশনারিরা ১৮২৬ খ্রিস্টাব্দ থেকেই সরকারের কাছে অবেদন-নিবেদন করছিলেন। ১৮৩০-৩১ খ্রিস্টাব্দে আলেকজান্ডার ডাফও এ বিষয়ে সচেষ্ট হন। অপর দিকে *সমাচার চন্দ্রিকা*-র মতো রক্ষণশীল পত্রিকাগুলি জাতিরক্ষার সঙ্গে উত্তরাধিকারের সংযোগকে হিন্দুধর্মের পক্ষে একটি প্রধান রক্ষাকবচ বলে বিবেচনা করতেন। যাই হোক, মিশনারিদের আন্দোলনই শেষপর্যন্ত সফল হয়। এই আইনের বিরুদ্ধে কলকাতার হিন্দুরা সভাসমিতি করেন এবং বিলাতে পার্লামেন্টের কাছেও একটি আবেদনপত্র প্রেরিত হয়, কিন্তু ব্রাহ্মসমাজের কোনো সভ্য নাকি এই আবেদনে স্বাক্ষর করেননি।

এর পরের আইনটি হচ্ছে Act XV of 1856 যার দ্বারা হিন্দুসমাজে বিধবা-বিবাহ আইনের অনুমোদন লাভ করে। হিন্দুসমাজের সর্বনিম্ন পর্যায়ের কোনো কোনো জাতির মধ্যে এবং বৈষ্ণব 'নেড়া-

নেড়ি'-দের মধ্যে বিধবা-বিবাহ চিরকালই প্রচলিত ছিল। কিন্তু ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থ, নবশাখ প্রভৃতি উচ্চ জাতির লোকেরা কোনোদিনই বিধবা-বিবাহ করতেন না এবং নিম্ন জাতির লোকেদের জাতি-মর্যাদা বৃদ্ধির একটি পন্থা ছিল আপন সমাজে বিধবা-বিবাহের নিবর্তন। বিদ্যাসাগর মহাশয় বিধবা-বিবাহ আন্দোলনকেই তাঁর জীবনের সর্বপ্রধান সৎকর্ম বলে বর্ণনা করেছেন এবং এর জন্য তাঁকে বহু পরিশ্রম, অর্থব্যয় ও সামাজিক প্রতিকূলতার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। কিন্তু আইন প্রণয়ন করে বিধবা-বিবাহকে বৈধ বলে ঘোষণা করলেও হিন্দুসমাজের উচ্চ শ্রেণির মধ্যে এ ধরনের বিবাহ আজও তেমন আদৃত হয়নি, বিধবা-বিবাহ কোথাও ঘটলে আজও তা আলোচনার বিষয় হয়ে থাকে। বিদ্যাসাগরের পর কেশব সেনের পরিচালিত ব্রাহ্মসমাজ বিধবা-বিবাহ আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ করে। ১৮৮২ খ্রিস্টাব্দে অনুষ্ঠিত ১৩টি ব্রাহ্ম-বিবাহের মধ্যে ৫টিই ছিল বিধবা-বিবাহ। বরাহনগরের ব্রাহ্ম নেতা শশীপদ বন্দ্যোপাধ্যায়ও বিধবা-বিবাহ প্রচলনের জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করেন। প্রথমা পত্নীর মৃত্যুর পর তিনি নিজে এক বিধবার পাণিগ্রহণ করেন এবং পরে দ্বিতীয়া পত্নীর সহায়তায় অন্যূন ৪০ জন হিন্দু বিধবার সৎপাত্রে বিবাহ দেন। পাত্রীদের মধ্যে অন্তত একজন তাঁর নিকট আত্মীয়া ছিলেন এবং পাত্রটি এক্ষেত্রে সংগতিসম্পন্ন হলেও পাত্রীর তুলনায় নিম্নজাতির (সদ্‌গোপ) ছিলেন। শশীপদ-বাবুকে এই বিবাহের জন্য নানা সামাজিক উৎপীড়ন সহ্য করতে হয়। তাঁর প্রতিবেশীরা তাঁর সঙ্গে পানাহার ত্যাগ করেন এবং তাঁর বাসগৃহেরও ক্ষতি করা হয়। জাতিভেদ প্রথার বিরোধী তৃতীয় আইনটি হচ্ছে ১৮৭২ খ্রিস্টাব্দের Special Marriage Act বা Act III of 1872। এই আইনে বলা হয় যে, যে-কোনো জাতি বা ধর্মের কোনো প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ বৈধভাবে অন্য যে-কোনো জাতি বা ধর্মের কোনো নারীর পাণিগ্রহণ করতে পারবে, যদি তারা এই বিবাহকে আইনত নথিভুক্ত (register) করে এবং ওই সঙ্গে প্রকাশ্যে ঘোষণা করে যে তারা হিন্দুধর্ম, ইসলাম, খ্রিস্টধর্ম বা ওই ধরনের কোনো প্রচলিত ধর্মমতে বিশ্বাস করে না। প্রধানত কেশব সেনের অনুগামীদের চেষ্টাতে এই আইনটি গৃহীত হয়। ব্রাহ্মরা এ ধরনের অসবর্ণ বিবাহ অশাস্ত্রীয় পদ্ধতিতে সম্পন্ন করছিলেন, সমাজের চক্ষে সেগুলির বৈধতা প্রতিপালনের জন্যই এ ধরনের আইনের প্রয়োজন হয়েছিল। কিন্তু দেবেন্দ্রনাথ প্রমুখ আদি ব্রাহ্মসমাজের নেতারা নিজেদের 'ধর্মহীন' বলে ঘোষণা করে বিবাহ করাটা আদৌ সম্মানজনক বলে মনে করেননি। বিবাহ ব্যাপারটি এর ফলে একটি ধর্মীয় সংস্কার থেকে সামাজিক চুক্তিতে পরিণত হয়। ১৮৭২ খ্রিস্টাব্দের পরে যতগুলি ব্রাহ্ম বিবাহ হয়েছিল (আদি ব্রাহ্মসমাজের গণ্ডির বাইরে) তার প্রায় সবকয়টিই এই 'তিন আইনের' শর্ত অনুসারে। ১৮৭২ খ্রিস্টাব্দের আইনে মেয়েদের বিবাহের ন্যূনতম বয়স ধার্য হয়েছিল ১৪ বৎসর এবং ছেলেদের ১৮ বৎসর। কিন্তু কেশব সেন নিজেই এই শর্ত লঙ্ঘন করে কোচবিহারের নাবালক মহারাজার সঙ্গে তাঁর জ্যেষ্ঠা কন্যার বিবাহের আয়োজন করেন তেরো বৎসর বয়সে। এর ফলে কেশব সেনের সঙ্গে তাঁর অনুগামীদের বিরোধ বাধে এবং শিবনাথ শাস্ত্রী, আনন্দমোহন বসু ও দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের মতো প্রগতিশীল ব্রাহ্মেরা কেশবের ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ থেকে বেরিয়ে এসে ১৮৭৮ খ্রিস্টাব্দের মে মাসে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা করেন।

সব শেষে ১৮৯১ খ্রিস্টাব্দের Age of Consent Act বা সহবাস সম্মতি আইনের উল্লেখ করা প্রয়োজন। উনবিংশ শতাব্দীতে বাংলা দেশে উচ্চ বর্ণের হিন্দুসমাজে মেয়েদের বিবাহের বয়স ছিল ৫/৬ থেকে ৯/১০ বৎসরের মধ্যে। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের দৃষ্টি এদিকেও আকৃষ্ট হয়েছিল এবং ১৮৫০ খ্রিস্টাব্দে *সর্বশুভকরী পত্রিকা*-এর প্রথম সংখ্যায় (ভাদ্র, ১৭৭২ শকাব্দ) বাল্যবিবাহের দোষ দেখিয়ে তিনি একটি সুদীর্ঘ রচনা প্রকাশ করেন। ১৮৯১ খ্রিস্টাব্দের আইনে কার্যত মেয়েদের বিবাহের ন্যূনতম

বয়স দশ বৎসর ধার্য করা হয়। বঙ্কিমচন্দ্র পরোক্ষভাবে এই আইনের প্রস্তাবিত ব্যবস্থাকে সমর্থন করেন এবং মেয়েদের বিবাহের ন্যূনতম বয়স আরও দু-বৎসর বাড়ানো যেতে পারে বলে মন্তব্য করেন। কিন্তু কলকাতার শিক্ষিত হিন্দুদের মধ্যেও এই আইনের বিরুদ্ধে এক তুমুল আন্দোলন শুরু হয়ে যায়। নানাস্থানে সভাসমিতির আয়োজন করে আইনের বিরুদ্ধে জনমত গঠনের চেষ্টা করা হয় এবং লজ্জার বিষয় এইসব সভাসমিতিতে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বহু স্নাতকের, এমনকি আইনবিদ ও চিকিৎসকদের উপস্থিতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। মেয়েদের বাল্যবিবাহ বন্ধ হয়ে গেলে হিন্দুদের জাতিভেদ প্রথা ও যৌথ পরিবার ব্যবস্থা ভেঙে যাবে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করা হয়। এইসব প্রতিবাদ অগ্রাহ্য করে Age of Consent Act গৃহীত হয়, সত্য, কিন্তু এই আইনকে অবিলম্বে সারা দেশে কার্যকরি করা সম্ভব হয়নি। এই চারটি আইন ছাড়াও ব্রিটিশ শাসনব্যবস্থায় সারা দেশে ফউজদারি আইনের সমতা আনা হয় এবং জাতি-পঞ্চায়েতগুলির বিচারবিভাগের ক্ষমতা লোপ করা হয়। ব্রিটিশ সরকার যে স্বেচ্ছায় ভারতীয় প্রজাদের মঙ্গলবিধানের জন্য জাতিভেদ প্রথাকে খর্ব করার চেষ্টা করেছিলেন তা নয়, কিছুটা সাম্রাজ্যের প্রশাসনিক ব্যবস্থার সুবিধার জন্য এবং কিছুটা নানা গোষ্ঠীর চাপে ও আন্দোলনের ফলে তাঁরা উপরে উল্লিখিত আইনগুলি গ্রহণ করেন। তবে আইন গ্রহণ করলেও সমাজে সেগুলি অবিলম্বে বলবৎ করা সব সময় সম্ভবপর হয়নি। সাম্রাজ্যবাদী শাসকগোষ্ঠী স্বভাবতই শাসিতদের সমাজে এমন কোনো আলোড়ন সৃষ্টি করতে চাননি। যার ফলে তাঁদের প্রশাসন ব্যবস্থার ভিত্তি শিথিল হয়ে যায়। তা ছাড়া ব্রিটিশ সমাজেও এই সময়ে অভিজাত ও সাধারণ লোকের মধ্যে দুস্তর সামাজিক ব্যবধান ছিল। সুতরাং ভারতে জাতি-বৈষম্য তাঁদের দৃষ্টিতে সহনীয় বলেই মনে হয়।

বাঙালির ব্যাবসাদারি

নজরুল ইসলাম

'বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মী' কথাটা যেমন দিনের মতো সত্য, 'বাণিজ্যে বসতে মিথ্যা' কথাটা তেমনই রাতের মতো অন্ধকার। শিল্প-বাণিজ্যের উন্নতি না করিতে পারিলে জাতির পতন যেমন অবশ্যম্ভাবী, সত্যের উপর ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত না করিলে বাণিজ্যের পতনও আবার তেমনই অবশ্যম্ভাবী। মদকে মদ বলিয়া খাওয়ানো তত দোষের নয়, যত দোষ হয় মদকে দুধ বলিয়া খাওয়ানোতে। দুধের সঙ্গে জল মিশাইয়া বিক্রি করিলে লাভ হয় যত, প্রবঞ্চনা করার পাপটা হয় তার চেয়ে অনেক বেশি। একটা জাতি ব্যাবসা-বাণিজ্য দ্বারা যত বড়ো হয় হউক, কিন্তু প্রবঞ্চনা বা মিথ্যার বিনিময়ে যেন তাহার জাতীয় বিশ্বস্ততা আর সুনাম বিক্রি করিয়া সে ছোটো না হইয়া বসে। ভণ্ড লক্ষপতি অপেক্ষা দরিদ্র তপস্বী ঢের ভালো! হ্যাঁ, এখন কথা হইতেছে—বাণিজ্য দ্বারা আমরা স্বজাতির নাম করিব, স্বদেশের মুখ উজ্জ্বল করিব, না—অন্য বড়ো জাতির নাম দিয়া নিজের নাম ভাঁড়াইয়া বড়ো হইয়া সেই বড়ো জাতিরই তেলা মাথায় তেল ঢালিব? কথাটা খোলসা করিয়া বলি।

আমাদের বাঙালিদের হিন্দু-মুসলমান অনেকেই ব্যাবসা-বাণিজ্যের দিকে বেশ একটু ঝোঁক দিয়েছেন, সে খুব মঙ্গলের কথা। তবে ইহার মধ্যে অমঙ্গলের কথা হইতেছে এই যে, ইহাদের অনেকেই নিজের বা স্ব-জাতির নাম ভাঁড়াইয়া ইংরেজি নামে নিজের নূতন নামকরণ করিতেছেন! কী সুন্দর মৌলিকতা! যিনি অতটা না করেন, তিনি আবার নিজের পৈতৃক নামটাকে বিপুল গবেষণার সহিত বহু কসরত করিবার পর এমন একটি অস্বাভাবিক অশ্বডিম্বে পরিণত করিয়া বসেন, যাহা আমাদের পূর্ব বা পর-পুরুষের কোনো ব্যক্তিই বুঝিতে পারিবেন না ইনি কিনি! এইরূপে কৃষ্ণকে ক্রিস্টো রূপে বাজারে বসাইয়া কতটা সুবিধা হয় জানি না, কিন্তু আমাদের বিশ্বাস, ইহাতে অসুবিধাটাই হয় বেশি। শুনিয়াছি, এই রকম কালা চামড়ায় সাদা পালিশ বুলাইলে নাকি দুই-এক জন শ্বেতদ্বীপবাসী বা বাসিনী ভুলক্রমে ওই দোকানে গিয়া উপস্থিত হন এবং তাহাদের মধ্যে যাঁহারা আসল ব্যাপার

বুঝিতে পারেন না, তাঁহারা সন্তুষ্টচিত্তেই সওদা করিয়া চলিয়া যান, কিন্তু এই প্রতারণা ধরা পড়িলে যে আবার অনেকে মুখের উপরেই দোকানদারকে প্রবঞ্চক ভণ্ড বলিয়া মধুর সম্ভাষণে আপ্যায়িত করেন, এটাও সত্য! অনেকে ভদ্রতার খাতিরে বাহিরে কিছু না বলিলেও মনে মনে দেশীয় দোকানদারের এই ক্ষুদ্রত্বের নিন্দা না করিয়া পারেন না। আর নাম ভাঁড়াইয়া কোনো কাজ করিবার পর আসল নামটা প্রকাশ হইয়া গেলে কেহ যদি মুখের উপরেও গালাগালি করে, তাহা নির্বিকার চিত্তে হজম করা ভিন্ন কোনো উপায় থাকে না। কিন্তু দ্বারে আসল নামটাও লেখা থাকিলে অন্তরের বাহিরের এসব কোনো বিড়ম্বনাই আর সহ্য করিতে হয় না। তা ছাড়া, এইরকম কালার গায়ে সাদার দাগ লাগাইয়া লাভও যে খুব বেশি হয় তাহা আমরা কিছুতেই বিশ্বাস করিতে পারি না। কারণ ইহাতে এইরকম দোকানদারগণ যেমন দুএকটি বিদেশি খরিদ্দার পান, তেমনই আবার অনেকগুলি স্বদেশি খরিদ্দারও হারান। কেননা আমাদের দেশের শহরের সোজা বা পাড়াগাঁয়ের ভদ্র মাঝারি লোকে সহজে সাহেবের দোকান মাড়াইতে চান না। ইঁহাদের কেহ-বা ওসব বিজাতীয় হ্যাঙ্গামের মধ্যে যাইতে চান না, কেহ-বা স্বদেশি দোকানেই জিনিস কিনিতে ভালোবাসেন, আবার কেহ-বা নানান দিক দিয়া নিজের দীনতা ধরা পড়িবার ভয়ে ওসব দোকানে যান না।

আমাদের অনেক দেশীয় লোকের আবার একটা ধারণা এই যে, সাহেবের দোকানের জিনিসের দাম দেশীয় দোকানের চেয়ে অনেক বেশি। কাজেই বেশি দামে দুই-চারিটা জিনিস সাহেবদের বিক্রি করিতে পারিলেও অন্য দিক দিয়া এসব দোকানের অনেক ক্ষতি। সাহেব খরিদ্দারগণ বেশি দামে দামি জিনিস কিনিলেও তাঁহারা সংখ্যায় কম। সে অনুপাতে কম-দামি জিনিসের ক্রেতা বহু দেশীয় লোকের অপেক্ষা বেশি টাকার জিনিসও দোকানে বিক্রি হয় না। অথচ; যদি দেশীয় দোকানদার বাণিজ্যে পসার করিয়া একবার সুনাম অর্জন করিতে পারেন, তাহা হইলে বহু বিদেশি বা সাহেব-খরিদ্দার আপনিই জুটিয়া যাইবে। এই ধরুন আমাদের বটকৃষ্ণ পালের কথা। ইনি অনায়াসেই নিজের পৈতৃক নাম কাটছাঁট করিয়া অন্তত 'মন্টোক্রিস্টো পল' হইতে পারিতেন। কিন্তু তাহাতে তাঁহার ব্যবসায়ে যদিই-বা পসার হইত, কিন্তু সকলের নিকট এত নাম হইত না এবং আমরা গর্বের সহিত এক জন বাঙালি ব্যবসায়াভিজ্ঞ লোকের নাম যেখানে-সেখানে উদাহরণস্বরূপ পেশ করিতেও পারিতাম না। বেনামিতে যে দু এক জন বাঙালি ব্যালসাদার বেশ একটু পসার করিয়াছেন, তাঁহাদের আমরা বাঙালি বলিতে সংকোচ করি, লজ্জা হয়। কেননা তাঁহারা নিজেই সর্বপ্রথমে নিজের বাঙালিত্ব অস্বীকার করিয়াছেন। কাজেই ইঁহারা হইয়া পড়িয়াছেন বাদুড়ের মতন— না পাখি, না পশু!

তাহা ছাড়া, ইহা আত্ম-প্রবঞ্চনা নয় কি? ইহাতে নিজেকে, দেশকে, জাতিকে ছোটো করিয়া দেখা হয় না কি? নিজের কৃতিত্বে, দেশের লোকের সুনামে, জাতির আত্মবিশ্বাসে আমাদের নিজের লোকেরাই কত বেশি হেয় ক্ষুদ্র ধারণা পোষণ করে, ইহাই তাহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। কেন, আমরা কি জগতের এতই ঘৃণ্য অস্পৃশ্য জীব যে, আমাদিগকে আমাদের নিজ সত্যিকার পরিচয় লুকাইতে হইবে? আমরা কি এতই অমানুষ এবং যাহাদের নামের দৌলতে এই জঘন্য অর্থলাভ তাহারাই কি এত মস্ত মানুষ? দেখিয়াছি,

অনেকে তথাকথিত নীচ বংশে জন্ম বলিয়া নিজের পিতৃপুরুষের পরিচয় গোপন করে, কিন্তু তবু সে শান্তি পায় কি? লোকে তাহার এই মিথ্যা মুখোশে বরং আরও টিটকারি দেয় না কি? সে নিজের অন্তরেই নিজে লজ্জাতুর ছোটো হইয়া যায় না কি? তাহার চেয়ে তাহার গৌরব করিবার ছিল, যদি সে বুক ফুলাইয়া তাহার পিতৃপুরুষের পরিচয় দিয়া নিজের কৃতিত্বে আপন মনুষ্যত্বের উপর দাঁড়াইয়া বলিতে পারিত যে, জন্মটা কিছুই নয়—পুরুষকারই হইতেছে আসল জিনিস। তাহাতে তাহার নিজের অন্তরেও সে বল পাইত, আনন্দ পাইত এবং অন্যেও তাহার নির্ভীকতার, মনুষ্যত্বের কাছে সসম্মানে মাথা নত করিত। আমরা আজ ভারতে এক অখণ্ড জাতি গড়িয়া তুলিতে চলিতেছি, আর আজও যদি আমাদের আত্মসম্মান না জাগে—আজও যদি আমরা আত্মবিশ্বাসে ভর করিয়া নিজের মনুষ্যত্বের ও পুরুষকারের জোরে মাথা উঁচু করিয়া বিশ্বের মুক্ত-পথে চলিতে না পারি, তবে আমাদের জাতি-গঠন তো দূরের কথা, মুক্ত-দেশের অন্যে একথা শুনিলে মাথায় টোক্কর লাগাইয়া বলিয়া দিবে যে, আগে মাথা উঁচু করে চলতে শেখো।

যাহা হইয়া গিয়াছে তাহা এখন অপরিবর্তনীয়, কিন্তু যাঁহাদের সাহস আছে, আত্মসম্মান আছে, জাতিকে যিনি বড়ো করিয়া দেখিতে পারেন, তাঁহার উচিত এখ্‌খুনিই এ মিথ্যা মুখোশটাকে দূর করিয়া ফেলিয়া আবার নতুন করিয়া নিজের বিশ্বাসে নিজের কৃতিত্ব, কর্মকুশলতা ও পৌরুষের পুঁজি লইয়া ব্যাবসাক্ষেত্রে দাঁড়ানো। তাহাতে তাঁহার নাম, তাঁহার দেশের নাম, তাঁহার জাতির নাম। আর সবচেয়ে বড়ো জিনিস তাঁহার নিজের অন্তরের শান্ত পূত মহাতৃপ্তির, অপূর্ব আত্মপ্রসাদের বিপুল গৌরব।

এই জাতীয়তার যুগে, এই নিজেকে সত্য বলিয়া জানার সাহসী কালেও ওই পুরোনো বিশ্রী অভিনয়ের হেয় অনুকরণ হইতেছে বলিয়া আমরা এত কথা বলিলাম। ডোম যদি ডোম বলিয়া সসংকোচে পথ ছাড়িয়া আমাকে দীর্ঘ গোলামি সালাম ঠোকে, তাহা হইলে স্বতই তাহার প্রতি আমার একটা উঁচুনিচুর ভাব আসে, কিন্তু সে যদি ডোম বলিয়া পরিচয় দিয়া সহজ হইয়া আমার পথে মানুষের মতো দাঁড়াইতে পারে, তাহা হইলে বাহিরে আমি অভ্যাসবশত যতই ক্ষুব্ধ হই, অন্তরে তাহার আত্মসম্মান ও মনুষ্যত্ব জ্ঞানকে প্রণাম না করিয়া থাকিতে পারি না। সমাজ বা জন্ম লইয়া এই যে বিশ্রী উঁচুনিচু ভাব তাহা আমাদিগকে জোর করিয়া ভাঙিয়া দিতে হইবে। আমরা মানুষকে বিচার করিব মনুষ্যত্বের দিক দিয়া, পুরুষকারের দিক দিয়া। এই বিশ্ব-মানবতার যুগে যিনি এমনই করিয়া দাঁড়াইতে পারিবেন, তাঁহাকে আমরা বুক বাড়াইয়া দিতেছি—তাঁহাকে নমস্কার করি।

হ্যাঁ,— ব্যক্তিত্বের দিক ব্যতীত দেশীয় লিমিটেড কোম্পানিগণও তাহাদের ম্যানেজিং এজেন্টের কল্পিত ইংরেজি নাম রাখিয়া লোকের চক্ষে ধূলা দিতেছেন। কী বিশ্রী প্রতারণা! কী ঘৃণ্য অধঃপতন।

আজ আমরা তাঁহাকেই ভাই বলিয়া আলিঙ্গন করিব, তাঁহারই পায়ের ধূলা মাথায় লইব,—তিনি মুচি, ডোম, হাড়ি, যেই হউন—যিনি মহাবীর কর্ণের মতো উচ্চশিরে সর্বসমক্ষে দাঁড়াইয়া বলিতে পারিবেন, 'আমি সূতপুত্রই হই আর যেই হই, আমার পুরুষকারই আমার গৌরব, আমার মনুষ্যত্বই আমার ভূষণ!'

উৎস : *নজরুল রচনা সম্ভার—৩য় খণ্ড।*

শুভ উৎসব

বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর

পাশ্চাত্য সভ্যতার সংঘর্ষে আর যাহাই হউক, আমাদের পুরাতন বিচিত্র উৎসবকলা যে ক্রমশ বিলুপ্ত হইতে বসিয়াছে, সে বিষয়ে আর কোনো সন্দেহ নাই। দোল দুর্গোৎসবেই কী, বার ব্রত অনুষ্ঠানাদিই কী, আর জাতকর্ম অন্নপ্রাশন বিবাহাদি সংস্কারগুলিই বা কী, অল্পদিন মধ্যে আমাদের সকল ক্রিয়াকর্মেই যেন কী একটি পরিবর্তন শুরু হইয়াছে— প্রাচীনকালে ইহার মধ্যে যে শুভ আনন্দটুকু ছিল, তাহা বুঝি আর থাকে না, ইহার ব্যাপক সর্বজনীন ভাব সংকুচিত হইয়া গিয়া ক্রমশ ইহা ব্যক্তিবিশেষের সমারোহময়ী তামসিকতামাত্রে আসিয়া না পরিণত হয়। কারণ, আমাদের দেশে, সমাজবন্ধনগুণেই হউক বা লোকের প্রকৃতিগুণেই হউক, উৎসবমাত্রেই চতুষ্পার্শ্বের সর্বসাধারণের যেন একটি চিরন্তন অধিকার ছিল; আমার গৃহের পূজাপার্বণে, আমার পারিবারিক সকল শুভ কর্মে কেবলমাত্র আমি এবং আমার গৃহিণীর নিকটসম্পর্কীয়গণ নহে, কিন্তু নিকটস্থ সমস্ত গ্রামের, চতুষ্পার্শ্বস্থ সমস্ত পল্লির অন্তরে উৎসব ঘনীভূত হইয়া আসিত, এবং সকলেরই মনে হইত, যেন তাহার নিজের বাড়ির কাজ। এক্ষণে নবাগত সভ্যতা ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্য রক্ষাচ্ছলে আত্মপরের মধ্যে ব্যবধান ক্রমশই দুরতিক্রমণীয় করিয়া তুলিতেছে— আমরা সকল অধিকার আইনের পাকা মাপকাঠির সাহায্যে নূতন করিয়া বুঝিতেছি; সুতরাং হৃদয়ের কাঁচা সরস সম্বন্ধ অক্ষুণ্ণ রক্ষা করা অনেক স্থলেই অত্যন্ত কঠিন হইয়া উঠিতেছে। ফলে যেসকল উৎসবকলা হৃদয়ের তাপে এত দিন সজীব ও নবীন ছিল, হৃৎপিণ্ডের রক্তপ্রবাহ হইতে বঞ্চিত হইয়া সেগুলি ক্রমশ মৃত্যুর মতো হিমপাণ্ডু হইয়া আসিতেছে। এবং এই মৃত্যুহিমবিবর্ণতাটুকু ঢাকিবার জন্যই বাহিরের সাজসজ্জা ও সমারোহবাহুল্য অনিবার্য হইয়া উঠিতেছে।

কিন্তু মুখরাগলেপনে স্বাভাবিক স্বাস্থ্যের তপ্ত লাবণ্যসঞ্চারচেষ্টার মতো উৎসবশ্রী-সম্পাদনে এই সমারোহাড়ম্বর সম্পূর্ণ নিষ্ফল। উৎসবের সহস্র চঞ্চল আলোকরশ্মি জনতার চিন্তাক্লিষ্ট ললাটে ও উৎসাহহীন ম্লান মুখে প্রতিফলিত হইয়া অবসাদের শীর্ণ মূর্তিখানিই ক্ষণে ক্ষণে প্রকাশ করিয়া দেয়। পূর্বে হৃদয়ের সম্বন্ধাধিকারে যখন আইনের এত চুলচেরা সূক্ষ্ম বিভাগ ছিল না, একের উৎসব তখন

সহৃদয়তাগুণে দশের হইয়া উঠিত। উদ্যোগপর্বের ভারও তখন পাঁচ জনের মধ্যে স্বেচ্ছায় বণ্টন করিয়া দেওয়া হইত এবং উত্তরকাণ্ডেও সকলের সমবেত যত্ন চেষ্টা উৎসাহ আনন্দে উৎসবকলা সর্বাঙ্গ সম্পূর্ণ হইয়া উঠিত। নব্যতন্ত্রের নাগরিক অধিকার অনধিকার বিধি তখনও হয় নাই— সুতরাং আমার কাজে খাটিয়া দিতে পাঁচ জনের অনধিকার সংকোচ বোধ হইত না এবং নিজের কাজের ভার পাঁচ জনের উপর চালাইয়া দিতে এ পক্ষেরও কোনোরূপ দ্বিধা মনে আসিত না। কেহ আটচালা নির্মাণকার্য পরিদর্শনে নিযুক্ত হইত, কেহ দীপ জ্বালাইবার ব্যবস্থা করিত, কেহ কদলীপত্র সংগ্রহ করিয়া আনিত, কেহ কটিবন্ধ দৃঢ়রূপে আঁটিয়া পরিবেশনে লাগিয়া যাইত, কেহ- বা ক্রমাগত ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইত, কেহ বসিয়া বসিয়া কেবল পরামর্শ সরবরাহ করিত, নিতান্ত কোনো কাজ না পাইলে ডাকহাঁক ও মোড়লি করিয়া লোকে নিজের একটা কর্ম গড়িয়াও লইত। এইরূপে নিশ্চেষ্ট ঔদাস্যভরে দেখিবার অবসর না পাওয়ায় এবং উৎসবসৌষ্ঠব সম্পাদনবিষয়ে কথঞ্চিৎ নিজ হস্ত উপলব্ধি করিয়া সকলেই আপনাকে ইহার একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গরূপে অনুভব করিতে পারিত। এবং ইহা হইতেই একের উৎসব সাধারণের হইয়া সমধিক সরস ও সজীব হইয়া উঠিত, এবং বৃহৎ সমাজের সর্বাঙ্গ একটি অখণ্ড সৌষ্ঠবলাভে সমধিক মনোজ্ঞ সৌন্দর্যে প্রতিভাত হইত।

এক্ষণকার উৎসবগুলি কিন্তু ক্রমশই যেন আপিসি ছাঁচে গঠিত হইয়া উঠিতেছে— তাহার মধ্যে দেনাপাওনা হিসাবপত্রের হাঙ্গামা যত অধিক, আনন্দ আর সে পরিমাণে নাই। পূর্বে যে দেনাপাওনার সম্বন্ধ আদৌ ছিল না তাহা নহে, এবং হয়তো সূক্ষ্মরূপে বিচার করিয়া দেখিলে আর্থিক সম্বন্ধ তখনও এখনকার মতো প্রবল ছিল, কিন্তু অন্যপ্রকার সম্বন্ধের আবরণে এই হিসাবি সম্বন্ধটা তখন কোথাও বড়ো প্রবল হইয়া আত্মপ্রকাশ করিবার অবসর পাইয়া উঠে নাই। ব্রাহ্মণ ফলাহারের পর দক্ষিণা না লইয়া বাড়ি ফিরিতেন না, কিন্তু দাতা-গ্রহীতার মধ্যে এমন একটি মধুর সম্বন্ধবন্ধন ছিল যে, দক্ষিণার আর্থিকতা তাহার মধ্যে স্থান পাইত না। নাপিত ক্ষৌরকার্য সারিয়া যে রিক্তহস্তে গৃহে ফিরিত তাহা নহে, সেকালে বরঞ্চ পাওনাগণ্ডা এখনকার অপেক্ষা অনেক বেশিই ছিল, কিন্তু নাপিতের সহিত সম্বন্ধ এমনই, যেন সে বিনা অর্থেও ক্ষৌরকার্য সম্পাদন করিয়া যাইত এবং উক্ত কার্য না করিলেও কর্তা তাহাকে অর্থসাহায্য করিতেন। কুম্ভকার শুভ কার্যের দিনে গুটিকতক চিত্রিত নূতন ভাণ্ড আনিয়া না দিলে যেন কর্মই বন্ধ হইয়া থাকে, পয়সা দিয়া বাজার হইতে কিনিয়া আনিলে উৎসবের অঙ্গহানি হয়। সকলেরই সঙ্গে আমাদের এইরূপ একপ্রকার আত্মীয়তাবন্ধন— এবং উৎসবাদিতে এই আত্মীয়তাটুকু যেন সম্যক স্ফূর্তিলাভের অবসর পায়। সেইজন্যই মন্ত্রপাঠের ব্রাহ্মণ হইতে শুরু করিয়া কামার কুমার ধোপা নাপিত হাড়ি ডোম পর্যন্ত যে যেখানে আছে, সকলেরই নিজ নিজ মর্যাদানুসারে উৎসবাঙ্গে স্থান নির্দিষ্ট আছে— কাহাকেও বাদ দিলে চলে না।

কিন্তু এখন ইংরেজি পণ্যশালার অনুগ্রহে যান্ত্রিকভাবেই অনেক কার্য নিঃশব্দে সমাধা হইয়া উঠে। এক কলমের আঁচড়ে হ্যারিসন হ্যাথারে, হোয়াইট্যাওয়ে লেড্‌ল, অস্‌লর, ল্যাজারাসের ভবন হইতে যাহা-কিছু আবশ্যক— আনাইয়া লওয়া যায়, এমনকি, নাপিত পাচক পরিবেশকাদিও সংগ্রহ করিতে বিলম্ব হয় না। কিন্তু আমাদের পণ্যক্রিয়ার মধ্যে সজীব সহৃদয় মনুষ্যত্বের মধুর সংস্পর্শে যে একটি নিগূঢ় আনন্দ ছিল, ইহাতে সেটুকু দিতে পারে না স্বীকার করিতে হয়।— তখনকার দিনে বড়োলোকের বাটীতে কোনো ক্রিয়াকর্মোপলক্ষে মাসেক কাল পূর্ব হইতে নানাবিধ পণ্যভার লইয়া দোকানি পসারিরা গতিবিধি শুরু করিত। শালওয়ালা ভালো ভালো কাশ্মীরি শাল ও রুমাল লইয়া আসিত, মুর্শিদাবাদ ও ঘাটাল অঞ্চলের বণিকেরা নানাবিধ গরদ তসর ও রেশমি বস্ত্র আমদানি

করিত, ঢাকা শান্তিপুর ফরাসডাঙা সিমলার ব্যাপারীরা কত প্রকারের সূক্ষ্ম ও বিচিত্রপাড় কার্পাসবস্ত্র এবং পশ্চিমি ক্ষেত্রীরা বেনারসি ও চেলির জোড় লইয়া উপস্থিত হইত। এতদ্ভিন্ন, স্বর্ণকার কর্মকার মালাকার ময়রা গোয়ালা পাথরওয়ালা কাংস্যপিত্তলবিক্রেতা নানান জনে নানাবিধ ফরমাশে নিত্য গতায়াত করিত। এমনকি, বেদানার বস্তা লইয়া বিদেশি কাবুলিওয়ালা পর্যন্ত বাদ যাইত না। কিন্তু এ গতিবিধি নিতান্তই বাহিরের লোকের মতো ছিল না। এবং এই খরিদবিক্রয়টুকুর মধ্যেই তাহাদের সমস্ত সম্বন্ধ শেষ হইয়া যাইত না। সকলেই উৎসাহ-সহকারে উৎসবের নানাবিধ অনুষ্ঠান বিষয়ে পাঁচটা প্রসঙ্গ উত্থাপন করিত, মন্তব্য দিত, প্রশ্ন করিত, কোথায় কী হইবে না হইবে, দেখিয়া শুনিয়া ঘুরিয়া বেড়াইত, কাজের দিনে বাড়ির ছোটো ছোটো ছেলেপুলেগুলিকে লইয়া উৎসব দেখিতে আসিত, এবং পুরাতন কাবুলিওয়ালা তাহার শখের জরির কোর্তা গায়ে দিয়া প্রসন্নমুখে দ্বারদেশে আসিয়া প্রহরী হইয়া দাঁড়াইত। নিতান্ত জড় বিনিময় মাত্র না হইয়া আমরা তাহাদের পণ্যসামগ্রীর সহিত অন্তরের শুভ প্রীতিও অনেকখানি করিয়া লাভ করিতাম, এবং মুদ্রাখণ্ডের সহিত উৎসবের ভাগও কতক পরিমাণে দিতাম। এই যে অন্তরে অন্তরে 'ফাউ' আদানপ্রদানটুকু, ইহাতেই আমাদের বিশেষ আনন্দ। এবং এইটুকুর জন্যই আমাদের মধ্যে আর্থিক সম্বন্ধে হীনতা সহজে দেখা যায় না।

কেবলই যে বাহিরে বাহিরে এইরূপ গতিবিধি ও আদানপ্রদান ছিল, তাহাও নহে। অন্তঃপুরে কুম্ভকারপত্নী নূতন বরণডালা সাজাইয়া আনিয়া দিত, মালিনী নিত্য নব নব ফুলভার জোগাইত এবং ফুলসজ্জার জন্য নূতন নূতন ফুলের গহনা প্রস্তুতের ব্যবস্থা করিত, নাপিতানি দিদিঠাকুরানি ও বধূঠাকুরানিদিগের কোমল পদপল্লবে ঝামা ঘষিয়া আলতা পরাইয়া দিয়া যাইত, তাঁতিনি নূতন নূতন পাড়ের মনোহারিণী নীলাম্বরি ও বিচিত্র বর্ণের শাটিকা লইয়া আসিত, গোয়ালিনি মধ্যাহ্নভোজনান্তে, আর কিছু না হউক, গোয়ালপাড়ার দুইটা মন্তব্য শুনাইয়া যাইত, এবং পাড়ার বৃদ্ধা ব্রাহ্মণঠাকুরানি স্বহস্তকর্তিত কয়গাছি পইতার সুতা আনিয়া দিয়া পা ছড়াইয়া গল্প করিতে বসিতেন। এই এতগুলি বর্ষীয়সী ও যুবতিগমাগম যে নিতান্ত যান্ত্রিকভাবে সাধিত হইত না, সে কথা বলাই বাহুল্য। হাস্যপরিহাস গল্পগুঞ্জন সমালোচনা বিধিব্যবস্থা নির্ধারণ ও নানা অনাবশ্যক উপদেশ পরামর্শ ও বিচার প্রসঙ্গে বয়স ও অবস্থার তারতম্য ঘুচিয়া গিয়া সকলের মধ্যে সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠ ও সরস হইয়া উঠিত— দেনাপাওনার সম্বন্ধটুকু আদৌ প্রকাশ পাইত না। সকলেই যেন আত্মীয়পরিজনবর্গের মধ্যে যেন একটি বৃহৎ একান্নবর্তী পরিবারের নানা অঙ্গ।

এইরূপে আমাদের প্রত্যেকের কোনো শুভানুষ্ঠানের মধ্যে অলক্ষিতে এই এতগুলি লোকের শুভকামনা কার্য করে। এবং ইহাতেই আমাদের সামান্য ক্রিয়াকর্মও বৃহৎ উৎসবে পরিণত হয়। নব্যতন্ত্র রজতচক্রকে যেরূপ সকল সম্বন্ধের মধ্যবিন্দু করিয়া তুলিতে চাহে, তখন তাহা ছিল না। ধনের পদমর্যাদা যথেষ্ট থাকিলেও কুলের গৌরবকে প্রীতির সম্বন্ধকে সে লঙ্ঘন করিতে পারিত না। এমনকি, বেতনভুক সামান্য দাসদাসীদিগকেও সংসারের একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গরূপে দেখা হইত, এবং সুগৃহিণী ইহাদের কেহ ক্ষুধিত থাকিতে নিজের মুখে অন্ন তুলিয়া দিতে কুণ্ঠিত হইতেন। এই যে হৃদ্যতাটুকু— এই যে ব্যথার ব্যথী ভাব— ইহা আর কিছুতেই থাকে না। পরিজনবর্গের সহিত পূর্বের মতো একসংসারভুক্ত অবশ্যপোষ্য সম্বন্ধ ঘুচিয়া গিয়া বিদেশি ইংরেজের দৃষ্টান্তে কেবলমাত্র কাজ আদায় ও বেতনদানের সম্বন্ধই দিনে দিনে বদ্ধমূল হইয়া উঠিতেছে। এমনকি, পাকা নব্যতন্ত্রীগণের নিকট সে কালের মাঠাকুরানি দিদিঠাকুরানি প্রভৃতি সম্বন্ধসূচক সম্বোধনগুলি পর্যন্ত বিরক্তিকর হইয়া উঠিয়াছে।

এইসকল সামান্য পরিবর্তন হয়তো আমাদের দৈনন্দিন জীবনের অতি তুচ্ছ ঘটনা, এবং উৎসব প্রসঙ্গে এসকল তুচ্ছ বিষয়ের উত্থাপন না করিলেও চলিত, কিন্তু ইহাতে এইটুকু অন্তত বুঝা যায় যে, পূর্বে যেখানে প্রীতিসূচক আত্মীয়তাই স্বাভাবিক ছিল, এক্ষণে সেখানে নিকট সম্বন্ধ স্থাপনই অনেক সময় অত্যন্ত অশোভন ও অসংগত বলিয়া ঠেকে। আশ্রিত জন এক্ষণে পূর্বের ন্যায় হৃদয়ের আশ্রয় আর বড়ো পায় না, এবং আশ্রয়দাতাও তাহাদের হৃদয়ের অধীশ্বরত্ব হইতে বঞ্চিত হয়েন। অন্তরে অন্তরে কাহারও সহিত কাহারও কোনোরূপ অনিবার্য যোগ নাই।

আমাদের উৎসবে এই অন্তরেরই প্রথম প্রতিষ্ঠা। সমারোহ-সহকারে আমোদপ্রমোদ করায় আমাদের উৎসবকলা কিছুমাত্র চরিতার্থ হয় না, কিন্তু তাহার মধ্যে সর্বজনের আন্তরিক প্রসন্নতা ও শুভ ইচ্ছাটুকু না থাকিলে নয়। উৎসবপ্রাঙ্গণ হইতে সামান্য ভিক্ষুকও যদি ম্লানমুখে ফিরিয়া যায়, শুভ উৎসব যেন একান্ত ক্ষুণ্ন হয়। যাত্রা হউক, কথা হউক, রামায়ণগান হউক বা চণ্ডীপাঠ হউক, যখন যাহা হয়, উন্মুক্ত গৃহপ্রাঙ্গণে আসিয়া সর্বসাধারণে তাহাতে অকাতরে যোগদান করে, এবং সকলের সহিত একত্র হইয়া গৃহকর্তা তাহা উপভোগ করেন।

কেবলই যে বড়ো বড়ো পূজাপার্বণে এই বিধি তাহা নহে, ছোটোখাটো বারব্রত যে-কোনো অনুষ্ঠানেই এই শুভ ভাবটি রক্ষণীয়। এবং অনুষ্ঠানের সংখ্যাও নিতান্ত কম নহে। আজ পূজা, কাল ব্রত, পরশু গঙ্গাস্নানের যোগ, অন্য দিন কোনো শুভ তিথি বা বারমাহাত্ম্য, কখনও নবান্ন, কখনও পৌষপার্বণ, কোনো দিন-বা অরন্ধন, জ্যৈষ্ঠে জামাতৃ পূজন, কার্তিকে ভ্রাতৃদ্বিতীয়া, মধ্যে রাখিবন্ধন, কোনো মাসে পুত্রের বিবাহ, কোনো দিন পৌত্রের জাতকর্ম, তাহার পর জন্মতিথি, হাতেখড়ি, সাধ, সীমন্তোন্নয়ন, পঞ্চামৃত— যেন একটির পর একটি শুভ অনুষ্ঠান ও আনন্দপ্রবাহের অন্ত নাই। প্রচলিত প্রবচনে বারো মাসে তেরো পার্বণ মাত্র স্থান পাইয়াছে, কিন্তু গণনায় বোধ করি প্রতি মাসে ত্রয়োদশ সংখ্যা ছাড়াইয়া যায়। এবং কর্মকার্যের সহিত জড়িত হইয়া সকলগুলিই আমাদের শুভকর্ম। দান ধ্যান সদনুষ্ঠান ও দশ জনের সহিত আত্মীয়তা প্রকাশ ও সকলের আনন্দ বর্ধন করাই উদ্দেশ্য। একটা উপলক্ষ পাইলেই হয়।

এবং যাহাতে আমার নিজের কিছুমাত্র আনন্দ আছে, সেই আনন্দটুকু যখন দশ জনের মধ্যে বিতরণ করিতে চাহি, তখন উপলক্ষের অভাব ঘটিবার কোনো কারণ দেখা যায় না। আমার আনন্দ সকলের আনন্দ হউক, আমার শুভে সকলের শুভ হউক, আমি যাহা পাই, তাহা পাঁচ জনের সহিত মিলিত হইয়া উপভোগ করি— এই কল্যাণী ইচ্ছাই উৎসবের প্রাণ। অনেক ছোটোখাটো বিষয়েও আমি হয়তো একটুকু আনন্দ পাই, নিজের বাড়িখানি হইলে সুখী হই, পুষ্করিণীটি থাকিলে লাগে ভালো, গোরুগুলির কল্যাণ কামনা করি— গৃহপ্রবেশ, জলাশয়প্রতিষ্ঠা, গোষ্ঠাষ্টমী, এইরূপ এক-একটি উৎসব উপলক্ষে পাঁচ জন ব্রাহ্মণপণ্ডিত আত্মীয়স্বজন পাড়াপ্রতিবেশী পোষ্যপরিজন দীন দুঃখীকে আহ্বান করিয়া যথাসাধ্য সৎকারে আমার সুখের ভাগী করিতে চাহি। আমি যে আজ এক জন গৃহহীনকে আশ্রয় দিতে পারি, তৃষ্ণার্তের পিপাসা নিবারণ করিতে পারি, অবোলা জীবের কিছুমাত্র সুখবিধান করিতে সক্ষম হই, আমার এ সৌভাগ্য অন্তর যেন সকলের মধ্যে সঞ্চারিত করিয়া দিতে চাহে। সাবিত্রীব্রত, ভ্রাতৃদ্বিতীয়া, জামাতৃষষ্ঠী উপলক্ষে আপন প্রিয়জন ও স্নেহাস্পদগণকে যথাযোগ্য সৎকার করিয়া নিজেকে ধন্য মনে হয়, বিধাতা আমাকে যে এত সৌভাগ্যসুখ দিয়াছেন, ইহা সকলের সহিত বণ্টন করিয়া না লইলে ইহার সফলতা কোথায়? উৎসব ইহারই উপলক্ষ।

সেইজন্য আমাদের উৎসবে ভাবেরই প্রাধান্য— বাহিরের সমারোহ তাহার প্রধান অঙ্গ নহে। পতিব্রতা স্ত্রীর সামান্য হাতের লোহা ও মাথার সিন্দূর যেমন আমাদের মনে একটি অনির্বচনীয় লক্ষ্মীশ্রী সূচিত করিয়া দেয়, নেত্রঝলসি অলংকাররাজি তাহা পারে না, প্রীতিবিকশিত উৎসবের সামান্য মঙ্গলঘট ও চূতপল্লবগুচ্ছ সেইরূপ আমাদের অন্তরে একটি শিবসুন্দর ভাব সঞ্চারিত করিয়া তুলে, সহস্র তাড়িতালোক ও বিলাস-উৎসে সে শুভ কমনীয়তা সঞ্চার করিতে পারে না। বিলাসের মণিমুক্তা আমাদের বাহিরের ঐশ্বর্যের পরিচায়ক মাত্র, কিন্তু উৎসবের ধান্যদূর্বামুষ্টি অন্তরের অকৃত্রিম শুভকামনার বাহ্য চিহ্ন। ইহার সহিত ধনীর রত্নভাণ্ডারেরও তুলনা সম্ভব নহে। ব্রাহ্মণের যজ্ঞোপবীতের মতো ইহার মধ্যে যেন কেমন একটি অক্ষুণ্ণ শুচিতা আছে— বাহ্যাড়ম্বরবাহুল্যের সহিত তাহার কিছুমাত্র সম্বন্ধ নাই।

উৎস : *ভারতী, অগ্রহায়ণ ১৩০৫।*

বাংলাদেশ কি শিল্পালয়ের জন্য উপযুক্ত?

মহম্মদ কুদরত-এ-খুদা

অতীতের বাংলা প্রধানত কৃষিকার্যোপযোগী ছিল; আজিও অনেকে মনে করেন যে, নদীমাতৃক এই শ্যামলভূমিটি একমাত্র কৃষির উপযোগী ক্ষেত্র। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও এই বাংলার বক্ষে নানাবিধ শিল্পালয় ইতিমধ্যেই প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে ও তাহাদের অনেকগুলিই বেশ সমৃদ্ধ হইয়া উঠিয়াছে। দুঃখের বিষয় কোনো বিশিষ্ট গঠনমূলক জাতীয় পরিকল্পনা লইয়া এই শিল্পালয়গুলি স্থাপিত হয় নাই, পরন্তু যেখানে সেখানে এলোমেলোভাবে এইগুলির উদ্ভব হওয়ায় ইহাদের মধ্যে আন্তরিক যোগাযোগের অভাব রহিয়াছে। জাতীয় প্রয়োজনের কথা ভাবিয়া এইগুলিকে স্থাপন করিতে হইলে, দেখা প্রয়োজন— কাছাকাছি যাহারা অবস্থান করিবে, তাহারা যেন পরস্পরের সহায় হয়। প্রতিদ্বন্দ্বী হইলে উহাদের কোনোটিই আশানুরূপ উন্নতিলাভে সমর্থ হইবে না। এইরূপ বিবেচনার অভাব বর্তমান প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়। এইজন্যই বলিলাম যে, ইহারা কোনো জাতীয় পরিকল্পনার প্রেরণায় প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও যখন এই প্রতিষ্ঠানগুলি সমৃদ্ধ হইয়া উঠিয়াছে, তখন ইহা স্বীকার করিতেই হইবে যে, কৃষিপ্রধান বাংলার মাটিতেও শিল্পালয়ের জন্য যথেষ্ট সুবিধা বর্তমান। এইজন্যই আমরা— যাহারা বাস্তব জীবনের খুঁটিনাটির সঙ্গে বিশেষভাবে জড়িত হইয়া গিয়াছি, কবিভাবাপন্ন যুবজনের ন্যায় শিল্পালয়ের চিমনির ধূম উদ্‌গিরণের চিত্রে স্বাভাবিক সৌন্দর্যবোধ ক্ষুণ্ণ হওয়ায় পীড়িত হই না, তাহারা— শিল্পালয় প্রতিষ্ঠার কথায় আতঙ্কিত না হইয়া অনাগত বাঙালি জীবনের সুখ ও সমৃদ্ধির কথা ভাবিয়া বরং আনন্দ বোধ করি। মনে রাখা প্রয়োজন যে, কৃষি ও শিল্পকার্য পরস্পরবিরোধী নহে। ইহাদের একটি অপরের সহায়। অতএব শিল্পোন্নতি যেমন কৃষি ফলনের অধিকতর উৎপাদনের মুখাপেক্ষী, তেমনই বর্তমান যুগে শিল্পপ্রধান দেশ তাহাদের অপেক্ষাকৃত অনুর্বর জমিতে উন্নততর সার দিয়া ও আধুনিকতম লাঙল দ্বারা চাষ করিয়া আশ্চর্যরূপ অধিক ফলন ঘটাইয়াছে। পাশ্চাত্য দেশে এইরূপ উদাহরণের অভাব নাই। বাংলাদেশে ফসলের পরিমাণ ক্রমাগত প্রতি বৎসরই কমিয়া যাইতেছে। এই ক্ষতির প্রকৃত কারণ নির্ণয় করিয়া শিল্পপরিচালকের কুশলী হস্তের সাহায্যে ওই কারণগুলি নিবারণ করিয়া আমাদের

কৃষিক্ষেত্রকে অধিকতর উপযোগী করা একান্ত বাঞ্ছনীয়। কৃষিকার্যের দ্বারা বহুবিধ ফসল অধিক পরিমাণে উৎপন্ন করিতে পারিলে একাধিক শিল্পালয় গঠিত হইতে পারিবে। কাজেই আমার মনে হয় যে, প্রকৃতিদেবীর কল্যাণে ভারতের অন্যান্য প্রদেশের তুলনায় বাংলাদেশই শিল্প ও কৃষিকার্য উভয়ের জন্যই উপযুক্ত।

শিল্প নানাবিধ। প্রত্যেকটি শিল্পপরিচালন কার্যে যান্ত্রিক শক্তি ও কাঁচামালের প্রয়োজন। এই উভয়বিধ উপায়ের ব্যবস্থা না হইলে শিল্পালয় পরিচালন সম্ভব নহে। এই দ্বিবিধ উপায়ের কথা একে একে আলোচনা করিব।

প্রথমত শক্তির কথাই ধরা যউক। যান্ত্রিক শক্তি বিভিন্ন যুগে ভিন্ন রূপে উৎপাদিত হইয়াছে। মানবের ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখিতে পাই যে, আদিম যুগের অপেক্ষাকৃত অধিকতর অসহায় মানুষ নিজদেহ দ্বারা যন্ত্র-চালনা করিয়া থাকিত, আজিও সেই আদিম উপায়ই বহু ক্ষেত্রে অবলম্বিত হইতেছে। ক্রমশ দৈহিক পরিশ্রম লাঘবের উদ্দেশ্যে মানুষ হাতে বা পায়ে চালানো কল উদ্ভাবন করে। বর্তমানে কুটিরশিল্প-পরিচালনকারীদের অনেকের গৃহে এইরূপ যন্ত্র ব্যবহৃত হইতেছে। কিন্তু এইরূপ যন্ত্র সহযোগে কার্যের গতি কেবল দেহসহযোগে যাহা হইত তাহা হইতে দ্রুত হইলেও যথেষ্ট দ্রুত হইতে পারে না; শ্রমোৎপন্ন বস্তুর পরিমাণও আশানুরূপ অধিক হয় না। কাজেই কোথাও কোথাও পশ্বাদির সহযোগেও মানব দৈহিক শ্রম লাঘব করিয়া থাকে, কিন্তু এইরূপে অধিকতর কার্য সম্পন্ন হইলেও শ্রমলাঘবের উহা শ্রেষ্ঠতম উপায় নহে। এইজন্য পরে আবার স্টিম-শক্তির সাহায্য লওয়া হইল। স্টিম-শক্তি সহযোগে যেমন সুবৃহৎ রেলগাড়ি টানিয়া লইয়া যাওয়া হইতেছে, তেমনই স্টিম-এঞ্জিন শিল্পালয়ে স্থাপন করিয়া দ্রুততর বেগে শ্রমোৎপন্ন দ্রব্যের পরিমাণ বৃদ্ধি করা হইতেছে। কিন্তু বর্তমান যুগে ইহাকেও স্থানচ্যুত করিয়া বিদ্যুৎশক্তি কার্যে নিযুক্ত হইতে আরম্ভ করিয়াছে। আধুনিকতম যান্ত্রিক শক্তি বলিতে এইজন্যই আমরা বিদ্যুৎশক্তির কথাই ভাবি। এখন দেখা প্রয়োজন এই বিদ্যুৎশক্তি কি এ দেশে সহজলভ্য? অনেকেই মনে করিবেন ইউরোপ বা আমেরিকায় বিদ্যুৎশক্তি সহজলভ্য হইলেও এ দেশে উহার কথা চিন্তা করা বাতুলতার সমতুল্য হইবে। কারণ কলিকাতার ন্যায় সুবৃহৎ শহরে, যাহাকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের দ্বিতীয় নগরী বলিয়া গর্ব করা হয়, সেখানেও দুই আনা ইউনিট দরে বিদ্যুৎ পাইয়াও শিল্পালয় গঠন করা সম্ভব নহে। কাজেই বাংলাদেশের অন্যান্য শহরে আট হইতে বারো আনা পর্যন্ত ইউনিট দরে বিদ্যুৎশক্তি কিনিয়া শিল্পকার্য পরিচালনা করা যে অসম্ভব, সে কথা সকলেই বুঝিতে পারে। কিন্তু ইহা সত্ত্বেও আমার মনে হয়, বঙ্গভূমিতে বিদ্যুৎশক্তি সহজলভ্য হওয়া অসম্ভব নয়।

বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য বর্তমানে দ্বিবিধ উপায় অবলম্বিত হইয়া থাকে। প্রথম উপায় হইল স্টিম-শক্তি সহযোগে ডাইনামো ঘুরাইয়া বিদ্যুৎ উৎপাদন করা, আর দ্বিতীয়, জলশক্তি দ্বারা জল তুর্বিন ঘুরাইয়া অন্যবিধ ডাইনামো হইতে বিদ্যুৎস্রোত উৎপাদন করা। একটু চিন্তা করিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারা যাইবে যে, বাংলাদেশে প্রাকৃতিক কল্যাণে এই উভয়বিধ উপায়ই বিদ্যুৎ উৎপাদন কার্যে নিযুক্ত হইতে পারে। স্টিমের জন্য প্রয়োজন হয় পাথুরিয়া কয়লা, এবং জলশক্তির জন্য একান্ত আবশ্যক উচ্চভূমি। ইহাদের প্রথমোক্ত পদার্থটি বাংলার পশ্চিম প্রান্তে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায় এবং শেষোক্ত উচ্চভূমি সুবিস্তৃত হিমালয় পর্বতরূপে সারা বাংলার উত্তরপ্রান্তকে বেষ্টিত করিয়া বিদ্যমান রহিয়াছে।

আসানসোল ও রানিগঞ্জের কয়লার খনি হইতে প্রচুর পরিমাণে পাথুরিয়া কয়লা নিত্য উঠিতেছে। রেলযোগে ইহাকে পূর্ব পশ্চিম উত্তর দক্ষিণ চতুর্দিকে প্রেরণ করা হইতেছে। বাংলার প্রতি গৃহে আজ ইহার বহুল ব্যবহার হইতেছে। বিশেষজ্ঞেরা মনে করেন যে, উপযুক্তভাবে ব্যবহৃত হইলে এই কয়লা বহু শতাব্দী ধরিয়া বাংলাদেশের প্রয়োজন মিটাইতে পারে। কিন্তু বর্তমানে ইহার ব্যবহার প্রকৃত বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে হইতেছে না, পরন্তু নানাভাবে ইহার অপব্যয় ঘটিতেছে। প্রথমত কয়লা উত্তোলন সময়ে প্রকৃত বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির অভাববশত খনির অধিকারীগণ যে-কোনো প্রকারে কিছু কয়লা বাজারে চালাইবার জন্য বাহির করিয়া আনেন, কিন্তু ওই সঙ্গে যে বিরাট পরিমাণ কয়লার চূর্ণ খনি হইতে উত্তোলিত হয় তাহা প্রায় নষ্ট হইয়া থাকে। অথচ ইউরোপের কোনো খনিতেই এইরূপ ঘটে না। জার্মানিতে অতি নিকৃষ্ট শ্রেণির এক কয়লা পাওয়া যায় উহাকে 'ব্রাউন কয়লা' বলা হইয়া থাকে। ইহার মধ্যে দাহ্যমান পদার্থের তুলনায় জলীয় ভাগ অত্যন্ত অধিক। এই কয়লাও সেখানে বৈজ্ঞানিক উপায়ে রূপান্তর গ্রহণ করিয়া মানুষের কাজে লাগিতেছে, অথচ এই দেশের গুঁড়াকয়লার ব্যবহার প্রায় কিছুই নাই বলিলেই চলে। আধুনিকতম স্টিম-এঞ্জিনে গোটা কয়লার পরিবর্তে চূর্ণ কয়লাই দাহ্যরূপে ব্যবহৃত হইতেছে। এই গুঁড়াকয়লা দূরদূরান্তে রফতানি করা একটু কষ্টসাপেক্ষ এবং বিপদসংকুল, কারণ উহা অতি সামান্য ব্যাপারে জ্বলিয়া উঠিতে পারে। এইজন্য উহাকে খনির কাছাকাছি কোথাও কাজে লাগাইতে পারিলেই সর্বাপেক্ষা সহজে উহা ব্যবহৃত হইতে পারে। আসানসোলের আশেপাশে যন্ত্র স্থাপন করিয়া এই গুঁড়াকয়লাকে যেমন দাহ্যরূপে ব্যবহার করিয়া বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদন করা যায়, তেমনই উহার দ্বারা কয়লার ইষ্টক প্রস্তুত করিয়াও দূরদেশে উহাকে প্রেরণ করা সম্ভব। যেভাবেই হউক, এই চূর্ণ কয়লা নষ্ট না করিয়া উহাকে কার্যে নিযুক্ত করা বাঞ্ছনীয়। বর্তমানে উহার ওইরূপ কোনো নিয়োগ না থাকায় ইহা প্রায় নষ্ট হইয়া থাকে। কেবলমাত্র এইরূপ দাহ্য সহযোগেই প্রচুর পরিমাণে নূতনতর শক্তি তথায় উৎপাদিত হইতে পারে। এতদ্‌ব্যতীত সাধারণ কয়লা তো রহিয়াছে, কাজে কাজেই বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদন করিবার জন্য যে পরিমাণ কয়লার তথায় প্রয়োজন হইবে, তাহার অভাব কোনোদিনই ঘটিবে না। এইরূপে উৎপাদিত বিদ্যুৎশক্তি তথা হইতে যেমন কলিকাতায় নীত হইতে পারে, তেমনই পশ্চিমে ও উত্তরেও কিছুদূর পর্যন্ত উহাকে প্রেরণ করা সম্ভব।

বিদ্যুৎশক্তি বাহিত হয় ধাতব তারের সাহায্যে, এইরূপ বিদ্যুৎবাহী তার আসানসোল হইতে কলিকাতা পর্যন্ত বিস্তৃত হইলে পথিমধ্যে প্রায় প্রত্যেক স্থানে এই শক্তি সহজলভ্য হইবে। কেবল তাহাই নহে, তখন আর কয়লার সাহায্যে স্টিম-এঞ্জিন সহযোগে রেলগাড়ির চলাচল প্রয়োজন হইবে না, পরন্তু বিদ্যুৎশক্তি যেমন কলিকাতার ট্রামগুলিকে দ্রুত টানিয়া লইয়া যায়, তেমনই এই শক্তিশালী বিদ্যুৎস্রোত যাত্রী ও মালপূর্ণ ট্রেনগুলিকেও অনায়াসে টানিয়া লইয়া যাইবে।

কয়লা ব্যবহারে নানাবিধ অসুবিধা, তাহার মধ্যে ধূম উদ্‌গিরণের কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। স্বাভাবিক কারণে বাংলার বায়ু পশ্চিমের ন্যায় শুষ্ক নহে। পরন্তু অত্যন্ত অধিক পরিমাণে জলীয় বাষ্পে পূর্ণ। এই জলীয় বাষ্পের মধ্যে ধূম বর্তমান থাকলে তাহাকে সহজে অপসারিত করা যায় না। কাজেই ইহা দেশবাসীর স্বাস্থ্যনষ্টের একটি কারণরূপে সর্বদাই আমাদের জাতীয় জীবনকে বিপদাপন্ন করে। আমাদের দেশের বর্তমান পরিচালিত রেলগাড়িগুলি এইরূপে দেশের স্বাস্থ্যকে বিপদাপন্ন করিয়াছে। ইহা ব্যতীত বাংলাদেশে প্রায় প্রত্যেক গৃহে কয়লা ও কাঠ জ্বালানি হিসাবে ব্যবহৃত হয়, ইহাতে উদ্‌গিরিত ধূমের পরিমাণ বাড়িয়াই যায়। এই বিভিন্ন উপায়ে

উদ্‌গিরিত ধূমরাশি একত্র হইয়া বাংলার বায়ুস্তরকে কলুষিত করিয়া রাখিয়াছে। বিদ্যুৎশক্তি সহজলভ্য ও সস্তা হইলে এইসকল বিভিন্ন কারণে কয়লা ও কাঠের ব্যবহার কমিয়া যাইবে, কাজেই তখন আমরা নির্মলতর বায়ু সেবন করিয়া স্বাস্থ্যের উন্নতি করিতে পারিব। ইউরোপের মধ্যে সুইজারল্যান্ড দেশটি এই হিসাবে অত্যন্ত ভাগ্যবান, কারণ তথায় স্টিম-এঞ্জিনের প্রচলন নাই, সমস্ত দেশটি বিদ্যুৎ সাহায্যেই যাবতীয় কার্য সম্পাদন করে। ট্রেনগুলি সবই বিদ্যুৎ-পরিচালিত। সুইজারল্যান্ডে দুই-চারি দিন বাস করিয়া ইটালিতে গমন করিলে এই দুই দেশের বায়ুমণ্ডলের পার্থক্য প্রত্যেকেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সুইজারল্যান্ড এইজন্যই স্বাস্থ্যনিবাস। ফুসফুস রোগের জন্য এখানে সর্বোত্তম স্বাস্থ্যাগার রহিয়াছে।

যদি পূর্বোক্ত পরিকল্পনা অনুযায়ী বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদিত হয়, তাহা হইলে কেবলমাত্র শিল্প-প্রতিষ্ঠানই নহে, পশ্চিম বাংলার সমস্ত রেলপথ এই বিদ্যুৎ দ্বারা পরিচালিত হইয়া সমস্ত দেশকে ধূম, ধূলি ও ভস্ম হইতে রক্ষা করিবে। এই বিদ্যুৎধারা যে পথ দিয়া প্রবাহিত হইবে, তাহার চতুষ্পার্শ্বস্থ বিদ্যুৎশক্তি সহজলভ্য হওয়ায় সর্বত্র ছোটোবড়ো নানারূপ শিল্প-প্রতিষ্ঠান গঠনের সহায়তা হইবে। বাংলাদেশে আবহমানকাল বহুবিধ কুটিরশিল্প চলিয়া আসিতেছে। এই সহজলভ্য শক্তির সাহায্যে তাহারা নূতন প্রেরণা পাইবে। এতদ্‌ব্যতীত আরও নূতন নূতন বহুবিধ শিল্পালয় ক্রমশ গঠিত হইতে থাকবে। ইহাদের কথা পরে বিশদরূপে আলোচনা করিব।

জলধারার দুর্জয় শক্তি সহযোগেও বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদিত হইয়া থাকে। নায়গ্রা জলপ্রপাতের প্রচণ্ড শক্তি বিদ্যুৎরূপে রূপান্তরিত হইয়া আমেরিকার একটি বিস্তৃত জনপদকে নানাবিধ শিল্পের জন্য পরম উপযোগী করিয়া তুলিয়াছে। সুইডেন ও সুইজারল্যান্ডেও স্বাভাবিক উপায়ে জলশক্তি পাওয়া গিয়াছে বলিয়া ওইসকল দেশে নানাবিধ শিল্পালয় সহজে গড়িয়া উঠিয়াছে। স্বাভাবিক জলপ্রপাত না থাকিলে মানুষ নিজ পরিকল্পনার সাহায্যে কৃত্রিম উপায়ে বিরাট জলাধার নির্মাণ করিয়াও জলপ্রপাত প্রস্তুত করিতে পারে। দক্ষিণ ভারতে টাটা কোম্পানির প্রতিষ্ঠিত ইলেকট্রিক কারখানাটি এইরূপ পরিকল্পনার দ্বারাই নির্মিত হইয়াছে। যদিও এই পরিকল্পনার সূত্রপাতে লোকে উহার প্রতিষ্ঠাতাদের কার্যকে অসম্ভব মনে করিয়া তাহাদিগকে উপহাস করিয়াছিল, তথাপি পরবর্তীকালে ইহা অসম্ভবকে সম্ভবে পরিণত করিয়াছে, ইহার ফলে দক্ষিণ ভারতের পুরাতন রূপ সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তিত হইয়া গিয়াছে।

মহীশূর রাজ্যে কাবেরীর জলধারার সাহায্যে এই অল্পদিন পূর্বে প্রচণ্ড বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদন করিবার ব্যবস্থা হইয়াছে ও ইহার সহযোগিতায় তথায় আধুনিকতম কতকগুলি রাসায়নিক শিল্পালয় প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে। আমার মনে হয় বাংলাদেশের উত্তর সীমান্তে অবস্থিত সুউচ্চ এবং সুবিস্তৃত হিমালয় পর্বতশ্রেণির পাদদেশেও এইরূপ কতকগুলি জলাধার প্রস্তুত করা সম্ভব। এই কল্পনাকে রূপ দিতে পারিলে সমস্ত উত্তরবঙ্গেও বিদ্যুৎশক্তি সহজলভ্য হইয়া পড়িবে। এইসকল স্থানে বর্তমানে কয়লার সাহায্যে স্টিম উৎপাদন করিয়া শিল্পালয় পরিচালন করা অপেক্ষাকৃত অধিকতর ব্যয়সাপেক্ষ। কাজেই বিদ্যুৎ সহযোগে নূতন শিল্পালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়া এই প্রদেশকে সম্পদশালী করিবে।

পশ্চিমবঙ্গে দামোদর নদের বিপুল জলধারা প্রতি বৎসর নানাবিধ অনর্থের সৃষ্টি করে। রাঁচি ও হাজারিবাগের গিরিগাত্র বাহিয়া বাংলাদেশের সমভূমিতে অবতরণ করিবার পূর্বে যদি অন্তত আংশিকভাবে ওই জলরাশিকে আবদ্ধ করা যায়, তাহা হইলে হঠাৎ বন্যা নামিয়া বর্ধমান ও হুগলি জেলায় বাৎসরিক যে অনর্থ ঘটায়, তাহা আর ঘটাইতে পারিবে না। অথচ ওই জলরাশি আবদ্ধ

হইলে পরে উহাকে ইচ্ছানুরূপ বেগে দামোদর বক্ষে নামিতে দিলে তাহার সাহায্যেও বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিম সীমান্তে নবীন বিদ্যুৎধারা উৎপাদিত হইতে পারে। অধিকন্তু এই বিপুল জলরাশির কিয়দংশ অপেক্ষাকৃত নিম্নতর ভূমিতে আর-একটি দ্বিতীয় জলাধারে আবদ্ধ করিলে দামোদরের অতর্কিত বন্যা যেমন বন্ধ করা যায়, তেমনই প্রায় সমস্ত বৎসর ধরিয়া উহাকে পূর্ববঙ্গের ন্যায় একটি স্রোতবতী নদীতে পরিণত করিয়া উহার উভয় পার্শ্বের অপেক্ষাকৃত উষর ক্ষেত্রকে সমস্ত বৎসর ব্যাপী কৃষিকার্যের জন্য উপযোগী করিতে পারা যায়। আমার মনে হয়, এই পরিকল্পনাকে কার্যে পরিণত করিতে আর বিলম্ব করা মোটেই উচিত নহে। এই বৎসর দামোদরের বন্যার ফলে কলিকাতা ও হুগলি জেলার বহুলাংশে ভবিষ্যৎ ক্ষতির যে সম্ভাবনা উপস্থিত হইয়াছে, তাহাতে এই পরিকল্পনা কার্যে পরিণত করা বিশেষ প্রয়োজন হইয়াছে। এ সম্বন্ধে কিছুদিন পূর্বে বাংলা গভর্নমেন্ট সমস্ত অঞ্চলটি পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছিলেন। পূর্বোল্লিখিত জলাধার স্থাপন করিবার সপক্ষেই তাঁহারা বিশেষজ্ঞের অভিমত পাইয়াছিলেন। বর্তমান যুদ্ধের পর এই ব্যাপারটি পুনরায় আলোচিত হইলে এই পরিকল্পনাকে প্রকৃতরূপে কার্যকরী করা অসম্ভব হইবে না।

এই দুইটি অঞ্চল ছাড়া বাংলার উত্তর-পূর্ব সীমান্তেও জলাধার স্থাপন করা সম্ভব। আসামের গিরিগাত্র মধ্যে একাধিক উপযুক্ত স্থানে সুবৃহৎ জলাধার স্থাপন করা যাইতে পারে। ইহা ভিন্ন ব্রহ্মপুত্র নদের বেগবান স্রোতধারার সাহায্যেও বাংলাদেশের উত্তর-পূর্ব প্রান্তে যথেষ্ট পরিমাণ বিদ্যুৎস্রোত উৎপাদিত হওয়া সম্ভব। আসাম গভর্নমেন্টের সহিত যুক্তভাবে কার্য চালাইলে কেবল হাইড্রো-ইলেকট্রিক নহে, আসাম কয়লার সাহায্যেও ওই অঞ্চলে বিদ্যুৎ উৎপাদিত হইতে পারিবে। কাজেই দেখা যাইতেছে যে, বাংলাদেশের অন্তত তিনটি দিক হইতে প্রচুর পরিমাণে নূতন এবং প্রচণ্ড শক্তিশালী বিদ্যুৎস্রোত উৎপাদিত হইতে পারে।

বাংলা মাতার পাদদেশ ধৌত করিয়া যে সাগরবারি সর্বদা চঞ্চলা রহিয়াছে, ভবিষ্যতে তাহাকেও যে কার্যে নিয়োজিত করিতে না পারা যাইবে এমন নহে। পাশ্চাত্য দেশে এইরূপ জোয়ার ও ভাটার চঞ্চল গতিবেগকে ধরিয়া সাগর-স্রোত হইতে বিদ্যুৎ উৎপাদনের চেষ্টা চলিতেছে। এখানেও তাহা অসম্ভব বলিয়া মনে করি না, তবে এখনও উহা পরীক্ষাসাপেক্ষ। যদি এই পরীক্ষায় সাফল্য লাভ করা যায়, তাহা হইলে বাংলাদেশের চতুষ্পার্শ্ব হইতেই অল্পাধিক পরিমাণে বিদ্যুৎস্রোত উৎপাদিত হইতে পারিবে। এইরূপ সুবিধা বাংলাদেশে না থাকিয়া পাশ্চাত্য যে-কোনো দেশে থাকিলে তাহারা নিশ্চয় ইহাকে বহু পূর্বেই কাজে লাগাইত। কিন্তু দুঃখের বিষয়, আমাদের অলস প্রকৃতি আজ পর্যন্ত আমাদিগকে এই সুযোগ গ্রহণ করিবার জন্য অনুপ্রাণিত করে নাই। কিন্তু চিরকালই কি আমরা নিষ্ক্রিয় থাকিব? উপযুক্ত প্রচেষ্টা ও পরিশ্রম সহযোগে আজিকার এই কল্পনাকে রূপ দিতে অধিক বেগ পাইতে হইবে না। ইহার জন্য প্রয়োজন উদ্যোগী পুরুষের ও সহানুভূতিশীল রাজশক্তির। আমার মনে হয়, এখন এমন সময় সমাগতপ্রায় যখন আমরা এই উভয়বিধ উপায়ই গ্রহণ করিতে পারিব। উপযুক্ত ব্যক্তির সহিত সহানুভূতিসম্পন্ন রাজশক্তির যোগাযোগ সত্বর ঘটিবে।

অতএব বুঝিতে পারা যায় যে, বাংলাদেশে শিল্পালয় পরিচালনজন্য যে শক্তির প্রয়োজন তাহা আমরা সহজেই পাইতে পারিব। এখন দেখা যাউক এখানে শিল্পকার্যের উপযুক্ত কী কী কাঁচামাল কত পরিমাণে পাওয়া যাইবে। এই কাঁচামালকে দুই শ্রেণিতে ভাগ করিতে পারি। প্রথম, খনিজ পদার্থ যাহা স্বাভাবিক উপায়ে যথেষ্ট পরিমাণে মজুত থাকে। আর দ্বিতীয়ত, কৃষিজাত দ্রব্য, ইহাকে চেষ্টা দ্বারা উৎপাদন করিতে হয় ও তাহার পরিমাণ চেষ্টানুযায়ী অল্পাধিক হইতে পারে, কিন্তু প্রথম

শ্রেণির দ্রব্যরাজির পরিমাণ বাড়ানো সম্ভব নহে। উহা যে পরিমাণে বর্তমান রহিয়াছে, তাহাই কাজের জন্য নিযুক্ত হইতে পারে।

শস্যশ্যামলা এই সুন্দর দেশটিতে খনিজ পদার্থ তেমন অধিক পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায় না; তবু কয়লার ন্যায় মূল্যবান খনিজ বাংলাদেশের পশ্চিম প্রান্তে বিস্তৃত ক্ষেত্র পূর্ণ করিয়া রহিয়াছে— সে কথা পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। এই কয়লার সাহায্যে বিদ্যুৎ উৎপাদনের কথা পূর্বে বলিয়াছি, কিন্তু উহাই কয়লার একমাত্র ব্যবহার নহে। কয়লার সাহায্যে কতকগুলি রাসায়নিক শিল্পালয় চালানো সম্ভব। কয়লা ব্যতীত অল্পাধিক পরিমাণে লৌহ খনিজও বাংলার প্রান্তদেশে এবং বর্তমান বিহার প্রদেশের উপকণ্ঠে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। এই লৌহ খনিজ হইতে নানা শ্রেণির লৌহ প্রস্তুত হইয়া বিভিন্ন কার্যে নিযুক্ত হইতেছে। একটু যত্ন করিলে এই লৌহ প্রস্তুতের জন্য যেসকল প্রতিষ্ঠান গঠিত হইয়া উঠিয়াছে, তাহাদের সাহায্যে আরও বহুবিধ ছোটোবড়ো প্রতিষ্ঠান গঠিত হইতে পারে। ইহার পর চুনাপাথর ও জিপসামের কথা উল্লেখ করা যায়। এই পদার্থগুলি চুন ও সিমেন্ট প্রভৃতি গৃহনির্মাণোপযোগী দ্রব্য প্রস্তুত জন্য যেমন প্রয়োজন হয়, তেমনই ইহার সাহায্যে আরও বহুবিধ কারখানা প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে। ফায়ারব্রিক বা তাপ-সহ ইষ্টক নির্মাণোপযোগী কাঁচামালও বাংলার পশ্চিমাঞ্চলে পাওয়া গিয়াছে ও তাহার সাহায্যে ফায়ারব্রিক প্রস্তুত হইতেছে। ইহা ব্যতীত বক্সাইট ও কাদা-জাতীয় মাটি হইতে নানারূপ চিনামাটির পাত্রাদি প্রস্তুত হইয়া থাকে। এইসমস্ত পদার্থ নিয়মিতভাবে আহৃত হইয়া নানা কার্যে উন্নততর উপায়ে ব্যবহৃত হইতে পারে। দেশের দক্ষিণ অংশে যে সমুদ্রজল চির বর্তমান, তাহা হইতে প্রচুর পরিমাণে লবণ উৎপন্ন করিয়া বিশিষ্ট কর্মে উহাকে নিযুক্ত করা যায়— সে কথাও পরে বলিতেছি। খনিজ পদার্থের সম্বন্ধে আমাদের সচ্ছলতা অত্যন্ত অধিক না হইলেও আমাদের কৃষিজাত সম্পদকে ইচ্ছানুযায়ী বৃদ্ধি করা সম্ভব। আজ এই মুহূর্তে আপাতদৃষ্টিতে এ কথার সত্যতা প্রমাণ হয় না, কারণ দেশব্যাপী এই দারুণ খাদ্যাভাবের মধ্যে কে ভাবিবে যে বাংলাদেশ তাহার স্বকীয় আহার্য নিজ ক্ষেত্রে উৎপাদন করিতে সক্ষম। কিন্তু বোধ হয় সকলেই বুঝিতে পারিতেছেন যে, বাংলার বহির্ভাগ হইতে যে পরিমাণ খাদ্যদ্রব্য পূর্বে এ দেশে আনীত হইত তাহার অভাবই বর্তমানের এই সুদূরপ্রসারী হাহাকারের প্রকৃত কারণ নহে, কারণ বাংলাদেশ হইতে রেঙ্গুনের পতনের পূর্বে যে পরিমাণ চাউল পাশ্চাত্য দেশাভিমুখে প্রেরিত হইত, ভারতের বহির্ভাগ হইতে আনীত চাউলের পরিমাণ তাহা অপেক্ষা তেমন অধিক ছিল না। এই হাহাকারের মূলে রহিয়াছে কতকগুলি বিশিষ্ট ব্যক্তির অদূরদর্শিতা, ও তৎসহ মিলিত হইয়াছে— তাহাদিগের সততার অভাব। যে চক্রান্তের ফলে বর্তমানের এই দুরবস্থার আবির্ভাব ঘটিয়াছে, তাহা সর্বকালে সংঘটিত হইতে পারিত না। বিচক্ষণ ব্যক্তি দ্বারা দেশের শাসনকার্য পরিচালিত হইলে, এইরূপ অবস্থার আবির্ভাব পুনরায় ঘটিবে না, ইহা অতি সত্য কথা। কাজেই দেশের কৃষিজাত পণ্য যথেষ্ট বর্ধিত করা যে সম্ভব, সে কথা সহজেই অনুমেয়।

উৎস : *'যুদ্ধোত্তর বাংলার কৃষিশিল্প'*, ১ চৈত্র ১৩৫০।

মধ্যবিত্তের দুশ্চিন্তা

সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার

ডেপুটি গজানন্দ, রায়বাহাদুরি খেতাব ও পেনশন লইয়া যখন অবসর গ্রহণ করিলেন তখন তাঁহার বালিগঞ্জের বাড়ি তৈয়ার শেষ হইয়াছে। গজানন্দের সংসার ছোটো নহে, তিন পুত্র চারি কন্যা। ইহাদের লালন শিক্ষাদি ব্যাপারে অনেক টাকা খরচ হইয়াছে, চাকুরিজীবনে সাধারণ মধ্যবিত্তের মতোই আত্মীয়স্বজনকেও মাঝে মাঝে সাহায্য করিতে হইয়াছে। তেলাপোকা পক্ষী না হইলেও উড়িতে পারে, ডেপুটি সিভিলিয়ন না হইলেও হাকিম। এই হাকিমি মর্যাদার জন্য অনেক 'অপব্যয়' করিতে হইয়াছে। কিন্তু সরকারি চাকুরির মহিমা এই, বিশেষ যোগ্যতা কুশলতা না থাকিলেও বেতন যথা নিয়মে বাড়িয়া যায় এবং ক্রমে হরেকরকম উপার্জনের ফিকিরফন্দির সন্ধান পাওয়া যায়। এই পথেই গজানন্দ নগদে ও কোম্পানির কাগজে মোটা টাকা করিয়াছেন। কুলোকে বলে, গজানন্দ 'সেটেলমেন্ট'-এ ঢুকিয়া অনেক টাকা ঘুষ খাইয়াছেন ও মফস্‌সলের ক্যাম্পে, পাঁঠা, হাঁস, মুরগি ভেট পাইলে, চাপরাশি মারফত হাটে বেচিয়া দিতেন, এমনই ছিলেন কঞ্জুস। গজানন্দ বলেন, টাকা উপার্জন করা সহজ, রাখা কঠিন, বাড়ানো আরও সুকঠিন। সেই সুকঠিন পরীক্ষায় তিনি উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

লোক পরোক্ষে নিন্দাই করুক অসাক্ষাতে বিদ্রূপই করুক, টাকা আছে এটা অখ্যাতি নয় খ্যাতি। এই খ্যাতির জোরে বালিগঞ্জ সমাজের উপরের দিকের বৈঠকখানায় তাঁহার সম্মানের আসনসংখ্যা বাড়িতে লাগিল। ডেপুটিত্বের অভিমান এবং অভ্যস্ত হাকিমি মেজাজ তাঁহাকে এমন একটা আত্মমর্যাদা জ্ঞান দিয়াছে যে, তিনি অপরের বাড়ির আয়তন উচ্চতা ও আসবাব না দেখিয়া ঘনিষ্ঠতা করেন না। পুত্রকন্যাদের 'বুড়ো ঘরে' বিবাহ দিয়া নিশ্চিন্ত হইবার আশায় এমন মেলামেশার সুবিধা আছে। গজানন্দ ও গৃহিণী একটু সেকেলে হইলেও, সিভিলিয়ন বা সমপর্যায়ের সরকারি চাকুরিয়া পাত্র ধরিবার জন্য গৃহে একাল আমদানি করিয়াছেন। মেয়েরা কলেজে পড়ে, পিয়ানো বাজায়, রেডিয়ো শোনে, হারমোনিয়াম বাজাইয়া আধুনিক গান গায়।

ছোটো দুটি আবার ওরিয়েন্টাল নৃত্য শিখিতেছে। মেয়েরা দাদাদের সতীর্থদের সঙ্গে সিনেমায় যায়, পিকনিক করে; পছন্দ না হইলেও গজানন্দ ইহা বরদাস্ত করেন। যে কালের যা, উপায় নাই।

কিন্তু গজানন্দ মনে মনে একালের ছেলেদের দু-চক্ষে দেখিতে পারেন না। মফস্‌সলে থাকিতে তিনি শুনিতেন কলিকাতায় 'তরুণ' নামক একশ্রেণির যুবকের আবির্ভাব হইয়াছে, যাহাদের চালচুলা নাই, ফ্যাশন করিয়া লোটন পায়রার মতো ধুতি পরে, রবি ঠাকুরের কবিতা আওড়ায়, রাজনৈতিক সভায় হাততালি দেয়, সাহিত্য ও আর্টের আবরণে আদিরসের আলোচনা করে, আর ওই আর্টের বুলি আওড়াইয়া মেয়েদের সঙ্গে প্রেম করিবার চেষ্টা করে। তাই কলিকাতায় আসিয়া তিনি সর্বদাই হুঁশিয়ার থাকেন। পশ্চিম অঞ্চলের কৃষকেরা যেমন খেতে টোম বাঁধিয়া টিয়াপাখি তাড়ায়, তিনিও তেমনিই দোতলার ঘরে বসিয়াই একতলার তরুণদের তাড়াইবার চেষ্টা করিতেন। কিন্তু সব তরুণ সমান নয়। হাফশার্ট ও কাবুলি স্যান্ডেল চক্রব্যূহ ভেদের কৌশল জানে। কয়েকজন গজানন্দ গৃহিণীকে মাসিমা বলিয়া, ফাইফরমাশ খাটিয়া এবং মেয়েদের প্যাটার্নমাফিক বুনানির সুতা মিউনিসিপ্যাল মার্কেট চষিয়া কিনিয়া দিয়া একটু স্থায়ী আসন করিয়া লইয়াছে। কন্যাগণ এবং এইসকল নাছোড়বান্দাদের মধ্যে ব্যবধান রাখিবার জন্য গজানন্দ প্রায়ই নীচের বৈঠকখানায় আসিয়া বসেন। তাঁহাকে পাইলেই তরুণেরা সুভাষ বোস, জওহরলালের প্রসঙ্গ তুলিয়া কংগ্রেস, সোশ্যালিজম, কার্ল মার্কস, লেনিন লইয়া আলোচনায় মুখর হইয়া উঠে। সুবিজ্ঞ গজানন্দ মুচকি হাসিয়া বলিতেন,— 'যাই বল বাপু, ইংরেজের মতো জাত হয় না, ইংরেজ এদেশে এসেছিল তাই তোমরা মানুষ হয়েছ। ওদের তুল্য কেউ নয়। বড়ো বড়ো সিভিলিয়নের সঙ্গে চাকরি করে এসেছি। হ্যাঁ তারা মানুষ বটে। যেন চর্বি দিয়ে মাজা শংকরমাছের লেজের চাবুক— কাছে গেলেই সমীহ করে চলতে হয়। তা না হলে আর ভগবান দয়া করে এত বড়ো সাম্রাজ্যটা দিয়েছেন'।

গজানন্দের অচলা ব্রিটিশ-ভক্তি, তরুণেরা তো ছার, স্বয়ং হিটলার টলাইতে পারেন নাই। তরুণেরা তর্ক করে আর চার-চারটি যুবতি কন্যার পিতা বলিয়া সমবেদনার সুরে মন্তব্য করে— 'উনি বড়োই সেকেলে'। কেহ বা মুখের কথা কাড়িয়া লইয়া বলিয়া উঠে, 'রাজনৈতিক ব্যাপারে ওঁর মতো গোঁড়া হলেও সামাজিক ব্যাপারে ওঁর মত বড়ো উদার'। কথা বলিতে বলিতে তরুণটি হয়তো কোনো তরুণীর মুখে সকৃতজ্ঞ সমর্থনের উৎসুক দীপ্তি খোঁজে।

এমনিভাবে দিন যায়। অকস্মাৎ বিনামেঘে বজ্রগর্জনের মতো ইউরোপে বাধিয়া উঠিল লড়াই। ইংরেজ পড়িল জড়াইয়া। পোল্যান্ড গেল, ফ্রান্স গেল, ডানকার্ক হইতে নাজেহাল ইংরেজ সৈন্য ফিরিল, হিটলার ইউরোপময় দাপাদাপি করিয়া ঝাঁপাইয়া পড়িলেন রুশিয়ার উপর। গজানন্দ খবরের কাগজ পড়েন, আর ফিক ফিক করিয়া হাসেন, সোনার দর চড়িতেছে দেখিয়া পুলকিত হন, কোম্পানির কাগজের দাম ঠিক আছে দেখিয়া নিশ্চিন্ত হন। এইভাবেই চলিতেছিল— এমন সময় আর-এক অঘটন ঘটিল,— জাপানের মালয় আক্রমণ, রেঙ্গুনে বোমাপতন এবং সঙ্গে সঙ্গে ধনী প্রতিবেশীদের পলায়ন,— এই তিনে মিলিয়া গজানন্দের ডেপুটিত্বের মহিমা ধূলিসাৎ করিয়া দিল। সাধারণ গৃহস্থেরা কী ভাবে, কী বলাবলি করে, লোকের কী অবস্থা হইবে, এইসকল খুঁটিনাটি সংবাদের জন্য তিনি অত্যন্ত কৌতূহলী হইয়া উঠিলেন। চারি পাশের গরিব ভদ্রলোকদের সংস্রব যিনি সাবধানে এড়াইয়া চলিয়াছেন, কেহ উৎসুক দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে পাছে আলাপ করিয়া বসে এই ভয়ে ছাতা আড়াল দিয়া মর্যাদা রক্ষা করিয়াছেন, আজ সেই গজানন্দ গায়ে পড়িয়া কেরানি,

উকিল, ইশকুলমাস্টারদের সঙ্গে আলাপ করেন, সন্ধ্যায় রেডিয়ো শুনিবার জন্য আমন্ত্রণ করেন। ইহাদের সহিত একত্র বসিয়া কম্পান্বিত কলেবরে জাপানি বক্তৃতা শোনেন। যাহাদের সহিত একাসনে বসার কথা গজানন্দ কল্পনাও করিতে পারিতেন না, আজ তাহাদিগকে চা-সিগারেট দিয়া আপ্যায়িত করেন।

গজানন্দ একেবারেই বদলাইয়া গিয়াছেন। যুদ্ধ ও জাপানি বোমা ছাড়া তাহার আলোচনার আর কিছুই নাই। তাঁহার বৈঠকখানায় বিভিন্ন বয়সের পত্নীবিরহীদের অশ্রান্ত গমনাগমন ও আড্ডা শুরু হইয়াছে। মেয়েরা ড্রয়িংরুম ছাড়িয়া পাশের একটা ছোটো ঘরে আশ্রয় লইল, গৃহিণী পল্লিভবনে যাইবার জন্য ব্যাকুলা হইলেন। সুবিজ্ঞ গজানন্দ মাথা নাড়িয়া বলে,— 'তিরিশ বছর ইংরেজের সঙ্গে ঘর করছি, অত সহজ নয় গিন্নি, এই আড়াই বছরে অতবড়ো জার্মান ইংরেজের এক ইঞ্চি জমি নিতে পারেনি,— ও কি জাপানির কর্ম। লোকে না বুঝেই পালাচ্ছে। দু-দিন পরেই সুড়সুড় করে ফিরে আসবে দেখে নিয়ো বাহিরে বৈঠকখানায় বলেন—'ইংরেজের কৌশল জাপানিরা কী বুঝবে! তোমরা যা বলছ বিলকুল গলতি কথা। জাপানিরা এগুচ্ছে ঠিক, কিন্তু আসলে ইন্দুর এগুচ্ছেন জাঁতিকলের দিকে, সিঙ্গাপুর হল সেই কল! একটি খ্যাঁদা বাছাকেও আর দেশে ফিরে যেতে হবে না'। গজানন্দকে তর্কে হারাইবার জো নাই। তিনি কালীঘাটের বিখ্যাত জ্যোতিষীকে দিয়া চার্চিল-রুজভেল্ট এমনকি বড়োলাট ছোটোলাটদের কুষ্ঠি বিচার করিয়া নিশ্চিন্ত আছেন।

একদিন সকালবেলা খবরের কাগজে বড়ো বড়ো হরফগুলি দেখিয়া গজানন্দ বিস্ফারিতনেত্রে স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন। পড়িতে শিরদাঁড়া শিরশির করিয়া উঠিল, কালো হরফগুলি আগুনের ফুলকির মতো চক্ষুর সম্মুখে নাচিতে লাগিল। দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া গজানন্দ গুম হইয়া রহিলেন। দেখিতে দেখিতে বৈঠকখানায় লোকসমাগম, সকলের মুখে এক কথা, সিঙ্গাপুর গেল, এখন উপায়! ততক্ষণে গজানন্দ সামলাইয়া লইয়াছেন, কাষ্ঠহাসি হাসিয়া গজানন্দ বলে, 'হুঁ, চার্চিলের বক্তৃতা পড়েছ? কেউটে সাপের জাত বাবা। সহজে ফণা নামাবে না'। কিন্তু আজ গজানন্দের মনের জোর নাই— সমগ্র আসাম-বঙ্গের পালাও পালাও রব তাঁহার মগজে হাতুড়ি মারিতে লাগিল। আলোচনা যখন তুমুল, সকলের অলক্ষ্যে গজানন্দ উপরে উঠিয়া গেলেন। জামা পরিয়া ছাতিটা হাতে লইতেই, গৃহিণী জিজ্ঞাসা করিলেন, 'এখন আবার কোথায় বেরুচ্ছ!' গজানন্দ উদাসভাবে বলিলেন,— 'মহাপ্রস্থানের পথের সন্ধানে—'

ট্রাম ধরিয়া গজানন্দ সোজা লালদিঘির মোড়ে নামিয়া পড়িলেন। সোৎসুক দৃষ্টিতে চারি দিকে চাহিয়া দেখিলেন সরকারি দপ্তরখানা ও জেনারেল পোস্টাপিসের কাজকর্ম ঠিকই চলিতেছে। ব্যাংকে গিয়া দেখিলেন লোকে টাকা তুলিবার জন্য ভিড় জমায় নাই, একবার ভাবিলেন, কালই হয়তো ভিড় হইবে, আজ টাকাগুলি তুলিয়া লই। আবার ভাবিলেন, না থাক, দিবে তো কতকগুলো কাগজ। অকারণে ক্লাইভ স্ট্রিটে ঘুরিয়া ঘুরিয়া পরিশ্রান্ত গজানন্দ এক পানের দোকানের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন। ডেপুটিত্বের অহমিকায় পরিস্ফীত গজানন্দ ফুটপাথে দাঁড়াইয়া মাটির খুরিতে লেমোনেড পান করিতেছেন, এই দৃশ্য ছয় মাস পূর্বে কেহ কল্পনাও করিতে পারিত না। কেবল তাহাই নহে, পানওয়ালার সঙ্গে আলাপ করিয়া, সওদাগরি আপিসগুলির হালচাল জানিতে লাগিলেন। পানওয়ালা চাপরাশি দারোয়ানদের নিকট শোনা কথা, রং ফলাইয়া বলিতে লাগিল। গজানন্দ করুণ হইয়া বলিলেন, 'আমাকেই যা বললে, এসব কথা কাউকে বোলো না, পুলিশের ফ্যাসাদে পড়বে'। পানওয়ালা সচকিত হইয়া বলিল, 'ঠিক বোলেছেন, এ সোব কথায় হামার কী কাজ বাবু—'।

সেখান হইতে গজানন্দ এক খবরের কাগজের আপিসে গিয়া উঠিলেন। 'কী মশাই খবর কী?' কর্মব্যস্ত সাংবাদিক মুখ না তুলিয়াই বলিল, 'সে তো কাগজেই দেখতে পাচ্ছেন!' 'সে খবর নয় মশাই, আপনারা যা পান অথচ ছাপাতে পারেন না, সেইসব খবর—'। গজানন্দ অর্থপূর্ণ হাস্য করিলেন, ডিমে তা দেওয়া হাঁসের মতো কিছুক্ষণ ফ্যালফ্যাল করিয়া চাহিয়া, সাংবাদিক পুনরায় কাজে মনোনিবেশ করিতেই, গজানন্দ বলিয়া উঠিলেন,— 'চেপে যাচ্ছেন কেন? বলুন না মশাই। বোঝেন তো কাচ্চাবাচ্ছা নিয়ে ঘর করি'। এইবার সাংবাদিক সম্বিৎ ফিরিয়া পাইলেন, হাসিয়া বললেন, 'ওসব খবর সম্পাদকেরা রাখেন'।

গজানন্দ কার্ড দিয়া সম্পাদকের সহিত দেখা করিলেন, ভারিক্কি মানুষ দেখিয়া সম্পাদক আদর করিয়া বসাইলেন। সহৃদয় আবহাওয়ার মধ্যে গজানন্দের রসনা বল্‌গাহীন হইল। তাঁহার ত্রিশ বৎসরের চাকুরিজীবনের অভিজ্ঞতা ও সিভিলিয়ান ইংরেজ-চরিত্রের মহিমা শুনিতে শুনিতে সম্পাদক বিব্রত হইয়া পড়িলেন। তার পর উঠিল যুদ্ধের কথা। আধ ঘণ্টা পর আলোচনা সিঙ্গাপুরের পতনে আসিয়া ঠেকিল। এইবার অন্তরঙ্গ হইয়া গজানন্দ প্রশ্ন করিলেন,— 'আপনি কি মনে করেন, কলকাতায় শিগগিরই বোমা পড়বে?' প্রাচ্যের প্রধানতম জ্ঞানীপুরুষের মতো মাথা নাড়িয়া সম্পাদক বলিলেন, 'এপ্রিলের আগে সে সম্ভাবনা দেখছি না, তবে আগেভাগে সাবধান থাকাই তো উচিত'। গজানন্দ আরও ঘনিষ্ঠ হইয়া প্রশ্ন করেন, 'ইন্ডিয়া না অস্ট্রেলিয়া?' রণনীতিজ্ঞ সম্পাদক প্রত্যয়সিদ্ধ কণ্ঠে বর্তমান যুগের রণকৌশলের সহিত রেঙ্গুন, বাটাভিয়া, আমেরিকান নেভি, জাপ-বিমানবহরের জটিল সমস্যা ব্যক্ত করিতেছেন,— এমন সময় খাপছাড়াভাবে গজানন্দ জিজ্ঞাসা করলেন—, 'আচ্ছা ব্যাংকগুলোর কী হবে!' সম্পাদকের হুঁশ হইল, এত খোলাখুলিভাবে কথা বলা ঠিক হয় নাই। বুড়া ডেপুটি হয়তো আই. বি.-র স্পাই। ভারতরক্ষা আইন স্মরণ করিয়া সম্পাদক মুদ্রিত নেত্রে মৌন হইলেন। গজানন্দ আবার হাইকোর্ট পাড়ায় ফিরিয়া আসিলেন। ঝানু অ্যাটর্নি বন্ধুর সহিত বিষয় সম্পত্তি, কোম্পানির কাগজ, ব্যাংকের টাকা প্রভৃতির নিরাপত্তা লইয়া অনেক আলোচনা করিলেন। না, ভরসার কিছুই নাই, একটা সর্বজনীন সর্বনাশের বিভীষিকা তাঁহাকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল।

রজনি গভীর। পার্শ্বে নিদ্রিতা গৃহিণীকে ঠ্যালা মারিয়া গজানন্দ বলিলেন, 'শুনছ?' গৃহিণী জড়িতস্বরে বলিলেন, 'বলো'।

'বলব বা কী! স্টেটস্‌ম্যান পড়লে তো! দীর্ঘকাল জমিদারি ভোগ করলে যা হয়, এদেরও তাই হয়েছে— এত বাবুগিরি....., সিঙ্গাপুরটা ঠেকাতে পারলে না'। গৃহিণী সান্ত্বনা দিয়া বলেন, 'এখন একটু ঘুমোও দেখি'। গজানন্দ দীর্ঘকাল ঘুমাইবার ভান করিয়া, টুকরো টুকরো চিন্তার অঙ্কগুলিকে যোগ বিয়োগ গুণ ভাগ করিয়া একটা ফল বাহির করিবার চেষ্টায় ছিলেন, পত্নীর সহানুভূতিতে তাহা আবার গুলাইয়া গেল। অস্ফুট আর্তস্বরে গজানন্দ বলেন, 'আর ঘুমোবো! সবই ভেস্তে যায় গিন্নি;— ছেলে দুটোর চাকরি হল না, মেয়েদের বিয়ে হল না। আজীবনের এত কষ্টের কড়ি— তবু বল আমি ঘুমোবো'। হাপরের মতো দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া গজানন্দ পাশ ফিরিয়া শুইলেন। আসামি, উকিল, সাক্ষী, পেশকার, পিনাল কোড তাঁহার মগজে ঘুরিয়া ঘুরিয়া ইংরেজ রাজত্বের অটল মহিমা যতই বুঝাইতে চেষ্টা করে, গজানন্দের চিন্তা ততই ছেঁড়া পুঁটুলির সরিষার মতো সরসর করিয়া সরিয়া যায়।

২

বোমা! বোমা! বোমা! মাথায় ভাঙিয়াও পড়ে না, মাথা হইতে নামেও না। এতদিন শহরে বাস করিতেছি, এমন জ্বালায় কখনও জ্বলি নাই। রাস্তায় ট্রামে, বাসে, দোকানে, আপিসে সর্বত্র ওই এক

আলোচনা,— বোমা। প্রত্যহ প্রভাতে সিঙ্গাপুর রেঙ্গুনের সংবাদ পাঠ করি— গায়ে কাঁটা দিয়া উঠে। গেল বছর শীতকালে ইউরোপের উপর এমনিই বোমা পড়ার খবর পরম আরামে চা পান করিতে করিতে পাঠ করিয়াছি। তখন এমনটি হয় নাই। এবার পাগল হইবার উপক্রম। প্রত্যহ সকালে খবরের সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ কমিশনার ও এ. আর. পি.-র নোটিশগুলি পড়ি, আর দুশ্চিন্তা বুকের মধ্যে বিড়ালের নখের মতো আঁচড় মারিতে থাকে। বিমান আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার জন্য দশ জনের মতো আমিও ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছি। দোতলা ছাড়িয়া একতলার ঘরে শুই, গিন্নি পুত্রকন্যা নাতিনাতনি-সহ মধুপুরে গিয়াছেন, প্রত্যহ ডাকে অশ্রুসজল মিনতিপূর্ণ পত্র আসিয়াছে। তিনিও জানেন, আমিও জানি, পলাইবার পথ নাই। চাকুরি ছাড়ার অর্থ বোমা পড়িবার আগেই মরা। হোটেলে খাই, মাঠে বেড়াই, রাত্রে নিষ্প্রদীপ বাসায় বসিয়া রেডিয়ো শুনি। এই দুই মাসের মধ্যে মরিয়া হইয়া উঠিয়াছি। আর তো দেরি সহ্য হয় না, পড়ুক বোমা, একটা হেস্তনেস্ত হইয়া যাক। প্রথম বোমা বর্ষণের পর যদি প্রাণে বাঁচি তাহা হইলে পলাইয়া যাইবার একটা কৈফিয়ত বড়ো সাহেবকে দিতে পারিব।

মোটা বেতন পাই। রাজনীতি লইয়া কোনোদিন মাথা ঘামাই নাই। কিছুদিন হইল কংগ্রেস, লিগ, এমেরি, চার্চিল, রুজভেল্ট মায় রাজাগোপালাচারীর বক্তৃতা মনোযোগ দিয়া পড়ি। স্বায়ত্তশাসন, স্বাধীনতা, দেশরক্ষার দায়িত্ব লইবার জন্য বড়ো বড়ো কথা শুনিলে গায়ের রক্ত হিম হইয়া যায়, দায়িত্ব এতদিন যাঁহাদের ছিল, তাঁহারাই যদি ঠেকাইতে না পারেন, তাহা হইলে নিধিরাম সর্দারের দল যে কী দিয়া কী করিবেন, ঠাহর পাই না। ছেলেরা আবার জনযুদ্ধ বলিয়া রব তুলিয়াছে। গুন্ডার ছুরি দেখিলে যাহারা দেয় চোঁচা দৌড়, আত্মরক্ষার জন্য যাহারা প্রথমেই গিয়া উঠে থানার বারান্দায়, যখন শিরে সংক্রান্তি, তখন তাহারা করিবে লড়াই,— এর চেয়ে নাটক নভেলের বীরত্ব অনেক বেশি সত্য। বলিতে কী, এ. আর. পি. সিভিক গার্ড, পুলিশের উপরও আমার ভরসা নাই। তাই ভাবিয়া ভাবিয়া দিনে দিনে শরীর শুকাইয়া যাইতেছে।

কত ভাবি, ইংরেজ রাজত্বে কী সুখেই না ছিলাম। আমরা চার পুরুষ সরকারি বেসরকারি চাকুরি করিতেছি। আপিস-আদালতের পুকুরে কলমিলতার মতো বসুবংশের শাখাপ্রশাখা ছড়াইয়া পড়িয়াছে। আমরা স্বদেশি করি না, মিটিং-এ যাই না, ইনক্লাব জিন্দাবাদি দল হইতে ছেলেদের সাবধানে রাখি। দুঃখেসুখে আমার জীবনের একটানা স্রোত, যখন প্রৌঢ়ত্বের সীমায় আসিয়া পৌঁছিয়াছে এমন সময় আচম্বিতে উপর হইতে পড়িবে জাপানি বোমা! আমাদের জীবনের কামনা-বাসনার চিরসম্বল, আপিস, আদালত, ব্যাংক গুঁড়াগুঁড়া হইয়া ভাঙিয়া পড়িবে, শেয়ার ও কোম্পানির কাগজের দাম পড়িয়া যাইবে, মাসের পহেলা তারিখ বেতন পাইব না, ইহা ভাবিতেও হৃৎকম্প হয়। ইংরেজ রাজত্ব নাই থানাপুলিশ নাই, ছোটোলোকের দৌরাত্ম্য হইতে ভদ্রলোকদের রক্ষার কোনো ব্যবস্থা নাই— কেবল কতকগুলো বেঁটে জাপানি শহরের পথে দাপাদাপি করিবে, ইহা ভাবিতে গেলে কপালের শিরা দপদপ করিয়া জ্বলিতে থাকে। আমার সহকারী রাম চক্রবর্তী টিটকিরি দিয়া বলে, বোমা পড়িয়া একটা পরিবর্তন হোক ভয় কী? কাষ্ঠহাসি হাসিলে কী হয়, সকলেরই হাত-পা পেটের মধ্যে ঢুকিতেছে।

কিছুদিন পূর্বে আপিসে হিটলারের প্রশংসা চলিত। ইংরেজ বেকায়দায় পড়িয়াছে— বিরক্ত কেরানিদের মধ্যে একটা পুলক ঝিলিক দিয়া উঠিত। হইবে না, হিটলার কি একটা নেচি-ফেচি লোক। নিরামিষ খান, ব্রহ্মচারী যুগাবতার, সাক্ষাৎ কল্কি অবতার, ভূভারহরণের জন্য অবতীর্ণ

হইয়াছেন। তাঁহার জয়ে সত্যযুগ আসিবে। আমি একটু ধর্মভীরু বলিয়া কিছু কিছু বিশ্বাসও করিতাম। রুশিয়ার কমিউনিস্টরা ঈশ্বর মানে না, ধর্ম মানে না, ধর্মশাস্ত্রের বিধি লঙ্ঘন করিয়া ছোটোবড়ো ভেদ লুপ্ত করিয়াছে। তাই সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের নির্দেশে হিটলার তাহাদের কোতল করিতে গেলেন। আমরা ধর্মের জয় দেখিবার জন্য উৎকণ্ঠিত হইলাম। কিন্তু এ কী দেখিতেছি? ঈশ্বরের বরপুত্র আর্যবংশধর ধার্মিকেরাই অধার্মিকদের ঠ্যাঙানি খাইয়া গুটিগুটি বাড়ি ফিরিতেছে। ইউরোপের কথা থাক,— এদিকে যে সূর্যপুত্রগণ হানা দিয়াছেন, শুনি সেই জাপানিদেরও নাকি ঈশ্বরে বিশ্বাস নাই, ধর্মকর্মে মতি নাই। উহারা যদি সত্যই বর্মা ডিঙাইয়া কলিকাতায় আসিয়া পড়ে, তাহা হইলে 'বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি' বলিয়া পায়ে পড়িলে কি বাঁচিব! ইহার বেশি ভাবিতে পারি না!

আসল কথা বলিতে কী, এই অবস্থায় সুসংবদ্ধভাবে চিন্তা করা অসম্ভব। মাঝে মাঝে সভায় গিয়া ডাক ছাড়িয়া বলিতে ইচ্ছা করে যে, হে ইংরেজ এতকাল তুমি আমাদের বাঁচাইয়াছ, এ সংকটে তুমিই আমাদের বাঁচাও। দেশরক্ষার দায়িত্ব লইয়া আমরা ফ্যাসাদে জড়াইতে চাহি না, যুদ্ধের মতো জটিল ব্যাপার হইতে আমাদের দূরে রাখো। তুমি সেপাই সান্ত্রি কামান বিমান লইয়া লড়াই করো। আমাদের শুধু নিরাপদে প্রাণ বাঁচাইবার ব্যবস্থা করিয়া দাও। জানি একথা বলিলে লোকে কাপুরুষ বলিয়া আমাকে ধিক্কার দিবে। আমি কাপুরুষতার অপবাদ মাথা পাতিয়া লইতে রাজি আছি, কিন্তু নির্বোধ হইতে প্রস্তুত নই। আমার স্ত্রী-পুত্র পরিবার, স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি এবং চাকুরিটি যদি নিরাপদ থাকে, তাহা হইলে আমি জাপানি বোমা হইতে হিটলারি হুংকার কিছুই গ্রাহ্যের মধ্যে আনা আবশ্যক বোধ করি না। দুনিয়ার মালিক যাহারা, তাহারা রাজ্য রক্ষা ও রাজ্য গ্রাসের জন্য যুদ্ধ করুক। আমি শুধু কায়ক্লেশে দু-মুঠা খাইয়া বাঁচিতে চাই। আমি পরিবর্তন, বিবর্তন, আবর্তন, সামাজিক উন্নতি, অর্থনৈতিক নয়া ব্যবস্থা, রাজনৈতিক স্বাধীনতা, কিছুই চাহি না, কিছুতেই বিশ্বাস করি না, ধার্মিকদের মুখে শুনিয়াছি, এই পৃথিবীরূপ কুকুরের লেজ কখনোই সিধা হইবে না। কাজেই হানাহানি হইতে দূরে থাকিয়া পৈতৃক প্রাণ রক্ষা করাই বুদ্ধিমানের কাজ। এইভাবে প্রবোধ দিয়া মনকে বাগাইয়া আনি, এমন সময় সাইরেন বাজিয়া উঠে। বয়সোচিত গাম্ভীর্য আর রাখিতে পারি না। পদমর্যাদা ভুলিয়া চাকরটার সম্মুখেই খাটের তলায় ঢুকি। আরও বিপদ হইয়াছে, পাড়ার ছেলেরা সাইরেনের নকল ডাক যখন তখন ডাকিয়া প্রাণ অস্থির করিয়া তোলে। রাত্রে একক শয্যায় ঘুম হয় না। যে গৃহিণীর অঞ্চল ধরিয়া ত্রিশ বৎসর কাল নিরাপদে কাটাইয়াছি, আজ বোমা সেই আশ্রয়স্থল হইতে আমাকে বঞ্চিত করিয়াছে। আজ আমি অসহায়, নিরুপায়। এ-হেন নিরীহ শ্রীকৃষ্ণের জীবকে মারিবার বা ভয় দেখাইবার জন্য কেন এ বোমা ফাটাফাটি।

৩

মেঘলা প্রভাত। পাতলা কুয়াশা বাতাসে ভাসিতেছে। চায়ের পেয়ালা ও সংবাদপত্র লইয়া বৈঠকখানায় বসিয়াছি। সিঙ্গাপুরের পতনের পূর্বে এমনকি পরেও দিনকয়েক অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া পড়িয়াছিলাম। এখন একটু প্রকৃতিস্থ হইয়াছি। কয়েকটা দিন মনটা আর আশা-নিরাশায় দোল খাইতেছে না। আচমকা বিপদের প্রথম আঘাতে মন মুহ্যমান হইয়া পড়িয়াছিল। ভূমিকম্পের মধ্যে মানুষ যেমন ঠিক হইয়া দাঁড়াইতে পারে না, অবস্থা অনেকটা সেইরূপ। এখন ভাগ্য ও নিয়তিকে বরণ করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছি। মধুপুরবাসিনী গৃহিণীর নিকট বীরত্বপূর্ণ বড়ো বড়ো চিঠি লিখিতেছি, বোমার ভয় আর রাখি না। গৃহের শূন্যতা সহিয়া গিয়াছে। যতদিন কলিকাতায় ট্রাম, বাস

চলিবে, মুদিখানা ও খাবারের দোকান খোলা থাকিবে, বাজার বসিবে, ততদিন ভৃত্য ও পাচক পঞ্চুকে লইয়া কলিকাতার মাটি কামড়াইয়া পড়িয়া থাকিব। এবং বোমা পড়ার পর মুড়ি ও মিছরি, কুলি ও কৌসুলি, ভাড়াটে ও বাড়িওয়ালা একাকার হইয়া গিয়াছে, সেই ভয়ার্ত সাম্যবাদ দেখিবার জন্য আমি বাঁচিয়া থাকিব। জীবনযাত্রা প্রণালিটা আরও ভালো লাগিত যদি বিপদের জন্য দিনের পর দিন অনিশ্চিত প্রতীক্ষা করিতে না হইত।

কয়েকদিন খবরের কাগজগুলা অত্যন্ত একঘেয়ে হইয়া উঠিয়াছে। মার্শাল চিয়াংকাইশেকের বিবৃতিটা পড়িতে পড়িতে ভাবাবেগে তন্ময় হইয়া উঠিয়াছি, এমন সময়, 'এই যে দাদা' বলিতে বলিতে নিতাই ঘরে ঢুকিতেই; 'আরে এসো এসো' বলিয়া অভ্যর্থনা করিলাম। নিতাই ফরোয়ার্ড ব্লকের পান্ডা, সম্প্রতি গা ঢাকা দিয়াছে; তা দিক, ছেলেটি বড়ো অমায়িক। দেশবিদেশের খবর ও গুজব ওর নখাগ্রে। ইংল্যান্ডের রাজারানি কলিকাতার কেল্লা হইতে কবে কানাডায় গিয়াছেন; হিটলার ক্রেমলিনে খানা খাইতেছেন, স্টালিন পলাতক, এসব খবরও নিতাই রাখে; টোকিয়ো, বার্লিন, সাইগন, নিউইয়র্ক, রিয়ো-ডি-জেনেরো আরও কত কী বেতারবার্তা তাহার মুখে শুনিয়া কখনও আনন্দে রোমাঞ্চিত, কখনও ভয়ে অভিভূত হই। নিতাই-এর সহিত যুদ্ধের আলোচনা করিব, এমন সময় পঞ্চু আসিয়া এক টাকার নোটখানি দু-আঙুলে ওরিয়েন্টাল ভঙ্গিতে, তুলিয়া ধরিয়া বলিল, 'বাবু কয়লার দাম চার আনা চড়েছে'। রাগে প্রায় লাফাইয়া উঠিলাম। পঞ্চুই চোর না কয়লাওয়ালাই মুনাফাখোর ঠাহর না পাইয়া ফুলিতেছি, নিতাই বাধা দিয়া বলিল, 'ও চার আনা দিয়ে দিন দাদা, বরঞ্চ আরও মন কয়েক আনিয়ে রাখুন, কাল হয়তো, দেড় টাকা হয়ে যাবে'। চাকরের হাতে পয়সা তুলিয়া দিয়া নিতাইকে বলিলাম—'গভর্নমেন্ট দাম বেধে দিলে পনেরো আনা অথচ চড়চড় করে পাঁচ আনা বেড়ে গেল? এ যে অরাজক কাণ্ড! যাই বল নিতাই তোমাদের ফরোয়ার্ড ব্লক মন্ত্রীরা কিচ্ছু না'।

নিতাই বাধা দিয়া বলিল, 'মন্ত্রীরা কী করবে শুনি। কেবল সৈন্য আর রসদ চলাচল; মালগাড়ি কই! এই দেখুন না, মফস্‌সলে ধানের দাম এই এক-মাসে তিন টাকা-সাড়ে তিন টাকা থেকে, দু-টাকা সোয়া দু-টাকায় নেমে গেল। খুলনা, বরিশাল, মেদিনীপুরে চাল পাঁচ টাকা মন আর কলকাতায় মন ৮/৯ টাকা, গাড়ি চলাচলের পথ বন্ধ হওয়াতেই এই অবস্থা'।

'মালগাড়ি না হয় নেই, নৌকোগুলোও কি নদীতে ডুবেছে'। নিতাই উত্তর দিতে দিতে ক্রমে রণনীতি ও অর্থনীতির জটিল গ্রন্থি খুলিয়া যেসকল তত্ত্বকথার অবতারণা করিল, তাহা হইতে মুক্তি পাওয়ার ফিকির দেখিতেছি, এমন সময় বসন্তবাবু খবরের কাগজ পাঠ ও আমাকে সঙ্গসুখ দিয়া ধন্য করিতে আসিলেন। নিতাইকে দেখিয়াই বসন্তবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কী হে নিতাই, তোমাদের বন্দি-মুক্তি আন্দোলনের কী হল'। 'সময় আসুক; দেখে নেবেন'— বলিয়া নিতাই গম্ভীর হইল। বসন্তবাবু খোঁচা দিয়া বলিলেন,— 'মুরোদ দেখা গেছে। শরৎবাবুর জন্য তোমাদের ব্লকের মন্ত্রীরা কি চাকুরি ছাড়ল। তোমরাও তো আর চাপ দেয়ো না?' নিতাই অপ্রস্তুত হইবার পাত্র নহে। সে বুঝিয়া বলিল,— 'রাজনীতি আপনি বোঝেন না; সময় আসুক, বন্দি-মুক্তি তো ছার; দেখবেন আমরা কী করি?'— নিতাই তাহার প্ল্যান বলিতে বলিতে চ্যালেঞ্জের ভঙ্গিতে দুই হাত ঊর্ধ্বে তুলিয়া বলিল,— 'বলুন সকলে দাই নিপ্পন, দাই নিপ্পন'।

বিস্ময়ে নিতাইয়ের মুখের দিকে চাহিলাম, পেশোয়ার হতে চট্টগ্রাম পর্যন্ত একটা গণসংগ্রামের বিভীষিকা মন তোলপাড় করিয়া তুলিল। করুণ হইয়া বলিলাম; 'এই দেখ নিতাই স্টেটসম্যান

লিখেছে যে, গঙ্গা, যমুনা ও ব্রহ্মপুত্রের পূর্বতীরে আসাম ও পূর্ববঙ্গ আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা ঘনিয়ে এসেছে। এমন সময় তোমরা—'

'এই তো চাই! চিয়াংকাইশেককে নিয়ে জওহরলালের নাচানাচি— ডিব্রুগড় থেকে চুংকিং রাস্তা— এসব বেকুবির খেসারত দিতে হবে না? আমরা তো হাত মেলাবার জন্য প্রস্তুত'। এইবার বসন্তবাবু দস্তুরমতো রাগিলেন,— 'দেখ নিতাই আসলে তোমরা কিচ্ছুই করবে না। তোমরাই না বলেছিলে গ্রামে গ্রামে মিলিশিয়া গঠন করে শত্রুর আক্রমণ থেকে দেশ রক্ষা করবে, এখন বলছ, হাত মেলাবার জন্য প্রস্তুত; এর কোন্‌টা সত্যি'? 'এই তো কূটনীতি'। — বলিয়া নিতাই যাহা বলিতে লাগিল, তাহা শুনিয়া অধৈর্য হইয়া উঠিলাম, কিন্তু নিতাইয়ের রসনা টংকার দিয়া শর সন্ধান করিতে লাগিল; 'আপনাদের দোষেই দেশটা ডুবল মশাই। বাঙালি ভদ্রলোকের আত্মপরায়ণতা আর কেবল স্ত্রী-পুত্র, টাকাকড়ির ভাবনা। জাতীয় জীবনের এতবড়ো সুযোগের কথা ভাবছেন না। ভাবছেন না, সমগ্র এশিয়ার সহসমৃদ্ধি,— মিলিশিয়া— দেখে নেবেন! এটা কেবল ইংরেজে জাপানে লড়াই নয়— আমাদের জাতীয় মুক্তিযুদ্ধের'— আর সহ্য করিতে পারিলাম না,— 'থামো ভাই, আমরা গেরস্ত মানুষ, রুজিরোজগারের ধান্দায় ফিরি— ওসব ব্যাপারে আমাদের জড়িয়ো না'। —চা খাইতে খাইতে নিতাই বলিল, 'বুঝবেন, বুঝবেন!'

নিতাই ও বসন্তবাবু চলিয়া যাইবামাত্র, পঞ্চু আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'বাবু জাপানিরা কি রেঙ্গুনে এসেছে!' পঞ্চু নিতাইয়ের বক্তৃতা বাহিরে দাঁড়াইয়া শুনিয়াছে। পঞ্চুর মনের ভাব আমি জানি, ওই সংবাদটির জন্যই সে পোঁটলাপুঁটলি বাঁধিয়া প্রতীক্ষা করিতেছে। গৃহিণীর বিরহও সহিয়া গিয়াছে, কিন্তু পঞ্চু পালাইলে, আমি আমার ছোটো নাতিটির মতো অসহায় হইয়া পড়িব। পঞ্চুকে প্রবোধ দিয়া বলিলাম— 'জাপানিরা রেঙ্গুনে আসলে তোর কী? জানিস, জাপানিরা রেঙ্গুন নিলেও আরও দু-হাজার মাইল জায়গা পড়ে থাকবে, কত পাহাড়পর্বত বনজঙ্গল— তার পর আছে লবণ সমুদ্র! কলকাতায় আসা কি চালাকি ব্যাপার!' কিন্তু পঞ্চু কেবল আমার কথা শোনে না, বাজারে ও ভৃত্যমহলে সে যেসকল কথা শুনিয়া আসে, তাহা আবার আমাকে শোনায়। এতদিন পরে বুঝিতেছি আমরা অর্থাৎ চাকুরিজীবী ভদ্রলোকেরা কত অসহায়। পঞ্চু পলাইলে জাপানি আসিবার পূর্বেই আমার পঞ্চত্ব প্রাপ্তি ঘটিবে। অথচ এই আমি, বসিয়া বসিয়া বড়ো বড়ো ভাবনা ভাবি— দেশরক্ষা জাতিরক্ষার প্ল্যান করি— এবং সংকট আসিলে বিপদের বুকে বসিয়া আমিই আপিস চালাইব— বড়োসাহেব এমন ভরসাও রাখেন। সত্যই ইংরেজ শাসনের সুশীতল শান্তি আমাদের কত বড়ো ভণ্ড করিয়া তুলিয়াছে। আমাদের ও পঞ্চুর মতো যেসব গোবেচারাদের লইয়া এ. আর. পি. ও সিভিক গার্ড করা হইয়াছে, একটা বোমা ফাটিলেই পশ্চিমি হাওয়ায় শিমুলতুলার মতো তাহারা যে কোথায় ভাসিয়া যাইবে তাহার পাত্তাই পাওয়া যাইবে না।

৬

মধুপুর হইতে গৃহিণী যেসকল পত্র লিখিতেছেন, তাহা সুখপাঠ্য নহে। আমি ঘন ঘন ভায়রার বাড়িতে যাই কেন এবং শ্যালিকা ও তাহার বিধবা ননদ-সহ প্রায়ই সিনেমা দেখিতে যাই কি না, এইসব প্রশ্ন তুলিয়া তিনি প্রত্যেক পত্রেই শ্লেষ ও বিদ্রূপ করিতেছেন। এই সাধারণ সংবাদগুলিকে অসাধারণ গুরুত্ব দিবার কোনো হেতু নাই। কলিকাতায় আমার জীবনযাত্রা সম্পর্কে গৃহিণী গোপনে সংবাদ সংগ্রহ

করিতেছেন, কথাটা ভাবিতেও মন বিরক্তিতে ভরিয়া উঠে। মনে মনে হাসিও পায়। বুঝিলাম, শ্যালিকা সরলভাবে বিরহিণী ভগ্নীর নিকট যে পত্র লিখিয়াছেন, তাহারই মন্থনে ঈর্ষার হলাহল উঠিয়াছে। হুজুরের মোকাবেলায় সওয়াল জওয়াব করিতে হইবে— মধুপুর যাত্রার দিন স্থির করিলাম।

সামনে দোলের ছুটি, তার সঙ্গে আর দুটা দিন যোগ করিলে কয়েকদিন মধুপুরে থাকিয়া আসিতে পারিব মনে করিয়া বড়োসাহেবের শরণাপন্ন হইলাম। তিনি বড়ো রাশভারী মানুষ। হোটেলে ক্লাবে স্বজাতিমহলে তাঁহার মেজাজ রাত্রে বড়ো দিলদরিয়া হয়; কিন্তু আপিসে একেবারে ধ্যানী বুদ্ধের মতো গম্ভীরমূর্তি— আপন অটল মহিমায় অটুট থাকিয়া ভারতীয়দের প্রতি কৃপাদৃষ্টিপাত করেন। কাজের কথা ছাড়া তিনি কস্মিনকালেও কোনো কথা বলেন না, আজ অত্যন্ত হৃদ্যতার সহিত অন্তরঙ্গতা করিতে দেখিয়া অবাক হইয়া গেলাম। 'তোমরা কী ভাবছ?' বলিয়া তিনি দৃষ্টি বিস্ফারিত করিলেন। বুঝিলাম, তোমরা অর্থাৎ দেশি লোকেরা, এবং বিষয়বস্তু হইল যুদ্ধ। আমি বলিলাম, সিঙ্গাপুর ডিঙিয়ে জাপানিরা বর্মায় ঢুকেছে, এখন বোমা ছাড়া আর কোনো কথা নেই— সকলেই ভাবছে, কলকাতায় জাপানিরা কবে আসবে?' সাহেব চেয়ারে দেহ প্রসারিত করিয়া বলিলেন, 'শুনতে পাই, ইংরেজ বেকায়দায় পড়েছে বলে তোমাদের খুশির সীমা নেই?' 'কথাটা সত্যি, জাপান আসুক, এটা আমরা চাইনে, তবে ইংরেজের গর্ব খর্ব হচ্ছে দেখে অনেকেই আনন্দিত'। 'কেন আমরা কি তোমাদের কোনো উপকার করিনি?' 'উপকার এক কথা আর মর্যাদার সঙ্গে ব্যবহার আর-এক কথা। হৃদয়ের সহিত সম্পর্কহীন দাক্ষিণ্যে মানুষের মন পীড়িত হয়। এদেশে তোমরা চাকরি কর, ব্যবসায় কর, কেবল কাজের খাতিরে দেশি লোকের সঙ্গে মেশ, কিন্তু কখনও আমাদের সঙ্গে হৃদ্যতা ও সামাজিকতার সম্পর্ক রাখ না। আপিসের পর ভারতীয় সমাজের ছোঁয়াচ বাঁচিয়ে তোমরা ক্লাবে হোটেলে নিজেদের সঙ্গে মেলামেশা কর; ভারতীয় জীবনের কোনো খোঁজখবর রাখ না। বয়, বেয়ারা, খানসামা, বাবুর্চিদের আচারব্যবহার দেখে ভারতীয় চরিত্র আন্দাজ কর। আয়া, মেথরানির জারঘটিত কলঙ্কের কাহিনি ক্লাবে আলোচনা করে ভারতীয় চরিত্র সম্পর্কে অশ্রদ্ধা প্রকাশ কর। পরস্পরের মধ্যে এই অপরিচয়ের ব্যবধান; অবিশ্বাস, অসন্তোষ সৃষ্টি করেছে দীর্ঘদিন ধরে'— সাহেব আমার কথা সম্পূর্ণ সত্য বলিয়া স্বীকার করিলেন না, তিনি বলিলেন, 'দোষ দুই পক্ষেরই। অতীত ইতিহাসের তিক্তস্মৃতি সত্ত্বেও, আমরা বুঝতে পারছি, ভারতের ও আমাদের স্বার্থ এক'— আলোচনা ক্রমে রাজনীতিতে আসিয়া পড়িল। উপসংহারে তিনি বলিলেন, 'মি. বোস মাঝে মাঝে তোমার সঙ্গে এরূপ আলোচনার সুযোগ পেলে সুখী হব'। যুদ্ধের গরমে বড়োসাহেবের কড়া মেজাজও নরম হইয়াছে,— ছুটিটা মঞ্জুর হইল।

সাহেবের কামরা হইতে নিজাসনে ফিরিবামাত্র কয়েকজন আগাইয়া আসিল। এতক্ষণ কী কথা হইল জানিবার জন্য সকলেই উদ্‌গ্রীব। গম্ভীরভাবে বলিলাম, 'সিঙ্গাপুর বর্মায় আমাদের অনেক ক্ষতি হয়ে গেল, সাহেব বললেন, মিস্টার বোস, আপিসের অর্ধেক কেরানি কমিয়ে দাও'। উৎসাহদীপ্ত মুখগুলি নিষ্প্রভ হইয়া গেল। কৃত্রিম সহানুভূতির সুরে বলিলাম, এখন তো দেশে যাও সব, পৈতৃক প্রাণ বাঁচলে চাকরি অনেক মিলবে। তিন-চারটি কণ্ঠ হইতে একই আর্তসুর উঠিল— দেশে তো যাব; খাব কী; আর গাম্ভীর্য রক্ষা করিতে পারিলাম না; হাসিয়া বলিলাম, 'তোমরাও ভালো, শুনিয়ে দিয়ে এলাম কড়া কড়া কথা। এতদিন পর আমাদের ওপর দরদ হয়েছে; স্পষ্টই বললাম, তোমরাই আমাদের দফা শেষ করেছ, এখন তোমরাই জাপানি ঠ্যালা সামলাও, আমাদের কী'। চাকুরি যাইবে না আশা পাইয়া সকলেই যার যার কাজে ফিরিয়া গেল।

পরদিন সকালবেলা পঙ্কুকে লইয়া হাওড়ায় আসিয়া দেখি— সমস্ত শহরবাসী পাগলের মতো প্রত্যেকটি ট্রেন আক্রমণ করিতেছে— কামরায় কামরায় ধস্তাধস্তি, বচসা! অনেক কষ্টে দ্বিতীয় শ্রেণির এক কামরায়, একটা স্টিল ট্রাংকের উপর বসিবার ঠাঁই মিলিল। গাড়ি ছাড়িবার পর, সমবয়সি মুখোমুখি ভদ্রলোকটি অর্থপূর্ণ ভঙ্গিতে প্রশ্ন করিলেন, পালাচ্ছেন বুঝি! বিরক্ত হইয়া বলিলাম, বুধবারই কলকাতা ফিরব। ভদ্রলোক হাসিয়া বলিলেন, ও আপনারও আমার মতো হাল দেখছি। আলাপ জমিয়া উঠিল। ইনি দেওঘরে পরিবারবর্গ স্থানান্তরিত করিয়াছেন, প্রতি সপ্তাহেই যাইতে হয়, খরচ বাড়িয়াছে, ইত্যাদি। বর্ধমান পৌঁছিবার পূর্বেই— গাড়িতে যুদ্ধের আলোচনা মুখর হইয়া উঠিল। এক জন প্রত্যক্ষদর্শীর ভঙ্গিতে সিঙ্গাপুর পতনের কাহিনি বর্ণনা করিতে লাগিলেন। জাপানের অস্ত্রবলকে মন্ত্রবলের ঐন্দ্রজালিক ভূমির উপর দাঁড় করাইয়া, তিনি যেসব আজগুবি কথা বলিতে লাগিলেন, তাহার সমর্থনের অভাব দেখিলাম না। জাপানিরা সুন্দরবনের জঙ্গল ও বালেশ্বরের বেলাভূমি হইতে দু-মুখো আক্রমণ চালাইয়া কীভাবে কলিকাতা দখল করিবে, তাহার নিখুঁত ও নির্ভুল বিবরণ সকলে হাঁ করিয়া গিলিতেছেন,— আমি মৃদুভাবে সন্দেহ প্রকাশ করিতে, বক্তা বিজ্ঞজনোচিত অনুকম্পার ভঙ্গিতে আমার বুদ্ধিবিবেচনার উপর কটাক্ষপাত করিলেন। আলোচনা চলিতে লাগিল, মধুপুর স্টেশনে আসিয়া নিষ্কৃতি পাইলাম।

বাসায় পৌঁছিলাম, আশঙ্কা করিয়াছিলাম যে, গৃহিণী মুখ ভার করিয়া থাকিবেন, কিন্তু তাঁহার হাসিমুখ দেখিয়া আপাতত খুশি হইলাম। মনের কোণে আশঙ্কা থাকিল, ঝড়টা বুঝি-বা রাত্রেই উঠিবে। কিন্তু সেরূপ কিছু হইল না। কলিকাতার গল্প ও সাধারণ ঘরসংসারের কথার ফাঁকে ঘুমাইয়া পড়িলাম। প্রভাতে 'ভালমন্দ দ্রব্যের' ফর্দ লইয়া বাজারে গেলাম। বাজারে চেনা মুখের অভাব নাই। অ্যাটর্নি বন্ধু অমিয় ঘেঁসিয়া আসিল এবং কতকগুলি স্থূল রসিকতা করিয়া বলিল, 'বিকেলে চা-টা অন্তত আমার ওখানেই খেয়ো। সকাল সকালই ছেড়ে দেব, বউদিদির ভয় নেই'।

চায়ের পর্ব চলিতে চলিতে, সন্ধ্যা ঘনাইয়া চতুর্দশীর চাঁদ উঠিল। সামনের বাগান হইতে ফুলের গন্ধ ঝিরঝিরে হাওয়ায় ভাসিয়া আসিতেছিল। কলিকাতার বন্ধজীব আমি, প্রকৃতির স্নেহস্পর্শে উন্মনা হইয়া উঠিলাম। যৌবনের হারানো দিনের স্মৃতি ভাসিয়া উঠে, দু একটা কবিতার ভগ্নাংশও মনে পড়িয়া যায়, গুনগুন করিয়া গাহিতে ইচ্ছা হয়, 'এমন চাঁদের আলো, মরি যদি সেও ভালো'। এলোমেলো চিন্তায় বাধা পড়িল, ব্যারিস্টার মি. ব্যানার্জি কৌতুকের সঙ্গে বলিলেন, অমিয় আর দেরি কেন, দিব্যি চাঁদের আলো—। হুইস্কি সোডা গ্লাস আসিয়া হাজির হইল। আমি বিদায় লইবার ভঙ্গিতে বলিলাম, 'অমিয়, তোমরা আনন্দ করো, আমি উঠি'। অমিয় হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিল, আরে দাদা সে কি হয়? খাঁটি স্কচ হুইস্কি— এর পর আর মিলবে না কতদিন কে জানে। মি. ব্যানার্জি মিনতি করিয়া বলিলেন, কবে জাপানি বোমায় মারা যাবেন, মি. বোস, বন্ধুর অনুরোধ রাখুন। এই বোমার হিড়িকে ভেবেই মরে যেতাম, এই হুইস্কিই বাঁচিয়ে রেখেছে। গৃহিণীর মুখারবিন্দ স্মরণ করিয়া বলিলেন,— তুমি তো জান অমিয়! মদ ও সোডা মিশাইতে মিশাইতে অমিয় হাসিয়া বলিল, 'জানি জানি, তুমি আড্ডা ছাড়বার পরও মদ ছাড়নি। প্রসবের পর বউদিদিকে সবল করবার জন্য ব্র্যান্ডি কিনতে, তার বেশির ভাগ যেত তোমারই পেটে'। 'হ্যাঁ সে এক-আধটু মাঝে মাঝে চলত এখন একেবারে ছেড়েছি'। মি. ব্যানার্জি রসিকতা করিয়া বলিলেন, 'তা হলেই বুঝুন মি. বোস, মাতাল সাসপেন্ড হয়, ডিসমিস হয় না, এও তো এক দিনের মামলা'।

শেষপর্যন্ত রেহাই পাইলাম না। সংকল্প করিয়াছিলাম, দুই পাত্রের বেশি অগ্রসর হইব না কিন্তু শেষপর্যন্ত মাত্রাধিক্য ঘটিয়া গেল, আমার যৌবনের দুর্বলতা অমিয় জানে। পুরাতন কথা টান দিয়া ভাবাবেগময় আলোচনার মধ্যে বোতল শেষ হইল।

আহারের সময় গৃহিণী টের পাইলেন, কিছুই বলিলেন না। এ যাত্রা বাঁচিয়া গেলাম ভাবিয়া যখন শয্যায় গিয়াছি, দরজায় খিল দিয়া গৃহিণী প্রথম চোটেই বুঝিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কীসের গন্ধ শুনি? আবার ছাইপাঁশ ধরেছ? সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করিয়া বলিলাম,— 'আজ কেবলমাত্র ভদ্রতার খাতিরে'— তিনি ঝংকার দিয়া উঠিলেন, 'ভদ্রতার খাতিরে না পড়লে এই বয়সে আর রেণুকাকে নিয়ে সিনেমায় যাবার শখ হবে কেন?' গৃহিণী খোঁচা মারিয়া যেসব কথা বলিলেন তাহা শুনিয়া দুই কর্ণে কনিষ্ঠাঙ্গুলি দিয়া বলিলাম, 'নারায়ণ! নারায়ণ! তুমি আমাকে এতটা সন্দেহ করতে পারলে!' উদরস্থ পদার্থ তখন মস্তিষ্কে উঠিয়াছে। মাথায় হাত দিয়া শপথ করিলাম, হাতে হাত দিয়া মিনতি করিলাম, তাঁর রোষ ক্রন্দনে ভাঙিয়া পড়িল। আমার ভবিষ্যৎ ভাবিয়া এবং নিজের দগ্ধ দুর্ভাগ্যকে ধিক্কার দিয়া তিনি যেসব কথা বলিতে লাগিলেন, এই যুদ্ধকালীন জরুরি বিরহ ব্যতীত তাহা কিছুতেই সম্ভব হইত না। ত্রিশ বৎসরের একানুরক্ত স্বামীর চরিত্রে এত সন্দেহ এই কয়দিনেই মনের কোণে জমিয়া উঠিয়াছে! বুঝিলাম বোমা বাড়িঘর ঘায়েল করিবার পূর্বেই আমার মতো হতভাগ্যের পরম নিশ্চিন্ত একান্ত নির্ভরপর দাম্পত্য জীবনের ভিত্তিতে ফাটল ধরাইয়াছে! নিরুপায়ের অশ্রু গড়াইয়া পড়িল, বালিশের কোণ দিয়া মুছিতেছি দেখিয়া গৃহিণী যাহা করিলেন, — সে কথা এ বয়সে বলিতে লজ্জা করে।

বাঙালির প্রতিষ্ঠান

নির্মলকুমার বসু

প্রায় বাইশ-তেইশ বৎসর পূর্বের ঘটনা। আমরা তখন স্কটিশ চার্চেস কলেজে পড়ি। হঠাৎ আমাদের মধ্যে কয়েকজনের মনে হেদুয়া পুষ্করিণীতে একটি সাঁতারের ক্লাব স্থাপন করিবার বাসনা হইল। তাহার কয়েক মাস পূর্বে হেদুয়ায় সেন্ট্রাল সুইমিং ক্লাব প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। আমরা দল বাঁধিয়া কলেজের অধ্যক্ষ ওয়াটসাহেবের কাছে মনের অভিলাষ ব্যক্ত করিলাম। তিনি খুব খুশি হইলেন এবং পরদিন এ বিষয়ে আলোচনা করিবেন বলিয়া আশ্বাস দিলেন। ওয়াটসাহেব তখন আমাদের *বাইবেল* পড়াইতেন, কিন্তু ক্লাসে এক *বাইবেল* ছাড়া অন্য প্রায় সবরকম আলোচনাই হইত, ছাত্রদের ব্যায়ামশালায় যোগদান করা কর্তব্য, কী করিলে স্কটিশ চার্চেস কলেজের ছাত্রগণ কলেজের মুখ উজ্জ্বল করিতে পারে, ইত্যাদি। ওয়াটসাহেবের কথাবার্তার মধ্যে কোনোদিন তাঁহাকে বলিতে শুনি নাই, 'তোমরা আমার ছাত্র, আমার মুখ উজ্জ্বল করো।' তিনি সুযোগ পাইলেই আমাদিগকে শুনাইতেন, 'তোমরা স্কটিশ চার্চেস কলেজের ছাত্র, স্কটিশ চার্চেস কলেজের ছাত্রের পক্ষে এইরূপ করা উচিত, এইরূপ করা উচিত নয়', ইত্যাদি।

যাহাই হউক, পরদিবস *বাইবেল* ক্লাসে আসিয়া প্রথমেই তিনি সাঁতারের ক্লাবের বিষয় উত্থাপন করিলেন। তিনি বলিলেন আমাদের উৎসাহ দেখিয়া তিনি যৎপরোনাস্তি আনন্দিত হইয়া সেন্ট্রাল সুইমিং ক্লাবের কর্মকর্তার নিকট হইতে ক্লাবের নিয়মাবলি সমস্ত জানিয়া আসিয়াছেন। মাত্র চার আনা পয়সা দিয়া প্রত্যেকে সভ্য হইতে পারিবে। তদ্ভিন্ন আরও আট আনা দিয়া ব্যাজ কিনিতে হইবে এবং সুইমিং কস্টিউমে তাহা আঁটিয়া লইতে হইবে। ব্যস, তাহা হইলেই হইল। আমরা তো অবাক। কোথায় নিজেদের একটি ক্লাব হইবে, তাহাতে কেহ সেক্রেটারি, কেহ ট্রেজারার হইব, তা নয়, একেবারে অন্য একটি ক্লাবের মধ্যে ওয়াটসাহেব আমাদের তলাইয়া যাইবার ব্যবস্থা সাঙ্গ করিয়া আসিয়াছেন! আমরা তখন ভাঙা ইংরেজিতে যতখানি বলা চলে, ততখানি জোরের সঙ্গে আমাদের স্বতন্ত্র ক্লাব গড়িবার বাসনা জ্ঞাপন করিলাম। ওয়াটসাহেব মনযোগ সহকারে সব কথা শুনিলেন। তাহার পর তিনি একটি সুদীর্ঘ বক্তৃতা দান করিলেন, যাহার সারমর্ম নিম্নে প্রদত্ত হইল।

ওয়াটসাহেব বলিলেন, 'আমি তোমাদিগকে আজ যাহা বলিতেছি, তাহা ইংরেজ হইয়া তোমাদের দোষ প্রদর্শন করিবার জন্য বলিতেছি, এরূপ ভাবিয়ো না। তোমাদের শিক্ষকরূপেই একটি কথা আমি বলিতে চাই। বাংলা দেশে একটি বিষয় আমি লক্ষ করিয়াছি, যাহা ইংল্যান্ডে বা স্কটল্যান্ডে সচরাচর দেখা যায় না। সেখানে আমরা কোনো প্রতিষ্ঠান থাকিলে তাহাকে আরও বড়ো প্রতিষ্ঠানে পরিণত করিবার চেষ্টা করি। নিজেদের প্রভুত্বের আকাঙ্ক্ষা থাকিলে সেই প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সদলবলে প্রবেশ করিয়া তাহাকে দখল করিয়া বসি। কিন্তু একটির পাশে আর-একটি স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠান গড়িবার কল্পনাও করি না।

'তোমাদের মধ্যে অন্যরূপ দেখিতেছি। ইহা ভালো নয়। সামাজিক শক্তির পক্ষে ইহাতে অনিষ্ট হয়। আজ যদি হেদুয়া সরোবরে তোমরা অপর একটি ক্লাব গঠন কর, তবে হেদুয়ার জলকে দুই দিন পরে দ্বিখণ্ডিত করিতে হইবে, এ পক্ষের লোক অপর পক্ষের এলাকায় সাঁতার কাটিলে মনোমালিন্যের সৃষ্টি হইবে। অতএব তোমাদিগকে সেন্ট্রাল সুইমিং ক্লাবের সভ্যরূপে সাঁতার কাটিতে হইবে, তাহা ছাড়া উপায়ান্তর নাই।'

অধ্যক্ষের কথা শুনিয়া আমরা দমিয়া গেলাম, কিন্তু স্বাতন্ত্র্য কে সহজে বিসর্জন দিতে চায়? অবশেষে সেন্ট্রাল সুইমিং ক্লাবের কর্তৃপক্ষ ওয়াটসাহেবের সুপারিশে আমাদের ব্যাজে ক্লাবের নাম ছাড়া আমরা স্কটিশ চার্চেস কলেজের ছাত্র, ইহার নির্দেশক S.C.C. চিহ্নও থাকিবে, এইরূপ শর্তে রাজি হইয়া গেলেন। আমরাও সেই হইতে অখণ্ড হেদুয়া সরোবরে সাঁতার কাটিয়া বাঁচিলাম।

ব্যাপারটি যে সময়ে ঘটিয়াছিল, তখন সমাজের বিষয়ে আমাদের মাথা ঘামাইবার বয়স নয়। মাথা আমরা অবশ্য ঘামাইতাম, কিন্তু ফল কিছুই ফলিত না। কেননা সমাজের তত্ত্ব সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞানও ছিল না, বাঙালির সম্বন্ধে জ্ঞানের সীমা ততোধিক পরিমিত ছিল। পরবর্তীকালে সমাজের নানাবিধ সংঘাতের মধ্যে পড়িয়া, রাষ্ট্রনৈতিক কোনো কোনো প্রতিষ্ঠানে কাজ করিয়া বাংলা দেশের প্রতিষ্ঠান এবং বাঙালির প্রতিষ্ঠান চালাইবার কতকগুলি অভ্যাসের পরিচয় পাইয়াছি, তাহার বিষয়ে আলোচনা করা কর্তব্য বলিয়া মনে হইতেছে।

কিছুদিন পূর্বে বীরভূম জেলায় মুচি, হাড়ি ও ডোমেদের দ্বারা অধ্যুষিত একটি পল্লির মধ্যে বাস করিতে হইয়াছিল। মাঝে মাঝে আমাদের মিটিং হইত এবং মিটিং ভিন্নও সভা করিয়া হরিনাম সংকীর্তন *রামায়ণ* পাঠ অথবা সময়বিশেষে ভাদুর গানের পালাও বসিত। এই সকল অধিবেশনে একটি বিচিত্র ব্যাপার আমরা প্রায়ই লক্ষ করিতাম। কলিকাতা শহরে কোনো মিটিঙে দেখিয়াছি, যাঁহার বক্তৃতা ভালো লাগে না, তিনি সচরাচর বিনা বাক্যব্যয়ে মিটিং ছাড়িয়া উঠিয়া যান। মিটিং যেন হাবড়া স্টেশন, দরকারে লোকে সেখানে আসে, কাজ ফুরাইলে চলিয়া যায়। হাবড়া স্টেশনের দাবি তো কাহারও উপর নাই। কেবল দুই-চারি জন সজ্জনকে লক্ষ করিয়াছি, যাহারা যাইবার জন্য সভাপতির নিকট অনুমতি লইয়া তবে বাহির হইয়া যান। ইংরেজগণের এক-আধটি মিটিঙে গিয়াছি, সেখানে সকলেই ওইরূপ আচরণ করিয়া থাকেন। হয়তো ইংল্যান্ড দেশে সভার তাহাই নিয়ম। কলিকাতায় অধিকাংশ শ্রোতা সেরূপ নিয়মের বশবর্তী নহেন।

কিন্তু হাড়ি এবং ডোমেদের সভায় বিচিত্র ব্যাপার লক্ষ করিয়াছি। সভা হয়তো বসিয়া গিয়াছে, তখন কেহ আসিলে প্রথমে সমগ্র সভাকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করে, তাহার পর সভাস্থ হয়। সভার একটি স্বতন্ত্র সত্তাকে তাহারা স্বীকার করে এবং সেখানে নিজেও বসিলে নিজেকে সভারই অঙ্গস্বরূপ বিবেচনা করে, স্বীয় পৃথক অস্তিত্বের কথা ভুলিয়া যায়। ইহা এক বিচিত্র নিয়ম। অথচ ইহাও বুঝি যে,

সভাকে, সমাজকে, সমগ্রকে যদি আমরা ক্ষুদ্রের সমষ্টিমাত্র না ভাবিয়া তাহা অপেক্ষা মহত্তর স্থান দিই, তবেই মানুষের সামাজিক জীবন দৃঢ় হয়, সমাজ আমাদিগকে পোষণ করে।

প্রাচীন স্মৃতিগ্রন্থ পাঠ করিয়া আমার এই ধারণাই হইয়াছে যে, পূর্বকালে ভারতবর্ষে সমাজকে একসময় সর্বময় কর্তৃত্বের আসন দেওয়া হইয়াছিল। ব্যক্তি তাহার নিকট আত্মনিবেদন করিত, সমাজও ব্যক্তিকে পোষণ করিত, রক্ষা করিত। অশিক্ষিত সমাজের মধ্যে সমাজের প্রতি সেই আনুগত্যের ভাব এখনও দেখিতে পাওয়া যায়, শিক্ষিত বাঙালি সমাজে তাহা লুপ্ত হইতে বসিয়াছে। ইংরেজদের সমাজ জীবন্ত, বৃদ্ধিশীল, সেখানেও ওই আনুগত্যের লক্ষণটি বর্তমান। দুর্ভাগা কলিকাতা শহরের শিক্ষিত বাঙালিই যেন পুরাতন ভারতের আনুগত্যটুকু হারাইয়াছে, উপরন্তু ইংরেজের মতো নতুন কোনো সমাজিক বোধও লাভ করিতে পারে নাই।

ইহার কারণ কী? আর সামাজিক বোধ এবং আনুগত্য যদি জাতীয় মঙ্গলের পক্ষে প্রয়োজনীয় বস্তু হয়, তবে তাহা লাভ করিবার উপায়ই বা কী?

বিষয়টি ভাবিয়া দেখিবার মতো। কিছু ভাবিবার চেষ্টাও করিয়াছি, তবে ঠিক ঠিক বুঝিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। যদি অপরে বর্তমান প্রবন্ধ পড়িয়া এই বিষয়ে চিন্তিত হইয়া উঠেন এবং আলোচনায় প্রবৃত্ত হন, তবে মঙ্গল হইবে, সন্দেহ নাই।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে বাঙালি জাতির দুরবস্থা ঘনাইয়া উঠিয়াছিল। দেশে তখন অরাজকতা ব্যাপকভাবে দেখা দিয়াছে, সকলের ধন এবং মান বিপন্ন। সমাজের কোন ক্ষমতা নাই, রাষ্ট্র এবং সমাজ সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছে। আগে সমাজ যেমন ব্যক্তির নিকটে আনুগত্য দাবি করিত, তেমনিই রাষ্ট্র তাহাকে রক্ষা করিত, প্রত্যেকে স্বীয় জাতীয় বৃত্তির দ্বারা অন্নসংস্থান করিতে না পারিলে সমাজপতি বা রাষ্ট্রপতিগণের নিকটে অভিযোগ করিতে পারিত এবং তাঁহারাও এ বিষয়ে যথাযথ ব্যবস্থা অবলম্বন করিতেন। কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দীর রাষ্ট্রশক্তিবিহীন সমাজ জীর্ণ হইয়া পড়িল। মানুষকে রক্ষা করিবার শক্তি তাহার আর রহিল না, সে কেবল মানুষের নিকট আনুগত্যের দাবি করিতে লাগিল।

এই জীর্ণ সমাজ শুচিবায়ুগ্রস্তের মতো, বহিরঙ্গে শুচিতা বজায় রাখিয়া নিজের পরাধীনতার গ্লানিকে ভুলিবার চেষ্টা করিয়াছিল। রঘুনন্দনের আমল হইতেই আভ্যন্তরিক শুচিতার দ্বারা অন্তরের গ্লানি মোচনের চেষ্টা আমরা দেখিতে পাই। কিন্তু সে বিষয়ে আলোচনা আজ নিষ্প্রয়োজন। উনবিংশ শতাব্দীর নরনারী ইংরেজি শিক্ষা লাভ করিল, আরও সরলভাবে প্রকৃতির দিকে, মানব-সমাজের দিকে, ধর্মব্যবস্থার দিকে চাহিয়া দেখিতে শিখিল। বাঙালি অত্যল্প কালের মধ্যেই আবিষ্কার করিল যে, হিন্দুসমাজ শুধু শাসন করিতে চায়, পোষণ করিতে পারে না। যাহার পোষণ করিবার ক্ষমতা নাই, তাহার আনুগত্যের দাবিকে কেহই স্বীকার করে না। ফলে গোটা উনবিংশ শতাব্দী ধরিয়া আমরা নানা দিক হইতে হিন্দু-সমাজের শাসনবিভাগের বিরুদ্ধে নানাবিধ অভিযোগ ও বিদ্রোহের প্রকাশ দেখিতে পাই।

ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য শিক্ষিত বাঙালির ধর্ম হইয়া দাঁড়াইল এবং ফলত হিন্দুসমাজের বন্ধন উত্তরোত্তর শিথিল হইতে লাগিল। সময়ে সময়ে ইংরেজের প্রতি রাগ করিয়া বাঙালি এক নব-হিন্দুধর্মের জয়গান করিয়াছিল বটে, কিন্তু সে বাঙালিও ইংরেজি বইয়ে শেখা ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের জয়গান করিতে পশ্চাৎপদ হয় নাই। স্বামী বিবেকানন্দ ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের পুরোহিতছিলেন, তিনি ইংরেজির পরিবর্তে বেদান্তের মারফত নূতন স্বাতন্ত্র্যধর্ম প্রচার করিলেন, তাহাতে হিন্দুর জাতীয় মানও রক্ষা পাইল, অথচ ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যও প্রচারিত হইল। স্বামীজিও কিন্তু সমাজের এই কলেবরকে তীক্ষ্ণ কুঠারাঘাতের দ্বারা খান খান করিতে

পশ্চাৎপদ হন নাই। তাঁহার অত্যল্পকালব্যাপী চেষ্টায় নূতন সমাজ গড়িয়া উঠা সম্ভব হয় নাই বটে কিন্তু পুরাতন সমাজ তাঁহার নির্মম আঘাতে আমূল প্রকম্পিত হইয়া উঠিয়াছিল।

উনবিংশ শতাব্দীর সামাজিক ইতিহাস হইতে আমরা শিক্ষিত বাঙালির মনকে খানিক বুঝিতে পারি। সমাজের প্রতি আনুগত্যের কথা বলিলেই তাহার মন ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিত। পুরাতনকে ভাঙিতে হইলে এরূপ ভাব নিতান্ত প্রয়োজন। কিন্তু আজ যাহা প্রয়োজন. কাল তাহা তো অনাবশ্যক হইতেও পারে।

আমার মনে হয়, বাঙালির সেই যুগ আসিয়াছে! পুরাতন সম্পূর্ণ না ভাঙিলেও অনেক খানি ভাঙিয়া গিয়াছে। ভাঙার কাজ প্রায় শেষই হইয়াছে। কিন্তু যদি বাঙালিকে বাঁচিতে হয়, তবে তো শুধু স্বাতন্ত্র্য-বুদ্ধির দ্বারাই সে বাঁচিবে না, তাহাকে নূতন সমাজ বাঁধিতে হইবে, যে সমাজ আজিকার জগতে যেন তাহাকে জীবন দান করিতে পারে। এবং সেই সমাজের প্রতি তাহাকে আবার একটি একনিষ্ঠ আনুগত্যের ভাব নির্মাণ করিতে হইবে। মনে হয়, আজ সেই মুহূর্ত আসিয়াছে, এবং সেইজন্যই শিক্ষিত বাঙালির মধ্যে সামাজিক বোধের অভাবকে লক্ষ করিয়া আমাদের মনে পীড়ার উদয় হইতেছে। সভায় বাঙালির অসামাজিক আচরণ, শহরের পথে, ট্রামে, বাসে পরের সুবিধা-অসুবিধার প্রতি নিদারুণ অবহেলার ভাব, সমিতির মধ্যে দায়িত্ববোধের একান্ত অভাব, কর্তব্যের সম্বন্ধে আশ্চর্য রকমের ঔদাসীন্য সেইজন্য বোধ হয় আমাদিগকে আজ এত পীড়া দিতেছে। কেবলই মনে হইতেছে, আজ নূতন করিয়া বাঁচিবার দিন আসিয়াছে। এমন অবস্থায় আমাদের প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানকে, প্রত্যেক সংঘকে জাতীয় জীবনের পোষণকার্যের জন্য নূতন শক্তিতে গড়িয়া তুলিতে হইবে। এমন অবস্থায় যদি সমাজের প্রতি আনুগত্যের জন্য ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যকে অপরিসর পথে পরিচালিত করিতে হয়, তাহাতেই বা ক্ষতি কী? আজ যে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য আমরা ভোগ করিতেছি, তাহার দ্বারা আমাদের চারিদিকের মানুষ কতটুকুই বা লাভবান হইতেছে? সে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের বৃক্ষে কীই বা এমন ফুল ফুটিয়া উঠিয়াছে, যাহার সৌরভ নষ্ট হইলে সমগ্র জগৎ ক্ষতিগ্রস্ত হইবে?

এইরূপ নানাবিধ চিন্তা বাঙালির সভায়, সমিতিতে, শিক্ষাগারে বসিয়া বহু সময় মনে হইয়াছে। হয়তো আমার মতো অপরেও শিক্ষিত বাঙালির অসামাজিকতা দেখিয়া পীড়িত হইয়াছেন। তাঁহাদের নিকটে ইহার মূল কারণ এবং তাহা নিরাকরণের উপায়ের সম্বন্ধে শ্রবণ করিতে ইচ্ছা হয়। অনেকের মনেই যদি নূতন সমাজ গঠনের বাসনা সঞ্জাত হয়, তবে অদূর ভবিষ্যতে বাঙালির জীবনে যে তাহার সুফল ফলিবে এ বিষয়ে কোনো সংশয়ের কারণ নাই।

উৎস : *'নবীন ও প্রাচীন' গ্রন্থ, শনিবারের চিঠি*, অগ্রহায়ণ, ১৩৪৭।

বাংলাদেশ : সমকাল

সমর সেন

প্রথমেই প্রদেশের নাম নিয়ে গণ্ডগোল। দুবছর আগে ঢাকার একটি সাংবাদিকের সঙ্গে আলোচনার সময় 'বাংলাদেশ'-এর রাজনীতি, পার্টি ও নেতাদের বিরুদ্ধে কিছু বিরূপ মন্তব্য করায় ভদ্রলোকটি বেশ গম্ভীর হয়ে গেলেন। তিনি মুজিববাদী ছিলেন না, কিন্তু বলেছিলেন যে মুজিব ছাড়া দুর্ভাগ্যক্রমে আর কোনো নেতা নেই, মুজিব বেশ কিছুদিন চালিয়ে যাবেন। দিনটা ছিল ১৪ আগস্ট। তার পরদিন সপরিবারে মুজিব বিগত হন। সাংবাদিকের ভারাক্রান্ত মুখ দেখে মনে পড়ল আমি পশ্চিমবঙ্গের নেতাদের সমালোচনা করছি, কিন্তু সাধারণ কথাবার্তায় আমরা পশ্চিমবঙ্গ না বলে বলি 'বাংলাদেশ'। তাই গণ্ডগোল।

পূর্ব পাকিস্তান হবার পর প্রথমে ওখানকার বাংলা ভাষায় বহু অপ্রচলিত উর্দু, ফারসি ইত্যাদি শব্দ জোর করে ঢোকান হয়, উর্দুকে রাষ্ট্র ভাষা করার চেষ্টা চলে। ভাষা আন্দোলনের সময় থেকে ওখানকার জনসাধারণ ও বুদ্ধিজীবীরা সে-সব শব্দ আবার বরবাদ করে নিজেদের সংস্কৃতি অনুযায়ী ভাষা ব্যবহার শুরু করেন। সুতরাং ১৯৭১ সালের পর নিজেদের দেশের নামকরণে (বাংলাদেশ) ওদের দ্বিধা বা অসুবিধা হয়নি। দেশ বিভাগের পর আমরা বাংলাদেশ বলে পরিচয় দিলে সেটা ভবিষ্যতে পররাজ্য গ্রাসের একটা মতলব বলে মনে হতে পারত। কিন্তু 'পশ্চিমবঙ্গ' নামটা জনগ্রাহ্য নয়। এ-বিষয়ে জ্যোতি বসু কিছু করতে পারেন, অবশ্য কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে আলোচনা করে। বেশি দেরি করা অনুচিত, কিছুদিন পর তাঁকে এ-বিষয়ে হিন্দিতে আলোচনা করতে হবে। আর একটা সমস্যার সৃষ্টি হবে।

পশ্চিমবঙ্গের নানা সমস্যার আলোচনা করা এই প্রবন্ধ-লেখকের ক্ষমতার বাইরে। কেননা কোনো জিনিসের 'গভীরে' ঢোকা আমার স্বভাবে নেই। বেশ কিছুদিন ধরে বাঙালিরা ফিচ্‌লে, আড্ডাবাজ ও উন্নাসিক। তাছাড়া তিরিশ-চল্লিশ দশকের আড্ডায় তবু যা গুরুগম্ভীর, জ্ঞানগর্ভ, আলোচনা চা-সিগারেটের সাহায্যে অল্পস্বল্প চলত তা এখন সম্ভব নয়। চা আজকাল বুদ্ধি শানায় না। অথচ তরল মাদকদ্রব্যে ফুর্তির ভাবটা যত বাড়ে, আলোচনার সার পদার্থ তত কমে। এর ব্যতিক্রম

আছে। অনেক ছোটো পত্র-পত্রিকার বিষয়বস্তু তার প্রমাণ। কিন্তু এদের সংখ্যা বড়ো বেশি। অর্থ ও লোকবল একত্র করে যদি মোটামুটি সহধর্মী বুদ্ধিজীবীরা অসংখ্য পত্র-পত্রিকার পরিবর্তে কয়েকটির দিকে মন দেন তাহলে তাঁদের বার্তা বেশি পাঠকের কাছে পৌছবে। গোষ্ঠীর সংখ্যাধিক্য পশ্চিমবঙ্গের আর একটি সমস্যা।

১৯৪৭ ও তার পরেকার পর্যায়ে ফেরা যাক। পূর্ব পাকিস্তান থেকে অনেক ছিন্নমূল উদ্‌বাস্তু এখানে এসেছেন। একসঙ্গে নয়, খেপে খেপে। কেন্দ্রীয় সরকার তাদের পুনর্বাসনের জন্য এমন কিছু করেননি যতটা করেছেন উত্তর ভারতে। এখানে কিন্তু একটা দুটো কথা বলা দরকার। দেশবিভাগের সময় লেখক দিল্লিতে ছিলেন। পাঞ্জাব, দিল্লি ইত্যাদি জায়গায় বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে যে বীভৎস নরমেধ চলে, লক্ষ লক্ষ লোক আদিবাস ছেড়ে চলে আসতে বাধ্য হন, নতুন জায়গায় গিয়ে যে সমস্যার মুখোমুখি হন, তার তুলনা পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল। তবু তো বলা হয় Peaceful transfer of power! একহিসেবে সঠিক। যাঁরা ক্ষমতা পেলেন তাঁদের কোন ক্ষতি হয়নি, তাঁরা মর্মস্পর্শী বক্তৃতা দেবার সুযোগ পেয়েছেন।

পূর্ব পাকিস্তান ও পশ্চিমবঙ্গে উত্তর ভারতের মতো ভয়াবহ তাণ্ডব ঘটেনি : মাঝে মাঝে গণ্ডগোল বেধেছে। লোক মরেছে, আতঙ্কে অনেকে এখানে চলে এসেছেন। পশ্চিমবঙ্গের উদ্‌বাস্তুদের সংখ্যা, কাগজে পড়েছি ৪০ লক্ষ। এখান থেকে কতজন পূর্ব পাকিস্তানে গিয়েছেন? এখানকার উদ্‌বাস্তুরা সবাই কলকাতায় বা আশেপাশে নেই, অনেককে বাইরে পাঠানো হয়েছে, যেমন দণ্ডকারণ্যে। অবশ্য অনুর্বর জমিতে, কঠিন পরিবেশে যেখানে ডাল ভাত ইলিশ মাছ খাওয়া নদীনির্ভর প্রাণীদের জীবনযাত্রা দুরূহ। উদ্‌বাস্তুদের আগমন পশ্চিমবঙ্গের ওপর চাপসৃষ্টি করে, সন্দেহ নেই। কিন্তু ১৯৭১ সালে, ইন্দিরা গান্ধির মতে, এক কোটি শরণার্থী এখানে হু হু করে এসেছিলেন। বিয়ের দিনে, জামাইষষ্ঠীতে যেখানে বাজারদর হু হু করে চড়ে সেখানে এক কোটি বাড়তি লোক সত্ত্বেও জিনিসপত্রের দাম তেমন বাড়েনি। এটা ভাববার বিষয়।

অনেকে বলেন 'বাঙালিরা' অলস তাই তাঁরা নতুন করে সংসার গড়ে তুলতে পারেননি। আসলে পশ্চিমবঙ্গের অনেকের মনোবৃত্তি উন্নাসিক, উদ্‌বাস্তুরা সরকারি বেসরকারিভাবে যথেষ্ট সহানুভূতি পাননি। আলস্যের প্রসঙ্গে একটি ঘটনা মনে হল। ১৯৪৭-এ দিল্লিতে কনট প্লেসে একটি ফুটফুটে বাচ্চা ছেলে বিকেল বেলায়, আমাকে বলল ওখানকার একটি দৈনিক পত্রিকা কিনতে। ছেলেটি উদ্‌বাস্তু। বললাম পত্রিকাটি আমি সকালে পড়েছি, ওটার দরকার নেই, দামটা দিয়ে দিচ্ছি। ছেলেটি নিল না। কিছুদিন পরে দেখা গেল উদ্‌বাস্তু পরিবারে অনেক মেয়েরা জামাকাপড় ধোওয়া, সেলাই, গরম রোটি সরবরাহের ব্যবস্থা করে নিয়েছেন অনেক স্থানীয় বাসিন্দাদের সঙ্গে। ওদের মধ্যে আলস্য চোখে পড়েনি। পরে অবশ্য কেন্দ্রীয় সরকার প্রচুর পয়সা ঢেলেছেন, সম্পত্তির বিনিময় হয়েছে। এখন দিল্লির পুরনো মুঘল আদব-কায়দা, আদাব, সেলাম আলেকম সংস্কৃতি প্রায় মুছে গিয়ে পাঞ্জাবি হিন্দু ও শিখদের প্রবল আধিপত্য। শুনেছি ১৯৬৫ সালের ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের পরে পাঞ্জাবি ঠিকেদার ও অন্যান্য ব্যবসায়ীরা প্রচুর পয়সা করেছেন, গৃহনির্মাণ যে ভাবে এগিয়েছে তাতে আগেকার দিল্লি আর নেই, এমন কি ওখানকার ঐতিহাসিক স্মৃতিচিহ্নের বেশির ভাগ আধুনিক ঘরবাড়ি অফিসের আধিক্যে ও চাকচিক্যে প্রায় চোখে পড়ে না।

দিল্লি থেকে এসে কলকাতা ও পশ্চিমবঙ্গের সম্বন্ধে হতাশা বেড়ে চলে। দিল্লি বম্বের তুলনায় কলকাতাকে মফস্‌সল শহর মনে হয় যদি, তাহলে সত্যিকার মফস্‌সল শহরগুলির অবস্থা অনুমান করা সহজ। তবু এই শহরের পিছনে যা অর্থব্যয় হয়, যে-সব পরিকল্পনা চালু করার প্রচেষ্টা চলেছে তা ভস্মে

ঘি ঢালা। সমাজ অর্থনৈতিক কাঠামো, বিত্তবানদের মনোভাব, ব্যবসায়ী ও শিল্পপতিদের মুনাফাপ্রীতি এমন যে টাকার মা-বাপ নেই। তিরিশ বছর কংগ্রেসিরা বেশ কিছু কামিয়ে নিয়েছেন দেশ ও দশের নামে। দেশের সমান অগ্রগতির নামে কেন্দ্রীয় সরকার পূর্ব ভারত শোষণের যে ব্যকথা চালু করে গেছেন তাতে পশ্চিবঙ্গ পিছিয়ে পড়েছে সব ব্যাপারে— সঙ্গে সঙ্গে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বিহার, ওড়িষ্যা, আসাম। দেশের সর্বত্র ইস্পাতের দাম সমান, অন্য দ্রব্যমূল্য সাধারণত নির্ণয় করে মুনাফাখোরেরা। এ বিষয়ে বিস্তারিত লিখেছেন রণজিৎ রায়, মার্কসবাদী আমার কয়েকজন বন্ধু অবশ্য তাঁর সঙ্গে একমত নন। কিন্তু বাঙালির, শিক্ষিত বাঙালির একটা অভিমান ও আক্রোশ বেড়ে চলেছে। পাতাল রেলওয়ে, স্টেডিয়াম, হাওড়ায় দ্বিতীয় ব্রীজ, হলদিয়া, টেলিভিশন নিয়ে অর্থব্যয় চলেছে। পাতাল রেলওয়ের টাকাটা মফস্‌সলে ঢাললে পশ্চিমবঙ্গের নিঃসন্দেহে উন্নতি হত। গ্রামাঞ্চলের কথা তোলা বাতুলতা। কেননা বেশির ভাগ লোক সেখানে থাকেন, জমিতে খাটেন দৈনিক মজুরিতে বা ভাগচাষী হিসেবে। তাঁরা মহাজন ও জোতদারদের মুখাপেক্ষী, ধর্মঘট তাঁরা করতে পারেন না। বছরের বেশির ভাগ সময় কোনো কাজ থাকে না। কিছু কিছু পরিবার কলকাতায় এসে পথে-ঘাটে সংসার পাতেন, কিছু লোক কাজ পায়। মেয়েরা ভিক্ষা করে। তবু তাঁরা বলেন গ্রামের চেয়ে শহরের ফুটপাত ভালো। গ্রামে সাহায্য করার কেউ নেই। এখানে বাবুরা দু-এক পয়সা দেন, ছোটখাটো রেস্তোরাঁয়, খাবার দোকানের, গৃহস্থালির উচ্ছিষ্ট বা বাড়তি খাবার পাওয়া যায়, বর্ষার সময় কপাল ভালো থাকলে গাড়ি বারান্দায় মেলে আশ্রয়। চালের চোরাকারবার আছে।

গ্রাম বাংলার সমস্যা আমূল ভূমি সংস্কারের সমস্যা। আসলে পশ্চিমবঙ্গ কেন, গোটা দেশের সমস্যা জট পাকিয়ে এমন জায়গায় এসেছে যে স্তোকবাক্য, গান্ধিবাদ, যোগ, হঠযোগ, জোড়াতালি দিয়ে কিছু করা যাচ্ছে না। একটি জিনিস ঘটেছে, যেটা শাসক শ্রেণির পক্ষে ভালো নয়। বিভিন্ন নেতা ও দলের আসল চেহারাটা আজকাল জনসাধারণ চটপট ধরে ফেলে। 'জনতা ঢেউ' এসেছিল মার্চের নির্বাচনে। তারপর এলো জনতা পার্টির খেয়োখেয়ি, অনৈক্য, বড়লোক প্রীতি, গ্রামে হরিজন ও অন্যান্য শ্রেণির প্রতি জনতা জোতদারদের প্রচণ্ড অত্যাচার। ফলে উত্তর প্রদেশে মার্চের তুলনায় জনতার ভোট ১৫ শতাংশ কমেছে, বিহারে ও অন্যান্য অঞ্চলেও কমেছে। বিপদের লক্ষণ হল কংগ্রেসের ভোট বৃদ্ধি শ্রীমতীর আনাগোনা, বেদান্ত ভক্তি, অনুশাসন পর্বের সন্তের সঙ্গে তিনদিনের আলাপ-আলোচনা। প্রিয়দর্শিনী ক্ষমতায় ফিরে এলে আশা করি আচার্য মুষল পর্বকে অভিনন্দন জানাবেন। বিপদের কথা উঠত না যদি কংগ্রেস বা জনতার বিকল্প কোন বামপন্থী পার্টি মাথা তুলে দাঁড়াত। অন্যথা বিভিন্ন জায়গায় খণ্ডযুদ্ধের সম্ভাবনা আছে। ইতিমধ্যে দু-একটা জায়গায় নাকি চলেছে। এটা অন্য পথ। সাংবিধানিক পথ নয়। তবু হয়ত শেষ পর্যন্ত জনগণ এই পথের দিকেই ঝুঁকবে। পশ্চিমবঙ্গ ব্যতিক্রম নয়। যাহোক ততদিন আমরা ভাঙা হাটে কাঁসর ঘণ্টা বাজিয়ে যাব। আমাদের আছে সত্যজিৎ রায়, জ্যোতি বসু, বিশ্বকবিপুষ্ট সাচ্চা সংস্কৃতি। আমরা মধ্যবিত্তরা, যারা বেকার নই, চালিয়ে যাব। ভারতচন্দ্র বলে গিয়েছেন :

ভবিষ্যৎ ভাবি কেবা বর্তমানে মরে।
প্রসবের ভয় তবু পতিসঙ্গ করে।

যোগাভ্যাস করলে ভয়টাও থাকবে না।

একটা বয়সে, সমাজব্যবস্থার উল্লেখযোগ্য পরিবর্তনের আশু সম্ভাবনা না থাকলে, ভবিষ্যতের কথা ভাবা যায় না। মনে হয়, এইভাবে কেটে যাবে কাল। হতাশার ভাব মাঝে মাঝে হয়; সব সময় হলে তার থেকে একটা কিছু বেরিয়ে আসার সম্ভাবনা থাকে। কিন্তু ক্ষণিক হতাশা আর অভ্যাসবশে দিনগত পাপক্ষয় করে গেলে অবস্থাটা হয় হাফ্-গেরস্তের মতো।

কৈশোর ও যৌবনে নানা প্রত্যাশা ছিল। ব্যক্তিগত আশা-অভীপ্সার কথা তোলা বোধহয় নিরর্থক, কেননা সাধারণ মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলেদের ভাবনা-চিন্তায় বিশেষ ফারাক থাকে না। পরীক্ষা পাস করা, ভালো চাকরি পাওয়া, সুন্দরী স্ত্রী (ফর্সা রং মানে আমাদের দেশে সুন্দরী), ছেলেপিলে বেশি নয়, কয়েকজন বন্ধুবান্ধব (অন্দরে তাদের ঘন ঘন আনাগোনা অবশ্য উচিত নয়), বার্ধক্যে পেনশন, অল্পদিন ভুগে মহাপ্রস্থান ইত্যাদি। এ-সব অবশ্য আশা-অভীপ্সা, অনেকের জীবনে বাস্তবে পরিণত হয় না, শেষেরটা বাদে। বাস্তব বড়ো হিসেবি, নির্মম। বাস্তবকে বদলানো মানে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কাঠামো বদলানো। ভাবতে ভালো লাগে কিন্তু অনেকের সাধ্যে কুলোয় না।

শারীরিক কারণে যৌবন বড়ো যন্ত্রণার কাল। তখন ফ্রয়েডকে ঋষি মনে হয়, কিন্তু বয়েস বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সংসারের চাপে সে-যন্ত্রণা কেটে যায়, সঙ্গম অভ্যাসে পরিণত হয়। মানুষ শরীর সর্বস্ব নয় তার প্রমাণ, যৌবনে দেহগত জ্বালার সঙ্গে সঙ্গে অনেকে বাইরের জগৎ সম্বন্ধে সচেতন হন।

ছেলেবেলায় ভাবতাম, এই শালা গোরাদের হাত থেকে কবে রেহাই পাবো। মিশনারি কলেজে ভর্তি হয়ে সাহেব অধ্যাপকদের ব্যক্তিগতভাবে খারাপ লাগত না, কিন্তু সাহেবদের রাজত্ব থেকে মুক্তি, অর্থাৎ স্বাধীনতার চিন্তা অক্ষুণ্ণ ছিল। মুক্তিলাভের পথ বিষয়ে নানা মুনির নানা মত। আমাদের চরিত্রে সন্ত্রাসবাদের প্রভাব বেশি, তাই গান্ধিপন্থা হাস্যকর মনে হত, চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন, ম্যাজিস্ট্রেট নিধন মনে বেশ উত্তেজনার সৃষ্টি করত। ১৯৩০-৩১-এ একবার দেশবন্ধু পার্কে পুলিশের লাঠির তাড়নায় গান্ধিপন্থীদের মুক্তকচ্ছ পলায়ন এখনো মনে আছে। আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে জড়িত না থাকলে নাক-উঁচু ভাব সহজেই আসে। তাছাড়া ছেলেবেলায় মেয়েদের সভায় মা সোনার বালা খুলে গান্ধিজিকে দেওয়াতে তিনি আমাকে একটি মাত্র কমলালেবু দিয়েছিলেন—সেই অসম বিনিময়ের ব্যাপারটি কখনও

কিছুদিন পরে আন্দামান-ফেরৎ সন্ত্রাসবাদীদের অনেকে মার্কসবাদী হলেন, লাল ঝান্ডার কথা শুনলাম, সিডনি ও বিয়েট্রিস ওয়েবের রাশিয়া বিষয়ক বই পড়লাম, তার আগে রবীন্দ্রনাথের *রাশিয়ার চিঠি* আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল; অনেকে স্থির সিদ্ধান্তে পৌছলেন যে সাম্যবাদী পথ ছাড়া দেশের মুক্তি অসম্ভব! *রাশিয়ার চিঠি* ১৯৩১-এ প্রকাশিত হয়। তার বছরখানেক পরে রবীন্দ্রনাথ জার্মানিতে তাঁর নাতি নীতিনকে নাকি উপদেশ দিয়েছিলেন যে সে যেন কিছুতেই মানুষখেগো বলশেভিকদের পাল্লায় না পড়ে। অল্প বয়সে নিতুর মৃত্যু হওয়াতে সে বিপদ তার ঘটেনি। আমরা অবশ্য বরাবর রাশিয়া ও স্তালিনের ভক্ত। রুশ-জার্মান যুদ্ধের সময় মনে হয়েছিল 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলন হঠকারিতা, যদিও যাঁরা সে আন্দোলনে যোগ দিয়েছেন, মারা গিয়েছেন তাঁদের সম্বন্ধে কোনো বিরূপ ভাব ব্যক্তিগতভাবে আমার ছিল না। তাঁরা আন্তরিক মানুষ, কিন্তু রাজনীতি তো অন্য ব্যাপার, লেনিন বলেছেন 'there is no sincerometer in politics.' তখন মনে হত, রুশ-জার্মান যুদ্ধের পরিণতি দেখার জন্য অন্তত বেঁচে থাকা দরকার। স্তালিন বলেছিলেন যে মস্কো, লেনিনগ্রাদ ও স্তালিনগ্রাদ কখনো পড়বে না। পশ্চিম ইউরোপে নাৎসি বাহিনীর প্রবল পরাক্রম ও প্রথমদিকে রাশিয়ায় বিদ্যুৎগতি—ইত্যাদি কারণে স্তালিনের ঘোষণা সম্বন্ধে মনে একটা

খটকা ছিল, কিন্তু বাইরে প্রকাশ করিনি। স্তালিন কম কথা বলতেন, প্রথম বিপর্যয়ের পর মাঝে মাঝে যুদ্ধের গতি বিষয়ে যা বলতেন, তা অক্ষরে অক্ষরে ফলে। এখন অনেকে স্তালিনের নিন্দায় মুখর। তিনি ভুলভ্রান্তি করেছেন, অকারণে অনেকের প্রাণহানি করিয়েছেন, সন্দেহবাতিকে ভুগতেন, কিন্তু সব মিলিয়ে তাঁর মতো পুরুষ ছিল বলে রাশিয়া বেঁচে গেছে। একটা কথা মনে হলে এখন মাঝে মাঝে মাথা চুলকোই। চিনের খবর কিছু কিছু আসত, Edgar Snow-র *Red Star over China* পড়েছিলাম, কিন্তু ইংরেজি শিক্ষা— বা অশিক্ষার ফলে আমরা বড়ো বেশি ইউরোপমুখী ছিলাম। মাও সে-তুং-এর রচনাবলির প্রতি তেমন একটা ঝোঁক ছিল না তখন যতটা ছিল স্তালিনের লেখার প্রতি। তাছাড়া রাশিয়ার স্বার্থে আমাদের কম্যুনিস্ট পার্টি নিজেদের নীতি নির্ধারিত করত। তখন মনে হত সব ঠিক, রাশিয়া বাঁচলে বাপের নাম। মূলত হয়ত তাই, কিন্তু 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনের সময় কম্যুনিস্টদের বিরোধিতা বোধহয় ঠিক ছিল না। অবশ্য যে পরিপ্রেক্ষিতে প্রস্তাব পাশ করে কংগ্রেস নেতারা হাঁপ ছেড়ে জেলে চলে গেলেন, পুলিশ আসতে নেহরু বলে উঠেছিলেন—'Hurrah, they have come!' জাপানি বাহিনীর নিকটবর্তিতা গান্ধিজির ওপর যে প্রভাব ফেলেছিল, তাতে অনেকের মনে সন্দেহের উদ্রেক হওয়া অস্বাভাবিক নয়। এখানে একটি জিনিস স্বীকার করি নির্ভয়ে, কেননা মার্চের নির্বাচনের সময় থেকে আমাদের নির্ভীক হতে বলা হয়েছে— নেতাজির প্রতি আমার বিশেষ অনুরাগ ছিল না। একটা কারণ, ভারত ত্যাগের পর ওঁর বিষয়ে তথ্যের অভাব। তিনি, পরে জেনেছি, হিটলারের রাশিয়া আক্রমণের বিরোধী ছিলেন। আরও কিছু তথ্য পরে বেরোবে। ১৯৩৭ সালে, কংগ্রেস সভাপতি তখন, নেতাজি মুসোলিনির সঙ্গে গোপন সাক্ষাতের চেষ্টা করেন চিঠিপত্রের মাধ্যমে। শত্রুর শত্রু আমার মিত্র। ভেবে দেখলে ব্যাপারটা খারাপ নয়। নেতাজির প্রতি বিরাগের একটা ব্যক্তিগত কারণ থাকতে পারে। শরৎবাবুর বাড়ির একজন বললেন যে তাঁর মেয়ের বিয়েতে আমাকে ডাকা হবে না কেন না জাতে আমি তাঁতি। মহারাজা কাশিমবাজার পলিটেকনিক স্কুলে আমাকে কাঠ ও তাঁতের কাজ শিখতে হত। তাঁতি শুনে খটকা লাগল। বাড়িতে এসে বাবাকে জিজ্ঞেস করতে তিনি খেপে আগুন— আমরা বদ্যি, প্রায় বামুনের সমান, অশৌচের কাল আমরা কমিয়ে দিয়েছি, আমরা পৈতে নিই ইত্যাদি (নেড়া হবার ভয়ে আমি নিইনি, দিল্লিতে বিয়ের সময় শ্বশুরমশায়ের পৈতে ধার করেছিলাম)। কিন্তু শরৎবাবুর মেয়ের বিয়েতে আমার নিমন্ত্রণ হল না। আমার বাবা অবশ্য সুভাষচন্দ্রের অনুগামী ছিলেন, সেজন্য জেলেও যেতে হয় যুদ্ধের সময়। যাইহোক বেঁচে থাকা সার্থক হল, লাল বাহিনী বার্লিনে প্রবেশ করল।

তারপর উঠল আমরা কিভাবে স্বাধীন হব তার কথা। গণ-আন্দোলনের বদলে গণহত্যা, কলকাতায় নরক, মারীর বীজ চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল। নেতাদের কচকচানি হিসেব-নিকেশের অন্ত নেই, এদিকে বহু নরনারী শিশু স্বর্গলোকে চলে গেল 'স্বাধীনতা'র হত্যাকাণ্ডে। কলকাতায় ১৯৪৬-এ গণ্ডগোল শুরু হবার দিন দুয়েক আগে দিল্লি চলে যাই, কর্মস্থলে। সাম্প্রদায়িক হত্যার নমুনা দেখেছি দিল্লিতে ১৯৪৮-এর সেপ্টেম্বরে, স্বাধীনতা প্রাপ্তির হপ্তা দুই তিন পরে। স্বাধীনতা দিবসে আমার পুলক হয়নি। এখনও প্রতি বছর ১৫ আগস্টে দিল্লির তাণ্ডবের কথা মনে পড়ে। তার ওপর দিনটা অ-তরল।

স্বাধীনতার পর কম্যুনিস্ট পার্টি আবার অবৈধ হল, তেলেঙ্গানায় অভূতপূর্ব আন্দোলন নির্মমভাবে দমন করল ভারতীয় সৈন্যবাহিনী ও রাজাকাররা। সেসময় একজন কম্যুনিস্ট, যাঁর যুক্তি-তর্ক প্রখর, আমাকে দিল্লিতে বলেন যে পশ্চিমবঙ্গে, বিশেষ করে কলকাতায় বিপ্লব শুরু হয়ে গিয়েছে, জয়লাভের দেরি নেই। কলকাতায় চাকরি নিয়ে ফিরলাম। কাগজে পড়লাম যে, বাসে ট্রামে পটকা ছোঁড়া হচ্ছে ইত্যাদি। রণদিভের 'হঠকারিতা'র যুগ। তিনি তখন মাওবিরোধী।

কম্যুনিজমের জয়লাভ দেখার জন্য বেঁচে থাকার সার্থকতা তখন ছিল, বুদ্ধির দিক দিয়ে। অন্যান্য ব্যাপারে অবশ্য এমন কিছু খারাপ ছিলাম না।

কলকাতায় ফেরার কিছু দিন আগে মাও সে-তুং-এর বাহিনী অভূতপূর্বভাবে চিনে নতুন যুগের প্রবর্তন করল। তার কিছুদিন পর শুরু হল কোরিয়ার যুদ্ধ। ফলাফল সম্বন্ধে অত্যন্ত আগ্রহ ছিল। তারপর অত্যন্ত বিচলিত করেছিল ১৯৫৬ সালে স্তালিনের প্রতি আক্রমণ। 'দেখিলাম থাকে না কিছুই'। ১৯৫৭ সালে চাকরি নিয়ে মস্কো যাই। সেখানে রুশদের কাছে স্তালিনের প্রতি আমার অনুরাগ কখনও গোপন করিনি। মধ্যবয়সীরা বিশেষ কিছু মনে করতেন না, একলা থাকলে। সবচেয়ে নিষ্ঠুর ছিল স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা। এরাই এখন আমেরিকানদের আদর্শে জীবনযাত্রা চালিয়ে যাচ্ছেন।

তারপর, বেঁচে থাকার প্রয়োজন বোধ করেছিলাম, ভিয়েতনামের যুদ্ধের সময়। প্রবল পরাক্রান্ত মার্কিন বাহিনীর বিরুদ্ধে কীভাবে লড়ে ভিয়েতনাম শেষ পর্যন্ত জয়লাভ করল তা ইতিহাসে পরিণত হয়েছে।

প্রবাসী বাঙালির প্রতি স্বদেশবাসী বাঙালি

প্রমথনাথ বিশী

কোনো এক উপলক্ষ্যে আমি লিখিয়াছিলাম যে, বাংলা দেশে বাঙালির সংস্কৃতি নষ্ট হইয়া গেলেও বাংলার বাইরে যেসব প্রবাসী বাঙালি পত্তন গড়িয়া উঠিয়াছে সেখানে এই সংস্কৃতি বাঁচিয়া থাকিবে।

প্রবাসী বাঙালিদের কেহ কেহ ইহাতে আপত্তি করিয়াছিলেন।

তবে কি সেখানেও বাঙালি সংস্কৃতি থাকিবে না? হয়তো তাই। হয়তো আমি দূর হইতে প্রবাসী বাঙালিদের অবস্থা না বুঝিয়া অকারণ আশা পোষণ করিয়াছি। আমার বিশ্বাসে সন্দেহের ছায়াপাত ঘটিলেও সে বিশ্বাস এখনও যায় নাই। না যাইবার পক্ষে কতকগুলি কারণ আছে— আজ তাহাই সংক্ষেপে বলিতে চেষ্টা করিব।

বাঙালির সংস্কৃতি ও ভারতীয় সংস্কৃতিতে গোড়ায় একটা ভেদ আছে। বাঙালির সংস্কৃতি প্রধানত উনবিংশ শতকে গড়িয়া-ওঠা বস্তু; ভারতীয় সংস্কৃতি বহু প্রাচীন; তাহার আবাস প্রধানত উত্তর ভারতে।

বাঙালির সংস্কৃতি এদেশে ইংরেজ আসিবার পরে গড়িয়া উঠিয়াছে— তাহার পূর্বে যা ছিল, তাহা ভারতীয় সংস্কৃতি হইতে ভিন্ন নয়। উনবিংশ শতকে ইউরোপের দীক্ষায় বাঙালি যে সংস্কৃতি গড়িয়া তুলিয়াছে— সমগ্র ভারতবর্ষে তাহা ছড়াইয়া পড়িয়াছে— ইহাতে বাঙালির গৌরব করিবার আছে— কিন্তু ইহাকে ভারতীয় সংস্কৃতি বলা নিরর্থক। কারণ ইহার মূলের যোগ ভারতবর্ষের মাটিতে নয়, ইউরোপের মাটিতে; ইহাই বাঙালি সংস্কৃতির মৌলিকত্ব।

এখন প্রশ্নটা এই— বৈদেশিক মৌলিকত্ব লইয়া একটা সংস্কৃতি দীর্ঘকাল বাঁচিয়া থাকিতে পারে কি না? জাতির জীবনে চিরকালীন রস-সঞ্চয় দিতে পারে কি না? যদি তাহা পারে তবে এই পরগাছা সংস্কৃতির ফুল যতই সুন্দর হোক না কেন তাহা কিছুদিনের মধ্যে ঝরিয়া পড়িবে; — তাহাকে বাঁচাইবার একমাত্র উপায় দেশের মাটির সঙ্গে তাহার মূলের সংযোগ সাধন। অর্থাৎ বাঙালির সংস্কৃতি যদি বাঁচিতে চায়, তবে তাহাকে ভারতীয় সংস্কৃতির সঙ্গে সংযুক্ত হইতে হইবে। বাংলা দেশে সে সুযোগ কম; বাংলার বাইরে বাঙালির পত্তনে, বিশেষ, উত্তর ভারতে যেসব বাঙালি

পত্তন গড়িয়া উঠিয়াছে, সেগুলির এই সুযোগ আছে। সে সুযোগ প্রবাসী বাঙালিরা গ্রহণ করিবে কি না— অনেকটা নিজেদের রুচি ও বাঁচিবার ইচ্ছার উপর নির্ভর করে। প্রবাসী বাঙালিরা কী বলিবেন জানি না, কিন্তু নিজেদের অজ্ঞাতসারে নিশ্চয় তাঁহারা অন্তত কিয়ৎ পরিমাণেও ভারতীয় সংস্কৃতিকে গ্রহণ করিয়াছেন— যে পরিমাণে করিয়াছেন, সেই পরিমাণে তাঁহাদের জীবনের দলিল পাকা হইয়াছে।

বাঙালি কোনো কালেই যে ভারতীয় সংস্কৃতিকে সর্বতোভাবে গ্রহণ করিতে পারে নাই, তার কারণ বাঙালির আত্মকেন্দ্রিক প্রাদেশিকতা। প্রাদেশিকতার অভিযোগে প্রবাসী বাঙালিরা নিশ্চয়ই বিস্মিত হইতেছেন— তাঁহারা হয়তো বলিবেন, অন্যান্য প্রদেশের প্রাদেশিকতার ধাক্কায় তাঁহারা যখন কোণঠাসা হইতেছেন, তখন তাঁহাদের বিরুদ্ধে এ অভিযোগ শুধু অন্যায় নয়, নির্মমও বটে।

কিন্তু প্রাদেশিকতা শব্দকে আমি বর্তমান রাজনৈতিক অর্থে ব্যবহার করি নাই। বর্তমান রাজনীতি ও অর্থনীতির ব্যবস্থার ফলে, চাকরির কড়াকড়িতে, আইন পরিষদে আসন দখলের মারামারিতে ও সরকারি তহবিলে রজত-রস দোহনের লুব্ধ উন্মত্ততায় একরকম প্রাদেশিকতা গড়িয়া উঠিয়াছে— বাঙালি সেখানে অত্যাচারী নয়, অত্যাচারিত। যদিচ তাহার হাতে ক্ষমতা থাকিলে যে সে ইহার বিপরীত করিত তাহা না ভাবিবার যথেষ্ট কারণ আছে।

কিন্তু আমি প্রাদেশিকতা সম্পূর্ণ অন্য অর্থে ব্যবহার করিয়াছি— ইহাকে সংস্কৃতির প্রাদেশিকতা বলা যাইতে পারে; এই প্রাদেশিকতা সাম্প্রতিক রাজনৈতিক প্রাদেশিকতার চেয়ে গভীরতর ও অশুভকর; এইজাতীয় প্রাদেশিকতার ফলে রজত-রস ও জীবন-রস দুইয়েরই অভাব ঘটে; ইহাতে নিজে যুগপৎ বিকৃত অঙ্গ ও ব্যঙ্গ করিতে থাকে—বাঙালি এইজাতীয় প্রাদেশিকতার নাটের গুরু!

জানি আমার অভিযোগ গুরুতর, কাজেই কিছু ব্যাখ্যার আবশ্যক।

বাঙালি জাতির ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যাইবে ভারতবর্ষের পূর্বতম প্রান্তের এই দেশে যাহারা সময়ে সময়ে আসিয়া বসতি স্থাপন করিয়াছে— উত্তর ভারতের সঙ্গে তাহাদের বনিবনাও হয় নাই; কোনো কোনো সম্প্রদায় বা ধর্মমতের অনৈক্যের জন্য; কোনো সম্প্রদায় বা রাজপীড়নের ভয়ে; কোনো সম্প্রদায় বা পুরাতন স্থানে আত্মপ্রতিষ্ঠা করিতে না পারিয়া এই দেশে চলিয়া অসিয়াছে— আর এইসব অনৈকচারী সম্প্রদায় জ্ঞাতসারে ও অজ্ঞাতসারে ভারতবর্ষের ঐতিহ্যকে অবহেলা করিয়াছে; ভারতবর্ষও তাহাদের দণ্ড দিতে চেষ্টার ত্রুটি করে নাই। তীর্থযাত্রা ছাড়া এদেশে আসিলে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে এমন বিধান আছে— ইহা আর কিছু নয়, এই অনাচারী জাতিটাকে একঘরে করিয়া রাখিবার চেষ্টা মাত্র।

ইহার অনুরূপ জাতিগঠনের ইতিহাস আমেরিকায় ঘটিয়াছে। ইউরোপের তাড়া-খাওয়া সম্প্রদায় আমেরিকায় গিয়াছে; কোনোটা সম্প্রদায় বা ধর্মের জন্য, কোনোটা-বা রাজনীতির জন্য, কোনোটা-বা সহজে পয়সা উপার্জনের জন্য; আর বহু লোক, চোর-ডাকাতশ্রেণি— রাজদণ্ড এড়াইবার জন্য।

ফলে হইয়াছে এই যে আমেরিকীয় নামে একটি জাতি কাগজে কলমে থাকিলেও বাস্তবে সেদেশে ইউরোপের বিভিন্ন জাতি নূতন পরিবেশে রহিয়াছে মাত্র; জার্মান-আমেরিকান, ফরাসি-আমেরিকান, স্পেনীয়-আমেরিকান, ইংরেজ-আমেরিকান।

তবে এই জাতিসন্নিবেশ প্রক্রিয়া বাংলা দেশে বহুকাল আগে ঘটিয়াছে বলিয়া মূল জাতির কথা বাঙালি ভুলিয়া গিয়াছে— কিন্তু যে অনৈক্যের দরুন তাহারা উত্তর ভারত ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিল সেই অনৈক্যকে ভারতীয় সংস্কৃতির বিরুদ্ধে বিদ্রোহে রূপান্তরিত করিয়া রক্তের মধ্যে জাগ্রত করিয়া রাখিয়াছে। রাজনীতি কিংবা কোনো নীতিতেই যে বাঙালির ভারতবর্ষের সঙ্গে মেলে না, তার কারণ তার মজ্জাগত এই কেন্দ্রী এই অকর্মণ্যতার ভাব। ইহাকে বিদ্রোহ নাম দিয়া শহিদ সাজাইয়া আত্মবিলাস করা চলে বটে— কিন্তু ইহা বাঙালি জাতির বহু গুণের একতম নয়, বহু দোষের একতম এবং প্রধানতম। ইহার প্রভাবেই সে ভারতীয় সংস্কৃতিকে প্রসন্ন মনে গ্রহণ করিতে পারিতেছে না এবং মরিতে বসিয়াছে।

এখন, প্রবাসী বাঙালিরাও রক্তের মধ্যে এই মৌলিক আত্মম্ভরিতা বহন করিয়া বিদেশের অস্বস্তির আসনে কালযাপন করিতেছেন। বহু পুরুষ ধরিয়া অনেকে বিদেশে আছেন— কিন্তু সে দেশকে আপন করিতে পারেন নাই। জওহরলাল নেহরুর পূর্বপুরুষ কাশ্মীর হইতে আসিয়াছিলেন, এখন তাঁহারা যুক্তপ্রদেশের লোক হইয়া গিয়াছেন; শুনিয়াছি রাজেন্দ্র প্রসাদের পূর্বপুরুষ বিহারের বাহিরে কোনো জায়গা হইতে আসিয়াছিলেন, এখন তাঁহারা বিহারি হইয়া গিয়াছেন; কিন্তু বিদেশের বাঙালি আজিও প্রবাসী বাঙালি হইয়া রহিল— তিন চার শত বৎসর বিদেশে থাকিয়াও অনেকে বাংলা দেশের দিকে চাহিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া থাকেন— যেমন ভারতীয় মুসলমানদের মধ্যে অনেকে ভূগোলে-পড়া আরব ও তুরস্কের দিকে তাকাইয়া মনে মনে দ্রাক্ষাফলের স্বাদ লাভ করেন।

প্রবাসী বাঙালিরা অবসর কালে মাঝে মাঝে বাংলা দেশের জন্মপল্লির কথা স্মরণ করিয়া ব্যাকুলতা অনুভব করেন— সে পল্লি কত মধুর; তাহাকে 'স্বপ্ন দিয়া তৈরি ও স্মৃতি দিয়া ঘেরা' বলিয়া মনে হয়; এবং সময়ে সময়ে তাঁহারা হয়তো একত্র এই সোনার বাংলার উদ্দেশে বিলাপ করিয়া থাকেন।

কিন্তু সত্য কথা এই যে সোনার বাংলা বলিয়া কিছু নাই। সোনার বাংলা একটি Myth বা উপকথা। ইংরেজের চাকুরি প্রথা, যাহা দেশ হইতে ছিন্ন করিয়া আমাদিগকে বিদেশে লইয়া যায়, ইংরেজের সাহিত্য, যাহা আমাদের মনে সুদূরের সৌন্দর্যজাত রোমান্টিক কল্পনার প্রলেপ দিয়াছে, প্রবাসের ভালো চাকুরির প্রাচুর্য, এবং স্বাস্থ্যকর স্থানের নিয়মিত ক্ষুধোদ্রেক, এই কয়টি উপাদান মিলিয়া সোনার বাংলা myth সৃষ্টি করিয়া তুলিয়াছে। বাংলা দেশে এই অলৌকিক myth সৃষ্টি করিতে সাহায্য করিয়াছে গ্রাম-ছাড়া ডেপুটি-ম্যাজিস্ট্রেট সাহিত্যিকের দল। দ্বিজেন্দ্রলাল চাকুরি না পাইয়া গ্রামে থাকিতে বাধ্য হইলে এদেশকে 'স্বপ্ন দিয়ে তৈরি ও স্মৃতি দিয়ে ঘেরা' বলিয়া কখনও মনে করিতে পারিতেন না। আবার আর-একদিকে প্রবাসী বাঙালির দল একাধারে এই myth রচনা করিতেছেন ও বসিয়া বসিয়া এই myth-এর সৌন্দর্য উপভোগ করিতেছেন।

সোনার বাংলা আদৌ সোনার নয়, গিলটি সোনার। ইহার প্রকৃতি সম্বন্ধে প্রবাসী বাঙালির চেয়ে স্ববাসী বাঙালির সাক্ষ্য অধিকতর মূল্যবান।

বাঙালি জাতির নাভিশ্বাস উঠিয়াছে। ইহার গ্রামগুলি উৎসন্ন, সমাজ অবসন্ন, নগরগুলি ক্লিন্ন ; এ দেশের ধনীরা দেউলে, মধ্যবিত্তরা আত্মঘাতী— আর উভয়ে কৃষককে দলে টানিবার নামে স্বার্থ সাধন করিতে তৎপর। এ দেশ সুজলা কিন্তু জলের অভাব ও আতিশয্য দুইরকম জলকষ্ট এখানে লাগিয়াই রহিয়াছে; এ দেশ সুফলা কিন্তু সে ফল অন্য লোকে ভোগ করে— আর শস্যশ্যামলা কিন্তু তাহার মূল্য এতই কম যে তাহা লইয়া কাব্য রচনা ছাড়া আর কিছু করিবার খরচ পোষায় না।

এ দেশের রাজনীতির অর্থ স্ব স্ব সম্প্রদায়ের আত্মপ্রতিষ্ঠা— আর হিন্দু-মুসলমানের বিরোধের আসল অর্থ এই যে, চাকুরি বণ্টন করিবে কে? এ দেশের নেতাদের চোখে জনসাধারণ হস্তৈকসর্বস্ব— অর্থাৎ হাত দেখাইয়া ভোট দেওয়াতেই তাহাদের জীবনের যা-কিছু সার্থকতা। এ দেশের সাহিত্য বুগ্‌ণের, বেকারের, অশিক্ষিতের, নিষ্কর্মার বিলাস, আর এ দেশের সাহিত্য-সভা মানে একটা সুলভ সম্মানের উপলক্ষ্য সৃষ্টি করিয়া চাকুরি বণ্টনে প্রভাবশালী কোনো নেতাকে সভাপতির আসনে বসাইয়া দেওয়া, আর এ দেশের শিক্ষা বিস্তারের অর্থ, নিরীহ চাষিদের অক্ষর পরিচয় করাইয়া সংবাদপত্রের রাজনৈতিক কুৎসার বিষকে তাহাদের মনে সঞ্চারিত করিয়া দেওয়া— আমাদের *বেদ-বাইবেল-গীতা* হইতেছে সিকিশিক্ষিত সাংবাদিকের কিম্ভূত প্রলাপ; উড়োকথা, বিচ্ছিন্ন চিন্তা, আর অমূলক অর্ধসত্য; আমাদের তীর্থ হইতেছে শহরের পার্কগুলি— যেখানে আত্ম-প্রতিষ্ঠার দম্ভোক্তির গম্বুজের তলে সত্য, আদর্শ, নীতির সমাধিক্ষেত্র রচিত হইতেছে। আধুনিক বাঙালি ত্রিশঙ্কুর মতো নিরলম্ব— ইহার ভবিষ্যৎ নাই— অতীত লুপ্ত, বর্তমান অনিশ্চিত; ইহার দ্বারা আর কাহাকেও উদ্ধার করা সম্ভব নয়— কারণ নিজেকেই সে উদ্ধার করিতে অসমর্থ।

প্রবাসী বাঙালিদের প্রতি অনুরোধ তাঁহারা যেন সাহায্যের জন্য বাংলা দেশের উপর নির্ভর না করেন; বাংলার এখন যে অবস্থা তাহাতে নিজেকে সে যদি রক্ষা করিতে পারে— তবে সে একটা বিস্ময়কর ব্যাপার হইবে; অন্য কাহাকেও রক্ষা করা তাহার পক্ষে অসম্ভব।

প্রবাসী বাঙালিকে বাঁচিতে হইলে আত্মকেন্দ্রী-সংস্কৃতির প্রাদেশিকতা ত্যাগ করিতে হইবে; নিজেদের সংস্কৃতির সঙ্গে ভারতীয় সংস্কৃতির যোগ ঘটাইতে হইবে; ভারতীয় সংস্কৃতির ব্যাপকতার মধ্যে, বলিষ্ঠতার মধ্যে সঞ্জীবনী আছে; সেই অমৃতে প্রবাসী বাঙালির সংস্কৃতি সঞ্জীবিত হইবে— প্রবাসী বাঙালি সম্প্রদায় বিনাশের মুখ হইতে বাঁচিয়া যাইবে। বাংলা দেশে নানাবিধ Philistinism এতই প্রবল যে তাহার পক্ষে এ সংযোগসাধন সম্ভব নয়। প্রবাসী বাঙালি বাঁচিয়া গেলে হয়তো স্বদেশবাসী বাঙালিরও বাঁচিবার উপায় হইতে পারে।

উৎস : *বাঙালি ও বাংলা সাহিত্য*।

বাঙালির রন্ধন-সংস্কৃতির এক দিক

বুদ্ধদেব বসু

'ভারতীয় সাহিত্য' বলে কিছু নেই, আছে দশ-বারোটি ভিন্ন-ভিন্ন ভারতীয় ভাষায় লেখা সাহিত্য'— এই কথা বলে বিদেশে আমি অনেক বক্তৃতা আরম্ভ করেছি, ভারতীয় সাহিত্য বিষয়ে কিছু বলার জন্য আহূত হয়ে। তেমনি, ভারতীয় রান্না বলেও কিছু নেই— আছে অনেকগুলো ভিন্ন-ভিন্ন রন্ধনপ্রণালী, যা গড়ে উঠেছে বহুযুগ ধরে বিচিত্র খাদ্যবস্তু নিয়ে, আঞ্চলিক ভূগোল-ইতিহাসে নির্ভরশীল। আমরা ভারতীয়রা পরস্পরের ভাষায় কথা বলতে পারি না— সাধারণত পারি না, পরস্পরের আহারও আমাদের রুচিরোচন নয়। একজন শিখ, একজন তামিল ও একজন বাঙালি যা সমানভাবে উপভোগ করবেন, এমন একটি ভারতীয় ভোজ উদ্ভাবন করা খুব শক্ত কাজ। এই কথাটা ঈষৎ কষ্টকরভাবে আমার হৃদয়ে— বা উদরে— একবার প্রবিষ্ট হয়েছিল, যখন নেমেছিলাম আমেরিকার এক ক্ষুদ্র বিশ্ববিদ্যালয়-শহরে, সন্ধেবেলা, প্লেনের ঝাঁকুনির ফলে ক্লান্ত। এয়ারপোর্টে প্রাথমিক সম্ভাষণের পরেই আমার নিমন্ত্রণকর্তা অধ্যাপক সহাস্যে বললেন, 'আপনার জন্য আজ ভারতীয় খানার বন্দোবস্ত করেছি— এক ভারতীয় পরিবারের সঙ্গে। আশা করি আপনার সেটা মনোমতো হবে। আমি সতর্কভাবে জিগেস করলাম, পরিবারটি কোন্ প্রদেশের, অধ্যাপক তা জানতেন না— আর একথাও আমি অবশ্য তাঁকে জানতে দিইনি যে সে রাতটা আমাকে উপোসি কাটাতে হয়েছিল। কেননা সেই ভারতীয় ভোজের আসরে আমি কয়েক চামচে নিছক ভাত আর এক পেয়ালা কফি ছাড়া প্রায় কিছুই গলা দিয়ে নামাতে পারিনি— আমার আপ্যায়নকারী পরিবারটি ছিলেন তামিল। হয়তো না বললেও চলে যে আমার এই উক্তিতে কোনো কটাক্ষপাত নেই— না তামিল রন্ধনশিল্পের প্রতি, না আমার সেই সন্ধ্যায় সহৃদয় গৃহস্বামীর উদ্দেশে— এবং আমার প্রাদেশিকতার জন্য ক্ষমা প্রার্থনারও কোনো প্রয়োজন আমি দেখিনি, কেননা বাঙালি রান্নাঘর থেকে নিঃসৃত মাছের গন্ধে কোনো নিষ্ঠাবান তামিল ব্রাহ্মণেরও মূর্ছা যাবার দশা হবে। সেই সনাতন সারস-শৃগালের ব্যাপার আর কী— মেনে নেওয়া ভিন্ন উপায় নেই। কোনো কোনো ভারতীয় ভোজ্য স্বাভাবিকভাবে পরস্পরকে এড়িয়ে চলে।

কোনো সময়ে— কোনো সুদূর সময়ে— নিখিল ভারতে একই খাদ্যের প্রচলন ছিল কি? এই প্রশ্নের উত্তর দেবার মতো তথ্য আমাদের হাতে নেই। কোনো দলিল নেই নির্ভরযোগ্য। চরক-সুশ্রুতে স্বাস্থ্যদায়ক খাদ্যপ্রকরণ অনেক পাওয়া যায়, কিন্তু দুঃখের বিষয় কামসূত্রের অনুরূপ কোনো ঔদারতার শাস্ত্রগ্রন্থ কেউ রচনা করেননি— বা করে থাকলেও তা অনেক আগে লুপ্ত হয়ে গেছে। সাহিত্যিক সাক্ষ্য থেকে এ পর্যন্ত বলা যায় যে মৌলিক আর্যেরা ছিলেন দুর্ধর্ষভাবে মাংসাশী ও মদ্যপ, আসক্ত ছিলেন যুগপৎ গোদুগ্ধে ও গোমাংসে— তাঁদের গোমাংস-প্রিয়তার অনেক প্রমাণ অতি পবিত্র ঋগ্‌বেদেই ছড়িয়ে আছে। প্রাচীন দ্রাবিড় বংশীয়েরাও মাংস ভোজনে অভ্যস্ত ছিলেন, স্বয়ং বুদ্ধ আমিষবর্জন বিষয়ে চরম কোনো বিধান দেননি— তাঁর শিষ্যদের মধ্যে অনেকে (হয়তো বাঙালি) নিয়মিত মাছ খেতেন বলে জানা যায়। একমাত্র জৈনরাই ছিলেন অনন্যভাবে নিরামিষভুক— এখনও তা-ই আছেন— তবে জৈনরা চিরকালই স্বল্পসংখ্যক ও ভারতবর্ষীয় বৃহত্তর সমাজ থেকে কিছুটা বিবিক্ত বলে সর্বসাধারণিক জীবনের উপর এদের প্রভাব কখনও স্পষ্ট হয়ে ওঠেনি। কবে, এবং কেমন করে, গোমাংস ও শূকর মাংস দুটোই নিষিদ্ধ হয়ে গেল, এবং আমিষ-নিরামিষের ভেদচিহ্নে দ্বিখণ্ডিত হল ভারতভূমি— সেই ইতিহাস আজ পর্যন্ত অস্পষ্ট থেকে গেছে; এমনকি আমরা এ-ও জানি না এইসব নিষেধাজ্ঞা ধর্মের কারণে স্থাপিত হয়েছিল, না কি প্রয়োজনের চাপে। বৈদিক ও পৌরাণিক যুগের রন্ধনপ্রণালী বিষয়েও আমাদের জ্ঞান অকিঞ্চিৎকর। হোমারে পাই প্রতিটি ভোজের সযত্ন ও সবিস্তার বর্ণনা— তরুণ বৃষটির কণ্ঠচ্ছেদ থেকে বীরবৃন্দের সোৎসাহ সম্ভোগ পর্যন্ত; কিন্তু বিপুলবিস্তৃত মহাভারতের মধ্যে এ বিষয়ে উল্লেখ বিস্ময়করভাবে বিরল ও আমাদের পক্ষে বিরক্তিকরভাবে যাথার্থ্যহীন। রন্ধনে দ্রৌপদী কথাটা আমাদের মুখে-মুখে ফেরে, কিন্তু সেই গরবিনিকে আমরা একবারও রন্ধনশালায় দেখতে পাই না— বনবাসের সময়েও না; সহস্র শিষ্যসমেত কোপনস্বভাব দুর্বাসামুনির ভূরিভোজনটি কৃষ্ণই তাঁর তুকমন্ত্রে ঘটিয়ে দিয়েছিলেন— দ্রৌপদীকে কড়ে আঙুলটিও নাড়তে হয়নি। বিরাট রাজার প্রধান পাচকের কর্ম নিয়ে ভীম কাটালেন অজ্ঞাতবাসের পুরো বছরটা— কিন্তু সেই অবস্থায় কোন্ কোন্ অসাধারণ রসনানন্দ তিনি রচনা করেছিলেন, সেই অত্যন্ত কৌতূহলজনক কথাটা বিলকুল চেপে গিয়েছেন ব্যাসদেব। কুদর্শন বাহুক সারথিকে দেখা মাত্র দময়ন্তী অনুমান করেছিলেন যে ইনিই আসলে অভিশপ্ত নল, কিন্তু অনেক অনুকূল লক্ষণ সত্ত্বেও ঠিক বিশ্বাস করতে পারেননি, যতক্ষণ না বাহুকের রান্না পূর্বাস্বাদিত মাংস খেয়েছিলেন। কেমন সেই রান্না যা একবার চাখলে আর ভোলা যায় না, মাংস কোন্ পশুর, পাকপ্রণালীর বৈশিষ্ট্য কী, এসব জানতে আজকের দিনে কার না ইচ্ছে করবে? এ-রকম একটা প্রসঙ্গ পেলে হোমার হয়তো এক কুড়ি হেক্সামিটার লিখে ফেলতেন, কিন্তু মহাভারতে এটি উল্লেখমাত্রে পর্যবসিত হল। ঔদরিক ব্যাপারে কিছুটা বরং উৎসাহ ছিল বাল্মীকির— অন্তত তাঁর বনবাসী রাম-লক্ষ্মণকে আমরা মাঝে-মাঝেই দেখি মৃগয়া-হত রাশি রাশি পশু নিয়ে বাড়ি ফিরতে— গোসাপ, বুনো শুয়োর, নানা জাতের হরিণ; পুথিতে এও পড়া যায় যে তিনজনেরই প্রিয় খাদ্য ছিল শল্যপক্ব মাংস— যাকে আমরা আজকাল বলি শিক-কাবাব; কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্যবশত আর কোনো তথ্য জোগানো হয়নি। মৃত পশুর ছাল-চামড়া কে ছাড়াত, কে কাটত টুকরো করে, কে ধরাত উনুন, শিকে বিঁধে আগুনে ঝলসাবার ভার থাকত কার উপর, কোন্ ধরনের পানীয়ের সঙ্গে সেই 'অগ্নিতপ্ত পবিত্র' মাংস কণ্ঠনালী দিয়ে নামিয়ে দেওয়া হত, সঙ্গে থাকত কোন্ কোন্ ফল অথবা সবজি— এই সবই স্রেফ আমাদের কল্পনার উপর ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। তবু বাল্মীকির

কাছে আমরা চিরন্তনভাবে কৃতজ্ঞ আছি অযোধ্যাকাণ্ডের সেই একটি দৃশ্যের জন্য— যেখানে ভরদ্বাজ মুনি সৈন্যদলসমেত ভরতকে আপ্যায়ন করছেন; বিশালতর মহাভারতে তার সঙ্গে তুলনীয় কিছুই নেই— না রৈবতক উৎসবে, না এমনকি যুধিষ্ঠিরের অশ্বমেধ যজ্ঞের বর্ণনায়। এই একবার আমাদের প্রাচীন সাহিত্যে পুরোমাপের একটি খাদ্যতালিকা পাওয়া গেল— 'ভারসাম্যযুক্ত' বিচিত্র একটি তালিকা : অনেকরকম ফলের রস ও সুগন্ধি সুপ (এটা ডাল হতে পারে, কিন্তু ইংরেজি অর্থে 'soup' হবারও বাধা নেই), ময়ূর হরিণ ছাগল আর বনমোরগের মাংস, আর মুখ বদলের জন্য দই, ঘোল, ছানা-পনির, পায়েস, আর মধু, গুড়, মিশ্রি— শুভ্রবর্ণ অন্নের কথা না বললেও চলে। প্রবাহিত ছিল সুরা, সুধা, মদিরার স্রোত, ছিল সুন্দরী ললনার দল নৃত্যে গীতে পরিচর্যায় নিপুণ। মানছি, বর্ণনাটি অতিবর্ণিত ও অতিরঞ্জিত— অরণ্যবাসী মুনির আশ্রমে এই ঐশ্বর্য দেবতার বরেই লব্ধ হয়েছিল— এমন ঐশ্বর্য যা ভোগপরায়ণ লঙ্কাপুরীকেও টেক্কা দিতে পারে; কিন্তু এতে অন্তত রাজকীয় ভোজের একটি আদর্শ চিত্র পাওয়া যায়, আমরা বুঝতে পারি যে বাল্মীকি একটি ঋদ্ধিশালী বিলাসবহুল সভ্যতার সঙ্গে পরিচিত ছিলেন।

অপভ্রংশ ভাষার রামায়ণগুলিতে এই ভোজনবৃত্তান্ত যেভাবে বদলে গেছে তাতে আদিকবিকে আর চেনাই যায় না। অন্য এক জগৎ, নিষেধের কাঁটাতার দিয়ে ঘেরা, যেখানে লোকেরা ভুলে গিয়েছিল যে চতুর্বর্গের অন্যতম হল কাম, অর্থাৎ সুখভোগ, যেখানে আমাদের মহাকাব্য দুটি হয়ে উঠেছিল রাম ও কৃষ্ণের নির্ভেজাল মহিমাকীর্তনের অছিলা মাত্র— সেখানে ভরদ্বাজের দরাজ হাতকে ছাঁটাই না করা সম্ভব ছিল না। এক কোপে কাটা পড়ল সব মাংস ও মাদক পানীয়; তুলসীদাস অস্পষ্ট ভাষায় লিখলেন 'ভোগ বিভূতি ভূরি'— যে কথার আধ্যাত্মিক অর্থটাই আগে মনে পড়ে; আর কৃত্তিবাস ভেবেচিন্তে জোটালেন, 'ঘৃত দধি দুগ্ধ মধু মধুর পায়স'— 'নানাবিধ নানারস মিষ্টান্ন'— শুধু মিষ্টান্ন। দু-জনেই যেন পার্থিব ঐশ্বর্যের কল্পনায় সন্ত্রস্ত হয়ে, এই ভোজটিকে করে তুলবেন সম্পূর্ণ 'নির্দোষ'— তাঁদের দারিদ্র্যগ্রস্ত কৃষিজীবী গ্রামীণ সমাজের সঙ্গে সুর মিলিয়ে। এ কথা তাঁদের মনে হল না যে এই আপ্যায়ন ঠিক রাজোচিত নয়, বদান্য দেবগণের পক্ষেও অযোগ্য।

কৃত্তিবাসকে ছেড়ে মঙ্গলকাব্যগুলিতে এসে আমরা অনেকটা খোলা হাওয়ায় নিশ্বাস নিতে পারি। দক্ষিণ হস্তের ব্যাপারটা যে নেহাত জীবন ধারণের জন্য নয়, তাতে উপভোগেরও একটি অংশ আছে, এই সত্যটি সেখানে সরলভাবে স্বীকৃত হয়েছিল। সবচেয়ে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত কবিকঙ্কণে; তাঁর কালকেতু ব্যাধ খাচ্ছে, এটা রীতিমতো একটা ঘটনা হয়ে ওঠে আমাদের চোখের সামনে; আমরা দেখতে পাই সে প্রকাণ্ড থাবায় প্রকাণ্ড চোয়ালে উড়িয়ে দিচ্ছে রাশি রাশি ভাত কাঁকড়ার ঝোল দিয়ে মেখে, সঙ্গে কিছু শাকপাতা হয়তো;— আমরা শুনতে পাই তার হাড় চিবোবার কড়মড় শব্দ, দাঁতের ফাঁক দিয়ে এঁটো কাঁটাগুলি ছিটকে বার করে দেবার শব্দ; আমরা তাকে বাহবা না দিয়ে পারি না যখন সাপটেসুপটে সব খেয়ে নেবার পর সে তার স্ত্রীকে বলে : 'রন্ধন করেছ ভালো আর-কিছু আছে?' ছবিটি একেবারে বাস্তব— সকলের পক্ষে না হোক অন্তত একজন পেশাদার ব্যাধের পক্ষে; কিন্তু আরও একটু উচ্চাঙ্গের ভোজন কীরকম ছিল তারও নমুনা পাই মাধবাচার্যের চণ্ডীমঙ্গলে— লহনার রান্নার বর্ণনা থেকে কয়েকটা লাইন তুলে দিচ্ছি :

পাবক জ্বালয়ে রামা মনের হরিষে।
শাক রন্ধন করি ওলাইল বিশেষে।।

উমাবড়ি ভাজে রান্ধে ঘৃতেতে আগল।
জাতিকলা দিয়া রান্ধে ঝুনা নারিকেল।।
জলপাইর অম্বল রান্ধে মহাহৃষ্ট হয়্যা।
সম্ভারি ওলাইল তারে সর্ষে পোড়া দিয়া।।
নিরামিষ্যব্যঞ্জন রামা থুইয়া এক ভিত।
আমিষ্য রান্ধিতে লহনায় দিল চিত।
মনের হরিষে রান্ধে রোহিতের মাচ।
দুহিতা মিশায়ে রান্ধে দরিতা আনাচ।।
বড় বড় কৈ-মৎস্য রান্ধয়ে হরিষে।
সুগন্ধি তন্ডুলে অন্ন রান্ধে অবশেষে।।

এই উদ্ধৃতির সব কথা পাঠক হয়তো বুঝবেন না— আমিও বুঝিনি— কিন্তু মোটের উপর ভোজের একটি সুগন্ধ পাওয়া যাচ্ছে : সেটুকুই আমাদের মোদ্দা লাভ। সাংসারিক সুখভোগ বিষয়ে মধ্যযুগের বাঙালি যে একেবারে নিস্পৃহ ছিল না, তার সুখপাঠ্য দলিল আছে ভরতচন্দ্রেও : 'আমার সন্তান যেন বাড়ে দুধে-ভাতে'— ঈশ্বরী পাটনির এই বিখ্যাত আবেদনে ধ্বনিত হচ্ছে স্বাস্থ্য ও সচ্ছলতার জন্য আকাঙ্ক্ষা, আক্ষরিক অর্থে শুধু দুধ ভাতের জন্য অবশ্য নয়।

হয়তো মঙ্গলকাব্যগুলির ধারা অনুসরণ করেই— বা হয়তো ইউরোপীয় বাস্তবতার প্রভাবে— আমাদের আধুনিক গদ্যলেখকেরা রান্না-খাওয়াকে তাঁদের বিষয়ীভূত করে নিলেন; রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্র থেকে শুরু করে আজকের দিন পর্যন্ত বিশ-শতকি বাংলা উপন্যাসে অনেক ভোজনবৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ আছে— কোনো কোনো মহিলা-ঔপন্যাসিক রন্ধনপ্রণালির খুঁটিনাটি লিখেও বাধিত করেছেন আমাদের। চরিত্র চিত্রণের একটি উপায় হিসেবে খাদ্য কেমন কাজে লাগে, তার একটি সুন্দর দৃষ্টান্ত পাই *যোগাযোগ* বইটায়। মধুসূদন ধনার্জনে প্রতিভাবান, ধন বিষয়ে সে অহংকৃত এবং সেটা জাহির করতেও সে ভালোবাসে; তার থালা গেলাস সব রুপোর, কিন্তু তার প্রতিদিনের খাদ্য হল কলাইয়ের ডাল, কাঁটাচচ্চড়ি, তেঁতুলের অম্বল, আর সবশেষে মস্ত বড়ো এক বাটি ভরতি চিনি মেশানো দুধ। এই ঔদরিক তথ্যটুকু যোগ করে রবীন্দ্রনাথ বুঝিয়ে দিয়েছেন বেচারা কুমুদিনী তার বায়বীয় ধরনধারণ নিয়ে কীরকম শক্ত লোকের পাল্লায় পড়েছে। এমনকি, যিনি একবার বলেছিলেন যে কুমড়োফুল নিয়ে কবিতা লেখা যায় না, যেহেতু 'রান্নাঘর তার জাত মেরেছে', সেই রবীন্দ্রনাথ, যেন নিজের কথা নিজেই অপ্রমাণ করে কুমড়োফুলের চেয়েও সাধারণ খাদ্যকে কবিতার রাজ্যে টেনে তুলেছিলেন। হয়তো, আমি বলবার আগেই, পাঠকের মনে পড়ে গেছে *বীথিকা*-র 'নিমন্ত্রণ' বলে কবিতাটা, এক অনামিতা মহিলার উদ্দেশে লেখা— যেখানে আধা ঠাট্টার সুরে, আধুনিকদের দিকে বক্রোক্তি ছিটিয়ে তিনি 'গদ্যজাতীয় ভোজ্য'কে তাঁর ছন্দের ছোঁয়ায় রাঙিয়ে দিয়েছিলেন :

একালে চলে না, সোনার প্রদীপ আনা
সোনার বীণাও নহে আয়ত্তগত।
বেতের ডালায় রেশমি রুমাল টানা
অরুণবরন আম এনো গোটাকত।
গদ্যজাতীয় ভোজ্যও কিছু দিয়ো,

পদ্যে তাদের মিল খুঁজে পাওয়া দায়।
তা হোক, তবুও লেখকের তারা প্রিয়;
জেনো, বাসনার সেরা বাসা রসনায়। ...
শোভন হাতের সন্দেশ পানতোয়া
মাছ-মাংসের পোলাও ইত্যাদিও
যবে দেখা দেয় সেবামাধুর্যে ছোঁওয়া
তখন সে হয় কী অনির্বচনীয়।
বুঝি অনুমানে, চোখে কৌতুক ঝলে;
ভাবছি বসিয়া সহাস-ওষ্ঠাধরা,
এ সমস্তই কবিতার কৌশলে
মৃদুসংকেতে মোটা ফরমাস করা।
আচ্ছা, না-হয় ইঙ্গিত শুনে হেসো;
বরদানে, দেবী না-হয় হইবে বাম;
খালি হাতে যদি আস তবে তাই এসো
সে দুটি হাতেরও কিছু কম নহে দাম।

শেষ কয়েকটা লাইনে কবিতার সুর বদলে গেল, খাদ্য গদ্য রূপান্তরিত হল হৃদয়ের মাধুর্যে, কিন্তু তাই বলে ওই পোলাও-পানতোয়ার বাস্তবতা যে ক্ষুণ্ণ হল তাও নয়।

মাঝে-মাঝেই আমার মনে হয় যে বাংলায় শব্দের বড়ো অভাব : আমাদের কথ্য ভাষায় সবগুলো রং বলা যায় না, শরীরের সব অঙ্গপ্রত্যঙ্গেরও নাম নেই— 'পাণি', 'বাহু', 'অরুণ', 'পিঙ্গল' প্রভৃতি জরুরি শব্দ আমাদের ঘরোয়া আলাপে চলতি নেই বলে আমি অফুরন্তভাবে খিন্ন বোধ করি। কিন্তু এ মুহূর্তে, ভোজনতত্ত্ব বিষয়ে লিখতে গিয়ে, আমার হঠাৎ খেয়াল হল যে আমার মাতৃভাষা একটি বিভাগে অসামান্য রকম পটীয়সী— তা হল বিবিধ খাদ্যপ্রকরণের নামকরণ। ফরাসিরা বাগবহুল বিশেষণ বসিয়ে তাদের মেনুগুলোকে জমকালো করে তোলে, কিন্তু ছোট্ট এক শব্দের নাম বানাতে বাঙালির মতো ওস্তাদ কেউ নেই। এ কি আশ্চর্য নয় যে 'দম' জিনিসটা অনন্যভাবে শুধু আলুরই অধিকারভুক্ত, এবং তিনি এতই সতী-সাধ্বী যে আলুর সঙ্গে কুমড়ো জুড়ে দিলেই তিনি দম-ত্ব হারিয়ে 'ছকা'য় নামান্তরিত হন, আর পটোল অথবা ফুলকপির সংযোগে আবার 'ডালনা'য়, পৃথিবীর অগুনতি ফসলের মধ্যে পটোল ছাড়া আর কোনোটি দিয়ে 'দোলমা' তৈরি হয়, এমন কথা কি সাত পুরুষে কোনো বাঙালি কখনও শুনেছে? নাকি এমনও কেউ কল্পনা করতে পারে যে 'ধোঁকা' মানে ডালের একটা মশলাশ্রিত ব্যঞ্জন ছাড়া অন্য কিছু? অবশ্য ভাঁওতা অর্থেও 'ধোঁকা' বলি আমরা, কিন্তু ব্যঞ্জনটিও তো চারিত্রিকভাবে তা-ই— কেননা সে শস্যরচিত হয়েও ভান করে যেন মাংস— তাকে নকল মাংস বা নিরামিষ মাংস বললে দোষ হয় না; তার নামের মধ্যে একটা রসিকতাও প্রচ্ছন্ন আছে। আমরা রোজই খাচ্ছি চচ্চড়ি বা ঘন্ট, কিন্তু ও দুটোয় তফাত কী তা জিগ্যেস করলে আমরা অনেকেই মাথা চুলকোব; দুটোতেই পাঁচ তরকারি লেপটে মিশে থাকে, দুটোতেই কুচো মাছ বা মাছের কাঁটার সংযোগ সম্ভব;— বহু চিন্তা করে শুধু এই তফাতটি খুঁজে পাওয়া যাবে

যে চচ্চড়িতে যে মশলাটি খুব স্বাভাবিক সেই সর্ষে মেশালে ঘন্টর আর জাত থাকে না। চচ্চড়ির আর-এক প্রকরণ হল ছ্যাঁচড়া বা ছেঁচকি— খুব অল্প তেলে পোড়া পোড়া রান্না হয় বলে তাকে আলাদা একটি নাম দেওয়া হল। একই পাঁচমিশালি ধরনের অন্য একটি দ্রব্যের সঙ্গে আমরা পরিচিত আছি : 'লাবড়া'— বৈষ্ণবরা যা ভক্তিসহযোগে আহার করে থাকেন, যার পবিত্রতা আমিষের লেশ সংস্রব এড়িয়ে চলে, এবং জগন্নাথদেবের প্রসাদ হবার গৌরবের জন্য যাতে সবরকম সবজিও অনুমোদিত নয়— থোড় মোচা শিম বেগুন মুলো আর মিঠা কুমড়োই প্রশস্ত। লাবড়ার আর-একটি বৈশিষ্ট্য এই যে তাতে সবজিগুলো প্রায় গলে যায়, চচ্চড়ি-ঘন্টর সঙ্গে এইটে তার টেকনিকাল তফাত। বাংলার মেয়েরা, রাঁধুনিরা যুগ যুগ ধরে ঘরে ঘরে যত নতুন দ্রব্য উদ্ভাবন করেছেন— হোক না তারা এক গোত্রের, এক গোষ্ঠীর, প্রায় একই উপাদানমিশ্রণে তৈরি— স্বাদে অথবা রান্নার কৌশলে সূক্ষ্মতম তফাত থাকলেও বাঙালি বুদ্ধি আস্ত একটি নতুন নাম না দিয়ে ছাড়েনি। ভাবা কি যায় যে আজকের পৃথিবীর প্রবলতম ভাষায় এই বৈচিত্র্যরাশি পরিণত হয়েছে একটিমাত্র নির্বিশেষ ও নিশ্চরিত্র Curry শব্দে— অতিব্যাপ্তির দোষে যে কথাটা প্রায় অর্থহীন? ডালনার সঙ্গে চচ্চড়ির ঠিক ততটাই মিল যতটা মিল ঘোড়ার সঙ্গে ছাগলের; দুটো জন্তুকেই 'চতুষ্পদ' বলা যেমন হাস্যকর, দুটো খাদ্যকেই 'কারি' বলাও তেমনিই; বিষয়টি অনুধাবন করলে, আমরা বুঝতে পারি যে প্রত্যেক ভাষাই যে যার ধরনে সীমাবদ্ধ— কোনো ভাষাতেই সব কথা বলা সম্ভব নয়। এমনকি, বাঙালির যেটা দৈনিকতম আহার সেই মাছের ঝোলটাও কোনো ইউরোপীয় ভাষায় বলা যাবে না। চাটনি-অম্বল, আমসি-আমসত্ত্ব— এইসব জ্ঞাতি-খাদ্যের তফাত বোঝাতে হলে কয়েক ডজন ইংরেজি শব্দের দরকার হবে। 'নামেতে কী হবে, হাসিতে তোমার পরিচয়—' এই রোমান্টিক কথাটা বাঙালি রন্ধনবিজ্ঞানীর কাছে অর্থহীন; তিনি বোঝেন বিনা নামে কোনো রসাস্বাদন সম্পূর্ণ হয় না।

সেই চিরায়ত মাছের ঝোলটাকে ধরা যাক। শুধু তো ঝোল নয়— স্বাদের মৃদুতা বা তীব্রতা অনুসারে কোনোটা ঝোল ও কোনোটা ঝাল, কোনোটা আবার কালিয়া। কোন্ মাছ কত বড়ো, স্বাদ কীরকম; তার মাংস আঁটো না শিথিল, দৃঢ় না কোমল। এইসব তারতম্য অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন পাকপ্রণালী নির্দিষ্ট হয়ে আছে— আছে মৎস্যকুলের প্রতিটি প্রতিনিধির জন্য আলাদা আলাদা সবজি-মশলার সমন্বয়, আর কুচো মাছ রান্নার এমন সব মেধাবী টেকনিক, যাতে পেঁয়াজকলির সঙ্গে অঙ্গুষ্ঠ সমান ট্যাংরা দিয়েই এক থালা ভাত খেয়ে ওঠা যায়। তাছাড়া আছে বিশেষ কয়েকটি উচ্চকুলীন, বিশেষ কোনো-কোনো মৎস্যের সঙ্গেই যাদের নির্বন্ধ: কিশমিশ আর দারচিনি-বাটার দইমাছের জন্য পাকা রুইয়ের পেটির অংশটি নির্ঘাৎ চাই, যেমন চাই নারকেলের দুধ দিয়ে রাঁধা তথাকথিত মালাইকারির জন্য বাগদা চিংড়ি— কোনো বিকল্প চলবে না। 'তেল-কই' নামে আলাদা একটা রান্না বেরোল, শুধু পুষ্ট বড়ো বড়ো কই মাছেরই এলাকাভুক্ত— ছোটো কইয়েরও নয়— কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী তেল-রুই বা তেল-কাতলার সৃষ্টি হল না, এতেই বোঝা যায় বাঙালি রাঁধুনির ঔচিত্যবোধ কত তীক্ষ্ণ। তেমনি আবার 'মুঠিয়া' খেতে হলে চিতল মাছের গাদা আপনাকে জোটাতেই হবে— সেই ঘন কন্টকিত জলজ মাংসকে কেমন করে একটি নিরাপদ সুখাদ্য করে তোলা যায়, সেটা বঙ্গসংস্কৃতির আনন্দমেলায় পূর্ববাংলার এক বিশিষ্ট অবদান। আর সেই রজতবর্ণ মনোহরদর্শন মৎস্যকুলরাজ মহান ইলিশ— সে এক দেহে এতটা প্রতিভা ধারণ করে যে, শুধু তাকে দিয়েই তৈরি হতে পারে একটি পঞ্চপদী নানা স্বাদযুক্ত ভোজনের মতো ভোজন— যদি অবশ্য ভাগ্যে

জোটে যথাযোগ্য রন্ধনকারী বা কারিণী। আরম্ভে এল মুড়োর সঙ্গে স্নিগ্ধ লাউ, তার পর ঝরতি পড়তি কাঁটা দিয়ে রাঁধা ঘন মুগডাল সঙ্গে কালচে ব্রাউন কড়কড়ে ভাজা গলকাঁটা। তৃতীয় দফায় কাঁচা কুমড়ো যোগে কালোজিরে-ছিটানো পাতলা ঝোল— কুমড়ো, মাছ দুটোই থাকবে অনতিপক্ব, আর বাঙাল ভাষায় যাকে 'লুকা' বলে সেই বস্তুও যেন সমাদৃত হয়— কেননা ইলিশই একমাত্র মাছ যার যকৃৎটিও উপাদেয়। চার নম্বর এল সর্ষপমণ্ডিত তপ্তবাষ্পাকুল ভাতে অথবা কলাপাতায় মোড়া পাতুরি, আর সবশেষে, জিভ জুড়োবার জন্য চিনিমেশানো পাতিলেবুর একটা ঠান্ডা অম্বল— যাতে বিন্দু বিন্দু কালোজিরে আর দুএকটা সুবাস নিস্রাবী কাঁচালংকার সঙ্গে ইলিশের ওঁচা অংশ ল্যাজার দিকটা ভাসমান— রান্নার গুণে সেই অধমও এখন উত্তম। কিন্তু মনে রাখবেন কোনো রান্নাই তেমন জমবে না যদি টুকরোগুলোকে ত্রিকোণ করে কাটা না হয়— আর সাবধান!— এই মীনসত্তমের ধারেকাছে আদা-পেঁয়াজ ঘেঁষতে না পায়, কেননা পেঁয়াজহীন কালিয়ার মতোই পেঁয়াজযুক্ত ইলিশও অচিন্তনীয়। আর যদি আপনি ভুলেও কখনও ইলিশের সঙ্গে আলুর কোনো সংযোগ ঘটান, সেটা হবে রীতিমতো এক মহাপাতক।

কিন্তু শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ইলিশ— এ চলতে পারে বছরের মধ্যে শুধু দু-চার দিন। বিশেষত শেষ বর্ষায়— যখন সর্বাঙ্গে সামুদ্রিক নুনে চর্চিত হয়ে শক্তিধর মহোদয়গণ উজান সাঁতরে ভাগীরথীর জলে ফিরে আসেন। বাঙালির বারোমেসে আহার অনেক বেশি বিচিত্র। আমাদের মাতৃভূমিকে প্রকৃতি যত দান দিয়েছেন, আয়ুর্বেদীয় প্রাচীন যত গবেষণার আমরা উত্তরাধিকারী, যেসব ফল আর আনাজ এ দেশে আমদানি করেছে তাতার মোগল ফিরিঙ্গির দল, আর আজ যেগুলো পূজার আয়োজনে ছাড়া বিলকুল দিশি বনে গেছে— তাছাড়া আমাদের রক্তের ধারায় শাক্ত-বৈষ্ণবের ও ধ্যানধারণায় আর্য-অনার্যের সংমিশ্রণ— এই সবকিছুর সন্নিপাতে বাঙালির ভোজনশিল্প হয়ে উঠেছে একদিকে যেমন উদার তেমনি অন্য দিকে সুচিন্তিত। আমি দেখেছি চৈনিক অথবা ইউরোপীয় রেস্তরাঁয় এমন এক একটি দীর্ঘায়িত মেনু, যা থেকে একটি পদ বেছে নিতেই আধ ঘণ্টা সময় কেটে যায়— দিনেমার দেশে সাতান্নরকম স্যান্ডুইচ, আটলান্টিক-পেরোনো জাহাজে রকমারি থেকে রকমারিতর পশুপক্ষীর মাংসের রান্না; তবু মনে হয় বাঙালির তুল্য ভোজনের প্রসার আমি অন্য কোথাও দেখিনি। এই কথাটায় কোনো দেশপ্রেমজনিত অন্ধতা নেই; আমি শুধু এই সাদা সত্য বলতে চাচ্ছি যে, বাঙালির খাদ্য আমাদের শরীর-রসায়নের সব প্রয়োজন মেটাতে পারে; আর পারে রসনার সব লিপ্সার তৃপ্তি জোগাতে— যা জগৎবিখ্যাত চৈনিক বা ফরাসি রান্নাও পারে না। আপনি অবিশ্বাসে হাসছেন? কেন, আপনি কি লক্ষ করেননি যে, চিনে খাদ্যতালিকায় পাখির বাসার সুপ কিংবা একশো বছরের পুরোনো ডিমও পাওয়া যেতে পারে, কিন্তু তা থেকে বেমালুম বাদ পড়ে যায় তেতো আর মিষ্টি, কোনো দুগ্ধজাত দ্রব্যেরও নামগন্ধ থাকে না? এও আপনার নিশ্চয়ই জানা আছে ইউরোপে আপনি টক কিংবা তেতো চাখতে পারেন শুধু মাদক পানীয়ে, খাদ্যে কখনোই নয়— সেখানকার ভোজনবিধিতে কোমল স্বাদেরই প্রাধান্য? বিয়ার-মদ্যে প্রথম চুমুক দিয়ে আমরা অনেকেই বলেছি 'চিরতার জল'— তার মাদকতায় মোদিত হতে হলে রীতিমতো অভ্যাসের প্রয়োজন হয়। কিন্তু আমাদের উচ্ছে করলা কাঁকরোলের অতি মৃদু তিক্ত স্বাদটি স্বভাবতই রমণীয়। ভারতবর্ষীয় প্রাচীনেরা ছয়টি আলাদা-আলাদা রসকে শনাক্ত করেছিলেন— তিক্ত কটু অম্ল মধুর লবণ কষায়: এর প্রতিটির আস্বাদ যদি পেতে চান, আর সেই সঙ্গে চান আমিষ এবং

নিরামিষ, মৎস্য ও পশুমাংস এবং মৃত্তিকাজাত নানাবিধ ফল ওষধি আনাজ, তা হলে তো বাঙালি রান্নাঘর ছাড়া আপনার গত্যন্তর দেখি না। বললে অত্যুক্তি হয় না যে, মধুরিমার বিচিত্র আয়োজনে বাঙালি শিল্পীরা সুইস স্রষ্টাদের সমকক্ষ, এবং মৎস্যরন্ধনের উপায়নৈপুণ্যে ফিনল্যান্ডেও তাদের জুড়ি মেলা ভার। ভোজনের উপসংহার পর্ব— যাকে ইংরেজিতে বলে ডেজার্ট— সেটাকেও দুই কামরায় ভাগ করেছে বাঙালিরা : প্রথমে একটা টক বা টকে মিষ্টিতে মেশানো লেহ্য পদার্থ তারপর কোনো দুগ্ধাশ্রিত সুমিষ্ট পরিশেষ। একটি পূর্ণাঙ্গ বাঙালি ভোজের জন্য রবীন্দ্রনাথ যে সূত্র দিয়েছিলেন— 'সুক্তো থেকে পায়েস'— এতে সেই সনাতন কথাটাই নতুন করে বলা হল : আরম্ভে তেতো, শেষে মিষ্টি।

কিন্তু আসলে শুধু তেতো নয়, বাঙালির আদি পর্বটিও বিবিধ। যদি চলতে চান ব্রাহ্মণ্য পথে, তা হলে তপ্ত ঘিয়ে টাটকা ভাত মেখে নিয়ে প্রথম দু চার গ্রাস খেয়ে নেবেন; সঙ্গে এক ছিটে করকচ-নুন আর কাঁচালংকা চলতে পারে কিন্তু নিষ্ঠাবানেরা সেটা বাদ দিয়ে যান শুনেছি। আর ঘৃত যাঁদের পক্ষে আর্থিক বা ঔদরিক কারণে গুরুপাক, তাঁদের জন্য আছে তেতোর ডাল— সত্যিকার তেতো নয়, শুধু উচ্ছে-সংযোগে নির্ঝাল ও সুশীতল। এরই প্রতিযোগী হল রবীন্দ্রনাথ কথিত শুক্তো, অথবা একই গোষ্ঠীভুক্ত শাক— সস্তা এবং স্বাস্থ্যকর এবং স্বাদু: শাক জিনিসটার এমনি মহিমা যে, প্রথমই সেটা পাতে না পড়লে কোনো আনুষ্ঠানিক ভোজ শুদ্ধ হয় না। আর অবশ্য শেষের দফায় কোনো গব্য দ্রব্য থাকাই চাই : তা হতে পারে মধুসূদনের ধরনে বড্ড সাধারণ দুধ-ভাত, বা টক অথবা মিষ্টি দই (সবচেয়ে ভালো পাথরের বাটিতে ঘরে পাতা হলে) নয়তো আরও বিদগ্ধ কোনো মিষ্টান্ন। আর এই দুই প্রান্তের মধ্যে সাজানো যেতে পারে যার-যার সামর্থ্য ও রুচি অনুযায়ী বিবিধ ব্যঞ্জন— ঝাল, টক, কোমল, কষায়, মাছ-মাংস, মাংসল আনাজ ও পত্রজাতীয় সবজি— প্রতিটির মশলা সমবায় আলাদা, রসনার প্রতি আবেদনও স্বতন্ত্র। এই 'ব্যঞ্জন' কথাটা থেকেই ভারতবর্ষীয় রন্ধনতত্ত্বটি বোঝা যায় : কাব্যের পরিভাষায় যাকে বলে ব্যঞ্জনা, তারই প্রতিরূপ হল ভোজনের থালায় ব্যঞ্জন, অর্থাৎ খাদ্যবস্তু আভাসে-ইঙ্গিতে রসাত্মক হয়ে উঠলে তবেই সেটাকে ব্যঞ্জন বলা যায়, যে রান্নায় বিবিধ উপাদান মিলেমিশে একটি মৌলিক স্বাদের সৃষ্টি হয় না সেটা কোনো রান্নাই নয়। কথাটা শুনলে কত না খুশি হতেন শার্ল বোদলেয়ার, যিনি কবিকে বলেছিলেন রন্ধনকারী ও সুগন্ধরচয়িতার সহধর্মী।

এক হাঙ্গেরীয় মহিলা, কোনো এক বাঙালি কবিকে বিয়ে করে এ দেশে কিছুদিন কাটাবার পর আমাকে একবার বলেছিলেন: 'আপনাদের রান্নায় বড্ড বেশি মশলার ব্যবহার, ও ভাবে রাঁধলে ছেঁড়া জুতোকেও ভোজ্য করে তোলা যায়।' কথাটা তিনি ঠিক বলেননি, বেঠিকও বলেননি। মানতেই হবে যে বাঙালিরা (বিশেষত পূর্ববঙ্গীয়রা) কোনো-কোনো রান্নায় অত্যধিক এলাচ লবঙ্গ গরমমশলা মিশিয়ে মূল বস্তুটির স্বাদগন্ধকে হত্যা করে থাকেন— যেমন ধরা যাক আমাদের পূর্বোক্ত সেই ধোঁকা, গাঢ় এবং গাঢ়তর মশলাপ্রলেপে যার স্বীয় সত্তা বিলুপ্ত হয়ে যায়। শোল ইত্যাদি আমিষভুক মৎস্যের সঙ্গেও ওইরকম ব্যবহার চলে মাঝে-মাঝে, আর অতি উল্লেখ্যভাবে কাঁকড়া এবং কচ্ছপের সঙ্গে, কলকাতার বাজার-চলতি রোগীসেব্য কাছিম নয় অবশ্য, কুমিল্লার বিখ্যাত কালীকচ্ছপ হলে তবেই রান্নার জারিজুরি সম্ভব। আর যাঁদের আদি নিবাস ছিল পদ্মার ওপারে, তাঁরা কেউ-কেউ এমন একটি রহস্যময় প্রক্রিয়া জানেন যার দ্বারা নির্জলিত কাষ্ঠাকৃতি দুর্গন্ধময় শুঁটকি মাছকেও প্রচুর পরিমাণ পেঁয়াজরসুন ও অগ্নিবর্ণ আগ্নেয়স্বাদ লংকা মিশিয়ে সুস্বাদু করে তোলা

যায়— আমি তা-ই শুনেছি ও চোখেও দেখেছি, চাখবার মতো মনোবল কখনও পাইনি। কিন্তু বাঙালি রান্নার মহাকাব্যে মশলার এই বিজয়-অভিযান একটিমাত্র ক্ষুদ্র পরিচ্ছেদেই সমাপ্ত হয়; সাধারণ নিয়ম হল সুমিত মাত্রায় সুনিয়ন্ত্রিত মশলা প্রয়োগ— যাতে মূল উপাদান-আচ্ছন্ন না হয়ে বরং পায় নতুন এক আস্বাদ্যমানতা। ভুললে চলবে না, মাছমাংসেরও অনেকগুলো 'ঠান্ডা' পদ আছে— যেমন ধরা যাক শ্রীপঞ্চমীর তরুণ ইলিশ, যাতে স্রেফ একটু হলুদ ছাড়া আর কিছুরই দরকার হয় না; বা দুর্গাপূজার অজ মাংস শুধু একটি দুটি নম্রভাষী তেজপাতা দিয়ে সুবাসিত, যার পাতলা টলটলে ঝোল কনসোমে-সুপের মতোই স্বচ্ছ ও সুপেয়, মাংসের নিজ নির্যাসে কিরণবিন্দুচ্ছুরিত। ফালি-ফালি কাঁচাকলার সঙ্গে ঈষৎ-পরিমাণ আদা-জিরে-সম্বল মাগুর মাছ; পটোল-বরবটি-সংবলিত নলা মাছের অতি লঘু হরিৎ-পীত ঝোল; শীতের পাবদার সঙ্গে সেই ধনেপাতা— কোনো ভের্লেন বা জীবনানন্দর ভাষায় যার সুবাস যেন ঘাসের উপর দিয়ে বয়ে-যাওয়া সবুজ বাতাসের মতো : এসব সুখসন্ধান কোন্ বাঙালির না জানা আছে! আর য়েসব পদ গরম-মশলাযোগে তীব্র স্বাদের সেখানেও মশলাগুলোকে আসামি বলা যায় না— তারা বরং আস্বাদে আনে উৎকর্ষ আর পরিপাকেও সাহায্য করে; অতিমাত্রায় প্রযুক্ত হলে তবেই তারা পাকস্থলীতে অশান্তি ঘটায়। আর মানবজাতি এমন-কিছুই আহার অথবা পান করে না, যার অপরিমিত সেবন স্বাস্থ্যনাশক নয়।

বাঙালি রান্নার একটা মস্ত খুঁত এই যে তা বিশ্বের হাটে অচল; আমরা তাকে নিয়ে ঘরে-ঘরে সুখী হতে পারি, কিন্তু ব্যাবসায় খাটাতে পারি না। নিখিল বাঙালির বাসভূমি এই কলকাতার শহরে এমন একটি রেস্তরাঁ নেই যেখানে কোনো তপ্ত দুপুরে লাঞ্চের ছুটিতে, ফার্পোর বাঁধা গত এড়িয়ে, আপনি খেয়ে নিতে পারেন সাধু বাঙালি খাদ্য— যাকে বলে 'মাছের ঝোল-ভাত' সেই ধরনেরই ঘরোয়া মেনু, কিন্তু রান্নায় স্বাদু ও পরিবেশনে সুপ্রসারিত। ধরা যাক সুস্ফুট ও সুদৃশ্য বাটি-চাপা ভাত (সাদা ভাত, পোলাও-জাতীয় ভাজা ভাত নয়), দু এক টুকরো গন্ধলেবুর সঙ্গে পাতলা করে রাঁধা মুসুর ডাল— 'মুখে দেবার জন্য' মুড়মুড়ে ভাজা মউরলা বা কাচকি মাছ— আর, যদি দৈব হয় অনুকূল, সেই স্বর্গীয় খাদ্য প্রোটিনপূর্ণ ইলিশের ডিমের ডালনা, কাঁচা পেঁপের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যা অমৃতরস নিঃসরণ করে। এর পরে আপনি কল্পনা করে নিন আপনার পছন্দমতো যে-কোনো একটা মাছের ঝোল— কিন্তু আমি বলি সেটা বাদ দিলেও তেমন ক্ষতি নেই (আপনাকে আপিসে ফিরতে হবে, ইষৎ ঊনভোজনই সমীচীন)— যদি থাকে এক পাত্র শুভ্রবর্ণ শুভক্রিয় অম্লস্বাদ দধি, সঙ্গে পাটালি গুড় এবং একটি সুপক্ক মর্তমান কলা। এমন-কিছু লম্বা ফরমাশ নয়— কিন্তু দুঃখের বিষয়, এ রকম একটি আয়োজন আপনি সারা শহর টুঁড়ে কোথাও পাবেন না; কেননা চৌরঙ্গি পাড়ার রেস্তরাঁগুলিতে শুধু মোগলাই আর পাঞ্জাবি রান্নাই ভারতীয় বলে চলে, সস্তা দামের খানাঘরগুলিও লাহোর লখনউ-মাদ্রাজি শৈলীতেই সমৃদ্ধ। আর আমাদের অনেকেরই চেনা সেই উজ্জ্বল বঙ্গ মহিলা, হস্টেস হিসেবে যিনি কিছুটা সুনাম্নী, তাঁর আন্তর্জাতিক পার্টির দিনে তিনি সাবধানে এড়িয়ে চলেন বাঙালিয়ানা— পাছে তাঁর মশলা-ভীবু অঙ্গুলি-অপটু শ্বেতাঙ্গ বন্ধুরা প্রতিহত হন, বা ভারতীয় অতিথিবর্গের মধ্যেও কারও-কারও রুচির সঙ্গে ঠিক না মেলে। অতিথির প্রতি বিবেচনা নিশ্চয়ই ভালো— তামিল গৃহে আমি যেমন অপ্রস্তুত হয়েছিলাম তেমন যেন কাউকে কোথাও হতে

না হয়— কিন্তু নতুন দেশে বেড়াতে এসে নতুন খাদ্য চোখ দেখার ইচ্ছেটা স্বাভাবিক আর সেজন্যে কিছু ব্যবস্থা রাখাও সুবুদ্ধির কাজ। কিন্তু আমাদের গৃহস্বামিনী বেছে নেন এমন একটি মধ্য-পথ, যাকে বলা যায় নির্জাতীয়— অর্থাৎ স্থানীয়তা বা স্বকীয়তার সংস্পর্শহীন। হয়তো ভুল করব না, যদি আমার অনুমিত ভোজের আরম্ভে তখনই টম্যাটো-সুপ, তার পর অতি সরল ও অতি মৃদু ভেটকি পেরিয়ে পেস্তা-ছিটোনো পোলাও— সাদা ভাত অবশ্যই নয়, নয় লাল আটার টাটকা সেঁকা হাত-রুটি বা বাঙালির সেই অতুলনীয় সৃষ্টি— লুচি, যার সঙ্গে ভদ্রমহিলার মটন-রোস্ট বা ম্যায়নিজ-মুর্গির মিলমিশ হত চমৎকার। সঙ্গে দেখা যাচ্ছে কাঁচা ফসলের স্যালাড, আর শেষ দফায়— রাবড়ি সরভাজা ছানার পায়েসের বদলে— হয়তো পার্ক স্ট্রিটে ফরমাশ দেওয়া জমকালো একটি টুট্টি-ফ্রুটি— মোটের উপর ঠিক সেই ধরনের সমাবেশ, যা উচকপালে হোটেলগুলোতে নিত্যনৈমিত্তিক। আর তাই কোনো ভিনদেশি ভ্রমক যিনি গ্র্যান্ড অথবা গ্রেট ইস্টার্নে অনেকগুলো দিন সপ্তাহ কাটিয়ে যান, রাস্তায় ঘুরে-ঘুরে ছবি তোলেন, তৈরি করেন তথ্যমূলক একটি চলচ্চিত্র বা দেশে ফিরে বইও লিখে ফেলেন একখানা-– তিনি হয়তো এই ধারণা নিয়েই ফিরতি প্লেনে আরোহণ করেন যে বাঙালিদের নিজস্ব কোনো রান্না নেই।

কিন্তু হয়তো এইসবই যথাযথ। আমি যাকে বলেছি ত্রুটি, সেটাই আসলে বাঙালি রান্নার চরিত্র। যেমন সে বাইরের জগতে প্রতিষ্ঠা পেল না, তেমনই ব্যাবসাদারির অশ্লীলতাও সে এড়িয়ে গেল। আমাদের রন্ধনলক্ষ্মী অন্তঃপুরিকা; তার পসরা নিয়ে দেশে-দেশে ফেরি করতে গেলে তাকে চ্যুত করা হয় তার ধর্ম থেকে— কথাটা আদি অর্থে ব্যবহার করছি, যেমন জলের ধর্ম শীতলতা বা নারীর ধর্ম বাৎসল্য। গৃহ, পারিবারিক বন্ধন, ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির স্নেহসম্বন্ধ— এই হল তার সৃষ্টির উৎস ও বিবর্তনের আশ্রয়; তার একদিকে যেমন আছে কলাবিদ্যা তেমনই অন্যদিকে মানবিক হৃদয়; একদিকে বহুযুগসঞ্চিত বিজ্ঞান আর অন্যদিকে বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে সামঞ্জস্যবোধ। সব দেশের খাদ্যই মূলত তার জলবায়ু নিসর্গের সঙ্গে সম্পৃক্ত। কিন্তু যেসব দেশ হিমায়ন ও পরিবহনের ব্যবস্থায় ধুরন্ধর, সেখানে বছরের যে-কোনো তারিখে যে-কোনো খাদ্য আপনি পেতে পারেন— অবশ্য নির্বাত টিন অথবা তুহিনীকৃত বাক্স থেকে। কিন্তু সেরকম কোনো ব্যবস্থা— ঈশ্বরকে ধন্যবাদ— আমাদের দেশে অভাবনীয়। সর্বশক্তিমান যন্ত্রের দ্বারা বরপ্রাপ্ত বা অভিশপ্ত আমরা হইনি। এখানে আমাদের অনেক রকম সুখাদ্য তাই ঋতুনির্ভর এমনকি দৈনন্দিন আবহাওয়া-বদলের ছন্দে বাঁধা। কিন্তু এই রহস্যটি আমাদের বিদেশি বন্ধুর কল্পনায় কোনো স্থান পাবে না, যদি না তিনি বাসা নেন কোনো বাঙালি পরিবারের মধ্যে— দায় চুকিয়ে দেওয়া অতিথি হিসেবে নয়, যতটা সম্ভব ঘরের ছেলে বনে গিয়ে অন্যদের সঙ্গে একই খাদ্য খেয়ে— এমন একটি পরিবারে, যাঁরা জীবনযাত্রায় কিছুটা মেনে চলেন ঐতিহ্য, এবং অনুষ্ঠান পালনের অবকাশ ও অভিরুচি যাঁরা হারিয়ে ফেলেননি। সে-রকম একটি পরিবারে, ফাল্গুনের শুরুতে মধ্যাহ্নভোজনে প্রথমেই আপনার পাতে পড়বে কচি নিমপাতা ভাজা— ঈষত্তম তেতো যার কৈশোর-স্বাদ দুতিন সপ্তাহেই বুড়িয়ে যায়— আর উপসংহারে টকেমিষ্টিতে কাঁচা আমের সুবাস-ভরা অম্বল। জৈষ্ঠ্যের দিনে প্রথমেই পাবেন উজ্জ্বল-সবুজ ঢেঁকি শাকের সঙ্গে এক চামচে কাসুন্দি— সর্ষপ এবং সৌর অগ্নির সেই বিরচন যা ইংরেজের গোমাংস সঙ্গী মাস্টার্ডের চেয়ে উগ্র হয়েও দেহের মধ্যে তাপ বৃদ্ধি করে না। কোনো-কোনো দিন কাসুন্দির বদলে সজল তিক্ত হিঞ্চের ঝোল— তেমনই উপাদেয় এবং খিদে জাগানো, যেমন গ্রীষ্মের দুপুরে রোদে ঘুরে-ঘুরে ক্লান্ত হবার পর বরফ-গলা এক গ্লাস কাম্পারি। কোনোদিন,

হয়তো, তরুণ কাঁঠালের ডালনা মুখে দিয়ে আপনি সেটাকে গোবৎসের মাংস বলে ভুল করবেন। আষাঢ় এল, মেঘলা দিন অন্ধকার, বাইরে মর্মর শব্দ অবিরাম, সেদিন দেখবেন খিচুড়ি হর্ষের ধুম পড়ে গেছে বাড়িতে, আলু ডিম মিঠে পেঁয়াজের সংযোগে যা একাই একটি আদরণীয় ভোজ হয়ে ওঠে, যার তপ্ত ঘ্রাণ মাছ-মাংসের অভাব সুদ্ধু ভুলিয়ে দেয়। শরতে দেখা দেয় কচুর শাক, কচুর লতি— ছোলা আর নারকোল-কুচিতে দানাদার, আর ঝোলা-গুড়ে রাঁধা কষায়স্বাদ চালতার অম্বল। শীতে পাবেন মটর ডালে বা অম্বলের মধ্যে লাল মুলোর ঝাঁঝালো স্বাদ, আর কোনো রাত্রে বেগুনপোড়ার নবনীমসৃণ সম্ভাষণ। আর যদি বাড়িতে কোনো নিষ্ঠাবতী বিধবা থাকেন, তাহলে— চেয়ে-চিন্তে যে করে হোক তাঁর রান্নার নমুনা আপনাকে চাখতেই হবে। হয়তো তাঁর রান্নাঘরে তিনি ঢুকতে দেবেন না আপনাকে, তবু তাঁকে আবেদন জানাতে আপনি দ্বিধা করবেন না— কেননা তিনি আচার বিষয়ে অন্ধ হলেও অতিথি সেবায় সর্বদাই দরাজ।

৫

হিন্দু বিধবার নিয়ম পালনের কাঠিন্য যে সম্প্রতি ভেঙে যাচ্ছে, এটা আমাদের সকলের পক্ষেই আনন্দের কথা। এই প্রথার সম্পূর্ণ তিরোধানের আশায় আমরা সাগ্রহে অপেক্ষা করছি। তবু, আমার ছেলেবেলার কথা মনে করে, মাঝে-মাঝে আমি দীর্ঘশ্বাস ফেলি বিধবার হাতের সেইসব রচনার জন্য, যার শিল্পচাতুরী বিশেষভাবে গার্হস্থ্য এবং দৈশিক। মনে পড়ে সারি-সারি বৈয়ম-ভরতি আচার মোরব্বা ইত্যাদি— যা তৈরি করতেন বিধবা ও সন্তান পালনের দায় থেকে মুক্ত প্রৌঢ়া সধবারা মিলে: ঋতুভেদে কুল দিয়ে, পেয়ারা দিয়ে, কাঁচা আম পাকা আম দিয়ে, আমলকী, বেল, জলপাই আর পুরোনো কালো তেঁতুল দিয়ে, টক মিষ্টি ঝাঁঝালো আর কষায় স্বাদের পঞ্চাশরকম হেরফের ঘটিয়ে— কোনোটা সর্দিতে উপকারী, কোনোটায় বদহজম সারে, আর কোনো-কোনোটা গর্ভিণী ও সদ্যরোগমুক্তের অরুচির চিকিৎসক— আর সবগুলোই অবশ্য রাখা হয় লুব্ধ শিশুদের নাগালের বাইরে, কোনো সুশীতল স্থানে বাড়ির সকলের জন্য সংবৎসরের এক স্বাদ সঞ্চয়ন। মিষ্টির লাইনেও উদ্ভাবন কিছু কম দেখিনি: নাড়ু মোয়া পিঠে পায়েস তক্তি— তিলের নাড়ুর দন্তোপযোগী দ্রঢ়িমা, লক্ষ্মীপুজোর সুকোমল নারকোলের মিষ্টি— চালের মতো গড়ন, মাছের মতো, চিংড়ির মুড়োর মতো, কোনোটা আবার অর্ধচন্দ্রাকার— শীতের সকালে সর-পড়া নতুন গুড়ের বাসি পায়েস, কোনো ব্রতের দিনে উনুন-গরম আস্কে-পিঠে আর পাটিসাপটা, ফল শস্য দুগ্ধশর্করার বিচিত্র এই সমাহারকেও বাঙালি ভোজ্যতালিকায় একটি গৌরবের আসন দিতে হবে।

কিন্তু এ সবের চেয়েও আশ্চর্য হল সেই নিরামিষ রন্ধনশৈলী, যাকে বলা যায় বৈধব্যপ্রথারই একটা উপজাতক। শুনতে অদ্ভুত কিন্তু কথাটা সত্য, যে এই উপবাসকারিণী একাহারিণী ভগিনীদের হাতেই বাঙালি রান্না পেয়েছে তার সূক্ষ্মতম, সুকুমারতম ব্যঞ্জনা— যদিও ভক্ষ্য বিষয়ে শত শাসনে তাঁরা আবদ্ধ, অথবা হয়তো সেইজন্যেই। ইউরোপের মধ্যযুগে যেমন খ্রিস্টান সন্ন্যাসীরা তাঁদের সংসারচ্যুত মঠের নিভৃতে, ধীরে-ধীরে জারিত করেছিলেন দ্রাক্ষারস থেকে অভিনব মদিরা পর্যায়, তেমনই আমাদের বিধবারা সব খ্যাতিমান সুখাদ্য থেকে বঞ্চিত হয়ে, সমাজের উপর মহৎ প্রতিশোধ নিয়েছিলেন রসনায় সূক্ষ্মতর বোধ উদ্রিক্ত করে, বাঙাল ভাষায় যাকে বলে 'তার'। পেঁয়াজ তাদের নিষিদ্ধ, গরম-মশলা নিষিদ্ধ, এমনকি মুসুর ডালের মতো নিরীহ শস্যও চলে না— এ অকথায় তাঁরা হাত পাকিয়েছেন একটি নতুন স্টাইলে, অসামান্য রচনাশক্তির পরিচয় দিয়ে। স্টাইলটিকে আমি বলব শুদ্ধ এবং সুন্দর— ভূষণরিক্ত বলে শুদ্ধ আর সুন্দর, এই অর্থে যে ন্যূনতম উপকরণে তা

সম্পন্ন করা যায়। আমাদের যা অনাদৃত ও পরিত্যক্ত, সেই কুমড়োর বিচি লাউয়ের খোসাকেও তাঁরা স্বাদু করে তুলতে পারেন। তাঁদের ভাঁড়ারে স্থান পায় খিড়কি-পুকুরের শালুক-ডাঁটা, সবচেয়ে সস্তা বাজারের শাক, আর উঠোনের মাচার লাউপাতা আর কুমড়োফুল। কিন্তু এই দৈন্যকেই ধন্য করে তোলে তাঁদের ডাল-পাতুরি, দেশে-দেশে অভিনন্দনপ্রাপ্ত হংসযকৃৎ-পিষ্টকের মতোই যা সুখদায়ক; বাসন্তিক অ্যাসপারাগাসের মতো নধর, সরস সজনে-ডাঁটা, কচি বেগুন আর কলাই ডালের বড়ির সঙ্গে স্নিগ্ধ লাল শাক, ঈষৎ-মধুর মাংসল কাঁঠাল-বিচি দিয়ে রাঁধা অনবদ্য মটর ডাল, আর কখনও হয়তো সর্ষেবাটায় মখমল মসৃণ কচু সেদ্ধ। যদি আপনি হন প্রকৃত একজন ভোজনতত্ত্ববিদ, তা হলেও এই দ্রব্যগুলিকে তেমন বিরল ও বিশেষ বলে জানবেন, যেমন জাপানি জলের অরুণকান্তি কাঁচা মাছ, কাস্পিয়ান হ্রদের কাভিয়ার, বা ফ্রান্সের মাটির তলায় লুকিয়ে থাকা কৃষ্ণবর্ণ শিলীন্ধ্র— অর্থাৎ ব্যাঙের ছাতা। এমনকি ভাতেরও আছে আলাদা একটি বিধবাসম্মত প্রকরণ, যেহেতু তাঁরা অধিকারী শুধু পাথরের থালায়, শুধু আতপ চালে;— নিছক ভাত জিনিসটা কত ভালো হতে পারে তা জানতে হলে নিরিমিষ-ঘরের টাটকা গরম সুঘ্রাণ গোবিন্দভোগের স্বাদ নেওয়া চাই।

এই প্রসঙ্গে একটি ব্যক্তিগত কথা না লিখে পারছি না। আমি স্বভাবত মৎস্যবিলাসী ও মাংসভুক জীব, কিন্তু আমার জীবনের সবচেয়ে স্মরণীয় দুটি ভোজন হয়েছিল আমিষবর্জিত। প্রথমটি শান্তিনিকেতনে— যেবারে রবীন্দ্রনাথের অতিথি হয়ে সপরিবারে ও সবান্ধবে কয়েকটা দিন কাটিয়েছিলাম সেখানে। সেদিন মধ্যাহ্নভোজনের জন্য 'উদয়ন'-এ যেতেই প্রতিমা দেবী মৃদু স্বরে বললেন, 'আজ মাছ পাওয়া যায়নি, আপনাদের কষ্ট হবে'। আমাকে মানতেই হবে আমি মনে-মনে একটু মুষড়ে গিয়েছিলাম ও কথা শুনে, কিন্তু টেবিলে বসে ক্রমশ আমার অনুভূতি হল যে, আজকের এই আপ্যায়নের কোনো তুলনা নেই। আজ থালা-বাটি সব নিকষকালো পাথরের সেই কালোর উপর জুঁইফুলের মতো শুভ্র অন্ন শুভ্রতর হয়ে শোভা পাচ্ছে, বাটিতে-বাটিতে সুসজ্জিত ব্যঞ্জন থেকে নানান ধরনের অনুকূল গন্ধ উঠছে। শুষ্ক বীরভূমে এপ্রিল মাস চলেছে তখন, '*পুনশ্চ*' থেকে '*উদয়ন*'-এ হেঁটে আসার এক মিনিটে মাথা ফেটে যায়; কিন্তু এই ভোজনকক্ষটি প্রশস্ত ও ঠান্ডা ও আধো অন্ধকার— প্রখর রৌদ্রকে ঠেকিয়ে রেখেছে সিক্ত মোটা খসখসের পর্দা, ইলেকট্রিক পাখার ঝাপটে-ঝাপটে চন্দনের মৃদু গন্ধ পাচ্ছি, মেঝের উপর দুটো বিশাল অ্যালসেশিয়ান লম্বমান, নরম আওয়াজে গান ভেসে আসছে রেডিয়ো থেকে, আমাদের সামনে বসে আছেন বাদামি একটি কটকি শাড়ি পরে নম্রভাষিণী মঙ্গলরূপিণী প্রতিমা দেবী : পরিবেশটি যতদূর সম্ভব মনোরম। বর্ণ গন্ধ স্পর্শ এবং সুরধ্বনির এই সন্নিপাতে সেদিনকার ভোজন ভোজনাতীতভাবে সুখের হয়ে উঠেছিল।

কয়েক বছর পরে, কলকাতায় আমি এক বন্ধুর বাড়িতে সান্ধ্যভোজে নিমন্ত্রিত হয়েছিলাম : উপলক্ষনও— তার বিয়ের আশীর্বাদ। কখনো শুনিনি বঙ্গভূমিতে কোথাও কোনো বৈবাহিক ভোজ বিনা-মৎস্যে সম্পাদিত হয়, কিন্তু 'পাকা দেখা'র অনুষ্ঠান বিষয়ে সেই পশ্চিমবঙ্গীয় ব্রাহ্মণ-বংশ এমন একটি স্বতন্ত্র রীতি মেনে চলেন যা তার আগে পর্যন্ত আমার ধারণাতীত ছিল। আমরা বসেছি পঙক্তিবন্ধ হয়ে একতলার লম্বা খোলা বারান্দায়— জনা পঞ্চাশ অতিথি আমরা; আমাদের আসনগুলি কম্বলের বা কুশাতৃণের, আমাদের সামনে লালচে পোড়া মাটির থালা। গেলাসে-গেলাসে কেওড়া-বাসিত জল; সবই অনিন্দ্যভাবে পরিচ্ছন্ন। আর ভোজ্যবস্তু আবির্ভূত হচ্ছে ছোটো-ছোটো মৃন্ময় পাত্রে, একের পর এক অন্তহীন। সবসুদ্ধু কটা পদ পরিবেশিত হয়েছিল আমি তা গুনে উঠতে পারিনি— পরে শুনেছিলাম বত্রিশটি (বা কে জানে হয়তো চৌষট্টিও হতে পারে)। কেননা

সেই সংখ্যাটাই বিধিবন্ধ। সবই আসছে সুচিন্তিত অত্যল্প পরিমাণে, সবই বিশুদ্ধ নিরামিষ— যতদূর মনে পড়ে আলু গাজর টম্যাটোর মতো অর্বাচীন কোনো ফসলও ছিল না— শুধু সনাতন শাকপাতা মশলা শস্যের রহস্যময় বহু বিচিত্র প্রকরণ, যার রন্ধনপ্রণালির স্রষ্টাদের আমি প্রতিভাবান না বলে পারছি না। কী কী পদ খেয়েছিলাম আমার মনে নেই, সবগুলোকে আমি শনাক্ত করতে পারিনি, সবগুলো যে আমার মুখে খুব ভালো লেগেছিল তাও হয়তো নয়— কিন্তু এই আনুষ্ঠানিক ভোজ আর প্রতিমা দেবীর গৃহে সেই মধ্যাহ্নভোজন : এই দুটিকে আমার এখনও মনে হয় আহার-ব্যাপারে সুন্দরের শ্রেষ্ঠ উদাহরণ।

৬

কিন্তু এইসবই অতীতের কথা। আমার এই লেখাটায় যার নকশা আঁকলাম সেই জগৎ দ্বিতীয় যুদ্ধের ধাক্কায় কেটে গিয়েছিল; স্বাধীনতার পরে, বাংলা দেশের ভূগোল-বিপ্লবের পরে, এতদিনে তা এতদূর বিধ্বস্ত যে, এখনকার বৃদ্ধ-প্রৌঢ়দের আয়ু ফুরোলেই তার বিলুপ্তি অবধারিত বলে ধরে নেওয়া যায়। বন্যার মুখে ভেঙে পড়ল অনেক হাড়ে-ঘুণ-ধরা প্রতিষ্ঠান— সেটা ভালোই; কিন্তু সেই সঙ্গে আমরা হারিয়ে ফেলছি এমন একটি জিনিস যা সপ্রাণ ও পরিণতিশীল— একটি কলাবিদ্যা, আমাদের জলবায়ু মানসপ্রকৃতির একটি উৎসরণ : আমাদের রান্না। কে দিতে পারে সেই সূক্ষ্ম জটিল কারুকর্মের জন্য সময় আর সে সব সরঞ্জামই বা কোথায়, যখন স্বামী-স্ত্রী সংসার পাতেন ক্ষুদ্রাকার ফ্ল্যাটে, সাধারণত মা বাবা ইত্যাদি থেকে বিচ্ছিন্ন, পারতপক্ষে দুজনেই কাজে বেরিয়ে যান, আর যখন ভাগ্য খুব ভালো না থাকলে তেমন দক্ষ গৃহসেবকও জোটানো যায় না? আজকের দিনের কলকাতাবাসী মধ্যবিত্ত তরুণ বাঙালিরা ভোজনভজনায় লক্ষণীয়ভাবে বঙ্গবিমুখ, কিংবা বলা যায় সর্বভারতীয় বা আন্তর্জাতিক; তাঁদের মধ্যে এমন আমি কাউকেই প্রায় চিনি না যিনি হৃষ্ট না হন ধোসায়, বিফরোলে, হ্যাম্বার্গারে বা দহিবড়ায়। প্রায়ই তাঁরা বাইরে খেয়ে আসেন রাঁধাবাড়ার ঝামেলা বাঁচাবার জন্য, অথবা বাড়ি নিয়ে আসেন চৌ-মিন বা পাঞ্জাবি দোকানের রুটি-মাংস। আনা মাত্র খেয়ে নেওয়া যায় এমনিই সব ঠান্ডা আমিষ তাঁদের পছন্দ; যে দেশে টাটকা মাছ এত প্রচুর আর ভিটামিনাত্মক তাজা সবজিরও ছড়াছড়ি, সেখানে তাঁরা বিজ্ঞাপনে ভুলে ক্ষীণপ্রাণ টিনের খাদ্যে প্রলুব্ধ হন। এমনকি আমাদের বহুযুগপ্রিয় সুরভি সেই পত্রনির্যাস, যা হিমালয়ের শিখরদেশ থেকে উজ্জীবক ধারায় ছড়িয়ে পড়েছে বাংলার ঘরে-ঘরে, হয়ে উঠেছে আমাদের গার্হস্থ্য ও সামাজিক জীবনের একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ— সেটিকে পরিহার করে অনেকে ধরেছেন তাৎক্ষণিক কফি, যেহেতু চা-রচনায় কিঞ্চিৎ বেশি খাটুনির প্রয়োজন হয়। অবশ্য এই সবই সময়োচিত, বাঙালির স্বভাবসুলভ রোমান্টিকতার একটি উচ্ছ্বাসও বলা যায়: এ নিয়ে নালিশ যেমন নিষ্ফল তেমনি মন খারাপ করাও অর্থহীন। তবু এই কথাটুকু এখানে পেশ করতে চাই যে বাঙালি রান্না যদি আজকাল গ্রস্ত হয়ে থাকে— আর লক্ষণ দেখে তাই মনে হচ্ছে— তা হলে তার বিবরণ লিপিবদ্ধ থাকা জরুরি একটি প্রয়োজন— কেননা পরিবর্তন জীবনেরই একটি নিয়ম হলেও পরিবর্তনও পরিবর্তনের অধীন, আর ইতিহাস ও পূর্বপুরুষের স্মৃতির মধ্যেই ভবিতব্যের বীজ নিহিত থাকে।